ISSN : 0975-5594

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

ষোড়শ সংখ্যা

পঁচিশে বৈশাখ ১৪২২

রবীন্দ্র-জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

A Literary Journal, Department of Bengali Language & Literature, University of Calcutta. Editor : Prof. Biswanath Roy

ISSN : 0975-5594

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

ষোড়শ সংখ্যা

পঁচিশে বৈশাখ ১৪২২

সম্পাদক

বিশ্বনাথ রায়

রবীন্দ্র-জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

A Literary Journal, Department of Bengali Language & Literature, University of Calcutta Vol. 16, May 2015 ISSN : 0975-5594

Editor : Prof. Biswanath Roy

প্রচ্ছদ ঃ আত্মপ্রতিকৃতি ঃ রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

পরামর্শ পরিষৎ

শ্রীসুরঞ্জন দাস, উপাচার্য

শ্রীধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্য, শিক্ষা

শ্রীমতী সোনালি চক্রবর্তী ব্যানার্জী, সহ-উপাচার্য, অর্থ

শ্রীবাসব চৌধুরী, নিবন্ধক

শ্রীঅপরেশ দাস, অধীক্ষক, ক.বি. মুদ্রণালয়

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসনৎকুমার নস্কর

শ্রীমতী উর্মি রায়চৌধুরী

শ্রীমতী সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅরূপকুমার দাস

শ্রীপ্রসূন ঘোষ (বিভাগীয় প্রধান)

সেখ রফিকুল হোসেন

সম্পাদক

শ্রীবিশ্বনাথ রায়

অধ্যাপক বাসব চৌধুরী, নিবন্ধক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীঅপরেশ দাস, অধীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়, ৪৮, হাজরা রোড কলকাতা-৭০০ ০১৯ হতে মুদ্রিত।

Regd. No. 2736B

মূল্য — ৩০০ টাকা

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের মুখপত্র 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'র ষোড়শ সংখ্যাটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভাগীয় নিয়মতান্ত্রিকতার সূত্রে দায়িত্বভার অর্পিত হয় বর্তমান সম্পাদকের উপরে। সময়টা ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালনের পূর্তিতে গোটা দেশ জুড়ে সেই মহাকবিকে স্মরণের জোয়ারের কাল। এ নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও চলেছিল বহুমাত্রিক কর্মতৎপরতা। প্রাচীন এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধনে যুক্ত ছিল রবীন্দ্র-মনীষা। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিদ্যা-চর্চাতেও তিনি ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারী। আমাদের শ্লাঘার বিষয় বাংলা বিভাগে তিনি অধ্যাপনা করেছেন দু'বছর (১৯৩২-১৯৩৪)। বেতন গ্রহণ করেছেন যেমন তেমনি তাঁর ক্লাসে 'রোলকল' করে ছাত্রদের পার্সেন্টাইজও দেওয়া হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের ক্লাস লওয়া সে এক বিচিত্র ব্যাপার।'

এইসব কারণেই বিভাগীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয় 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'র ষোড়শ সংখ্যাটি হবে রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রিক। শুধু তাই নয় শতবর্ষে পা দিতে চলা বিভাগটিতে রবীন্দ্র-চর্চার একটি রূপরেখা তাতে যেন ধরা থাকে। ১৯১৯ সালে প্রথম অধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র সেন কিংবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো না কোনো সূত্রে বাংলা বিভাগে যাঁরা পাঠদান করেছেন এবং এখনও পাঠদান করে চলেছেন তাঁদের লেখা দিয়েই সজ্জিত হবে সংখ্যাটি। এই নির্মাণ কার্যে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক; আন্তর্বিভাগীয়, অংশকালীন বা আমন্ত্রিত অধ্যাপক যাই হোন না কেন— প্রত্যেকের লেখাই যুক্ত থাকবে।

কাজটি ছিল রীতিমত কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। নানা সূত্র থেকে তথ্য জোগাড় করে জানা গেল এখনও পর্যন্ত শতাধিক শিক্ষক পাঠদান করেছেন বাংলা বিভাগে। এঁরা সকলেই যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে লেখা-লেখি করেছেন এমনটা যেমন নয়, ঠিক তেমনি সকলের কাছে আমাদের পক্ষে পৌঁছানোও সম্ভব হয়নি। আরও দুঃখের কথা অনেকের কাছে বার বার লেখা চেয়েও কোনো সাড়া পাইনি আমরা।

তাহলেও প্রাপ্ত মোট পঁচাশিটি লেখা কম গৌরবের বিষয় নয়;—যার থেকে বিশ্বের প্রাচীনতম বাংলা বিভাগের রবীন্দ্র-চর্চার focusটি পাঠক পেয়ে যাবেন 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'র এই সংখ্যায়। লেখাগুলিতে কেবল মাত্র রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথাসিদ্ধ বিচিত্র দিক নির্দেশ নেই, তাঁর সম্পর্কে স্মৃতি-লেখ, তাঁর সাহিত্য ও ভাষা ভাবনার বিরূপ সমালোচনা, সে নিয়ে সমকালীন প্রতর্ক, তাঁর গ্রন্থ এমনকি ছবির বইয়ের রিভিউ, মনীষীদের সঙ্গে সম্পর্কের খতিয়ান; কবির অনুবাদ, সংগীত, চিত্রকলা, পুঁথিচর্চা থেকে শুরু করে লিঙ্গ রাজনীতি—এই সংকলনে সন্ধান পাওয়া যাবে এক বহুমাত্রিক রবীন্দ্র-মনীষার।

দুটি পর্বে লেখাগুলি বিন্যস্ত। প্রয়াত শিক্ষকদের রচনাগুলি স্থান পেয়েছে প্রথমে অর্থাৎ 'পূর্বপক্ষ'-এ। 'উত্তরপক্ষ'-এ আছে মর্ত্যকায়ায় বর্তমান শিক্ষকদের রচনা সমূহ। সব সময়ে ঠিক ঠিক কালানুক্রম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাল-তামামির বেড়া ভেঙে দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই। সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক

গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির কথা আমাদের অজানা নয়। কথাসাহিত্যিক ও জার্নাল লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপুল জনপ্রিয়তার আড়ালে পড়ে গিয়েছিল তাঁর কবি-সত্তা। তাই কোনো প্রবন্ধ নয়, এই সংকলনের মুখপাত-এ 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যা (১৯৭০) থেকে পুনর্মুদ্রিত হল তাঁর কবিতা 'রবীন্দ্রনাথকে'।

অপর পক্ষে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ'-এ Professor হিসাবে রবীন্দ্রনাথের যোগদানের অন্যতম শর্ত ছিল 'delivering a course of lectures each year on selected topics connected with Bengali Language and Literature for the benefit and guidance of post-graduate students'. কবি-অধ্যাপকের প্রথম বক্তৃতাটি দিয়ে তাই সূচনা হয়েছে এই সংকলনের।

অধ্যাপক সতী ঘোষ-এর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক কোনো বাংলা লেখার সন্ধান আমরা পাইনি। 'Rabindranath' নামে ইংরাজিতে লেখা তাঁর একটি বই ছিল। সেই গ্রন্থের দশম অধ্যায় 'Rabindranath as a Song-Maker' অংশটি আমাদের অনুরোধে নির্বাচন করে দেওয়া হয়েছে তাঁর পরিবার সূত্রে। বাংলায় লেখা নয় বলে 'পূর্বপক্ষ'-এর সব শেষে সেটি স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের লেখাটি নির্বাচন করে দিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

প্রথম পর্বের অনেক লেখাই নির্বাচনের পর প্রয়োজন মতো সম্পাদনা যেমন করতে হয়েছে তেমনি 'উত্তরপক্ষ'-এর অনেক বিপুলাকৃতির প্রবন্ধ লেখকের অনুমতিক্রমে পত্রিকার উপযোগী করে নিয়েছি আমরা। 'পূর্বপক্ষ'-এর লেখাগুলিতে বানান অপরিবর্তিত।

রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণার যে কোনো ক্ষেত্রে উৎসাহদানে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাসের কোনো খামতি নেই। 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'র এই সংখ্যাটি প্রকাশে তা আরও একবার প্রমাণিত হল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তরফে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সংখ্যাটি প্রস্তুতের কাজে নিরন্তর সাহায্য পেয়েছি বর্তমান ও প্রাক্তন কোনো কোনো গবেষকের কাছে। তাঁদের মধ্যে ড. শুভাশিস মণ্ডল, ড. দেবাশিস ভট্টাচার্য, প্রণব নস্করের নাম করতেই হয়।

বিশ্বনাথ রায়
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় সূচি

পূর্বপক্ষ

রবীন্দ্রনাথকে
—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫

ঘরের কথায় রবীন্দ্রনাথ
—দীনেশচন্দ্র সেন ১৬

রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান সুর
—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২১

বাঙ্গালা ভাষার মামলা
—বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৩৪

বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ
—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৯

রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"
—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৮

বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা
—শশাঙ্কমোহন সেন ৫১

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য
—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩

রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম
—প্রিয়রঞ্জন সেন ৬৯

আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ
—সুকুমার সেন ৭৫

রবীন্দ্র-কাব্যে বৈচিত্র্য
—বিশ্বপতি চৌধুরী ৭৯

রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার
—আশুতোষ ভট্টাচার্য ৮৩

'জগৎ দেখিতে হইব বাহির'
—প্রমথনাথ বিশী ৯১

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা
—নীহাররঞ্জন রায় ৯৪

ইংরাজীশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ
—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১০০

সাহিত্যতত্ত্ববিচারে রবীন্দ্রনাথ
—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ১০৯

বৈষ্ণব কবিতা : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি
—জনার্দন চক্রবর্তী ১১৮

রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা
—শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১২৫

রবীন্দ্র-চিত্তে বিজ্ঞানের সক্রিয় পদক্ষেপ
—ক্ষুদিরাম দাস ১৩৬

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা
—হরপ্রসাদ মিত্র ১৫২

‘শিক্ষার মিলন’ ও ‘শিক্ষার বিরোধ’
—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চা
—শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৭৫

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা
—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯০

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ
—প্রণবরঞ্জন ঘোষ ২০৩

রবীন্দ্র-মানস : দ্বিধা, সমন্বয় ও পরিণাম
—রথীন্দ্রনাথ রায় ২০৮

টলস্টয়, ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ
—ভবানীগোপাল সান্যাল ২১৩

ডাকঘর—ইংরেজি রূপান্তরে
—জ্যোতি ভট্টাচার্য ২২৩

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারের আদর্শ
—উমা রায় ২৩০

রক্তকরবীর চিত্রকল্প : সকাল ও বিকালে
—নির্মলেন্দু ভৌমিক ২৩৮

দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ : উপসর্গ প্রসঙ্গ
—পরেশচন্দ্র মজুমদার ২৪৫

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম
—অপূর্বকুমার রায় ২৬৩

রবীন্দ্র-ঋতুচিত্র : বর্ষা-প্রসঙ্গ
—রামেশ্বর শ ২৭৫

বাংলা ব্যাকরণ ও রবীন্দ্রনাথ
—সুভদ্রকুমার সেন ২৭৮

পুঁথির বানান, পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা এবং রবীন্দ্রনাথ
—করুণাসিন্ধু দাস ২৯৮

আধুনিক ভারত-সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ
—বীতশোক ভট্টাচার্য ৩০৩

RABINDRANATH AS A SONG-MAKER
–Sati Ghosh ৩১৫

উত্তরপক্ষ

রবীন্দ্রসংগীত : শ্রদ্ধার বর্ণবিপর্যয়
—অরুণকুমার বসু ৩২০

চিঠিপত্রে স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ
—অলোক রায় ৩৩৪

গদ্যকবিতার সূত্র ও রবীন্দ্রনাথ
—পবিত্র সরকার ৩৪২

দেড়শততম জন্মবর্ষের আলোকে দুই মহামানব
—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ৩৫৬

নিভৃত গ্রাম্য ভারতবর্ষ
—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৩৭০

মেঘদূত অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ
—নরেশচন্দ্র জানা ৩৭৭

***বিসর্জন* : আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য প্রথম ভারতীয় ছবি**
—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ৩৮১

রবীন্দ্রনাথের শেষকটি কবিতা
—সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮৪

রবীন্দ্রনাথ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ
—দিব্যজ্যোতি মজুমদার ৩৯১

রবীন্দ্রমননে সুভাষ
—জ্যোতির্ময় ঘোষ ৩৯৫

‘*গীতাঞ্জলি*’ ‘*সং অফারিংস*’ : নোবেল প্রাপ্তির শতবর্ষ
—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৯৯

বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ
—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৫

রবীন্দ্র-নাটকে বৌদ্ধ আখ্যান
—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক ৪১৫

রাজায় রাজায় : শেক্‌সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের রাজ-ভাবনা
—দীপেন্দু চক্রবর্তী ৪২২

উনিশ শতকের পত্রপত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ
—স্বপন বসু ৪২৪

ছেলেভুলানো ছড়া, শিশুমন ও বর্তমান প্রজন্ম
—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৭

জীবনস্মৃতি **: কেবলি ছবি শুধু পটে-লিখা?**
—পিনাকেশ সরকার ৪৩৫

রবীন্দ্র-নাট্যে প্রতিবাদ : ***অচলায়তন***
—মানস মজুমদার ৪৪৫

বাংলা বানান-বিধি, দেবপ্রসাদ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ
—তুষারকান্তি মহাপাত্র ৪৫২

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর
—বরুণকুমার চক্রবর্তী ৪৫৮

রবীন্দ্র-কবিতার অনুবাদ ও ব্যাকরণের বাধা
—সুমিতা চক্রবর্তী ৪৬৫

রবীন্দ্র-উপলব্ধিতে বিজ্ঞানের অধিকার : ***বিশ্বপরিচয়***
—জীবেন্দু রায় ৪৭৫

একালের ভারতীয় সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ
—বিপ্লব চক্রবর্তী ৪৮১

রবীন্দ্রনাথ : স্বপ্নছবি অর্থাৎ ইমেজারি
—নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ৪৯১

উপনিবেশের কলকাতা : চিঠিপত্রের বয়ানে নাগরিকতা-বিমুখ রবীন্দ্রনাথ
—ছন্দা রায় ৫১৩

চণ্ডালিকা : এক অমানী অস্তিত্বের জাগরণ
—সত্যবতী গিরি ৫২৬

প্রবাদপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ
—বিশ্বনাথ রায় ৫৩২

রবীন্দ্রনাথ : ছুটির নিমন্ত্রণে
—তরুণ মুখোপাধ্যায় ৫৪৩

দেশ-কাল ভাবনা : আমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথ
—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী ৫৫০

'পড়েছি আজ রেখার মায়ায়'
—গোপা দত্ত ভৌমিক ৫৫৪

রবীন্দ্রনাটকে নারী
—সৌমিত্র বসু ৫৬৭

সুরের বাঁধনে : রবীন্দ্রনাথ ও স্যাঁ-জন পের্স
—চিন্ময় গুহ ৫৭৩

রবীন্দ্র-নাটকের উত্তরাধিকার
—শেখর সমাদ্দার ৫৭৯

পর্যবেক্ষক রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের আধুনিকতা
—জহর সেনমজুমদার ৫৮২

লিঙ্গ রাজনীতি ও রবীন্দ্র-ছোটোগল্প
—শম্পা চৌধুরী ৫৯১

রবীন্দ্রনাথ ও পাঁচজন ফরাসি দার্শনিক
—উর্মি রায়চৌধুরী ৫৯৬

অ-সহজপাঠ : রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা শিশুপাঠ্য
—সোহিনী ঘোষ ৬০৫

নিরুপমা থেকে সোহিনী : নারীর আত্মসত্তা নির্মাণ—একটি খসড়া
—শ্রাবণী পাল ৬০৯

একবিংশ শতকে রবীন্দ্রভাবনা : পরিবেশ ও স্থাপত্যের প্রেক্ষিতে
—সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২০

দলিত-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ
—সনৎকুমার নস্কর ৬২৪

সোনার তরী : কাব্যপরিচয় ও রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ব্যাখ্যায় ফিরে দেখা
—অরূপকুমার দাস ৬৪৭

ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে : *শিশু* আর *শিশু ভোলানাথ*
—সুদক্ষিণা ঘোষ ৬৫৯

‘*সোনার তরী*’র দুটি কবিতা : নির্মাণ ও ভাষাশৈলী
—অভিজিৎ মজুমদার ৬৭৯

‘*স্ত্রীর পত্র*’ ও সেকালের সামাজিক
—প্রসূন ঘোষ ৭০৪

‘দ্য সেন্টার অব ইন্ডিয়ান কালচার’ : আজকের প্রেক্ষিতে
—সেখ রফিকুল হোসেন ৭২১

কবিতায় গল্প : অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ
—সৌগত চট্টোপাধ্যায় ৭২৫

একটি ভাঙা প্রেমের গল্প এবং বাক্‌চিত্রী রবীন্দ্রনাথ
—শুভঙ্কর রায় ৭৩৫

ভারতীয় সাহিত্যপাঠে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিজ্ঞতা : এক পাঠকের প্রস্তাব
—মননকুমার মণ্ডল ৭৪২

We believe in freedom of expression.
The views expressed by the contributors
to this journal are their own.

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

রবীন্দ্র-জন্মসার্ধশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা

পূ র্ব প ক্ষ

রবীন্দ্রনাথকে

জলের সেতারে বাজে দিনান্তের সুর
গৈরিক গঙ্গায় বোট চলে—
তিন-পাহাড়ের ছায়া সন্ধ্যার তারাকে ছুঁতে চায়—
দিয়াড়ার ঘরে ঘরে প্রদীপের শিখাগুলি কাঁপে
‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ পড়ি কিশোরের বিমুগ্ধ আবেগে
তোমাকে প্রথম পাই রক্ত-আলো তরঙ্গিত জলে।

যৌবনের রাত্রি আসে চৈত্র-গন্ধে বিধুর উদাস ঃ
কোথায় নিঃসঙ্গ বাঁশি বাজে ঃ
‘যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা’—
অগণ্য নক্ষত্রপটে অসীম সত্তার দীপায়ন।
আমার জীবন ভরে হে বিরাট তোমার সঞ্চার।

উদ্বেল প্রাণের ঝড়—মিছিলের উত্তাল জনতা ঃ
বাধা-বন্ধ-মৃত্যু ভাঙে—ইতিহাসে অমোঘ স্বাক্ষরে—
আমার রক্তের তালে গুরু গুরু তোমার মন্দিরা ঃ
  ‘ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, উর্ধ্বে তোলো শির।’

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যুর দু’দিন পূর্বে ১৯৭০ সালের ৬ নভেম্বর শুক্রবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামোফোন রেকর্ডে যে দু’টি কবিতা রেকর্ড করেন, এটি তার অন্যতম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্ত্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেচেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষ্যে নিজের ন্যূনতা প্রকাশ হয়তো শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলঙ্কারগুলি বস্তুত শোভন নয় এবং তা নিষ্ফল। কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপক্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলে সাধারণের মন অনুকূল হতে পারে এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাইনে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্রুটি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্রুটি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকরুণ, তাঁরা সেটাকে বিনয় বলে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্লানি বলেই গণ্য করেন।

যে কর্ম্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েচে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারো অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি কর্ম্মটি আমার যে উপযুক্ত, সে বিচার কর্ত্তৃপক্ষদের দ্বারা পূর্ব্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে, তার থেকে অনুমান করা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনো একটি নূতন সঙ্কল্পের সূচনা হয়েচে। হয়তো মহৎ তার গুরুত্ব। এই জন্য সুস্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহুকাল থেকে কোনো একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দিন কাটিয়েচি। আমি সাহিত্যিক, অতএব সাহিত্যিকরূপেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েচে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নিরুদ্বেগের বিষয় নয়, বহুদিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপরে নির্ভর করে, যুক্তি প্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল, সর্ব্বত্র এ সমান ভার সয় না। তাই বলি, কবির কীর্ত্তি কীর্ত্তি-স্তম্ভ নয়, সে কীর্ত্তি-তরণী। আবর্ত্তসঙ্কুল বহু দীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অন্তত নোঙর করে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায় তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনো একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকূল প্রতিকূল বাতাসের আঘাত খেতে খেতে তাকে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হবে। মহাকালের বিচার-দরবারে চূড়ান্ত শুনানির লগ্ন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘটে না, বৈতরণীর পরপারে তাঁর বিচার-সভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরবগম্ভীর পদে সহসা সাহিত্যিককে বসানো হলো। সুতরাং এই রীতিবিপর্য্যয় অত্যন্ত বেশী করে চোখে পড়বার বিষয় হয়েচে। এ রকম বহু তীক্ষ্ণদৃষ্টিসঙ্কুল কুশাঙ্কুরিত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত

মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি যদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি অসম্মতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পথের বাধা কঠোর হোত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসবশতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে; বাহির থেকে আমি এসেচি আগন্তুক, এই জন্য প্রশ্রয় প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে সেই আশ্বাসের আভাস পূর্ব্বেই দিয়েচি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেচি কোনো একটি ঋতু পরিবর্ত্তনের মুখে। পুরাতনের সঙ্গে আমার অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আনুচর্য্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ কালে এই কথাটির আলোচনা করে অন্যের কাছে না হোক অন্তত নিজের কাছে, বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হোলো তার ভূমিকা এখানে স্থির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দ্দিষ্ট হয় না, কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এদেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেচে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষ্যে তার বিস্তারিত বিচার অসঙ্গত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এ'কে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বরূপ কীরকম প্রতিভাত হচ্চে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুল্য য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভর্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অর্থাৎ য়ুনিভর্সিটির যে-চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ব্যবহার, সেটা সমূলে ও শাখাপ্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ এদেশের সঙ্গে সঙ্গত নয়, এদেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটেনি।

অথচ এই য়ুনিভর্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কাল নির্ণয় এখনো হয়নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভর্সিটির পূর্ব্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য্য আবেগে। তার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্ব্বত্র-পরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূতরূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে-বিদ্যা, যে-মননধারা, যে-ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেচে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্য্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা

ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে, এবং তাকে সর্ব্বলোকের ও সর্ব্বকলের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে, তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বলরূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন মহাভারত নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্তভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্ম্মেকর্ম্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তারপর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েচে, তার মর্ম্মগ্রন্থি বারম্বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জ্জর, কিন্তু ইতিহাস-বিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্ত্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেক-প্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেচে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হোত, তাহলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্ব্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে কী একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেচে, এই আর্য্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কীরকম সে নিরন্তর সক্রিয়।

জ্ঞানের একটা দিক আছে তা বৈষয়িক। সে রয়েচে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার করে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের অভিমুখে কোনো মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যুগের উল্লেখ করলেম, সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল, তার কারণ ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্ম্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল, এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্ব্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদগতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশীলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে যে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল, তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্ব্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে-ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, সে-ধর্ম্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে, সর্ব্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কীরকম সত্য ছিল, কীরকম উদার, কীরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্য্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যা-নিকেতনের বর্ণনা করেচেন। তাঁর লেখনীচিত্রে দেখতে পাই, এর অলঙ্করণ-রেখায়িত শুক্তিরক্তস্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্ম্যশিখর, ধূপসুগন্ধি মন্দির, ছায়ানিবিড় আম্র বন, নীলপদ্মে প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল। তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নদধি নয়তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সঙ্ঘের বিস্তার সাধন করেচেন, চারিদিকে উন্নত চৈত্য উঠেচে, সেই চৈত্যগুলির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভা-গৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারিদিকে বেদী ও মন্দির, স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্ম্মাণে কীরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন—আধুনিক কালে যে-রকমের ইঁট ও গাঁথুনি প্রচলিত, এখানকার গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ ও যোজনাপদ্ধতি তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইৎসিঙ বলেন—এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েচে; বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে সকল আচার্য্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন তাঁদের যশ বহুদূরব্যাপী, তাঁদের চরিত্র পবিত্র অনিন্দনীয়। তাঁরা সদ্ধর্ম্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে-বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের পরে, সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল করে রক্ষা করবার দায়িত্ব ছিল তাঁদের পরে, কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহুশ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাদের কাছে প্রত্যাশা করেচে। আচার্য্যেরা জানতেন দূর দূর দেশকে জ্ঞান বিতরণের মহৎ ভার তাঁদের পরে; সমুদ্রপর্ব্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকার করে বিদেশের ছাত্রেরা আসচে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার পরে সর্ব্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষ্যে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেচে, ঘোষণা করেচে, ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেচে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনো বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকার চেষ্টা করেছিল তার প্রমাণ পাইনে। এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তা বলিনে, কেননা সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্য্যগৌরব প্রকাশ করবার উপলক্ষ্য রচনা করে আপন নৃপতিকে বেষ্টন করে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপুণ্যে শোভাপ্রাচুর্য্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক অতীত ভারতবর্ষের সেই চেষ্টাকে আমরা আজ দেখতে পাইনে। হয়তো রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না বলেই সেখানে ক্রমাগতই ধ্বংসধূমকেতুর সম্মার্জ্জনী কাজ করেচে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমশীলা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতিরক্ষা-চেষ্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্ব্বজনের যে উদার শ্রদ্ধা প্রভূত ত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত, সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণউৎস।

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কীরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তির বহ্নিশিখা কীরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্স্‌ট্‌ বুক্‌ থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করা। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ, দূর দূরান্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান, সুযোগ্য; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েচে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেচেন এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত আট জন বর্জ্জিত হোত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরুক। লোকের মনে উদ্বেগ ছিল পাছে অযথা প্রশ্রয়ের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে একজায়গায় সমবেত হোত, তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকা-ব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতখানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরো নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু জ্ঞানের তপস্যা উপলক্ষ্যে মানব মনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায়নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, চিত্তসম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েচেন বা সৃষ্টি করেচেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশ-বিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ করে আমাদের মনে করবার সময় এসেচে, যে, মানব ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। বাংলা দেশের পক্ষ থেকে আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য,—নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালী, তাঁর নাম শীলভদ্র; তিনি বাংলা দেশের কোনো এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সঙ্ঘে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সঙ্ঘ ছিল নানাস্থানে। সেই সকল সঙ্ঘে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশীলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের "পরিষদ"-এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায় ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হোত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা আলোচনা তর্ক বিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদরচনা করেছিল তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

য়ুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেচে। সেখানে খৃষ্টধর্ম্মের আরম্ভ কালে পুরাতন ধর্ম্মের সঙ্গে নূতন ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নবদীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হোলো তখন স্বভাবতই পূজার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হোলো। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্ররূপ ও বিকৃতরূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন করে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় য়ুরোপের নানাস্থানে আচার্য্য ও ছাত্রদের সঙ্ঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্ব্বাচনের দরকার হোলো। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয় কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্ম্মসঙ্ঘ, তারি সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্ক শাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন dialectic সকল বিজ্ঞানের মূলবিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই সকল আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদিত অর্থে পৌঁছতে গেলে শাব্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কীরকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা। তখনকার য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার য়ুনিভর্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্ত্তন ঘটেচে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে-নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্ত্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েচে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্র-বাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েচে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এই সঙ্গে আর একটা বড়ো পরিবর্ত্তন ঘটেচে ভাষা নিয়ে। একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্ত্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে, তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হোলো সর্ব্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হোলো। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায় সাধন হয়েচে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্য্যরূপে সম্মিলিত করেচে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হোলো সমস্ত

প্রজার মধ্যে, যুক্ত হোলো প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্রক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হোলো য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে য়ুনিভর্সিটি যেমন উদারভাবে সকল দেশের, তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটেই হচ্চে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তাহলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না, সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এসিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্ম্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এই জন্যেই সে সকল দেশে সে ধর্ম্ম সর্ব্বজনেরর অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেচে, এক একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেচে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেচে।

য়ুনিভর্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে, বিশেষ দেশ বিশেষ জাতি যে-বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি, গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করেচে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য্য। সেই ঐশ্বর্য্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়, তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানে অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশ-বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল তার এমন সম্পদ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্ত্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই, সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠচে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে য়ুনিভর্সিটির পত্তন হোলো বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্য্যন্ত দুঃখ পাচ্চি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে, এদেশের দরিদ্র পাড়ায় তারি একটা ছোট শাখা স্থাপন হোলো। ভারতীয় বিদ্যা বলে কোনো একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েচে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভর্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদ্ঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমতো ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিককালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে আবর্ত্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্চে প্রবহমান চিত্তের লীলাচাঞ্চল্য। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই

দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা, সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলচে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য্য যেমন জলে স্থলে উভয়তই সক্রিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলণ্ডের য়ুনিভর্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্‌স্‌ফোর্ডে দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চ্চা স্বীকার করা হয়েচে। চারিদিকে কী ঘটচে, সমাজ কোন্‌দিকে চলেচে সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে য়ুনিভর্সিটির এই উদ্যোগ। ম্যাঞ্চেস্টার য়ুনিভর্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করচে। বর্ত্তমান কালের চিন্তাদ্বন্দ্ব ও কর্ম্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্ত্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এ রকম সম্মিলন ঘটতে পারেনি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো—তার চলৎ-রূপ আমরা দেখতে পাইনে। যে সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্ত্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুব সিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিকরীতির বৈদগ্ধ্য বলে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি, জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি, এবং সেই টুক্‌রো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্‌স্‌ট্‌-বুক্‌ সংলগ্ন আমাদের মন পরাশিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েচে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এই জন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা, অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি, ফর্দ্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজনদরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ বলে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। এ রকম বিদ্যার দানেও গৌরব নেই, গ্রহনেও না। এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনো কখনো এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি নিজগুণেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান করে কৃতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এই রকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে, শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকে সৃষ্টিকায্য চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষা-পদ্ধতিতে যে-ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে

এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণমাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়; বাজারদরের হিসাব করে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায়, সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্য দুর্ম্মূল্য বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য করে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেচে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক য়ুরোপ আজ যে-বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত, তখন জাপান প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার বেগে আপন সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই য়ুরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানবসমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্দ্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্য্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো করে নিজেক বঞ্চনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মানবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এই জন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেচে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্ব্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বজনের করে তুললে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্ত-প্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজিজানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্চে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কম্‌তি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায়রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র।

এ কথা মানতে হবে জাপান স্বাধীন দেশ। সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেচে সে মূল্য পুরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করেনি। আর হতভাগা আমরা পুলিস ও ফৌজ বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্ত শেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকণা খুঁটে তারি দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখচি ফাঁকা মাল-মসলায়। আমাদের কাঁথার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছেঁড়া কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গৌরব নেই, কেবল কিছু পরিমাণে লজ্জা নিবারণ ঘটে, লোক-দেখানো মান রক্ষা হয়, জীর্ণতা সত্ত্বেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ করে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেচে বলেই হাল আরো শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায় কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেচি, তাকে স্বদেশের চিত্তবেদীতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবী তার কাছে সার্থক হবে—শ্রদ্ধয়া দেয়ং—দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্ম্মাণ করতে হবে সর্ব প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন, যে, না হবার কারণ তার নিজের শক্তি-দৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা করে সাহস করে শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে, সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলঙ্কৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সখের জিনিষ হবে, প্রাণের জিনিষ হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণা বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্ত্তন হয়েচে এইখানেই। তার প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উঁচু করে তোলা ছিল, তার মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশ পথ দিয়েই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েচে। আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন-সেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েচে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেচি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েচে অধ্যাপক; এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসঙ্গত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়ীনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেচি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গী, তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজি ভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাৎড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে মাস তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্ত্তি হেনরি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। সেক্স্পিয়রের কোরায়োলেনস, টমাস ব্রাউনের বেরিয়ল আর্ন্ এবং মিলটনের প্যারাডাইস্ রিগেন্ড্ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থগ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্ত্তিমান নোট বইয়ের কাজ করতেন

না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠন-ধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনা শক্তির উৎকর্ষ-সাধন সাহিত্য শিক্ষার আর একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষা শিক্ষা সাহিত্য শিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্ট শিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রস-স্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন, তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ বিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্মত্রুটি বা শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চ্চাই সাহিত্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।

বয়স যদি পর্য্যবসিতপ্রায় না হোত আর যদি আমার কর্ত্তব্য হোত ক্লাসে সাহিত্যশিক্ষকতা করা তবে এই আদর্শ অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম শোকাবহ হোত। কর্ত্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সঙ্কট কাটিয়ে এসেচি।

আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমতো কর্ম্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দির-দ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূম-মলিন নিশীথপ্রদীপের নির্ব্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নব সূর্য্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্ত্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

ঘরের কথায় রবীন্দ্রনাথ

দীনেশচন্দ্র সেন

যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন অর্থাৎ ২৫ বৎসর পূর্বে, আমি রবীন্দ্রবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া আমি অনেক দিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট একখানি কাগজ দোভাঁজ করিয়া মুক্তার মত হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মত মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর, সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়া একটি বৎসর ছিলাম, তখন আমি শয্যাগত, রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। ফরিদপুর থাকাকালে তিনি তাঁহার 'ক্ষণিকা' আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, আমার মন্তব্য সম্বলিত চিঠির উত্তরে বাংলা ১৩০৭ সনের ৩০শে ভাদ্র তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরে যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সে জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম। যখন আপনার খবর পাইলাম, তখন আর সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিল না।' তাহার পর তিনি আমাকে শিলাইদহ যাইতে আমন্ত্রণ করিয়া চিঠির উপসংহার করিলেন।

এই সময় হইতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। ১৯০১ সনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া আমি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। রবিবাবু শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ লেখক; অপরাপর লেখকের কাব্য পড়িলেই তাঁহার মধ্যে যাহা ভাল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত লেখা পাঠ করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক জানিবার বাকী থাকে; তিনি রূপ দিয়া চক্ষু ভুলান, ''গুণে আঁখি ঝরে।'' কণ্ঠস্বরে মিষ্টত্ব; বন্ধুর সহৃদয়তা ও ঋষিতুল্য ধর্মভাব দিয়া মন হরণ করেন, তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ ছায়ার ন্যায় মন হইতে চলিয়া যায়, এবং ছবির মত তিনি সমগ্র মনটি দখল করিয়া বসেন। কত দিন আমার ন্যায় শ্রোতার সম্মুখে সারাটি দিন বীণানিন্দিত সুরে তিনি গান গাহিয়া কাটাইয়াছেন, কতদিন সাহিত্যধর্ম সমাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে; তিনি নিত্যই নূতন হইয়া দেখা দিয়াছেন। রূপ ছন্দ ও চিত্তহারী নানা গুণে তিনি আমার মত বহু লোককে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবাবু ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে কখনই লোকমতকে গ্রাহ্য করিয়া লন না—ঠাকুরবাড়ীর সর্বত্র একটা মৃদু-মধুর সৌজন্য আছে, পাছে পরের মনে আঘাত লাগে, এজন্য ঐ বাড়ীর কেহ কোন ভদ্র ব্যক্তির কথার প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু রবিবাবু অতি মিষ্টভাষী হইয়াও অন্যায় কথার প্রতিবাদী, যাহা তিনি ভাল বলিয়া মনে করেন না, তাহা তাঁহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জোরে প্রতিবাদ করেন। গল্পচ্ছলে নানা কথা কহিবার সময়ও তাঁহার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্য সর্বদা জাগরূক থাকে। তাঁহার স্নিগ্ধ শ্লেষ

ও বাক্‌চাতুরী অনেকেই টের পাইবেন, যাহাকে ইংরাজীতে pun বলে, তিনি কথাবার্তায় অলংকারশাস্ত্রের সেই ধারাটি সর্বদা ব্যবহার করেন। তাঁহার সম্পাদকতার সময় শৈলেশ তাঁহাকে না জানাইয়া নিজেকে সহসম্পাদক বলিয়া বঙ্গদর্শনের মুখপত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, ‘শৈলেশ তো আপনার সহ-সম্পাদক হইয়াছেন।’ তিনি বলিলেন, ‘সহ নহে দুঃসহ’। কোন এক লোকের নাম ছিল—কয়েকটি কড়ি, বোধহয় তিনকড়ি টিনকড়ি হইবে, সেই ব্যক্তির মতামত লইয়া কথা হইতেছিল, কেহ কেহ তাহার মতটির উপর বেশী মূল্য দিতেছিলেন। রবিবাবু বলিলেন, ‘উঁহার বাপ মায়ের চাইতেও কি আপনারা উঁহাকে বেশী জানেন? তাঁহারা তো উহার প্রকৃত মূল্য ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন।’ বহুকাল হইতেই তাঁহার দর্শনকামী ব্যক্তিগণ বাড়ীতে ভিড় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিছুতেই উঠিতে চান না, স্নানের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তথাপি বসিয়াই থাকিবেন। একদিন ঐরূপ এক ব্যক্তি বসিয়া ছিলেন, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ইঁহার নাম কি?’ আমি বলিলাম ‘‘বসন্ত’’ তিনি বলিলেন—‘হয়েছে! ‘‘বসন্তকে’’ উঠাবেন কি করে?’ কথার এই চাতুরী তিনি মিষ্টভাবে, নিপুণভাবে এত বহুল পরিমাণে দেখাইয়া থাকেন, যে, তাহাতে বাংলা ভাষার প্রতি শব্দটির প্রতি যে তাঁহার সর্বদা লক্ষ্য তাহা টের পাওয়া যায়।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি ‘চোখের বালি’ লিখিতে শুরু করেন। একবার তিনি আমাকে বোলপুরে যাইতে সাদর আহ্বান পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন—(১২ই বৈশাখ, ১৩০৯), ‘আপনি এবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদকধর্ম সংগত হইবে কি না, তাহা এখন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আর বিলম্ব করিবেন না। পুঁথিপত্রসহ লুপমেলের গাড়ীতে চড়িয়া বসুন, তাহার পরে আর আপনাকে কে নিবারণ করিতে পারে?’ কিন্তু ‘চোখের বালি’ তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। ‘গোরার’ও অনেকটা ছাপা হইবার পূর্বে আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রেম খুব বড় বড় তুলিতে মোটা মোটা রেখায় আমাদের সাহিত্যে ইতিপূর্বে আঁকা হইয়াছে। খুব গভীর ভাবের সঙ্গে অসামান্য সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় বৈষ্ণব কবিরা দিয়াছেন, কিন্তু বিনোদিনী প্রভৃতি চিত্রের মধ্যে যে খোদকারি আছে, তাহা একান্ত অভিনব, এ যেন ঢাকই সেকরার তারের কাজ, ‘প্রেম জিনিসটাকে কারুকার্যের এমন নিপুণ সৌন্দর্য দিয়া তিনি আঁকিয়াছেন, যে, তাহা চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। প্রেমিকার চুলের গন্ধ, পঠিত পুস্তকের উপর সুগন্ধ তেলের দাগ, এমন মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোমল রেখা—স্বপ্নের জিনিস, যেন অলক্তকের আল্‌পনার মত, তাহা বিধিসৃষ্ট নারীকে নূতন করিয়া দেখাইতেছে।

এই শিল্পকলা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। আমি ‘নৌকাডুবি’, ‘চোখের বালি’ ও ‘গোরা’ পড়ি নাই, রবিবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তেমন আগ্রহে ইহার পূর্বে কোন বই শুনি নাই। কবির লেখা গীত হয় নাই, বাদিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি বীণাবেণুর কথাই সর্বদা মনে জাগাইয়া দিয়াছে—যেন বীণাপাণি নূপুর-শিঞ্জিত পদে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন, এই পুস্তকত্রয়ের নর্তনশীল গদ্যছন্দের গতি আমার নিকট তেমনই বোধ হইতেছিল। আমি নৈতিক আদর্শের কথা আনিব না, অপেক্ষাকৃত অল্পদরের লেখকরা যখন রসের নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় তখন সে রসের নাম হয় বীভৎস। কিন্তু প্রকৃতই যদি কেহ সুরসিক হন, তবে তিনি মানুষের মনটা লইয়া পুতুল খেলা খেলিতে পারেন—তাহাও কি আবার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে?

রবিবাবু দয়া করিয়া অনেকবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, একবার আমার ৫ বৎসরের পুত্র বিনয় তাহার লম্বা চুলগুলি লইয়া মাথাটা রবিবাবুর পায়ের উপর রাখিয়া আব্দার ধরিয়া ছিল, 'আমায় বোলপুরে লইয়া যাও'। রবিবাবু তাহাকে বড় হইলে লইয়া যাইবেন, এই আশ্বাস দিয়াছিলেন। সে কথা এখনও তাঁহার মনে আছে, ঐ ছেলেটির কথা অনেকবার তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন।

রবীন্দ্রবাবুর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ তাঁহার ভগবৎপ্রীতি; ইহাই তাঁহার 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্যের ছত্রগুলিকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ভগবৎপ্রীতি তাঁহাকে মনুষ্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্যসমাজ, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরস-সিক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহা শুধু তাঁহার কবিতার কথা নহে, ইহা শুধু প্রতিভায় স্ফুরিত আকস্মিক আলো নহে, ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা। তাঁহার বহু চিঠিপত্র আমার নিকট আছে; এই পত্রগুলিতে অনেকের মধ্যেই সেই সাধকের তপস্যা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একবার কোন লোক বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত বিদ্বেষের বিষ পত্রিকায় বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, (২০শে বৈশাখ ১৩০৯), 'পত্রে আপনি যে কথার আভাস মাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন, সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটা আমি পড়ি নাই—আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধ করিয়াছি, কারণ লেখকজাতির অভিমান সহজেই আঘাত পায়, অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজেকে সেই গ্লানিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোন সুখ নাই, কোন শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষ্টার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবনপ্রদীপের তেল তো খুব বেশী নয়, সবই যদি রোষে দ্বেষে হু হু শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব?'

এই ক্ষমা ও উচ্চ প্রীতির ভাবই, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও রবীন্দ্রবাবুর মনে জাগিয়াছিল। তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন (১৩ই কার্তিক ১৩১৩), 'আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া বাদপ্রতিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিসকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে, তাহার সমালোচনাও তথৈবচ। তা ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক্ না; সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে নাকি? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগে না, কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই জিতিয়াছি—আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।'

আমার ছেলে অরুণকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলাম। তাহাকে লইয়া রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার একটা মনান্তর হইয়াছিল। দোষ হয়ত আমারই ছিল, কিন্তু কোন কোন চক্রীলোক নানা অমূলক কথা আমার সম্বন্ধে প্রচার করিয়া এই মনোমালিন্যটা বাড়াইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু চিরকালই বন্ধুবৎসল, উদারপ্রকৃতি, তাঁহার মনের দুর্যোগ শীঘ্রই কাটিয়া যায়। এতদুপলক্ষে তিনি আমাকে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। উত্তেজনার সময় কেহ নিজের দোষ স্বীকার করিতে চান না, কিন্তু রবিবাবুর দেব-প্রকৃতি সেই উত্তেজনার সময় কিরূপ বিনয় ও ক্ষমা-ভূষিত হইয়া আমার চক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা সেই পত্রের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, 'যদি অজ্ঞানে অথবা ভ্রমক্রমে আপনার মনোবেদনার কারণ হইয়া

থাকি, তবে শত সহস্রবার আপনাকে প্রণিপাত করিয়া আপনার মার্জনা ভিক্ষা করি। আমার দোষ যথেষ্ট আছে, সেজন্য সংসারে আমি প্রশ্রয় পাই নাই। প্রত্যাশাও করি নাই। আপনাদের সকলের কাছে পরমেশ্বর আমার মাথা হেঁট করিয়া দিন, আমাকে এমন জায়গায় দাঁড় করান, যেখানে আপনাদের কৃপাপাত্র হইতে পারি, কিন্তু চিরদিন আপনাদের অসহ্য মনস্তাপের কারণ হইয়া আপনাদিগকে অন্যায়ে উত্তেজিত করিতে থাকিব, ইহাই না ঘটে, এই আমার অন্তরের প্রার্থনা। আমি রাগ করিয়া আপনার সঙ্গে বিবাদ করিব না—আমি নত হইয়া আপনার বিচার গ্রহণ করিব।'

ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট এই মহান নতি কত বড় মহত্বের পরিচায়ক! তাঁহার সুদীর্ঘ অনেক পত্র আমার কাছে আছে—অনেকগুলি হারাইয়া গিয়াছে, সর্বত্রই তাঁহার উদারতা ও প্রীতি প্রতিবিম্বিত। যিনি খুব বড় রাজ্যের আবহাওয়া পাইয়া থাকেন, শুধু তিনিই এই ছোট রাজ্যে সেই উচ্চদরের বার্তা বহন করিয়া আনিতে পারেন।

ইহার পর বহুবৎসর চলিয়া গেল। ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার নিকট সর্বদাই উৎকৃষ্ট চিন্তার প্রেরণা—স্বর্গীয় শুভবার্তার ইঙ্গিত। আমি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যসমূহ হইতে একটা বড় সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করিব, এইজন্য তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন, (১৬ই কার্তিক, ১৩১৩), 'প্রাচীন কবিতাসংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি, তাহা একান্তই প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে। স্থির করিয়াছিলাম, কয়েক মাস আমিই আপনাকে সাহায্য করিব, কিন্তু এখানে (বোলপুরে) নূতন ছাত্র ও রোগীদের জন্য ইমারত ঘর তৈরি করিতে হইতেছে, তাহাতে বিস্তর খরচ পড়িবে। অতএব এখন কিছুকাল আমার সম্বল কিছুই থাকিবে না। তাহার পর বহু ব্যয়ে বই ছাপাই এমন শক্তি আমার নাই। ত্রিপুরা হইতে অর্থ সাহায্য সম্প্রতি কোন মতেই প্রত্যাশা করা যায় না। নাটোরকে টাকার কথা বলিতে আমি কুণ্ঠিত। যদি গগনেরা এই ভার লইতেন, তবে বড় সুখের হইত।'

তাঁহার এস্টিমেট ছিল লক্ষ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় খুব বৃহদাকারে পুস্তক না ছাপাইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রভাবে 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারই পত্র-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯১৪। রবীন্দ্রবাবু আমাকে কত সম্মান দিতেন তাহা ব্যোমকেশের নিকট যে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যাইবে। উহা ১৯০৫ সনের ৭ই মার্চ তারিখের লেখা। তিনি 'সফলতার সদুপায়' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে লিখিতেছেন, 'মিনার্ভার চেয়ে কার্জেনে বেশী জায়গা আছে। আমার প্রবন্ধটির নাম 'সফলতার সদুপায়'। সভাপতি মেজদাদা হইলে কোনমতেই চলিবে না। বরং নাটোরের মহারাজা হইলে ভাল। নতুবা হীরেন্দ্রবাবু, ত্রিবেদী মহাশয়, বা দীনেশবাবুকে ধরিবে।' ব্যোমকেশ আমাকে ধরিতে আসিয়া চিঠিখানি আমার নিকট ফেলিয়া গিয়াছিল, তদবধি উহা আমার নিকট আছে। আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম, সুতরাং রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সভায় সভাপতিত্বের গৌরব পাইলাম না। তখনও আমি ইংরাজী কোন পুস্তকই রচনা করি নাই, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিয়া সাহিত্যরাজ্যের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম মাত্র, তথাপি রবীন্দ্রবাবু আমার সামান্য সাহিত্যিক গুণের এতটা পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তিনি অতি দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন ও 'রামায়ণী কথা'র শুধু ভূমিকা নহে, তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ সকল মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত উপকৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কি ভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সাহিত্য একটা যুগের প্রতিবিম্বস্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোন প্রধান লেখককে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা বা নিন্দাবাদ না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগ-লক্ষণ কি পাওয়া যায়, তাহাই নির্দেশ করা বিধেয়। এক এক যুগের শিক্ষা-দীক্ষার ঐতিহাসিক কারণগুলি বিবৃত করিয়া কবিগণকে সেই শিক্ষা-দীক্ষার পাণ্ডা স্বরূপ দাঁড় করাইয়া তাঁহার প্রসঙ্গে সমস্ত জাতির চরিত্র নির্দেশ করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য—নতুবা কোন একটি লোককে তাঁহার যুগ হইতে পৃথক করিয়া আনিয়া বর্তমান কালের নৈতিক কি সামাজিক রুচির মাপকাঠি দিয়া বিচার করা সংগত নহে। আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে কবিগণের আলোচনা কতকটা ব্যক্তিগতভাবে হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজী ইতিহাসখানায় রবীন্দ্রবাবুর উপদেশ অনুসারে আমি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। তিনি শেষোক্ত পুস্তকের অবলম্বিত প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যে সকল কবি ঝড়ের মত তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাবের আতিশয্যে পাঠকচিত্তকে উলট-পালট ও অভিভূত করিয়া ফেলেন, রবীন্দ্র তাহাদিগের অনুরক্ত নহেন। তিনি সেই সকল কবির পক্ষপাতী যাঁহারা বর্ণিত বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়া নিজকে একেবারে আড়াল করিয়া রাখিতে পারেন, এই জন্য তিনি বাইরণ-জাতীয় কবির কবিত্ব স্বীকার করেন না, বাল্মীকির মত বিষয়গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মহারা কবির অনুরাগী।

রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান সুর

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখেছেন.........''ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবল মাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই। .....বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষ-বোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দ্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল। .....আমার সমস্ত কাব্য-রচনার ইহা একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'।"

রবীন্দ্রনাথ সত্য শিব সুন্দরের উপাসক; প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার; তাই তিনি প্রকৃতির রূপ-মুগ্ধ প্রেমিক। প্রত্যেক বড় কবির কাব্যে এইটিই প্রধান লক্ষণ যে, তাঁর বর্ণনীয় বিষয়বস্তুকে ছাড়িয়ে তাঁর ভাব উপচে ছাপিয়ে ওঠে—তাঁর রচনার সীমার মধ্যে তাঁর ভাব বন্ধ থাকতে চায় না; তদতিরিক্ত, সীমার বহির্ভূত একটু-কিছু প্রকাশ করবার আকুতি সেই রচনা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়ে একটি আকুলতার সুর ধ্বনিত হ'তে শোনা যায়। সে-সুর হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের, বিশেষের মধ্যে অবিশেষের, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্য অধীরতার সুর, যে-ভাবটিকে তিনি তাঁর পরবর্ত্তীকালে রচিত একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন এবং যে-কবিতাটিকে আমি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-চয়নিকায় তাঁর সমগ্র কাব্যের মূল সুর-স্বরূপ মুখ-বন্ধ ও ভূমিকারূপে ছেপেছিলাম—

''ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান মর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা বন্ধুবর অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ''ঐকান্তিক ভাব-গতি" নাম দিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে এই সীমাকে উত্তীর্ণ হ'য়ে, বাধাকে অস্বীকার ক'রে বা বাধাকে কাটিয়ে অগ্রসর হ'য়ে চলবার একটা আগ্রহ ও ব্যগ্র তাগাদা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। যা লব্ধ, তাতে সন্তুষ্ট থেকে তৃপ্তি নেই; অনায়ত্তকে আয়ত্ত কর্‌তে হবে, অজ্ঞাতকে জান্‌তে হবে, অদৃষ্টকে দেখে নিতে হবে—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বাণী, এই হচ্ছে তাঁর প্রধান বক্তব্য।

যেখানে গতি আছে সেখানে ব্যাপ্তিও আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার আর-একটি বিশেষত্ব হচ্ছে সর্ব্বানুভূতি—জল-স্থল-আকাশে, লোক-লোকান্তরে, সর্ব্বদেশকালে ও সর্ব্ব-মানবসমাজে আপনাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে মেলে দিতে তিনি নিরন্তর উৎসুক। যে-কবি দেশ কালকে অতিক্রম ক'রে শাশ্বত সত্যকে যত বেশি প্রকাশ করতে পারেন, তিনি তত বড় কবি। রবীন্দ্র এই হিসাবে কবীন্দ্র, তিনি শাশ্বত সত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। সামান্য প্রাণ-কম্পের মাঝে, শিশুর হাস্য-কণিকায়, ফুলের হিল্লোলিত রূপ-সুষমায়, নদী-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে যে প্রাণ-শক্তি দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে, তাকে তিনি নব নব রূপ, নব নব শ্রী ও অভিনব মহিমা দান করেছেন; তুচ্ছতমও তাঁর কাব্যে মর্য্যাদা লাভ করেছে, কারণ তুচ্ছতম ধূলিকণাকেও তিনি অসীম সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরঙ্গ ব'লে জেনেছেন, নামগোত্রহীন কুলের মধ্যে বিশ্ব-সুষমার আভাষ পেয়েছেন, সমাজে ছোট-লোক ব'লে গণ্য অতি সাধারণ লোকের ছেলের মধ্যেও তিনি বিশ্বমানবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন।

আমাদের দেশের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে, সত্য স্থির। শঙ্করাচার্য্য সত্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন—''কালত্রয়াবাধিতম্ সত্যম্"—যা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালে সমভাবে অবাধে অবস্থিতি করে, যার কস্মিনকালেও কোনো পরিবর্ত্তন হয় না, তাই সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ইয়ুরোপীয় দর্শনের বাণী হচ্ছে যে, সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নয়; যার গতি নেই, স্ফূর্ত্তি নেই, তা জড়, তা কখনো সত্য হ'তে পারে না। যার জীবনী-শক্তি আছে সে আর-সকল জিনিষকে নিজের ক'রে নিয়ে তবে নিজেকে প্রকাশ করে, তার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে, খণ্ডভাবে দেখ্‌লে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাল অবিভাজ্য, কাল অনন্ত-প্রবাহ, মহাকালের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নেই; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান একটি বিশেষ খণ্ডকালের সম্পর্ক, একটি বিশেষ ক্ষণের তুলনায় কবি কালিদাসের কাল তাঁর কাছে ছিল বর্ত্তমান, কিন্তু আমাদের কাছে তা হ'য়ে গেছে

ভূত বা অতীত; আবার কবি রবীন্দ্রনাথের কাল আমাদের কাছে বর্ত্তমান, কিন্তু তা ‘‘আজি হ’তে শত বর্ষ পরে’’ ‘‘দূর ভাবী শতাব্দীর’’ লোকদের কাছে ভূত হ’য়ে যাবে। এই অনন্ত কাল ও দেশ ব্যেপে নিজেকে প্রসারিত ক’রে দেওয়ার ‘ইচ্ছাই’ রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবন থেকে এই সত্তর বৎসরের পরিণত যৌবনকাল পর্য্যন্ত কেবল এই গতির মাহাত্ম্যই প্রচার ক’রে এসেছেন; আমাদের এই নিশ্চল জড়-ভাবাপন্ন পঙ্গু দেশে যে কিশোর-কবি অগ্রগতির জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেছিলেন, সেই ‘‘চির-যুবা, সেই যে চির জীবী’’ আজো সেই বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌ছেন—ভগবান করুন এই চির-নবীন ও চির-যুবা মহাকবির তূর্য্য-কণ্ঠ চিরকাল ধ’রে বিশ্ববাসীর ও বিশেষ ক’রে আমাদের দেশবাসীর কর্ণে নিত্যনিরন্তর ধ্বনিত হ’তে থাক্। আমাদের এই জড়-ধর্ম্মী দেশে আজ-কাল যে একটু নড়বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তার মূলে আমাদের এই কবির উদ্বোধিনী বাণীর অনুপ্রেরণা অনেকখানি রয়েছে।

আমরা দেখতে পাই, কবি কিশোর বয়সেই গতির মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্য ‘‘পথিক’’-বেশে যাত্রা করেছেন এবং সকলকে তাঁর যাত্রা-পথের সঙ্গী হবার জন্য আহ্বান ক’রে বলেছেন—

‘‘ছুটে আয় তবে-ছুটে আয় সবে,
অতি দূর-দূর যাব;
কোথায় যাইবে?—কোথায় যাইব!
জানি না আমরা কোথায় যাইব;—
সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়,—’’

এই শুধু ‘অকারণ অবারণ চলার’ আবেগ তিনি বরাবর অনুভব করেছেন, তাঁর ‘‘চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে’’ আকৈশোর। এই গতির আহ্বানেই ‘‘নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ’’ হয়েছে। আমাদের কবির ‘‘প্রভাত-উৎসব’’ গতিরই উৎসব :

‘‘জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি’ গাহিছে এ-কি গান।’’

প্রভাত-উৎসবের এই গতি অন্তর থেকে বাহিরে এবং বাহির থেকে অন্তরে, গতির এক অপূর্ব্ব গতায়াত; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন অন্তরে গ্রহণ ক’রে আপন অন্তরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মেলে দেবার আনন্দ এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবির অন্তরের গতি-বেগ ‘‘স্রোত’’ হ’য়ে বয়ে চলেছে, এবং কবি সকলকে আহ্বান ক’রে বলেছেন—

‘‘জগৎ-স্রোতে ভেসে চল’, যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চল’রে সেথা যাই।’’

কবির কাছে যাত্রার আহ্বানই ‘‘মঙ্গল-গীতি’’—

‘‘যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সঙ্গীত-কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল্।
যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হ’তে,
যাত্রা করি ছাড়ি’ হিংসা দ্বেষ,

যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি' সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে ল'য়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি' নিজ দুঃখ শোক।"

কবির যৌবন-সুলভ হৃদয়াবেগ যখন তাঁর মনোবীণায় ''কড়ি ও কোমল'' সুর বাজাচ্ছিল, তখনও সেই সুরের মধ্যে গতির মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয়েছে! —কবি লক্ষ্য করেছেন—

''মানব-হৃদয়ের বাসনা
বিশ্বময় কারে চাহে, করে হায় হায়।"

কবি অনুভব করেছেন—

''লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়,
কত দিক হ'তে তারা ধায় কত দিকে।"

সমুদ্রের অস্থিরতা দেখে কবি বলেছেন—

''কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে।
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন!"

আমাদের কবি সাগর-পারের অপরিচিতা বিদেশিনীর অভিসারে ''সোনার তরী''তে বার বার ''নিরুদ্দেশ যাত্রা'' করেছেন—

''আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে,
হে সুন্দরি?"
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।

কবি শুধু যেতেই চান ''অকূল-পাড়ির আনন্দ'' অনুভব কর্‌বার জন্যে—

''সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়ে দিলেম নৌকা-খানি,
কোথায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি?"
* * * *
''দুলুক তরী ঢেউয়ের পরে,
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ!
গাও রে আজি নিশীথ রাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দ গান।
যাক না মুছে তটের রেখা,
নাইবা কিছু গেল দেখা,

অতল বারি দিক না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে;
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লওরে বুকে দু'হাত মেলি'
অন্তবিহীন অজানাকে।"

কবির মনোরাজ্যের "বনের পাখী" এসে "খাঁচার পাখীকে" বাহিরে উড়ে যেতে ডাকাডাকি করেছে; "কন্যা মোর চারি বছরের" "যেতে নাহি দিব" ব'লে কাতর নিষেধ কর্‌লেও কবি-চিত্তের যাত্রা স্থগিত হয়নি। কবি-চিত্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে দুর্নিবার গতির আবেগ দেখে দুঃখ ও সান্ত্বনা দুইই অনুভব করেছে—

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়।"

কবি "মানস সুন্দরী"কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন—

"কোন্ বিশ্ব-পার
আছে তব জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্-কল্পলোকে"—

জীবন-মরণের দোলায় কবি "ঝুলন" খেল্‌তে ব্যগ্র; সমগ্র "বসুন্ধরা" কবি-চিত্তের বিহার-ভূমি—

"ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে, ...;"

বিশ্ব-বিমুখ স্বার্থপর ক্ষুদ্রতার বেদনা কবিকণ্ঠে কাতর ক্রন্দন ক'রে বলেছে "এবার ফিরাও মোরে"—

"দুর্দ্দিনের অশ্রু-জল ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি'। তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে....."

কবি তাঁর "অন্তর্যামীকে" পথিকের চঞ্চল সঙ্গী-রূপেই উপলব্ধি কর্‌তে চেয়েছেন—

"আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হ'তে পথে, ঘর হ'তে ঘরে,
দুরাশার পাছে পাছে।"

তিনি ‘‘অতিথি অজানার’’ সঙ্গে ‘অচেনা অসীম আঁধারে’ যাত্রা কর্‌বার জন্য উৎসুক; ‘‘দিনশেষে’’ কবির যদি বা কখনও তরণী বাঁধ্‌বার প্রলোভন হয়েছে, কিন্তু সেও ‘‘বহু দূর দুরাশার প্রবাসে’’ ‘‘আসা যাওয়া বারবার’’ করার পর কোন অজানা বিদেশে অচেনা তরুণীর ভরা ঘটের ছল-ছল আহ্বানে! কিন্তু দিনশেষেও কবির ভাগ্যে বিশ্রাম-লাভ ঘটেনি; তখন

‘‘পৌষ প্রখর শীত-জর্জ্জর ঝিল্লি-মুখর রাতি’’

এক অবগুণ্ঠিতা তাঁর সুখনিদ্রা ভাঙিয়ে ‘‘সিন্ধুপারে’’ নিয়ে চলেছে—

‘‘অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই।’’

কবির ‘‘দুরন্ত আশা’’ ‘‘পোষমানা এ প্রাণ’’ নিয়ে ‘‘বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান’’ থাক্‌তে পারে না। সন্ধ্যার দুঃসময় এসে উপস্থিত হ’লেও কবি চিত্ত-বিহঙ্গকে পাখা বন্ধ কর্‌তে নিষেধ ক’রে বলেছেন—

‘‘যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
*　　*　　*　　*
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক’রো না পাখা।’’

কোথাও যদি কোনো আশ্রয় না থাকে তবু নভ-অঙ্গন তো আছে, তার মধ্যেই স্বচ্ছন্দ-বিহার কর্‌তে হবে।

‘‘বর্ষ-শেষের’’ সঙ্গে-সঙ্গে কবি-চিত্ত বন্ধন-মুক্ত হ’য়ে অনন্তাভিমুখ হ’য়ে উঠেছে—

‘‘চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
　　হেরিব না দিক,
গণিব না দিন-ক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
　　উদ্দাম পথিক।
*　　*　　*　　*
যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
　　সে পথ-প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখ’ মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
　　যুগ-যুগান্তের।’’

রুদ্র বৈশাখের ‘‘বিষাণ ভয়াল’’ তাঁকে ডাক দিলে তিনি বলেছেন—

‘‘ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ,
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন-তন্দ্রা জাগি’ উঠি বাহিরিব দ্বারে.....’’

তিনি অচেনা বহু পথিকের সঙ্গে এক নৌকার ‘‘যাত্রী’’, তিনি গৃহস্থের ঘরে ‘‘অতিথি’’ মাত্র, তিনি ‘‘ছুটির’’ আনন্দে উল্লসিত হ’য়ে সকল বন্ধনের প্রতি ‘‘উদাসীন’’, তিনি ‘‘সুদূরের পিয়াসী’’, তিনি ‘‘প্রবাসী’’। কবি বলেছেন—

‘‘ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
　　চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।’’

কিন্তু কবির এ ‘‘যাত্রাশেষ” তো ‘‘বিপুল বিরতি” নয়, এ যাওয়া যে দোলার ফিরে আসার বেগ-সঞ্চয়ের জন্য—

‘‘এই মত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা!”

এ ‘‘খেয়া-নেয়ের” এপার-ওপার যাওয়া আসা।

কবির ‘পরাণ-সখা বন্ধু’ ‘ঝড়ের রাতে অভিসার’ করেন কবির কাছে। কবি জানেন, তাঁর বিধাতা তাঁকে কোন্ আদি-কাল হ’তে জীবনের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন—

‘‘জানি জানি কোন্ আদিকাল হ’তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।”

কবি নিজে অনুভব করেন এবং সকলকে অনুভব কর্‌তে বলেন—

‘‘জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ”;

সেই আনন্দ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণে যাত্রা করে’—

‘‘কবে আমি বাহির হ’লেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।”

যাত্রার খেয়া-ঘাটে এসে কবির আশঙ্কা ‘‘ঐ রে তরী দিল খুলে!” কিন্তু তখনি তিনি মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌ছেন—

‘‘আমার নাইবা হ’ল পারে যাওয়া,
যে হাওয়াতে চলতো তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।”

কিন্তু তিনি যদি বা যাত্রার উদ্যোগ-পর্ব্ব সমাধা ক’রে প্রস্তুত হ’লেন, কাণ্ডারীর তখনো উদ্দেশ নেই—

‘‘কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে;
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থ-গামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।”

তখন তিনি কাণ্ডারীকে দেখে বল্‌ছেন—

‘‘ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানব-জন্ম-তরীর মাঝি,
শুন্‌তে কি পাস্ দূরের থেকে
পারের বাঁশী উঠ্‌ছে বাজি’?”
‘‘কাণ্ডারী গো, যদি এবার পৌঁছে থাক’ কূলে,
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার হাত ধ’রে লও তুলে।”

কবি কাণ্ডারীর বিলম্ব দেখে অধীর হ'য়ে উঠেছেন—

"এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে ব'সে যায় যে বেলা মরি গো মরি।"

কবি সদা-প্রস্তুত কাণ্ডারীকে হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে আনন্দে ব'লে উঠ্‌লেন—

'নাম-হারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে!"

কিন্তু তরী যদি নাই মেলে তা হ'লে কি তবে যাওয়া বন্ধ থাক্‌বে?

"যে দিল ঝাঁপ ভাব-সাগর-মাঝ-খানে
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার-কাটা সেই জানে
ভব-সাগর-মাঝ-খানে।"

কিন্তু এত দিন নদীপথে যাত্রার প্রতীক্ষা করার পর কবি দেখ্‌তে পেলেন—

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্র-ভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে!"

তখন আনন্দিত কবির উৎফুল্ল কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে—

"যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।"

কবির "পথ হ'ল সুন্দর"; তিনি যাত্রা কর্‌তে পেয়েই সন্তুষ্ট, তরীতে না হয় তো রথে তাঁর যাত্রা—সে একই কথা, বাহন তুচ্ছ সাধন মাত্র, যাত্রা কর্‌তে পারাটাই হ'ল তাঁর কাছে প্রধান।

কবি নিজেই জানেন যে, গতির মাঝে মাঝে গতি-বিরতিও আছে,

"যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা;"

কিন্তু পা-ফেলেই কবির ভয় হয় বুঝিবা গতি স্থগিত হ'য়ে পড়্‌ল—

"ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।"
*   *   *   *
কি নিরখি আজি একি অফুরান লীলা
একি নবীনতা বহে অন্তঃশীলা!
*   *   *   *
পুরাতন পথ শেষ হ'য়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে।"

কিন্তু চির-নবীন কবি-চিত্তের যাত্রা তো স্থগিত হবার নয়—

''আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।
* * * *
বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্য-রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি'।''

মাঝে মাঝে পথ খুঁজ্‌তে গিয়ে পথ হারায়—

''এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত না পাই,
চল্‌তে গেলে পথ ভুলি যে কেবলি তাই।''

এবং ''খুঁজিতে গিয়ে কাছেরে করি দূর,'' চলা আলো বেড়ে যায়—তখন হতাশ হ'য়ে কবি বলেন—

''এমনি ক'রে ঘুরিব' দূরে বাহিরে,
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।''

কিন্তু তাতেও লোকসান নেই—

''মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যাব' কাহার দ্বার?
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।''

কবির ''চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে'' দেখে কবি পরম আনন্দিত—

''ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে!
নইলে অভাবিতের দেখা ঘটতো না কোনোমতে।''

সেই অভাবিতের দেখাটি কি?—

''আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন?''

সেই হারাপথে বিদেশী সাপুড়ের সঙ্গে যাত্রীর সাক্ষাৎ ঘটে—

''কে গো তুমি বিদেশী,
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার বাজালো সুর কি দেশী!
* * * *
লুকিয়ে রবে কেগো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
ফুটায়ে ভূঁই-চাঁপারে।''

কবি সেই বাঁশির সুর ধ'রে যাত্রা ক'রে চলেছেন নিরুদ্দেশের পানে—

"শুনেছি সেই একটি বাণী—
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো।"
"তোমার মাঝে আমার পথ
ভুলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে
টলিয়ে দাও গো টলিয়ে দাও।"
"পথের শেষে মিলবে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব' তা পথেই পাব',
দুয়ার আমার খুলিয়ে-দাও।"

কবি "সুদূরের পিয়াসী", তাঁর কাছে দূরের ডাক এসে পৌঁচেছে—

"এবার আমায় ডাক্‌লে দূরে
সাগর-পারের গোপন পুরে।"

সেই "সাগর-পারের গোপনপুরে" কবি একা পথিক হ'লেও তাঁর সঙ্গী জুটে যায়—

"যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে ওরে এবার ঝড়কে পেলেম সাথী।"

কবির এই যাত্রা তো আজকের নয়, তা অনাদি অনন্ত—

"অনেক কালের যাত্রা আমার,
অনেক দুরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।"

তিনি সকল ভার বোঝা ফেলে দিয়ে লঘু হ'য়ে যাত্রা কর্‌তে উৎসুক—

"রিক্ত হাতে চল্‌না রাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে।"

কবির "পথ চলাতেই আনন্দ", পথের নেশায় তিনি বিভোর—

"পথের নেশা আমায় লেগেছিল',
পথ আমারে দিয়েছিল' ডাক।"

কারণ—

"পান্থ তুমি, পান্থ-জনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দ-গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।"

"গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।"

কবি "শিশু ভোলানাথ"-রূপে বল্‌ছেন—

"সাত সমুদ্র তের' নদী
আজকে হব' পার।"

শিশু ভোলানাথ বলেছে—

"আজকে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চ'লে।
যত' তুমি ভাব্‌তে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ কর্‌তে পারব' না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।
*　　*　　*　　*
অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।"

ফাল্গুনী নাটকটি আগা-গোড়া চলার মহিমা-কীর্ত্তনে ভরা—তার মধ্যে চলার বাঁশি বেজেছে—

"চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে,
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন্ বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।
পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিক জনেরে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।"

চাঞ্চল্য হচ্ছে প্রাণের ধর্ম্ম, শিশু প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে সদা-চঞ্চল, যুবা প্রাণের প্রবল আবেগে উদ্দাম। তাই দেখ্‌তে পাই যে, আমাদের দেশের স্থবিরদের যিনি গতির মুক্তি-বাণী শুনিয়েছেন তিনি কখনো শিশু আর কখনো যুবা, তিনি স্থবির কখনই না—

> ''সবার আমি সমান-বয়সী যে
> চুলে আমার যতই ধরুক পাক।''

চির-যুবা কবি ''শুধু অকারণ পুলকে'' মেতে তাঁর যুবক সঙ্গীদের ডেকে বলেছেন—

> ''অশ্লেষাতে যাত্রা ক'রে সুরু
> পাঁজি-পুথি করিস্ পরিহাস,
> অকারণে অকাজ ল'য়ে ঘাড়ে
> অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
> হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
> পালের 'পরে লাগাস ঝড়ো হাওয়া,
> আমিও ভাই তোদের ব্রত লব—
> মাতাল হ'য়ে পাতাল পানে ধাওয়া।''

যৌবন তো সুখে-শান্তিতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারে না, অসাধ্য সাধন করাই যৌবনের ধর্ম্ম, এইটেই যৌবনের মহিমা—

> ''পার্‌বি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
> খ'সে যাবার ভেসে যাবার
> ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে।
> * * * *
> লুটে যাবার ছুটে যাবার
> চল্‌বারই আনন্দে রে।''

কবি সকল ''অচলায়তন'' ভেঙে ফেলে চলার নিমন্ত্রণ ঘোষণা করেছেন। মহা-পরিব্রাজক কবি তাঁর ''যাত্রী'' পুস্তকের মধ্যেও এই একই কথা ব'লেছেন। ''বলাকা''-তে এই মহাবাণীই আগাগোড়া উদ্ঘোষিত ক'রে চ'লেছে—

> ''হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।''

কবির গানে যখন জীবন-সন্ধ্যার ''পূরবী'' রাগিণী বেজে উঠেছে, তখনও তাঁর বিশ্রাম বা বিরতির কথা মনে হয়নি, কেবলই 'চলো চলো' বাণী ধ্বনিত হয়েছে—

> ''আশ্বিনের রাত্রি-শেষে ঝ'রে-পড়া শিউলি-ফুলের
> আগ্রহে আকুল বনতল; তা'রা মরণ-কূলের
> উৎসবে ছুটেছে দলে দলে; শুধু বলে 'চলো, চলো'!''
>
> * * * *
> ওরা ডেকে বলে, কবি,
> সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, ...?''
>
> * * * *

কবি বলেন,—

'যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে'......।

'মহুয়া' তার যৌবন-প্রেমের মাদকতা বিলিয়ে—

''যাবার দিকের পথিকের পরে
ক্ষণিকের স্নেহ-খানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি'।''

তখনও মাদকতা-বিহ্বল কবি নিশ্চল হ'য়ে পড়েননি, তখনও তিনি যাত্রার জন্য সকলকে আহ্বান ক'রে বলেছেন—

''কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও''......

আমাদের কবি অজর অমর, তাঁর বার্দ্ধক্য নেই, তিনি আকৈশোর আজ পর্য্যন্ত চলারই মাহাত্ম্য ঘোষণা ক'রে এসেছেন। কবি বলেছেন—

''না চল্‌তে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হ'লে খরচ কর্‌তে সঙ্কোচ হয়......এই তরুণ একদিন গান গেয়েছিল'—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।'—সাগর পারে যে অপরিচিতা আছে তার অবগুণ্ঠন মোচন কর্‌বার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই?''

অজানাকে জান্‌বার, অনায়ত্তকে আয়ত্ত কর্‌বার, অদৃষ্টকে দেখবার যে-আগ্রহ নিয়ে বৈদিক ঋষি আপনাকে মহীপুত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—''চরৈবেতি, চরৈবেতি'', ঠিক সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমাদের কবি সকলকে ডাক দিয়ে পুনঃ পুনঃ বলেছেন—''আগে চল্, আগে চল্, ভাই।''

কবি-চিত্ত সপ্ত-তন্ত্রী বীণার মতো, তাতে কত সুর কত মূর্চ্ছনাই বেজেছে; কিন্তু আমার কানে এই গতির বাণীটিই খুব বেশি ক'রে ধরা পড়েছে। যিনি অগতির গতি তিনিই এই গতি-শক্তি-হারা দেশে এই তূর্য্য-কণ্ঠ কবিকে প্রেরণ করেছিলেন দেশবাসীদের জড়ত্ব থেকে উদ্বোধিত ক'রে তোল্‌বার জন্যে। মহাকবির এই অভ্যুদয় যুগ-যুগান্তর ধ'রে জয়-যুক্ত হোক্, ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

বাঙ্গালা ভাষার মামলা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

এ মোকদ্দমায় বাদী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি; এবং প্রতিবাদী এই নগণ্য—আমি। একবার গদাধর বাগ্দী সরকার বাহাদুরকে প্রতিপক্ষ করিয়া একটি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। পাড়াগাঁয়ের লোক গদাধরকে সাক্ষাৎ কোনও পীর-পয়গম্বরের অবতার ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আমিও যাচিয়া প্রতিবাদী হইয়া বড়লোকের নামের মহিমায় খ্যাতি লাভ করিবার আশা রাখি! আমার আর একটি সুবিধা এই যে, বাদিগণ উচ্চপদস্থ; হয়ত তাঁহারা কেহ সাহিত্যের এজলাসে উপস্থিত হইবেন না। আমি চালাকী-পূর্বক এক-তরফা ডিক্রী হাসিল করিয়া জয়-লাভের সুখ অনুভব করিব।

মোকদ্দমার মূল বিষয়ের তর্ক তুলিবার পূর্বে আমি এই কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য যে, শিরোনামায় 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা' লিখিলাম কেন? 'ঙ' নামধারী ক-বর্গের অনুনাসিকটি 'গ'-এর সঙ্গে যুক্ত হইলে 'গ' অক্ষরের পূর্ণ উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া লিখিতে গেলে 'বঙ্গ'-কে 'বং-অ', 'গঙ্গা'-কে 'গংআ' প্রভৃতি লিখিতে হয়। যতদিন সর্বত্র অক্ষরগুলির সেরূপ 'অং-অ'-সৌষ্ঠব না হয়, ততদিন একাকী 'বাংলা'-কে 'সং'-এর মত করিয়া সাজাইতে পারিব না। 'রঙ্গ' লিখিলে যখন হসন্ত উচ্চারণে বাঙ্গালার প্রাকৃতিক উচ্চারণের নিয়মে 'রং' পড়িতেই বাধ্য হইতে হয়, তখন বানান লইয়া এ রঙ্গ করা কেন?

আমাদের ভাষায় আ, ঈ, ঊ প্রভৃতির দীর্ঘ উচ্চারণ নাই; accent-যোগে হ্রস্বকেও দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। কথার জোর দিয়া যখন 'অত' 'মিছে' প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে হয়, অর্থাৎ, যখন 'অ-অত' 'মি-ইছে' প্রভৃতি লিখি না, কেবল accent বুঝিবার ও বুঝাইবার উপর নির্ভর করি, তখন কি-ই বুঝাইবার জন্য 'কী' লিখিলে লাভ কি? যদি জানিতাম, আমরা 'প্রবাসী-ঈ' উচ্চারণ করি, 'রমণী-ঈ' উচ্চারণ করি, তাহা হইলে দীর্ঘ ঈ-কার-যোগের একটা সার্থকতা থাকিত।

এ-কারে স্থলবিশেষে ইংরেজির at-এর মত যে উচ্চারণ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য যদি স্বতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি না করা যায়, তবে য-ফলায় আ-কার দিলে কেহ কিছু বুঝিবে না। বাঙ্গালীর ছেলে এ-কারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উচ্চারণ আপনা-আপনি শিখিয়া থাকে; বঙ্গের বাহিরে সর্বত্র য-ফলায় আকার দিলে 'ই-আ' উচ্চারণ হইয়া থাকে। কাজেই বিদেশীরা য-ফলা, আ-কার দেখিয়া কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। স্বতন্ত্র একটা 'a' চাই।

বর্গীয় অনুনাসিকের মধ্যে পাগড়ীর গৌরবে একা 'ঙ' যদি স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে, তবে দুগ্ধপূর্ণ পালানের গৌরবে 'ঞ' স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না কেন? উচ্চারণের হিসাবে ধরিতে গেলে 'ঙ' এবং 'ঞ' উভয়কেই অনুস্বারের কাছে মাথা হেঁট করিতে হয়। যখন উচ্চারণ করি,

'অকিন্‌চন', 'বান্‌ছা', 'আগ্‌গাঁ', তখন 'ঞ্চ', 'ঞ্ছ', ও 'জ্ঞ' বাঁচিয়া থাকিবে কেন? যোগেশবাবুও এই সুযোগে কয়েকটি অক্ষর ঢালাই করিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে যথেষ্ট যশস্বী হইয়াছেন। এই অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, নূতনত্বটুকু না চালাইলেও সে যশ অপ্রতিহত থাকিবে। আশা করি, মুরারির ন্যায় তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিবেন না। যুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা যাহা খুসী লিখিব, এবং যাহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা একজন নগণ্য লোকের কথায় পরিত্যাগ করিব না, আশা করি, এরূপ কথা কেহই বলিবেন না। যাহা হউক, আমি দেবী সরস্বতীর এজলাসের ভাষায় 'বাঙ্গলা'ই লিখিলাম। প্রতিপক্ষের ভাষায় একবার অনুরোধ করিয়া বলি যে—"রোবিন্দ্রোবাবু জোদি আগ্‌গাঁ দ-a-ন (than), তা হোলে এই নোতুন বানান্ গং-আয় সমর্পোন্ কোরি।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ লিখিতেছেন, দেখিতে পাইতেছি। তিনি যে এই মহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা তাঁহার পূর্বপ্রকাশিত 'শব্দতত্ত্ব' [১৯০৯] গ্রন্থ পড়িয়াই জানিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার এই ব্যাকরণ হইল বাঙ্গালা ভাষার তত্ত্ব। শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণের প্রকৃতি ও পদযোজনার নিয়ম প্রভৃতি সযত্নে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রতিভাসম্পন্ন কৃতী পুরুষ হইলেও, উপযুক্ত উপাদান সংগৃহীত না থাকিলে, কেহ এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। উপাদানে উপেক্ষা করিলে, কিংবা ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যুৎপত্তি বাহির করিলে, ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' নাম দিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতে ব্যাকরণের জন্য এক শ্রেণীর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। ললিতবাবু কোনও শ্রেণীবিভাগ না করিয়া শব্দাদির সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া ঐ প্রবন্ধটিকে নিরবচ্ছিন্ন উপাদান-সংগ্রহ বলিতে পারি না। কিন্তু কি উপায়ে সংগৃহীত শ্রেণীর উপাদান অধিক সংগৃহীত হইতে পারে, ললিতবাবু তাহার পথ দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে ও ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধে গন্তব্য পথের অনেক কথা সূচিত করিয়া দিয়াছেন। যে যে উপাদান সংগ্রহ না করিলে ব্যাকরণ লেখা সম্ভব হইতে পারে না, তাহার কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

(ক) যে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা পরিবর্তিত হইতে হইতে এ কালের বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি না বুঝিলে, বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে বাধা ঘটিবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সংস্কৃতে যে সর্বনামটি সঃ, অতি প্রাচীন প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ ছিল 'সো', এবং যে মাগধী প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতির জন্ম, তাহাতে উহার উচ্চারণ ছিল 'সে'। এই সে কেবল বাঙ্গলায় ও ওড়িয়ায় প্রচলিত আছে। এই শেযোক্ত প্রাকৃতে অনেক শব্দেরই প্রথমার পদে কর্তৃ-কারকে এ-কার যুক্ত হইত; যথা— মহাবীরে, নায়পুত্তে, লোকে ইত্যাদি। অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ এই শেযোক্ত প্রাকৃতে লিখিত। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলেই 'নায়া-ধর্ম-কহা' 'ওববায়ীয়-দসাও', 'উবাসগ-দসাও' প্রভৃতি জৈন প্রাকৃত গ্রন্থের ভাষা পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই প্রাচীন প্রথাতেই 'লোকে বলে', 'ছাগলে খায়', 'হাতীতে খায়' প্রভৃতি প্রয়োগ বাঙ্গলায় রহিয়াছে। ওড়িয়া ভাষাতেও যে ঐ প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহা বাবু যোগেশচন্দ্র রায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এ সকল স্থলে কোনও তির্যক-গতি নাই, অথবা তৃতীয়া বিভক্তির 'ন'-র লোপ হয় নাই। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, এ কালের 'তির্যক-গতি'তে না হইলেও, প্রাচীন কালের 'তির্যক-গতি'তে প্রথমা বিভক্তিতে এ-কার আসিয়াছিল। প্রথমতঃ সে কথার অনুসন্ধান করিলে এ কালের বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-বিচারে কোনও ফল হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালের প্রাকৃতে অন্যবিধ কারণে ঐ এ-কারের জন্ম হইয়াছিল। সংক্ষেপে তাহার পরিচয়

দিতেছি। ভাষা বিদেরা জানেন যে, 'দূর' বুঝাইতে হইলে, কিংবা 'বহু' বুঝাইতে হইলে, বর্বরেরা একটি স্থানকে অথবা একটি পদার্থকে একটু টানিয়া দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমরা যখন সাধারণতঃ 'গন্ধ' বলি, তখন ভাল গন্ধ বুঝায়। দুর্গন্ধ বুঝাইতে হইলে আমরা এখনও একটু নাক সিঁটকাইয়া 'গন্ধ' শব্দটি টানিয়া দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করি। বর্বরের ভাব-প্রকাশক দীর্ঘ উচ্চারণ ঐ ধরনের। অ-কারান্ত শব্দের বহুবচন প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার আদিম যুগে অ-কারকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইত। এবং উহা হইতেই 'নর' শব্দের বহুবচনে 'নরাঃ' করিতে হইয়াছিল। এখানে সকল প্রত্যয় ও বিভক্তির বিশ্লেষণ করিলে চলিবে না। যে দীর্ঘ উচ্চারণের ফলে 'নরাঃ' সেই দীর্ঘ উচ্চারণের ফলেই অর্বাচীন প্রাকৃতে 'নরে' হইয়াছিল। সম্বোধনের সময়ে স্বাভাবিকভাবে যে দীর্ঘ টান দিতে হয়, তাহা বহুকাল হইতে এ-কার দ্বারা প্রকাশিত হইত। প্রাকৃত ভাষায় যখন একবচন ও বহুবচনের পদের পার্থক্য কমিয়া আসিতেছিল বলিয়া 'গণ' প্রভৃতি বহুত্বজ্ঞাপক শব্দ জুড়িয়া বহুবচনের সৃষ্টি হইতেছিল, তখন একবচনেও এ-কার রহিয়া গিয়াছিল। একারযুক্ত প্রথমার পদগুলি যে অনেক স্থলে যুগপৎ একবচন ও বহুবচন বুঝায়, তাহা 'লোকে বলে', 'ছাগলে খায়' প্রভৃতিতে দেখিতে পাই। একটা ছাগল গাছ মুড়িয়া খাইয়াছে, এবং 'ছাগলে কি না খায় ও পাগলে কি না বলে' তুলনা করিলেই উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

আমি একটা দীর্ঘ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যাকরণ-প্রবন্ধের ত্রুটি দেখাইতে বসি নাই। উপাদান সংগ্রহ না করিলে, সুবিচারিত হইলেও, মন-গড়া ব্যুৎপত্তি যে ভ্রমের পথে লইয়া যায়, তাহাই অল্প দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, সকল উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকিয়া বরং কিছু লিখিয়া ফেলা ভাল; পরে না হয় উহার দোষটুকু সংশোধন করা যাইবে। কথাটি আপাততঃ শুনিতে মন্দ নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যে ভাষার ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার উৎপাদক ও পরিবর্ধক ভাষার সহিত পরিচয় না থাকিলে, আদৌ এই ব্যাকরণ লিখিবার কার্যে হস্তক্ষেপ করা চলে না। রবীন্দ্রবাবু যদি ব্যুৎপত্তি বাহির না করিয়া, কেবল ব্যবহৃত প্রয়োগগুলিকেই শ্রেণীবদ্ধ করিতেন, তবে ক্বচিৎ তাহাতে ভুল হইলে অন্য লোকে সমালোচনা করিতে পারিত।

(খ) আর্য ভিন্ন অন্যান্য যে সকল জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত, এবং করিতেছে, তাহাদের সংস্পর্শে ভাষা যে অনেক পরিবর্তন লাভ করিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেক জাতির শব্দ ও প্রত্যয় আমাদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভাষাকে পরিবর্ধিত করিয়াছে। সেই সকল দেশী শব্দ যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিতে হইবে। সংস্কৃতের আধিপত্যে অনেক দেশী শব্দ একটু রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক শব্দসমূহ সংগ্রহ করিবার সময়ে শব্দগুলির প্রচলিত গ্রাম্য উচ্চারণ সর্বথা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা ব্যুৎপত্তি ভাবিতে ভ্রমে পড়িতে হইবে। অনেক দেশী শব্দ যে-সংস্কৃতের বংশে পোষ্য করিয়া লইবার চেষ্টায় তাহাদের চেহারা বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে, এবং ঐ পরিবর্তনের জন্য যে সহসা সেই শব্দগুলির দ্রাবিড়ী প্রভৃতি উৎস ধরিতে পারা যায় না, এ বিষয়ে অন্যত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে গৃহীত হইলেও প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, সেগুলিরও উচ্চারণ বজায় না রাখিলে ব্যুৎপত্তি ধরিবার সময় গোলে পড়িতে হয়। সাধারণ শ্রেণীর লোকে 'বাড়ী কোথায়' জিজ্ঞাসা করিতে হইলে 'নিবেশ কোথায়' বলিয়া থাকে। প্রাকৃত ভাষায় দেখিতে পাই, 'বেশ্মন্' শব্দজাত 'নিবেশ' কথাই ব্যবহৃত ছিল। আমরা কিন্তু ঐ শব্দটি অসাধু

প্রয়োগ মনে করিয়া উহার স্থলে 'নিবাস' ব্যবহার করিয়া থাকি। ঐ প্রকার পরিবর্তনে আমাদের ভাষার সহিত প্রাচীন প্রাকৃতের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হইতে পারে যে, 'ভদ্র' শব্দ হইতেই আমাদের দেশী 'ভদ্রস্থ' শব্দ উৎপন্ন। 'প্রবাসী' পত্রে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ 'ভদ্রস্থ' কথাটিকে সাধু করিয়া 'ভদ্রতা' করিয়াছেন। 'ভদ্রস্থের' অর্থ 'ভদ্রতা' নহে, রবীন্দ্রবাবুর নিজের প্রয়োগেই তাহা তিনি দেখিতে পাইবেন। 'অমুক কাজ না করিলে ভদ্রস্থ নাই' বলিলে, সে কাজের সহিত ভদ্রতা অভদ্রতার কোনও সম্পর্ক থাকে না। এই সকল শব্দ বিশেষ অর্থ বুঝাইবার জন্য দেশী উচ্চারণে রক্ষিত হউক।

(গ) ভাষার কোন্ স্থলে 'খানি' বসে, কোন স্থলে 'টা', 'টি' প্রভৃতি বসে, তাহা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা ভাল। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে 'টা' 'টুকু' প্রভৃতির যে সকল ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, উহাই তাঁহার প্রবন্ধের দোষের অংশ। ঐ ব্যুৎপত্তি না দিলে ভাষার idiom বা রীতি-সিদ্ধির বিচারে কোনও ক্রটি হইত না। তিনি যেভাবে ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তাহাতে না-জানা বিষয়ে জোর করিয়া একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,— 'টুকু' শব্দ সংস্কৃত 'তণুক' শব্দ হইতে উৎপন্ন। তিনি কোন প্রমাণে এমন স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন? ওড়িয়া ভাষায় 'টিকিএ' বা 'টিকে' শব্দের অর্থ—অল্প। বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে 'টুক্' শব্দের যে ব্যবহার আছে, তাহা প্রায় ওড়িয়ার 'টিকিএ'র সন্নিহিত মনে হয়। ঐ অঞ্চলের যাত্রাগানের কথায় আছে যে, 'ভীমের গদার আঘাতে দুর্যোধন টুক্‌চের বই মরে গেল।' এই 'টিকিএ' ও 'টুক্' যে কোন খাঁটি দেশী শব্দ নহে, তাহা কি সাহসে বলিব? সন্দেহের বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা দোষাবহ বলিয়া মনে করি। 'গোটা' হইতে 'টা' 'টি' প্রভৃতির উৎপত্তি, রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন।—''বাংলা ভাষায় 'গোটা' শব্দের দ্বারা অখণ্ডতা বুঝায়, এই কারণে এই 'গোটা' শব্দের অপভ্রংশ 'টা' চিহ্ন পদার্থের সমগ্রতা সূচনা করে।" এটা খাঁটি নির্ভুল সিদ্ধান্তের ভাষা। 'গোটা' শব্দ দ্বারা ওড়িয়া ভাষায় অখণ্ডতা বুঝায় না। ওড়িয়াতে উহার অর্থ—সংখ্যাবাচক এক। অথচ উড়িয়া ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত 'টা', 'টে' প্রচলিত আছে। সংখ্যাবাচক এক অর্থে 'গোটা' শব্দটি উত্তর অঞ্চলের পাহাড়ী ভাষায় প্রচলিত আছে। এই দেশীয় 'গোটা' সম্ভবতঃ বঙ্গভাষাতেও 'এক' অর্থে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ছিল; এবং তাহা হইতেই পরে 'অখণ্ড' অর্থ আসিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে অখণ্ড অর্থ প্রচলিত হইবার পর যে ভাষায় 'টা' 'টে' প্রচলিত হইয়াছে, এ কথা সত্য নহে। হিন্দী প্রভৃতি অন্য প্রাদেশিক ভাষাতেও বহু প্রাচীনকাল হইতে 'টা' 'ট' প্রচলিত আছে। অথচ পাহাড়ী, বাঙ্গালা কিংবা ওড়িয়া অর্থের 'গোটা' শব্দ ঐ সকল ভাষায় প্রচলিত নাই। উত্তর অঞ্চলের হিন্দীতে 'এক্‌ঠো', 'দোঠো' প্রভৃতি ব্যবহৃত আছে। ছত্রিশগড়ী হিন্দীতেও অনেক কথার সঙ্গে 'টা' 'টে' ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার এই 'টা' 'টে' প্রভৃতির আর একটি রূপান্তর পূর্ববঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা 'ডা' 'ডি'। 'ভাইটি' 'বোনটি'র স্থলে 'ভাইডি', 'বুন্‌ডি' ব্যবহৃত হয়। এই 'ডা' 'ডি' বঙ্গের পশ্চিম ভাগেও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি। 'কেরে' স্থলে 'কেটারে'র ব্যবহার আছে। পূর্ববঙ্গে ঐ স্থলে 'কেডারে' বলে, নদীয়া জেলার দূরপল্লীতে ঐ সকল স্থলে 'ট' ও 'ড' বিকল্পে ব্যবহৃত দেখিতে পাই। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, 'টা' 'টে' প্রভৃতির নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, উহার সহিত 'গোটা' কথার কোনও সম্পর্ক নাই। অনেক সংখ্যাবাচক শব্দের পরে প্রাকৃতে যে 'ঠ' দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই হিন্দীর 'ঠ' এবং বাঙ্গালার 'ট', 'ড' কিনা তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না। পালিতে 'ছট্‌ঠো'র অর্থ ষষ্ঠ। কিন্তু

পরবর্তী মাগধীতে 'ছয়টি'র স্থলেও 'ছট্ঠো' ব্যবহৃত আছে। 'গোটা' শব্দের ব্যবহার না থাকিয়াও যখন হিন্দীতে 'ঠ' আছে, তখন রবীন্দ্রবাবুর ব্যুৎপত্তি অসিদ্ধ হইতেছে।

কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রবাবু 'গোটা' শব্দের বহুবচনে 'গুলা' শব্দের জন্ম বলিয়া লিখিয়াছেন। বর্ণ-পরিবর্তনের কোন নিয়মে একটা 'ট' বহু অর্থে 'ল' হইয়া উঠিল, তাহা লিখিলে ভাল ছিল। রবীন্দ্রবাবু পূর্বে একবার 'গণ' শব্দের পরিবর্তনে 'গুলা' হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছিলেন। তখনও সে কথার সমালোচনা করিয়াছিলাম। যাহারা তামিল ভাষায় কথা কহে, তাহারা এখন বঙ্গ হইতে বহু দূরে বাস করে। কিন্তু বাঙ্গালায় প্রচলিত এমন অনেক দেশী শব্দ আছে, যাহা তামিল শব্দ। বিশেষভাবে কেহ প্রতিবেশী হইয়া না থাকিলে তাহাদের বহুসংখ্যক শব্দ গৃহীত হইতে পারিত না। সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় 'বঙ্গভাষার উপরে তেলেগু তামিল প্রভৃতির আধিপত্য' বিষয়ে একবার কিছু বলিয়াছিলাম। তামিল ভাষায় বহুবচনে 'গুল্' ব্যবহৃত আছে। উড়িয়ায় এবং বাঙ্গলাতেই তেলেগু ও তামিল ভাষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তামিলের 'গুল' যে বাঙ্গলা ও ওড়িয়ার 'গুলি' ও 'গুলা' নহে, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারেন কি? বাঙ্গলা ও ওড়িয়ায় যখন তামিল এবং তেলেগুর শব্দ অনেক সংগৃহীত আছে, তখন বহুবচনের চিহ্ন 'গুল্' যে গৃহীত হয় নাই, তাহা বলা কঠিন।

আমার বক্তব্য এই যে, যতদিন এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য উপকরণ সংগৃহীত না হয়, ততদিন কেবলমাত্র চিন্তার জোরে কোনও ব্যুৎপত্তির নির্দেশ না করিলে ভাল হয়। ভাষার প্রচলিত প্রয়োগ ও রীতিসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া উহার প্রকৃতিবিচার চলিতে পারে। রবীন্দ্রবাবু ততটুকু করিলে কোনও ক্ষতি নাই।

আমি পূর্বে অতি-পশ্চিমবঙ্গের 'বই' শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ঐ শব্দটির বঙ্গের সাধারণ ব্যবহার মানভূমের ব্যবহারের সহিত মেলে না। 'টুক্ চের বই মরে গেল' স্থলে 'বই' অর্থ বাদে বা অন্তে হয়। এই অর্থটি কিন্তু প্রাথমিক অর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। সকল প্রদেশের শব্দ সংগৃহীত হইলে এ কথার বিচার চলিবে।

(ঘ) ভাষা-বিজ্ঞানের যে সকল তথ্য না জানিলে কোনও ভাষারই বিচার করা চলে না, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঐ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের গ্রন্থগুলি সকলেই পড়িয়া থাকেন, মনে করি। কেন না, তাহা না হইলে এ যুগে ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চা অসম্ভব।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ যে-দিন প্রথম সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে ঘেরিয়া সমালোচনার জাল বোনা সুরু হইয়াছিল। আমাদের ছাত্রজীবনে সমালোচ্য বিষয়ের সংখ্যা এখনকার মত এত বেশী ছিল না। রাজনীতির স্রোত সে-দিনে মৃদুমন্থর গতিতে বহিত—অন্ততঃ ছাত্রেরা তাহাতে বড় ঝাঁপ দিতেন না। আমাদের সে-দিনে যে-সকল বিষয় লইয়া সমালোচনা চলিত, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্য-গল্প-নাটকই ছিল প্রধান। ইহার মধ্যে প্রতিকূল সমালোচনার বহর নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা গান গায়িতে বলিলে রবিবাবুর গান গায়িতাম, অন্য গান লোকে তেমন শুনিতে চাহিত না। আবৃত্তি করিতে হইলে রবিবাবুর কবিতা নহিলে চলিত না। মাসিক পত্রে রবিবাবুর নাম নহিলে পাঠকের মন খুশী হইত না।

এই সকল সমালোচনার মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, অনেকে রবিবাবুর লেখা না পড়িয়াই সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেন। অর্থাৎ সে সময়ে রবিবাবুর লেখার প্রতিকূল সমালোচনা করা একটা 'ফ্যাসানে' পরিণত হইয়াছিল। তাহার কারণ সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় ছিল। এখনকার মত সেই নবীন বয়সেও তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

আমি জানি না এখনও রবিবাবুর লেখা সম্বন্ধে বাঙ্গালী জনসাধারণের এরূপ বিশাল অজ্ঞতা আছে কি-না। আমেরিকা, জার্ম্মানী, জাপান, রুশিয়া, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে যাঁহার কাব্য-উপন্যাস সুপরিচিত, তাঁহার সম্বন্ধে 'জানি না' বলিতে আমাদের অভিমানে আঘাত লাগে। ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ অজ্ঞতার একটি উদাহরণ মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বিশ্বের আসরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন, তাহার কিছু পরে আমার একটি কবি-বন্ধুর সহিত কথা হইতেছিল। তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কাজেই তাঁহার নাম না-ই করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'রবিবাবুর কবিতা বৈষ্ণব কবিতার গন্ধে ভরপুর। তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণে আজ ইয়ুরোপে তাঁহার যশের দুন্দুভি বাজিয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রবিবাবুর কোন্ কবিতার কথা বলিতেছেন? ভানুসিংহের পদাবলী? সেগুলির ত তরজমা হয় নি।' তিনি বলিলেন, 'না, তাঁহার অন্য কবিতার কথা বলিতেছি। রবিবাবুর সব কবিতায় চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অমর মুদ্রাঙ্ক রহিয়াছে।' আমি ভাবিলাম, 'হয়ত বা ঠিক!' কারণ তখন বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহিত আমার বেশী পরিচয় ছিল না। পরে যখন বৈষ্ণব কবিতা পড়িতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম যে বন্ধুবরের তীর লক্ষ্যের অনেক দূর দিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-কবিতায় বৈষ্ণব ভাবের ছায়া কতখানি পড়িয়াছে, তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। আমার মনে হয় যে, বিহারীলালের কবিতা ব্যতীত অন্য কোনও কবিতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে

পারে নাই, যেমন বৈষ্ণব কবিতা করিয়াছে। কবি নিজেও তাহার ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বলা যায় যে, বৈষ্ণব কবিতার মূলধন লইয়াই রবীন্দ্রবাবুর কারবার, তাহা হইলে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যিক অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। তাঁহার কতকগুলি গানে ও কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার ছায়াপাত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের নাম বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি বলিয়া চিরদিন উল্লিখিত হইবে। ভারতবর্ষ গীতি-কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব কবিতা যে গীতি-কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে যদি বলা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী তাহা হইলে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় বৈষ্ণব কবিতার অলস তরল গতি আছে, উহারই ন্যায় ছন্দ-বৈভব আছে। বৈষ্ণব কবির পরে প্রেমের উজ্জ্বল মধুর ছবি আর কেহ এমন করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। আর একটি মনোমুগ্ধকর সাদৃশ্য এই যে, বৈষ্ণব কবিতারই মত রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে এক সোনার সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে ঃ—

দেবতারে যাহা দিতে পারি,
তাই দিই মানবেরে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

বৈষ্ণব কবি প্রিয়কে দেবতা করিতে চাহিবেন না, সত্য। কিন্তু মানবের প্রেম যে সেই অখণ্ড প্রেমের প্রাতিভাসিক বিকাশ, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? আমরা যে রবীন্দ্র-কবিতার মধ্যে—বিশেষতঃ প্রেম সম্বন্ধীয় গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ছায়া ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাই না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈষ্ণব কবির প্রেমচিত্রের মধ্যে যাহা সার্ব্বভৌম বা বিশ্বজনীন (universal) তাহারই উপলব্ধি করিতে হইবে।

প্রতিভাবান লেখক বা কবির রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা পড়িলেই যেন কত পরিচিত, কত পুরাতন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন আরও কোথাও পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি। নূতনত্ব সত্ত্বেও যে তাহারা অপরিচিতের মত আসিয়া মনের আঙ্গিনায় বিপ্লব বাধাইয়া দেয় না, ইহা একটি আশ্চর্য্য অথচ উপাদেয় সত্য। এই কারণে আমরা বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে যদি বৈষ্ণব কাব্য-প্রতিভার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই—ভাবি, তাহা হইলে তাহার অনুকূলে যথেষ্ট বলিবার আছে, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরব বাড়াইবার জন্য বা রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক মৌলিকতা খর্ব্ব করিবার জন্য যদি এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে সেরূপ চেষ্টার সমর্থন করা যায় না।

সেদিন একখানি মাসিক পত্রে দেখিলাম যে, 'শ্রীরাধাই হইতেছেন রবিবাবুর কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য। রাধাই রবিবাবুর কাব্য-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।' একথা শুনিলে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ চমকিয়া উঠেন, তাহা দেখিতে কৌতূহল হয়। লেখক 'উর্ব্বশী' কবিতায় এই রাধাভাবের একটা 'য়্যাস্‌পেক্ট' দেখিয়াছেন।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।
*   *   *   *
বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।

ইহার মধ্যে লেখক শ্রীরাধাকে নিঃসন্দেহ রূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। যাঁহারা এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যে ঐ কবিতার মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের ছায়া ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান না, ইহা বড় বিচিত্র নহে।

কিন্তু যাঁহারা 'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতাটি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রেমিকার ছবি দিয়া তাঁহার প্রেমের অমরাবতী সাজাইয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীরাধার নামগন্ধ নাই। আছেন শকুন্তলা, দময়ন্তী, সুভদ্রা, আর আছেন তপস্বিনী মহাশ্বেতা ও পার্ব্বতী। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব ভাবে অনুপ্রাণিত কোনও কবি রাধিকার চিত্র বাদ দিয়া প্রেমামরাবতী সাজাইবার কল্পনাও করিতে পারেন না। কেন-না, বৈষ্ণবের প্রেম-নন্দনকাননের কল্প-পারিজাত—শ্রীরাধা!

তবে বৈষ্ণব কবিদিগের অঙ্কিত চিত্রের যে মাধুর্য্য, যে 'অকথিত বাণী মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে' সদাই জাগিয়া রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-লুণ্ঠনকারী হৃদয়কে এড়াইবে কিরূপে? বৈষ্ণব সাহিত্যে যাহা-কিছু সুন্দর আছে, তাহাই তিনি আত্মসাৎ করিয়া বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদ দান করিয়াছেন। আমি এস্থলে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

'দেহের মিলন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।

জ্ঞানদাসের কবিতায় রাধা-হৃদয়ের ব্যাকুলতা-ভরা আবেগ বাসনা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে ঃ—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পুতলি মোর থির নাহি বাঁধে।।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহারই কতকটা অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।[১] (কড়ি ও কোমল)

রবীন্দ্রনাথ যে জ্ঞানদাসের ভাবটি ফুটাইয়া তুলিলেও অনুকরণ করেন নাই, তাহা আর একটু অগ্রসর হইলেই ধরা পড়ে।

আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

ইহা ঠিক বৈষ্ণব ভাবের অনুকূল নহে। বৈষ্ণবের প্রেম বিলয় কামনা করে না। বৈষ্ণবের মতে প্রেমিক ও প্রেমিকার, ভক্ত ও ভগবানের, উপাস্য ও উপাসকের চির ব্যবধানই অনুরাগের তীব্রতা ও গাঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখে।

বড় সাধে জ্বালিনু দীপ গাঁথিনু মালা
চির দিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন। (গান)

এই যে 'চিরদিনে' দর্শন পাওয়া—ইহা কেবল তিনিই লিখিতে পারেন, যিনি বিদ্যাপতির পদের সহিত পরিচিত।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই পদ গায়িয়া স্বগৃহে শ্রীচৈতন্যের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। 'বড় সাধে জ্বালিনু দীপ গাঁথিনু মালা' পড়িলেই মনে পড়ে ঃ—

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লু
গাঁথিলু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা।। (বড়ু চণ্ডীদাস)

রবীন্দ্রনাথের

এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা
কেমনে আছে সে পাসরি।
সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি বাজে না বাঁশরী।।

'ক্ব মন্দ্র মুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ' স্মরণ করাইয়া দেয় না কি?

ভানুসিংহের পদাবলী কবির কাব্যকুঞ্জে প্রভাতী সঙ্গীত। তিনি সেই প্রথম যৌবনে বৈষ্ণব কবিদের ভাব, ভাষা ও সঙ্গীতের মধ্যে যত কিছু সুন্দর আছে, তাহা নিঃশেষে লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে বৈষ্ণব কবিতার তরলিত গতি তাঁহার অনুভূতি-প্রবণ হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের ঢেউ বহাইয়া দিয়াছিল! আশ্বর্য্যের বিষয় এই যে, বাংলার আর একজন শ্রেষ্ঠ কবিও বৈষ্ণব কবিতার দ্বারা এইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা' পরিণত বয়সের রচনা। বৈষ্ণব কবিতার ভাষা ও ছন্দ তাঁহারও প্রাণে মাধুর্য্যের ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার সমস্তই বৈষ্ণব ভাবের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু তাঁহার কবি-হৃদয় সে-সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্য্যের সন্ধানে অভিসারে ছুটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথেও আমরা দেখিতে পাই নানা প্রতিকূল অবস্থানের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সৌন্দর্য্যের আহ্বানে বৈষ্ণব কবির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এখনও তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশী শুনেছি।

পড়িলেই মনে পড়ে ঃ—

কদম্বের বন হৈতে কি বা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে।। (অজ্ঞাত পদকর্ত্তা)

আর ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনোমাঝে!

পড়িলে সেই বিরহ ব্যাকুলা রাধার চকিত চাহনি মনে পড়ে না কি?

বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্

অথবা—

কেন বাজাও কাঁকন কন কন
কত ছল ভরে!

যেন একখানি জীবন্ত ছবি আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে। সেই যমুনাতীরের নীপনিকুঞ্জ, সেই কদম্ব-কেতকী-যূথীর পরাগমাখা সৌরভ, সেই বাঁশীর আকুল আহ্বান আর গৃহকর্ম্মে শৃঙ্খলিতা অথচ মন যার নিমেষে শতবার 'কদম্ব কাননে ধায়' এমন একখানি রমণীর চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

বঁধু হে ফিরে এস!
* * *
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এস।

এ শুধু আধুনিক কীর্ত্তন নহে; বৈষ্ণব কবিতার জলতরঙ্গ সঙ্গীতে যাহাদের কান বাঁধা, তাহারা যে ইহাতে সেই বৈষ্ণব কবিতারই সুর শুনিতে পায়, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

এমনি এবং আরও কত ভাবে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। তিনি নিপুণ জহুরীর ন্যায় বৈষ্ণব কবিতার ভাণ্ডারে যে-সকল মণিমাণিক্য ছড়ান আছে, তাহা চুনিয়া চুনিয়া নিজের কবিতা-লক্ষ্মীকে সাজাইতে চাহিয়াছিলেন ঃ

কো তু হুঁ বোলবি মোয়।

একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার একটি কলি বা অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি কেমন সুন্দর ভাবে তাহার অন্তরতম ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন ঃ

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি।।
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয়।।

...তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, আঁখির অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগমদপাঁতি, গ্রীবার হার, দেহের সর্ব্বস্ব এবং গৃহের সার। পাখীর পাখা যেমন, মাছের পক্ষে জল যেমন, জীবের জীবন যেমন, তেমনই আমার তুমি। (তবু) হে মাধব, তুমি আমায় বল, তুমি কেমন!

তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, কো তুঁ হুঁ বোলবি মোয়। তুমি কে, আমাকে বলিয়া দাও। তোমার বাঁশীর

স্বর বিষামৃতে মিশানো, ('মুরলী বাজায় যেন, বিষামৃতে একত্র করিয়া'—অজ্ঞাত পদকর্ত্তা) তোমার হাসি দেখিয়া ঋতুরাজ বসন্ত ছুটিয়া আসিল, ত্রিভুবন চরণ-কমল ছুঁইবার আশে বিভ্রান্ত মধুকরের মত ধাইল, বলিয়া দাও, তুমি কে! কো তুঁ হুঁ বোলবি মোয়।

বৈষ্ণব কবিতার একটি কলির অর্দ্ধাংশ নিজ কবিতায় গাঁথিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিবার যে পদ্ধতি, তাহা নূতন নহে। সার এড্‌উইন আরণল্ড্‌ ও গীতগোবিন্দের ছন্দে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ইংরেজী কবিতায় এইরূপ একটি কলি জুড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

The lesson that thy faithful love has taught him
He has heard;
The wind of spring, obeying thee has brought him
At thy word;
What joy in all the three worlds was so precious
To thy mind?
Ma Kooroo Manini Manamaye
Ah, be kind!

–*The Indian Song of songs*

ইহা ঠিক অনুবাদ না হইলেও জয়দেবের ঝঙ্কার যেন কতকটা তুলিতে পারিয়াছে। জয়দেবের কবিতায় 'মাধবে মাকুরু মানিনি মানময়ে' যেমন 'ধ্রু' কলি, অর্থাৎ প্রত্যেক যুগ্মের পরে গায়িতে হয়, আরণল্ডও সেইরূপ প্রত্যেক stanza-র শেষে ঐ কলিটি দিয়া জয়দেবের ছন্দ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'কো তুঁ হুঁ বোলবি মোয়' কলিটিও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক stanza-র পরে ধ্রু কলির মত প্রদত্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় ব্রজবুলির সুন্দর অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

মরণরে তুঁ হুঁ মম শ্যাম সমান।

এই কবিতায় কবি বলিতেছেন, হে মরণ, তুমি আমার শ্যামের সমান। অর্থাৎ আমি তোমাকেই বরণ করিলাম। শ্যাম নির্দ্দয় হইলেও তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিবে না, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না; রাধার হৃদয় তুমি কখনও ভাঙিয়া দিবে না।

বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা রাধাকে দিয়া অন্য ভাবে এই একই কথা বলাইয়াছেন ঃ

এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ।।
যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝুগাত।। —গোবিন্দ দাস

.....হে সখি, আজ মৃত্যু ও বিরহের মধ্যে যে কলহ তাহা চুকিয়া যাউক।[২] যদি ঐ ভাবে গোকুলচন্দ্রের সহিত মিলন ঘটে! (মৃত্যু হইলে আমার দেহের পঞ্চভূত পঞ্চ মহাভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন যেন) প্রভু আমার যেখানে রাঙ্গাচরণ ফেলিয়া চলিয়া যান, আমার দেহের মৃত্তিকা যেন সেখানকার মৃত্তিকা হয়। তিনি যে-সরোবরে স্নান করেন, আমার দেহ যেন সেই সরোবরের জল হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শীতল করে।

এখানে একটি কথা এই যে, বৈষ্ণব কবির সহিত সাদৃশ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। কারণ বৈষ্ণব কবির প্রভাবে প্রভাবিত কোনও কবি হয়ত মরণকে শ্যামের সহিত তুলনা করিতেন না। শ্যাম অতুলনীয়, নিরুপম।

মধু রিপু সম নহি দেখিঅ সোহাওন
জে দিঅ তহ্নিক উপামরে।—বিদ্যাপতি

মধু রিপুর তুল্য সুন্দর দেখি না যে তাঁহার উপমা দিব।
(নগেন্দ্রবাবুর অনুবাদ)

মরণ যখন একান্ত কামনার বিষয় হয়, তখন সে কেবল 'ঐছন মিলই যব গোকুল চন্দ'—তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য। নহিলে মরণ কে চায়?

হরি-লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে।—শশীশেখর

বৈষ্ণব কবিতার তরল সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথ বহু পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া থাকিলেও তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিতে পারে নাই, নানা কারণে। প্রতিকূল বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের ভাব, ভাষা ও ছন্দ যত দূর ধরিতে পারিয়াছেন, আর কোনও কবি তাহা পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য বা অন্য কোনও সাহিত্য হইতে তিনি যদি উপকরণ লইয়া নিজের অনন্য সাধারণ অনুভূতির রসে পাক করিয়া পরিবেষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে কোনও হানি নাই। জয়দেবের গীতি-কবিতা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাস যে তাঁহার অমর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কবি-যশ একটুও ম্লান হয় নাই। গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াও বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অবলীলাক্রমে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ধনে ধনী হইয়াও অমরতা লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার নিকটে কি পরিমাণে ঋণী। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কোথায় কোন্ কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার আভাস আছে, কোথায় কোন্ গানে কীর্ত্তনের সুর বাজে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে বহুকালব্যাপী গবেষণা আবশ্যক। অসামান্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের ইতিহাস যে-দিন গ্রথিত হইবে, সে-দিন বুঝিতে পারা যাইবে বৈষ্ণব কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতিত্ব কোথায় ও কতখানি।

বৈষ্ণব কবিতার সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাদৃশ্য যতই থাক্, ইহা বলিতেই হইবে যে সে-সাদৃশ্য ঐ সাহিত্যের অতি অল্প অংশ। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে গানে নাটকে ও প্রহসনে, উপন্যাসে প্রবন্ধে ও আলোচনায় যে বিরাট সৃষ্টি শিল্পের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ছায়া অল্পই স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে অপূর্ব্ব কাব্যভোজে তিনি আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছেন, তাহাতে নানা রসের পরিবেষণ হইয়াছে। বৃন্দাবনের মনোহরা তাহাতে একমাত্র মিষ্টান্ন নহে।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি কবির যে অসাধারণ অনুরাগ আছে, তাহার বহু প্রমাণ তাঁহার লেখা হইতে সংগ্রহ করা যায়। বাউল ও কীর্ত্তনের সৌন্দর্য্য তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার 'বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক কবিতা অভ্রান্তভাবে তাঁহার শ্রদ্ধা ও উদারতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এ গীতি-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;—

এ উক্তি মুগ্ধ ভক্তের উক্তি, শ্রদ্ধার প্রস্ফুট কুসুম-সম্ভার। আমার মনে হয় কোনও কবি, কোনও কালে বৈষ্ণব কবিকে এইরূপ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন কি-না সন্দেহ। কিন্তু যতই হোক, এই 'বৈষ্ণব কবিতা' পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পথের কোন্‌খানে মহাজনদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি হইল। কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
.....একি শুধু দেবতার?

তিনি বলিতে চাহেন ঃ—

বৈষ্ণব কবির গাথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহ তরে...

এইখানেই কবি বৈষ্ণব ভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে গেলেন।

কেহ দেয় তারে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে।... ... ...

ইহা শুনিতে যতই সুন্দর হউক, বৈষ্ণবের ভাব এখানে রক্ষিত হইল না। কে প্রিয়? কার তরে এই গান? বৈষ্ণব বলিবেন—তাহার প্রিয়তমের জন্য, চির কিশোর কিশোরীর নিমিত্ত—মানুষের জন্য কখনও নহে। যাহা অনিত্য, যাহা মরণশীল, তাহা প্রেমের বিষয় হইতে পারে না। কাম ও প্রেম, লালসা ও প্রীতি পৃথক বস্তু। কাম-লালসা পার্থিব, নশ্বর সংসারেরই মত অনিত্য। প্রেম, প্রীতি স্বর্গীয়? না; একমাত্র বৃন্দাবনের সামগ্রী। বৃন্দাবনের বাহিরে প্রেমতরু বাঁচে না। ইহাকে ব্রজ ছাড়া করিও না; তাহাতে প্রেমও থাকিবে না, তোমারও বিপদ হইবে।

ব্রজ বিনা অন্যত্র ঞিঁহার নাহি বাস।—চৈতন্যচরিতামৃত

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাব ছুঁই ছুঁই করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দের মন্দিরের অনতিদূরেই ভাষার তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুই-ই অপূর্ব্ব, দুই-ই সুন্দর। রবীন্দ্রের কাব্য শুধু ভক্তের জন্য নহে, তাঁহার সঙ্গীত সবই ধর্ম্মসঙ্গীত নহে। তাঁহার বহু কবিতা আছে, যাহা বৈষ্ণব ভাবের ধার ধারে না। মানব-চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলি অসামান্য অনুভূতির বলে তিনি যেমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, এমন কোনও কবি পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। প্রকৃতির নব নব বিভ্রমশালী সৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় যেমন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এমন বৈষ্ণব কবিতায় নহে। তাঁহার 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা' উপমাহীন। তাঁহার বহু কবিতা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রসে ভরপুর, অথচ তাহাতে বৈষ্ণব কবিতার গন্ধমাত্র নাই।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা। —রঘুবংশ সপ্তম।

চিত্তলোভী নৈনদ্বার অতিহী সূক্ষ্ম কহাঁ বহ
সিন্ধু ছবি হৈ অগাধা।
রোম জিতনে অঙ্গ নৈন হোতে সঙ্গ রূপ লেতী
নিদরি কহত রাধা।।—সুরদাস

শ্রীরাধা বলিতেছেন আমার প্রতি রোম যদি চক্ষু হইত, তাহা হইলে সাধ মিটাইয়া শ্যামরূপ দেখিতাম।

২. বিরহে মরণমেব নির্দ্বন্দ্বং নির্ব্বিরোধমিত্যর্থঃ—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা। অর্থাৎ এতদিন আমার দেহ লইয়া মৃত্যু ও বিরহের মধ্যে যে কলহ বা বিরোধ চলিতেছিল, তাহা শান্ত হউক। কৃষ্ণবিরহে মরণ অনুকূল হউক।

রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই বইখানি নানা দিক্ দিয়া একক, এবং বৈশিষ্ট্যময়। ইহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত আঠারোখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে (এগুলির মধ্যে দশখানি বহুবর্ণময়), এবং চিত্রের ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া কবিবরের রচিত আঠারোটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা কবিতা এবং কবিতাগুলির ইংরেজী ভাবানুবাদ কবির স্বাক্ষরিত হস্তলিপির প্রতিলিপিতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কবির রচিত একটী ইংরেজী ভূমিকা, ও শিল্পাধিষ্ঠাত্রী "চিত্রলেখা দেবী"-র উদ্দেশ্যে রচিত আর একটী বাঙ্গালা কবিতা ও তাহার ইংরেজী অনুবাদও আছে।

এই বইয়ে সহজ-লভ্য আকারে কবির চিত্র-বিষয়ক কৃতির কতকগুলি নিদর্শন মিলিবে। রবীন্দ্রনাথ সর্ববাদিসম্মতিক্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে অন্যতম। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব কাহারও কাহারও পক্ষে—বিশেষতঃ যাঁহারা ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতের ব্যবসায়ী বা অনুরাগী তাঁহাদের কাহারও কাহারও পক্ষে—অনুমোদনীয় বলিয়া মনে না হইলেও, আধুনিক বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষে তিনি যে সঙ্গীতকে তাহার একটী অভিনব এবং বহুজনের মতে যুগোপযোগী রূপ দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাট্যেও—নাটক রচনায়, অভিনয়ে এবং প্রয়োগে—তাঁহার প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কলা বা সুকুমার শিল্প—ইংরেজীতে যাহাকে Art বা Fine Art বলে—তাহার চারিটী মুখ্য অঙ্গ ঃ কাব্য, সঙ্গীত, নাট্য এবং রূপ-শিল্প। রূপ-শিল্পের প্রকাশ হইয়া থাকে নেত্র-গ্রাহ্য রেখায়, বর্ণে এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও ঘনত্বের সমাবেশের মধ্যে; বাস্তুগঠন, ভাস্কর্য ও চিত্র উহার প্রকাশের তিন প্রধান উপায়। নাট্য—অভিনয় নৃত্য ইত্যাদিকে একাধারে চলমান চিত্র বা ভাস্কর্য এবং সঙ্গীতের সংযোগ বলা যাইতে পারে। এই চারি প্রকার কলার মধ্যে আপেক্ষিক স্থান কোনটীর সর্বোচ্চে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে রূপকর্ম, নাট্য, কাব্য এবং সঙ্গীত, এই তিনটীর মধ্যে, সঙ্গীত-ই দ্যোতনা-শক্তিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী—বিশেষতঃ যন্ত্র-সঙ্গীত, কারণ ইহা ভাষার অতীত, বাক্যের অতীত, এবং নেত্র-গ্রাহ্য রূপের অতীত। কিন্তু কাব্য, নাট্য ও রূপকর্ম বহুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের মত অনুভূতিশীল কবি এবং নিষ্ঠাবান্ গুণীর নিকট কাব্য, নাট্য এবং সঙ্গীত, তিনটীই সার্থক-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার অনুভবী প্রতিভা, রূপ-শিল্পের প্রতিও যে আকৃষ্ট হইবে, ইহা স্বাভাবিক। শিল্পকলার তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার; অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের লোকোত্তর প্রতিভার একজন দরদী পরিপোষক তিনি, এবং বিদেশী শিল্পের মহত্ত্বও তিনি উপলব্ধি করেন। বহু বৎসর পূর্বে অস্‌লো নগরে নরওয়ের বিখ্যাত ভাস্কর গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ড্-এর বিরাট্ ভাস্কর্য-বিষয়ক কৃতিত্ব দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ-ভাবে তাহার সৌন্দর্য ও শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন; সেই দর্শনের অনুধ্যানের আনন্দে যাহাতে অন্ততঃ একটী দিনের জন্য কোনও বাধা না পড়ে, সেই জন্য তিনি সারাদিন ধরিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেন নাই, একথা নরওয়ের একটী বন্ধু আমায় বলিয়াছিলেন।

কলানুরাগী বিদগ্ধজন রূপ-শিল্পকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কলা বা সঙ্গীতে কৃতিত্ব কিন্তু বিশেষ-শিক্ষা-সাপেক্ষ; শিক্ষা দ্বারা এবিষয়ে মানসিক প্রবণতাকে পুষ্ট এবং প্রকাশ-ক্ষম করিয়া তুলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা, শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলে সঙ্গীতে সহজেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রূপ-শিল্পে তাঁহার যে প্রকাশ কয়েক বৎসর হইল দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে রূপকর্মের অনুধ্যান আছে, সাহচর্য আছে, রূপকর্মের সহিত "সাহিত্য" আছে; কিন্তু রীতিমত পরিপাটী বা নিয়ম অনুসারী শিক্ষা বা সাধনার সহায়তা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শিল্পময় প্রকাশের মধ্যে ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেষ্টার পক্ষে ইহাই সর্বপ্রধান লক্ষণীয়, যে ইহা স্বত-উৎসারিত, সাবলীল, —এবং ইহার মধ্যে অপরিহার্যতা-গুণ বিদ্যমান। কবির বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতির প্রকাশ যেমন আপনা হইতেই তাঁহার গানে, কাব্যে, নাটকে, কথায় হইয়া থাকে,—গোপন বার্তা যেমন তাঁহাকে প্রকট করিয়া দিতেই হইবে, তেমনি একটা অবশ্যম্ভাবিতার সহিত তাঁহার অনুভূতির প্রকাশ নূতন ভাবে রূপ-রেখায় ও বর্ণে আমাদের চোখের সামনে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য শিক্ষার বা শিক্ষানবিশীর অভাব আছে—তাহা শিল্প-শিক্ষককে, এবং যিনি শিল্পের প্রাণ অপেক্ষা তাহার আকারকেই বড় বলিয়া মনে করেন তাঁহাকে, খুশী করিবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই শিল্প-চেষ্টাকে শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারস্বামীর মত শিল্প-রসিক childlike, not childish—অর্থাৎ শিশুচেষ্টিতের মত সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত অতএব সুন্দর, বয়োবৃদ্ধ কর্তৃক শিশুর অসুন্দর অনুকরণ নহে, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার রূপ-শিল্পের এই অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকার লিখনে যে ভাষাহীন গীতি বা উক্তি রচিত হইয়াছে, সাধারণ চিত্রের ভাষার ব্যাকরণ দিয়া তাহার যাচাই করিতে গেলে চলিবে না। কথা হইতেছে, এগুলির দ্বারা অনুভব-শীল ব্যক্তির চিত্তে কোনও ভাব-পরম্পরা উদিত হয় কি না। হয় তো রচনা-কালে যে ভাবের ভাবুক হইয়া কবি তুলিকার চালনা করিয়াছেন, দ্রষ্টার মনে এই প্রকার চিত্রের দর্শনে ঠিক সেই ভাবটী জাগিবে না; কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় না—কারণ তথ্যের বাহিরেকার সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের মন-গড়া ভাব-ই আমাদের পক্ষে কার্যকর হইয়া থাকে।

কবির আঁকা সব ছবিগুলিই যে শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর তাহা কেহ বলিবে না। ছবিগুলির মধ্যে সেগুলির উদ্ভবের ইতিহাস নিবদ্ধ রহিয়াছে। কেমন করিয়া বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে লেখা গান কবিতা বা গদ্যরচনার মধ্যে লিখন-কালে কোনও অংশ কাটাকুটি করিয়া বাদ দিবার আবশ্যকতা হওয়ায়, কবির অলস লেখনীর মুখে এই সমস্ত কাটাকুটির রেখা নানা প্রকারের নক্‌শার এবং কিম্ভুতকিমাকার জীবের রূপ গ্রহণ করিত। নিজ কল্পনার বল্গাকে শ্লথ করিয়া দেওয়ার ফলে, এই ভাবে কবির কলমের অব্যাহত গতির ফলে তাঁহার চিত্র-প্রতিভা নিজেকে দেখা দিতে আরম্ভ করে। কালো কালির লেখায় ক্রমে লাল কালির মিলন হইল, তাহার পরে বিভিন্ন রঙ্গের কালি আসিল, প্রথমটায় কলমের দ্বারায় ও পরে তুলির সাহায্যে তাঁহার চিত্র-রচনার ক্রম-বিকাশ চলিল।

কবির হাতে এইভাবে নানা ঢঙ্গের রঙ্গীন ও একরঙ্গা বহু চিত্র রচিত হইয়াছে। কতকগুলি নিছক্ কল্পনা-প্রসূত—নক্‌শা, অথবা আদিম যুগের বিরাট্‌কায় অদ্ভুত অধুনালুপ্ত জন্তুর অনুকরণে অঙ্কিত পশু পক্ষীর মূর্তি। বিভিন্ন রঙ্গের সমাবেশে রচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুল-পাতা এবং অনেকটা স্বাভাবিক-ভাবে আঁকা নরনারীর চিত্রও তাঁহার হাতে দেখা দিয়াছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে একটা রোমান্টিক আব-হাওয়া বিশেষ স্পষ্ট।

শিল্পের দিক হইতে এই ছবিগুলির সার্থকতা অথবা, এগুলির নিরর্থকতা বিচার করিবার যোগ্যতা

আমার নাই। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি, কবির আঁকা অনেকগুলি ছবিই আমার কাছে উপভোগ্য। রঙ্গের সমাবেশের দরুন, অনেকগুলির মূল্য আমার কাছে শব্দহীন গানের সুরের গুঞ্জনের মত মনে হয়। আমার কাছে কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে, কবির হাতে আঁকা কতকগুলি মুখ। আমার মনে হয় এইখানে কবি মুখের আকার ও ভঙ্গীর দ্বারা অদ্ভুত-ভাবে ছবিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এখানে তাঁহার কৃতিত্ব একেবারেই শিশু-চেষ্টিতের মত নহে, এখানে যেন অকস্মাৎ প্রৌঢ় শিল্পের, ওস্তাদ শিল্পীর হাতের ঝঙ্কার দেখা দিয়াছে! দৃষ্টান্ত স্বরূপ "চিত্রলিপি"-র ২, ১১, ১৩ সংখ্যক চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবির চিত্রের প্রদর্শনীতে এরূপ মুখের ছবি আরও অনেক দেখিয়াছি। কবি অসীমের আহ্বান তাঁহার কবিতা গান ও সুরে আমাদের শুনাইয়া দিয়াছেন, তেমনি মানব-চরিত্রের মধ্যে সীমার পরিচয়ও আমাদের দিয়াছেন; এই মুখচিত্রগুলি নূতন ভাবে, এবং নিরতিশয় শক্তি সহানুভূতি ও সার্থকতার সঙ্গে মানব-চরিত্রের সম্বন্ধে কবির সুগভীর আত্মীয়তাবোধের এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিতেছে। এই প্রকার মুখের ছবিগুলির জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথকে উচ্চকোটির রূপ-শিল্পীর আসন দিতে ইতস্তত করিব না। অন্য চিত্রগুলি, রেখা ও রঙ্গের jeu d'esprit বা প্রতিভার লীলা; কিন্তু এগুলি যথার্থ creative art—প্রতিভার সার্থক শিল্প-রচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক ছবিটীর আশয় অবলম্বন করিয়া, কতকটা ব্যাখ্যাত্মক ভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা কবিতা ও সেগুলির ইংরেজী ভাবানুবাদ দিয়াছেন। সব সময়ে সেগুলি যে দ্রষ্টা এবং পাঠকের মনোভাবেরও প্রকাশক হইবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু তাহাতে ছবি ও কবিতা, উভয়ের মূল্য কমে না। একাধারে কবি ও চিত্রকার জগতে তাদৃশ সুলভ নহে। শিল্প-রসিক ব্যক্তি এই বই হইতে কবির প্রতিভার একটা নূতন দিক্ দেখিয়া প্রীতবিস্মিত হইবেন।

* চিত্রলিপি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত ও রচিত। বিশ্বভারতী পুস্তকালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে প্রকাশিত। আকার, ১১" × ৯"। মূল্য ৪॥০; রাজসংস্করণ, কবি-কর্তৃক স্বাক্ষরিত, কুড়িখানি মাত্র, মূল্য দশ টাকা।

বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা

শশাঙ্কমোহন সেন

বিহারীলালের অপূর্ণতা তাঁহার শিষ্য রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গুরুকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু গুরুকে বিস্মৃত হন নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। ... তাঁহার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'পুরীতে সমুদ্রদর্শনে', 'মানসসুন্দরী', 'বসুন্ধরা', 'পুরস্কার' ও আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা ও অনেকগুলি সনেট আমরা জগতের সাহিত্য-প্রদর্শনীতে নির্ভয়ে পাঠাইতে পারি।

*   *   *   *   *

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের উপাসক। ... সেই প্রেম প্রথমে ভাব-প্রবণ ও অগভীর ছিল। এই সময়ে প্রবীণ বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাবে, তাঁহার ভাব ও ভাষা উভয়ই অতি আশ্চর্য মূর্তিতে 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' পরিস্ফুরিত হইয়াছে। ... এই প্রেম বারে বারে নানারূপ প্রেম-সংগীতে ও 'কড়ি ও কোমলের' ক্ষুদ্র কবিতায় ঘনতা ও অবয়বপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং 'চিত্রাঙ্গদা'য় একাধারে কবির সমস্ত পূর্ণভাবের সন্নিবেশ করিয়াছে। 'মানসী'র ধ্যান-ধারণার রাজ্যে নিগূঢ় অন্তর্লীনতা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা দিয়াছে। পরিশেষে কবিকে 'সোনার তরী'তে ভাসাইয়া 'চিত্রা'র ভিতর দিয়া এমন এক রাজ্যে উপনীত করিয়াছে, যাহাকে 'যোগ' বলিলেও বলা যায়। তিনি মানবীর প্রেমের ভিতর দিয়া জগৎলক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার 'মানসসুন্দরী', 'চিত্রা', 'উর্বশী', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি কবিতায় পরিস্ফুট। ভাবোন্মত্ততা হইতে যোগে উন্নতি, জগতে অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। এইরূপে বৈষ্ণব কবিদের প্রেম, কবির মৌলিক প্রতিভায় ও ইউরোপীয় প্রভাবে, ক্রমে পরিণত হইয়া, বঙ্গসাহিত্যে সমুন্নত প্রেম-কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে।

*   *   *   *   *

ইদানীং রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাবকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিতেছে। 'চিত্রা'র কবিতাগুলি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছন্দের নৃত্যে, ভাষার ঝংকারে, আকুলতার আবেগে, ভাবের সুচিক্কণ সুররশ্মি ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করা দায় হইয়াছে। ... রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক স্থলে গ্রামের সরলতা অপেক্ষা নগরের ভদ্রতাই অধিক। ... এখন তিনি অল্পে অল্পে স্বভাবের রাজ্য অধিকার করিতেছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতে ও 'চৈতালি'র কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। ... পূর্বোক্ত কারণগুলির সমবায়ে রবীন্দ্রনাথ এ দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট অধৃষ্য ও দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছেন।

*   *   *   *   *

তিনি (রবীন্দ্রনাথ) উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ক্ষুদ্রের ভিতর মহত্ত্ব-দর্শনে বিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে ও মানবচরিত্রের অধ্যয়নের ফলে তাঁহার অনেক

গল্প সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এই সমস্ত গল্পে বঙ্গভাষার বর্তমান শক্তি ও গতি বুঝিতে পারা যায়।

* * * * *

রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রেমসংগীত দিয়াছেন। এই সমস্ত সংগীত ইউরোপীয় গীতিকবিতার আদর্শে রচিত। সুতরাং রসোদ্রেক অপেক্ষা ভাবোদ্রেকই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলি ভাবের উদ্দীপক ও বিরাট পুরুষের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক; তাই সংগীত-সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মের প্রাচীন যোগমূলক ধারণায় ও আন্তরিকতায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত চিরঞ্জীব প্রভৃতি সাধু সাধকগণের সংগীতকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালায় সর্বপ্রথম প্রকৃত হাস্যরসের কবিতা রবীন্দ্রনাথ ‘মানসী’তে লিখিয়াছিলেন।

প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি আমাদের দুর্গাপ্রতিমার মত। সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাকচিক্য, সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক সভায় ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশের সংমিশ্রণে যে ভাষা বহিয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার রত্নৈশ্বর্যস্বরূপ সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সমালোচকেরাই একমত। সেই বিশেষত্বটি এই যে, নাটক ঠিক ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভার উপর নির্ভর করে না; প্রতিবেশ-প্রভাব ইহার পক্ষে প্রায় তুল্যরূপেই প্রয়োজনীয়। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল যুগে ও দেশে নাটকের উৎকর্ষ জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকে। পেরিক্লিসের যুগের গ্রীক্ নাটক, চতুর্দ্দশ লুই-এর যুগের ফরাসী নাটক ও এলিজাবেথ্ যুগের ইংরাজী নাটক সকলেই জাতীয় জীবনের উন্নতি ও উন্মাদনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নাটক যেন উন্নতিশীল, বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জাতির যৌবনের দৃপ্ত তেজ ও উন্মাদনা কাটিয়া গেলে, চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতত্ত্বানুশীলতা জাতীয় জীবনকে অধিকার করিলে নাট্য-সাহিত্যের উৎস সেখানে শুকাইয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক্ ও ভিক্টোরিয়া যুগের অনেক প্রতিভাবান কবি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অতুলনীয় কবি প্রতিভা নাটককে ঠিক জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, নাটকের মূল রহস্যটি তাঁহাদের নিকট ধরা দেয় নাই। সাহিত্য-রাজ্যে নাটক যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা; এবং ইহাকে জাগাইবার সোনার কাঠি জাতীয় জীবনের কোন্ গোপন স্তরে লুকান আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

অনেকটা এই কারণেই অতি-আধুনিক যুগে নাটকের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে একটা গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অনেক চেষ্টার পরেও যখন পুরাতন নাটককে পুনর্জীবিত করা গেল না, তখন লেখক ও সমালোচক ইহার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে ক্রমশঃ এই সত্য ফুটিয়া উঠিল যে, এলিজাবেথ্ যুগের নাটককে যে বর্ত্তমান কালে পুনর্জীবিত করা যায় না, তাহার প্রধান কারণ, আমাদের জীবনের ধারা ও সমস্যা এখন সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। যৌবনের স্বপ্ন ও কর্ম্মক্ষমতা প্রৌঢ়জীবনে প্রতিফলিত করা যায় না। শেকস্‌পীয়ারের নিকট জীবনের যে-প্রশ্ন, যে-সমস্যা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, একজন আধুনিক নাট্যকারের নিকট তাহারা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। লিয়ারের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, ম্যাক্‌বেথের মূঢ় রক্ত-পিপাসা, ওথেলোর উন্মত্ত সন্দেহ, হ্যামলেটের অশান্ত আত্ম-জিজ্ঞাসা—সমস্তই যেন একটা সুদূর জগতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মতো আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছে। অবশ্য শেকস্‌পীয়ারের নাটকে মানব-হৃদয়ের যে-সমস্ত সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহারা চিরন্তন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু উহাদের সে পুরাতন তীব্রতা, সে উদ্দাম গতিবেগ নাই। অকৃতজ্ঞ সন্ততির এখন অভাব নাই এবং বোধ হয় কখনই অভাব থাকিবে না; কিন্তু আত্মপ্রতারণা ও মোহের যে উচ্চ শিখর হইতে ভূমিসাৎ হইয়া বৃদ্ধ রাজা লিয়ারের মর্ম্মবেদনা এত করুণ ও অভ্রভেদী হইয়াছিল, বর্ত্তমান জীবনের সমতল ভূমিতে সেই মোহ-পর্ব্বতের

স্থান কোথায়? সুতরাং বর্ত্তমান যুগের লিয়ারেরা পড়ে ও কাঁদে, কিন্তু তাহাদের ক্রন্দনে সেই বিরাট, সর্ব্বগ্রাসী সুর নাই। ম্যাক্‌বেথের উচ্চাভিলাশ বর্ত্তমান যুগে হত্যার ছুরিকা না ধরিয়া উপায়ান্তরে নিজ উন্নতির পথ পরিষ্কার করে এবং ডাকিনীর সহিত পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না—সুতরাং নাট্যকার তাহার মধ্যে আপনার চরম গৌরবের উপাদান খুঁজিয়া পান না। ওথেলোর ঈর্ষ্যা আজকাল সমস্ত পাশ্চাত্য সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়া বিবাহচ্ছেদ বিচারালয়ের কার্য্যবিবরণীর মধ্যে সুলভ সমাধান লাভ করে, এবং ডেস্‌ডেমোনা আত্মবলির পরিবর্ত্তে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ স্বামীর সহায়তাই করে। হ্যামলেটের আত্মজিজ্ঞাসা অবশ্য বিশেষভাবেই আধুনিক কালের ব্যাধি, কিন্তু যে-অবস্থার মধ্যে তাহার চিত্ত-দৌর্ব্বল্য ট্রাজেডির সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহার পুনরাবৃত্তির অবসর কোথায়? মোটের উপর শেকস্‌পীয়ারের সময়ে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যে উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবলতা, যে উচ্চ সুরে বাঁধা হৃদয়তন্ত্রী ছিল আধুনিক কালে তাহার তীব্রতা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; আজ-কাল জীবনের দুঃখ-জ্বালা, জীবনসমস্যার সংঘাত অপেক্ষাকৃত মৃদু সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন ট্রাজেডির বীরত্বপূর্ণ, অলঙ্কার-বহুল ভাষা আমাদের কর্ণে যেন অনেকটা অর্থহীন কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়—"with little meaning, though the words are strong." বর্ত্তমান জীবনের চরম মুহূর্ত্তগুলি (crises) শেকস্‌পীয়ারের যুগের সহিত এক নয়।

সুতরাং এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমতা রাখিয়া নাটকেরও প্রকৃতি ও আদর্শ রূপান্তরিত হইতেছে। ঘটনা-বহুল পঞ্চাঙ্ক নাটক বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র সমস্যার মধ্যে তাহার রাক্ষসী ক্ষুধার যথেষ্ট খাদ্য পাইতেছে না, সেইজন্য খুব স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাহার কলেবর সঙ্কুচিত হইয়া তিন-অঙ্ক বা একাঙ্ক নাটকে দাঁড়াইতেছে। ভাষার কবিত্বময় উচ্ছ্বাস ও অলঙ্কার-স্ফীতি সাধারণ জীবনের সম্পর্কে আপনার আতিশয্যে আপনি লজ্জিত হইয়া প্রতিদিনের গদ্যে সঙ্কুচিত হইতেছে। আবার এই আকৃতি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আধুনিক নাটকের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। এই অন্তর্দৃষ্টির যুগে মানুষ বাহিরের বিস্ময় হইতে দৃষ্টি সংহত করিয়া অন্তরের গভীরতর রহস্যের দিকে প্রেরণ করিতেছে। বাহিরের যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা বহিঃপ্রেরণার জন্য অন্তরের বিক্ষোভ যে-পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিতেছে, সেই পরিমাণে অন্তরের নীরবতা এক অপূর্ব্ব রহস্যমণ্ডিত হইয়া নূতন অর্থ-গৌরবে ভরিয়া উঠিতেছে। যাহা তুচ্ছ ও সামান্য, তাহার মধ্যেও অনন্ত রহস্যের সঙ্কেত ও ইঙ্গিত স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। বাঁশীর মধ্যে ফুৎকারবায়ুর ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত নীরব, নিশ্চল পদার্থের মধ্যে একটা গোপন শক্তির আনাগোনা, তাহার মৃদু পদক্ষেপ ও অস্পষ্ট গুঞ্জরণ-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। জীবনের এই অতীন্দ্রিয় রহস্য (mysticism) ও সাঙ্কেতিকতা (symbolism) সর্ব্বপ্রথম গীতি-কবিতার ছন্দে গাঁথা পড়ে। কিন্তু এই লীলাময় বিকাশ যতই সুস্পষ্ট হইতেছে, যতই ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা ছাড়াইয়া সাধারণ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিতেছে, বিশেষতঃ মানব-মন যতই ইহার আনন্দময় ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতূহল অনুভব করিতেছে, ততই ইহা গীতি-কবিতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া নাটকের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের নাট্য-সাহিত্য আমাদের চোখের সম্মুখে সৃষ্ট হইতেছে। ইহাকে symbolical drama বা রূপক-প্রধান নাটক নামে অভিহিত করা হইতেছে। Maeterlinck, Yeats, Synge প্রভৃতি এই নূতন নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই নূতন নাটকের প্রকৃতি সম্বন্ধে Maeterlinck যাহা বলিতেছেন তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, পুরাতন নাটকের সহিত ইহার কি গভীর মূলগত প্রভেদ—

> "I have come to believe that an old man seated in his arm-chair, waiting quietly under the lamp-light, listening without knowing it to all the eternal laws which reign about his house.....bowing his head a little, without suspecting that all the powers of the earth intervene and stand on guard in the room like attentive servants....—I have come to believe that this motionless old man liked really a more profound, human, and universal life than the lover who strangles his mistress, the captain who gains a victory, or the husband who 'avenges his honour'."

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ এই সাঙ্কেতিক নাট্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং এই নূতন নাটকের আদর্শেই তাঁহার নাটকগুলির বিচার করিতে হইবে।

দুই

এই সাঙ্কেতিকতা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটকগুলির মধ্যে ততটা সুপরিস্ফুট নহে। তাহাদের প্রধান বিষয় হইতেছে ধর্ম্মঘটিত বিরোধ, ধর্ম্মের প্রাণহীন সংস্কারের সহিত প্রবুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞানের সংঘর্ষ। এই ধর্ম্মপ্রাণতা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকেরই সাধারণ লক্ষণ; কিন্তু আগেকার নাটকগুলির মধ্যে ধর্ম্মের যে বিচার ও আলোচনা হইয়াছে তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ও হৃদয়-ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তাঁহার মধ্যে রূপকের ভাস্বর আবরণ নাই, সাঙ্কেতিকতার বিদ্যুৎ-বিকাশ খেলিয়া যায় না। হয় ত কোথাও কোথাও এই রহস্যময় ইঙ্গিতের একটা অস্পষ্ট ছায়া লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ছায়াবরণের পশ্চাতে যে গোপন লীলাময় খেলা চলিতেছে তাহার অপরূপ নৃত্য-ভঙ্গীটি আমাদের কানে বাজিয়া উঠে না। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে আসল রূপ তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী নাটকেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং এই সাঙ্কেতিকতার ক্রম-বিবর্ত্তনের দিক্ দিয়াই তাঁহার নাটকগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) প্রকৃতির প্রতিশোধ; (২) মালিনী; (৩) রাজা ও রাণী; (৪) বিসর্জ্জন—এই কয়েকখানি নাটকেই পূর্ব্ব-সাঙ্কেতিকতা (Pre-symbolism) যুগের বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 'অচলায়তনের' স্থান দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি। ইহাতে যদিও রূপকের স্পর্শ আছে, কিন্তু সেই স্পর্শের মধ্যে রহস্যঘন, লীলা-চঞ্চল সুরটি বেশ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশ পায় নাই। ইহার প্রধান বিষয় হইতেছে জরাজীর্ণ, কুসংস্কার-কীট-জর্জ্জর হিন্দু ধর্ম্মের উপর আক্রমণ; এবং এই আক্রমণের মাত্রাধিক্যই রহস্যের সুরটির অবাধ ও সাবলীল প্রকাশে বাধা দিয়াছে। সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে—(১) রাজা; (২) ডাকঘর; (৩) ঋণশোধ বা শারদোৎসব; (৪) মুক্তধারা; (৫) রক্তকরবীকে ফেলা যাইতে পারে। সর্ব্বশেষ নাটক 'নটীর পূজা' অনেকটা সাঙ্কেতিকতা-প্রভাব-মুক্ত ও তাহার মধ্যে সাধারণ নাটকোচিত গুণের অপেক্ষাকৃত অধিক স্ফূরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আদি-যুগের নাটকগুলি অনেকটা সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত। তাহাদের মধ্যে যে-বিরোধের সংঘাত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মূলতঃ অভিন্ন-প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত নাটকেই একই প্রকার সংঘাতের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইয়াছেন—প্রকৃত স্বাধীন ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত প্রতিষ্ঠান-বদ্ধ, আচার-ভার-ক্লিষ্ট ধর্ম্মমতের সংঘর্ষ। আর এই সংঘর্ষের বাহ্যবিকাশ হইয়াছে রাজশক্তির সহিত ব্রাহ্মণ্য-শক্তির তুমুল প্রাণপণ সংগ্রামে। রবীন্দ্রনাথ মোটের উপর রাজশক্তিকে স্বাধীন ধর্ম্মজ্ঞানের অনুকূল ও ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে প্রাণহীন ধর্ম্মান্ধতার দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে দেখাইয়াছেন। আবার নাটকীয় সংঘাতকে ঘনীভূত করিবার জন্য এই দুই প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে একটা

আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও ভেদের অবতারণা করিয়াছেন। 'বিসর্জ্জনে' রাণী ধর্ম্মান্ধ পুরোহিতের দলে যোগ দিয়া রাজার কর্ত্তব্য-পালনকে দুঃসাধ্যতর ও তাঁহার মনোবেদনাকে গভীরতর করিয়া দিয়াছেন; আবার পুরোহিত-পক্ষীয় জয়সিংহ তাহার চিত্তসংশয় ও গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা রঘুপতির লৌহমুষ্টিকে কতকটা শিথিল ও তাহার দর্পিত বিজয়-শ্রীকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। রাজকন্যা মালিনীর সুকুমার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংস্কারগত সনাতন ধর্ম্মমতের যে-বিরোধ তাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল বটে; কিন্তু চিরসুহৃৎ ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের যে মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটিল তাহাই নাটকখানিকে ট্রাজেডির রক্ত-রাগে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া গেল। 'রাজা ও রাণী'তে বিরোধের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র; রাজা বিক্রমদেবের অভিমান-ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত প্রেমপিপাসার সাংঘাতিক বিজিগীষায় পরিবর্ত্তনই ইহার মুখ্য ব্যাপার; কিন্তু বিক্রম ও তাহার প্রতিযোদ্ধা কুমারসেনের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, রাণীর বিরুদ্ধে রাজার মর্ম্মান্তিক অভিমানই তাহার ফিকে রং-এর উপর এক গাঢ়তর বিষাদ-কালিমা লেপন করিয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'ও কেন্দ্রস্থ বিরোধ-কাহিনীটি একটু নূতন রকমের—একজন উদাসীন, সংসারের প্রতি জাতক্রোধ, মোহমুক্ত সন্ন্যাসীর সংসারের স্নেহ-মায়া-মমতার নিকট আত্মসমর্পণ। এখানে দ্বন্দ্বটি সম্পূর্ণরূপেই অন্তরের, কোন বহিঃশক্তির সহিত সংঘাত ইহার মধ্যে নাই।

এই সমস্ত প্রথম যুগের নাটকের মধ্যে নাটকোচিত গুণের কতখানি বিকাশ হইয়াছে, ইহার আলোচনা করিতে গেলে কোন্ আদর্শে ইহাদের বিচার হওয়া উচিত, তাহাই সর্ব্বপ্রথম নির্দ্ধারণীয়। একদিকে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁহার নাটকগুলিকে সাধারণ নাটকের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চাহেন নাই। উহার সুনির্দ্দিষ্ট অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক-সংবলিত 'ঘন-পিনদ্ধ কায়া', তাঁহার মনের মধ্যে যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ ডানা মেলিয়া আছে, তাহাকে লৌহপিঞ্জরবৎ পীড়িত করিয়াছে। তাঁহার সমস্ত নাটকেই একটা শিথিল, স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত গঠন আছে। তাঁহার লেখার গীত-ধর্ম্মের অতি-প্রাধান্য যে অন্যান্য গুণকে অনেকটা হ্রস্ব ও সঙ্কুচিত করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং খাঁটি নাটকের চির-প্রথাগত আদর্শ অনুসারে উহাদিগকে বিচার করিতে গেলে উহাদের প্রতি বোধ হয় সুবিচার করা হইবে না। আবার পক্ষান্তরে নাটকের একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, যাহাকে বিসর্জ্জন দিলে নাটকের বাহ্যরূপ অবলম্বন করার কোনই সার্থকতা থাকে না। গীতি-প্রতিভা যতই উজ্জ্বল ও প্রচুর হউক না কেন, তাহা নাটকীয় গুণের অভাব পূরণ করিতে পারে না। নাটকের পাত্র-পাত্রীর নিয়ন্ত্রিত কথোপকথনের দ্বারা এমন একটি তীব্র, ঘন বিরোধের ভাব ফুটাইতে হইবে যাহা গীতিকাব্যের স্বতঃ-উৎসারিত একটানা প্রবাহের মধ্যে মিলে না। সেইজন্য 'কর্ণ ও কুন্তী' ও 'কচ ও দেবযানী' নাটকের বাহ্যলক্ষণাক্রান্ত হইলেও ইহাদিগকে নাটক বলিয়া ভুল করা যায় না। নাটকের মধ্য দিয়ে একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ঘনীভূত নির্য্যাস পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেই হইবে, যেখানে ইহার অভাব, সেখানে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বিরোধের প্রকৃতি এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক নাটকে পূর্ব্বের মত সমুদ্র-মন্থন, দেবাসুরের তুমুল সংগ্রাম, দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধের অবসর না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একটা নূতন ধরণের খেলা, প্রাণের মধ্যে একটা নূতন শক্তির আনাগোনা, একটা নূতন রহস্যময় অতিথির লঘু পাদসঞ্চার, একটা নব পরিচয়ের নিগূঢ় আবেগ ও উন্মাদনা দেখাইতে হইবে। সাঙ্কেতিক নাটকে পূর্ব্বকালের যুদ্ধের পরিবর্ত্তে এই নূতন খেলার নৃত্যটি ফুটাইয়া তোলা হয় বলিয়া তাহার নাটকরূপে পরিচিত হইবার দাবী স্বীকৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নাটকগুলির মধ্যে এই কেন্দ্রস্থ ভাবটির—তাহা বিরোধই হউক বা নব-পরিচয়ের প্রাণস্পন্দনই হউক—অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ভাবটি কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর উহাদের নাটকীয় উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে। তিনি নাটকের বাহ্য অবয়ব ইচ্ছাপূর্ব্বকই বর্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সমালোচককেও ইহাকে গৌণ অঙ্গ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘন ও গীতিকাব্যসুলভ আতিশয্যের মধ্যে নাটকীয় মূল সূত্রটি পাওয়া যায় কি-না তাহার জন্য সমস্ত দৃষ্টিশক্তি ও বিচারবুদ্ধি জাগ্রত রাখিতে হইবে।

তিন

এইবার নাটকগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ কবির প্রথম বয়সের রচনা। যে অস্বাস্থ্যকর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার প্রথম কবিতাগুলির মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা এই নাটকেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ইহার নাটকোচিত গুণ খুব সামান্য। ইহাতে চরিত্র একটিমাত্র, এবং তাঁহার উক্তিগুলিও সমস্ত একতরফা। প্রকৃতির উপর সন্ন্যাসীর অভিমান ও বালিকার স্নেহ-আকর্ষণের মধ্যে যে-সংঘাত, তাহার মধ্যে নাটকীয় রূপ ও তীব্রতার একান্ত অভাব। অবশ্য সন্ন্যাসীর মনের পরিবর্ত্তন-স্তরগুলি সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও নাটক এক নহে। বাহিরের যে ঘাত-প্রতিঘাতে এই মানসিক পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল, তাহার কোন স্পষ্ট লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাস্তবজীবনের যে-কয়েকটি ছবি সন্ন্যাসীর মনোবিকারের হেতু-স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা অসংলগ্ন ও স্বল্পপরিসর, কোন উচ্চতর ঐক্যসূত্রে বদ্ধ হয় নাই। স্থানে স্থানে আশ্চর্য্য কবিত্বের উচ্ছ্বাস থাকিলেও ভাষা মোটের উপর অপরিপক্ব ও নাটকের অনুপযোগী। সেইজন্য মনে হয় যে, লেখক বিষয়-নির্ব্বাচনে নাটকোচিত সম্ভাবনার সন্ধান করেন নাই, ভাষার উপর অধিকার ও প্রকাশক্ষমতা পরীক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

‘মালিনীতে’ও নাটক অপেক্ষা গীতি-কাব্যেরই লক্ষণ অধিক সুপরিস্ফুট। বইখানি আগাগোড়া মিত্রাক্ষর-ছন্দে রচিত বলিয়া মনে হয় যে, কবি ইহাকে নাটকের রূপ দিতে চেষ্টাই করেন নাই—ইহা যেন ‘কচ ও দেবযানী’ বা ‘কর্ণ ও কুন্তী’র বৃহত্তর সংস্করণ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি প্রায় পূর্ণবিকশিত হইয়াছে—ভাষার জড়তা ও দৈন্য সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়া একটা পূর্ণ প্রবাহের জোয়ার আসিয়াছে। কিন্তু কোন নাটকীয় প্রতিবেশ রচনা বা নাটকোচিত গুণের বিকাশের দিকে কবি একেবারেই উদাসীন। মালিনী, রাজা, রাণী ইত্যাদি কেহই নাটকের পাত্র-পাত্রী বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় না। তাহাদের নিজ বক্তব্যটি তাহারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে অনবদ্য কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু নাটকের ন্যায় একের উক্তি অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার কোন লক্ষণই নাই। এক ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের সম্পর্কের মধ্যে সামান্য একটু নাটকোচিত গ্রন্থিজাল পড়িয়াছে, কিন্তু সে-সমস্যা অতি সামান্য ও তাহার সমাধানও খুব সুলভ। ‘মালিনী’তে গীতি-কাব্যেরই সম্পূর্ণ প্রাধান্য, নাটকের বাহ্যরূপ তাহার অত্যন্ত স্বচ্ছ ছদ্মবেশ মাত্র। কবি যেন তাঁহার কাণায়-কাণায়-পূর্ণ গীতিশক্তির একটা অনাবশ্যক তরঙ্গ নাটকের শুষ্ক খাত দিয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন—নাটকের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বলিয়া নয়, একটা নবলব্ধ শক্তির উচ্ছ্বসিত বাধা-বন্ধহীন আনন্দে।

‘বিসর্জ্জন’ ও ‘রাজা ও রাণী’ এই দুইখানি পূর্ণাবয়ব পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং ইহাদের মধ্যে নাটকের রীতি-নিয়ম যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে পালন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দুইটিতে কবি নাটকের

সূক্ষ্ম বিধি-নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে নিজ মুক্ত-স্বাধীন কবিপ্রতিভাকে আবদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাদিগকে নাটকীয় আদর্শে বিচার করা অন্যায় হইবে না। ইহাদের মধ্যে ‘বিসর্জ্জন’ নাটকটি অনেকটা কবির নিজ অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য জনসমাজে অধিকতর পরিচিত।

রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরোধের যে ক্ষীণ আভাষ ‘মালিনীতে’ পাওয়া যায় তাহা এখানে নাটকোচিত পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য পরস্পরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী; তাহাদের ইচ্ছাশক্তির পরস্পর সংঘাতে যে দাহ ও দীপ্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা নাটকীয় রূপ ধারণের উপযুক্ত—কেবল গীতি-কবিতায় তাহার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়। ক্ষেমঙ্কর যে-বিদ্রোহ গীতি-কাব্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে, রঘুপতিতে তাহা একেবারে উদ্দাম হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও কার্য্যক্ষেত্রে তাহার তীব্র অভিব্যক্তি হইয়াছে। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বটি নাটকের পক্ষে যথেষ্ট প্রবল ও ব্যাপক—বাস্তবিকই একটা গভীর অন্তর্বিপ্লবে তাহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইতেছে, ইহা আমরা অনুভব করি। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে’ সন্ন্যাসীর অনির্দ্দিষ্ট ও অস্পষ্ট ক্ষোভ এখানে কায়া ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং-নাটকীয় উপাদান ও প্রচেষ্টা ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কিন্তু তথাপি নাটক হিসাবে ইহা খুব উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর উক্তিগুলি অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ ও বাহুল্য-দুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাটকোচিত সংযম ও অর্থপূর্ণতার অভাব। জয়সিংহের স্বগতোক্তিগুলিতে বিশেষভাবে এই দোষ লক্ষিত হয়। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের শান্ত অটল তেজস্বিতা ও স্নেহসিক্ত ন্যায়নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেমন, নাটকে ততটা ফুটিয়া উঠে নাই। রাজা ও নক্ষত্ররায়ের মধ্যে তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে যে-কথোপকথন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান ছিল; কিন্তু লেখক সেই উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তারপর নাটকের ঘটনা-বিন্যাস মোটের উপর খুব উপযোগী হয় নাই। কোন কোন দৃশ্য অযথা ভারাক্রান্ত হইয়াছে, আবার কোথাও বা শূন্যগর্ভ গীতিকাব্যোচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস। অপর্ণা ‘প্রকৃতির প্রতিশোধের’ অনাথা বালিকার আর-একটু উন্নততর সংস্করণ; কিন্তু তাহা অবিমিশ্র, একটানা খেদবাণী নাটকের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় নাই। লেখকের ভাষা গীতি-কাব্যের দিক্ দিয়া বেশ কবিত্বপূর্ণ হইলেও নাটকের দমকা হাওয়ায় ও মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার পক্ষে যেন যথেষ্ট লঘু ও স্বচ্ছন্দগতি নয়। রবীন্দ্রনাথের যে নাটকের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না, তাহা বুঝিতে গেলে তাঁহার রাজর্ষি উপন্যাসের সহিত ‘বিসর্জ্জন’ নাটকটির তুলনা করিলেই চলিবে। উপন্যাসে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত মাধুর্য্য ও কোমলতা ঢালিয়া দিয়াছেন; নাটকের অপরিচিত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা যেন অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া খণ্ডিত ও প্রতিহত হইয়াছে। রাজার যে অবিকল্প মূর্ত্তিটি উপন্যাসে জ্বলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নাটকে যেন তাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও হীনপ্রভ। উপন্যাসটি তাঁহার ডান হাতের লেখা ও নাটকটি যেন বাঁ হাতের লেখা বলিয়া মনে হয়।

‘রাজা ও রাণী’ রবীন্দ্রনাথের অ-সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া মনে হয়। ইহাতে নাটকীয় অবসরও অনেক; কবি এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটা প্রকৃত tragic sense একটা প্রতিকূল দৈবের ক্ষমাহীন বিরোধের ভাব অনুভব করা যায়। বিক্রমদেবের মানসিক পরিবর্ত্তন বেশ নিপুণভাবে ও যথেষ্ট হেতুবাদের সহিত সাধিত হইয়াছে। সুমিত্রার পতিগৃহ হইতে পলায়ন, খুব সাধারণ ঘটনা হইলেও, এমন একটা দুশ্ছেদ্য জটিলতাজালের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা মোচন করিতে কুমার ও সুমিত্রার শোচনীয় আত্মবলিদানের প্রয়োজন হইয়াছে।

অপ্রধান চরিত্রগুলিও বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছে, লেখক যেন দুই-একটি কথাবার্ত্তার দ্বারাই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটাইতে পারিয়াছেন। কুমারের পরিণাম নিয়তি-নিষ্পেষণের একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত। তাহার সবই ছিল—অপরিমেয় প্রেম, প্রজা ও সৈন্যদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ক্ষাত্রশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু ভাগ্যের অগ্নিপরীক্ষায় এ সমস্তই দুর্ব্বার বন্যাস্রোতে বালির বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া গেল। আর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার নিজের মহত্ত্বই তাহার নিজের মাথার উপর দুর্ভাগ্যের বজ্রকে ডাকিয়া আনিল। ভগিনীর অনুরোধে ও ভগিনীপতির সাহায্যার্থেই তাহার প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ; কিন্তু এই উদার স্নেহশীল ব্যবহারের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। তারপর আমরা ইহাও অনুভব করি যে, যদি কুমার নিজের ধীর প্রবৃত্তির রাশ ছাড়িয়া দিয়া কাশ্মীরের বহির্দ্দেশে বিক্রমদেবের সহিত রণক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় বিক্রমের অন্ধ হিংসা ও রোষানল সহজেই নির্ব্বাপিত হইত। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তেই সে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমা ও মৈত্রীর বাণীতে কর্ণপাত করিল, সেই মুহূর্ত্তেই আপন সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। আবার ইলার সহিত বিবাহ অসম্পূর্ণ রাখিয়া যুদ্ধযাত্রা করা তাহার উদার প্রকৃতির আর-একটি সাংঘাতিক ভুল। কেননা বিবাহ তাহার ভাবী শ্বশুর অমরুরাজের দুর্ব্বল, সংশয়সমাকুল চিত্তকে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বনাশের অন্ততঃ একটা ছিদ্রপথও বন্ধ রাখিতে পারিত। সেইজন্য কুমারের অনপরাধের শাস্তি আমাদিগকে কর্ডেলিয়া বা হ্যামলেটের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উদার হৃদয়ে ঔদার্য্যজনিত যে-দুঃখ তাহাই ট্রাজেডির প্রকৃত উপজীব্য।

অন্যান্য দিক্ দিয়াও নাটকটির অনেক উন্নতি দেখা যায়। ঘটনা-বিন্যাস মোটের উপর প্রশংসার্হ, তবে পঞ্চম অঙ্কটিকে পুঞ্জীভূত ঘটনার চাপে অযথা ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে; ইহার কিয়দংশ চতুর্থ অঙ্কে সন্নিবেশ করিলে নাটকের গঠন-সামঞ্জস্য আরও উন্নতিলাভ করিত। গ্রাম্য লোকের চরিত্র 'বিসর্জ্জনে'ই অধিকতর নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, কেননা ধর্ম্মমোহ তাহাদের চরিত্রের একটা প্রধান অঙ্গ; 'রাজা ও রাণী'র গ্রাম্য লোকদের সেরূপ কিছু বিশেষত্ব নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি দেখা যায় ভাষার দিক্ দিয়া—ভাষার মধ্যে কবিত্ব ও নাটকোপযোগিতা উভয় গুণই একসঙ্গে রক্ষিত হইয়াছে। 'বিসর্জ্জনে'র আতিশয্য ও অনুচিত দৈর্ঘ্য নাটকের প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহার স্বচ্ছ ওজস্বিতা ও পরিমিতির ভিতর দিয়া নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর অন্তরের আবেগ প্রতিফলিত হইয়াছে। যদিও ইহাতে খুব উচ্চ অঙ্গের নাট্য-প্রতিভার পরিচয় নাই, যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পর্শের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার মানবহৃদয়ের গভীর অন্ধকার তলদেশে আকস্মিক আলোক-রেখা পাত করেন, তাহা বিরল, তথাপি কবিত্বপূর্ণ সুগঠিত নাটকের মধ্যে ইহার স্থান উচ্চে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

চার

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে 'অচলায়তনে' সাঙ্কেতিকতার প্রথম সূত্রপাত। ইহাতে তিনি চিরপ্রথাগত নাটকের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া সাঙ্কেতিকতার গহন পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন। পূর্ব্ব নাটকের সহিত ইহাদের বিষয়গত প্রভেদ যে খুব বেশী তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মপ্রবণ মন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই উদ্দেশ্যের অনুসরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে—ধর্ম্মের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান হইতে ইহার প্রকৃত রূপটির পৃথকীকরণই তাঁহার জীবনের ব্রত। কিন্তু এখন হইতে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে তাঁহার কবিতায় যেমন, নাটকেও তেমনি একটা নূতন পন্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এখন তিনি ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী তত্ত্বকথায় প্রকাশ না করিয়া হৃদয়ের একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি, একটি

সূক্ষ্ম, অপরূপ স্পর্শের মত দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। রঘুপতি ও রাজা গোবিন্দমাণিক্য, ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় ধর্ম্মের আদর্শ ও স্বরূপ সম্বন্ধে ও পরস্পরের মত্ যুক্তিতর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এখন হইতে লেখক যুক্তিতর্কের পথ বর্জ্জন করিয়া ঠাকুরদাদার মত সরল আনন্দময় বৃদ্ধ, অমলের মত স্বচ্ছ অনাবিল-দৃষ্টি বালক, সুরঙ্গমার মত হীন অথচ ভগবৎ কৃপায় ধন্যা নারী প্রভৃতির অনুভূতির মধ্য দিয়া ভগবানের রহস্যময়, অথচ নিঃসন্দেহ আবির্ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের নিকট ভগবান অনধিগম্য, অপ্রাপণীয় নহেন; উপনিষদের 'যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে' ইঁহার প্রতি প্রযোক্তব্য নহে। ইনি ইহাদের একান্ত আত্মীয়, অত্যন্ত নিকট; ইঁহার স্পর্শ বসন্তপবন-হিল্লোলের মত ইহাদের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়; চারিদিকের আকাশ-বাতাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ইঁহার আভাস ও ইঙ্গিতে পূর্ণ; ইঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব ইহাদের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে নিজ নিঃশব্দে পদসঞ্চারের ছাপ রাখিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই সন্দেহ-সঙ্কুল, অবিশ্বাসী যুগের মধ্যে ব্রজলীলার পুনরাভিনয় ঘটাইয়াছেন—অথচ বর্ত্তমান চিন্তা-ধারার সহিত ইহার কোন অসামঞ্জস্য নাই। এখানে পৌরাণিক যুগের অতিপ্রাকৃত বা ভগবানের অত্যন্ত স্থূলদেহ ধারণ আমাদের বিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করে না। বিজ্ঞান আমাদের সনাতন মন্দিরগুলি বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ও পুরাতন বিগ্রহগুলি চূর্ণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ইহাদের সহিত সহমরণে যায় নাই। ভগবান তাঁহার পুরাতন আশ্রয়চ্যুত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন ও নূতন উপায়ে ভক্ত হৃদয়ের সহিত সম্পর্কস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন পূজার উপাসক ও এই নতূন মন্ত্রকে বাণী দিয়াছেন—ভগবানের সহিত মানব-মনেন মিলনের এই অবিনশ্বর আকাঙ্ক্ষাকে, আনন্দ-উপলব্ধি ও ব্যাকুল প্রতীক্ষার মধ্য দিয়া, নাটকীয় রূপ দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নাটকের মধ্যে ভগবানের স্বরূপটি, নীরস তত্ত্বকথায় নহে, সরস লীলা-মাধুর্য্যে, মানব-মনের সহিত বিচিত্র, চঞ্চল ঘাত-প্রতিঘাতে, যতই সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে, ততই নাটক হিসাবে তাহাদের সার্থকতা ও উৎকর্ষ এবং এই দিক দিয়াই তাহাদের নাটকীয় গুণ সম্বন্ধে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

'অচলায়তনে'র রূপক খুব সুস্পষ্ট নহে; বিদ্রূপাত্মক আক্রমণের তলে ইহা চাপা পড়িয়াছে। কবি ভগবানের স্বরূপটি ফোটান'র পরিবর্ত্তে যে জীর্ণ প্রাণহীন আচার-সংস্কারের বোঝা ভগবান্‌কে অধিকাংশ চিত্ত হইতে আড়াল করিয়াছে তাহাদের বর্ণনাতেই অধিক জোর দিয়াছেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপ যে সাহিত্যিক অস্ত্রশালার একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু নাটকের ভিত্তি খুঁড়িবার কাজে ইহার যে কতটা উপযোগিতা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। যে-সমস্ত যুক্তিহীন সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল হইয়াছে, তাহারা নিজ বার্দ্ধক্যের ভারে ও যুগধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রভাবে জীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রবন্ধে ও কবিতায়, উপন্যাসে ও তত্ত্বালোচনায় চারিদিক হইতে তাহাদের উপর যে তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হইয়াছে, তাহাতে একেবারে অমর না হইলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। এরূপ অবস্থায় আবার নাটকের পৃষ্ঠায় তাহাদের বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধক্ষেত্র রচনা অনেকটা বৃথা শক্তি-ব্যয় বলিয়াই মনে হয়। সে যাহা হউক, এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রাধান্য নাটকখানির উৎকর্ষের হানি করিয়াছে। অনেক অংশ caricature বা অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গ-চিত্র বলিয়াই ঠেকে। আর যোদ্ধৃবেশমণ্ডিত দাদাঠাকুরকে ভগবানের সম্পূর্ণ প্রতীক্ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের মন সায় দেয় না। অনার্য্য অন্ত্যজ জাতির নেতৃত্ব ও প্রীতি-সাহচর্য্য ঐশী লীলার একটা দিক্ হইতে পারে; এবং অচলায়তনের বল্মীকাচ্ছন্ন প্রাচীর ধ্বংসও তাঁহার অন্যতম যোগ্য কীর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ইহারা কি ভগবানের রহস্যমণ্ডিত মহৈশ্বর্য্যময় চরিত্রের উপযুক্ত

নিদর্শন? দাদাঠাকুরের সরল খেলাধূলার মধ্যে অগ্নিগর্ভ মেঘের ন্যায় কোন গোপন মহিমার বিদ্যুৎ বিকাশ দেখা যায় না। কেবল আচার্য্য অদীনপুণ্যের দ্বিধাজড়িত চিত্তের মধ্যে দীর্ঘ অপরিচয়ের জন্য বিস্মৃত-প্রায় আদি-ধর্ম্ম গুরুর আগমনের যে ক্ষীণ শঙ্কিত পূর্ব্বাভাস রহিয়া রহিয়া জাগিয়া উঠে তাহাই ভগবৎ-প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলিয়া আমরা অনুভব করি; কিন্তু এই অভিব্যক্তিটি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হয় নাই।

'ডাকঘরের' রূপকটি একটু জটিল। অমলের কৌতূহল ও সরল বিশ্বাস শৈশবের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক সুস্থমনা শিশুর মধ্যেই অমলের ন্যায় সুদূর অপরিচিত জগতের প্রতি একটা প্রবল, মোহময় আকর্ষণ আছে—নীল মায়া-ঘেরা দূর দিগন্ত তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। আবার শৈশবকালে ভগবানের সহিত আমাদের এমন একটা ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ যোগ থাকে, যাহাতে ভগবানের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধাত্মক বিচিত্র বাণী আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সোজা পৌঁছিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তের পক্ষে সেই যোগসূত্র অনেকটা শিথিল ও ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই বিচিত্র-সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীটাই একটা প্রকাণ্ড ভগবানের ডাকঘর। এখানে হইতে দিকে দিকে অসংখ্য চিঠি প্রেরিত হইতেছে, অধিকাংশই আমাদের স্থূল, অনুভূতিহীন হৃদয় হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, কতিপয় মাত্র ভাগ্যবান সেই চিঠি খুলিয়া পড়িয়া তাহার বাণীটি হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী হইতেছে। অমল তাহার শিশু-হৃদয়ের সমস্ত সরলতার সহিত বিশ্বাস করিতেছে যে, ভগবান তাহার নামে চিঠি পাঠাইবেন, এবং এই বিশ্বাস নিজ গভীর আন্তরিকতায় নিজ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। ইহাই হইল রূপকের মোটামুটি ব্যাখ্যা; কিন্তু ইহার অন্তরালে আরও একটি গভীরতর সাঙ্কেতিক অর্থের প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব যেন অনুভব করা যায়। অমলের রোগটা কি, যাহা লইয়া পৃথিবীর কবিরাজ ও রাজ-কবিরাজের ব্যবস্থার এত গভীর অনৈক্য হইয়াছে? এই রোগ বোধ হয় মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকার—that disease called life. সংসার এই রোগ-প্রতিকারের জন্য যে-ব্যবস্থা করে তাহার মূলনীতি হইতেছে জীবনের সমস্ত প্রত্যক্ষ, গভীর অনুভূতির পথগুলি বন্ধ করা, যাহাতে অসীমের রাজ্য হইতে আমাদের রুদ্ধদ্বার জীবন-যাত্রার পথে একটিও আলোক-রেখা প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন। যে চঞ্চল হাওয়া আমাদিগকে সাধারণ জীবন যাত্রার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে অনন্তের পথে উধাও করিবার চেষ্টা করে, আমাদের সমস্ত সাংসারিক জ্ঞান ও বিষয়-বুদ্ধি সে মাদক হাওয়াকে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহে। রাজ-কবিরাজ, মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে আসিয়া, এই সমস্ত বাধাবন্ধনকে খুলিয়া দেন; এবং এই জীবন-ব্যাধির চরম চিকিৎসা ও আরোগ্য হইতেছে মৃত্যু—যে আমাদের ভগবানের সহিত পরিচয়ের রুদ্ধদ্বারগুলিকে আবার খুলিয়া দেয় ও জগতের সহিত আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার সাধন করে। সুতরাং 'ডাকঘর' নাটকটি কেবল শিশুচিত্তের নয়, সমস্ত মানব-জীবনেরই রূপক।

কিন্তু নাটক হিসাবে যে-সুরটি সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহা বালক অমলের অদম্য কৌতূহল, অপরিচিতের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ ও অধীরতা। তাহার রোগ-ক্লিষ্ট মনে এই আগ্রহটি অত্যন্ত করুণ, অসহায় সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। এই সুরের মধ্যে কোন নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নাই বলিয়া ইহা গীতি-কবিতার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। অমলের রোগ কি তাহা না বুঝিলে ক্ষতি নাই—এমন-কি চিকিৎসকদের ব্যবস্থার অর্থবোধও অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু শিশুচিত্তের ব্যাকুল, করুণ পিপাসা সমস্ত নাটকটিকে প্লাবিত করিয়া পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এখানে নাটক নিজ বিশেষত্ব হারাইয়া গীতি-কাব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে।

কিন্তু তবুও মনে হয় যে, ব্যাকুলতার সুরটি নাটকের কথোপকথনের মধ্য দিয়া যেরূপ ফুটিয়াছে গীতি-কবিতায় সেরূপ ফুটিতে পারিত না।

'ঋণ-শোধ' বা 'শারদোৎসব' সেইরূপ বালক-মনের আনন্দোচ্ছল আত্ম-বিহ্বল ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া শরতের দিগন্ত-বিস্তৃত আনন্দরসের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের চেষ্টা। এই মত্ত আনন্দ-প্লাবনের নিকট নাটকের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভাগীরথী-তরঙ্গে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। যে দুই-একটি ক্ষীণ বিদ্রোহের সুর মাথা তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহারাও এই দুর্ব্বার আনন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। লক্ষেশ্বরের সমস্ত অর্থতৃষ্ণা ও সতর্কতার মর্ম্ম ভেদ করিয়া এই আনন্দ একটা অতৃপ্ত বেদনার কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়াছে। বালক উপনন্দের কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপর শরতের এক ঝলক সোনালি রৌদ্র পড়িয়া তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত আনন্দের রং-এ রাঙ্গাইয়া দিয়াছে। ঠাকুরদাদা, কবিশেখর, সম্রাট্ বিজয়াদিত্য সকলেই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর আহ্বানে শরৎ-প্রকৃতির আনন্দনির্ঝর হইতে আপন আপন মন ভরিয়া লইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। চারিদিকে কি পুলক-প্লাবন, কি গানের ফোয়ারা, কি আলো-ঝলমল নীল আকাশ! প্রকৃতির যে অদৃশ্য শক্তি হইতে শেফালির শুভ্র হাসি দিকে দিকে পুঞ্জীভূত হয়, পদ্মের অম্লান-শ্রী শ্বেতছত্রের মত বিস্তারিত হয়, নির্ঝর আনন্দ-নৃত্যে ছুটিতে থাকে, সেই গূঢ় প্রাণরসের কিয়দংশ কবির মনে সঞ্চারিত হইয়া এই নাটকে অপূর্ব্ব শোভাসম্পদে বিকশিত হইয়াছে—নাটকের এক-একটি গান যেন তাহার এক-একটি পাপড়ি। এই আনন্দ-প্লাবনের আত্মবিস্মৃতিতে নাটক তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছে—শেলির Prometheus Unbound-এর চতুর্থ অঙ্কের ন্যায় ইহা একটি rhapsody-তে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টি-রহস্যের একটা দিক্ কবির নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আনন্দ-কুঠারির চাবিটি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। 'শারদোৎসব' নাটক নহে,—কিন্তু বহির্জগতের আনন্দ মনের গূঢ় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অন্তর-জগতে চোয়াইয়া লওয়ার মধ্যে যদি কোন নাটকীয় গুণ থাকে, তবে সে-গুণের ইহা পূর্ণমাত্রায় অধিকারী।

'শারদোৎসবে'র মধ্যে কোন বিশেষ রূপক নাই। যে-হিসাবে মানবজীবন অনন্ত জীবনের ইঙ্গিত করে, বা প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভগবানের রূপের কিঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, সেই হিসাবে 'শারদোৎসবে'র শরৎ-শ্রীর মধ্যে আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করা যায়। শরতের সমস্ত আলো হাসি, গান যে এক অফুরন্ত আনন্দধারার উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে তাহারি সঙ্কেত মিলে বলিয়া নাটকখানিকে সাঙ্কেতিক বলা যাইতে পারে।

সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান 'রাজা' বা রবীন্দ্রনাথের নূতন নামকরণানুসারে 'অরূপ-রতন' নাটকেরই প্রাপ্য; অন্য কোন নাটকেই সাঙ্কেতিকতার রহস্য এত তীব্র, ব্যাপক ও অর্থপূর্ণভাবে প্রকটিত হয় নাই। ভগবানের ভীম-কান্ত রূপ আর কোথাও এরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত, এরূপ রহস্যময় আভাস-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া, যাথার্থ্যের এরূপ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। এই সাঙ্কেতিকতা প্রতি ছত্র, প্রতি দৃশ্য হইতে একটা অদৃশ্য পুষ্পের গন্ধসারের মত উত্থিত হইতেছে। ভগবানের সহিত মানুষের বোঝাপড়ার যতগুলি বিভিন্ন স্তর আছে, সমস্তগুলিই এই নাটকে আশ্চর্য্য ব্যঞ্জনাশক্তি ও সুসঙ্গতির সহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাণী সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে রাজার সাক্ষাৎ পান—ভগবানের সহিত ভক্তের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় না। এক ঘন রহস্যময় যবনিকার অন্তরাল হইতেই ভগবান নিজ আবির্ভাবের আভাস দেন—সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদার মত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা নিজ সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও স্বচ্ছ অনুভবশক্তির বলে এই আভাস উপলব্ধি করিতে

পারেন। প্রকৃতির যে অসংখ্য বিচিত্র রূপ আছে তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভগবানকে দেখিবার নিমিত্ত মানব-মনের একটা ব্যাকুল আগ্রহ আছে—এই মূর্ত্তি একদিকে মানুষকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে ইহার ভয়াবহ রহস্য তাহার মনে একটা ভীতির সঞ্চার করে। রাণীর মনে এই দুইটি ভাবের সংঘাতটির প্রতি অতি সুন্দরভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ভগবানের আর-একটি গুণ অতি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে—তাঁহার grand impersonality, তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্ববিলোপ। ভগবান চিরকাল আত্মগোপন করিয়া সকলকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন—কাহারও স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই একটা সন্দেহ জাগে—সময় সময় রাজ্যকে সম্পূর্ণ অরাজক বলিয়া ভ্রম হয়। তার পর তাঁহার অদর্শনের সুযোগ লইয়া অনেক ভণ্ড ভগবানের বেশে বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয়কে প্রতারিত করে। আবার সম্রাটের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীর ক্ষুদ্র সামন্ত রাজগণ নিজেদের অধিরাজত্ব তারস্বরে ঘোষণা করিতে ক্রটি করে না। অপরিণত-বুদ্ধি অনধিকারী ভগবানের নগ্নরূপ দেখিতে গিয়া তাঁহার 'ধূমকেতুমিব কিমপি করালং' রূপ দেখিয়া ভয়ে ও বিতৃষ্ণায় পিছাইয়া আইসে। অভিমান-মেঘ ভক্তিপ্রবণ চিত্তকে আবৃত করিয়া মিলনের পথে দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে। এইরূপে ভগবানের গৌরবময় মূর্ত্তিকে অন্তরাল করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটা ঘোরতর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু ক্ষীণ কুহেলিকার মধ্য দিয়া সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় ভগবানের ভাস্বর-রূপ সমস্ত সংশয়-জালের পিছনে আপনাকে অনিবার্য্য তেজে প্রকটিত করে। ঈশ্বরের এই লোকোত্তর, সংশয়-নিরসনকারী, ভাস্বর মহিমা, যাহা মানুষের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার, অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা-বিদ্রোহের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দীপ্ততেজে বিচ্ছুরিত হয়—তাহাই সাঙ্কেতিকতার আশ্চর্য্য নিপুণ প্রয়োগে এই নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রূপকের দিক্ দিয়া ভগবানের যে-মূর্ত্তি-ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে তাহা আমাদের কল্পনা ও ভক্তির উচ্চতম দাবী মিটাইতে সক্ষম। সাঙ্কেতিকতার দিক্ দিয়া ইহার প্রত্যেক ইঙ্গিতটি গোপন অর্থের আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে; সাধারণ কথার স্বচ্ছ ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া ভগবানের রহস্যমণ্ডিত মহিমার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র নাটক হিসাবেও ইহার স্থান খুব উচ্চে। রাণীর সমস্ত চিত্তক্ষোভ—তাঁহার রাজাকে আলোতে দেখিবার ব্যাকুলতা, অদম্য আগ্রহ, চিনিতে অক্ষমতা ও তজ্জনিত লজ্জা, রাজার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিবার পর বিমুখতা ও বিতৃষ্ণা, স্বয়ংবরপ্রার্থী রাজগণ কর্ত্তৃক নিপীড়ন ও অবমাননা, রাজার প্রতি ঘোরতর অভিমান, এবং সর্ব্বশেষে অভিমান-গলানো, সর্ব্বত্যাগী, শান্তিময় প্রেম—এ সমস্তই নাটকোচিত উজ্জ্বল বর্ণে ও প্রবল আবেগের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। নাটকের কোন পাত্র-পাত্রীকেই রূপকের ছায়া বলিয়া মনে হয় না—সকলেই সজীব, রক্তমাংসের মানুষ। এমন-কি রাজার মুখে যে-সমস্ত কথা আরোপিত হইয়াছে তাহাও ঐশীমহিমার অনুপযুক্ত মনে হয় না। রাজগণ, নাগরিকগণ, ঠাকুরদাদা প্রভৃতি সকলেই আপন আপন চরিত্রানুরূপ কার্য্য করিয়াও কথা বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলেরই বাক্য ও কার্য্য এক নিগূঢ় শক্তি-নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহাদের সাধারণ অর্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইয়াছে। ভগবান মানুষকে লইয়া যে-খেলা খেলেন, নাট্যকারও তাঁহার সৃষ্ট-চরিত্রগুলি লইয়া প্রায় তদনুরূপ খেলাই খেলিয়াছেন—জোর করিয়া গতি ফেরান নাই, দূর হইতে অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, নাটকের স্বাধীন গতি নষ্ট না করিয়া তাহার মধ্যে ঐশীশক্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন। সাঙ্কেতিক নাটকের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কৃতিত্ব আর কি হইতে পারে?

পাঁচ

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিকতা পূর্ব্ব-সীমা ছাড়াইয়া এক নূতন রাজ্যে, আধুনিক সমস্যার ছায়াসঙ্কুল প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বনাটকগুলিতে অতীত যুগের প্রতিবেশ-চিহ্ন বিদ্যমান। কিন্তু পরবর্ত্তী নাটকগুলিতে—'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে—আধুনিক যুগের সমস্যার নিঃসন্দিগ্ধ ছায়াপাত হইয়াছে। এই সমসাময়িক যুগের ছাপ তাহাদের আকর্ষণ বাড়াইয়াছে, তাহাদের রহস্যময় সঙ্কেতগুলির প্রতি একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল জাগাইয়াছে। আমাদের চোখের সামনে যে-সব প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি, তাহাদের বাস্তব-অংশ হইতে নিষ্কাশিত মর্ম্মকথা অতীতের ক্ষীণ আবরণের মধ্য দিয়া আমাদের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে। অবশ্য এই সমসাময়িক সমস্যা-সঙ্কুলতার ফলে নাটকীয় উৎকর্ষ বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা বিবেচ্য বিষয়। অতীতের বস্তু-অংশ কালপ্রভাবে এতই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, তাহার মূল গতিধারাটি অবান্তর বর্জনের দ্বারা এতই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, তাহাকে একটি বিশেষ রূপ দেওয়া ও তাহার মধ্যে রূপকের রঙ্গীন আলোক পাত করা কবি-কল্পনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। তা ছাড়া, যদি অতীতের এতটা সম্পূর্ণ যুগকে এরূপ রূপ-বৈশিষ্ট্য দেওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে এমন একটি খণ্ডাংশ নির্ব্বাচন করা যায়, যাহার উপর কল্পনাগত ঐক্যের ছাপ মারা কঠিন নহে। ক্ষীণকায় অতীত হইতে কবি এমন একটি অধ্যায় বাছিয়া লইতে পারেন যাহা তাঁহার উদ্দেশ্যের উপযোগী হইবে, যাহা নিজ বস্তু-বাহুল্যের দ্বারা তাঁহার কল্পনার স্বচ্ছ-লীলার পথে অন্তরায় হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমানকে কবি এত সহজে বরখাস্ত করিতে পারেন না—তাহার ইচ্ছানুরূপ বর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন নিতান্ত সহজ-সাধ্য নহে। 'মুক্তধারা'য় বিজেতা-বিজিত জাতির সম্পর্ক বা 'রক্তকরবী'তে আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সমস্যা একটা প্রবল, জীবন্ত শক্তি—ইহাদের বিরাট দৈত্যদেহকে রূপকের বোতলে প্রবেশ করাইতে যে-পরিমাণ ইন্দ্রজাল-শক্তির প্রয়োজন তাহা নৈসর্গিক জগতে মেলা কঠিন। সুতরাং কবির রূপক-প্রবণতা বর্ত্তমানের বস্তুতন্ত্রতায় পদে পদে প্রতিহত হইয়াছে, এবং এই বিরাট বস্তুপিণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে কবি যে রূপকের জাল বয়ন করিয়াছেন তাহা খুব ঘন-সন্নিবেশ নহে। সেইজন্য রূপকের আধ্যাত্মিকতা ও সাঙ্কেতিকতা ইহাদের মধ্যে সেরূপ প্রবল নহে।

'মুক্তধারা'য় আধুনিক রাজনীতির নির্ম্মম ক্রূরতা, প্রচণ্ড অনুকম্পাহীন শক্তি রূপক সাহায্যে সূচিত হইয়াছে। উত্তরকূটের অধিবাসীরা বিজেতৃজাতির সমস্ত দম্ভ, অহঙ্কার, মদোদ্ধত জাত্যভিমান ও অটল, দ্বিধালেশহীন আত্মপ্রত্যয় অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যুধ্যমান জাতিদের ন্যায়—My nation, right or wrong—ইহাই তাহাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র। প্রাচীন ইহুদী হইতে আধুনিক জার্ম্মান পর্য্যন্ত সমস্ত বিজয়ী জাতির ন্যায় ইহারা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে যে, ইহারা দৈবানুগৃহীত জাতি, দুর্ব্বলতর জাতির উপর নিজ শিক্ষা-দীক্ষা, নিজ সভ্যতা ও আধিপত্য বিস্তার করা উহাদের বিধি-নিয়োজিত পবিত্র ব্রত। সেইজন্য উত্তরকূটের যুদ্ধরাজ যখন শিবতরাই-এর মঙ্গলার্থ গিরিসঙ্কটের পথ খুলিয়া দিলেন, তখন তাহা উহাদের চক্ষে অমার্জ্জনীয় স্বদেশদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হইল। মুক্তধারা যন্ত্রসাহায্যে বাঁধিয়া শিবতরাই-এর তৃষ্ণার জল বন্ধ করা উহাদের নিকট আন্তর্জাতিক সমরের একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বৈধ অস্ত্র—বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে বিষ-বাষ্প প্রয়োগের ন্যায়। সেইরূপ যন্ত্ররাজ বিভূতিকে জয়মাল্য অর্পণ যন্ত্রশক্তির দানবতার অন্ধ-স্তাবকতা, নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকার ও বিলোপ। অম্বার অবহেলিত, উপেক্ষিত মাতৃহৃদয়ের ক্রন্দন এই দানবশক্তির নৃশংস হৃদয়হীনতার, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রতি নির্ম্মম ঔদাসীন্যের মাপকাঠি। এই

সমস্তই আধুনিক সমস্যরা অঙ্গ বলিয়া সহজেই চেনা যায়। আবার শিবতরাই-এর তরফে যে-সমস্ত প্রচেষ্টা বা আন্দোলন দেখা যায়, তাহারা আরও ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের নিজের দেশের সমসাময়িক অবস্থার সহিত বিজড়িত। লেখকের অস্বীকার সত্ত্বেও ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাহার প্রচারিত বাণীর মধ্য দিয়া মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অহিংস অসহযোগ অত্যন্ত অনিবার্য্যভাবে উঁকি মারে। আবার শিবতরাই-এর জনসাধারণের পক্ষে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অন্ধ, বিচারহীন অনুসরণ ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় মহাত্মার বাণীর নিকট দেশবাসীর স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কাহিনীই সূচিত করে। অতি-আধুনিক ও অতি-পরিচিতের সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ‘মুক্তধারা’র ইঙ্গিতগুলিকে এমন সহজ-বোধ্য ও নিকট করিয়া তুলিয়া নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়াইয়াছে।

কিন্তু নাটকটিকে সমগ্রভাবে দেখিলে ইহাকে পরিকল্পিত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানরূপে গ্রহণ করা যায় না। দিগন্তবিস্তৃত অমানিশার অন্ধকারের প্রান্তে ক্ষীণ খদ্যোতালোকের পাড় বুনিয়া দেওয়ার মত ইহা অতল-স্পর্শ গহ্বরের মধ্যে একটুমাত্র কল্পনা-বিকাশের ন্যায় দেখায়। রাজকুমার অভিজিৎ যে-মন্ত্রবলে যন্ত্রদানবের ঈর্ষ্যা ব্যর্থ করিয়া মুক্তধারার রুদ্ধ জলপ্রবাহ খুলিয়া দিলেন, সে-মন্ত্রের রহস্য ঝরণার জল-কল্লোলের মধ্যে নীরব হইয়া গিয়াছে, মানব-মন তাহার সূত্র ধরিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। অবশ্য নাট্যকারের কর্ত্তব্য কেবল ইঙ্গিত করা; পূর্ণ সমাধান দিতে তিনি বাধ্য নহেন। তথাপি ‘শারদোৎসব’ ও ‘রাজাতে এই ইঙ্গিত আমাদের সমস্ত মনকে যেমন নাড়া দিয়া যায়, ফললাভের সম্ভাবনায় যেমন উদ্বুদ্ধ করে, ‘মুক্তধারা’য় সেরূপ কোন ফল ফলে না। শংকর-স্তব ও যন্ত্র-রাক্ষসের দাম্ভিক, গগন-স্পর্দ্ধী শির—এই দুইটিই নাটকের মধ্যে সাঙ্কেতিকতার মুখ্য নিদর্শন। কিন্তু শঙ্কর-স্তোত্র নাটকে যেমন আমাদের মনের মধ্যে সেরূপ প্রবলভাবে ধ্বনিত হয় না, এবং বিভূতির যন্ত্রের চূড়াটা অস্তসূর্য্যের রক্ত-মদিরা পানে লাল হইয়া উত্তরকূটের আকাশপটে যেমন ধূমকেতুর মত জ্বলিতে থাকে, আমাদের কল্পনাকাশে সেরূপ দীপ্ত ভয়ঙ্কর রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে না।

‘রক্তকরবী’ সম্বন্ধে উপরের সমালোচনা আরও অধিকমাত্রায় প্রযোজ্য। বরং ‘মুক্তধারা’র যে-বিষয় তাহা বৃহৎ একটা আদর্শবাদের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়, সাঙ্কেতিকতার চকিত আলোকে তাহার পাতাগুলি আদ্যোপান্ত পড়া যাইতে পারে। কিন্তু ‘রক্তকরবী’র প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত আদর্শবাদ ও সাঙ্কেতিকতাকে হারাইয়া নিজ বিশাল দেহ বিস্তার করিতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে রূপকের বৈদ্যুতী বরং সঞ্চার করা যায়, কিন্তু কলকারখানার লৌহযন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতাকে কোন্ হাপরে গলাইয়া তাহার ভিতর অতীন্দ্রিয় জগতের আলোকপাত সম্ভব? এ অতৃপ্ত বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষার উপর কোন্ কুণ্ডের শান্তিজল নিক্ষেপ করা চলিবে? রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট বস্তুপুঞ্জসঞ্চয়, জীবনী-শক্তির এই শোচনীয় অপব্যবহারের পরিধিতে দুইটি নৈতিক শক্তির অবতারণা করিয়াছেন—এক, নন্দিনীর রক্তকরবী, জীবনের অদম্য প্রাণশক্তি ও আনন্দ মাদকতার প্রতীক্, এবং দ্বিতীয়, লৌহজালের অন্তরালস্থিত যন্ত্রসভ্যতার রাজা, যাহার একদিকে অসীম শক্তি, অপর দিকে অসীম অতৃপ্তি ও প্রাণভরা হাহাকার। এই দুইটি শক্তি তাহাদের সমস্ত প্রকাশক দ্যুতি লইয়া যন্ত্র সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু তাহার কঠিন লৌহবর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই যন্ত্রসভ্যতার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত খণ্ডদৃশ্যের দ্বারা, কিন্তু এগুলিকে আমরা যথেষ্ট বা চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার মর্ম্মস্থানে যে-শক্তি, যাহাকে যক্ষপুরীর লৌহ-জালাবগুণ্ঠিত রাজার রূপক সাহায্যে দেখান হইয়াছে, তাহার পরিচয়টিও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে

নাই। সুদর্শনার অন্ধকার ঘরের রাজা ও এই ভূগর্ভস্থ অন্ধকারে আত্মগোপনশীল লৌহজালে- ঘেরা রাজার মধ্যে স্পষ্টতার দিক্ দিয়া কত প্রভেদ। একটি চিত্র প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতির স্থির আলোকে প্রোদ্ভাসিত, অপরটি কল্পনার চঞ্চল, অনিশ্চিত আলোকে ঈষদ্দৃষ্ট মাত্র। নন্দিনী ও রাজার মধ্যে অনেক বাক্যবিনিময় হইয়াছে; তাহাতে আমরা বুঝি যে, এই বিরাট শক্তির কেন্দ্রস্থলে এক গোপন, অলক্ষিত দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত আছে। নন্দিনীর প্রতি একটা লোলুপ করুণ আসক্তি আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নন্দিনীর রক্তকরবীর যে-আভা কাহারও কাহারও মধ্যে চিরসুপ্ত প্রাণহিল্লোল জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা রাজার লৌহময় বক্ষের নীচে, মাত্র একটা অশান্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি রাজার মনোভাবটি বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তোলে নাই। যক্ষরাজ এই চঞ্চল বিদ্যুল্লতার দিকে ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু তাহার পায়ে কিরূপ বেড়ী পরাইবে, কি বাঁধনে তাহার অস্থির গতিকে চিরকালের নিমিত্ত নিশ্চল করিয়া দিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। নন্দিনীও এই বিশাল অজেয় শক্তির অবিচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু না পারিয়াছে তাহাকে রক্তকরবীর রঙ্গীন আভায় রাঙ্গাইয়া তুলিতে, না পারিয়াছে তাহার লৌহমুষ্টির তলে আত্মসমর্পণ করিতে। সুতরাং এই বহ্নি-পতঙ্গের খেলাটির পরিণাম-ফল অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

এই অনিশ্চয় নন্দিনী ও রঞ্জনের সম্পর্কের উপর ছায়াপাত করিয়াছে। রঞ্জনের প্রভাব নাটক-মধ্যে আরও গূঢ় ও অশরীরী, সে নন্দিনী অপেক্ষা আরও অস্থির, চঞ্চল, অবাস্তব। তাহার আগমন-বার্ত্তার বৈদ্যুতী নন্দিনীর প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তাহার অন্য কোন পরিচয় আমরা পাই না। নাটকের মধ্যে আমরা জীবিত রঞ্জনের সাক্ষাৎ পাই না, তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাই। সুতরাং রঞ্জনের প্রভাব ও ক্রিয়ার ধারণা আমাদের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট হয় না। মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, সে নন্দিনীর প্রভাবকে সম্পূর্ণ (supplement) করে—নন্দিনী তাহার রক্তকরবীর সমস্ত জ্বলন্ত সৌন্দর্য্য সেই বায়ুপ্রবাহ হইতে আহরণ করিয়াছে। কিন্তু এক দিকে তাহার এই অত্যন্ত অশরীরী, অতীন্দ্রিয় স্পর্শ, অপর দিকে তাহার মৃতদেহ—এই দুই এর মধ্যে একটা বিষম অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে, যাহা আমরা কল্পনা-সাহায্যে পুরণ করিতে পারি না। এই কল্পনা-গত অনৈক্য আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে নিরন্তর পীড়িত করিতে থাকে।

নাটকের অন্যান্য দৃশ্যগুলি বাস্তবানুগামী, কিন্তু রূপক তাহাদের বিশেষ রূপান্তর সাধন করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কুলিদের জীবনযাত্রা ও মনোভাব, সর্দ্দারের অনুক্ষণ খবরদারী ও অত্যাচার, অসাধু ভণ্ড ধর্ম্ম কর্ত্তৃক এই অত্যাচারের সমর্থন ইত্যাদি সমস্তগুলিই যন্ত্র-রাজ্যের খুব সাধারণ ও পরিচিত দৃশ্য; কিন্তু এই ধূমধুলি-ধূসর দৃশ্যগুলির ভিতর রূপকের আলোক নিতান্ত হীনপ্রভ ও নির্ব্বাপিত প্রায় দেখায় এবং বিষয়ের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। ফলতঃ রক্তকরবীর আভা যেমন যক্ষরাজের লৌহবর্ম্ম ভেদ করিতে পারে নাই, তেমনি কবি-প্রতিভার সাঙ্কেতিকতা এই অতিকায়, অতি-বাস্তব শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অবশ্য নন্দিনীর রক্তকরবী যক্ষরাজের প্রাণে একটি গূঢ় ব্যর্থতার বীজ বপন করিয়াছে, এক প্রবল, আত্মঘাতী বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে; সেইরূপ যদি কোন দূর ভবিষ্যতে এই অন্তর্ক্ষুব্ধ, রুদ্ধ হাহাকারপূর্ণ যন্ত্রসভ্যতা শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়ে ও রাক্ষসের ন্যায় নিজের অস্ত্র নিজেই ছিঁড়িয়া খায়, তবে কবি নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির দাবী করিতে পারিবেন, কিন্তু সে-দাবী তাঁহার কবিত্বের খাতায় লেখা থাকিবে কি না সন্দেহ।

ছয়

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ নাটক ‘নটীর পূজা’ তাঁহার অন্যান্য নাটক হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইহাতে রূপকের কোনো স্পর্শ নাই; এবং ইহার ঘটনা বুদ্ধ-বিষয়ক। বুদ্ধের মহিমময়, ভক্তি-প্লাবিত যুগে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পদক্ষেপ। বাস্তবিক বৌদ্ধ যুগে ধর্ম্মবিপ্লব, বিপরীত ধর্ম্মের টানে পারিবারিক অশান্তি ও অকৌশল, নব বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত পুরাতন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সংঘর্ষ, নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী উপাদান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘নটীর পূজায়’ এই জলন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্ম-বিরোধের একটা স্বল্প-পরিসর চিত্র দিয়াছেন। এই বিপ্লব সর্ব্বাপেক্ষা ফুটিয়াছে রাণী লোকেশ্বরীর চরিত্রে; মুখে বুদ্ধকে অস্বীকার করিলেও অন্তরে তাঁহার বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগ অনপনেয় আগ্নেয় অক্ষরে মুদ্রিত আছে। একদিকে রাজোচিত, ক্ষত্রিয়োচিত নহে বলিয়া সে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ধিক্কার দিতেছে; আবার পুত্রকে তাহার মাতৃবক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহার আরও গভীর অভিমান; মহারাজ অজাতশত্রুর বৌদ্ধ-ধর্ম্মদ্বেষে ও বৌদ্ধ-উৎপীড়নে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি; কিন্তু অন্তরে তাহার ভক্তি অক্ষয় হইয়া আছে—প্রকৃত পরীক্ষার সময় তাহার অন্তরের রুদ্ধ মনোভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। রাণীর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। রাজকুমারীদের আভিজাত্যাভিমান ও ধর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যে বিরোধটিও বেশ নাটকোচিত হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্মুখীনতার জন্য বাহ্য উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলি নাটকের বাহিরে রাখিয়াছেন। বিম্বিসারের হত্যা, জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য, অজাতশত্রুর বৌদ্ধ ধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ ইত্যাদি দৃশ্য, যাহা অন্য নাট্যকার কাজে লাগাইতে ব্যস্ত হইতেন—তাহা রবীন্দ্রনাথ একবারে বর্জ্জন করিয়াছেন; তাহার একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র নাটকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যটিতেও নাটকীয় পরিণতির অপেক্ষা করুণ রসের প্রাধান্য অধিক লক্ষিত হয়। মোটের উপর, রবীন্দ্রনাথের শেষ নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা পুরাতন সুরে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার মধ্যে এখনও যথেষ্ট জীবনী শক্তি অবশিষ্ট আছে, পাঠকের মনে এই ধারণা উৎপাদিত হয়।

সাত

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির এক-এক করিয়া বিশ্লেষণ শেষ হইল। এখন নাটকগুলির দুই-একটি সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতে পারে। এই নাটকগুলির পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, প্রায় সমস্ত নাটকগুলির বিষয়গত সামান্য পার্থক্য থাকিলেও মূলগত সুরটি এক। প্রায় সমস্ত নাটকেই একই প্রকারের ঘটনা ও চরিত্রের পুনরুক্তি হইয়াছে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাদার চরিত্রটি সমস্ত নাটকগুলিরই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ—সর্ব্বত্রই তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দেন ও প্রায় একরকম খেলাই খেলেন। একজন স্বচ্ছ-দৃষ্টি, সরল-হৃদয়, আনন্দময় পুরুষ, যিনি হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার আনন্দ-উৎসের মুখে পাথর না চাপাইয়া তাহার স্রোতোবেগ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে, যিনি বালকদের সমপ্রাণ বন্ধু, নায়ক ও ক্রীড়া-সহচর—এই আদর্শেই কবি ঠাকুরদাদার চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল ‘অচলায়তনে’ কবি তাঁহার আরও পদোন্নতি সাধন করিয়া তাঁহাকে আদি ধর্ম্মগুরু স্বয়ং শ্রীভগবানের সঙ্গে একাসনে বসাইয়াছেন। এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, নাটকের দিক্ দিয়া প্রশংসার্হ না হইলেও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অবিচলিত ঐক্যের সুন্দর

পরিচয়-স্থল। বাহিরের জগতে নানা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকিলেও কবির মনে একই প্রকার খেলা পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে—বাহিরের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এই অন্তর-লীলার ছায়াপাত হইয়াছে, কবির চক্ষু তাহাই মাত্র লক্ষ্য করিয়াছে। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'—তাঁহার গানের এই প্রসিদ্ধ চরণখানি অশ্রান্ত সুরে তাঁহার নাটকের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোভাবই তাঁহার নাটকে বাহ্য বৈচিত্র্যের অভাবের কারণ। সাধারণ নাটকের যে-লক্ষণ তাহার অনেকগুলিই তাঁহার নাটকে মিলে না—কিন্তু ইহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অসীমের সুর তাঁহার নাটকে যেরূপ মধুর ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্নভাবে বাজিয়াছে, অন্য কোথাও তাহার তুলনা মেলে না।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের আর একটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। নাটকীয় চরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধাপটি তাঁহার নাটকে অব্যাহতভাবে বজায় রাখা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের রাজসভার প্রতিবেশ তাঁহার সমস্ত নাটকেই দেখিতে পাই। সেই চিরপরিচিত রাজা, অমাত্য, বিদূষক, সেনাপতি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। সেই প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও শাসন ব্যবস্থা—রাজার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বমূলক সমাজশৃঙ্খলা—সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। এমন-কি, অতি আধুনিক সমস্যা ও বিশ্লেষণে সেই প্রাচীন প্রথার অবতারণা হইয়াছে। 'রক্তকরবী'তে এই প্রাচীনের অবিচ্ছিন্ন মহিমা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কেননা একমাত্র যক্ষরাজ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত চরিত্র কতকটা যান্ত্রিক-যুগের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। কবি এই প্রাচীনত্বের ছদ্মবেশের কেন এতটা পক্ষপাতী তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। হয়ত এই প্রাচীন প্রতিবেশ রচনার দ্বারা তিনি আধুনিক সমাজের বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি নিজের আত্যন্তিক বিমুখতা জ্ঞাপন করিতে চাহেন। ভ্রাতৃবিরোধ বা সামাজিক দলাদলি যে নাটকের উপজীব্য বিষয়, রবীন্দ্রনাথের তাহার প্রতি কিছু মাত্র প্রবণতা নাই; সুদূর হিন্দু সভ্যতার যুগে তাঁহার নাটকগুলিকে সন্নিবেশ করিয়া বর্ত্তমানের সমস্ত ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থ-সংঘর্ষ হইতে তিনি যেন আপনাকে উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বোধ হয়, এই কালনির্ব্বাচনের সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, তাঁহার মনে ভগবানের যে লীলারহস্য, অসীমের যে আনাগোনা ভাস্বর হইয়া আছে, তাহা প্রাচীন কালের রাজসভার প্রতিবেশেই স্ফুটতর হইয়া উঠে। তিনি যে রাজরাজের মহিমা প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছেন, প্রাচীনকালের সর্ব্বময় কর্ত্তা রাজাদের সম্পর্কেই তাঁহার সে পরিচয় ফুটে ভাল। এক দিকে অপ্রতিহত-প্রভাব, অসীম-বলমদোদ্ধত নৃপতিরা তাঁহার অদৃশ্য শক্তির নিকট মাথা হেঁট করিয়া নিজেদের গর্ব্ব-অভিমান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে; অন্য দিকে, কোন কোন ধন্য রাজা ভগবদ্দত্ত রাজ সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে পরম দান—ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—তাহাও লাভ করিয়া মনুষ্য মধ্যে দেবপদবাচ্য হইয়াছে। সেইজন্য রাজা-রাজড়ার সঙ্গেই তাঁহার বেশী কারবার—আধুনিক গণতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হাত-পা-বাঁধা রাজা নয়, সত্যকার রাজা, যাহার ভাল মন্দ দুই দিকেই শক্তি অপরিমিত। এইরূপ বাধা-বন্ধহীন অতি-মানবদের হৃদয়ই ভগবানের প্রিয় সিংহাসন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকই একবাক্যে সেই সাক্ষ্য দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম

প্রিয়রঞ্জন সেন

বর্তমান যুগে শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতবর্ষের, এমন কি বিশ্বের পটভূমিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার ব্যাপক ব্যঞ্জনায় মানস চক্ষের সামনে ভেসে ওঠে দুই মুক্তিকামী পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে প্রীতির বন্ধন। বাপুজী যে তাঁর শক্তিসংগ্রহ করতেন কবির রচিত অপূর্ব সঙ্গীতলহরী থেকে, তা কি ভোলা যায়? বিশেষ করে নোয়াখালির শোচনীয় ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর শান্তিস্থাপনের জন্য মহাত্মাজী যখন সেখানে যান তখন "একলা চলরে" ও "জীবন যখন শুকায়ে যায়" তাঁকে কী রসমাধুরীই না জুগিয়েছিল! রবীন্দ্রনাথ মূলে কবি; পর্বতের শিখরে শিখরে নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে, নারিকেল পল্লবের মর্মরে, রূপের উন্মত্ত নৃত্য, দক্ষিণে বামে প্রাণের দুরন্ত ঝড় ও সৃজন প্রলয়ের রূপ তিনি দেখেছেন, কিন্তু তাঁর সকল গানের মধ্য দিয়ে অরূপের, সত্যশিবসুন্দরের সন্ধান ও আরাধনা চলেছে, তার আধার খুঁজতে গেলে পৌঁছতে হয় তাঁর বিশ্বাত্মার সঙ্গে একান্ত যোগে, তাঁর ধর্মে। কী সে ধর্ম। এ জিজ্ঞাসা নিরর্থক নয়, তাঁর ভাবনা থেকে আমাদের অনেক কিছু জানবার ও শিখবার আছে। তিনি যে অর্থে কবি ছিলেন, তা প্রচলিত অর্থ অপেক্ষা আরও গভীর, তিনি ছিলেন স্রষ্টা, মহাকাব্য রচনা না করলেও মহাকবি। গান্ধীজীর ও দেশবাসীর গুরুদেব।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যে আলোচনা করবে, কবির জীবিতকালে কথাটা কৌতুকের উপাদান জোগাত নিশ্চয়। তাঁর রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে একখানি ইংরেজী বইয়ের সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা, সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট পড়ে তাই মনে হয়—'আমার নিজের মতের ঠিক চেহারাটা পেলুম না।' অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বলেছিলেন, ইংরেজী বইয়ের অনেক তর্জমা ছিল। তাঁর নিজের ভাষা ছিল না। আমরা সেই কারণটি বাদ দিয়ে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু তাঁর ধর্মের স্বরূপ বুঝবার প্রয়াসই করেছি। কবি তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর মনের অবস্থা ও গতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আশ্রয় করেই আমাদের ধারণা অগ্রসর হতে পারে। একটা নাম বা সংজ্ঞা না দিলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। তাই আমরা কখনও বলি বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথ, কখনও বলি বেদান্তী, কখনও বা তিনি আমাদের কাছে প্রাচীন ভারতবর্ষের ধারা বহন করে এনেছেন বলে বলি, ঐতিহ্যবাহী। তাঁর গান তো শুধু বৈকুণ্ঠের জন্য নয়। রূপকে তিনি মায়া বলে তুচ্ছ করেননি, ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন তপোবন, একথা বলতে গিয়েও তিনি আমাদের মনে রাখতে বলেছেন, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই, সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালপালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা ও মনোভাব দেশবাসীর সামনে গান্ধীজীর জীবনের মতই খোলা চিঠি হয়ে পড়ে আছে। কবি তাঁর জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ছেলেবেলা, ডায়েরী, চিঠিপত্রে ও কাব্যে

ভাষণ ও প্রবন্ধে বলে গেছেন তাঁর নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা, অবশ্য তাঁর নিজস্ব ভাষায় ও অপরূপ প্রকাশভঙ্গীতে। সেই সমস্ত আশ্রয় করেই তাঁর সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করি।

জীবনস্মৃতির পাতায় কবি লিখেছেন তাঁর উপনয়ন সংস্কারের কথা। এটা একটা ঘটনা। ''আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে। আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিষ নয়। ... গায়ত্রী মন্ত্রের কোন তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার এক দিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শান বাঁধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।''

আমরাও অবশ্য সে কথা বুঝিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করব না। কিন্তু কবি বার বার এই গায়ত্রী মন্ত্রের ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যত্র বলেছেন, ''বাল্যে উনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে নয়; বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মকা ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।'' শান্তিনিকেতনের আশ্রমও সেই মন্ত্রের প্রকাশ বলেই তিনি বর্ণনা করেছেন।

> ''বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইয়ে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি। আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শান্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।''

দীক্ষার দিনে মহর্ষি এই মন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনায় মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের দেশে অনেকেরই জপের মন্ত্র হলেও, এই মন্ত্রটিই ছিল মহর্ষির 'জীবনের মন্ত্র'। ''তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, বরেণ্যং ভর্গঃ, সেই বরণীয় তেজকে ধ্যানগম্য করে তুলছে।''

মহর্ষির এই 'জীবনের মন্ত্র' সম্বন্ধে কবি পরে আরও খুলে লিখেছেন। কবির নিজের ভাষায়—

...''তিনি নদীপর্বত সমুদ্র প্রান্তর যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন, কোথাও আর তাঁর প্রিয়জনকে

হারাননি—কেননা তিনি যে সর্বত্রই, আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত সুখ। যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস গীত গন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ! এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।"

জীবনস্মৃতিতে পিতার সঙ্গে কবির হিমালয়যাত্রার বিবরণের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে মহর্ষির সস্নেহ ধর্মশিক্ষাদানের প্রকার যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে পুত্রকে পাশে নিয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা উপাসনা।

ফিরে এসে চৌদ্দ পনের বছর বয়সে যখন তিনি সেন্ট জেভিয়র্সে ভর্তি হন তখন ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার প্রভাব তাঁর কিশোর মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। একাধিকবার তিনি এই শিক্ষকের উল্লেখ করেছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। "তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন—অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতা তাঁহাকে যেন আবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে। ... আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম—আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।" জীবনস্মৃতিতে এই ভাবে লিখবার পর "শান্তিনিকেতনে" 'শুচি' প্রসঙ্গে এই সৌম্যমূর্তি, মৃদুভাষী তাপসপ্রকৃতি অধ্যাপকের প্রতি নিজের প্রগাঢ় ভক্তির কথা বলেছেন—"কোন্ অলক্ষ্য উপাসনা যেন তাঁকে ভিতরে ভিতরে সর্বদাই স্নান করাইয়া শুচি করিয়া দিতেছে!" একেই তো বলে, বাহ্যভ্যন্তর শুচি।

কৈশোর থেকে তারুণ্যের বয়সে পা দেওয়ার সময় চারদিকে ছিল তাঁর সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার কলহ; তাতে তাঁর আস্তিক্যবুদ্ধির মলিনতা ঘটেছে তার কোনও চিহ্ন লেখার মধ্যে দেখা কঠিন, তবে তিনি ধর্মবিদ্রোহে পীড়া অনুভব করতেন। "যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে" এই বিদ্রোহিতা তাঁর মনেও দেখা দিয়েছিল। যদিও আদিসমাজের সেবায় তাঁর কর্মশক্তি নিযুক্ত ছিল।

বিশ একুশ বৎসর বয়সে হঠাৎ তাঁর মধ্যে কী একটা ওলট-পালট হয়ে গেল। —জীবনস্মৃতিতে তার যথাসম্ভব বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সদর স্ট্রীটের বাড়ি থেকে একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফ্রী ইস্কুলের বাগানের দিকে চাওয়ামাত্র দেখলেন, 'হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। এক অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।' কেহই এবং কিছুই আর অপ্রিয় রইল না। গানে যে কথা বলা আছে 'নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি, যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি'—'পথের পথিক সে-ও দেখে যাবে, তোমার বারতা মোর মুখভাবে'—সেই ধরণের অনুভূতি। এই পরম উপলব্ধির কথা তাঁর জীবনের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু এ উপলব্ধির মুহূর্ত বারবার আসে না। হিমালয়ের নির্জন অঞ্চলে গিয়ে যখন এই অনুভূতি পুরনায় পাবার চেষ্টা করলেন তখন সেই হারানো মুহূর্ত আর ফিরে এল না।

কিন্তু সেই উপলব্ধি! তার পূর্বেই উপনিষদের মন্ত্রের ধ্যানে চিন্তার আনন্দে কবি মনের মধ্যে "একটা জ্যোতি" দেখতে পেলেন, কবি এমন উক্তিও করেছেন। এই অবস্থায় তিনি চারদিন ছিলেন,

এই আনন্দের এবং বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধের ভাবে কবির ‘‘আবরণ’’ খসে পড়ল। তাঁর এই বিচিত্র মনোভাবের বিবরণ পড়তে মনে হয়, হিরণ্ময়েন কোষেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষনুপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। সেদিন যেন তাঁর সেই দৃষ্টিই লাভ হয়েছিল, দেখতে পেয়েছিলেন সেই অখণ্ড মানুষকে যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

পরবর্তী জীবনে শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে পল্লীর নিভৃত কোণে বাউলদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে অরূপের সঙ্গে কবি সহজ সম্বন্ধ বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন, কবি তাঁদের বিচিত্র অনুভূতি দেখে মুগ্ধ হলেন, শুনতে পেলেন তাঁদের কণ্ঠে অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা গান—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার,
ও তুই নূতন লীলা কী দেখবি যার নিত্যলীলা চমৎকার।

প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায়, বিজ্ঞান অধ্যয়নে, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ যিনি সর্বানুভূঃ—সমস্ত অনুভব করেন—তাঁর বোধ দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর হতে থাকল।

যে উপলব্ধি তাঁর হতে থাকল, সেই উপলব্ধি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা চলে না। ‘‘ইন্দ্রিয়বোধের মতোই সেটা অনির্বচনীয়। ব্যোমতরঙ্গকে চোখ কেন আলোকরূপ দেখে তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই—দেখে বলেই দেখে এইটে হোল চরম কথা। চৈতন্যের নানা দিক আছে। এক এক আলো থেকেই নানা রঙের বোধ যেমন এও তেমনি। কেউ বা লাল রং দেখতে পায় না কেউ বা নীল,কেউ বা এটা বেশি দেখে কেউ বা ওটা। আমি আজকাল ছবি আঁকি, সেই ছবিতে বর্ণসংঘটনের বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের কারণ আমার চৈতন্য রঙের বিশেষ ধারণার মধ্যে। আমি সব রংকে সমানভাবে দেখিনে, পক্ষপাত আছে, কেন আছে কে বলবে? গাছের পাতা কেন সবুজ রংকে প্রক্ষিপ্ত করে? গাছের ফুল কেন করে লালকে? মিস্টিক উপলব্ধিও এক রকমের নয়, নিশ্চয়ই তার বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য ঠিক বর্ণনা করা যায় না। কেন না সেতো চোখে দেখবার জিনিষ নয়। কবিদের উপলব্ধিকে যদি মিস্টিক বল, তবে সেই উপলব্ধির ভাষা তাঁদের আছে এইখানেই কবিত্ব। কবীর প্রভৃতি প্রাচীন সাধকেরা ভাষাবান ছিলেন। তবু সে ভাষা সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে কিছু পরিমাণে তাঁদের মতো চিত্ত থাকা চাই। ...ভাষা মানে কেবল শব্দের ভাষা নয়, সঙ্কেতের ভাষা, যুক্তির ভাষা, চোখের ভাষা, কর্মের ভাষা, চরিত্রের ভাষা, এমন কত কি।’’

ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রবন্ধের মধ্যে চিন্তার যে প্রকৃতি দেখা যায় তা অনুধাবন করবার জন্য সঞ্চয় ও পরিচয়ের প্রবন্ধগুলি বিশেষ করে পড়তে হয়। কবি নানা দিক দিয়ে ধর্ম-সমাজের কথা ভেবেছেন, আলোচনা করেছেন। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শময় জগতের প্রতি তিনি তো মোটেই উদাসীন নন, বৈরাগ্যসাধনে যে মুক্তি, তা তাঁর কাম্য নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে তিনি মুক্তির স্বাদ পেতে চান, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিতে চান, ‘‘সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে, যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা রাজরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান, এবং তাহা বহু। এই সত্য সুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখনই আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আধারে বদ্ধ করিতে চাই তখনই তাহা সত্যসুন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি আনয়ন করে।’’

ধর্মের কথা আলোচনা করতে গেলে পাপ-পুণ্যের কথা এসে পড়ে। পাপ কি, পাপের থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়; পরিত্রাণের পথ কি, এসব প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ ধর্মজিজ্ঞাসুরা করে

থাকেন। রবীন্দ্রনাথ পাপের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন। বলেছেন, 'সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নয়, অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ, অহমের দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকে তার সত্য। মানুষ আপনার দিকে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনমতেই অল্পকে জানিতে চায় না। তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃত পারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরম গতিকে যাহা কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।'

তবে তো ব্রহ্মের দিকে ভূমার প্রতি যে আকর্ষণ তাই তো পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ, আর যদি পাপ থেকে মুক্তি পেতে চাই তবে অমৃতস্বরূপ আনন্দস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের শরণই একমাত্র উপায়। শুধু দুঃখের তপস্যায় নয়, কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধানে নয়, সত্যের আশ্রয়েই একমাত্র পরিত্রাণের পথ।

ধর্মবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদীক্ষা মহর্ষির নিকটে; কত স্নেহে কত প্রেমে কত উদারভাবে পিতা তাঁকে ধর্মশিক্ষা দিতেন, সে কথা সর্বদা স্মরণ করতেন। শুধু তাঁর উদাত্ত গম্ভীর শ্রাদ্ধোপাসনায় নয়, যেখানেই উপলক্ষ হয়েছে, সেখানেই তিনি মহর্ষির ত্যাগ, সংগ্রাম, তপস্যা ও সামঞ্জস্য সাধনের কথা বলেছেন। ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করতেও তাঁর পিতৃদেবের আদর্শই ছিল তাঁর সামনে। ''ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে পূজা অর্চনা ক্রিয়াকর্মের মহাসমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতি বিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গনতলে তাঁহার মস্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকাল পর্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দকুঞ্জছায়ায় বুলবুলের মতো প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।'' নবযুগের ধর্মের রসস্বরূপের আভাস এইখানেই।

শান্তিনিকেতনে আমরা কবির খুবই কাছে আসি, যেন শুনতে পাই তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, উপনিষদের শ্লোকগুলি এক একটি করে নিয়ে তার অর্থ স্পষ্ট করে আমাদের সামনে ধরেছেন। আমরা যেন তার কিছুই না হারাই। নবযুগের উৎসবে তিনি বললেন, ''যেন কে বললে—বেদাহমেতং, আমি এঁকে জেনেছি। কাকে জেনেছ? আদিত্যবর্ণং—জ্যোতির্ময়কে জেনেছি যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছো, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছো, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। ... কিন্তু—বেদাহমেতং। আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের; যাঁকে জানলে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না; কাউকে ঘৃণা করা যায় না। ...এই মন্ত্র কোনো এক-ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী,

সকলে শোনো। পূর্বগগনের প্রান্তে একটি ধ্বনি জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং। আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি।”

কিন্তু এমনি করে দুই চারিটি কথা উদ্ধার করে কবির জাগ্রত ধর্মভাবের আভাস দেওয়া যাবে না, তাঁর মূল রচনা দেখতে হবে। শান্তিনিকেতনের ও অন্যান্য অনুরূপ রচনার মধ্যে, তাঁর কাব্যসাহিত্যের মধ্যে যে কথা নানারসে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার পরিচয় আমরা পেতে পারব। সেই পরিচয়ে আমরা যেন সত্য শিব সুন্দরের বোধে উদ্বুদ্ধ হই। ভারতবর্ষের সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারার সাধনা, জীবন যাতে একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে এই পরিপূর্ণতার সাধনা। এই অমৃতধারা দুর্গম গুহা থেকে উৎসারিত হয়ে ভারতবর্ষের নানা অবস্থা ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনও শুকিয়ে যায় নি। আমাদের ঘরের সামনে সেই মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে দেখতে পেয়ে আমরা যেন তার অমর্যাদা না করি, কবি আমাদের বুঝতে বলেছিলেন ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে পড়ে আছে, সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবে এই স্রোতস্বিনী, অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবে, এবং ‘‘বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবন যোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্য পর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যই ভারতের অমৃত-কলমন্দ্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।”

আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ

সুকুমার সেন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা হাইকোর্ট—এই ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুটি পক্ষ অথবা বিচরণভূমি, যাই বলি না কেন। আশুতোষের পাবলিক লাইফ্-এর বাইরে প্রায় শেষ পর্যন্ত কিছু ছিল না। প্রায় বলছি এই জন্যে যে শেষজীবনে তিনি সাহিত্যের দু-একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু এ-সব কাজে তাঁর চরিত্রের অথবা চিন্তার কোনো বিশেষত্ব পরিস্ফুট নয়। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আবাল্য বিদ্যালয়ভীত আর আযৌবন উকিল-আদালত-সন্ত্রস্ত। এ দু-জন মনীষীর বিচরণক্ষেত্রের পরিধিস্পর্শ ঘটবারও কোনো সম্ভাব্যতা ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ অল্প কিছুকালের জন্যে সাধারণ্যে প্রকাশ্য ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আশুতোষ স্বাভাবিক কারণেই সে আন্দোলন থেকে অত্যন্ত দূরে ছিলেন। এমন-কি সে আন্দোলন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তখন তিনি সে আন্দোলনের বিরুদ্ধেই গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্জনের সংকল্প শুধু যে স্বদেশীর জন্যেই হয়েছিল তা নয়, কতকটা হয়েছিল লর্ড কার্জনের সমর্থিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিরোধিতার জন্যও বটে। আশুতোষ এই বিলের প্রবল সমর্থক ছিলেন। সেই সমর্থনের পথেই উচ্চশিক্ষার নেতা রূপে তাঁর প্রবেশ। সে কারণে তিনি দেশের নেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে অপ্রিয় হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন, তবে অন্য কারণে। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের দেশের ছেলেরা আমাদের দেশের অবস্থার অনুযায়ী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভ করবে, তা না হলে শিক্ষার অপচয় কিছুতেই বন্ধ হবে না। আশুতোষ যথাসম্ভব সর্বান্তকরণে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থন করতেন। তাঁর চেষ্টা ছিল সেই শিক্ষাকে প্রসারে এবং গভীরতায় বিস্তার করতে। সে বিস্তারের জন্যে তিনি শিক্ষার বোঝা হাল্‌কা (এবং পরীক্ষার ভার লঘু) করতে দ্বিধা করেন নি। এদিক দিয়ে হয়তো আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপন্থার দিকেই চলেছিলেন অজ্ঞাতসারে। এবং উল্‌টা পথে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষাকে সহজগ্রাহ্য ও সর্বাত্মক করতে, পরীক্ষাকে তিনি একরকম বাদই দিতে রাজি ছিলেন।

আশুতোষের পরিধিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ ঘটল তাঁর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির উপলক্ষে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ সরকারিভাবে ঘোষিত হবার আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে উপাধি (D.Litt.) দেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সে কথা হয়তো ঠিক। তবে এ কথাও হয়তো বেঠিক নয়, যে ইংরেজি গীতাঞ্জলির যশ (এবং নোবেল প্রাইজ পাবার কানাঘুসা) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের—চ্যানসেলর লর্ড হার্ডিঞ্জের এবং রেক্টর লর্ড কারমাইকেলের —অবগতিতে আগেই এসেছিল (অথবা সেক্রেটারি অব স্টেট তাঁদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন)।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্ববিদ্যালয় নমোনমো করে স্বীকার করলেন, কিন্তু বাংলা লেখক বলে

তাঁর মূল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিদ্যার অধিকারীদের দ্বারা তবুও স্বীকৃত হল না। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব বিদ্যারই যথাসম্ভব খোঁজখবর রাখতেন এবং সব বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন কিন্তু বাংলা বিদ্যার করতেন না। তার কারণ তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা মহাবিদ্যা নয়, বিদ্যাও নয়, অর্ধবিদ্যা মাত্র। ম্যাট্রিকুলেশন, ইন্টারমিডিয়েট ও বি.এ. পরীক্ষায় একটিমাত্র পত্র, তার অধ্যয়ন। পরীক্ষার্থীদের বাংলায় একশো মার্কের একটিমাত্র পত্রের পরীক্ষা দিতে হত, এবং সে পত্রের জন্যে অধ্যয়ন ছিল নিষ্প্রয়োজন এবং অধ্যাপন আরো নিষ্প্রয়োজন। (শেষকালে কিন্তু আশুতোষই বাংলাকে মহাবিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্কে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র দায়িত্ব ছিল ঐ তিনটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও সে-সব পত্রের উত্তর দেখা। এ কাজের ভার যাঁদের উপর তখন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে ন্যস্ত ছিল তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখার সম্বন্ধে বেশ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন না। তাঁরা নোবেল প্রাইজে অভিভূত এবং ডি.লিট. ডিগ্রিতে বিচলিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিন জন বিখ্যাত ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিশেষ সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে ডিগ্রি পেয়েছিলেন। পথে ঘাটের সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকের, তাঁদের বিদ্যার বিষয়ে যেমন অনুকম্পাশ্রিত উপেক্ষা দৃষ্টি ছিল, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয়েও প্রায়ই সেই রকম ধারণা ছিল।

সেইজন্যে, যখন দেখছি পরের বছরেই (১৯১৪) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনার অংশ তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে, 'শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় পুনর্লেখন কর' (rewrite in correct and chaste Bengali) তখন খুব বিস্ময় জাগে না। (আগেই বলেছি তখন বাংলা বিদ্যার খোঁজ আশুতোষ বেশি রাখতেন না, তাই এ ব্যাপারে তাঁকে দোষী করা যায় না।)

আশুতোষের তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভেট (contact) হল জগত্তারিণী পদকপ্রাপ্তি উপলক্ষে। রবীন্দ্রনাথ কনভোকেশনে গিয়েছিলেন (১৯২২) পদক নিতে। (অ্যাকাডেমিক পরিচ্ছদে লাল-গাউন-পরা তাঁর যে শালপ্রাংশু সমুজ্জ্বল মূর্তি সে কনভোকেশনে সেনেট-হলে দেখেছি, এখনো তা যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। বিধ্বস্ত সেনেট হলের সঙ্গে সে মূর্তি মনে গাঁথা হয়ে আছে।)

জগত্তারিণী-পদক-সম্মানের অল্প কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারও কিছু আগে আশুতোষ পোস্টগ্রাজুয়েট অধ্যাপনা-গবেষণা প্রবর্তন করেছেন। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে মনীষীদ্বয় সমান্তরাল পথ ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ছেন—আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়-সর্বস্ব। সুতরাং এখন এঁদের মধ্যে যেন একটু, এখন যাকে বলে 'আত্মিক' যোগাযোগ, তাই ঘটল। আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে খয়রার রাজার এনডাউমেন্ট তহবিলের অন্যতম ট্রাস্টি করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে এই একটিমাত্র University Body-র মেম্বর হয়েছিলেন। তিনি খয়রা বোর্ডের একটিমাত্র মিটিঙে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৬ কি ১৯২৭ সালে মনে নেই, খয়রা বোর্ডের যে মিটিঙে সুনীতিবাবুর (শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) পাঁচ বছরের মেয়াদের পর চাকরি পাকা করবার কথা ছিল, সেই মিটিঙে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন দেখেছি। তখন কিন্তু আশুতোষ জীবিত ছিলেন না। তখন ভাইস-চ্যানসেলর ছিলেন বিচারপতি গ্রীভ্‌স। আশুতোষের মৃত্যুর পর ইনিই ম্রিয়মান পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগগুলিকে স্থায়িত্বের পথে তুলে দিয়ে বাঁচিয়ে গিয়েছিলেন। সে কথা এখন আমাদের অনেকেরই স্মরণে নেই। (অল্পকাল পূর্বে গ্রীভ্‌স পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধা জানাই।)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষই রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে, আশুতোষের মৃত্যুর দু-এক মাস আগে। আশুতোষের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ তিনটি রিডারশিপ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার স্থান ছিল দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এ দোতলার হল, তখনকার লাইব্রেরি রিডিং রুম। সে বক্তৃতায় আশুতোষ সভাপতিত্ব করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রিডারশিপ বক্তৃতা দেওয়া (তখন রিডারশিপ বক্তৃতা দিতে বিদেশী নামী পণ্ডিতদেরই ডাকা হত) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এইই প্রথম।

আশুতোষ নিজের টাকা দিয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য এনডাউমেন্ট স্থাপন করেছিলেন, মায়ের নামে জগত্তারিণী পদক আর বড়োমেয়ের নামে কমলা বক্তৃতামালা। রবীন্দ্রনাথ এ দুটিরই লাভের সম্মান পেয়েছিলেন। জগত্তারিণী পদক তিনিই প্রথম পান, তবে কমলা বক্তৃতায় তিনি প্রথম নন। এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি ১৯৩৪ সালে।

আশুতোষের মৃত্যুর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় নি। বিশ্বভারতীকে উপলক্ষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা বেড়ে গিয়েছিল। এফিলিয়েটেড ইন্স্টিটিউশন না হলেও বিশ্বভারতীর ছাত্রদের ইন্টারমিডিয়েট ও বি.এ. পরীক্ষা দেবার অধিকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছিলেন। এ অধিকার আর-কোনো প্রতিষ্ঠান কখনো পেয়েছে বলে জানি নে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো অধ্যাপক সপ্তাহান্তিকে একদিন কি দুদিন বিশ্বভারতীতে পড়াবার অনুমতি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ নিবিড়তম হয়েছিল ১৯৩২-৩৪ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ দু-বছরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলা বিভাগের প্রধান রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ এইসময়ে খালি হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ কোনো এক ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ না করে পদটিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুজনকে দেন। দু-বছরের পর রবীন্দ্রনাথকে পুনর্নিয়োগ করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ হলেন ৫০০০ টাকা মাইনের বিশেষ অধ্যাপক আর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রচলিত গ্রেডে দ্বিতীয় অধ্যাপক। এবং সে অনুসারে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

আশুতোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চিন যাত্রারম্ভের পূর্বদিনে (২০ মার্চ ১৯২৪)। সেদিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর আলিপুরস্থিত সরকারি বাসভবনে এই উপলক্ষে প্রীতিসম্মিলন আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তখন প্রশান্তবাবুর অতিথি হয়ে আলিপুরে ছিলেন। সে সম্মিলনে আশুতোষ এসেছিলেন। তাঁর এক প্রবল প্রতিপক্ষও এসেছিলেন—তিনি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভিন্নতা নানা দিক দিয়েই ছিল। তবুও তাঁদের মধ্যে যে মিল ছিল তা সর্বদা স্পষ্ট না হলেও গভীর। দুজনেই ছিলেন কর্মী ও কর্মপ্রিয়, দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল মানুষগড়া। উদ্দেশ্য যেখানে এক সেখানে যাত্রাপথ যতই দূরাবস্থিত হোক না কেন সে পথ হয় সমান্তরাল চলবে নয় এক ক্ষেত্রে এসে মিলবে। আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথের পথ সমান্তরাল চলেছিল। বলতে পারি মিলেও ছিল—বাংলাভাষার স্বীকৃতিতে ও প্রতিষ্ঠায়।

রবীন্দ্রনাথ দু-বার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কনভোকেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এক বার (১৯২২) জগত্তারিণী পদক নিতে, আর-এক বার (১৯৩৭) কনভোকেশন বক্তৃতা দিতে। সে বক্তৃতার গোড়ায় যা তিনি বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করি—

> ''কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবি-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপটুতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ্য আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হল।''
> (ছাত্রসম্ভাষণ, শিক্ষা)

রবীন্দ্রনাথ যে কতটা দূরদর্শী ও বিবেচক ছিলেন তা 'বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয়' কথা থেকেই বোঝা যায়। কেন বলেন নি 'ভারতবর্ষের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয়?'

আশুতোষ শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। কিন্তু দুজনের শক্তির প্রকাশ রূপ ভিন্ন। তবে দুজনের চিন্তা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সংলগ্ন হয়েছিল। সে হল জ্ঞানের উপর অসীম আস্থা, জ্ঞানার্জনের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ।

রবীন্দ্র-কাব্যে বৈচিত্র্য

বিশ্বপতি চৌধুরী

রবীন্দ্র-কাব্যের অপূর্ব বৈচিত্র্যের কথা বলিতে গিয়া স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁর "কাব্যপরিক্রমা"র মধ্যে একস্থলে লিখিয়াছেন—"জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতার এমন অবাধ, এমন আশ্চর্য্য প্রকাশ জগতের অল্প কবির মধ্যে দেখা গিয়াছে।"—একথা খুবই সত্য, এবং আমাদের মনে হয়—অজিতবাবু যদি "জগতের অল্প কবির মধ্যেই দেখা গিয়াছে" স্থলে বলিতেন—"জগতের কোন কবির মধ্যেই বোধ হয় দেখা যায় নাই" তাহা হইলেও হয়ত বাড়াইয়া বলা হইত না। বাস্তবিকই পৃথিবীর আর কোন কবির কাব্যে বোধ হয় এত অসংখ্য বিচিত্র সুরের সমাবেশ দেখা যায় নাই। অতিবড় হাল্কা প্রণয়-সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া অতিবড় সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও ভাগবত কবিতা সমান নিপুণতা এবং সমান আন্তরিকতার সহিত পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোন যুগে, কোন কবির দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

এমন ধারাটা কেমন করিয়া সম্ভব হইল?—ইহার মূলে কবিচিত্তের কোন্ বিশেষ বৃত্তি কাজ করিতেছে? আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে এই যে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, ইহার মূলে রহিয়াছে কবির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা।

আমাদের মনের মধ্যে গোটাকতক বাঁধা-ধরা অনুভূতি স্বভাবতঃ আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। এইসকল স্বাভাবিক অনুভূতি মূলে কবিচিত্তের গভীর আন্তরিকতা থাকিলে এই সকল অনুভূতিজাত কবিতায় অনায়াসে প্রথম শ্রেণীর রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে।—সেদিক হইতে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এইসকল স্বাভাবিক গোনাগুন্তি অনুভূতিকে সম্বল করিয়া কোন কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত এত বিচিত্র, এত বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য সুরের আমদানি করিতে পারেন নাই।

অনুভূতি জিনিষটি স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনসহিষ্ণু নয়। একটি বিশেষ অনুভূতি মনের মধ্যে একবার জাগিয়া উঠিলে তাহা সহজে ছাড়িয়া যাইতে চায় না। তাই অনুভূতি জিনিষটি যে-সকল কবির একমাত্র সম্বল তাঁহাদের কবিতায় গভীরতা বা আন্তরিকতা অনায়াসেই থাকিতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব নয়। অনুভূতি জিনিষটা আগাইয়া যাইতে জানে না—জানে নিজের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে।

এমনি করিয়া এক-একটি অনুভূতি নিজের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে থাকে। সুতরাং কেহ কাহারও সহিত মিলিত হইতে পারে না। এই যে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি নিজের নিজের এলাকার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতেছে—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি এমন কোন গোপন পথ নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া এক অনুভূতি হইতে অন্য অনুভূতিতে, নির্দ্দিষ্ট একটি অনুভূতি হইতে অসংখ্য বিচিত্র সূক্ষ্ম অনুভূতিতে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়? এরূপ

কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। এই উপায়টি আর কিছুই নয়—কবির চিন্তাসূত্র। এই যে এক অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়া, ইহার মূলে কবির মনের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা অলক্ষ্যে কাজ করিয়া চলিতে থাকে। এক অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির আর-একটি বিচিত্র অনুভূতিতে পৌঁছিবার মাঝখানে যে-পথ—তাহা চিন্তার পথ। এই পথ যাঁহার কাছে রুদ্ধ, তাঁহার কবিতায় খুব বেশী বৈচিত্র্য আশা করা যাইতে পারে না।

অনেকে হয়ত বলিবেন—একই অনুভূতির মধ্যেই যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। শুধু নর-নারীর প্রেমের কবিতার মধ্যেই বৈচিত্র্য-সৃষ্টি যথেষ্ট করা যাইতে পারে—এবং সেদিক হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব কোথায়? একথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—এ শ্রেণীর বৈচিত্র্যের কথা আমি বলিতেছি না। আমি যে-অর্থে ''বৈচিত্র্য'' কথাটি এখানে ব্যবহার করিতে চাই—সেদিক হইতে নরনারীর প্রেমানুভূতিকে তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন বিচিত্র সুরসমেত একটি মাত্র অনুভূতি হিসাবে ধরিতে হইবে। এবং ইহা হইতে অন্যশ্রেণীর অনুভূতিতে যাইতে হইলে বিরহ, মিলন, মান, অভিমান প্রভৃতি সমশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন অবস্থাভেদের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিলে চলিবে না—যাইতে হইবে সম্পূর্ণ ভিন্নশ্রেণীর অনুভূতিতে। এই দিক হইতে বৈচিত্র্য খুঁজিলে পৃথিবীর খুব অল্প কবির মধ্যেই রীতিমত বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

এখন পর্য্যন্ত আমরা তাহা হইলে দেখিলাম—অন্তর্নিহিত চিন্তাশীলতা না থাকিলে কোন কবির অনুভূতি বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিতে পারে না। অনেকে হয়ত বলিবেন—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জগতে আর কোনও কবির মধ্যে কি চিন্তাশীলতা ছিল না? তাহার-উত্তরে আমি বলিতে চাই—নিশ্চয়ই ছিল। প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে এইসকল চিন্তাশীল কবিদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মত অত বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে—পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর চিন্তাশীল কবি আছেন যাঁহারা চিন্তা এবং বিচারের দ্বারা জীবনের অনেক প্রশ্নের এবং সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সত্যে আসিয়া পৌঁছিয়া তাহার পর সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কবিতা লিখিতে বসেন। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবিরা কবিতা লিখিবার পূর্ব্বে যতদিক দিয়া যত বিচিত্র ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, কবিতা লিখিবার সময় ইহারা যে-অনুভূতিকে আশ্রয় করেন তাহা একাধিক বিভিন্ন চিন্তাপ্রসূত একই সত্য। সুতরাং এই সত্য যখন কবির মনের মধ্যে অনুভূতি হইয়া জাগিয়া উঠে তখন তাহা একটি অখণ্ড নির্দ্দিষ্ট অনুভূতি। কাজেই এইসকল চিন্তাশীল কবি যখন অনুভূতিতে আসিয়া পৌঁছান তখন তাহার মধ্যে বিচিত্র সুরের সন্ধান পাওয়া যায় না। চিন্তা যত বিচিত্রই হউক না কেন—এইসকল বিচিত্র বিভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি পরস্পরের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা যে-অনুভূতিটিকে সৃষ্টি করে, তাহা একটিমাত্র অখণ্ড অনুভূতি। কিন্তু বৈচিত্র্য ত' অনুভূতিতে নয়—বৈচিত্র্য এক অনুভূতি হইতে অপর অনুভূতিতে যাতায়াতের পথের মধ্যে। এই যে এক অনুভূতি হইতে বিভিন্ন অনুভূতিতে যাতায়াতের পথ, ইহা চিন্তার পথ। সুতরাং অনুভূতির সহিত যাঁহাদের চিন্তা জড়িত হইয়া না যায় তাঁহাদের অনুভূতির মধ্যে বৈচিত্র্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। চিন্তাশীলতা এবং অনুভূতি পৃথক হইয়া থাকিলে চলে না—একটির সহিত অপরটি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকা চাই।

যে-শ্রেণীর চিন্তাশীল কবিদের কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, তাঁহাদের চিন্তা যেখানে শেষ হয় সেইখানে অনুভূতির আরম্ভ এবং এই অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই ইঁহাদের কবিতা গড়িয়া উঠে।

সুতরাং ইঁহাদের কবিতার মধ্যে অনুভূতি একাই কাজ করিতে থাকে—চিন্তার সহিত এই অনুভূতির কোন সম্পর্ক থাকে না। ফলে, ইঁহাদের কবিতায় অনুভূতি বা আন্তরিকতা যথেষ্ট থাকিতে পারে; কিন্তু বৈচিত্র্য খুব বেশি থাকিতে পারে না।

কিন্তু এছাড়া আর-এক শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি আছেন যাঁহাদের চিন্তার পালা কবিতা লেখার বাহিরেই চুকিয়া যায় না—কবিতার ভিতর হইতেও নূতন করিয়া উদ্ভূত হইয়া উঠে। প্রথমোক্ত চিন্তাশীল কবিদের চিন্তাধারা আসে কবিতার বাহির হইতে,—তাই ইঁহাদের কবিতার মধ্যে চিন্তার গতিবেগ নাই। শেষোক্ত কবিদের চিন্তা উদ্ভূত হয় কবিতার বুকের ভিতর হইতে। তাই চিন্তার গতিবেগে এই শ্রেণীর কবিদের কবিতাকে কোনদিন একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেয় না—ক্রমাগত সুমুখের পানে আগাইয়া লইয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। তাঁহার কবিতার মধ্যে চিন্তা এবং অনুভূতি একই সঙ্গে কাজ করিতে থাকে। আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল কবির মধ্যে চিন্তাশীলতা খুব বেশী, তাঁহাদের কবিতার মধ্যে অনুভূতির দিকটি তেমন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। পৃথিবীর অধিকাংশ কবির পক্ষেই এই সত্য খাটিয়া যায়। এবং এইজন্যই আমাদের মধ্যে এই ধারণাটি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, চিন্তাশীলতা কবিত্বের পরিপন্থী। কথাটা আদবেই সত্য নয়। চিন্তাশীলতা কবিত্বের পরিপন্থী তখনই যখন চিন্তা এবং কবিত্ব পৃথক পৃথক ভাবে কবির মনের মধ্যে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু কবিত্ব এবং চিন্তা যখন একাকার হইয়া গিয়া একটি অখণ্ড সুরে বাজিয়া উঠে, তখন একটি অপরটিকে বাধা দেয় না—বরং একটি অপরটিকে হাত ধরিয়া চালাইয়া লইয়া যায়। কবিত্ব বা অনুভূতি সৃষ্টি করে গভীরতা, চিন্তা তাহাতে যোগ করিয়া দেয় সচলতা। গভীরতার মধ্যে মহিমা আছে, কিন্তু বৈচিত্র্য নাই। সচলতা তাহাতে বৈচিত্র্য বলিয়া জিনিষটি যোগ করিয়া দেয়। একস্থানে দাঁড়াইয়া একটি জিনিষ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে না। কূপ যত ইচ্ছা গভীর হইতে পারে, কিন্তু নদীর মত বৈচিত্র্য সৃষ্টি তাহার দ্বারা অসম্ভব। বৈচিত্র্যের মূলে আছে পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তনের মূলে আছে সচলতা। তাই যেখানে সচলতা নাই, সেখানে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না। এই হিসাবে যে-কবির কবিতা যত সচল সেই কবির কবিতায় বৈচিত্র্য তত বেশী।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সচলতা যতটা পাওয়া যায়—এতটা বোধ হয় পৃথিবীর আর-কোনও কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নিহিত এই সচলতাই তাঁহার কবিতাবলীকে এত বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। "সন্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যত-কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যে একটি ক্রম-পরিণতির অশ্রান্ত ধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে, ইহার মূলে অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে চিন্তার একটি অদৃশ্য গতিবেগ। অনুভূতি জিনিষটি নিজে হইতে চলিতে জানে না—তাহা কেবল একস্থানে দাঁড়াইয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাকে চালাইয়া লইবার জন্য চিন্তার গতিবেগের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক রসানুভূতির অন্তরালে একটি অন্তর্নিহিত গতিবেগ চিরদিনই কাজ করিয়া আসিয়াছে, এবং চিন্তার এই প্রচ্ছন্ন গতিবেগই তাঁর সারস্বত অনুভূতিকে চিরদিনই বিচিত্র ভাবে নানান দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছে,—একস্থানে দাঁড়াইয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে দেয় নাই।

তাই রবীন্দ্রনাথের খণ্ড খণ্ড অসংখ্য কবিতা আলাদা আলাদা করিয়া পড়িলে তাহাদের বিচিত্র সুর যেমন একদিকে আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তেমনি আবার তাঁহার কবিতাবলী শ্রেণী অনুযায়ী পর পর সাজাইয়া পড়িয়া গেলে একটি অখণ্ড ক্রমবিকাশের মহিমা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যদি বাহির হইতে আসিত, তাহা হইলে বিভিন্ন-চিন্তা-প্রসূত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন অনুভূতির মূর্ত্তি আমরা তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পাইতাম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার চিন্তা কবিতার বাহির হইতে আসে নাই—কবিতার ভিতর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ মনোবৃত্তি হইতে তাঁহার অনুভূতিগুলি জন্মিয়াছে সেই একই মনোবৃত্তি হইতেই তাঁর চিন্তাশীলতার জন্ম। তাই সহোদর ভায়ের মত একটি অপরটির হাত ধরিয়া ঠিক পথেই চালাইয়া লইয়া গিয়াছে।—তাই চিন্তা এবং অনুভূতির এমন অপূর্ব্বসমাবেশ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। তাই এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোন কবির কাব্যে আছে কি-না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার

আশুতোষ ভট্টাচার্য

লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের সংগ্রহ কার্য যেমন কঠিন, ইহার বিচারও তেমনই জটিল। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের যে পদ্ধতি সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ যান্ত্রিক। এমন কি, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহীত হইয়া তাহা ভিত্তি করিয়াই ইহার আলোচনা হইয়া থাকে। আজ হইতে সত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন, তখনও পাশ্চাত্য দেশে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হইবার সূচনা দেখা দেয় নাই, তথাপি তখনও সেখানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত, তাহা অনেকটা যান্ত্রিক নিয়মেরই অনুসারী ছিল। তথাপি এ' কথা সত্য, তাহাতে কতকটা হৃদয়ের স্পর্শও অনুভব করা যাইত। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই বিষয়ক যে যান্ত্রিক নিয়মটি আধুনিক যুগে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিভিন্নমুখী দিক হইতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে; প্রথমতঃ ভাষাতত্ত্বের দিক। ইহাতে প্রাদেশিক শব্দের উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া প্রতিটি শব্দ ও তাহার উচ্চারণের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন। সামগ্রিক ভাব, কিংবা রস কিংবা চিত্রের পরিবর্তে এখানে শব্দ দেহের গঠনটিই লক্ষ্য। সুতরাং ইহা সাহিত্যের প্রয়োজন নহে, ব্যাকরণের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লোক-সাহিত্য সংগ্রহের ভিতর দিয়া যে এই পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। এমন কি, কোন কোন শব্দ যেখানে তাঁহার নিজস্ব আদর্শ ও নীতিবোধে আঘাত করিয়াছে, সেখানে তিনি সমগ্র বিষয়টিই পরিত্যাগ করিয়াছেন। একটি মাত্র ক্ষেত্রে একটি ছড়া তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার একটি আপত্তিকর শব্দ তিনি পাঠকের নিকট অনেক জবাবদিহি করিয়া তবে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কথা পরে বলিব।

ভাষাতত্ত্ব না হইলেও বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য বাংলা দেশে লোক-সাহিত্যের উপকরণ রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও কেহ কেহ সংগ্রহ করিয়াছেন। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ যখন এদেশে আসিয়া বাংলা ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারই নিজেদের প্রয়োজনে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন নাই, বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্র হইতে তাঁহারা বাংলার রূপটি সন্ধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই জন্য বাংলার পল্লীজীবন হইতে তাহার ভাষার নিদর্শন সন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা কিছু কিছু বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রেই বাংলার লোক-সাহিত্য রূপে বাংলার প্রবাদই প্রথম সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে কোন প্রবাদ স্থান পায় নাই। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্ব কিংবা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উপযোগী হইবে ভাবিয়া তিনি তাঁহার লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। বাংলার আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা সম্পর্কে অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য ভাষা-তত্ত্ববিদ্

বাংলা লোক-সাহিত্যের কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, তবে তিনি উপরিউক্ত খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদিগের মত প্রবাদ মাত্র সংগ্রহ করেন নাই, বাংলা লোক-সাহিত্যের অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিযাছিলেন। তিনি উত্তর বাংলার কৃষকদের নিকট হইতে শুনিয়া 'মাণিক চন্দ্র রাজার গান' নামে যে গীতি-কাহিনী প্রকাশ করিলেন, তাহাই বাংলার লোক-সাহিত্যে প্রথম সংগৃহীত গীতিকা বা Ballad। তারপর তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সমীক্ষা (Linguistic Survey) প্রসঙ্গে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-গীতিও কিছু কিছু মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মূলতঃ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার সুবিচারের জন্যই তিনি ইহাদিগকে প্রকাশিত করিলেও ইহাদের দ্বারা আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, ইহারা প্রবাদমাত্র ছিল না বলিয়া ইহারা একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক আবেদন প্রকাশ করিতেও সমর্থ হইল; তাহার ফলেই বাংলা লোক-সাহিত্যের অনুরূপ বিভিন্ন উপকরণের অনুসন্ধানের জন্য অনেকের মনেই আগ্রহ সৃষ্টি হইল। একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, স্যার জন গ্রীয়ারসনকেই বাংলা গীতিকা ও লোক-সঙ্গীতের সর্বপ্রথম সংগ্রাহক বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তীকালে বাংলা লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হইয়া কিছু কিছু গ্রাম্যসঙ্গীত সংগ্রহ করিলেও কোনও গীতিকা তাঁহার সংগ্রহে স্থান পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লোক-সাহিত্য-বিষয়ের আলোচনায় নিজের সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কাহারও সংগ্রহের উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং দেখা যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্ব কিংবা ব্যাকরণ রচনার জন্য সেদিন লোক-সাহিত্যের যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইতেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশে সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার জন্যও অনেক সময় লোক-সাহিত্যের উপকরণ অবলম্বন করা হইয়া থাকে এবং সেই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা আমাদের দেশে এখনও নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় আছে এবং এই উদ্দেশ্যে এই পর্যন্ত কেহ আজও লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ কিংবা তাহার ব্যবহার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যদিও ইহাদের এই বিষয়ক মূল্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়, তথাপি এই উদ্দেশ্যে তাহার উপকরণ সমূহ তিনি সংগ্রহ করেন নাই। সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার জন্য লোক-সাহিত্যের যে উপকরণ সংগৃহীত হয়, তাহা সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত নীতি ও রুচিবোধ দ্বারা কোন দিক দিয়াই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না—সমাজের মধ্যে যাহা যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহা কোন দিক দিয়া পরিবর্তিত কিংবা মার্জিত করিয়া লইবার অধিকার কাহারও নাই, অবশ্য লোক-সাহিত্যের সকল উপকরণ সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য, তথাপি সাধারণ লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক যেমন তাঁহার রুচি এবং নীতিবোধের অনুগামী না হইলে লোক-সাহিত্যের বিশেষ কোন উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, সমাজ কিংবা নৃতত্ত্ববিদ্ তাহা পারেন না, তাহাতে সকল কিছুই যথাযথ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে হয়; গ্রাম্য জীবনের স্থূল পরিচয় তাঁহার পরিত্যাগ করিবার যেমন অধিকার নাই, মার্জিত করিবারও কোনও অধিকার নাই। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে তাঁহার লোক-সাহিত্যের উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই বিষয়ে কি নীতি যে তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি, 'আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে' এই ছড়াটি সংগ্রহ করিতে গিয়া ইহার শেষ চরণের অর্ধেক অংশ পরিবর্তন করিয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি পাঠক সমাজের নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করিয়াছেন,—

'এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুইটি একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভাল, তথাপি সাধারণতঃ এরূপ কলহ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী ব'লে।।'

কোন শব্দটিকে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'ইতর ভাষা' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, অথচ এ' কথা সত্য এই শব্দটি দীনবন্ধু, অমৃতলাল প্রভৃতির রচনার মধ্যে প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট নীতি, রুচি ও রসবোধ পল্লী হইতে সংগৃহীত ছড়ার মধ্যেও ইহাকে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ এ' কথাও মনে করেন নাই যে, ইহা উন্নত রুচি ও নীতিবোধ আঘাত করে বলিয়া ইহা সর্বথা পরিত্যাজ্য। তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তিনি বিশেষ একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন, পরিবর্তন করিতে না হইলে তিনিই সর্বাপেক্ষা সুখী হইতেন। ছড়ার প্রত্যেকটি শব্দই যে একটি রস, বাক্য ও চিত্রগত অখণ্ডতা রক্ষার সহায়ক, তাহা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ভদ্র সমাজে পরিবেশনের করিবার মত যোগ্যতা থাকাও যে আবশ্যক এ' কথা তিনি মনে করিতেন। এই মনোভাব কিংবা রুচিবোধ দ্বারা লোক-সাহিত্যের যে উপকরণ সংগ্রহীত হইতে পারে, তাহা সাহিত্য রসোপলব্ধির যতখানিই সহায়ক হউক, অন্ততঃ সমাজ কিংবা নৃতত্ত্ববিদের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিতে পারে না; কারণ, সমাজ কিংবা নৃবিদ্যা আলোচনার জন্য সকল তথ্যই প্রয়োজনীয়, কোন কিছুই বর্জনীয় নহে। এমন কি সমাজের গালাগালির ভাষাও সমাজতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এ কথা মনে করিতে পারেন যে, ইতিহাস রচনার প্রয়োজনেও লোক-সাহিত্যের উপকরণ ব্যবহৃত হইতে পারে। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রংপুরের কৃষক সমাজ হইতে সংগৃহীত গোপী-চন্দ্র বিষয়ক গীতি-কাহিনীতে একাদশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়ের মধ্যেই নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান করিবার পক্ষপাতী নহেন। ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে লোক-সাহিত্য যেমন সেখানে সংগৃহীতও হয় না, তেমনই ইহার কোন তথ্যই ঐতিহাসিক নজির হিসাবেও ব্যবহৃত হয় না। এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, It is like a forest tree with its roots deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits.

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ নিতান্ত আধুনিককালে এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের ভিতর দিয়া এ'কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

> 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না।'

উপরি উদ্ধৃত ইংরেজ সমালোচকের সাম্প্রতিক এই উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বেকার এই উক্তির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন, লোক-সাহিত্যের বিষয় মাত্রেরই প্রাচীন কোন ঐতিহ্য থাকিলেও ইহা নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই ইহার প্রাণধারা অব্যাহত রাখিয়া চলে। সুতরাং ইহার মধ্যে ইতিহাসের তথ্য যাহা থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ গোচর নহে, ঐতিহ্যের রূপে ইহার মর্মমূলে সমাহিত হইয়াই থাকে, যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সমসাময়িক নূতন উপকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উক্তিরও ইহাই অর্থ। 'প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ' রক্ষা করিয়াই লোক-সাহিত্যের পরিচয়, অথচ এ' কথাও সত্য যে এই সকল বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক উপকরণগুলিকে একত্র যোগ করিয়া ইতিহাসের কোন পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইহাদের মধ্য হইতে উদ্ধার করা যায় না।

> 'কোনো পুরাত্ত্ববিৎ তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না'

কথার অর্থই এই যে লোক-সাহিত্যের উপকরণ ঐতিহাসিকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না, অথচ ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন উপকরণ যে তাহাতে নাই, তাহাও নহে। কবিত্বের দিক হইতেও রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন,

> 'বালকের কল্পনা ঐতিহাসিক রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রু বাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।'

লিখিত সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমসাময়িক সমাজ-জীবনের রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে; সেইজন্য মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য হইতে কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দীরও কথা ও নাট্যসাহিত্য হইতে আমরা সমসাময়িক সমাজ জীবনের একটি পরিচয় পাইতে পারি। কিন্তু লোক-সাহিত্য হইতে তাহা পাইবার উপায় নাই। লোক-সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনের পরিচয় পাই, তাহা অতীত জীবনের নহে, ভবিষ্যৎ জীবনেরও নহে; অতীত জীবনের কোন ভার ইহা ধরিয়া রাখিতে পারে না, ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়ালোক ইহার কল্পনা অধিকার করিতে পারে না, কেবলমাত্র প্রবাহমাণ জীবনের ধারায় ইহা অগ্রসর হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে,

> 'তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে'

সেইটিই তাঁহার নিকট 'আদরণীয় বোধ হইয়াছিল,—' আর কোন প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তিনি ইহাদের সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হন নাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সাম্প্রতিক কালে কিংবা রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক কালেও যাঁহারা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল মাত্র ইহাদের প্রতি কাব্যরসের

আকর্ষণ বশতঃ এই কার্য করিযাছেন, তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ কিংবা সমাজ-নৃতত্ত্ব বিদ্ ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লোক-সাহিত্যের উপকরণ আর কেহই এ' যাবৎ সংগ্রহ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন কবির ত কথাই নাই, সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকও এই কার্যে ব্রতী হন নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ইহাদের ভিতর দিয়া যে রস-বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন, অন্য কেহ তাহা পান নাই। ইহা যে বাংলা লোক-সাহিত্যের পক্ষে একটি পরম সৌভগ্যেরর বিষয় হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের কথা বাদ দিলেও আজ প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ বাংলা দেশেই বাংলা সাহিত্যের যে অনুশীলন হইতেছে, তাহার ভিতর দিয়াও যে সকল প্রতিভার উদয় হইয়াছিল, তাহাদের কেহই এই বিষয়ের যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের কাহারও রচনার ভিতর দিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি কোন আকর্ষণের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, তাঁহাদের সাহিত্যের মূলে বাংলার লোক-সাহিত্যের যে কোন প্রভাব ছিল, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথ কেলমাত্র তাঁহার 'লোক-সাহিত্যে'র প্রবন্ধ কয়টির ভিতর দিয়াই নহে, নিজের ধ্যান ধারণার মধ্যেও ইহার রস স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যে লিখিয়াছেন,

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান"

এই ছড়াটি বাল্যকালে 'আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল' এবং 'সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই,' ইহা কেবল মাত্র তাঁহার বাংলার জাতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপের প্রতি লৌকিক প্রশস্তি বাচন নহে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ কতকগুলি পর্ব বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কথা কত গভীর সত্য। বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি আমাদের যথার্থ পরিচয় নাই বলিযা রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা এখনও সম্যক-সচেতন হইতে পারি নাই।

লোক-সাহিত্যের বিষয় মাত্রেরই সংগ্রহ কার্য স্বভাবতঃই জটিল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা আরও জটিল ছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে মানুষ হইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে পল্লীজীবনের যোগ খুব নিবিড় ছিল না। বিশেষতঃ এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি পূর্ব হইতে তাঁহার পরিচিত ছিল না, সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই তাঁহাকে কার্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার সংগ্রহের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে সেই পরিকল্পনা যে কত সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। শুধু নিজের দিক দিয়াই যে তাহা সার্থক ছিল তাহা নহে— তাঁহার নিজের সার্থকতা দ্বারা অন্যকে যে এই কার্যে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহাদের কার্যে ব্যাপক সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার প্রায় দশ বৎসর পর পর্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলার লোক-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে তাঁহার বাংলার লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন, একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে তাহাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমৃদ্ধতম রচনার যুগ। রবীন্দ্র কাব্য সাধনার দিক দিয়া তাহা প্রধানতঃ 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র যুগ, কথাসাহিত্যের দিক দিয়া 'গল্পগুচ্ছে'র যুগ এবং নাট্য রচনার দিক দিয়া নাট্যকাব্য অর্থাৎ 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জন' 'চিত্রাঙ্গদা' রচনার যুগ। রবীন্দ্র জীবনের কোনও কীর্তিকেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই, ইহাদের প্রত্যেকটি ধারাই একটি

অখণ্ড যোগ সূত্র দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং রবীন্দ্র-কবিমানসের ক্রমঃবিকাশ যাঁহারা অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহার জীবনের একটি পর্বে বাংলার লোক-সাহিত্য তাঁহার মধ্যে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার সেই যুগের সাহিত্য রস-বিচার কিছুতেই সার্থক হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোক-সাহিত্য হইতে যে রস-প্রেরণা একদিন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা'র রসোপলব্ধি যেমন সার্থক হইতে পারে না, তেমনই 'গল্পগুচ্ছে'র ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর গৃহ ও পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁহার যে মমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না। অথচ এ' কথা সত্য, রবীন্দ্র-কাব্য পাঠক মাত্রই এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ইহা রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া কোনভাবে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, তাহা কেহই এ' পর্যন্ত উপলব্ধি করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণার মৌলিক ভিত্তিটির সন্ধান করিতে না পারিলে, রবীন্দ্র সাহিত্য অনুশীলন আমাদের যে যথার্থ সত্যের সন্ধান দিতে পারিবে না, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ এ' পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক ও গবেষকের নিকট রবীন্দ্রনাথের উপর বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রভাবের বিষয় যথার্থ গুরুত্ব লাভকরিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কাব্যরসের আস্বাদন লাভ করিয়াই লোক-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বিষয়টির গুরুত্ব যত বেশি, তিনি যদি ঐতিহাসিক কিংবা সমাজ-তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লোক-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিতেন, তবে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের নিকট তাহা কোনও গুরুত্ব লাভ করিবার কথা ছিল না। কিন্তু তাঁহার লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় দেখা যায়, তিনি কবি হইয়া লোক-সাহিত্যের মধ্য হইতে কাব্যেরই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি আমার শৈশবেরর মেঘদূত ছিল।"

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-চেতনা কিংবা রবীন্দ্রকাব্যের উপর বাংলার বর্ষা প্রকৃতির প্রভাব বিষয়টি বুঝিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'শৈশবের মেঘদূত' যে কি ছিল, তাহা যে পরবর্তী জীবনে তাঁহার উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও সম্যক্ বুঝা দরকার। রবীন্দ্রনাথ যদি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ হইতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করিতেন, তবে ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সংগৃহীত তথ্য লইয়া আলোচনা করিতেন, তিনি যদি সমাজতত্ত্ব কিংবা নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিকোণ হইতে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও বিচার করিতেন, তবে সমাজ ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহার সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিতেন, কিন্তু তিনি নিজে কবি হইয়া যখন কাব্যরসের প্রেরণায় বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও বিচার করিয়াছেন, তখন রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের আলোচনায় তাহা যদি ভিত্তিরূপে স্বীকৃত না হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের মৌলিক স্বরূপটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়ে বাংলার বিদগ্ধ সমাজ সম্যক্ অবহিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছড়ার সংগ্রহ। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যে ইংরেজ ধর্মপ্রচারকগণ যে প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশে (idiom)র সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু ছড়াও সংগৃহীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ প্রবাদ-ধর্মী রচনাই ছিল এবং প্রবাদ বলিয়া মনে করিয়াই সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ অবিমিশ্রি ছড়ারই সংকলন, কাব্যধর্মী ছড়া

ব্যতীত তাহার সংগ্রহে আর কোন বিষয়ই স্থান পায় নাই। ছড়া সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ পল্লী সঙ্গীতেরও একটি আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পল্লীসঙ্গীতের স্বতন্ত্র কোন সংকলন তিনি প্রকাশ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীসমাজের কেবলমাত্র একটি অংশের সঙ্গেই যে সুনিবিড় পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার পল্লীসঙ্গীতগুলি প্রধানতঃ সেই অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরবর্তী কাল হইতে বাংলার পল্লীসঙ্গীতের যে সুবিপুল সম্ভার সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে 'গ্রাম্য-সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসঙ্গীতের উদ্ধৃতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইবে। তথাপি এ' কথা সত্য পল্লীসঙ্গীতের মধ্যেও যে উচ্চাঙ্গের কাব্যসম্মত জীবন-রস আছে, তাহা তিনিই সর্বপ্রথম আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। পল্লীসঙ্গীতের নিজের সংগ্রহ ব্যতীতও তিনি এই পথে বহু উৎসাহী কর্মীকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সমস্ত জীবন-ব্যাপী এই বিষয়ক তাঁহার অনুরাগ কোন দিক দিয়াই শিথিল হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই।

ছড়া এবং সঙ্গীত ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের আর কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন নাই। লোক-কথা (Folk-tales)র ভিতর দিয়াও তাঁহার যে অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ কোন লোক-কথা-সংগ্রহের ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাইলেও, তিনি তাঁহার জীবনে ইহার সুগভীর প্রেরণার কথা স্বীকার করিয়া যেমন প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তেমনই বিভিন্ন সংগ্রাহককে এই কার্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছড়ার সংগ্রহ 'ছেলে ভুলানো ছড়া' বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাঁহার সংগৃহীত ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছড়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়; প্রথমতঃ ছেলে ভুলানো ছড়া, দ্বিতীয়ত ছেলেখেলার ছড়া। এই দুই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি শিশুর জননী কিংবা শিশুধাত্রীর রচনা, সেইজন্য ইহাদের দেহে ও আত্মায় পরিণত বুদ্ধির স্পর্শ লাগিয়া যায়। শিশু ইহার অর্থ বুঝেনা, মাতৃকণ্ঠে উচ্চারিত সুরটুকু শুনিয়াই মুগ্ধ হয় মাত্র। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য হইতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে। যেমন,

> মাসি পিসি বনগাঁ বাসী বনের মধ্যে ঘর।
> কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।।
> কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
> এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন।।

ইহার মধ্য দিয়া শিশুর অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তির পরিবর্তে যে পরিণত জীবন ও সমাজ-বোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্কের আন্তরিকতা ও নিবিড়তার কথা স্মরণ করিলে মাসি কিংবা পিসির কথা যে কিছুতেই আসিতে পারে না ইহাই এই ছড়াটির বক্তব্য। ইহা সুপরিণত জীবন অভিজ্ঞতার পরিচায়ক, শিশুর অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র নহে। এই শ্রেণীর ছড়া শিশুর রচনা নহে; বরং পরিণত বুদ্ধি মানব-মনেরই সৃষ্টি। সেইজ্য ইহার যে আবেদন শিশুর নিকট প্রকাশ পায়, তাহা ইহার অর্থগত কিংবা ভাবগত নহে; বরং ইহার একান্ত সুর এবং ছন্দোগত। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বলিয়াছেন এবং তিনি কেবল মাত্র ছড়ার ভাব দ্বারা নহে, ছড়ার ছন্দ দ্বারাও যে কি ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্য পাঠকের অবিদিত নাই। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত বাংলা

কাব্যের ছন্দ বাংলা প্রাচীন রীতিকেই অনুসরণ করিয়াছিল, এমন কি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যতই নূতন ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত হোন না কেন, বাংলার ছড়ার ছন্দকে কোন দিক দিয়াই তিনি তাঁহার কাব্য রচনায় নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলার অলিখিত (Unwritten) সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপকে লিখিত সাহিত্য ধারার মধ্যে সার্থকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোক- সাহিত্য-প্রীতির ভিতর দিয়াই বাংলা ছড়ার ছন্দের যথার্থ শক্তির পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে দ্বিতীয় যে আর এক শ্রেণীর ছড়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিষয় খেলা। এই ছড়াগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহারা কিশোরমতি ছেলেমেয়েদের নিজস্ব রচনা, ছেলেভুলানো ছড়ার মত শিশুধাত্রীর রচনা নহে। শিশুর রচনা বলিয়াই ইহারা অর্থহীন, কিন্তু ছন্দ কিংবা তালহীন নহে, বরং ছন্দ ও তালের পরিচয় ইহাদের মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।।
বাজতে বাজ্‌তে চল্‌ল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলা পুলি।।
কমলা পুলির টিয়েটা।
সূয্যি মামার বিয়েটা।।
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই।। ইত্যাদি

খেলার ছড়া বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে, যেমন ছেলেদের খেলার ছড়া, মেয়েদের খেলার ছড়া, ইহাদের মিশ্র খেলার ছড়া। নিজেরা ছড়া বলিতে আরম্ভ করিয়া ছেলে এবং মেয়েরা প্রথম এক সঙ্গেই খেলা করিয়া থাকে, তখনকার ছড়াগুলি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ছেলে এবং মেয়েদের খেলা পৃথক্ হইয়া যায়; ছড়ার ভিতর দিয়া এই পার্থক্যের পরিচয়টিও গোপন থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের মধ্যে ছেলেদের স্বতন্ত্র খেলার ছড়া নাই বলিলেই হয়; এমন কি, কোন ছড়ার মধ্যেই মেয়েদেরও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র খেলার ছড়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ অনুভব করা যায় না —কেবলমাত্র মিশ্র খেলার ছড়ার পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। উপরে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা মিশ্র খেলার ছড়ারই নিদর্শন। ছড়াটি একটি ডোম চতুরঙ্গের বা যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু নিতান্ত ঘরকন্নার কথা দিয়া শেষ হইয়াছে। সেইজন্য ইহার প্রথমাংশে একটু পৌরুষের স্পর্শ থাকিলেও শেষাংশে অন্তঃপুরজীবনের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং পুরুষ এবং নারী উভয়ের জীবন অভিজ্ঞতারই পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে এই শ্রেণীর ছড়ার সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নাই।

রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ যত অসম্পূর্ণই হোক, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি লোক-সাহিত্যের যে বিচার করিয়াছেন, তাহা কোন দিক দিয়াই অসম্পূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই। তিনি ইহার মূল সুর ও তত্ত্বটির সন্ধান পাইয়া ছিলেন বলিয়া ইহার সম্পর্কে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র আমাদের দেশের নহে, সর্বদেশেরই লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও বিচারের ভিত্তি স্বরূপ হইতে পারে।

'জগৎ দেখিতে হইব বাহির'

প্রমথনাথ বিশী

কবি কাহিনীতে দেখিয়াছি নলিনীর ব্যক্তিগত প্রেম কবিকে দীর্ঘকাল তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই, তিনি নলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহৎ মানব-সমাজের পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করিলেন কিন্তু তৃপ্তি কোথায়? কবি ভাবেন একী হইল—নলিনীর ব্যক্তিগত প্রেম আর বৃহৎ মানব সমাজের অস্পষ্ট প্রেম দুইই সমান অতৃপ্তিকর। এমন হওয়া কি অসম্ভব যে ব্যক্তি-গত প্রেম ও সার্ব্বজনীন প্রেমের সমন্বয়েই তৃপ্তি! ব্যক্তি প্রেম বৃহতের পটভূমিতে স্থাপিত হইলে তবেই হয়তো সত্য হইয়া উঠে, এখানে তাহা হয় নাই বলিয়াই হয়তো এমন নৈরাশ্যজনক হইল। কবি যে তখন এই কথাগুলি এমনভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কবি কাহিনীতে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কাব্য সমূহের সাক্ষ্যে এমন মনে করা অন্যায় নয়।

কবি কাহিনীতে তিনটি সত্যকে পাই, নলিনী বা মানুষের ব্যক্তিরূপ, বৃহৎ মানব সমাজের রেখাক্ষরে অঙ্কিত অস্পষ্টরূপ আর প্রকৃতি। এই তিনের মধ্যে এই বয়সে প্রকৃতির সঙ্গেই কবির কিছু পরিচয় ছিল—তাই তিনি শেষ পর্য্যন্ত নলিনীর যখন মৃত্যু হইল, বৃহৎ মানব সমাজ যখন পরিচয়ের অস্পষ্টতায় তাঁহাকে হতাশ করিল—তখন প্রকৃতির কাছে শেষ সান্ত্বনা লাভের আশায় আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। প্রকৃতি তাঁহাকে বঞ্চিত করে নাই। বিশ্বপ্রকৃতির যোগ্য প্রতিনিধি হিমালয় কবি মনের নির্ভর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই হিমালয়ও আর ঠিক আগের নলিনীর সহিত কবির পরিচয় লাভের আগের প্রকৃতি নয়। ইহা নলিনীর দেহাতীতরূপে সমৃদ্ধতর। কবি জানেন যে মানুষের মন চায় মানুষেরই মন, যে মানুষের মনের প্রসঙ্গেই কেবল মানুষ নয় প্রকৃতিও পূর্ণাঙ্গ। আবার তিনি অবচেতনভাবে জানেন না যে প্রেমের ব্যক্তিরূপটাও প্রেমের সার্ব্বজনীনরূপের প্রসঙ্গেই পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় যে মানব সমাজের ঘনিষ্ট পরিচয় লাভটা কবিজীবনের মুখ্য ও অপরিহার্য্য উদ্দেশ্য। এবারে সেই পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা। প্রভাত সঙ্গীত বিশ্ব পরিচয়ের গঙ্গোত্রী।

আধুনিক আলঙ্কারিকগণ কাব্যে image বা চিত্রোপমার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁহারা বলেন চিত্রোপমার মধ্যে অজ্ঞাতসারে কবিমনের গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-কাব্যের চিত্রোপমা সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য সন্দেহ নাই। বোধকরি রবীন্দ্র-কাব্যের সার্থকতম চিত্রোপমা নদী প্রবাহ। বারে বারে ইহার দেখা পাওয়া যাইবে। নদী প্রবাহ যেমন ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে তেমনি এই উপমাটি ক্রমেই গুরুতর অর্থবাহী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের পদ্মানদী ইহারই বাস্তবমূর্তি। ইহারই আনুষ্ঠানিক ও প্রথম নিঃসংশয় প্রকাশ প্রভাত সঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে—যখন ভগ্ন স্বপ্ন নির্ঝর 'জগৎ দেখিতে হইব বাহির', বলিয়া গহ্বর ছাড়িয়া বৃহৎ-বিশ্বের মুখে বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। শৈশব সঙ্গীতের পথিক কবিতাতেও এই ভাবটি বিদ্যমান কিন্তু চিত্ররূপের অসম্পূর্ণতা হেতু তেমন করিয়া বাণীবাহী হইয়া উঠিতে পারে নাই। পথ চলায়, কিন্তু নিজে চলে না। নদী চলে এবং চালায়—বাণী বাহী উপমা হিসাবে

ইহাতেই তাহার পূর্ণতা। ভগ্ন স্বপ্ন নির্ঝর, ইহা কবি-সত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনার জীর্ণ ও ক্ষুদ্র গহ্বর ছাড়িয়া, ক্ষুদ্র বলিয়াই জীর্ণ-বৃহৎ জগতের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।

সেখানে কবি-নির্ঝরের কি কাজ?

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙ্গিব পাষাণকারা;
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতা আহ্বান সঙ্গীতে গুহাবদ্ধ কবি নির্ঝরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা দেখিতে পায়।

ওরে তুই জগৎ-ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খ'সে,
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস বসে।

এ জগৎ সর্ব্বজনের বৃহৎ জগৎ নয়। গুহাবদ্ধ নির্ঝরের জীর্ণ ও ক্ষুদ্র জগৎ। কথাটা কবি স্বয়ং স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

> ''জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে, সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়—যেমন নবোদ্গত, দন্ত শিশু মনে করেছেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন।''
> —প্রভাত সঙ্গীত, জীবন স্মৃতি।

কিন্তু একবার বৃহৎ জগতে বাহির হইয়া পড়িবা মাত্র ক্ষুদ্র জগতের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া যায়—তখন নির্ঝর 'অনন্ত জীবনের' আস্বাদ পায়—

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দলহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন উঠিলি আর কখন মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ।

নির্ঝর যতই অগ্রসর হইতেছে ততই জীবন লক্ষ্য তাদের সম্মুখে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে

আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান।
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

তখন আর সে একক নয়, তখন সকলের সঙ্গে সমস্রোতে তাহার যাত্রা—

জগৎ স্রোতে ভেসে চলো
যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবিশশী—
চলো রে সেথা যাই।

এবং অবশেষে—

জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা।

'মানুষের ধর্ম্ম' প্রবন্ধের 'মানব সত্য' নামে পরিশিষ্টে প্রভাত সঙ্গীতের নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কবি নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নির্ঝর যে জগতের অভিমুখে বর্হিগত কবি তাহার নাম দিয়াছেন—''সর্ব্বমানবচিত্তের মহাদেশ।''

'অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারও চিত্ত হয়তো বা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারো বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু, একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। ... এই হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করলো। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে সঙ্গে যোগমুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্য অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব তারই মধ্য দিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্য দিয়ে। এই যে ডাক পড়লো, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে পড়েছে এক জায়গায়...

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিলো, মানবধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, —সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহা সমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিয়ে তিনি সর্ব্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।' —মানব সত্য, মানুষের ধর্ম্ম।

এই ব্যাখ্যার পরে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল একটি কথা। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতাকেই কবি নিজ জীবন তত্ত্বের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিযা লইয়াছেন দেখা যায়। আমরাও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই ক্রমঃস্ফীত নদীর দুই তীরে, একতীরে ''সুখ দুঃখ বিরহ মিলন'' মানুষের সংসার, অন্যতীরে ''নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্য লোক''—রবীন্দ্র সাহিত্য জগৎ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা

নীহাররঞ্জন রায়

রবীন্দ্র-চিন্তায় একটি জীবন্ত রূপ আছে। যে মৌল প্রত্যয়গুলি লইয়া তিনি যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন তাহা কোনদিনই পরিবর্তিত হয় নাই; বরং তাঁহার জীবৎকালীন অশীতিবর্ষেরপ্রবল সংবেগমণ্ডিত বিশ্বইতিহাসপ্রেক্ষিতে তাহা সম্প্রসারিত হইয়াছে। কয়েকটি মূলসূত্রে এই প্রত্যগুলি বিধৃত। সূত্রগুলি এই : মানবতায় বিশ্বাস, সীমাহীন মানবপ্রেম, শান্তি, প্রীতি, ঐক্য ও সংহতিতে সমাজ-আদর্শের সন্ধান, সর্ববিধ নিপীড়ন, সংকীর্ণতা ও উগ্র প্রাদেশিকতার বিরোধিতা এবং যে পথ সহজ সরল, যে পথ কেন্দ্র হইতে বহুমুখী সেই পথকে একমাত্র পথ বলিয়া গণ্য করা। ইতিহাস কোনদিন কবিকে অতিক্রম করে নাই; তাঁহার কবিমন তাঁহাকে ইতিহাসে সহযাত্রী করিয়াছে এবং ইতিহাসের লক্ষ্য নির্দেশে সামর্থ্যদান করিয়াছে।

প্রথম পর্বে আধুনিক পৃথিবীর সম্মুখে অতীত ভারতের আদর্শায়িত রোম্যাণ্টিক রূপ তুলিয়া ধরেন। ব্রিটিশ বিজয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ছিল বহু সহস্র বর্ষের প্রাচীন পঙ্গুপ্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা। ব্রিটিশ বিজয় এই ভিত্তিভূমি ধ্বংস করিল এবং তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা সেই পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার সহিত আমাদের অঙ্গাঙ্গী সামঞ্জস্য নয়, তাহা এক আরোপিত নগর সভ্যতা; একান্তই কুশ্রী, সকল নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধবর্জিত। ভারতীয় গ্রামজীবনের সমূহ বিনষ্টি ঘটিল। নূতন একটি অর্ধ-সামন্ত পরগাছা শ্রেণীর অভ্যুদয়ে কৌম-কৃষি-প্রথা অবসান হইল, বিদেশ হইতে আনীত স্তূপীকৃত যন্ত্রজাত পণ্যসম্ভারে কুটীরশিল্প বিনষ্ট হইল।

এই দীন হতশ্রী ও মলিন পরিবেশের প্রতিবাদে এবং বলপ্রয়োগে সমাজের পুর্নগঠন সম্ভব নয় স্থির জানিয়া (বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এইখানেই তাঁর প্রভেদ), রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় সারল্য, ঔদার্য ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শ তুলিয়া ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায়, বিশেষত রাজসিংহ, আনন্দমঠ ও সীতারাম উপন্যাসে যে উগ্র জাতি-অভিমান ও হিংসাত্মকতা প্রচার করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে, ততোধিক তাঁহার গদ্য প্রবন্ধে, বিশেষতঃ গোরা ও ঘরে-বাইরে দুইটি উপন্যাসে তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্নতর একটি আদর্শ তুলিয়া ধরেন। সেই আদর্শ যে কেবল কল্পলোকের নহে, তাহা যে বাস্তবায়িত করাও সম্ভব, তাহা প্রমাণের জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে এমন এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন যাহা উপনিষদীয় আদর্শে পরিকল্পিত। পরবর্তী বিশ বৎসরকাল ইহাতেই তিনি তাঁহার সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করিলেন।

ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রথম বিদ্রোহ স্বদেশী আন্দোলনে তিনি নিজেকে কায়মনে সমর্পণ করিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইহার পুরোহিত, প্রবক্তা ও চারণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি যে আদর্শ কল্পনা করিতেন, যাহাকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন, স্বদেশী আন্দোলনের তাহাই লক্ষ্য। তাঁহার আদর্শের ভারতবর্ষ কেবল বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইবে না।

সর্বপ্রকার নৈতিক এবং মানসিক কলুষমুক্ত হইবে; ভারতবর্ষের সমাজ বলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না, প্রতিষ্ঠিত হইবে আন্তরসংহতিতে; বিকেন্দ্রীত অর্থ নীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়, যাহার বিশদ ব্যাখ্যা তিনি একের পর এক প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন বুয়র যুদ্ধে নূতন এক পাপশক্তির উত্থান, নূতন ভাষ্য দিলেন জাতীয়তাবাদের; এবং স্বদেশী আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, তাহাতে স্বদেশেও তিনি অনুরূপ প্রবণতার সূত্রপাত দেখিয়া (যদিচ এই দেখায় তাঁহার ত্রুটি ছিল) সমর্থন করিতে পারিলেন না।

১৯০০ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত একটি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পর্ব। এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষ বিগত শত শত বৎসরের তুলনায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এশিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেখা দিল জনগণের এক রাজনীতিক অভ্যুত্থান। বিদেশীর বিজয়ে যে ব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতে প্রত্যাবর্তন না করিয়া ভিন্নতর এক স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা জনচিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিল। এই আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বভাবতই অস্ফুট ইহার প্রথম প্রকাশ ঘটিল কেবলমাত্র হিংসাত্মক কার্যকলাপে ও যাবতীয় বিদেশী দ্রব্য বর্জনে।

এই দশকে কবি তাঁহার জীবনে প্রথম এবং শেষবার সক্রিয়ভাবে রাজনীতিক সংগ্রামে যোগদান করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রবন্ধ, সংগীত ও ভাষণের আগ্নেয় উদ্দীপনা সমগ্র জাতিকে মাতাইয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহার তৎকালীন কাব্যে ইহার অনুরূপ প্রতিফলন পড়ে নাই, কবিতার বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে ছিল দূরাশ্রয়ী। কিন্তু ইহা কেবল আপাতবিচার। কেননা, এই সময়ে রচিত অন্য কাব্যগ্রন্থ না ধরিলেও কথা, কাহিনী ও নৈবেদ্যকে তাঁহার গদ্য রচনাবলী ও গানের সম্পূরক বলা যাইতে পারে। উপনিষদের স্বীকরণজাত যে ধ্যান-ধারণাগুলি তিনি স্বদেশী আন্দোলনে অনুস্যূত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাই নৈবেদ্যের সনেটগুলিতে, সনেটগুলির ধর্মীয় ভাববস্তু সত্ত্বেও, চিত্রকল্পে ও প্রতীক ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চৈতালির অধিকাংশ সনেট এবং স্বদেশ ও উৎসর্গের কবিতাগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

তারপর যখন স্বদেশী আন্দোলন আক্রমণ ও হিংসাত্মক দিকে ফিরিল তখন অকস্মাৎ কবি সরিয়া দাঁড়াইলেন। ১৯১৯ সালে এবং তৎপরবর্তীকালে যখন গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তিনি তাহাতে যোগ দেন নাই; বরং ইহার কয়েকটি নেতিবাচক দিকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৯৩০ সালে যখন গান্ধিজী লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ নিস্পৃহ নিরপেক্ষ ছিলেন।

অবশ্য এরূপ মনে করা কখনোই সঙ্গত হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণ এবং তাহাদের ব্যথা-বেদনা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে নৃশংস হত্যালীলায় প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম প্রতিবাদবাণী উচ্চারণ করেন; প্রতিবাদে 'স্যর' পদবী বর্জন করিয়া বড়লাটকে তাঁহার লিখিত পত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ক্লাসিক পর্যায়ী রচনা। দেখা যায়, দেশবাসীর প্রতি তাঁহার প্রীতি এবং দাসত্বমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার অনীহা ক্রমশঃ বাড়িয়াছে। তাই মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পূর্বে তিনি লিখিলেন সেই বহুবিশ্রুত পুস্তিকা 'সভ্যতার সংকট', আর তাহাতে সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে কবির চূড়ান্ত রায় উচ্চারিত হইল, অপরের দাসত্ব ও সর্ববিধ সুকুমার মূল্যবোধের সমাধির উপর যাহার ভিত্তি।

বিশ ও ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ কেবল স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রহিলেন না। স্বদেশী আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার পর হইতেই তাঁহার চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের

পরিপ্রেক্ষিতে স্বকীয় ভঙ্গিতে পরিণতি লাভ করে। ১৯৩০ সালে যখন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শনে গেলেন তাঁহার ধ্যান-ধারণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি গ্রহণ করিল। তাঁহার মানস-পরিণতির সহিত বিশ্বের মনন ও চিন্তারাজ্যের সংযোগ ঘটিল; ভারতের জাতীয় কবি থাকিয়াও রবীন্দ্রনাথ হইলেন বিশ্বকবি। তাঁহার চিন্তাধারা স্বকীয় যুক্তিপন্থার জোরেই ভাববাদের কোটর হইতে মুক্ত হইল, এখন আর বাস্তব পৃথিবী ও তাঁহার ভাবজগতের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না।

কবি লিখিলেন 'মানুষের ধর্ম'; বহুকাল হইতেই ধীরে ধীরে ইহার বিকাশ ঘটিতেছিল; উপনিষদীয় প্রতিশব্দে ও চিন্তায় বস্তুত ইহা বিশ্বমানবিকতারই সর্বাধিক প্রগতিশীল অভিপ্রকাশ। বিশ্ব মানবের মুক্তি ও সমানাধিকার প্রয়াসে এই সময় হইতেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীমণ্ডলীতে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। গোর্কি ও রল্যাঁর মতই তিনি নূতন জীবনবেদের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা রূপে আবির্ভূত হইলেন। ফ্যাসিস্ত বর্বরতায় লাঞ্ছিত মানবতার বিবেক তাঁহার মধ্যে মূর্ত; বিশ্বশান্তি ও স্বাধিকারের দাবি তাঁহার কণ্ঠে বাণী লাভ করিল এবং স্বদেশী আন্দোলনের মতই তিনি বিশ্বমুক্তির ক্ষেত্রেও পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। কেবল স্বদেশের স্বাধীনতা নহে, শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে সর্বমানবের মুক্তিই তাঁহার লক্ষ্য। ইহার পর হইতেই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার আত্ম-অপসরণের অবসান ঘটিল; এবং আমরা দেখিতে পাই কবি নিঃসংশয়িত ব্যক্তিত্ব লইয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

সুতরাং রবীন্দ্রমানসের পরিণতি অনন্য, অনবদ্য। কেবল ভারতের ইতিহাসেই অনবদ্য নহে, বিশ্ব-ইতিহাসেও তাঁহার তুল্য ব্যক্তিত্ব বিরল। একটি কৃষ্টিধারার প্রভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া এমন জীবনচর্যা আবিষ্কার করিলেন যাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন কৃষ্টিধারার জনয়িতা। যখন জাতি বলিতে কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুঝাইত, সেই সময়ে জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি এই কৃষ্টির সকল সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং সমগ্র জাতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্পূর্ণ তাল রাখিয়া চলিয়াছিলেন। জীবনের গোধূলি-পর্বে কবি সর্বজাতির উদবর্তনে একজাতির স্বপ্ন দেখিতেন। যে জাতীয় ঐতিহ্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই অনুরূপ পরিধি-প্রসার, গভীরতা ও তাৎপর্যের সম্ভাবনা নিহিত ছিল তাই এই উদ্‌বর্তন সহজসাধ্য হইয়াছিল।

তাঁহার পূর্বে আমাদের লেখকেরা ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টির কোন একটি বিশেষ দিককেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই উপাদানেই তাঁহারা এক একটি ভাবজগৎ গঠনে আপনাদের সাধনাকে নিয়োজিত করিতেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম কবি, যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসপ্রেক্ষিতে তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই পরিপ্রেক্ষিত ক্রমশ ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে থাকে।

জাতীয়তাবাদের আছে দুইটি দিক; এবং যে গতিশীলতা সমগ্র জাতিকে নূতন আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বৈজয়ন্তীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, তাহা ঐ দুইয়ের সমন্বয়েই সম্ভব। একটি দিকের দৃষ্টি সম্মুখভাগে, তাহা বহির্মুখী, তাহা বহিরবিশ্বের অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করিতেছে; অন্যটির দৃষ্টি পশ্চাদ্‌ভাগে, তাহা সমান আগ্রহের সহিতই অতীত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করে এবং অতীত মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও সুনিশ্চয়তাজাত একটি জাতীয় ভাগ্যের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

যাঁহার উপরে জাতীয় আদর্শ বিধানের দায়িত্ব পড়ে, তিনি এমন বিষয় ও শৈলী আবিষ্কার করেন যাহা অতীত ও বর্তমানকে সংযুক্ত করিতে পারে; তাহাতেই ঐ দুইদিকের সমন্বয় হয়। রবীন্দ্রনাথই ইহা সম্ভব করিয়াছিলেন। এই আদর্শের একটি দিক লক্ষণীয় আবেগ-উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া ইহা

জাতিকে ব্যাপকতা দান করিল, একটি পন্থা নির্বাচন এবং সেই পথেই অগ্রসর হইল। এই নূতন মতাদর্শ সত্য না মিথ্যা তাহা সহজেই বিচার্য। নূতন নূতন শ্রেণীর সংযোগে ইহা কি জাতিকে বৃদ্ধির দিকে লইয়া যায় নাই এবং পূর্ববর্তী কালের পুরাতন মতাদর্শগুলির তুলনায় ইহা কি নূতন মানসিক ও আত্মিক পরিপুষ্টি বিধান করে নাই? ইহা কি জাতিকে অন্যান্য দেশের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা করে নাই ঐক্য ও সংহতির নূতন রাখীবন্ধ রচনা করে নাই? অথবা ইহা জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, আক্রমণে উৎসাহ দিয়াছে এবং ভূয়া মহত্ত্ব ও অধিকারবোধে প্ররোচিত করিয়াছে?

এই সকল মানদণ্ডে বিচার করিলে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর জন্য রবীন্দ্রনাথ যে মতাদর্শ সৃষ্টি করিলেন, তাহাকে অবশ্যই মহৎ ও প্রগতিশীল বলিতে হয়। সচেতনভাবে বা অচেতনভাবেই হউক তিনি নূতন কৃষ্টিধারার ভিত্তি স্থাপনা করেন এবং তাহার উপরে তিনিই সেই সমন্বয়সৌধ গঠন করিলেন যে-সম্বন্ধে আমি পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ব্যতীত অতীতের পুনরুদ্ধার এবং বহির্বিশ্বের নূতন শক্তিসম্ভার বিচ্ছিন্ন, বিনষ্ট, টুক্‌রা-টুক্‌রা জিনিসে পরিণত হইত। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ পূর্বসূরিগণ ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার উপরে সমকালীন ভারতবর্ষ ও জাতীয়কৃষ্টির কাঠামো রচনার কাজ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের জাতীয় পরিণতির পথ এবং কৃষ্টির রূপরেখা তিনিই গঠিত করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র দেশ তাঁহাকে আচার্য, গুরুদেব বলে। ইহা মোটেই আলংকারিক ভাবোচ্ছ্বাসমূলক অতিশয়োক্তি নহে; ইহাকে নিছক কৃতজ্ঞতা প্রকাশও বলা অনুচিত; ইহা সত্য ঘটনারই বিবৃতি। গান্ধিজী তাঁহাকে যথার্থই 'মহান প্রহরী' বলিয়াছেন। শত শতাব্দীর মধ্যে দিয়া ভারতবর্ষ যে মৌল মানবিক, এবং আত্মিক মূল্যবোধগুলি লালন করিয়া আসিয়াছে, তিনি ছিলেন তাহারই প্রহরী এবং পুনরুদ্ধারক।

কী অর্থে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রতিভা এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। তিনি বিশ্বখ্যাত মনীষীদের অন্যতম, যেহেতু বিশ্বের জাতিসভায় তিনি ছিলেন প্রস্তূয়মান একটি জাতিসত্তার প্রবক্তা।

১৯২০ সালের পর হইতে ভারতের আর্থিক ও রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সেই শক্তি নিহিত ছিল যাহা পৃথিবীর ভাগ্য রূপান্তরিত করিতেছে। প্রাচীন ভারতের দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এখন বিশ্বঐতিহ্যের অন্তর্গত, নূতন চিন্তা ও মননের রাজ্যে তাহার দানও যথেষ্ট। উপনিষদ, বৌদ্ধ দর্শন ও মধ্যযুগীয় মরমিয়াবাদের পুনরুজ্জীবনে নতুন ভাবধারার প্রবর্তন ঘটিয়াছে এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে সৃজনের নব নব সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের মহান গণ-বিদ্রোহ আন্তঃমহাদেশীয় বিদ্রোহের প্রস্তাবনা। আগামী বহু বর্ষের পৃথিবীর ইতিহাস ভারতের রাজনীতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফলাফলের উপরই নির্ভর করিতেছে। আজ ভারতবর্ষ জগৎ সভায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রনায়কের মর্যাদায় আসীন।

উনিশ শতকেও ভারত প্রশংসা পাইয়াছে, কিন্তু এখন আর শুধু প্রশংসা করে নাই। আমাদের দেশ প্রমাণ করিয়াছে যে ভারতবর্ষ কেবল ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের যাদুঘর নহে। যে সকল শক্তি বহু পূর্বেই অবসিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইত, তাহারা পূর্বের মতই এখনো প্রাণবন্ত রহিয়াছে এবং অন্যত্র অনুষ্ঠিত সর্ববিধ আন্দোলনের সহিত সংযোগসূত্ররক্ষায় সক্ষম।

ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছে এবং আজ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আধুনিক ইতিহাস সকল ক্ষেত্রে সংগ্রামের ইতিহাস এবং এই সংগ্রাম রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রাপেক্ষা চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন মতেই অপ্রধান নয়। এই সংগ্রামক্ষুব্ধ আধুনিক ইতিহাসে ভারতবর্ষ একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

যে ভবেই দেখি না কেন, বর্তমান চিন্তাজগতে ভারতবর্ষের যে প্রাধান্য তাহা যতখানি রবীন্দ্রনাথের জন্য ততখানি অপর কাহারও জন্য নহে। এই কারণেই তিনি বিশ্ব-প্রতিভা।

তিনি নিজের সৃষ্টিকে বিশ্বমুক্তি সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়াছেন এবং সেই উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সেবা করিয়াছেন। তাঁহার হাতে জাতীয় সংস্কৃতি স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করিল, পরিণতি লাভ করিল, শক্তি ও শ্রী সমন্বিত হইল এবং মানবতার ভবিষ্যৎ-সেবায় নিয়োজিত শক্তিসমূহের সঙ্গে সংগ্রথিত হইল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি এমন সময়ে রচনা আরম্ভ করেন যখন বর্তমান ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ছিল অস্ফুট। কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। কীরূপে বহুবিচিত্র ধারা কোনো অচল ব্যবস্থার ছকে না পড়িয়া গতিশীলতায় সুসমঞ্জস হইবে, যাহার ফলে অতীতের সকল ঐশ্বর্য এবং ভবিষ্যতের সকল সম্পদ অঙ্গীভূত করিয়া একটি একাত্মকরণ সম্ভব হইবে। রবীন্দ্রনাথ এই একাত্মকরণ সম্ভব করিলেন, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য নিরূপণ করিয়া দিলেন এবং বর্তমান পৃথিবীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই ঐতিহ্যে প্রাণ সঞ্চার করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই একাত্মকরণ দুই উপায়ে সম্ভব করিলেন—প্রথমতঃ জাতির অতীতকে এবং দ্বিতীয়তঃ স্বদেশবাসীকে গভীরভাবে ভালবাসিয়া। প্রথমটি তাঁহাকে সহায়তা করিল ভারতীয় সামাজিক জীবনের অন্তঃস্রোতধারা আবিষ্কারে এবং দ্বিতীয়টি সাহায্য করিল নূতন পথের সন্ধান পাইতে, যে পথে এই ধারাগুলি অবশ্যই প্রবাহিত হইবে যদি তাহারা স্রোতহীন জলাভূমিতে পরিসমাপ্ত না হয়। অতীত প্রীতি এবং স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি এই দুই শক্তি, তাঁহার মহৎ প্রতিভায় গতিসঞ্চার করিয়াছিল এবং এই প্রতিভার প্রকাশের পথও নির্ধারিত করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ কখনোই থামেন নাই। এ বিষয়ে অনেক মহৎ কবির সহিত তাঁহার গরমিল, মিল যদি থাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সহিত আছে। শেষ পর্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি ও সংবেদ তীক্ষ্ণ ও সচেতন ছিল; জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের নানা নূতন তথ্য তাঁহার মনে নূতন নূতন সৃষ্টিশীল প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু বৎসর পর্যন্ত নূতনতর বিষয়, আঙ্গিক ও সমস্যা তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল এবং প্রাণতায় বা প্রাচুর্যে সেখানে কোন অভাব ছিল না। কোথা হইতে তিনি এমন শক্তি পাইলেন? স্বজাতির মধ্য হইতে এবং যে বৃহত্তর জীবনে জাতি ক্রমশঃ প্রধানতর ভূমিকা গ্রহণ করিতেছিল সেখান হইতেই তিনি শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন, কেননা ইহার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয় নাই। এই দিক হইতে বিচার করিলে রামমোহন যে কাজ সুরু করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথই তাহার পরম সমৃদ্ধির প্রতীক। বরং তিনি তাহা হইতেও অধিক।

আমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিতে এক সাংঘাতিক বিরোধ থাকিয়া গিয়াছিল। সত্যই খুব কম লেখকই দুই প্রান্তসীমায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই বিরল লেখকদের মধ্য অন্যতম। কোনো সংস্কৃতির সারমর্ম তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রতিবার মধ্যেই প্রকট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই বিরোধের সমাধান করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কি পারিয়াছিলেন? অবশ্যই তিনি পারিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাকে আমরা ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য বলিয়া চিহ্নিত করিতাম না। সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই একাকী সেই বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, তখনকার কালে ইহা অসাধ্যসাধন; আবার শেষ পর্যন্ত তিনি যাহা রক্ষা করিলেন তাহার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মূলগত পার্থক্য সামান্য।

রবীন্দ্রনাথেও সেই ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রতি গভীর অনুরাগ, সেই জাতীয় ভাগ্যে আস্থা। নিশ্চিতভাবে বলিতে গেলে উপনিষদীয় ও মধ্যযুগীয় মানবতায় রবীন্দ্রনাথের আরো পরিচ্ছন্ন, আরো স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অন্তর্বিরোধে পঙ্গু মধ্যবিত্ত চিন্তাকে তাঁহার যে শক্তি ও গতিধর্ম লালন করিয়াছিল এইটুকু বলিলেই তাহার যথার্থ ব্যাখ্যা হয় না। আমরা রম্যা রল্যাঁর সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়াছি। কিছুদূর পর্যন্ত এই তুলনা সত্য; কিন্তু পার্থক্যটিও লক্ষণীয়। রল্যাঁ একটি বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দর্শনে বিশ্বাস করিতেন, তাহার প্রতি উগ্র আনুগত্যও ছিল; রবীন্দ্রনাথ কখনো তাহা করেন নাই। শেষদিন পর্যন্তও হাল আমলের দার্শনিক মতাদর্শগুলিতে তাঁহার গভীর সংশয় ছিল, কিছুটা রাজনৈতিক দল ও ব্যবস্থার প্রতি প্রাচীনপন্থী বিরূপতার মতো। তৎসত্ত্বেও ব্যাপক সামাজিক রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহার সহানুভূতি ছিল সর্বদা অত্যাচারিত নিপীড়িত মানবতার পক্ষে; এবং যতই তিনি জড়বাদের মূলসূত্রগুলিতে অনাস্থা প্রকাশ করুন না কেন, তিনি জড়বাদের প্রবক্তাদেরই সামাজিক লক্ষ্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলিতে হয়, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির বিরোধকে জয় করা তাঁহার ব্যক্তিত্বেরই বৈজয়ন্তী। যে পদ্ধতিতে তিনি সমীকরণ করিয়াছেন তাহা একান্তই ব্যক্তিগত। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত সেইকালে ও সেই আবহাওয়ায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিচারে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে পথে তাঁহার সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা নিছক যুগোচিত ব্যাপার নহে।

অনেকাংশে এই ব্যতিক্রম অপরিহার্য, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন শিল্পী, সর্বোপরি একজন জীবন-শিল্পী; বিশেষত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে শিল্পীর মানসক্রিয়া একান্ত ব্যক্তিগত, অন্তর্লীন হইতে বাধ্য। আমরা শুধু দাবি করিতে পারি, শেষ ফলাফল যেন সমাজগতভাবে যথার্থ হয়।

সুতরাং কি রূপে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ঔপনিষদিক মানবতা রবীন্দ্রনাথে ব্যক্তিসত্তার ক্রমউদ্ভিদ্যমান ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, অনন্য, অনবদ্য মানবতায় রূপান্তরিত হইল তাহার বুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্রনিরূপণ সম্ভব নহে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পাপক্ষালনে কবি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন। এই পর্যন্তই রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, এবং ইহাতেই আমাদের তৃপ্ত থাকিতে হইবে।

শেলী বলিয়াছেন, কবিরা বিশ্বের অস্বীকৃত আইনপ্রণেতা। কবিরা সর্বজাগতিক; মানবিক অভিজ্ঞতায় তাঁহাদের এমন অধিকার যে মানব জীবনের বিধান তাঁহারা প্রণয়ন করিতে পারেন। কবিতা নির্জনের স্বপ্নবিলাস নহে, নির্বাচিত বিশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার, অন্তর্লীন প্রতিক্রিয়া বা অনুধ্যানও নহে। কবিতাকে বাস্তব সত্য হইতে হইলে বাস্তব জীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে হইবে, জীবনের দূরপ্রসারী সমস্যা সমূহের বাস্তব সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত হইতে হইবে। অভিজ্ঞতাই একাধারে কাব্যের মূল ও কাব্যের উপজীব্য। কেবলমাত্র এই শ্রেণীর কাব্যই বিশ্বমানবের বিধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাই ইহা জীবনের মতই গভীর ও বিশাল।

ইংরাজীশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার স্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কি ছিল তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে; কারণ, এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্যে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। বিদ্যালয়ে ইংরাজীর প্রাধান্য বিদ্যাশিক্ষার প্রধান অন্তরায় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, মাতৃভাষাকে কেবলমাত্র বাল্যকালে নহে সর্বকালেই শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা উচিত। তাহা করিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের ধারণাশক্তি বলিষ্ঠ হয় নাই, স্বাধীন চিন্তা করিবার সাহস আমরা হারাইয়াছি। বিদেশী ভাষার পুঁথি পড়িয়া এবং তাহার বুলি মুখস্থ করিয়া আমরা অনেক তথ্য শিখি কিন্তু প্রকৃত বিদ্যা অনায়ত্ত থাকিয়া যায়। বিদেশী ভাষাই যখন আদানপ্রদানের প্রধান অবলম্বন হয় তখন মনের সহজ ভাব সহজে প্রকাশ করা যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে ভাবপ্রকাশের চেষ্টাকে কবি মুখোশের ভিতর দিয়া ভাবপ্রকাশের অভ্যাসের অনুরূপ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া আমাদের শক্তি ও সময়ের যে নিদারুণ অপব্যয় হয় তাহা জাতির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত হওয়ায় অনেকের প্রতিভা শৈশবেই পঙ্গু হইয়া যায়। মাতৃভাষার স্বাভাবিক পথে মানুষ হইবার সুযোগ পাইলে সেই প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ সম্ভব হইত। জাতীয় সম্পদ হিসাবে তাহার মূল্য যে অপরিমেয় একথা আমরা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তিনি সারাজীবন আক্ষেপ করিয়াছেন। সে আক্ষেপে কর্ণপাত করিবার মত মানুষ তখন বেশী ছিল না।

১৩০৮ সালে (ইং ১৯০১) ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। কবি কল্পনানয়নে ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী যে আদর্শ বিদ্যালয়ের ছবি দেখিয়াছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ।

প্রাচীন ভারতের তপোবনকে এ যুগের উপযোগী করিয়া ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষাতেই এই বিদ্যালয়ের জন্ম। কিন্তু এই তপোবনেও কবি ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ইংরাজী শিক্ষা যে এদেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক ইহা তিনি কখনও অস্বীকার করেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন, শিক্ষার বাহন হিসাবে নয়, শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরাজী ভাষা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। অচিরকালব্যাপী স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতায় এবং সহজবুদ্ধিবলে ইহাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন যতই বিপুল হউক না কেন ছাত্রদের শিক্ষার পক্ষে তাহা একান্ত অনুপযোগী। কেন অনুপযোগী তাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

ইংরাজী ভাষার সহিত ভারতীয় ভাষার কোন মিল নাই, উহা ''অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা''। শব্দবিন্যাসে পদবিন্যাসে ভারতীয় ভাষা ও ইংরাজী ভাষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ভাববিন্যাসেও একের সহিত অন্যের পার্থক্য বিস্তর।

এহেন অতিমাত্রায় বিদেশী এবং একান্ত অপরিচিত ভাষা আয়ত্ত করা শিশুদের পক্ষে সহজ

নয় অথচ শিশুকাল হইতেই তাহাদের ইংরাজী শিক্ষণ শুরু হয়। সেটাও নিতান্ত মন্দ হইত না, যদি শিক্ষার ভার পড়িত উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের শিক্ষার ভার পড়ে যাহাদের হাতে শিক্ষক হিসাবে তাহারা অযোগ্য। ''নিচের ক্লাসে যে সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রেন্স পাস, কেহ বা এণ্ট্রেন্স ফেল, ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি...।"[১] ইংরাজী শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষকের অযোগ্যতার জন্য কবি যে-কালে আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার পর হইতে এক শতাব্দীর ত্রিপাদকাল অতিক্রান্ত হইতে চলিল, আজিও কি সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে? ঘটে নাই যে তাহার প্রধান কারণ শিক্ষাপদ্ধতির কলকব্জার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেও তাহার কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। সেদিন যে শিক্ষক নীচের ক্লাসে ইংরাজী পড়াইতেন তিনি বাংলা কম জানিতেন, ইংরাজী জানিতেন আরও কম। এ যুগেও উন্নতির কোন কারণ ঘটে নাই। এ যুগে প্রবেশিকা হইতে বি.এ. পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় ইংরাজী বিষয়ে পরীক্ষার মান কত নামিয়াছে তাহা কাহারাও অবিদিত নয়। ইংরাজী পরীক্ষা পাসের ব্যাপারটা বর্তমানে একটা সামাজিক সমস্যার আকার গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা নিজগুণে পাস করিতেছে না, জাতীয় নেতারা তাহাদের গুণ টানিয়া কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছেন, এবং পরক্ষণেই তাহারা আসিয়া বিদ্যালয়ের কেদারা টানিয়া লইয়া শিশুশিক্ষায় ব্রতী হইতেছে। ফল, পূর্বে যাহা হইত আজও তাহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক হইতেছে না।

যাহারা শিক্ষা দিতেছে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। নোটবই অভিধান দেখিয়া দুই চার ছত্র ইংরাজীর অর্থ যদি বা আন্দাজমত একটা খাড়া করিয়া তুলে, অন্যকে বুঝাইতে গেলেই বুদ্ধির হালে পানি পায় না। রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের ইংরাজীশিক্ষকের দুরবস্থার প্রকৃত চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। Horse is a noble animal—বাক্যটিকে কঠিন কেহ বলিবে না। ব্যাকরণের দিক দিয়া তো নিরতিশয় সরল, অর্থের দিক দিয়াও জটিল বলা যায় না। তথাপি বাক্যটির অর্থপ্রকাশ করিয়া বলিতে হইলেই আর কথা যোগায় না। ''ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূত রকম হয় না।" এবং হয় না বলিয়াই গোঁজামিল দিতে হয়। যে শিক্ষকের বিদ্যা কম তাহার হাতে শিক্ষার ভার থাকিলে গোঁজামিল ছাড়া পথ থাকে না। অত্যল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত শিক্ষকের নিকট অধীত যে বিদ্যা তাহা নিষ্ফলা হইলেও তত দুঃখ ছিল না কিন্তু সে বিদ্যা যে বিষফল প্রসব করে।

আমাদের ইংরাজী শিক্ষার আর এক অন্তরায় ইংরাজী পুস্তকের বিষয় প্রসঙ্গ। ইংরাজের লেখা ইংরাজী বইয়ের সাহায্যে যখন আমরা ইংরাজী পড়া আরম্ভ করি তখন পাঠ্য বিষয় আমাদের অপরিচিত ঠেকে। বিদ্যালয়ে যাহা পড়ি—''জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাহার যোগ নাই।"[২] ফলে, ধারণা জন্মিবার পূর্বেই ছেলেরা মুখস্থ করিতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> ''হয়তো কোনো একটা শিশুপাঠ্য reader-এ haymaking সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরেজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা snowball খেলায় Charlie ও Katie র মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস

ইংরেজ সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।”৩

অথচ একথা সত্য যে বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে হইলে ইংরাজ লেখকের রচিত পুস্তকই পাঠ করা আবশ্যক। ইংরাজী সমাজে বাস করিতে পারিলে, অন্ততঃ ইংরাজী যাহার মাতৃভাষা এমন শিক্ষকের কাছে প্রাথমিক পাঠ লইতে পারিলে, আরও ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি যখন বিলাতে যান তখনই একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজের পরিবারে বাস করিয়া যে-ইংরাজী শেখা যায় তেমন শিক্ষা কোন বই পড়িয়া হয় না। পরবর্তী জীবনে নিজের বিদ্যালয়ে দেখিয়াছিলেন, শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতেই নয় বিদেশ হইতেও কত শিক্ষার্থী আসিয়া অনায়াসে বাঙ্গালা শিখিয়াছে। শিক্ষণপদ্ধতি অপেক্ষা শিক্ষার্থীর পরিবেশই যে এই শিক্ষার প্রধান সহায়ক সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার উপকরণ বিরল ছিল এবং যাহা ছিল তাহাও সংগ্রহ করা কবির পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষার ভার কবি স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এই প্রবন্ধে আমরা ইংরাজীশিক্ষক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালী বালকদের ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য যে ধরনের বই আবশ্যক সে বই দেশে নাই তাহা তিনি জানিতেন আর শিক্ষক যে ততোধিক দুর্লভ তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সমস্যা-সমাধানকল্পে তিনি স্বয়ং ইংরাজীশিক্ষার পুস্তকরচনায় উদ্‌যোগী হইলেন।

ইংরাজী শিখাইবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি বই লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সব কয়টিই শিক্ষকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচিত। অর্থাৎ তিনি যে বই লিখিলেন তাহা শিক্ষার্থীর পাঠ্য নহে শিক্ষাদাতার পাঠ্য। সেদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে এদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক বলা চলে। ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ শিক্ষণ-পদ্ধতিরও প্রথম প্রবর্তক তিনি। শুধু ইংরাজী শিক্ষার নয়, তাঁহার রচিত সংস্কৃত শিক্ষার বইগুলিও প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা এবং অনুশীলনের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ‘‘ইংরাজিসোপান’’ গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লেখেন—

> ‘‘আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক বাঙ্গলায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত—Otto, Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাপুস্তক প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনীশক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজিশিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন।’’

রবীন্দ্রনাথ-রচিত পুস্তকগুলিতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষণের যে প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার বৈশিষ্ট্য কি এবং প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সহিত তাহার পার্থক্য কোথায় সে আলোচনার পূর্বে বইগুলির নাম করিয়া লই।

১. ইংরাজিসোপান

ইহা দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯০৪-এর মে মাস। দ্বিতীয় খণ্ড দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

প্রথম খণ্ড দুই অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশ উপক্রমণিকা—ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪ এবং দ্বিতীয় অংশ ইংরাজিসোপান—প্রথম ভাগ—পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪১।

দ্বিতীয় খণ্ডেরও দুই অংশ—ইংরাজিসোপান দ্বিতীয় ভাগ এবং ইংরাজিসোপান তৃতীয় ভাগ। এই দুইটি ভাগ যথাক্রমে ৩৮ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল।

২. ইংরাজি পাঠ

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২। Lesson 1 হইতে Lesson 18 পর্যন্ত ১৮টি পাঠে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৩. ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা

ইংরাজিসোপানের প্রথম খণ্ডের প্রথম অর্থাৎ উপক্রমণিকা অংশটি পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিয়া এই পুস্তক রচিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়িয়া হয় ২৪-এর স্থলে ৩০। প্রকাশকাল সম্ভবতঃ ১৯০৯।

৪. ইংরেজি সহজশিক্ষা

ইংরেজি সহজশিক্ষার দুই ভাগ। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮ এবং দ্বিতীয় ভাগের ৫৮। দুই ভাগ যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৩০-এ প্রকাশিত হয়। সহজশিক্ষাও নূতন বই নয়। ইহার প্রথম ভাগ ইংরাজিসোপান প্রথম ভাগের এবং দ্বিতীয় ভাগ ইংরাজিসোপান দ্বিতীয় ভাগের পরিবর্তিত সংস্করণ।

৫. অনুবাদচর্চা

অনুবাদচর্চা বইটিও দুই খণ্ডে বিভক্ত। এক খণ্ডে "বিবিধ বিষয়ঘটিত বিবিধ ইংরেজি রচনারীতির বাক্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে।" অন্য খণ্ডে আছে তাহারই আদর্শ বাঙ্গালা অনুবাদ। অনুবাদচর্চার প্রথম প্রকাশকাল ১৯১৭।

রবীন্দ্রনাথ রচিত ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পুস্তক 'ইংরাজিসোপান' যে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংরাজী শিখাইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল তাহা উক্ত পুস্তকের 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তি হইতেই জানিতে পারি। ইংরাজিসোপান প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯০৪ একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বইটি লেখা হইল কবে? গ্রন্থকার বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন, 'কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষাদিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসংকোচে এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।' গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনার মধ্যে 'কয়েক বৎসর' কাটিয়াছে, যে কয়েক বৎসরে গ্রন্থকার স্বীয় প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালীর উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে পারিয়াছেন, 'ইহার সাহায্যে অল্পদিনেই শিক্ষার্থিগণ ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন ইহা আমাদের জানা কথা।' বালকবয়সী ছাত্র ছাড়া দুই-একজন বয়স্ক ছাত্রের উপরেও এই গ্রন্থের পরীক্ষা হইয়াছিল কিনা জানি না, হয়তো হইয়া থাকিবে। কারণ, 'যাঁহারা অধিক বয়সে ইংরাজি শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া' গ্রন্থকারের ধারণা।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৩০৮ সালের পৌষ মাসে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯০১-এর ডিসেম্বরে। সুতরাং বিদ্যালয়ের কাজ ১৯০২-এর গোড়া হইতেই আরম্ভ হইয়াছে ধরিয়া লইতে পারি। শিক্ষাদানের কাজে হাত দিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই বই লিখিয়া থাকিলে ১৯০২ সালই ইহার

রচনাকাল বলা চলে। ১৯০৪-এর মে মাসে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯০২-এর গোড়া হইতে ১৯০৪-এর মে মাস পর্যন্ত যে সময় তাহার পরিমাণ প্রায় আড়াই বৎসর। ‘‘কয়েক বৎসর’’ বলিতে এই আড়াই বৎসরই বুঝিতে হইবে। বিশেষ লক্ষ্যকরিবার বিষয় এই যে আড়াই বৎসর সময়ের মধ্যেই কবি নিজের প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীর পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছেন।

আজ হইতে ষাট বৎসর পূর্বে এদেশের শিক্ষার্থীকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য তিনি কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ-রচিত ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকগুলির বিশেষতঃ আলোচ্য গ্রন্থ ইংরাজিসোপান প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তুর পরিচয় লইতে হইবে।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ অর্থাৎ উপক্রমণিকা অংশকে লেখক ‘‘ভাষাশিক্ষার ড্রিল’’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‘‘ছাত্রগণ যখন অক্ষর পরিচয়ে প্রবৃত্ত তখনই ইংরাজি ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন এই অংশের উদ্দেশ্য।’’ ইংরাজী বই পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই ইংরাজী শব্দ ছাত্রদের কর্ণে ও তাহার অর্থ তাহাদের মনে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক—ইহাই ছিল লেখকের ধারণা। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, ছাত্রদের ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ অভ্যাস করা থাকিলে ‘‘শিক্ষাকার্য অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইবে।’’

এই উপক্রমণিকায় কয়েকটি পাঠ আছে। পাঠগুলি আর কিছু নয়, কয়েকটি অনুজ্ঞাবাচক ইংরাজী বাক্যের সমষ্টিমাত্র। এই পাঠগুলি ক্লাসে কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে সে নির্দেশ বাঙ্গালায় বাক্যগুলির পাশে পাশে (যেখানে যেখানে প্রয়োজন) লিখিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম পাঠটি উদ্ধৃত করিতেছি—

Come here কুমুদ। (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে) Sit down কুমুদ।

(প্রত্যেককে) You sit here. You sit there, ইত্যাদি।

(প্রত্যেককে) Stand up. You stand here. You stand there, etc.

(প্রত্যেককে) Go. You go there.

(প্রত্যেককে) Run. Stop. Come back. Sit down. Lie down. Get up. (এইরূপ প্রত্যেককে)

উপক্রমণিকার শেষাংশে এই পাঠেরই প্রয়োগ সম্পর্কে আরও বিশদ নির্দেশ দেখিতেছি। তাহার কিয়দংশ পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি। যেমন—

Come here কুমুদ (এইরূপে নাম ধরিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে)

Sit down কুমুদ।

(ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশ করিয়া)
You sit here. You sit there.
Stand up Kumud.
(ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ করিয়া) You stand here.
You stand there.
Go. You go there. (প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে)

এই পুনরাবৃত্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে শিক্ষাদানের প্রণালীর দিকেই গ্রন্থকারের লক্ষ্য

কেন্দ্রীভূত। মুদ্রণে কিছু কিছু অসংগতি আছে। যেমন, 'কুমুদ' শব্দ ইংরাজী পাঠের মধ্যেও বাঙ্গালায় দুই-একবার ছাপা হইয়াছে। সে-দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। বই-এর এ অংশ তো শিক্ষার্থীর পাঠের জন্য নয়, শিক্ষকের পাঠনের জন্য। কাজেই মুদ্রণের ছোটখাটো অসংগতি থাকিলেও ক্ষতি হইবে না বলিয়াই বোধ হয় সে দিকে তেমন নজর দেন নাই।

উপক্রমণিকার প্রথমাংশ অনুজ্ঞাবাক্যের সমষ্টি। শিক্ষক এক একটি বাক্য বলিবেন, ছাত্ররা বারংবার শুনিয়া তাহার অর্থ বুঝিবে। বাক্যের অন্তর্বর্তী শব্দগুলির সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হইয়া যাইবে। অনুজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদগুলির অর্থ কি তাহা শিক্ষক স্বয়ং দেখাইয়া দিবেন এবং ছাত্ররা আদিষ্ট হইলে তদনুরূপ আচরণ করিবে। এইভাবে অনেক ক্রিয়াপদের অর্থ তাহাদের মনে থাকিয়া যাইবে। come, go, run, walk, jump, stand, sit, take, bring, open, shut, touch, smell—প্রভৃতির লিখিত রূপ দেখিয়া বানান মুখস্থ করিবার আগেই ছাত্ররা এইসব ক্রিয়াপদের অর্থ শিখিয়া ফেলিবে। এই সঙ্গে বস্তুবাচক বহুশব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দও তাহাদের শেখা হইয়া যাইবে। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইলে আরম্ভ হইবে কথোপকথন।

উপক্রমণিকার প্রথম অংশে ছাত্ররা শিক্ষকের নির্দেশ শুনিয়া নিরুত্তরে তাহা পালন করিতেছিল। উপক্রমণিকার দ্বিতীয় অংশে আছে প্রশ্ন। শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন ছাত্র উত্তর দিবে। যে শব্দগুলি এতদিন কানে শুনিয়া তাহার অভ্যস্ত হইয়াছে—এখন মুখে বলিয়া তাহার প্রয়োগ করিবে। এইভাবে তাহাদের অজ্ঞাতসারে ব্যাকরণের কাজও কিছুটা হইয়া যাইবে।

প্রথম অংশে কুমুদকে বলা হইয়াছিল—Come here কুমুদ। দ্বিতীয় অংশে সে কথা তো বলা হইলই, তাহার পর কুমুদ আসিলে প্রশ্ন করা হইল—Have you come here? কুমুদ তাহার উত্তর দিবে। হয়তো ভুল উত্তর দিবে। শিক্ষক তাহার ভুল সংশোধন করিয়া বলিয়া দিবেন Yes, I have come here. ইহার পর যদু, মধু, হরিকে ডাকিয়া যখন একই প্রশ্ন করা হইবে তখন তাহাদের উত্তর আর ভুল হইবে না। ইংরাজী ব্যাকরণের present perfect tense-এর প্রয়োগ-পদ্ধতি এই ভাবে তাহার শেখা হইয়া গেল। এই ভাবে ক্রিয়াপদের আর দুই-এক প্রকার ব্যবহারও মোটামুটি জানা হইবে। উপক্রমণিকার কাজ যখন শেষ হইল তখন অনেকগুলি শব্দ শেখা হইয়া গিয়াছে। কেবল কানে শুনিয়া শেখা হইয়াছে, চোখের পরিচয় হয় নাই, হইলেও ঘনিষ্ঠ হয় নাই। ইংরাজিসোপান প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে (অর্থাৎ ইংরাজিসোপান প্রথম ভাগে) চোখের কাজ শুরু হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশের প্রথম পাঠটি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই পাঠে বারোটি ইংরাজী শব্দ এবং উহাদের পাশাপাশি বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। শব্দগুলির মধ্যে পাঁচটি বিশেষ্য এবং পাঁচটি বিশেষণ।

The man—মানুষ	Big—বড়
The Boy—ছেলে	Mad—পাগল
The cat—বিড়াল	Red—লাল
The dog—কুকুর	Bad—খারাপ
The pen—কলম	New—নূতন
The cow—গাভী	Fat—মোটা

পাঠের গোড়াতেই শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া আছে, ‘‘বাঙ্গালা অর্থ সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে।’’ বোর্ডে তো শব্দগুলি লেখা হইল। তাহার পর শিক্ষকের কর্তব্য কি?—সে বিষয়ে বিশদ নির্দেশ আছে—

> ‘‘উল্লিখিত শব্দগুলি ও তাহার অর্থ শিক্ষক ছাত্রের কণ্ঠস্থ করাইয়া দিবেন। বাঙ্গালা শব্দটি বলিয়া তাহার প্রতিশব্দ, ইংরাজি শব্দটি বলিয়া তাহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ বলাইয়া লইবেন। ক্রমশঃ পাঠ-গৃহস্থিত বা তন্নিকটবর্তী কোনও কোনও বস্তুর ইংরাজি নাম বলিয়া দিবেন এবং সেই বস্তুটি নির্দেশ করিয়া তাহার ইংরাজি নাম বলাইয়া লইবেন। শিক্ষক দেখিবেন যে ইংরাজি নাম বলিবার সময় the কথাটি যথাস্থানে প্রয়োগ করে, যথা the book, the ball ইত্যাদি।’’

এই অংশে মোট চব্বিশটি পাঠ এবং প্রত্যেক পাঠের সহিত কবি পাঠনের নির্দেশ দিয়াছেন। প্রচলিত ব্যাকরণ ও তথাকথিত পাঠ্য-পুস্তকের বন্ধুর পথে না গিয়া সহজে ছাত্রদের বিশুদ্ধ ইংরাজী শিখাইবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য কবি যে কিরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন এই পাঠগুলির মধ্য দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম পাঠে যে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দগুলি আছে দ্বিতীয় পাঠে তাহাদের সংযুক্ত করিয়া দেখানো হইয়াছে।

The big man. The mad dog ইত্যাদি। এখানে শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ আছে—

> ‘‘শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রকারে বিশেষ্য বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অর্থ বলাইয়া লইবেন। বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ইংরাজিতে বিশেষণ যে the ও বিশেষ্যটির মাঝখানে থাকে তাহা দেখাইয়া দিবেন।’’

তৃতীয় পাঠে নির্দেশ আছে—বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে শিক্ষক তাহার পুনরাবৃত্তি করাইবেন এবং বোর্ডে কতকগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ (বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সমেত) The ink—কালী, The sun—সূর্য, The bed—বিছানা, Hot—গরম, Wet—ভিজা, The mat—মাদুর ইত্যাদি লিখিয়া ‘‘ছাত্রকে কোন্‌গুলি বিশেষ্য ও কোন্‌গুলি বিশেষণ বাছিতে বলিবেন।’’

বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ ছাত্রকে মুখে মুখে ব্যাকরণ শিখাইতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শব্দ-ভাণ্ডার বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ভাষার বনিয়াদ শব্দ। ব্যাকরণ-সাহায্যে বাক্যরচনার প্রণালী জানা যায় কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক শব্দ জানা না থাকিলে ব্যাকরণের বিদ্যা কাজে লাগে না। তাই দেখিতেছি শব্দশিক্ষার দিকে তাঁহার মনোযোগ বেশী। পুরাতন পাঠের শব্দ পরবর্তী পাঠে বারংবার ব্যবহৃত হইতেছে। এক শব্দের সহিত অন্য শব্দের মিলিত প্রয়োগের শিক্ষা দিতেছেন। নবপ্রযুক্ত শব্দের সহিত পূর্বপরিচিত শব্দের যোজনা করিয়া দেখাইতেছেন। ছাত্র যখন নূতন নূতন বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ যোজনা করিতেছে তখন তাহারা যেন অর্থসংগতির কথা মনে রাখে শিক্ষককে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে নির্দেশ দিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, ভাষাশিক্ষণের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রণালীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেও কবি উহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেন নাই। তাহার একটি বড় প্রমাণ অনুবাদের অনুশীলন। ইংরাজী শিখাইবার জন্য শুধু বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী নহে, ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ অভ্যাস করাও আবশ্যক। এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এই গ্রন্থের প্রায় সকল পাঠেই অনুবাদের অনুশীলনী আছে। ভাষাশিক্ষার পক্ষে অনুবাদের উপযোগিতা

কতখানি এবং শিক্ষক কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ছাত্রদের অনুবাদ শিখাইবেন সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশদ মতামত 'অনুবাদচর্চা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থান নাই।

ইংরাজিসোপানের অনুবাদ-অনুশীলনীর লক্ষ্য কিন্তু ব্যাকরণ-শিক্ষা এবং বাক্যগঠনের মধ্য দিয়া ঐ ব্যাকরণজ্ঞানের প্রয়োগ, পরীক্ষা ও অভ্যাস। তাই লেখক প্রত্যেক পাঠের প্রারম্ভে প্রশ্নোত্তর সাহায্যে ব্যাকরণের এক একটি অধ্যায়ের অথবা বাক্যরচনার এক একটি প্রক্রিয়ার পরিচয় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ সাহায্যে সেই পরিচয়কে দৃঢ়মূল করিয়া লইতেছেন। স্বভাবতঃই এই সকল পাঠে কবি ইংরাজী ব্যাকরণের কূটকচালের মধ্যে যান নাই।

The-র প্রয়োগ, বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের ব্যবহার, is ক্রিয়াপদের ব্যবহার, has ও is-এর অর্থে ও প্রয়োগে পার্থক্য, ইতিবাচক শব্দকে নেতিবাচক করিবার নিয়ম, একবচন বহুবচন, There is দিয়া বাক্যরচনা—মোটামুটি এই কয়টি বিষয়ের পাঠ ও অনুশীলনী এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। সকল বাক্যেরই ক্রিয়াপদ নিত্য বর্তমান (present indefinite); অতীত ভবিষ্যৎ কালের উদাহরণ নাই কিন্তু গ্রন্থের পরিশেষে গ্রন্থকার নির্দেশ দিয়াছেন, "গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাঠগুলিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল করাইয়া লইতে হইবে।" অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলিতে কবি যে past indefinite এবং future indefinite বুঝাইয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট।

ইংরাজিসোপানের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম হইতে বিভিন্ন কালের প্রয়োগ-শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ভাগের অনুবৃত্তিস্বরূপ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠে কতকগুলি নিত্য বর্তমান কালবাচক সরল ইংরাজী বাক্য, যেমন—The boy eats, the girl laughs ইত্যাদি দিয়া সেগুলি অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে। পাঠের নিম্নে শিক্ষকের প্রতি লেখকের নানাবিধ নির্দেশ দেখা যাইতেছে। একটি হইল—"অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।" কিভাবে অতীত ও ভবিষ্যৎ করাইতে হইবে তাহাও বিশদভাবে বলা হইয়াছে। " 'অতীত কর' 'ভবিষ্যৎ কর' শুদ্ধমাত্র এইরূপ আদেশ করিলে চলিবে না—বলিতে হইবে 'বালকটি খাইতেছিল' বা 'বালকটি খাইবে' ইংরাজিতে কি হইবে বল। নতুবা, অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট না জানিয়াও অভ্যাসক্রমে ছাত্রগণ ঠিক উত্তরটি দিতে পারে, অবশেষে বাংলা করিতে বলিলে ভুল করিয়া বসে।"—এ নির্দেশ যে স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সরল বাক্য কয়টি ধরিয়া অনেক রকমের অনুশীলন হইতে পারে। বাক্যস্থ বিশেষ্য শব্দগুলিকে (সকল শব্দই একবচনে আছে) বহুবচনে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন, The boy eats, the boys eat; the girl laughs, the girls laugh ইত্যাদি।

বাক্যগুলি সব ইতিবাচক, ওগুলিকে নেতিবাচক করা যায়। সকল কালে এবং সকল বচনেই নেতিবাচক করা যাইতে পারে। "যথা, The boy does not eat, the boys do not eat. The boy did not eat, the boys did not eat. The boy will not eat, the boys will not eat." শিক্ষককে এস্থলে নির্দেশ দেওয়া আছে "প্রথমে বাংলা করিয়া তাহা হইতে ইংরাজি অনুবাদ করাইতে হইবে।"

একই পাঠে ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগও আরম্ভ করা হইয়াছে। আলোচ্য পাঠের বারোটি বাক্যে গ্রন্থকার যথাক্রমে এই বারোটি ক্রিয়াবিশেষণের—greedily, sweetly, silently, quickly, swiftly,

rapidly, correctly, fluently, soundly, brightly, slowly, suddenly ব্যবহার করিয়া উহাদের প্রয়োগ শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন।

এই শব্দগুলি যাহাতে ভালরূপে অভ্যাস হয় এইজন্য গ্রন্থকার শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন—

"ক্রিয়ার বিশেষণ সহ বাক্যগুলি পূনর্বার অতীত ভবিষ্যতে নানারূপে নিষ্পন্ন করাইয়া লইতে হইবে।"

দ্বিতীয় ভাগের পাঠসংখ্যা সতের। এই সতেরটি পাঠে নূতন শব্দ আনা হইয়াছে, অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পাঠের অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে। দ্বিতীয় হইতে দশম পাঠ পর্যন্ত নয়টি পাঠে কয়েকটি অতিপ্রচলিত preposition—at, in, on, to, into, from, with, for-এর ব্যবহার শিখানো হইয়াছে। যে সকল preposition একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রয়োগশিক্ষণ বিষয়ে গ্রন্থকার শিক্ষকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. শিক্ষার হেরফের—১২৯৯
২. শিক্ষাসমস্যা—১৩১৩
৩. শিক্ষার হেরফের।

সাহিত্যতত্ত্ববিচারে রবীন্দ্রনাথ

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ''আমাদের অলংকারশাস্ত্রে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি নাই। অবশ্য, রস কাহাকে বলে সে আর বুঝাইবার জো নাই''—অন্যান্য প্রসঙ্গেও তিনি বলিয়াছেন যে রস অনির্বচনীয়। ইহাকে অনির্বচনীয় বলিয়া মনে করিলেও তিনি নানাপ্রবন্ধে ইহার স্বরূপ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা হইতে মনে হয় যে তিনি মনে করিতেন যে সাহিত্যের রস একেবারে বর্ণনার অতীত নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্য কোনো বিষয়ের মধ্যে নাই। সেই বৈশিষ্ট্য কি?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ''রস জিনিসটা কী? না, যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাই রস, শুদ্ধ জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা রস নহে।'' রসের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা জ্ঞানের বিষয় নহে, ইহা বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। ইহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হইবে। ইহা আস্বাদস্বরূপ। কিন্তু যাহা কিছু আস্বাদন করি তাহাই সাহিত্যরসের বিষয় নহে। যে আস্বাদন প্রয়োজনমাত্রাকে পরিতৃপ্ত করিয়াই নিঃশেষিত হইয়া যায় তাহা সাহিত্যরসে উন্নীত হইতে পারে না। ''যাহা আবশ্যক শেষ করিয়াও অনাবশ্যকে আপনার আনন্দ ব্যক্ত করে,'' যাহা ''মানবের সর্বপ্রকার প্রয়োজনমাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয়'' তাহাই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের প্রাণ। তিনি আরো বলিয়াছেন, ''আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক করে চলা যাক না, শব্দের নির্বাচনে ভাষার ভঙ্গিতে ছন্দের ইশারায় এমন কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে গিয়ে ঠেকে সেইখানে যেটা অতিশয়।'' সুতরাং তাঁহার মতে সাহিত্যরসের লক্ষণ এই যে তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এবং এই অতিরিক্তত্বের জন্যই তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন; কারণ জ্ঞানের দ্বারা যাহা পাই তাহার মধ্যে আতিশয্য নাই। যাহা জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য, তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, একটা স্পষ্ট রূপদান করিয়া।

কিন্তু এই যে অতিরিক্ত যাহাকে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় না তাহার স্বরূপ কি? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তাহা অরূপ, তাই তাহা অনির্বচনীয়। সাহিত্য রূপেরই প্রকাশ, কিন্তু তাহা প্রকাশ করে অরূপকে। কলাসৃষ্টিতে ''রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন করে দেখা...।'' ''রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সে রূপ থেকেই মুক্তি গেয়।'' কথাটা স্পষ্ট হইল না। যাহা অরূপ তাহা কেমন করিয়া রূপের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং তাহা যখন রূপের মধ্যে প্রকাশ পাইল তখন তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রহিল কেমন করিয়া? অরূপের স্বরূপের সন্ধান না পাইলে এই বর্ণনা হেঁয়ালির মতো শোনাইবে। যে অরূপ সাহিত্যে

আত্মপ্রকাশ করে তিনি নানাভাবে তাহার বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন। প্রথমত, তাহা হৃদয়ের অনুভবের সামগ্রী; অনুভূতির বাহিরে রসের কোনো অর্থ নাই। হৃদয়স্থিত যে ভাব শুধু নিজেকে প্রকাশ করিয়াই পরিতৃপ্ত, যাহা ব্যবহারিক জগতের কোনো প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহাই রসত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের অনেক অনুভূতির প্রকাশ হয় প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটাইবার কাজে। যেখানে কোনো অনুভূতি প্রাত্যহিকের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া শুধু অভিব্যক্তি পাইয়াছে, যেখানে সে কেবল কল্পনার লীলাক্ষেত্র, সেইখানেই সে সাহিত্যের সামগ্রী।

দুই একটি সাধারণ সচরাচরদৃষ্ট উদাহরণের বিচার করিলে কথাটা স্পষ্ট হইতে পারে। সন্তানের বিয়োগে মা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিযা থাকে, ইহা সর্বত্র দেখা যায়। মা যে চেঁচাইয়া কাঁদে ইহার মধ্যে শুধু যে শোক প্রকাশ পায় তাহা নহে, শোকের গৌরবও প্রকাশ পায়। ইহার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নাই। মা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ইহাই দেখাইতে চায়, তাহার ছেলে যে ছিল ইহা শুধু সামান্য ঘটনা নহে, ইহা একটি বিরাট সত্য। জগতের মধ্যে ইহার প্রচার হওয়া চাই। এইভাবে তাহার শোক ব্যক্তিগত সীমা ছাপাইয়া বিশ্বের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে চেষ্টা করে। যে প্রকাশ মায়ের ক্রন্দনে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত তাহাই কবির কল্পনার মধ্যে সার্থকতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ আর একটি দৃষ্টান্তের বিচার করিয়াছেন এই ভাবে—"ক্লাসঘরের দেয়ালে মাধব আরেক ছেলের নামে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রেখেছে 'রাখালটা বাঁদর'। ... এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অন্য সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড়ো হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি অনুসারে আপন অনুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড়ো করে জানাচ্ছে মাধব রাগ করেছে, যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে।" দেখা যাইতেছে, অনুভূতি সেইখানেই রসরূপ লাভ করে যেখানে সে ব্যক্তির হৃদয় হইতে নিঃস্যন্দিত হইয়া বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তও বলিয়াছেন যে কাব্যের অর্থ সহৃদয়শ্লাঘ্য। অর্থাৎ কবি যাহা প্রকাশ করেন তাহা তখনই সার্থকতা লাভ করে যখন সহৃদয় ব্যক্তি তাহা আদর করিতে পারেন। এই যে বিশ্বের সঙ্গে মিলন ইহাই সাহিত্য, কারণ ইহার মধ্যেই সহিতত্ব রহিয়াছে। "যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই।" আমি আছি—এই অস্তিত্ববোধ যেখানে অন্যের থাকার সহিত যুক্ত হয়, যেখানে আমি আমার প্রাণধারণের সীমার বাহিরে চলিয়া যাই, সেইখানে আমার অনুভূতি বিশেষ লোকের ভোগ্যতার মলিন সম্বন্ধ হইতে যুক্ত হয়। ভট্টনায়ক এই প্রক্রিয়াকে বলিয়াছেন ভাবকত্ববা সাধারণীকরণ। এইভাবে আমার অনুভূতি বিস্তার লাভ করিয়া অসীম ও অনন্তের অভিমুখী হয়। যেখানে অনুভূতি আপনার সীমাবদ্ধ রূপ হইতে মুক্তি পাইয়া বিশ্বজগতের কাছে গোচর হইয়াছে সেইখানেই সে দীপ্যমান, সেইখানে তাহার প্রকাশের উৎসব। এইভাবেই সাহিত্যের মূল্যনিরূপণ হয়। যাহা সম্পূর্ণভাবে নিজের সীমা ছাড়াইতে পারে নাই, যাহা শুধু তৎকালিক বা তৎস্থানিক, তাহার প্রকাশ পঙ্গু, তাহা ব্যক্তিবিশেষের কালবিশেষের বা স্থানবিশেষের সামগ্রী। কামমোহিত ক্রৌঞ্চ বা ক্রৌঞ্চী ব্যাধ কর্তৃক নিহত হইল দেখিয়া বাল্মীকি শোকাভিভূত হইয়া শ্লোক রচনা করিলেন। ইহা যখন শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইল তখন ইহা আর মুনির ব্যক্তিগত শোক নহে। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, "ন মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্।" যদি তাহা একমাত্র মুনির শোকই হইত তাহা হইলে তাহা শ্লোকে পরিণত হইত না। ইহা করুণসরূপ, মুনি ও সহৃদয়ব্যক্তির যৌথ সম্পদ। ব্যক্তিগত শোক ব্যক্তির নীরব ব্যথা অথবা সরব আর্তনাদেই পর্যবসিত হইয়া যাইত। বিশ্বের সহিত

মিলিত হওয়ার যে মূলীভূত আকাঙ্ক্ষা তাহাই সাহিত্যকে অমরত্ব দান করে। যাহা বিভাতি অর্থাৎ প্রকাশিত হয় তাহাই অমর। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ‘‘পাখির গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই এ-কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে তো না-ই রহিল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা—কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।’’ এই মতবাদের সঙ্গে ইতালিয় দার্শনিক ক্রোচের মতবাদের পার্থক্য বিচার্য। ক্রোচে মনে করেন সকল রকমের আর্টই গীতিকাব্যধর্মী, অর্থাৎ তাহা মুখ্যত রচয়িতার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তাহা যে পাঠকসমাজে পরিবেষ্টিত হয়, ইহা গৌণ ব্যাপার। আর্টসৃষ্টির সঙ্গে বাহিরের পাঠকসম্প্রদায়ের কোনো মৌলিক সংস্রব নাই।

দুই

সাহিত্য অপরের কাছে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহার একটি লক্ষণ এই যে তাহা প্রত্যক্ষ, তাহা সহজেই সহৃদয় ব্যক্তির কাছে গোচর হইতে পারে। ইহার বিস্তৃতি ও প্রত্যক্ষতা পরস্পর-সম্বন্ধ। চরাচরব্যাপী প্রাকৃতিক জগৎ প্রত্যক্ষ। তাহাও ভাষা; তাহা অমরলোকের কাহিনী আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করিতেছে। মানব সচরাচর যে ভাষা ব্যবহার করে তাহার মধ্যে এই বিস্তৃতি ও অসীমতা নাই। কবির ছন্দ ও অলংকরণ এই অসীমতা ও প্রত্যক্ষতা লাভের উপায়মাত্র। ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতির ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করিয়া কবি বাল্মীকি বলিতেছেন—

সেইমতো প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে; কোথা সেই অনন্ত আভাস

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, মানবের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা অর্থের দ্বারা সংকীর্ণ। কোনো একটি শব্দ কোনো একটি বিশেষ অর্থকেই প্রকাশ করে। যদি এই নির্দিষ্টতা না থাকিত তাহা হইলে ব্যবহারিক জীবন অসম্ভব হইয়া পড়িত। কাব্যের ছন্দ ভাষাকে অর্থের নির্দিষ্ট গণ্ডি হইতে মুক্তি দেয়—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে

কাব্যের ছন্দ যে বিস্তৃতি আনে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের তাহাই প্রধান আদর্শ। ইহাই সাহিত্যের টেক্‌নিকের লক্ষ্য।

এই বিস্তৃতি ও সহিতত্ব ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া, সাময়িককে অনন্তকালীন করিয়া প্রকাশ করে। ব্যাধ যে কামমোহিত কৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করিয়াছিল ইহা তমসার তীরের কোনো

একটি নির্দিষ্ট সময়ের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বাল্মীকি ইহাকে দেখিলেন শাশ্বতকালের পরিপ্রেক্ষিতে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ম্যাথু আর্নল্ডের দুইটি পদ একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন—Eternal Passion, Eternal Pain এবং কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়াছেন। ওথেলোর সন্দেহ, ম্যাক্‌বেথের পাপাসক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ—প্রাত্যহিক জীবনে ইহারা কুৎসিত বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। ইহাদিগকে প্রতিদিনকার ঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমার খণ্ডিত ব্যাপার বলিয়াই জানি, ইহারা পুলিস-কেস রূপেই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু কবির হৃদয়ে ইহারা যে অনুভূতির সঞ্চার করিয়াছে তাহা বিস্তার লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সর্বজনের সম্পত্তি হইয়াছে। ইহারা বিশেষ ব্যক্তিত্ব পরিধি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বলিয়াছেন, ''মহাভারতের খাণ্ডবদাহন বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহুদূরে গেছে—সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি করেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন করে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে।'' সাহিত্যের বিচারে আধুনিক মনোবিকলনশাস্ত্রের অনুপ্রবেশকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু তাঁহার অভিমতের সঙ্গে কোনো কোনো মনোবিকলনবাদীর সিদ্ধান্তের আশ্চর্য রকমের মিল আছে—

> Bullough uses the expression *physical distance* as a figurative description for all manner of ways by which personal experience may be projected and made aesthetically valid. Distancing beings in actual spatial and temporal separation from an object, as in the case of a thunderstorm that is viewed from a distance or after a lapse of days; it ends in the most delicate reaches of aesthetic remoteness. *Psychical distance*, Bullough explains, is obtained by separating the object and its appeal from one's own self, by putting it out of gear with practical needs and ends. (Downey : Creative Imagination : International Library of Psychology)

তিন

বিস্তৃতি, প্রত্যক্ষতা ও দূরত্ববোধের উপর রবীন্দ্রনাথ যে জোর দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, তাঁহার মতে কাব্যের আদর্শ একান্ত ব্যক্তিনিরপেক্ষতা। মানুষের ভাবপ্রকাশ যদি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষই হইল, তাহা যদি পর্বত ও সরোবরের মতোই আমাদের গোচরীভূত হইল তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও বিজ্ঞানে পার্থক্য রহিল কোথায়? আধুনিক কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান যেরূপ নিরাসক্তচিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেইরূপ নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্রভাবে দেখিবে ইহাই শাশ্বতভাবে আধুনিক। বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তির সহিত যুক্ত না দেখিয়া নির্বিকার তন্দ্গতভাবে দেখাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। যদিও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নিরাসক্ত দৃষ্টি প্রাধান্যের কথা বলিয়াছেন এবং বিজ্ঞানের নিরাসক্ত দৃষ্টির সঙ্গে ইহার তুলনা করিয়াছেন, তবুও তিনি ইহাদের পার্থক্য সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। সাহিত্য বিশ্বজনীন কিন্তু ব্যক্তির অনুভূতি হইতেই তাহা উৎসারিত হয় এবং যদিও তাহা বিস্তার লাভ করিয়া রসে রূপান্তরিত হয় তাহা হইলেও তাহার স্বকীয়তা নষ্ট হয় না; তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বই প্রকাশ করে। বিজ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা বাস্তবকে জানে, সাহিত্য অনুভূতির দ্বারা তাহাকে অনুরঞ্জিত করে। বিজ্ঞান বাস্তবকে বাস্তব বলিয়া জানে, তাহার জ্ঞান তথ্য। যে বস্তু যেমন আছে, তাহার সেই স্বরূপ উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞানের কাজ। তাই বিজ্ঞান

আবিষ্কার করে। ইতিবৃত্ত ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দেয়; বলা যাইতে পারে তাহা ঘটনার অনুকরণ। কিন্তু সাহিত্য আবিষ্কারও করে না, অনুকরণও করে না; সাহিত্যের কাজ সৃষ্টি। রামায়ণের রামের জন্মভূমি কবির মনোভূমি, ইতিবৃত্তের অযোধ্যা নহে। সাহিত্যের সৃষ্টি প্রকাশধর্মী। সাহিত্যিক নিজের ব্যক্তিত্বকেই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। ‘‘বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিতভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, এইখানেই তাঁর জোর।’’ সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র হইতে একটি তুলনা উদ্ধার করিয়া রবীন্দ্রনাথের মতবাদ বোঝানো যাইতে পারে। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব যে ভাবে প্রকাশিত হয় ও বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহা প্রদীপের দ্বারা ঘটের আলোকনের সঙ্গে উপমিত হইতে পারে। প্রদীপ নিজেকে উদ্ভাসিত করে বলিয়াই ঘটপ্রভৃতি অন্য পাঁচটি পদার্থকেও আলোকিত করিতে পারে। সাহিত্যিকের প্রতিভা প্রদীপের আলোকের মতো; নিজেকে প্রকাশ না করিয়া তাহা অপরের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। মনোবিজ্ঞানবিশারদও স্বীকার করেন যে সাহিত্যের মধ্যে যে দূরত্ববোধ আছে তাহা একেবারে নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারে না। “Distance does not imply an impersonal, purely intellectually interested relation such as that of the scientist’s” (Downey)। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, শেক্সপীয়রের রচনার মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় নাই। হ্যামলেট, ওথেলো, ফলস্টাফ—ইহারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে পরিস্ফুট হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে শেক্সপীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ পাওয়া যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, লেখকের মূলপ্রকৃতি যতই ব্যাপক হইবে এবং বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যকে তিনি যতটা অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করিবেন তাঁহার ‘‘ব্যক্তি-বিশেষত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি’’ ততই অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু সেই ব্যক্তিবিশেষত্ব সর্বদাই সক্রিয় থাকে বলিয়াই সাহিত্যের রস উৎসাহিতহইয়াছে। শেক্সপীয়রের ব্যক্তি-বিশেষত্ব খুব বিরাট বলিয়া তাহা ডগবেরী, ফলস্টাফ হইতে আরম্ভ করিয়া লিয়র, হ্যামলেট প্রভৃতি বহু বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং সেই জন্যই উহাকে সহজে ধরা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া উহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই।

আর একটি দিক দিয়া বিচার করিলেও সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞান কোনো পদার্থকে জানে তাহার শ্রেণীগতরূপে। ঘোড়া বলিতে সে বোঝে প্রথমত এবং প্রধানত একটি চতুষ্পদজাতীয় জন্তু। সাহিত্যের কাছে শ্রেণীগতরূপ অস্পষ্ট; সে প্রত্যেক পদার্থকে সৃষ্টি করে তাহার বৈশিষ্ট্যকে অনুভূতির দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া। ক্লাস নামক একটা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী আছে; এই শ্রেণীর মধ্যে কোনো ছাত্রের স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় না। আমলাতন্ত্র বা অন্যান্য জাতি এবং শ্রেণীও এইরূপ। কিন্তু কোনো ব্যক্তিত্ব তাহার শ্রেণীগত সাধারণ অস্পষ্টরূপকে অতিক্রম করিয়া দীপ্যমান হইলে তাহা সাহিত্যের বিষয় হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ‘‘সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়। এখানে ‘ব্যক্তি’ শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার অনুরূপ আর দ্বিতীয় নাই।’’ বাস্তবিকপক্ষে আমি ও না-আমির সম্মিলনেই সাহিত্যের সৃষ্টি। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন, রস অলৌকিক, তাহা স্বগতও নহে পরগতও নহে। রবীন্দ্রাথ বলিয়াছেন, রস অনির্বচনীয়, তাহা স্বগত এবং পরগত উভয়ই। তাই ইহা একই সময়ে একান্তভাবে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ আবার বিশ্বের বস্তুজগতের পরিচয়। বস্তুজগতের মধ্যে মানুষের হৃদয় যে ভাব মুদ্রিত করিয়া দেয় এবং বস্তুজগৎ মানুষের হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। প্রকৃতির সৌন্দর্য কতকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্ট্সকে

অধিকার করিয়া আছে। সেই তথ্য যখন তাহার তথ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া আমার কাছে তেমন সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে, তখনোই সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে।

চার

সাহিত্যের গোড়ার কথা হইতেছে সহিতত্ব বা মিলন, মানুষে মানুষে মিলন, কালে কালে মিলন, বস্তুজগতের সঙ্গে চৈতন্যের মিলন। এই যে মিলন ইহা খণ্ড খণ্ড পদার্থের একত্রীকরণ নহে। রসের মধ্যে রহিয়াছে একটি অখণ্ড শক্তি যাহার বলে আপনা হইতেই কবির চিত্ত বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলিত হয়। এইখানেও রসের অনির্বচনীয়তা। কবির চৈতন্য অব্যবহিতভাবে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। এইজন্যই রসকে গণনা করা যায় না, মাপা যায় না, ওজন করা যায় না। তাহা সমগ্র, একক, বিভিন্ন অংশকে জোড়া লাগাইয়া তাহাকে তৈয়ারি করা যায় না, কবি কল্পনার রসে জারিত করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করেন। তাহাকে সৃষ্টি ও উপলব্ধি করিতে হয় সমগ্র মন দিয়া, হৃদা মনীষা মনসা। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিতভাবে জানে অসীমপুরুষকে, তখন সেই অখণ্ড ঐক্যের মধ্যেই রসের উৎপত্তি হয়। বস্তুজগতে এক পদার্থ অন্য পদার্থ হইতে খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বুদ্ধি দিয়া আমরা তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখি; যদি কখনো কোনো নীতির সাহায্যে একত্র করিয়া দেখি তাহা হইলেও তাহাদের পার্থক্য দূর হয় না। এই খণ্ডিত পরিচয়ে তাহাদের মর্মগত রহস্য গোপন থাকিয়া যায়। রসলোকে যে ঐক্য ও সমগ্রতা আছে সেইখানে কোনো ব্যবধান থাকিতে পারে না; যে আবরণে এই সমগ্রতা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে কবির কল্পনাবলে তাহা অপসারিত হয়। তাই সাহিত্যের রস ঐক্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আস্বাদও দেয়। আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত রসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের সাদৃশ্য একাধিকবার কথিত হইয়াছে। আর একটি সাদৃশ্য এখানে উল্লিখিত হইতে পারে। 'রসগঙ্গাধর'-গ্রন্থে জগন্নাথ অভিনব গুপ্তের মত বিবৃত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, ব্যক্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিৎ। চিৎশক্তি আবরণে আচ্ছন্ন থাকে। রসস্রষ্টা সেই আবরণ উন্মোচন করিলে চিৎশক্তি নিজেকে প্রকাশ করে এবং অন্যান্য বস্তুকেও প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ যে অব্যবহিত ঐক্য বা সংযোগের কথা বলিয়াছেন ইহার সঙ্গে তাহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

এই যে সমগ্র একক সৃষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ইহার সম্পর্কে একটি আপত্তি হইতে পারে যে, সাহিত্যে অনেক সময়ই একটি রসেরই অভিব্যক্তি হয়, যে-সকল চরিত্রের সৃষ্টি হয় তাহাদের মধ্যে বিশেষ একটি অনুভূতিই প্রাধান্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সাহিত্যে সমগ্র মানুষেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। সাহিত্য মানুষের সমগ্র মনের সৃষ্টি এবং তাহা প্রকাশও করে সমগ্র মানুষকে। যেখানে আমার ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত, সেইখানে আমি প্রাত্যহিক জগতের মানুষ, কিন্তু যেখানে আমি সমস্ত প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া নিজের সমগ্র মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি, সেইখানে আমি রসানুভব করি। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপে : ''আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হল আমার সীমার দিক্‌কার কথা; এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন; আমি মানুষ, এটা হল আমার অসীমের অভিমুখী কথা; এখানে আমি বিরাট একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশমান।'' ''লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।'' যদিও দেখা যায় যে কোনো একটি রসকে বা অনুভূতিকে কোনো জায়গায় প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলেও সেই রস বা অনুভূতির মধ্য দিয়া সমগ্র মানুষটি যে পরিমাণে প্রকাশিত হইবে সেই পরিমাণেই তাহার সাহিত্যিক

মূল্য নির্ণীত হইবে। হ্যামলেটের অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা বা ইয়াগোর কারণহীন পাপাসক্তি—একটি বিশেষ প্রবৃত্তি নহে; ইহাদের মধ্য দিয়া একেকটি সমগ্র মানুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এখানে বিশেষ প্রবৃত্তিগুলি সমগ্র অখণ্ড মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি বা প্রতীক। যদি কোনো প্রবৃত্তি—যেমন ঔদরিকতা—এইরূপ প্রতিনিধিত্বলাভ করিতে না পারে, তবে তাহার সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। যদি কোনো চিত্র আংশিকভাবে সমগ্রের প্রতীক হয়—যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যে বা জোলার উপন্যাসে—তাহা হইলে সৃষ্টি হয় খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যের মধ্যে শেকস্‌পীয়রের নাটকে বা জর্জ এলিয়টের নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রকাশ হইয়াছে। ''তারই সংঘাতে আমাদের আগাগোড়া জেগে ওঠে; আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড়-ভাঙা ছাইচাপা জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।'' ইহাকেই বলা যাইতে পারে ''ভগ্নাবরণা চিৎ।''

পাঁচ

যাহা চিন্ময় তাহাই আনন্দময়। সাহিত্যের ফল হইতেছে আনন্দোপলব্ধি। যে অমৃতরস প্রকাশমান তাহাই আনন্দস্বরূপ—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যে রস আস্বাদিত হয় তাহা যে আনন্দের সঞ্চার করে, ইহা বলাই বাহুল্য? কিন্তু প্রশ্ন এই, ট্রাজেডি দুঃখের চিত্র; তাহা কেমন করিয়া আনন্দের কারণ হইতে পারে? আর যদি ট্র্যাজেডি আনন্দের সঞ্চারই না করিবে তাহা হইলে তাহা লিখিতই বা হইবে কেন? প্রত্যেক আলংকারিককেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও এই সমস্যার যথাযথ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, সাহিত্য প্রয়োজনের জগতের বাহিরে; সুতরাং ইহা আমাদের স্বার্থে আঘাত করিতে পারে না। এই যে দূরত্ববোধ ইহাই আনন্দোপলব্ধির পথের বাধা অপসারিত করিয়া দেয়। ''দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর চোখের জলের বাষ্প সৃজন করে কিন্তু আমাদের সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করে না; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না...।'' কিন্তু এই উত্তর যথেষ্ট হইল না। সাহিত্য যদি সত্য হইয়া আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তাহা হইলে কাব্যবর্ণিত শোক ও দুঃখ আমাদের নিজেদের শোক ও দুঃখ বলিয়াই প্রতীত হইবে। তাহা আমাদের স্বার্থে আঘাত করিতে না পারে, কিন্তু তাহার উপলব্ধি পীড়াদায়ক হইবে না কেন? যে মনোবিকলতত্ত্ববিদ্‌দের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা মনে করেন যে, দূরত্ববোধের সৃষ্টি এমন করিয়া করিতে হইবে যে দুঃখের চিত্র জীবন্ত বলিয়া মনে হইলেও খুব কাছে আসিয়া ব্যথার সৃষ্টি করিতে পারে না। খুব কাছে আসিলে তাহা বেদনাদায়ক হইবে এবং খুব দূরে থাকিলে তাহা কৃত্রিম বলিয়া মনে হইবে। অভিনব গুপ্ত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছেন রসের অলৌকিকত্বের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে দেখিয়াছেন ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ হিসাবে। তাই তিনি মনে করেন যে আমি এবং না-আমির মিলনে দুঃখবোধের কারণ থাকিলেও সাহিত্যে যে গভীর আত্মোপলব্ধির সঞ্চার হয় তাহাই আনন্দের সৃষ্টি করে। যে কোন বেগবান অভিজ্ঞতায় চৈতন্য বিশেষ করিয়া আলোড়িত হয় এবং আত্মা আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া উপলব্ধি করে। বাস্তব জীবনেও দেখা যায় যে অনেক দুঃসাহসী মানুষ দুর্গমপথে যাত্রা করে, বিপদকে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে; আত্মোপলব্ধির প্রেরণাই তাহাদিগকে এই সকল অভিযানে উদ্বোধিত করে। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের উপলব্ধি হইতে প্রবলতর; ইহাই ট্র্যাজেডির মূল্য। দুঃখের মধ্যে আমরা নিজেদিগকে যেমন গভীরভাবে চিনিতে পারি সুখের মধ্যে তেমনভাবে পারি না। এই যে নিবিড় অস্মিতাসূচক অনুভূতি ইহা বাস্তবজীবনে সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে অনিষ্টের আশঙ্কা আসিয়া উপলব্ধিকে বাধা দেয়।

এই ব্যাপারে সাহিত্যের দূরত্ববোধ আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। সাহিত্যে দুঃখের চিত্রের মধ্যে আমি নিজেকে স্পষ্ট করিয়া জানি, গভীর করিয়া জানি, ব্যাপকভাবে জানি অথচ স্বার্থহানির সম্ভাবনা নাই। এখানে আত্মোপলব্ধি আছে অথচ আত্মঘাতের ভয় নাই। রবীন্দ্রনাথ আর-একদিক হইতেও ট্র্যাজেডির মহিমা বিচার করিয়াছেন। দুঃখকে শুধু দুঃখ হিসাবে দেখিলে আমাদের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহার পশ্চাতে আনন্দ আছে বলিয়াই তাহা সহনীয় হয়, উপভোগ্য হয়।

এই-সব কারণেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টিকে লীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ বিবর্তনবাদীরা জীবনকে দেখিয়াছেন সংগ্রাম হিসাবে—সেখানে শুধু হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে এই মারামারি ও কাটাকাটি আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, কারণ বাঁচিয়া থাকিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে। এই অহেতুক ইচ্ছাই জীবনের চরম কথা। ইহাকেই তিনি বলিয়াছেন লীলা এবং যেহেতু ইহা দুঃখবোধকে অতিক্রম করে তাই ইহা স্বভাবতই আনন্দময়। এই লীলা বা আনন্দের ক্ষেত্র জীবনব্যাপী; তাই ইহার বিরাট ভূমিকা। কেহ কেহ মন করিতে পারেন, সাহিত্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি। কিন্তু তাহা হইলে সাহিত্যের ব্যাপকতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। ভাঁড়ুদত্ত সুন্দর নহে; "হ্যাম্‌লেটের ছবি সৌন্দর্যের ছবি নয়, মানবের ছবি; ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।" এই মানবস্বভাব লীলাময়; তাই ইহার প্রকাশ আনন্দস্বরূপ। সৌন্দর্যসৃষ্টি এই আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তির উপলক্ষমাত্র। এই অর্থেই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এই অর্থেই Truth is Beauty, Beauty Truth।

সাহিত্যজিজ্ঞসায় রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল। যদিও এই সমস্যার অধিকাংশ প্রশ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা ও সমাধান তাঁহার আলোচনায় পাওয়া যায়, তবু কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার মত অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, একটি আপাত স্ববিরোধিতার কথা ধরা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, সাহিত্য আবিষ্কার নহে, সৃষ্টি। কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে ইহার প্রক্রিয়াকে তিনি অনাবরণস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই স্ববিরোধিতায় তাঁহার মতের চরম মূল্যের হানি হয় না। তিনি সত্যকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। মানবজীবনের চরম সত্যকে তিনি আনন্দস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাহা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়াই নিজের সত্তাকে লীলায়িত করে। সুতরাং সাহিত্য সৃষ্টিও বটে, অনাবরণও বটে। কিন্তু আর দুই-একটি ত্রুটি আছে যাহা মৌলিক। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মনের শক্তিকে দুই ভাগে—কোথাও তিন ভাগে—ভাগ করিয়াছেন—বুদ্ধি যাহা জ্ঞান লাভ করে, অনুভূতি যাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন, সাহিত্য সমগ্র মনের সৃষ্টি। এই সমগ্র মনের মধ্যে বুদ্ধিও আছে। প্রশ্ন এই, সাহিত্যসৃষ্টিতে বুদ্ধির স্থান কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সত্যকে আমরা হৃদা মনীষা মনসা উপলব্ধি করি। হৃদয় ও মন কি দুইটি বিভিন্ন বস্তু? যদি তাহা হয় তাহা হইলে হৃদয় হইতে বিভক্ত যে মন সাহিত্যসৃষ্টিতে তাহার দ্বারা কোন কাজ সাধিত হয়? আর যদি তাহারা এক অবিচ্ছিন্ন পদার্থই হয় তাহা হইলে তাহারা পৃথকভাবে উল্লিখিত হইল কেন? এবং তাহা হইলে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পার্থক্য থাকে কোথায়? লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোনো সাহিত্যে কতকগুলি ভ্রান্ত মতের সঙ্গে যদি একটা জীবন্ত মানুষ পাই তাহা হইলে সেই জীবন্ত মানুষকেই কি চিরস্থায়ী করিয়া রাখি না? কিন্তু প্রশ্ন এই, সেই জীবন্ত মানুষটি কি একটি অবিচ্ছিন্ন পদার্থ বা অ্যাবস্ট্রাকশন? ভ্রান্ত মতের সঙ্গে ঐক্যলাভ করিয়া তাহা কি সমগ্র হইয়া উঠে নাই? অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ-মতো।"

এই ‘‘গ্রহণ বর্জন’’ কাজটি করে কে? নিশ্চয়ই কল্পনা নহে, কারণ তাহার নির্দেশ-মতো ইহা সংঘটিত হয়। এই শক্তি বুদ্ধি। এই গ্রহণবর্জনকারী বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে নির্দেশক কল্পনার সম্বন্ধ কি? রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় এই-সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না।

উপরে যে সংশয়ের উল্লেখ করা হইল তাহাই আর একদিক হইতে উত্থাপিত করা যায়। বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যিকের সৃজনী প্রতিভার-সম্পর্ক কি? যে বস্তুজগৎ বাহিরে পড়িয়া আছে তাহা তথ্যমাত্র। তাহা সাহিত্যিকের পক্ষে বাস্তব নহে। তাহার একটি বিশেষ প্রকাশই সাহিত্যের অন্তর্ভূত। রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘‘যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।’’ চেতনার বাহিরে যে বাস্তব পড়িয়া রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ‘‘নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে ... কিন্তু সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করে কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়।’’ বস্তুজগৎ কি রসের আধার মাত্র? রসসৃষ্টিতে কি তাহার সহকারিতার প্রয়োজন হয় না? অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, ‘‘বাস্তবে যা আছে বাইরে, তাকে পরিণত ক’রে তুলতে হবে মনের জিনিস করে।’’ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বস্তুপিণ্ড রসের আধার নহে, তাহা রসের বিষয়বস্তু বা কাঁচা মাল। প্রসঙ্গান্তরে তিনি বাস্তবের সঙ্গে রসের সম্পর্কের ব্যবস্থা করিয়াছেন একটি অপরূপ উপমার সাহায্যে : ‘‘সূর্যের ভিতরের দিকে বস্তুপিণ্ড আপনাকে তরল-কঠিন নানাভাবে গড়িতেছে, সে আমরা দেখিতে পাই না—কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া আলোকের মণ্ডল সেই সূর্যকে কেবলই বিশ্বের কাছে ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। এইখানেই সে নিজেকে মুক্ত করিতেছে। মানুষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে এমনি করিয়া দৃষ্টির বিষয় করিতে পারিতাম, তবে তাহাকে এইরূপ সূর্যের মতোই দেখিতাম। দেখিতাম, তাহার বস্তুপিণ্ড ভিতরে ভিতরে নানা স্তরে বিন্যস্ত হইয়া উঠিতেছে; আর তাহাকে ঘিরিয়া একটি প্রকাশের জ্যোতির্মণ্ডলী নিয়তই আপনাকে চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে।’’ এই উপমার মধ্যে রস কোন বস্তুর সহিত তুলিত হইতেছে? ইহা কি প্রকাশের জ্যোতির্মণ্ডলী না সমগ্র সূর্য? যদি সমগ্র সূর্যই রসের উপমান হয়, তাহা হইলে মানিতে হইবে ভিতরের বস্তুপিণ্ড তাহা হইতে পৃথক নহে। আর যদি প্রকাশের জ্যোতির্মণ্ডলীই রসের প্রতীক হয়, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে উহা বস্তুপিণ্ড হইতেই বিকীর্ণ হইতেছে। আনন্দবর্ধনের মতে বাচ্য অর্থ—যাহা শাস্ত্র ইতিহাসাদিতে প্রযোজ্য—ব্যঙ্গ রসকে ‘‘আক্ষিপ্ত’’ করে। আলোর পক্ষে দীপের যেমন প্রয়োজন, কাব্যের পক্ষে বাচ্যার্থের সেইরূপ প্রয়োজন। অভিনব গুপ্ত ইহাদের মধ্যে ‘‘নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব’’ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহারা এই দুইটি পদার্থকে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান ও অনুভূতিকে, বাস্তবজগৎ ও রসজগৎকে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। আবার রসকে একটি সমগ্র অখণ্ড পদার্থ বলিয়াও কল্পনা করিয়াছেন এবং সাহিত্যের বিশ্লেষণের নিন্দা করিয়াছেন। আবার কখনো কখনো রসকে বাস্তবের অতিরিক্তও বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার গভীরতা ও ব্যাপকতা অনন্যসাধারণ, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে রসলোকের, বুদ্ধির সহিত কল্পনার সম্পর্ক তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট হয় নাই।

বৈষ্ণব কবিতা ঃ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি

জনার্দন চক্রবর্তী

শ্রীরাধাতত্ত্বের সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ের আলোচনা করবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এ-যুগের মহামনীষী কবি তাঁর বিশ্বগ্রাহী কবিমন দিয়ে বৈষ্ণব কবিতাকে যে-ভাবে গ্রহণ করেছেন, তার প্রভাব অতর্কিতে আমাদের বৈষ্ণব কবিতার মূল্যায়ন এবং শ্রীরাধাতত্ত্বের উৎসসন্ধানকে প্রভাবিত করেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একটি শক্তিশালী কবিমানসের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি একালের সমস্ত সারস্বত চেতনা ও প্রয়াসকে কতখানি আবিষ্ট করেছে, তার একটি উদাহরণ এখানে পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গটি তাই একটু সবিস্তারে আলোচনা করতে চাই। কবিসার্বভৌমের সর্বতোমুখী রসচেতনায় সর্বচিত্তহর শ্রীরাধাতত্ত্ব এবং সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কি-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনায় লাভ আছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠককে নোতুন করে বলে দিতে হবে না যে, তাঁর অত্যাশ্চর্য কবি-প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে বৈষ্ণবকবিতার রসানুভূতির নিবিড় যোগ রয়েছে। বর্ষীয়ান্ সর্বজনবরেণ্য বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের একটি উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য, ‘‘বৈষ্ণব কবিগণের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।’’ তবে রবীন্দ্রনাথের শ্রীরাধাতত্ত্বের ধারণা ঠিক বৈষ্ণবীয় উপলব্ধির পথে ধরে গঠিত হয়নি। ‘সোনার তরী’র প্রসিদ্ধ ‘বৈষ্ণব কবিতা’য় কবি প্রশ্ন করেছেন,

‘‘সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্ত রাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে! তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!’’

বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুপম কবি-ব্যাখ্যাতার কাছে একটি সশ্রদ্ধ পরিপ্রশ্ন ছিল যা তাঁর জীবৎকালে চরণনিষণ্ণ হয়ে উপস্থাপন করবার সুযোগ হয়নি। বৈষ্ণব কবিতার রসাস্বাদনে সবার সমান অধিকার, কেউই বঞ্চিত হয়ে ''যাবে না ফিরে''। বৈষ্ণবের সেটি পরম গৌরব, পরম কামনার বিষয়। কিন্তু 'রাধিকার চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা'র যে ছবি বৈষ্ণব কবি এঁকেছেন, তা কি সংসারসীমার মুখ ও আঁখি থেকে চুরি করা যায়? বিশ্বসাহিত্যে তার প্রতিচ্ছবি আর কোথাও মিলেছে কি?

''দুঃখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরানগরে ছিলে তো ভাল।।''

এতখানি 'ভালো' কি ধরার দুয়ারে রূপ নেয়? উদ্ধৃতিটি কবিবচন, তত্ত্বের ভাষায় একে ব্যক্ত করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ,

''আত্মসুখহেতু গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার।''

পদাবলীর কবিবচনে একথা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

''বঁধুর পিরীতি আরতি হেরিয়া
হেন মোর মনে করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে।''

''তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহসুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলু
কহতহি গোবিন্দদাস।''

ভাগবতীয় শাস্ত্রবচনে ভগবদুক্তিরূপে এর উৎসমুখে পাওয়া যায়,

''ন পারয়েহহং নিবরদ্যসংযুজাম্
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।''

কবিত্বলেশহীন হয়েও এর অনুবাদের আকৃতি মিটাই,

''আমারে ভজিয়া ছিঁড়িলে যেরূপে গৃহবন্ধন কঠিন ডোর,
প্রেমের বাঁধনে বাঁধিলে আমারে সুযশ যাহার ভুবনভোর।
কলঙ্কবিহীন সে অনুরাগের সাধ্য আছে কি, দিব প্রতিদান,
অনুরাগ দিয়ে সাধিবে তোমরা অনন্য সেই প্রেমের মান।''

''বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।

সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।"

সংসারসীমার ভালবাসা কি এমনভাবে 'সব সমর্পিয়া একমন হইয়া' 'নিশ্চয় দাসী' হতে পারে? তত্ত্বের ভাষায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

"লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম-কর্ম।
লজ্জাধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম।।
দুস্ত্যজ্য আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন।।
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমসেবন।।"

মহাজন পদকর্তা নানাভাবে এর রসভাষ্য রচনা করেছেন,

"ধৈর্যশালা হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কবাট ছিল তার।
বংশীরব বজ্রাঘাত পড়ে গেল অকস্মাৎ
সমভূমি করিল আমায়।।"

অথবা

"হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমায়ল
প্রেম প্রহরি রহু জাগি।
গুরুজনগৌরব চৌরসদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি।।"

প্রেমের এই অতন্দ্র পাহারা এই অনন্ত প্রতীক্ষা ও গুরুগৌরবে এই উপেক্ষা কি 'ধরার সঙ্গিনী'র সাজে?

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।"

অথবা

'দুঁহু লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম।"

"মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী মেলি মধাই।"

এই রূপানুরাগ ও গুণানুধ্যান কি ইন্দ্রিয়চেতনাময় রূপাভিনিবেশ বা 'নিধুবনে রমণীরসরঙ্গে' মত্ততার ফল? "আমাদেরি কুটির-কাননে" যে-ফুল ফোটে তার কি এতখানি সৌরভ? তবে কবিগুরুর কথিত "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা", এ-কথায় বৈষ্ণবের পূর্ণসম্মতি রয়েছে। বৈষ্ণবের চতুর্বিধারতির, তাঁর দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরের এই তো বৃত্তি, যে-জন্যে বৈষ্ণব ঐশ্বর্যভাবনা পরিহার করে মাধুর্যের সাগরে ডুবে যেতে চেয়েছেন,

"ব্রজের নির্মলরাগ শুন ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম।।"
"আপনারে বড়ো মানে আমারে সমহীন।
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।"
"ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভাষায়,

"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।।"

"মানসী"র 'একাল ও সেকাল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা
সারা দিন সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।
সেই দিবা-অভিসার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে?"

কিন্তু সংসারসীমার অভিসারে, জীবনে অথবা লৌকিক কাব্যে কি দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, বর্ষাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, এত বৈচিত্র্য থাকে? নীলাম্বুধিতীরে তপ্তবালুকাভিসার পাঁচশো বছর আগে এ-দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। দুঃখবরণের এই দুর্জয় অধ্যবসায়, তিমিরপ্রয়াণের, দুতরপন্থগমনের এই অদম্য আগ্রহ, মনসিজ-তন্ত্রের সাধনার এত স্তর কি লৌকিক প্রেমের অভিসারে দেখা যায়। পৃথিবীবাসিনী কোনও অভিসারিকা কি বলতে পেরেছেন?

"ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।"
"যছু পদতলে নিজ জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।"

আমাদের লিখিত ক্ষুদ্র 'নবপরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছিলাম, ব্রজবুলির নিখুঁত গীতময় অনুকৃতি হয়েও ভানুসিংহের পদাবলী বৈষ্ণব কবিতা হয়ে ওঠেনি। কথাটিতে কেউ-কেউ আপত্তি জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবুদ্ধি পোষণ করেই এ কথা বলেছিলাম। কথাটি তো আমার নিজের নয়, সত্যসন্ধ কবি নিজেই এ-কথা বলে গেছেন। তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গিতে তিনি ভানুসিংহের বাঙ্‌নির্মিতিকে 'পদাবলীর জালিয়াতি' বলেছেন। আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন, "পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানাদ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যের একটি অনধিকার প্রবেশ বলে গণ্য করি।" আমরাও সত্যানুরাগী কবির প্রতিধ্বনি

করে বলি, রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের উপাদানে বৈষ্ণব কবিতার রসের জোগান রয়েছে, কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্তার বিশেষ বিশ্বাস-চিহ্নিত ভক্ত-মনোভঙ্গি ও কবিমানসিকতার রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেনি। তবে তাঁর কবিচিত্তের অন্তস্তলে শ্রীরাধাতত্ত্বের প্রতি ভক্তিসংস্কার মাঝে-মাঝে উঁকি দিয়েছে,

> ‘‘প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়
> রাধাময় তব বেণু।
> জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা
> চরণে প্রণত ভানু।’’

রবীন্দ্রনাথে প্রণাম আছে, অঞ্জলি আছে, নৈবেদ্য আছে, মাল্য গন্ধ ধূপ দীপ আরতি নৃত্য, আরও কত কি উপচার আছে, কিন্তু তাঁর পূজার প্রকরণ ও পদ্ধতি স্বতন্ত্র! ‘নাম্মামকারি বহুধা’। নাম আছে, কিন্তু বিশেষ-কোনও নাম নেই, আছে

> ‘‘আপনি কবে তোমারি নাম
> ধ্বনিবে সব কাজে।’’

আকর্ষণ আছে, কিন্তু সর্বাকর্ষক নিত্যাকর্ষক কৃষ্ণনামটি নেই,

> ‘‘বেদনাদূতী গাহিছে ওরে গান,
> তোমার লাগি জাগেন ভগবান,
> নিশীথে ঘন অন্ধকারে
> ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
> দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।’’

বৈষ্ণবের উচ্ছল ভাবভক্তির পথটি রবীন্দ্রনাথ সাবধানে পরিহার করে চলেছেন। ‘নৈবেদ্য’ কাব্যে এই মনোভঙ্গি স্ফুটবাক্ হয়ে উঠেছে। ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থে যে আকূতি ও আত্মসর্ম্পণের সুর ধ্বনিত হয়েছে, তার কতখানি ভগবন্নির্ভর, কতখানি মানবতাভিমুখী, সে-সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। ‘নৈবেদ্য’-এর ‘অপ্রমত্ত’ কবিতায় পাওয়া যায়,

> ‘‘যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
> মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
> ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
> উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
> নাহি চাহি নাথ।’’

আমাদের আশঙ্কা হয়, এখানে ভাবভক্তির পরিপন্থী এবং কবিচেতনা হ’তে পৃথগ্‌ভূত একটি সচেতন দোষদর্শিতার স্পর্শ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসুন্দর কবিভাষাও এখানে ক্লিষ্ট হয়েছে। ভাগবতীয় ভক্তিসাধনা, বৈষ্ণব গোস্বামীদের এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-ব্যাখ্যাত সাধনভক্তি এখানে অস্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বে, এমন কি মহাপ্রভুর সমকালে তাঁর কাছেই এই অভিযোগ এনেছিলেন একজন তর্কনিষ্ঠ তীক্ষ্ণধী গৃহী এবং একজন বেদান্তী সন্ন্যাসী। মহাপ্রভুর ‘বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজভক্তিযোগ’ গ্রহণ করবার পূর্বে বাসুদেব সার্বভৌম এই অভিযোগ এনেছিলেন। সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ ও তাঁর সম্প্রদায় সম্ভ্রম সহকারে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিরুদ্ধে ভাবকালির আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন।

"সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন গায়ন
ভাবক সন্ন্যাসী লইয়া কর সঙ্কীর্তন।"

বিশ্ববিমোহন বিনয়বচনে মহাপ্রভু এর উত্তরে বলেছিলেন, গুরুদত্ত কৃষ্ণনাম তিনি কণ্ঠে ধারণ করেছেন। বেদান্তে তাঁর সম্যক্ অধিকার জন্মেনি।

"সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়।"

সেই সঙ্গে ভাগবতের এই শ্লোকটি মহাপ্রভু পড়েছিলেন,

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।" ভাগবত, ১১।২।৪০

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।।
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
তার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।।
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে হাসে ইতি উতি ধায়।।"
চৈতন্যচরিতামৃত, আদি। ৫ম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তি-কল্পতরু-বর্ণন প্রসঙ্গে আছে,

"যে যে পূর্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সে হো ফল খায় নাচে বলে ভালে ভাল।।"

কৃষ্ণদাস কৃষ্ণভক্তিরসের বহিরভিব্যক্তিতে 'মত্ত'তার অপবাদ খণ্ডন করে বলেছেন,

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।।"

সকলেই জানেন, বেদান্তী প্রকাশানন্দের ভক্তিবৈরূপ্য মণিমন্ত্র-মহৌষধি-নিরুদ্ধ ভুজঙ্গমের মতো শান্ত হয়েছিল। বহুদিন ধরে একটি সংশয়বেদনা-সংকুল প্রশ্ন আমাদের পীড়া দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের মতো ভূরিপাঠী অধীতী কবির কি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহকারে পড়বার সুযোগ হয়নি?[১] বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোথাও আমার এ-প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি। এ-সম্বন্ধে মনটি সর্বদাই জিজ্ঞাসু ও উন্মুক্ত রেখেছি। এ-বিষয়ে উপদেশ পেলে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব। বিশ্বসভায় বাংলা সাহিত্যের জন্য অসামান্য গৌরব বহন করে এনেছেন আমাদের যে মহামহিম কবিসার্বভৌম তিনি বাংলা সাহিত্যের আর এক প্রান্তের তাঁরই মতো চিরজীবী এক কবির সাধনদীপ্ত অত্যাশ্চর্য কবিপ্রতিভার বিজয়বৈজয়ন্তী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানির উপর

---

১. রবীন্দ্রনাথ 'চৈতন্যচারিতামৃত' গ্রন্থটি যে পাঠ করেছিলেন, তার একাধিক স্পষ্ট প্রমাণ আছে রবীন্দ্র রচনাতেই। —সম্পাদক

কোনও আলোকসম্পাত করেন নি, এটি আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। গ্রন্থসমাপ্তিকালে 'বৃদ্ধ জরাতুর' কবিরাজ কালের দূরদিগন্তে দৃষ্টিপ্রসারণ করে যে অশ্রুসিক্ত অনুনয় জ্ঞাপন করেছিলেন,

''চৈতন্য-চরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞি করোঁ মুঞি পানে।।''

তাঁর বিশ্ববন্দিত উত্তরসূরি কি সেই প্রাণস্পর্শী অনুনয়ের সম্মুখীন হন নি? রবীন্দ্রনাথের কবি-মন যে, তাঁরই কথায় ''স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে'' বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে বিচরণ করতে পারেনি, তার আর একটি দৃষ্টান্ত পাই, জয়দেব ও কালিদাসের রবীন্দ্রনাথ-কৃত তুলনামূলক সমালোচনায়। এ-সম্বন্ধে পূর্বে আর-এক স্থলে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। কালিদাসের কবি-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও কবিব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু জয়দেব-সম্পর্কে তাঁর স্বীকৃতি বিগতকুণ্ঠ হতে পারেনি। জয়দেবের লালিত্যেরই শুধু তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে লালিত্য যেন ''গুণ হইয়া হইল দোষ''। 'ললিতলবঙ্গ-লতা'র পাশে তিনি 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'কে স্থাপন করে কালিদাসের সংযম ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে জয়দেবের মিষ্ঠতার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করেছেন। আমাদের এখানে বলবার একটা ছোট কথা আছে। কালিদাস ও জয়দেব উভয়েই মদনমহোৎসবের কবি, কিন্তু কালিদাসে মদনমহোৎসব মদনদহনোত্তর শান্ত পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে। জয়দেবে মদনমোহন বা সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন-তত্ত্বের বিশ্রাম। জয়দেব বৈষ্ণবসাধনার গূঢ় রহস্যসঙ্কেতের কবি। মদনদহন ও মদনমোহন দুই-ই মানুষের অন্তর্লোকের সাধনরহস্য। গুরুত্বে কোনটিই ন্যূন নয়। কালিদাসের কাব্যের বহিরঙ্গে মদনমহোৎসব, অন্তরঙ্গে মদনদহন গভীর সংযত সংহতরূপ নিয়েছে। আশ্রমজীবনের সংযম আদর্শ মদনমহীপতির দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ন্ত্রিত করেছে। রঘুবংশে অগ্নিবর্ণ ও দিলীপ দুই-ই রয়েছেন। এ-যেন কবির প্রথম যৌবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নাগরজীবন ও আশ্রমজীবনের আদর্শসংঘাত। শকুন্তলায় দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পূর্বমিলন ও উত্তরমিলন, মালিনীতীরের তপোবনে এবং মারীচের আশ্রমে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মেঘদূতে পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ উভয়ত্র চেতনাচেতন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রকৃতিতে মদনমহীপতির অপ্রতিহত প্রতাপ মেঘমন্দ্রে বিঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও শিখণ্ডিবর্হে স্ফুরিতরুচি গোপবেশ বিষ্ণু, তাণ্ডবনিরত দেবতা মহাকাল এবং ভক্তিদৃষ্টি-বিমুগ্ধা ভবানী অপ্রত্যাশিতভাবে চকিতে দেখা দিয়েছেন। কুমারসম্ভবে দেবতার নিষ্কম্প দীপশিখার মতো যোগসমাধিস্থ অচঞ্চল মূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেবদম্পতীর বাগর্থসম্পৃক্তিতুল্য মিলনের চিত্রটিও গোপন রাখা হয়নি। জয়দেবেও তেমন ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল মলয়সমীরে'র চাঞ্চল্যই শুধু প্রদর্শিত হয়নি, স্বর্গমর্তবিজয়ী অবার্যবীর্য কন্দর্পদেবতার প্রাণমনোহরণ দর্পহরণের এবং 'মদন মরুছা পায়' এমন 'ঈষৎ হাসির তরঙ্গহিলোল' বয়ে গিয়েছে। প্রাচীন কবি কালিদাসের শৃঙ্গাররসে যে ভক্তিশ্রীর আভাস, উত্তরসাধক কবি জয়দেবে তার ঔজ্জ্বল্য, তার অন্তর্বল ও অধ্যাত্মসুষমার পূর্ণবিকাশ। শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-স্থাপক শ্রীরূপ এই উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরসের ভাষ্যকার এবং আলঙ্কারিক রূপকার। রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষা-মঙ্গল' কবিতায় বর্ষাপ্রকৃতির বাণীমূর্তির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

''শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীতি-মুখরিত বনবীথিকা।''

কালিদাস, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ এঁদের প্রত্যেকেরই কাব্য 'শত শত গীতিমুখরিত বনবীথিকা।'

রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে মানুষের মুক্তি ও অমৃতত্ব বা অমরত্বের ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল, কারণ উভয় ধারণাই মূলে প্রসৃত তাঁহার অন্তর্নিহিত একটি গভীর অদ্বয়বোধ হইতে। কিন্তু এই মুক্তি এবং অমৃতত্বের ধারণা বিষয়ে উপনিষদের সহিত খানিকটা অংশে রবীন্দ্রনাথের মিল থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে এবং সেই পার্থক্যের ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ব্যঞ্জিত।

অমৃতত্ব বা অমরত্ব বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-প্রবণতা কোনো একটানা পথে অগ্রসর হয় নাই। এ-ক্ষেত্রেও কোনও বিশিষ্ট মতবাদের পথ অনুসৃত হয় নাই বলিয়াই কোনো সোজা পথও দেখা দেয় নাই, অনুভূতি কবিকে বিচিত্রগামী করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁহার যে অমরত্বের বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খানিকটা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া। উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'ঐ যাহা কিছু তাহা পূর্ণ, এই যাহা কিছু তাহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতেই পূর্ণ উদিত হয়; পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।' এই পূর্ণ-স্বরূপের অসীমতার মধ্যে কিছুই হারাইয়া যাইবার ভয় নাই; ব্যক্তিকে নিজের ক্ষুদ্রসীমার মধ্যে খণ্ড করিয়া না দেখিয়া পূর্ণস্বরূপের অসীমতার মধ্যে প্রসারিত দেখিতে পাইলে আর মৃত্যুর প্রশ্ন থাকে না। এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া রচিত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি প্রচলিত জনপ্রিয় গানটি—

> তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
> যত দূরে আমি ধাই—
> কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
> কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

পূর্ণস্বরূপের 'চরণের কাছে' 'যাহা কিছু সব' নিত্যকালের জন্যই 'আছে আছে আছে'; অতএব 'নাই নাই ভয়' শুধু ক্ষুদ্র আমিরই ক্রন্দন; সেই পূর্ণস্বরূপের মধ্যে সকল 'অন্তর গ্লানি' এবং 'সংসার ভার' পলকের মধ্যে একাকার হইয়া যায়; সুতরাং জীবনের মধ্যে সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই নিত্য অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

এই গানে এবং এইজাতীয় অন্য গানে ব্যঞ্জিত যে প্রবণতা তাহা হইল সকল খণ্ডের পশ্চাতে পূর্ণস্বরূপ একের উপলব্ধির চেষ্টা; বহুত্ব হইতে খণ্ডত্ব হইতে ফিরিয়া পূর্ণস্বরূপ একে সমাহিত হইবার চেষ্টা। এখানে এই 'পূর্ণস্বরূপ এক'ই একমাত্র হইয়া দেখা দিয়াছেন, সেই একের ভিতর দিয়া বহুর ভিতরে যুক্ত হইবার কোনও স্পৃহা প্রবল হইয়া দেখা দেয় নাই। মৃত্যু-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি অতিজনপ্রিয় গান হইল,—

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয়।

এখানে কবিমন প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এখানেও 'অজানার জয়' ঘোষণা করিলেন বটে, কিন্তু এই অজানার মধ্যে যত অস্পষ্টভাবেই হোক, খানিকটা 'জানা' আসিয়া গিয়াছে। এই জীবন যেন 'দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘর', মৃত্যুর দুয়ারের ভিতর দিয়া এঘর ছাড়িয়া গেলে যেখানে গিয়া পৌঁছনো যাইবে তাহা হইল 'চিরদিনের আবাস'। এই 'চিরদিনের আবাস'কেও 'একে'র মধ্যে নিহিত বিশ্বজীবনের প্রবাহ বলিয়া যে ব্যাখ্যা না করা যাইতে পারে তাহা নয়, কিন্তু অন্যত্র কবি সত্যের নিখিল সৃষ্টিপ্রবাহের ভিতর দিয়া যে নিরন্তর জায়মান রূপ দেখিতে চাহিয়াছেন এক্ষেত্রেও 'অজানা'র জয়ধ্বনির ভিতর দিয়া তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে মনে হয় না। পরবর্তী কালের এই জাতীয় গানে রবীন্দ্রনাথ 'অজানা'কে খানিকটা প্রচলিত সুরঘেঁষা করিয়া 'চিরদিনের আবাস' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; খানিকটা সুরপরিবর্তন লক্ষ করিতে পারি—

সমুখে শান্তিপারাবার
ভাষাও তরণী হে কর্ণধার।।

এই সঙ্গীতটির ভিতরেই। অধ্যাত্ম প্রেরণা এখানেও স্পষ্ট, কিন্তু এখানে যে 'চির সাথী'কে ক্রোড় পাতিয়া কবিকে গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে সেই 'চির-সাথী'র পথ হইল অসীমের পথ, এবং 'ধ্রুবতারকার জ্যোতিঃ' লাভ করিতে হইবে এই অসীমের পথেই। 'মর্ত্যের বন্ধন' যাহাতে ক্ষয় হয় কবি তাহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা জানাইয়াছেন যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় হইবার পরেই 'বিরাট বিশ্ববাহু মেলি লয়'; এই বিরাট বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়াই অন্তরে 'মহা-অজানা'র 'নির্ভয় পরিচয়' লাভ করিতে হইবে। কিন্তু কবি এখানে 'অসীমের পথ' এবং 'বিরাট বিশ্বে'র কথা বলিলেও বেশ বোঝা যায়, তাঁহার দৃষ্টি পিপাসিত হইয়া উঠিয়াছে একটি 'ধ্রুব তারকা'র জ্যোতির জন্য—বিরাট বিশ্বের মধ্য দিয়া আপন লীলার লুকাচুরি খেলিতেছেন যে মহা-অজানা কবির অন্তরের সকল রসের ধারা যেন সেই দিকেই বাসনার বাহু বাড়াইয়া দিতেছে।

যে কথাটি এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ করিতে পারি তাহা হইল এই, এইজাতীয় গানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ আমিকে এক অসীম পূর্ণস্বরূপের সঙ্গে যোগ করিয়া অমৃতত্ব বা অমরত্ব লাভের প্রবণতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এখানকার 'এক'কে নিরন্তর আত্ম-সর্জনের ভিতর দিয়া প্রকাশমান এক করিয়া তেমনভাবে পাইতেছি না যতখানি পাইতেছি বিশ্বসৃষ্টির চরমবিধারক 'এক' রূপে। 'এক'কে অবলম্বন করিয়া 'সর্বং ইদং'কে জড়াইয়া ধরিবার ব্যাকুলতা এখানে প্রবল হইয়া ওঠে না, আমি এবং 'সর্বং ইদং' এখানে 'এক অসীমে'র মধ্যে পূর্ণস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছে সেইভাবে যেভাবে একটি নদীর ধারা গিয়া অমরত্ব লাভ করে বিরাট সমুদ্রের মধ্যে। এই 'একে'র মধ্যে অমরতা লাভের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনে' সঙ্কলিত একটি ভাষণের মধ্যে—

''মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই একেকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত

চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভ ক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; বিপদসম্পদ্ মুহূর্তে মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ,
এষোহস্য পরমো লোকঃ, এষোহস্য পরম আনন্দঃ।

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।” —(প্রাচীন ভারতের এক)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে কবিতায় এবং অনেকগুলি নাটকে আবার অমরতার কথা বলিয়াছেন অদ্বয়ের মধ্যেই একটি দ্বয়বোধকে অবলম্বন করিয়া, যেখানে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, তাঁহার ব্যক্তিজীবন একটি নিত্যকালের ‘আমি’রূপে স্মরণাতীত কাল হইতে—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

এই যে ধূলির সহিত আরম্ভ করিয়া চলিতে চলিতে একদিন মানুষের মধ্যে বিবর্তন ইহাত একদিনের কথা এক জীবনের কথা নয়—লক্ষ কোটি বৎসরের এই বিবর্তন মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠিবার; মানুষ হইয়া একবার ফুটিয়া উঠিয়াই যাত্রার শেষ হয় নাই—জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া মানুষ আমিও যে একটি চিরপ্রসার্যমাণ ব্যক্তিপুরুষে বর্ধিত হইতেছি। রবীন্দ্রনাথ এরূপ স্থলে বহুবার জীবন হইতে জীবনে চলিয়া যাইবার কথা বা জন্মজন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই জন্মান্তরবাদ ঠিক আমাদের প্রচলিত পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ নয়; এই জন্মান্তর হইল একটি বিবর্তনধারার ক্রমস্তর মাত্র। রবীন্দ্রনাথের এই যে অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়বোধের আদর্শ ইহা একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়—ইহার বিস্তারিত আলোচনায় এখানে প্রবেশ করিতে চাহি না; কিন্তু এই অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়কে অবলম্বন করিয়া কবির মধ্যে যে অমরতার ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই উল্লেখ করিতে চাহি। এই অমরতার পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যক্তিজীবনে একটা নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন-ধারায় বিশ্বাস, এই বিবর্তন-ধারার মধ্যে ত মৃত্যু বলিয়া কোনও কিছু থাকিতে পারে না; আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহাত কখনও এই বিবর্তন ধারায় কোনও ছেদ আনিতে পারে না, জীবন ও মৃত্যু উভয়ই যে এই ‘আমি’র অনন্ত বিবর্তন ধারায় আগাইয়া চলিবার পদক্ষেপ মাত্র। চলিতে গেলে পা ফেলিতেও হয়, পা তুলিতেও হয়, উভয় জুড়িয়া চলার কাজ; পা-ফেলা হইল জীবন, পা-তোলা হইল মৃত্যু। জীবনের ভিতর দিয়া প্রকাশের যে অধ্যায়টি আরম্ভ হইল মৃত্যুতে তাহার শেষ নয়, মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া নূতন অধ্যায়ে পৌঁছাইয়া দিল। মৃত্যুর ভিতর দিয়া ছাড়া নূতন অধ্যায় আসিবে কি করিয়া? নূতন নূতন অধ্যায় না আসিলে নিরন্তর হইয়া-ওঠা ‘আমি’র সকল হইয়া ওঠাই যে বন্ধ হইয়া যায়।

বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া বিশেষভাবে এই একটি ‘আমি’র যে নিত্য বিবর্তন ইহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন-মৃত্যুর একটি অচ্ছেদ্য পারস্পরিক সম্পর্কের কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে প্রথমাবধি দেখিতে পাই; জীবন-মৃত্যুর ভিতরকার অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বহু কবিতায় ও গানে রবীন্দ্রনাথ

উমা-মহেশ্বরের নিত্য-প্রেমসম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কোথাও কবি এই দুইকে নটরাজের নৃত্যের দুই পদক্ষেপ বলিয়াছেন, কোথাও তিনি ইহাকে নটরাজের নৃত্যের লাস্য ও তাণ্ডব এই দুই ভঙ্গি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীবনের সকল অতীত বর্তমান অনাগতকে জুড়িয়া একই 'আমি'র বিবর্তন বা প্রকাশ চলিতেছে বলিয়া একজীবনের কোনো অসমাপ্ত পূজাও যেমন কখনও 'হারা' হয় না,—আবার জীবনান্তরের দ্বারাও কোথাও কিছু 'হারা' হইবার সম্ভাবনা নাই; আমার জীবন যাঁহার হাতের বিশ্ববীণাতারের একটি বিশেষ ঝঙ্কারমাত্র সেই ঝঙ্কারের মধ্যেই আমার সমগ্র অর্থ নিহিত আছে—সেই ঝঙ্কারই নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া নিত্য অর্থবান্ হইয়া উঠিতেছে অনবচ্ছিন্ন বিবর্তনধারার ভিতর দিয়া। একজীবনে একরকমভাবে হইয়া উঠিবার পালা—মৃত্যুর মধ্য দিয়া আহ্বান আসিল আবার পুরাতন প্রথাকে ত্যাগ করিয়া নূতন করিয়া হইয়া উঠিবার পালার। 'প্রভাত-সংগীতে'র অস্পষ্ট কবিচেতনার মধ্যেই মরণের মধ্য দিয়া চিরজীবনের কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—

মরণ বাড়িবে যত কোথায়, কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কত না আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী,
যুগ-যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি। —(অনন্ত মরণ)

এই যৌবন-অনুভূতিই পরিণতি লাভ করিয়াছিল 'বলাকা'র 'শা-জাহান' কবিতায় প্রকাশিত দৃঢ় প্রত্যয়ে—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।

কালে কালে স্তরে স্তরে জীবনের এই অবিরাম ধারাকে প্রথম প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেও এক জীবন-দেবতা, এই ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিত্য আত্ম-বিকাশের অগ্রগতির পথেও আগাইয়া লইয়া যাইতেছে এক জীবন-দেবতা; জীবনে জীবনে বিচিত্র পরিবেশের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই জীবন-দেবতার সহিত পরিচয়; সকল নূতন পরিবেশের ভিতর দিয়া তাই খেলা করিতেছে একই পুরাতন 'আমি' আর সেই একই পুরাতন জীবন-দেবতা। এই জীবন-দেবতা ঠিক বিশ্বদেবতা নন; ইনি হইলেন বিশ্বদেবতারই ব্যক্তজীবন-কেন্দ্রে প্রতিফলিত একটি বিশেষ রূপ, বিশেষ জীবন-ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিশেষ জীবন-ধারা দ্বারা অবচ্ছিন্ন বিশেষ দেবতা। এই জীবন-দেবতা রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনও জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় নীরবে অঙ্গুলি তুলিয়া ইঙ্গিত দানকারিণী মধুরহাসিনী বিদেশিনী হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও কবিজীবনের অনন্তকৌতুকময়ী অন্তর্যামিনী-রূপেও দেখা দিয়াছেন কখনও 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর' মৃত্যুরজনীতে কৃষ্ণ অশ্বে আরূঢ়া

অবগুণ্ঠনবতী চিররহস্যময়ী নারী হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও তাঁহার কাব্যজীবনের 'মহারানী' হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও দেখা দিয়াছেন সমগ্র জীবন যাত্রায় অন্তরতমরূপে, আবার কখনও দেখা দিয়াছেন এক পরম অধ্যাত্ম দয়িত রূপে—যাঁহাকে কবি কোথাও ভগবান্ বা ঈশ্বর নাম দেন নাই বন্ধু বলিয়াছেন, নাথ বলিয়াছেন, সখা বলিয়াছেন, মিতা বলিয়াছেন, দোসর বলিয়াছেন, সুন্দর বলিয়াছেন, হৃদয়-রাজা বলিয়াছেন—আর বলিয়াছেন সকল আনন্দে সকল বেদনায় এক লীলাময় 'তুমি'। চিরন্তনের প্রবহমাণ এই 'আমি' ধারার উপরে নিত্য 'তুমি'র স্পর্শই জীবনকে অমৃতত্ব দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলির ভিতর দিয়া এই অমৃতত্ব বা অমরত্বই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে নির্ভয় দান করিয়াছে—সান্ত্বনা দান করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবিশ্বাসের অনুসরণ করিলে অমরত্বের এই বিশ্বাসই প্রধান হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়াছি, কবি ব্যক্তি-জীবনের এই ধারাকে সম্পূর্ণ একটি পৃথক্ ধারা না রাখিয়া ক্ষণে ক্ষণে ইহাকে বিশ্বমানবের জীবনধারার সহিত মিলাইয়া লইবার প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন। যেখানে তিনি তাঁহার বিশেষ 'আমি'-ধারার সঙ্গে একটি 'তুমি'কে যুক্ত করিয়া বিরলে এই 'আমি-তুমি'র নিত্যবিচিত্র রহস্য-লীলা আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন সেখানেই কবির মধ্যে 'একাকিত্বে'র ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই কবি বিশ্বজনের আড়ালে একা একা একটি 'তুমি'কে গান শুনাইতে চাহিয়াছেন; যেখানে এই বিশেষ আমিকে আবার সকল আমির সহিত যুক্ত করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন সেখানে আবার 'তুমি'কেও সকলের ভিতরকার অন্তর্যামী 'তুমি'কে মিশাইয়া যে এক 'তুমি' তাহার সহিত যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই এক 'আমি'কে সকল 'আমি'র সহিত যুক্ত করিয়া লইবার প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে নূতন করিয়া এক মানবতাবোধ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই মানবতাবোধকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অমরতাবোধের একটি নূতন রূপ লক্ষ করিতে পারি; সে রূপটি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে যেখানে তিনি তাঁহার 'The Religion of Man' গ্রন্থে বলিলেন, "his multi-personal humanity is immortal"—মানুষের মধ্যে বহুব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত যে মানবতা তাহাতেই হইল মানুষের অমরতা। এই মানবতার মধ্যে যে পূর্ণতার আদর্শ বিদ্যমান সেই মানবীয় পূর্ণতার আদর্শের মধ্যেই নিহিত মানবের অমরতা। এই কথা কবি বার বার করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার 'মানুষের ধর্ম' ভাষণে, ''মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম ক'রে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন''।

এই মানবতাবোধের জাগরণে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক একের বোধ নূতন বিস্তার এবং নূতন ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছে। আমরা কিছু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের পথে যে অমরতাবোধ তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে 'শান্তিনিকেতনে' সঙ্কলিত একটি ভাষণের ('প্রাচীন ভারতের এক') কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; সেখানে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের 'এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ' বাণীটি উদ্ধৃত করিযা কি করিয়া সৃষ্টি মধ্যে 'স্তব্ধ' একের মধ্যে অমৃতত্ব বা অমরতার সন্ধান লাভ করিতে হইবে তাঁহারই কথা বলিয়াছেন। কবি উপনিষদের এই বাণীটি তাঁহার 'মানুষের ধর্ম' ভাষণটির ভিতরেও উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন—

> ''এখানে উনি এবং এ, দুইয়ের কথা। বলেছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা কিছু যে তাঁতেই।"

এখানকার এই 'এ' কে? আর 'উনি'ই বা কে? 'এ' হইল ব্যক্তি-মানব, আর 'উনি' হইলেন মহামানব বা মানবব্রহ্ম—এবং "আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা বিষয়ীকৃত করি।"

এই মানবতাবোধ যেমন কবির মধ্যে জীবনের কোনও বিশেষ কালে বিশেষ প্রভাবে উদ্ভূত সত্য নয়—ইহা যেমন তাঁহার শৈশবের যুগ হইতেই তাঁহার মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং অস্পষ্ট চেতনার আবরণ মুক্ত হইয়া কর্মযোগে পরিণত বয়সে বলিষ্ঠরূপ ধারণ করিয়াছিল, মানবতাবোধের সঙ্গে যুক্ত অমরতাবোধের ক্রমবিকাশও ঠিক সেই একই সঙ্গে একইভাবে। 'প্রভাতসংগীতে'র 'অনন্ত জীবন' কবিতাতেই দেখিতে পাই, 'এ আমার গানগুলি দু-দণ্ডের গান, রবে না রবে না চিরদিন' এই বেদনা প্রথম যৌবনেই কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু আপনার মধ্যেই তিনি এ সংশয়ের উত্তর পাইয়াছিলেন—

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদী স্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ।

এই রকম প্রতিটি ব্যক্তি-হৃদয়ের গান মিলিয়া মিশিয়া মানুষের মহাসঙ্গীত রচিত হইয়া উঠিতেছে। প্রতিনিয়ত স্নেহ-ভালোবাসা লইয়া মানুষের ঘরে ঘরে আমরা কত ছবি দেখিতেছি; জীবনের দেখা সব ছবিই যে আমরা সব সময় মনে করিয়া রাখিতে পারি তাহা নয়—

কত কী যে দেখেছিনু হয়তো সে-সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি।
তা বলে নাহি কি তাহা মনে
ছবিগুলি মেশে নি জীবনে?

জীবনে যখন যেখানে মানুষের যত ছবি দেখিয়াছি, যত গান শুনিয়াছি তাহা সব আমার মনে-প্রাণে মিশিয়া গিয়া আমার জীবনকে মুহূর্তে মুহূর্তে গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং এই পদ্ধতিতেই মহামানবের মহাজীবন গড়িয়া ওঠে।

সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলে খেলা।

'প্রভাতসংগীতে'র এই 'অনন্ত জীবনে'র আদর্শ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের অনন্তপ্রবাহের ভিতর দিয়া যে অখণ্ডতার আদর্শ তাহারই সহিত যুক্ত; কিন্তু এখানেও এই ব্যক্তিজীবনের ধারাগুলি মিলিয়া মিলিয়া যে একটি মহামানবের সত্য গড়িয়া তুলিতেছে এবং

মহামানবের সেই গড়িয়া ওঠার মধ্যে ব্যক্তি-মানবের অমরতা লুক্কায়িত রহিয়াছে এ-কথার আভাস রহিয়াছে। 'প্রভাত সংগীতে' যাহা আছে আভাসে 'কড়ি ও কোমলে' তাহা কুঁড়ি হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
*　　　*　　　*
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।

মানবের সুখ-দুঃখের মধ্যেই অমর আলয় রচনা করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ দেখিতে পাইলাম এইখানে। যৌবনের এই আকাঙ্ক্ষার চমৎকার পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি 'পরিশেষে'র 'আমি' কবিতাটির ভিতরে। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'পরিশেষে'র কবিতা রচনার পূর্বে কবি 'The Religion of Man' এই ভাষণ দিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং শাশ্বত মানুষ বা মানব-ব্রহ্মের আদর্শ তখন তাঁহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; শুধু মননে নহে কর্মযোগে বিশ্বমানবের সহিত মিলনেও এ আদর্শ তাঁহার জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যে কথা দেখিতে পাই এই যুগের বিভিন্ন ভাষণে সেই কথাই দেখিতে পাই এই যুগের কবিতাতেও।—

জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেয়েছে জানিতে।
দিগন্তে বাদলবায়ু বেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারাম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে

নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।

অবশ্য পূর্বেই আমরা লক্ষ করিয়াছি, মহামানবের কথা বলিতে গিয়া কবি মহামানবের ধারাকে বিশ্বসৃষ্টির সমগ্রধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন নাই; মানবধারাকে বিশ্বধারার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু বিশ্বধারার বুকে অমৃতের বাণী যে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানবধারার ভিতর দিয়াই—এবং বিশ্ব-প্রকৃতির আর যাহা কিছু সব যে এই মানবধারার ভিতর দিয়া অমৃতের বাণী জাগাইয়া তুলিবারই সাধনা করিতেছে এ সত্য কবির মনকে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। পুনশ্চের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির শেষভাগে দেখিতে পাই—

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।

এই মাতা কে? মাতা বসুন্ধরা। সমস্ত সৃষ্টি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে কবে মাতা বসুন্ধরা তাঁহার তৃণশয্যায় মানবশিশু কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন, সেই মানবশিশুর মধ্যে ঘনীভূত হইয়া রূপ লাভ করিবে সৃষ্টির সকল অর্থ।—

দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তার শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে ঃ
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়;
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে ঃ জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তাঁহার 'শান্তিনিকতনে' 'সত্য হওয়া' নামক ভাষণটিতে—

"মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকা গৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ।"

'বীথিকা'র 'নব পরিচয়ে'র মধ্যে দেখি, নব নব জন্ম বহিয়া এক খেয়া-তরীতে করিয়া যে একটি 'আমি'র বার বার আনাগোনা এই আমির পরিচয় লইতে গিয়া কবি অনুভব করিতে পারিয়াছেন—

অনন্তের হোমানলে
যে-যজ্ঞের শিখা জ্বলে,
সে-শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি।

অনন্তের বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে আত্মাহুতির হোমানলের শিখা হইতে এই যে একটি জীবনের দীপ জ্বালাইয়া লওয়া গিয়াছে ইহার গতি কোন্ দিকে?

এ-সংসারে সব সীমা
ছাড়ায়ে গেছে যে-মহিমা
ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব
আছেন চির যে-মানব
নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।

এই চিরমানবের পথের পথিক হইয়া চিরমানবের চলার মধ্যেই হইল অমরত্বের আশ্বাস। 'বীথিকা'র মধ্যে এই দৃষ্টিতে কবি মরণকে 'মাতা' বলিয়া দেখিতে পাইয়াছেন—

চলে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু।
তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি
নূতন যুগ তোল যে গড়ি—
নূতন ভালো মন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি;
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী।
নিখিল ধারা সে স্রোত বাহি
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি
অচলরূপে রব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে-ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

নিজের জীবনে ফুল ফুটাইয়া যদি তাহা দ্বারা আগামী দিনের মানবের জীবনের কোনও ফুল ফুটাইতে সাহায্য করিতে পারি তবে তাহাই জীবনকে দিবে অমরত্বের সন্ধান। একদিন কবি নিজের জীবনের যত গান, কবিতা, অন্য যাহা কিছু তাঁহার সৃষ্টি সকলকেই আত্মানন্দের চরমমূল্যেই সার্থক বলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শেষের দিকে অন্য বোধটাই যেন কবির আত্মপুরুষকে সর্বাবস্থায় ধারণ করিয়া রাখিতেছিল; যাহা কিছু তাঁহার দান তাহা দ্বারা নিজের ভিতর দিয়া মহামানবকে যতখানি বিকশিত করিয়া যাইতে পারিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা ভাবিকালের মানুষকে তাহাদের নিজেদের মধ্যে মহামানবতাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে যতখানি সাহায্য করিতে পারিয়াছেন সেইখানে তাঁহার জীবনের সকল সার্থকতা, সেইখানেই তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া মহামানবের মধ্যে বাঁচিয়া রহিলেন।

মানুষের জীবনের একটা যে প্রাত্যহিক দিক আছে এই দিকটাতেই হইল মানুষের অনিত্য লীলা; এই প্রাত্যহিকতার অনিত্যলীলার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে চাহিতেছে মানুষের নিত্য; যেখানে ফুটিয়া ওঠে সেই নিত্যলীলার আভাস—সেইখানেই মানুষের মধ্যে আবির্ভাব দেবতার।

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়। —(বীথিকা, দেবতা)

এইরূপেই কোনও কোনও মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হন 'দেবসেনাপতি'; তিনি মৃত্যুপণে সর্ব অমঙ্গলের উপরে হানেন আঘাত—বিকীর্ণ করিয়া দেন দিব্যজ্যোতি; তাহারই প্রেরণায়—

ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হতে বক্ষে আসে;
অনায়াসে।
দাঁড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে
অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।
তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত-আলোতে;
তখন তাহার পরিচয়
মর্ত্যলোকে অমর্ত্যেরে করি তোলে অক্ষুণ্ণ অক্ষয়। —(বীথিকা, দেবতা)

মানবতার মধ্যে এইভাবে যখন দেবত্বের মহাবতরণ তখনই মর্ত্য অমর্ত্য হইয়া ওঠে; সেই দিকটাই হইল শাশ্বতের দিক। মহামানবতার অবতরণেই মানুষের অমরত্ব। এইবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই কবি 'আকাশ প্রদীপে'র 'ভূমিকা'য় বলিয়াছেন—

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয় দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা ব'লে মানি।

'জন্মদিনে'ও কবির মধ্যে দেখি সেই বিশ্বাস এবং আশ্বাস।—

খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম,
দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি
মূল্য যার মৃত্যুর অতীত। —(১৩ সং)

জীবনের অমৃতত্ত্বের সহিত কবির মানবতাবোধ কিভাবে মিশিয়া গিয়াছিল 'আরোগ্যে'র শেষের দুইটি কবিতার মধ্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। ৩২ সংখ্যক পদে কবি অনুভব করিতেছেন—

এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

কিন্তু এই 'পরম আমি'কে? তাহার উত্তর লাভ করা যায় ঠিক পরের কবিতাটিতেই—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিস্তারিত।

অমরতা রবীন্দ্রনাথের কাছে ন্যায়-যুক্তির পথে লব্ধ স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নহে, একটি বিশ্বাসমাত্র, কোনও জাতিগত সংস্কারের দ্বারা লব্ধ বিশ্বাস নহে— নিজের বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়া নানাভাবে গড়িয়া ওঠা একটা গভীর বোধ। গভীর বোধ মানুষের চিত্তে যখন একটা স্থিরতা লাভ করে—এবং বোধের সেই স্থিরতা যখন মানবচিত্তের মধ্যে জড়তাদ্রোহী প্রবল একটা প্রেরণা রূপে দেখা দেয় তখনই আমরা বলিয়া থাকি যে বোধ সেখানে বিশ্বাসের রূপ ধারণ করিয়াছে। অমরতা রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে এই জাতীয়ই একটি বিশ্বাস। এ-বিশ্বাসের মূল্য বাস্তবজীবনে ইহার সক্রিয়তায়। অমরতার কোন্ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে ইতিহাসের প্রতিক্রিয়ায় মুহ্যমান চেতনার মধ্যে নূতন তেজ ও তাপের সঞ্চার করিয়াছিল? নিস্তরঙ্গ নঙর্থক সন্মাত্রে পর্যবসিত কোনও পূর্ণস্বরূপের মধ্যে আত্ম-বিসর্জনের অমরতা নয়—মহামানবের ব্রহ্মকমলে বিকশিত পূর্ণস্বরূপের ভিতরে নিত্য-আত্ম-প্রবহণের অমরতা। এই নিত্যকালের মহামানবতার বোধই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একটি গভীর অধ্যাত্মবোধ রূপেই দেখা দিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার অধ্যাত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই তিনি গভীর উল্লাসে এই মহামানবের আগমনী-গান গাহিতে পারিয়াছিলেন—

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
* * * *
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই রবীন্দ্রনাথ অমর মানুষ সম্বন্ধে এমন করিয়া গাহিতে পারিয়াছিলেন—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক—
তোমাদের স্মরি।।

রবীন্দ্র-চিত্তে বিজ্ঞানের সক্রিয় পদক্ষেপ

ক্ষুদিরাম দাস

রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ ও মানুষের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে আমাদের মানসলোক সম্পূর্ণ অধিকার করেছেন আধুনিক বিশ্বে বাঙ্‌লার তথা ভারতের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তিনি যে নিতান্ত আত্মমগ্ন কবি ছিলেন না, স্বদেশ ও বাইরের পৃথিবীতে ছোটবড় যেসব ঘটনা মানুষের সমাজমূর্তি বদলে দিচ্ছে তার প্রতি যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি তাঁর দীর্ঘ আয়ুষ্কালে যেসব উল্লেখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে—যা জীবজগৎ, বস্তুপৃথিবী ও মহাকাশকে একসূত্রে গেঁথে তুলেছে—মহাবিস্ময়ে তা লক্ষ করেছেন, তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন অজস্র গানে, কবিতায় ও প্রবন্ধে। আমাদের মহাকবি স্বয়ং বিজ্ঞানী না হলেও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরা পুনঃপুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এবং গণিতের সূক্ষ্ম গণনায় প্রাণ ও প্রাণী, পৃথিবী ও মহাকাশ, গতি ও পরিবর্তনের যেসব রূপরেখা চিত্রিত করেছেন তাতে তিনি গভীর আস্থা রেখেছেন আর তারই অনুপ্রেরণায় হয়ে উঠেছেন নতুনতর কল্পনার পথিক। বিজ্ঞান-সখা কবির ঐসব নব নব কল্পনায় আমরা ক্রমাগতই অভিভূত হয়েছি। বিজ্ঞানের সত্যকে সাহিত্যিক সত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে পাঠক সাধারণের মানসিক আনন্দের পরিধি এমনভাবে প্রসারিত করে তোলা যায় এ রবীন্দ্রনাথই বিশেষভাবে প্রমাণ করলেন। এই অবকাশে সশ্রদ্ধ (কবি-স্মরণের) অর্ঘ্যরূপে তাঁর এই বিশিষ্ট অবদানের বিষয়টিই আমরা তুলে ধরতে চাই।

কবির বয়স যখন দশ, গৃহশিক্ষক কৌতূহলী বালককে হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে জল গরম করলে তা উপরে ওঠে, আর ঠাণ্ডা জল নিচে নেমে যায় এবং তার ফলেই সশব্দ আলোড়ন ঘটে। আরও সেইসঙ্গে অনেক প্রাথমিক প্রকৃতি-কথা। কিন্তু জল ও মাটির স্পর্শে শুকনো বীজ থেকে কেন ও কিভাবে অঙ্কুর গজায় তার কৌতূহল বালকচিত্তে বহুদিনই ছিল। এ তাঁর অজানার প্রতি চিরবিস্ময়ের একটি অংশ যার আভাস লেগেছে যৌবনে লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতায়—

> ...সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
> সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
> তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
> উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর,

ক্রমশঃ বিজ্ঞানের দীক্ষায় কবির এ বিস্ময় কতকটা নিবৃত্ত হয়েছে বটে, কিন্তু আরও গভীরতর, আরও অজানা রহস্য তাঁর চিত্ত অধিকার করেছে এবং বিজ্ঞানের সহায়তায় তা মোচন করতে করতে চলেছেন শেষ দিন পর্যন্ত।

গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য ও রাশিচক্র নিয়ে যে জ্যোতির্বিজ্ঞান তার সঙ্গে কবির প্রাথমিক পরিচয় ঘটে পিতৃদত্ত শিক্ষণে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। ... তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিষয় জানিয়ে যেতেন।"

বিজ্ঞানের যে শাখা-কবিকে সব থেকে বেশি অভিভূত ও অনুসন্ধানী করে তুলেছিল তা হল এই জ্যোতির্বিজ্ঞান, আজকে যার সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক আখ্যা হল নভোবস্তু-বিজ্ঞান অর্থাৎ এ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স। একই সূত্রে পরে পরে কবিকে বিচলিত করেছে পৃথিবীর রহস্য অর্থাৎ ভূবিজ্ঞান এবং চৈতন্যময় প্রাণরহস্য বা প্রাণবিজ্ঞান।

গ্যাস-ধূলি-সমাকীর্ণ ছোটবড়-নক্ষত্রখচিত ছায়াপথ থেকে অগ্নিবাষ্পময় সূর্যের এবং সূর্যদেহ থেকে একই ধরনের পৃথিবীর উৎপত্তি প্রায় পাঁচশ কোটি বছর আগে ঘটেছে। ক্রমে ছিট্‌কে-পড়া পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে থাকল, দেহ হল জমাট দগ্ধ প্রস্তরতুল্য, আরও কোটি কোটি বছর পরে ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর গ্যাসীয় আবরণে সংহত হতে থাকল—নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড। মূল হাইড্রোজেন স্পর্শে হল বারিবর্ষণ, এল জল। এবার চলল জলে স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তখনও স্থলে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেনি। ঘটল অনেক অনেক পরে। আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। প্রথমে সামুদ্রিক গুল্ম, পরে স্থলজ ঘাস ঝোপ। তার পরের অধ্যায়ে এল প্রাণের বিস্ময়। শৈবালজাতীয় তরলকোষী জীব, শামুক, বিষাক্ত কীট, অমেরুদণ্ডী, তারপর মেরুদণ্ডী। এর মধ্যেকার পৃথিবী ভয়ংকরী। অগ্ন্যুৎপাতে জলোচ্ছ্বাসে, বিষাক্ত কীট, সরীসৃপ ও বিপুলদেহী উভচর প্রাণীর আস্ফালনে পৃথিবীর অরণ্য-মরুভূমি সমুদ্র-তুষার তখন বিক্ষুব্ধ। এইভাবে কাটল আরও বহু কোটি বছর। জল-স্থল-অরণ্য-পর্বতবেষ্টিত ধরিত্রী ক্রমে শান্ত হয়ে এল। পরিশেষে এল আদি মানুষ ও বর্তমান মানুষ অনুকূল পরিস্থিতিতে। সে প্রায় দশ লক্ষ বছরের কথা।

কবি বিজ্ঞান-কাহিনী থেকে এই অভিব্যক্তির স্তরগুলি মনে গেঁথে রেখে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন নানান্ স্থানে—যখনই পৃথিবীর বিষয় তাঁকে বলতে হয়েছে। বত্রিশ বছর বয়সে লেখা একটি কবিতায় পুরাতনী এই ধরিত্রীর বিষাদমূর্তি কল্পনা ক'রে কবি লিখলেন—

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগ-যুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তার পরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু নাহি তার শেষ! —(সন্ধ্যায়)

ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে জলে-স্থলে রেষারেষির ও মুহুর্মুহু ভূমিকম্পের বর্ণনার সঙ্গে একটি

কবিতাতেও সমুদ্র-বর্ণনায় কবি জানাচ্ছেন—হে আদি-জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার। কল্পনায় কবি চলে গেছেন সেই আদিম অবস্থায় যখন বিশাল জলরাশি সমুচ্ছ্বসিত হচ্ছে পাষাণময়ী পৃথিবীর উপর, আর তারই জঠরে সম্ভাব্য জীব-কণিকার রূপে তিনি নিজে রয়েছেন সুপ্ত হয়ে। তাই সমুদ্র-দর্শনে তাঁর সেই আদিম আত্মীয়তার কথাই মনে পড়েছে। ভূবিজ্ঞান স্পর্শ ক'রে কবির এই আশ্চর্য কল্পনা ধরা দিয়েছে এইভাবে—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে,
যখন বিলীনভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে
অজাত-ভুবন-ভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।

আদিম দিনের ভূকম্পের পরিচয় দিলেন পাললিক ও আগ্নেয় শিলাময় হিমালয়ের উদ্ভবের একটি ছবি কল্পনায় দেখে—

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপ-বেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে

—ইত্যাদি। পৃথিবীর সৃষ্টি ও বিকাশের বিজ্ঞান-চিন্তিত ধারার স্বীকরণেই অবশেষে শোনালেন নিজ অভিব্যক্তির অপূর্ব পরিচয়—

গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পর্বতে।

অভিব্যক্তির ইতিবৃত্ত মনে রেখে পৃথিবীর আদিম রূপ আরও স্পষ্টাক্ষরে চিহ্নিত করলেন শেষ জীবনে লেখা 'পৃথিবী-প্রণাম' কবিতায়—

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়;
সে পুরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।
দেবতা এলেন পরযুগে—
মন্ত্র পড়লেন দানবদলনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হ'ল অভিভূত;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানপ্রীতির উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুসম্পর্ক স্থাপন। জগদীশচন্দ্র সেই সবে লন্ডন থেকে ফিরেছেন তাঁর—বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গের

সাহায্যে বিনা-তারে বার্তা পাঠানো'র গবেষণা সমাপ্ত ক'রে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহে গিয়ে দেখতে না পেয়ে টেবিলে ম্যাগনোলিয়া-গুচ্ছ ও কয়েক ছত্র লেখা রেখে ফিরে আসেন। এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাঁইত্রিশ, জগদীশচন্দ্রের চল্লিশ। জগদীশচন্দ্র দ্রুত লন্ডনে ফিরে যান। লক্ষ্য—বাহির থেকে দেওয়া কোনো উত্তেজনায়, কেবল বৃক্ষলতাই নয়, জড়বস্তুও সমানভাবে সাড়া দেয় এটি প্রমাণ করা। আচার্যের এই আশ্চর্য আবিষ্কার ইংল্যান্ড ও প্যারিসকে ১৯০০ খ্রীঃ অভিভূত করে এবং পত্র-পত্রিকায় এর সংবাদ প্রচারিত হয়। এখানে এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অপরিসীম আনন্দ ও গর্ব অনুভব ক'রে চিঠিতে অভিনন্দন পাঠান—

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান।

এখানে 'দেবতা' অর্থে স্বদেশ। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মর্ম বাঙলায় বোঝাবার জন্য লেখেন 'জড় কি সজীব?' নিবন্ধ; যার উত্তরে আচার্য কবিকে লেখেন—"তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার ইহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।" একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা' ও 'কল্পনা' কাব্য দুটি জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করে অভিনন্দিত করেন এবং

"ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ"

ইত্যাদি দীর্ঘ একটি কবিতায় জগদীশচন্দ্রের গৌরব ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ 'বৃক্ষলতা ও মানুষের সঙ্গে জড় পদার্থেও একই চৈতন্যের লীলা'—এ রবীন্দ্রনাথেরও কল্পনায় অনুভূত সত্য। বিজ্ঞানে তারই প্রমাণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন—

এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধূলায়-প্রান্তরে
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক-'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সংগীতে।

আচার্যের সত্তর বৎসর পূর্তিতেও বিমুগ্ধ কবি বৈজ্ঞানিকের ঐ বিশেষ কীর্তির বিষয়ই সাগ্রহে ঘোষণা করেছিলেন—

...হে তপস্বী তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে, অরণ্যের অন্তর-বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জনম মরনের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।

সুতরাং এমনই সম্ভব যে জগদীশচন্দ্রের এই বৈজ্ঞানিক কীর্তিই কবির বিজ্ঞান বিষয়ে পরবর্তী ঔৎসুক্য বাড়িয়ে তোলে।

লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।

পরমাণু-বিজ্ঞান ও তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত সৌর-নক্ষত্র-নীহারিকা বিজ্ঞান অর্থাৎ নভোবস্তু বিজ্ঞানে কবির আগ্রহ ছিল গভীর।

আচার্য জগদীশচন্দ্র যে সময় লন্ডনে বৃক্ষলতা ও জড়ের সাড়ার সমতা নিয়ে গবেষণায় প্রায় সিদ্ধিলাভ করে এসেছেন, ঠিক সেই সময়েই প্যারিসে মাদাম কুরী বিশ-শতকীয় পরমাণু-বিজ্ঞানের সূচনা করলেন 'রশ্মি-কণিকা-নিঃসারী' রেডিয়াম আবিষ্কার ক'রে। এই মৌল আবিষ্কার ক্রমশঃ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্বধারণার পরিবর্তন সূচিত ক'রে ও পরমাণু-তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে—আলোক, বৈদ্যুতি-কণা, মহাকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ ও প্রাণীর সূক্ষ্মতম প্রকৃতি বিষয়ে যথাযথ ধারণায় পণ্ডিতদের অনুপ্রেরিত করেছে। এমন কি মহামনীষী আইনস্টাইনের বৈপ্লবিক গণিত-নির্ভর আবিষ্কারগুলিও সহজসাধ্য করেছে। বিজ্ঞান-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর কৌতূহল পরমাণুর ক্ষেত্রেও যে সমানভাবে জাগ্রত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'নৈবেদ্য' থেকে আরম্ভ করে 'উৎসর্গ', 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতালির' বহু কবিতায় ও গানে। নৈবেদ্যে রয়েছে—

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণু-পরমাণুদের নৃত্য কলরোল।

মহাকাশ-গবেষণায় পরমাণু-বিজ্ঞানের অবদান ও কবিচিত্তে প্রতিক্রিয়া

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্র-পথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে।

১৯০০ খ্রীঃ পরমাণু-সত্য নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে পর সূর্য-নক্ষত্রের গ্যাসীয় পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র পাওয়া গেল। এর পূর্বে বর্ণলিপির সাহায্যে বিভিন্ন গ্যাসের অস্তিত্ব বোঝা গেলেও কতকগুলি বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। পরমাণুর বিকিরণ এবং শোষণের চরিত্র, তাদের বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ ধর্ম আবিষ্কৃত হলে পর নভোবিজ্ঞান যুক্তিসংগত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হল, নীহারিকা থেকে নক্ষত্রের উদ্ভব, কার্বন-চক্রে তাদের আভ্যন্তর পরিবর্তন, সংকোচন ও বিস্ফোরণ, জন্ম ও মৃত্যু নির্ণীত হতে লাগল। সুদূর রহস্যের প্রিয় কবি এখন থেকে মহাকাশ-রহস্যে নিমগ্ন হলেন। অনুভব করলেন—

প্রথম আদি তব শক্তি
—আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।

আবার, সৌররশ্মি-কণিকার পার্থিব প্রতিক্রিয়ায় বিস্মিত বিমুগ্ধ হলেন এবং অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করতে লাগলেন সৃষ্টির জন্মমৃত্যু-লীলা। কবির ঐ বিশ-শতকীয় নভোবিজ্ঞান-সচেতনতা প্রথম ধরা পড়ল উৎসর্গের একটি কবিতায়—

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে—
জগৎ ঘূর্ণি জেগেছে।
ঝলকি উঠেছে রবি শশাঙ্ক,
ঝলকি উঠেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা।

নীহারিকায় গ্যাসধূলি চঞ্চলতাধর্মে একত্র সংহত হচ্ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে, আকর্ষণে বিকর্ষণে চক্রগতি লাভ ক'রে ঘনীভূত বাষ্পতেজসহ সূর্য-তারকার রূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে—এসব নভোবিজ্ঞানীদের কথা। কবিপক্ষে তা জানার ফলে বিস্ময় গাঢ়তর হয়, তাই গেয়ে ওঠেন—

আকাশ-ভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।

মহাকাশ থেকে নীহারিকা-নক্ষত্র-সূর্যের থেকে এ বিশ্ব পৃথক নয়, এমন নিঃসংশয় উপলব্ধির মূলে রয়েছে নভোবস্তু-বিজ্ঞানীদের প্রমাণিত পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যনক্ষত্রের বস্তুগত উপাদানের যোগ এবং রশ্মির বিকিরণ ও গ্রহণের সম্বন্ধ।

জ্যোতি-পরমাণুর জটিলতার রূপান্তরে পৃথিবী, তার সৌন্দর্য আর মানুষের দেহপ্রাণ। অপূর্ব তবু শাশ্বত নয়। মহাকাশ-বক্ষ-সংলগ্ন সূর্যের স্থিতিও চিরকালের নয়। নক্ষত্রদের সহোদর সে। আয়ুশেষে হয় একদিন সেও বিস্ফুরিত হয়ে গ্যাসরশ্মি পদার্থকণা উল্কা ধূমকেতু বিক্ষিপ্ত করতে করতে সপরিবারে নিঃশেষ হয়ে পড়বে, ঘনীভূত সংকুচিত হতে হতে মহাকর্ষে গ্রহ উপগ্রহ টেনে নিয়ে ছাই করে দিয়ে মৃত জড়বস্তুরূপে শূন্য আকাশে তার যৌবনস্মৃতি-চারণা করতে থাকবে। নূতন সৃষ্টির জন্য এই মৃত্যু-লীলাই যখন অনিবার্য সত্য তখন চিরপথিক কবি কোনো ভয়ই রাখতে চান না, ধ্বংসের সঙ্গী হওয়াতেই তাঁর আনন্দ।

যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি-মেঘসাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব, যেথা শংকরের টলমল চরণ-পাতনে
জাহ্নবী তরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল

আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে
কন্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।

পৃথিবী-পতি সূর্যের ও নক্ষত্রদের এই অনিবার্য মরণযাত্রায় যোগ দিতে কবি দীন উদাসীন আমাদেরও আহ্বান জানাতে ভোলেননি—

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে।
(এই) খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই
আনন্দে রে।।...
পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগন-মাঝে
মরণ-বীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে।।

নটরাজ-লীলা

বিশ-শতকীয় আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখার ভিত্তি হল ঐ পরমাণু-তত্ত্ব। পরমাণু অর্থে প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন পজিট্রন প্রভৃতি। জটিল ও অদ্ভুত এদের চরিত্র। ইলেকট্রন ঘোরে প্রোটন-নিউট্রনের চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে অনেকটা গ্রহদের সূর্য-পরিক্রমার মত। অথচ কক্ষ-পরিবর্তন এমন কি বন্ধন ত্যাগও করতে পারে। বৈদ্যুতি মুক্ত ক'রে কখনও স্থির প্রোটনের কাছাকাছি আসে, কখনও উচ্চতর শক্তি নিয়ে লাফ দেয় উপরের কক্ষে। এমনকি বাইরেও এরই জন্য বর্ণলিপিতে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল রেখা ও কৃষ্ণ রেখা। কোয়ান্টাম্ পদার্থবিদ্যা এই শক্তির পরিমাপ করেছে, কিন্তু বৈদ্যুতিনীর কেন এই বিক্ষোভ তা ধরা যায়নি। এই খেয়ালী চরিত্রধর্ম নিয়ে পদার্থে, রশ্মিতে, তরুলতায়, বর্ণসৌন্দর্যে, এমন কি জীবদেহে মনে-প্রাণেও এগুলিরই সূক্ষ্মতম বিক্রিয়া। মহাকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত এই যে একের সূক্ষ্মতম বোধাতীত লীলা চলছে, জীবন এবং মৃত্যু, সৃষ্টি এবং ধ্বংস যে-অধরা শক্তির খেয়ালী রূপান্তরে ঘটে চলছে, ভাবুক কবি কল্পনায় সেই নিয়মের শক্তিকে আঁকলেন নৃত্য-পরায়ণ 'শংকর' বা 'নটরাজ' ব'লে। সমাজ-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাকে নাম দিলেন 'মহাকাল'। কবির ভাষায়—''নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে।" মহাকাশ ও পৃথিবীর জীবনমৃত্যুর অদৃশ্য সঙ্গী এই মহাবৈজ্ঞানিক সত্তার সৌন্দর্যের লীলা-পরিচয় বোঝাতে গিয়ে কবি বলছেন—

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।...
নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু।
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।

এ কবিত্বের মূল্য কোটি স্বর্ণমুদ্রার উপরে। পরমাণুরা কিভাবে বিদ্রোহী হচ্ছে আর তার ফলে কিভাবেই বা উদ্ভব হচ্ছে জ্যোতিঃপুঞ্জের, তার মূল তত্ত্ব কবিই জানাচ্ছেন তাঁর গদ্য লেখায়—

> "ইলেকট্রন বাইরের থেকে ভিতরের পথে দর্শন দেয়। কেন দেয় এবং হঠাৎ কখন দেখা দেবে তার কোনো বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। তেজ শোষণ করে ইলেকট্রন ভিতরের পথ থেকে বাইরের পথে লাফিয়ে যায়। এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর। ইলেকট্রন তেজ বিকীর্ণ করে, কেবল যখন সে তার বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে আবির্ভূত হয়। ছাড়া-পাওয়া এই তেজকেই আমরা পাই আলো রূপে।" —(বিশ্বপরিচয়)

মহাকাশের জ্যোতি-পদার্থের এই পরিস্থিতিতে সৃষ্টি-ধ্বংস পৃথক্ কোনো ব্যাপার নয়। ধ্বংস-মৃত্যুতে সীমিত সংকীর্ণ আমরাই শুধু বিচলিত হই। নটরাজ যেমন সন্ন্যাসী, তেমনই আবার সুন্দর, শিব-শান্ত, ভয়ংকর একাধারে। সত্তরের পথে অগ্রসর কবি এই বিপরীতের লীলায় মগ্ন হয়ে নিজেকে নীহারিকা-নক্ষত্র থেকে সূর্যের মধ্যস্থতায় পৃথিবীতে আকস্মিকভাবে বিক্ষিপ্ত কণিকারূপে অনুভব করছেন ও মহা উৎসাহে জীবন-মৃত্যুকে সমভাবে বরণ করেছেন—

মোর সংসারে তাণ্ডব তব
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,...
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।

কবি-অনুভবের মধ্যে সংগ্রামী মানুষ, বিপ্লবী মানুষের সপক্ষে যে উৎসাহ-বাণীর সান্নিধ্য আমরা বারংবার অনুভব করি, তার সঙ্গে বস্তুসত্যধারী বিজ্ঞানের বিষয়ে কবির ধারণাকেও মিলিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু তবু একথা বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক মহাকাশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখার উচ্ছ্বাসে কবি বৈরাগ্যব্রত সাময়িকভাবেই স্বীকার করেছেন। পরমুহূর্তেই ঝুঁকেছেন সৌন্দর্য ও রূপের দিকে, যা তিনি কবিস্বভাব অনুসারেই ছাড়তে পারেননি কখনও। সুতরাং মহাকাশ প্রসঙ্গে কবির এই ছবিতে রূপের অভিলাষ এবং বিস্ময়কর মানব-মহিমার কথাও ব্যক্ত হয়েছে—

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকার পথে
আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে...
অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল;
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

কবি-জীবনে সৌরপ্রেরণা

আশৈশব কবি আলোকপ্রিয় এবং সূর্যের অনুচর। শুনেছিলেন, বেদ-উপনিষদে বলা হয়েছে সূর্য থেকেই জীবের প্রাণ মন বুদ্ধির বিকাশ। সূর্যে রয়েছেন ভর্গদেব, নারীরূপে যিনি সরস্বতী। আধুনিক

বিজ্ঞান দেখেছে মাঝারি নক্ষত্র এই সূর্যে দু'কোটি সেন্টিগ্রেড তাপে হাইড্রোজেন কণিকারা জ্বলছে ভাঙছে, জোড়া হয়ে হিলিয়মে রূপান্তরিত হতে গিয়ে প্রচুর অগ্নিতেজের উচ্ছ্বাস ঘটাচ্ছে। সূর্য কার্বন-চক্রে অগ্রসর হচ্ছে। কবি সেই বৈদিক কল্পনার সঙ্গে বিজ্ঞান-কথিত সত্য মিলিয়ে নিয়ে সৌর পরিস্থিতি এবং সূর্য-প্রেরণার আধুনিক পরিচয় সন্নিবেশ ক'রে লিখলেন বিজ্ঞান-উদ্বোধিত একটি অপূর্ব কবিতা—'সাবিত্রী'।

মেঘে-ঢাকা ম্লান দিনে কবি তাঁর জ্যোতির্ময় বন্ধুর সাক্ষাৎ চাইছেন—'হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি দেখা দিক ফুটি'। এরই পরে বর্ণনায় যা বললেন তা বেদ-পুরাণের অনুগামী নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের সূর্যদর্শন। বললেন, সূর্যের কেন্দ্রে আমাদের চৈতন্যের উদ্বোধয়িত্রী যে সরস্বতী রয়েছেন, তাঁর বুকে বাজছে বহ্নিবীণা, আর তার কেশদাম হয়েছে প্রদীপ্ত, উচ্ছ্বসিত।—

"বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে-পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি, তারে জানি।"

অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ সূর্যের বিবরণ পেয়েছি। তিনি আরও জানেন যে তাঁর এই প্রাণ সৌর কণিকারই দান।—

"এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী।"

কিন্তু কেবল প্রাণই নয়, মন, বুদ্ধি, কবিস্বপ্ন সবই তো সেখান থেকেই—ঐ প্রজ্জ্বলিত গ্যাসীয় রশ্মি-কণিকা থেকেই পাওয়া!—

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমারে দিয়েছ যে ভ'রে
কেই বা সে জানে?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান থেকেও কবি আরও খানিকটা এগিয়ে গেছেন। প্রাণবিজ্ঞান অর্থাৎ বায়ো-ফিজিকস্ ও বায়ো-কেমিস্ট্রি এখনও এতদূর পৌঁছায় নি। ভবিষ্যতে পারবে হয়তো বা।

আপেক্ষিক তত্ত্বে নটরাজ-স্মৃতি

আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত দুটি গণনায় পৃথিবী-সূর্য-মহাকাশ বিষয়ে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিক ধারণা বদলে দিয়েছেন। এর প্রথমটির নাম বিশিষ্ট আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব (১৯০৫ খ্রীঃ)। আপাতভাবে স্থির পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যা চূড়ান্ত সত্য ব'লে মনে করা হয়, গতিশীল মহাবিশ্বের পক্ষে তা নয়। আমাদের সীমিত পার্থিব বিচারে দেশ ও কাল পৃথক্ বস্তু। আপেক্ষিকতাবাদে দেশ ও কাল নয়, মিলিত দেশ-কাল। কাল দেশেরই অংশ। দৈর্ঘ্য-বিস্তার-ঘনত্বের সঙ্গে যুক্ত চতুর্থ মাপকাঠি। মহাকাশের কালের বিচার করতে গেলে এখানকার কালের ধারণা ত্যাগ করতেই হবে। একই সঙ্গে তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্রতম কণিকাও পর্বতপ্রমাণ শক্তির জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ শক্তি হল—পদার্থের ভরকে আলোর গতি-পরিমাণের বর্গ দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়ায় সেই বিপুলতা। এই বিশেষ আপেক্ষিক-তত্ত্বের আরও দশ বছর পরে আইনস্টাইন উপস্থাপিত করলেন সাধারণ আপেক্ষিকতা। এতে তিনি প্রমাণ করলেন যে নিউটনের মহাকর্ষ-টানের অঙ্কটা

ঠিকই আছে, কিন্তু এই মহাকর্ষ ঘটছে দুই পদার্থের অন্তর্নিহিত আকর্ষণে নয়, শূন্যে চলমান মহাবস্তুর কাছের স্পেস অর্থাৎ দেশটা বাঁকা অবস্থায় থাকে ব'লে। নিউটনীয় মহাকর্ষকে তিনি দেশ ও কালের জ্যামিতির সঙ্গে অন্বিত করে দেখালেন। আইনস্টাইনের গণনার সত্যতা দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা বারংবার পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়, ফলে আমাদের কল্পনাশীল মহাকবিও এর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেননি।

১৯৩৫ খ্রীঃ লেখা 'শেষ সপ্তক' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় কবির মহাবিশ্ব-দর্শনের মধ্যে আইনস্টাইনের দেশ-কাল-সমীকরণ তত্ত্বের ছোঁয়া লেগেছে দেখা যায়। যেমন একুশ সংখ্যার কবিতা। প্রারম্ভেই কবি 'কাল'কে দেশের সঙ্গে এক ধরে নিয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন—

সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হ'ল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।

কালকে মাপতে এখানে বেষ্টনীর বিষয় ব্যবহার করতে হয়েছে। আবার,

সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে।

এখানে ক্ষেত্রের আয়তন বোঝাতে 'বৎসরের মাপ' ব্যবহার করা হয়েছে। কালকে আয়তনের সঙ্গে এক করা হয়েছে।

এই ভূমিকা ক'রে কবি নভোবস্তু-বিজ্ঞানের অনুযায়ী নীহারিকা-নক্ষত্রের জীবন ও মৃত্যুর কথা বললেন। জ্যোতিষ্কদের পতঙ্গের রূপক দিলেন, কারণ তাদের সদাচঞ্চল ভ্রাম্যমাণ অবস্থা আর সেই সঙ্গে ক্ষণজীবীত্ব 'পতঙ্গ' বিশেষণেই ভালো বোঝানো যায়। কবিতাটিতে পৃথিবী ও মানুষের নগণ্য ক্ষুদ্রতা ও সীমিত দেশ-কাল পরিস্থিতির বিষয় জানিয়ে এখানকার যুগ-পরিবর্তন ও ইতিহাসের দীর্ঘ উত্থান-পতনকে মহাকাশ-পরিস্থিতির কাছে নিতান্ত ক্ষণিক দেখিয়ে নির্বিকার মহাকালকে নমস্কার জানিয়েছেন কবি।

মহাকর্ষ বিষয়ে আইনস্টাইনের অভিমত কবি নিজে এইভাবে জানিয়েছেন তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' পুস্তকে—

> ''পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতিক টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের; যেমন মানুষের ঘরের টানটা অত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের।
>
> ...মহাকর্ষের ক্রিয়া একটুও সময় নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে ...বৈদ্যুতিক শক্তিরাও ঢেউ খেলিয়ে আসে আকাশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও মহাকর্ষের বেলায় সেরকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে আলো আর উত্তাপ পথের বাধা মানে, কিন্তু মহাকর্ষ তা মানে না...

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে অছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে-আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়।''

প্রাণবিজ্ঞান-রহস্য—প্রাণশক্তি

আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণিত সর্বব্যাপী প্রাণতত্ত্বে বিশ্বাসী কবি একদা সবিস্ময়ে অনুভব করেছিলেন (নৈবেদ্য, ১৯০১)—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।

এই প্রাণশক্তির ধারা পৃথিবীর আদি যুগের বৃক্ষ-পর্যায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক মানুষ, বিশেষে মেহনতী মানুষ পর্যন্ত কিভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার বিচিত্র অনুভব কবিকে গদ্য পদ্য বহু রচনায় প্রবর্তিত করেছে। দেহমধ্যে প্রাণের বিচিত্র লীলায় বিমুগ্ধ কবি গেয়ে উঠেছেন—

তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।।...
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে
যুগ-যুগান্তরের স্তন্য।।

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ রুক্ষ মাটিতে বর্ষণের ছোঁয়ায় যে অপূর্ব শ্যামলিমা জাগল তার ছবি কবিকে উদ্বোধিত করেছে মরু-বিজয়ের মহিমায় প্রাণের দানে। কবি গেয়েছেন—

মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে।...
ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়েরসেনা
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষ্যেও—

মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে, হে প্রবল প্রাণ।

শান্তিনিকেতনের শালবীথি আম্রবনের সঙ্গে রবীন্দ্রের নাড়ীর টান কবিচরিত্র সম্পর্কে একটি ইতিবৃত্ত। যৌবনের একটি লেখায় কবি জানিয়েছিলেন—দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। সে হল কালিদাসের কাব্যপাঠে উদ্দীপিত প্রকৃতিপ্রীতির মুহূর্ত। তারপর যা ছিল ভাবনায়, তার সত্যতা যখন পেলেন বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তখন কবির নিসর্গপ্রীতি ও সেই সঙ্গে প্রাণের বিজয়-গৌরব-ঘোষণার আর শেষ রইল না। বৃক্ষলতাফুল কবির কাছে এখন কেবল সৌন্দর্যে আকর্ষণীয় হল না, তার মধ্যে পেলেন সংগ্রাম ও বিজয়ের বার্তা, সহোদর প্রাণীর জন্য আত্ম-উৎসর্গের ইতিহাস—

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ,
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ 'পরে।

আবার বসন্তের প্রগল্‌ভ পুষ্পোচ্ছ্বাসে স্পষ্ট অনুভব করলেন পুরাতনকে ভেঙে ফেলার বিদ্রোহী প্রবণতা—

বাঁধন ছেড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মত ভেঙে চুরে দেয়
চিরভ্যাসের মেলা।

প্রাণের এই যে তেজস্বী মূর্তি, এই যে বাধাবন্ধ ছিন্ন করার অদম্য উৎসাহ এর মূলে কি সৌররশ্মির ও আদি জ্যোতির স্পর্শ ও প্রেরণা নেই। কবি বিচার করে বলছেন—অবশ্যই আছে। বৃক্ষ-প্রাণী-নির্বিশেষে জীবকোষের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূত্রে এর লীলা।

জীবের প্রাণে মনে আদি জ্যোতির প্রেরণা

"বিশেষ একটা যুগে প্রাণমন এল পৃথিবীতে অতি ক্ষুদ্র জীবকোষকে বহন করে। পৃথিবীর সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত কোনো ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্য ও মনে। ... জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলছে।" —(বিশ্বপরিচয়)

কবির এই বৈজ্ঞানিক অনুভব নিয়ে আগেই লেখা হয় 'পূরবী' কাব্যের 'আহ্বান' কবিতা, যার এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলি হল—

কোন্‌ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্ণিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

এবং 'সাবিত্রী'—

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী,
আয়ুস্রোতোমুখে

হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমারে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে?

প্রাণ থেকে আরও গভীরে

প্রাণবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বংশানুক্রম ধারায় এবং মনস্তত্ত্বেও ডুব দিয়েছিলেন কবি, সৃষ্টির বিস্ময়কে সামগ্রিকভাবে অধিগত করার তাগিদে। 'শেষ সপ্তকে'র কয়েক জায়গায় ধরা পড়ছে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কৌতূহল ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের অনুসরণে। মন ব'লে আমরা যাকে জানি তা বোধ-মহাসমুদ্রের ডাঙার উপর ভেসে-থাকা একটা নগণ্য অংশ মাত্র। এর পিছনের অদৃশ্যলোকে রয়েছে 'অবচেতন'-এর বিপুল বিস্তার—

ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক অনতিক্রমণীয়।

এই গুহাহিত মনোলোকের প্রভাব জীবনের গভীরে। ইচ্ছায় ও কর্মের গোপনে অবদমিত বাসনা, অচরিতার্থ সাধনার জটিল কার্যক্রম।

চারদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে;
হাওয়ায় লাগে শীতবসন্তের ছোওয়া।

যে-শক্তি যে-সাধনা প্রকাশের রূপ পেলে না, যে-সব অবদমিত কালিমাময় বাসনা অস্পষ্ট অবস্থাতেই রয়ে গেল একমাত্র মৃত্যুর মধ্যেই সে-সবের সমাপ্তি অনুভব করেছেন কবি বৈজ্ঞানিক ধারণারই অনুসরণে—

বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি
মূল্য পায়নি এমন মহিমা
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়...
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।—গীতা

অবরুদ্ধ কামনা-বাসনার বৈজ্ঞানিক পরিচয়কে যদিও কবি স্বীকৃতি দিলেন, বংশপরম্পরায় বাহিত জীন্-এর জৈবস্বভাবের অনুগামী হতে প্রবলভাবে অস্বীকার করলেন এই কারণে যে—মানুষের ধর্মই হল এগিয়ে চলা। স্থূল বাসনা-কামনাকে একান্ত স্বার্থলিপ্সাকে পায়ে দলে ব্যাপ্তির মধ্যে মহামানব-সম্মিলনের চরিতার্থতার পথে পদক্ষেপ করা। অভিযাত্রী সে। অভিব্যক্তির ধারাই দেখিয়ে দেয় যে, আরণ্য বর্বর মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি কর্মশক্তির সাহায্যে সংগ্রাম করতে করতে এত বিজ্ঞান, এত দর্শন এত কাব্য সৃষ্টি করেছে। তার জড়তা ও ভেদবুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট করার জন্য যুগে যুগে এসেছেন খ্রীস্ট বুদ্ধ মহম্মদ শ্রীচৈতন্যের মত মহাপুরুষ। আদিম ক্ষুধা নিয়েই মানুষ চলছে এবং চলবে—জীববিজ্ঞানের এই বংশানুক্রম-তত্ত্বের মৌল বিষয় মনে রেখেও কবি প্রতিবাদ জানালেন—

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে...
ও এসেছে কতলক্ষ পূর্বপুরুষের
রক্তের প্রবাহ বেয়ে;
কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা...
ও থাক ঐখানে দ্বারের বাহিরে,
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।...
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি...
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা। —(শেষ সপ্তক)

কবির বিজ্ঞান-দীক্ষার ফলিত প্রকাশ

"অতিথি বালক তরুদল, আয় আমাদের অঙ্গনে।"

সপ্ততি বৎসর পূর্তির কিছু আগে কবি শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। কবি লক্ষ্য করেছিলেন বনকর্তনের ফলে কেবল সৌন্দর্যশ্যামলিমাই দূর হচ্ছে তা নয়, প্রাণধারণও বিঘ্নিত হচ্ছে—"সূর্য তেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করছে, তাকে দান করছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।" সুতরাং আমরা যা নিচ্ছি তা ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে।

আমাদের দেশের শিক্ষিতের মন কৃষি ও কৃষকের প্রতি বিমুখ, এ এক বিপরীত ঘটনা, আত্মহননের এক অভিশাপ। এ দূর করার জন্যই তিনি নিজহাতে লাঙল ধরে হলকর্ষণের গুরুত্বের দিকে আমাদের আকৃষ্ট করার প্রয়াস করেন। আর ভাষণে বলেন—

> হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। ধরণীর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারিদিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক,ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের আমন্ত্রণ

> ''আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। ... বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে।''

কবির স্থায়ী মৃত্তিকাপ্রীতি, বৃক্ষপ্রীতি কেবল কাব্যের সূত্রেই নয়, বিজ্ঞানের প্রেরণাতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। কবির বিখ্যাত স্বাদেশিকতার মূল দেশের বাস্তব মাটিতেই নিবদ্ধ। কী গভীর আশা নিয়েই না কবি শিক্ষিতদের মনকে মাটির দিকে ফেরাতে চেয়েছিলেন—

> ''সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে উর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে ''তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ও তো আমারই জন্যে, আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্য আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।''

রবীন্দ্রনাথ নিজে মাটিকে সেই সহায়তাটুকু দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন শিলাইদহ- পতিসরে এবং শ্রীনিকেতনে। পুত্র-জামাতাকে কৃষি বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, ল্যাবরেটরি বসিয়েছিলেন, ঐকত্রিক চাষের সুবিধার জন্য ট্রাক্টর আনিয়েছিলেন, সমবায়-নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এসব উদ্‌যোগ পরাধীন ভারতে সেই প্রথম। কবি হয়েও তিনি বিজ্ঞান-দীক্ষিত মহাকৃষক! এজন্য দেশের পক্ষে যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেই ফসল ফলানোর বিষয়ে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করার আহ্বান বারংবার জানিয়েছেন কবি।

আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা

কবিকণ্ঠে এ বাণী বিস্ময়জনক হলেও সত্য। কারণ, তিনি শুধু কবিই নন, পথের দিশারী মহাপুরুষ এবং সেই সঙ্গে প্রবলভাবে স্বাদেশিক। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়ে এবং স্বল্প সময়ে সেখানে শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ-উদ্যোগের আশ্চর্য উন্নতি লক্ষ্য করে হতভাগ্য স্বদেশের জন্য আক্ষেপ করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বলশেভিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। কবির সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেখানকার বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষার আয়োজন। বিজ্ঞান তাদের আগেকার দিনের অন্ধসংস্কার দূর করেছে, নবীন জীবনের নব নব উৎসাহে দীক্ষিত করে তুলেছে। ফলে স্বদেশের বিদ্যালয়গুলিতেও তিনি বিজ্ঞান শেখানোর গুরুতর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছেন—

> ''শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না— গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার। বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান।''

কিন্তু হায়! আজও দেশের লোক ভাষা নিয়েই কলহ করে। দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠুক, বিজ্ঞান দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা সহজ করে আনুক, আচার-প্রথার অন্ধ আনুগত্য দূর হোক, বিকশিত হোক বিভেদহীন সামূহিক সমাজবোধ—এ কামনা শতকরা ক'জনের?

আশি বৎসরের কবির বিজ্ঞান-নির্ভর নিজ জীবন-সমীক্ষা

> জীবনের আশিবর্ষে প্রবেশিনু যবে
> এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—

লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।
এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্পকল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রির অবসানে
মন্থর গমনে এল মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে।...
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্য-নিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে-পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য-প্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশিবর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা

হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অজস্র রচনায় স্বদেশবোধের মূল কথা যে মনুষ্যচর্চা ও আত্ম-কর্তৃত্বের অধিকার সেকথা জানিয়ে গেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ দুই-ই ছিল তাঁর নজরে। জন্মশতবর্ষ-সংস্করণের 'রবীন্দ্র-রচনাবলীর' দ্বাদশ খণ্ডে 'স্বদেশ ও সমাজ' অংশে 'চিঠিপত্র', 'আত্মশক্তি', 'সমূহ', 'রাজাপ্রজা', 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ' এবং অনেকগুলি 'সংযোজন' পাওয়া যায়। তাছাড়া ত্রয়োদশ খণ্ডেও স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসংখ্যা বেশ কয়েকটি। ১৯০৮-এর ১২ আগস্ট গদ্য-গ্রন্থাবলীতে তাঁর 'স্বদেশ' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং 'সমাজ' বেরোয় ঐ বছরেই ৭ সেপ্টেম্বর। তাঁর গদ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'স্বদেশ'-এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি ছিল 'নূতন ও পুরাতন' (১২৯৮), 'নববর্ষ' এবং 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৩০৯), 'দেশীয় রাজ্য' (১৩১২), 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (১৩০৮), 'ব্রাহ্মণ' (১৩০৮)' 'সমাজভেদ' (১৩০৮), এবং 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' (১৩১০)। 'সমাজ' বইটিতে ছিল 'চিঠিপত্র' (১২৯২), 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১২৯৮), 'আচারের অত্যাচার' (১২৯৯), 'সমুদ্রযাত্রা' (১২৯৯), 'নকলের নাকাল' (১৩০৮), 'অযোগ্য ভক্তি' (১৩০৫), 'পূর্ব পশ্চিম' (১৩১৫)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রথম খণ্ডের ১৯৭০-এর সংস্করণে তাঁর এই উক্তি দেখা যায়—'বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে। যুরোপ ভ্রমণকালে যে ডায়েরি লিখিয়াছিলেন তাহারই এক বিরাট ভূমিকায় এইসব আলোচনা করেন; বোধ হয় উত্তরবঙ্গ ভ্রমণকালে উহা রচিত হয়। 'যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের প্রথম ভাগ বা ভূমিকা অংশ ছাপা হয়, আসল ডায়ারি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আড়াই বৎসর পূর্বে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলী প্রকাশকালে যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি অংশ 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত করা হয়, এবং ভূমিকাটিকে দুটি অংশে ভাগ করিয়া একাংশ 'নূতন ও পুরাতন' নামে 'স্বদেশ' খণ্ডে এবং অপরাংশ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে 'সমাজ' খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণ অপ্রচলিত হওয়ায় গদ্য-গ্রন্থাবলীর পাঠকগণের নিকট এই প্রবন্ধদ্বয়ের পটভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। অথচ প্রবন্ধ দুইটি স্থিরভাবে পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে যুরোপ হইতে সদ্য প্রত্যাবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন উঠিয়াছে।' 'যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'র (ভূমিকা)—প্রথম খণ্ড (১৬ বৈশাখ, ১২৯৮) রবীন্দ্রনাথ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ২৮ এপ্রিল, ১৮৯১ তারিখে চৈতন্য-লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে পাঠ করেন।

'স্বদেশ ও সমাজ'-এর পূর্বোক্ত চিঠিপত্রগুলি 'ষষ্ঠিচরণ দেবশর্ম্মণঃ' ও 'নবীন কিশোর দেবশর্ম্মণঃ' যথাক্রমে এই দুই কাল্পনিক প্রবীণ ও নবীন ব্যক্তির মোট ন'টি চিঠির সংগ্রহ। এই চিঠিগুলি চিত্তাকর্ষক। এগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই নবীনের উৎসাহের আধিক্য এবং প্রবীনের 'তথাস্তু' অনুভব করা যায়।

'আত্মশক্তি ও সমূহ' রচনাধারার মধ্যেই ''স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট'' অংশে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—''য়ুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল নহে।'' তিনি বারবার নানা প্রবন্ধে লিখে গেছেন যে, য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট, কিন্তু আমরা সে-অর্থে কখনোই স্টেটের ওপর নির্ভরশীল ছিলুম না। তাঁর কথায়—''আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। সেইজন্যেই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে।'' কিন্তু জাতির চেতনায় সে-বোধ তখন অতিক্রান্ত। তাঁর কথায়—''ইংরাজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল রাজত্ব পাইয়াছে, সমাজটাকে নিতান্ত উপরি-পাওনার মতো লইতেছে—ফাউ বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।'' এই ব্যাপারটি বিশদ করতে গিয়ে তিনি এই উদাহরণ ব্যবহার করেন যে—''ইংরাজের আইন আমাদের সমাজরক্ষার ভার লইয়াছে।'' এই রচনার তারিখ আশ্বিন ১৩১১। অর্থাৎ ১৯০৫-০৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং তার কিছু আগে এবং পরেও অনেকদিন তিনি আমাদের সমাজ ও ধর্ম-শক্তির ক্রমাবক্ষয় সম্বন্ধে খুবই পরিতাপ করে গেছেন। আমাদের পল্লীসমাজে যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি যে খুবই শিক্ষাপ্রদ ছিল—আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের জনসাধারণ পুঁথিপড়া বিদ্যা ব্যতিরেকেও যে আত্মস্থ থাকবার সহায়তা পেয়েছে এই দিকটি তাঁর আত্মশক্তি সম্বন্ধে চিন্তার অন্যতম বক্তব্য। ঐ প্রবন্ধেই তিনি জানান—''পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না।'' অর্থাৎ ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দেশদেশান্তরের মনুষ্যত্বের মূল সত্য সম্বন্ধে তাঁর আত্মকর্তৃত্ব-চিন্তার ঐকান্তিক ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল।

তাঁর জন্মের বছর-তিনেক আগে ১৮৫৮-তে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয় এবং ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায়। উনিশ শতকে সারা ভারতে একত্রিশ বার দুর্ভিক্ষ ঘটে। তার মধ্যে প্রথমার্ধে সাতবারে প্রায় পনেরো লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশ বারে মোট মৃত্যুসংখ্যা কুড়ি লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের এক বছর আগে ১৮৫৭-তে ঘটে সিপাহী-যুদ্ধ। অধ্যাপক অরবিন্দ পোদ্দার 'রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' (১৫ জানুয়ারি, ১৯৮২) নামে তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ বইটিতে বিস্তৃতভাবে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের পশ্চাৎপট অলোচনাসূত্রে এসব নানা লক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ ক'রে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের 'রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের' প্রসঙ্গই ব্যাখ্যা করেছেন। পরপর দশটি পরিচ্ছেদে এই সমীক্ষা সুবিন্যস্ত। ১৮৫৫-৫৭ পর্বের সাঁওতাল-বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক-বিদ্রোহ, ১৮৫৯-এর নীলবিদ্রোহ এবং অন্যান্য বিদ্রোহের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৩-র ইলবার্ট-বিল আন্দোলনের প্রসঙ্গও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বহু ঐতিহাসিকের মত দেখিয়ে যথাসাধ্য তাঁর মতামতের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ রাখেননি। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'টাগোর এ স্টাডি' (১৯৭২) নামে ইংরেজি বই থেকে তিনি এই মন্তব্যও দেখান যে,—''হিন্দুসমাজ থেকে ঠাকুররা ছিলেন রক্ত এবং ভূসম্পদ উভয় দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন!'' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' থেকেও তিনি তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্তের সমর্থক নানা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ তুলে দেখিয়েছেন। ১৮৬৭ থেকে যে বাৎসরিক চৈত্র মেলা বা হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হোতো, তার অন্যতম মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ও উদ্দীপক ছিলেন ঠাকুর-পরিবার—একথাও সুবিদিত। প্রভাতকুমারের কথায়— রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো দাদা গণেন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ছিলেন ''এর প্রাণ ও অক্লান্ত সংগঠক।'' ধূর্জটিপ্রসাদের পূর্বোক্ত বইটি অবশ্য প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-এর আগস্টে এবং ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে তার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁরই নামে এ-বই উৎসর্গ করেন ধূর্জটিপ্রসাদ। প্রথম অধ্যায়েই তিনি লেখেন—

> The Hindu Mela, which was the nucleus of the Swadeshi movement in Bengal, twice excited the young boy of 14 to write patriotic poems. The last one showed which way the wind was blowing. Lord Lytton was holding the Delhi Durbar, and famine was stalking the land. Rabindranath saw through the irony of the situation and exposed it in a poem which he recited before the audience. Poverty in the midst of plenty struck him deeply.

তারপর সেই রবীন্দ্র-জীবনী সম্পর্কিত আলোচনাতেই জাতীয় শিক্ষাপরিষদে (১৯০৬) সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ১৯০৭-এর বক্তৃতার উল্লেখ করেন ধূর্জটিপ্রসাদ। শ্রীঅরবিন্দ যে সেখানকার যাবতীয় স্বাদেশিকতা ও প্রগতি-চিন্তার কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি ছিলেন এবং অরবিন্দ-রবীন্দ্রের যোগ যে তখন থেকেই শুরু হয়, সে-প্রসঙ্গ দেখিয়ে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অতঃপর সন্ত্রাসবাদের ব্যাপ্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ যে মর্মাহত বোধ করেন সেকথারও উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ- বিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধেও ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সেকালের মানসিকতা দেখাতে গিয়ে লেখেন যে, স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার কিছু পরিচয় আছে তাঁর ১৯০৮-এর 'পথ ও পাথেয়' নিবন্ধে। জন্মশতবর্ষ-সংস্করণের রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে 'রাজাপ্রজা'-তে ১৩১৫ সালের এই প্রবন্ধটি পাওয়া যায়। এতে তিনি দেশের হিতসাধনের অতি উত্তেজনা যাতে আমাদের ধর্মভ্রষ্ট না করে, সে-বিষয়ে সতর্কবাণী ঘোষণা করেন। তিনি দেশের উচ্চ নীচ মুসলমান ও খ্রিষ্টান সকলেরই দৃষ্টি ফেরাতে বলেন যথার্থ ঐক্যবোধের প্রয়োজনীয়তার দিকে। তা যদি না হয়, তাহলে ''বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনই কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে।" এবং—''স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনতরো নিতান্ত ঢিলা বিবেচনার কাজ বর্তমানের প্ররোচনায় করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনোই কর্তব্য হইতে পারে না। কর্মের ফল যে আমার একলার নহে, দুঃখ যে অনেকের।"

সেই ১৩১৫ সালের রচনা 'পূর্ব ও পশ্চিম' (রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১২শ খণ্ড : 'সমাজ' দ্রষ্টব্য) প্রবন্ধে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা যে যথার্থ ধর্মবুদ্ধি দিয়েই ভারতবর্ষে সকল জাতির মিলনের আদর্শ বরণীয় বলে গেছেন, সেকথা লেখা হয়। তার কিছুদিন আগেই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়ে গেছে। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—''ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন কবিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।"

স্বদেশ-ভাবনা তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। গানে, কবিতায়, নাটকে,—প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে তিনি স্বদেশের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হতে দিয়েছেন। 'গীতবিতানে' স্বদেশ-পর্যায়ের গানগুলির প্রথম গানেই পাই স্বদেশের মাতৃমূর্তি—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
*   *   *   *
ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মাণিক হবে।

এই ভূমিস্পর্শমুদ্রাই তাঁর স্বদেশ ধ্যানের আসন। এবং সে শুধু সোনার বাংলাকেই নয়—সারা বিশ্বের বিশ্বময়ীকে ছুঁয়ে থাকার মুদ্রা—

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা!
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।

সংকোচের বিহ্বলতা—সংকট কল্পনায় ম্রিয়মান হ'য়ে থাকা নয়,—রাজা-প্রজার ব্যবধান বৃদ্ধি নয়, ভয় নয়,—ব্যর্থতাবোধ নয়—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার ব্যাপক উদ্দীপনার দিকটি ভোলবার নয়। কিন্তু সে শুধু সুরের খেলা নয়, শব্দের কুহক মাত্র নয়। ভেতরে ভেতরে কঠিন সংকল্প ছিল তাঁর। সেই সংকল্পের পূর্বপর্বে ছিল ভারতপথিকের স্বরূপ-সন্ধান। ইতিহাসের ঘটনাগতি তিনি সুদূর অতীত থেকে নিজের যুগ অবধি কী ভাবে কতো দিকে বিস্তৃত, তা অনুভব করেছিলেন। কর্মযোগ ও সত্যবোধ,—এই দুয়ের অচ্ছেদ্যতা মানবার নীতিই তাঁর স্বদেশনীতি। কিন্তু কর্মের দাসত্ব নয়, কর্মের মুক্তি এবং আনন্দের সাধনার দিকটিতেই তিনি বিশেষ জোর দিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৩০৯ সালের বৈশাখে লেখেন—

> ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্ক ধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে, এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে।

পৃথিবীর সকল মানবজাতির মধ্যে ভারতবর্ষের যে পৃথক এক স্থান আছে, সেই পার্থক্যের কথাপ্রসঙ্গে তিনি লেখেন—"বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, একথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হইতেছে।" তিনি জানতেন যে, আমাদের স্বাদেশিকতা আমাদের আচার ও সমাজ রক্ষার 'ভীষণ শক্তির' মধ্যেই প্রকাশিত। এই 'ভীষণ শক্তি' কথা দুটি তাঁরই প্রয়োগ। এই শক্তি হলো সংযমের শক্তি, আধ্যাত্মিকতার দীপ্তি। একে তিনি বলে গেছেন 'ভারতবর্ষের একাকিত্ব'। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা কোনো বিষাদমালিন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।"

ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে সবাই আসবে যাবে—কোনো পক্ষই 'যাবে না ফিরে'। এসব তাঁরই কথা,—এবং ভারতের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধিও তাঁর স্বদেশচিন্তার বিশেষ কথা। এই দুটি মোটেই পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই দেখা যায়—"য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী।" আবার—"আমাদের সুখসম্পত্তি একলার নহে; আমাদের দানধ্যান অধ্যাপন আমাদের কর্তব্য একলার।"

এই কথা থেকেই তিনি তীব্র এক বাস্তব সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন—"আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলোর ভিতরে বাহিরে চারিদিকে মানুষগুলোকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, একাকিত্বের আব্রুটুকু থাকে না।"

'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীও নয়, 'অচলায়তন'-এর শুষ্কতার প্রাকারও নয়,—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধের কেন্দ্রে এক কঠিন নিয়মের ভিত্তিতে পরম আনন্দকুসুমের স্বীকৃতি ছিল। গানে সে-কথার ইশারা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন।

আবার—

শাসনে যতই ঘেরা আছে বল দুর্বলেরও
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।

সমস্ত প্রতিকূলতার বিপক্ষে এই অখণ্ড প্রত্যয় নিয়ে এই শতাব্দীর সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাদেশিকতাবোধের সঙ্গে বিশ্বমৈত্রীর যোগে আত্মস্থ ছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বারবার আমাদের এই ঐতিহ্য ও প্রগতি-ভাবনার অন্বয়সূত্রটি দেখিয়ে দেন। ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠে তিনি শেষোক্ত প্রবন্ধে লেখেন—"'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। ... য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই।"

ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্মের ভিত্তিতেই তাঁর স্বদেশচিন্তা নানা প্রসঙ্গের প্রবহমানতা মেনে নিয়েও এক ধ্রুব বিশ্বাসে অটুট। তিনি য়ুরোপীয় ছাঁদে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়তে দিতে নারাজ ছিলেন। ১৩১৪ সালে 'আত্মশক্তি ও সমূহ' চিন্তাধারার মধ্যেই তিনি লেখেন—"স্বরাজ তো আকাশকুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়?"

পৌরুষ, কর্তব্যবোধ, শান্ত ও অকম্পিত শপথ—এবং নিরলস কর্মযোগের আনন্দই তাঁর স্বদেশপূজার লক্ষ্য ও উপায়। তাঁর ভূমা আর স্বভূমি একই বোধের অধীন! তাঁর স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বের ব্যবধান নেই, কারণ 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্!' উপনিষদের এই প্রেরণা অল্প বয়স থেকেই তাঁর মনে স্থায়ী হয়। পরিণত জীবনে ১৯৩০-এ 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি লেখেন—"আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি।" শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র নিয়ে রাশিয়ার কর্মশক্তির ব্যস্ততা দেখে স্বদেশের অনুরূপ প্রয়োজনের কথা মনে পড়েছিল তাঁর। সেই সময়ে তিনি লেখেন, "আমাদের দেশে কোন-এক সময়ে গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল-অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বলদান করছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই—তিনি লজ্জিত—যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন।" এবং—"শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না, যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে।"

১৩৩৬ সালের শ্রাবণে সুরুলে হলচালন উৎসবে বৈদিক মন্ত্র সহযোগে লাঙল ধরার কথা-প্রসঙ্গে সেই রবীন্দ্রনাথই লেখেন—"আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে, সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে?"

অর্থাৎ? অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশের ভাবনায় প্রাচীন আচারের অচলায়তনের বন্দীদশা মানতে বলেননি; তিনি চেয়েছিলেন যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—যন্ত্র-শিল্পের সমৃদ্ধির সঙ্গে আত্মিক মুক্তির চরিতার্থতা। তাঁর শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনও কবির সেই অভিপ্রায়ের উদাহরণ। এবং সেই ১৩৩৬ সালেই তাঁকে এই শোচনা ব্যক্ত করতে হয়েছিল যে—"হায় রে দূরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীনপন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনের স্থাপনা দেখে চটে যায়, যারা তরুণ আমাদের আমল দেয় না।"

তাঁর স্বদেশবোধের মধ্যে দেশের জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, অনুকরণপ্রবৃত্তির তামসিকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে এই বেদনাও ছিল তাঁর অটুট উদ্দীপনার সহচর। তাঁর চিন্তায় স্বরাজ সাধনা কোনো ক্ষণস্থায়ী তীব্র আবেগ মাত্র নয়। সে হলো নিরন্তর বিচারের এবং কর্মের প্রেরণা। ১৩২৮ সালের কার্তিকের প্রবন্ধ 'সত্যের আহ্বান'-এ রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ বক্তব্য উচ্চারিত হয় যে, মানুষ যে উন্নত জীব, তার প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ পরাসক্ত নয়, মানুষের স্বাতন্ত্র্য তার আত্মনির্ভরতায়। মানুষ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ভাবুক ও কর্মী। মানুষ অন্ধভাবে অভ্যস্ত প্রথার অনুগামী নয়। মৌমাছি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিশেষ নৈপুণ্যে তার চাক তৈরী করে আসছে বটে, কিন্তু সেই অভ্যাসে তার স্বকীয়তা নেই, আছে কেবল প্রাকৃতিক আনুকূল্য। প্রকৃতি কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবজন্তুকে যথার্থ আত্মজ্ঞান দেননি, তাদের রক্ষা করে সেইসব প্রাণপ্রবাহ টিকিয়ে রেখেছেন মাত্র। তাই এই সব জীবজন্তু পরাসক্ত। তাদের সজাগ অন্তঃকরণ কোথায়? কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার জীব-রচনা আরো সাহসের উদাহরণ হয়ে উঠেছে। "তিনি তার অন্তঃকরণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে সর্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্বল ক'রে এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হল।" ফলে, নিজের চেষ্টায় কোন্ আদিযুগে পাথরের বর্শাফলক, আগুন জ্বালাবার বিদ্যা, লোহা গলাবার বিজ্ঞান ইত্যাদি আবিষ্কার করে মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। প্রকৃতিদত্ত নখদন্তেই সে আত্মসন্তুষ্ট থাকেনি। এবং সেই আদিযুগের সীমাতেই যে আদিম মনুষ্যদল আবদ্ধ রইলো, তা নয়। যথার্থ মনুষ্যত্বের অগ্রগতি সেখানেই থেমে থাকেনি। অন্তঃকরণের সাধনা, আত্মশক্তির উদ্বোধন, অসাধ্যসাধনের সংকল্প—এই সবই মানুষের গুণ। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' নিবন্ধেও এই দিকেরই অভিব্যক্তি দেখা গেছে।

সেই ১৩২৮ সাল থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে 'সাধনা' পত্রিকাতে তিনি বার বার লিখেছিলেন যে, ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষ তখনকার কংগ্রেসের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ইংরেজের কাছে অধিকার ভিক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু সেই ভিক্ষার পথ ভুল পথ। এই বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লেখেন—"মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা; বাহিরের লাভে অন্তরে লোকসান ঘটে। আমি বলেছিলাম, অধিকার বঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা আমাদের মাথার উপরে 'আবেদন আর নিবেদনের থালা'। তারপরে যখন আমার হাতে 'বঙ্গদর্শন' এসেছিল তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি-শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল।" অর্থাৎ, যথার্থ দেশপ্রীতির তাড়নায় সে-আন্দোলন ঘটেনি। সেই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল ইংরেজ সরকারের প্রতি অভিমান। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন, অভিমানে, ক্রোধে সুস্থ দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়,—ফলে তাতে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না।

'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধেই তিনি জানান—''ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্ছে চিরসত্য, আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া।" তাঁর কথায়—'মায়া জিনিসটা অন্ধকারের মতো ... সত্য আলোর মতো তার শিখাটা জ্বলবামাত্র দেখা যায় মায়া নেই। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছেন : স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ভয়-কে তিনি বলেন, 'মনের নাস্তিকতা', কারণ সেই ভয় সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করা দুঃসাধ্য—''উপস্থিত মত তার একটা কারণ গেলেও রক্ত-বীজের মতো আর-একটা কারণ রূপে সে জন্ম নেয়।" এবং—''ধর্ম হচ্ছে সত্য, সে মনের আস্তিকতা; তার অল্পমাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড 'না'কে একেবারে মূলে গিয়ে অভিভূত করে।" তাঁর রাজনীতি-চিন্তায় 'সমাজ' ও 'ধর্ম'ই প্রধান কথা।

এই উক্তির পরের কথাগুলি আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণীর মতন। সেই সুদূর অতীতে ১৩২৮ সালের কার্তিকে তিনি জানান—''ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব-নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে।"

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—''আমার দেশ আছে, এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু, যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তর প্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে, সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।" অর্থাৎ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দেশ হলো দেশবাসীর চিত্তের সৃষ্টি। এই সূত্রেই বহুকাল আগে লেখা তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়। তাতে বলা হয়েছিল—''দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়, নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে।"

তিনি মনে করতেন যে, ''ইংরেজ-রাজ-সরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়।" এই মন্তব্যের ফলে সেদিন দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের কথায়—''যারা কটুভাষা-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বলছিনে, কিন্তু গণ্যমান্য এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তিরাও আমার সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেননি। এর দুটি মাত্র কারণ—প্রথম ক্রোধ, দ্বিতীয় লোভ। ক্রোধের তৃপ্তি সাধন হচ্ছে একরকমের ভোগসুখ, সেদিন এই ভোগসুখের মাতলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল—আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোনো আব্রু রাখছি নে। এই সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন? কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্য সাধনের সদুপায় নয়।" তার উত্তরে তিনি তাঁকে জানান যে, উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যটা মনে থাকলে আমরা অবশ্যই সংযত হতাম, কিন্তু ক্রোধই সেদিন আমাদের পেয়ে বসেছিল। তিনি 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে আমাদের সে-পর্বের আন্দোলনে ক্রোধ আর লোভের আতিশয্য ও সত্যপালনে অনীহার তত্ত্বটি দেখিয়ে লেখেন—''তখনকার একজন নেতা বলেছিলেন,—আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর এক হাত তার পায়ে।" স্বরাজ সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণও লক্ষণীয়। তিনি দেখান যে, এই মনোভাবের ফলে—''তৎকালে এবং তৎপরবর্তীকালে এই দ্বিধা

হয়তো অনেকের একেবারে ঘুচে গেছে, এক দলের দুই হাতই হয়তো উঠেছে সরকারের টুঁটিতে আর এক দলের দুই হাতই হয়তো নেমেছে সরকারের পায়ে।" কিন্তু তাতে স্বরাজসাধনার সত্য কোথায়?—"হয় ইংরেজ সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

অর্থাৎ তিনি নিজে চেয়েছিলেন দেশব্যাপী অন্তঃকরণের জাগরণ এবং যে যে অঞ্চলে যেভাবেই হোক সেই জাগরণ ঘটতে দেখেছিলেন, সেই সেই অংশ সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসা ছিল অকুণ্ঠ। তার নজীর আছে তাঁর এই উক্তিতে—"সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে এক দল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক এই প্রলয় হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্য তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলের নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।" এই প্রশংসাসূত্রে তিনি একথা বলতেও দ্বিধা করেননি যে,—"তাঁরা পরমত্যাগে পরমদুঃখে আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা। পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোটো, কিন্তু সেটা অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না, মাঝের থেকে পা দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্ন বিছিন্ন করা হয়"। দেশ যখন বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত নয়, তখন বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি লেখেন—"সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন, সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ-দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন, তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। ... আমার মনে হয় তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ বলে একটা জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি, এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন, অর্থাৎ যে যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণযোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই।"

এই মন্তব্যের সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে তিনি জানান যে, অন্য দেশের ক্ষেত্রে পোলিটিকাল প্রেরণা সারা দেশের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে যুক্ত থাকে বলেই সেখানে বৈপ্লবিক গতি সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে সে-আমলে তা ঘটেনি। এবং—"যমের ফাঁসি-বিভাগের সিংহদ্বার থেকে বাংলাদেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেছেন তাঁদের লেখা পড়ে কথা শুনে আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাবছেন। তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা সাধনের যোগ।"

'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে জড়তা, বাধ্যতা, ক্রোধ, লোভ, পরানুকরণ ইত্যাদিকে অসার বলে, বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরবর্তী আন্দোলনের আরো ব্যাপকতার উল্লেখ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগে তিনি লেখেন—"বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক গ্লাডস্টোন ম্যাট্সীনি গারিবলডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায়নি। এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। ... ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে?" ফলে সত্যের দৃষ্টান্ত তার মধ্যে জীবন্ত

হয়ে ওঠে। চাতুরী নয়, প্রেমই মুক্তির উপায়। লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য। কথাসূত্রে গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে গান্ধীজীর তুলনা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি।" এবং—"প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেমনি আমাদের মানতে হবে। কংগ্রেস প্রভৃতি কোনোরকম বাহ্যানুষ্ঠানে দেশের হৃদয় জাগেনি, মহৎ অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগল।"

মহাত্মাজীর কর্মপন্থার সমালোচনাও দেখা দেয় যখন রবীন্দ্রনাথ এই 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধেই জানান যে, ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু যেমন সত্যলাভ করে সকলকে সর্বস্তরে সত্যসাধনায় এগিয়ে যেতে আহ্বান জানান, মহাত্মাজী কেন সেইভাবে উদ্দীপিত করলেন না দেশবাসীর মন?—"মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তার মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।" এই অবস্থায় পীড়িত বোধ ক'রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"চরকা কাটা একদিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করতে পারে।" এইখানে তিনি আর একটি লক্ষণীয় তুলনা ব্যবহার করেন—"স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সংকীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয়নি, এথেন্স মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে।"

এদেশে চাষীরা (তখন দেশের শতকরা আশিজন) বছর ছ'মাস বেকার থাকে, তাই বেকার অবস্থায় তারা যাতে চরকা কাটায় উৎসাহিত হয় সেজন্যে দেশের সকল ভদ্রলোকেরই চরকা কাটা উচিত, রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত উপযুক্ত সমীক্ষা ব্যতিরেকে মেনে নিতে পারেননি। মহাত্মাজীর কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁর আরো কিছু কিছু বক্তব্য তিনি রেখে গেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ-ভাবনা ও স্বরাজসাধনার মূল কথা ছিল দেশের সামগ্রিক আত্মিকতা উদ্বোধিত করা।

‘শিক্ষার মিলন’ ও ‘শিক্ষার বিরোধ’

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৩ সালে ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধ দিয়া যাহার সূচনা, ১৯৩৭ সালে ‘ছাত্রসম্ভাষণে’ তাহার পরিসমাপ্তি—প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ তেইশটি প্রবন্ধ, আলোচনা, ভাষণ, অভিভাষণ ও সমালোচনায় শিক্ষার তাত্ত্বিকতা ও প্রয়োগগত সমস্যা লইয়া সুদীর্ঘ, সুশৃঙ্খল ও যুক্তিক্রমানুসারী আলোচনা করিয়াছেন। প্লেটোর ‘Republic’ হইতে আরম্ভ করিয়া রোমের পণ্ডিতদের অধীনে Tribium অর্থাৎ ত্রিবিদ্যা (ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র) এবং তাহার সীমা বাড়াইয়া Quadrivium অর্থাৎ চতুর্বিদ্যার (জ্যামিতি, গণিত, সংগীত, জ্যোতির্বিদ্যা) প্রচারকগণ যেভাবে শিশু, বালক ও তরুণের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তাহার মতো সংকীর্ণ খাতে বহমান নহে। মধ্যযুগের ‘literator’ অর্থাৎ স্কুলমাস্টারগণ য়ুরোপীয় বালকদের কতটুকু শিখাইতে পারিত? ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকারের যৎকিঞ্চিৎ, কাব্য, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র এবং গ্রীকভাষা—এই পর্যন্ত তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিসর। বোধহয় কুইন্টিলিয়নের (খ্রীঃ ৪০-১০০ অব্দ) ইনস্টিটিউশন অরাটোরিও-তে সর্বপ্রথম শিশুশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়স্ক শিক্ষার ক্রম ও প্রণালী ব্যাখ্যাত হইত। রেনেসাঁসের যুগে ইরাসমাস (১৪৬৭-১৫৩৬), মেলাংথন (১৪৯৭-১৫৬০) এবং তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যের দল লাটিন ভাষা শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ক্রমে য়ুরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডে হেলেনিক সংস্কৃতির মূল বাণী অর্থাৎ মানবতন্ত্রবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত হইল। কোম্‌নিয়াস (১৫৯১-১৬৭১) শিক্ষাসংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ লিখিয়া স্কুল-মাস্টারদের শিক্ষাপদ্ধতিকে অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে পেস্টালোৎজি (১৭৪৬-১৮২৭) এবং ফ্রোয়ব্‌ল্ (১৭৮২-১৮৫২) তাঁহার অনেকগুলি রীতিপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে তাহার মানসিক প্রবণতা সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে। বোধ হয় রুশো (১৭১২-১৭৭৮) সর্বপ্রথম তাঁহার Emile (১৭৬২) গ্রন্থে শিশুর মানসিক প্রবণতার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন। পেস্তালোৎজি তাঁহার রচনা হইতে শিক্ষার বাস্তব দিকটি উপলব্ধি করিয়া শিশুকে তাহার শিশুত্বের মধ্যে শিক্ষাপ্রকরণ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেস্তালোৎজির শিক্ষাদর্শই ফ্রোয়ব্‌লের নিয়মপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ক্রমপর্যায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মতে, শিশু, বালক ও তরুণ তখনই যথার্থ শিক্ষা লাভ করে, যখন শিক্ষক তাহাদের বয়োধর্ম ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হন। বালক-বালিকাদের যথাযথ পরিবেশে স্থাপন করিতে পারিলে তাহারা সহজেই কাজ ও খেলাকে একসূত্রে মিলাইতে পারিবে। অর্থাৎ শিক্ষাকে তাহারা জুজুর মতো ভয় করিবে না এবং খেলাকেও লঘু মুহূর্তের পলায়নী অবকাশ বলিয়া মনে করিবে না।

মারায়া মন্টেসোরি (১৮৭০-১৯৫২) ১৯০৬ সালের দিকে জড়বুদ্ধি বালক-বালিকার শিক্ষা ও

মনঃপ্রকৃতির গঠনের জন্য যে বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ১৯০৯ সালের দিকে শিশুশিক্ষা ও মনের গঠনে তাঁহার পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু য়ুরোপ-আমেরিকায় নহে, এ দেশেও (মাদ্রাজ, করাচি, সিংহল, পুনা) শিশুশিক্ষার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করেন। তাঁহার মতে শিশু ও বালকের শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হইবে তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও কল্পনার নির্বাধ বিকাশের সুযোগ দান। একালে তাঁহার পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, কোম্‌নিয়াস, পেস্টালোৎজি, ফ্রোয়ব্‌ল্ এবং মন্টেসোরি শিশু ও বালক-বালিকার শিক্ষাসংক্রান্ত যে-সমস্ত রীতিপদ্ধতির কথা বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তৎ-সংক্রান্ত কেতাবি বিদ্যা আয়ত্ত না করিয়াও বালকদের শিক্ষাকে যে-রীতিতে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার সহিত শিশুশিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের অভিমতের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অথচ তিনি বৃত্তির দিক দিয়া শিক্ষাব্যবসায়ী ছিলেন না।

বাল্যকালে শিশুশিক্ষা নামে যে খাঁচার মধ্যে তিনি কিছুদিন বন্দী-জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই এই-সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীর অভিশাপ নিদারুণভাবে ভোগ করিয়াছিলেন। তাই দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মচর্য আশ্রম খুলিয়া, বালশিক্ষার নূতন পরিবেশ রচনা করিয়া, হাতেকলমে শিক্ষার জীবন্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করিবার অভিপ্রায়ে দীর্ঘ দিন ধরিয়া যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন তাহাই প্রায় অর্ধশতাব্দী (১৮৯৩-১৯৩৭) ধরিয়া নানা প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিক্ষা যে বৃত্তি শিখাইবার কল নহে, বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়া ইহজগতে সাফল্যলাভের একমাত্র চাবিকাঠি নহে এই কথাটা সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশীয় বালকের সঙ্গে বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির জোড়কলম বাঁধিবার হাস্যকর অবস্থাটা তিনি নানাভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। শিক্ষার মান, ভাষা, বিষয় ও পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত, শিক্ষক ও ছাত্রের মানসিক গঠন, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্কই বা কী, এই সম্পর্কে তিনি শুধু অলস চিন্তায় অবসর যাপন করেন নাই, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বিশ্বভারতী স্থাপনা পর্যন্ত, শিক্ষার নানা রূপ ও রীতি তিনি হাতেকলমে পরীক্ষা করিয়াছেন। যাঁহারা বাঁধাপথের শিক্ষাবিধি ধরিয়া নিরাপদ জীবনের সৌধ রচনা করিতেন, তাঁহারা মনে করিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা কবিজনোচিত কাল্পনিকতা মাত্র। তিনি যে প্রাচীন ভারতের আশ্রম ও গুরুকুলকে আধুনিক জীবনের ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে আনিতে চাহিতেছেন তাহাও দুরাশা এবং একপ্রকার রোমান্টিক অতীতচারিতা, যাহাতে মেঘডম্বর যতটা আছে, বর্ষণ ততটা নাই। কিন্তু এই-সব সংশয়ীদের চিন্তার দুর্বলতা ও সিদ্ধান্তের ভীরুতা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তাব শুধু সমর্থন করেন নাই, কাজেও দেখাইয়াছেন। আরো দেখাইয়াছেন, বিজ্ঞান শুধু পরীক্ষাগারের চারি দেওয়ালের মধ্যে নাই, তাহার স্থান ক্লাসঘরের বাহিরে, হাটে মাঠে, মাটিতে। আমাদিগকে ভারতের নিজস্ব ধাতুপ্রকৃতি অনুসারে আধুনিক জীবনে চলিবার উপযোগী শিক্ষাকে একসূত্রে বাঁধিতে হইবে। ইংরাজি আমাদের মাতৃভাষা নহে, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও ইহা কোনোদিনই আমাদের প্রাণের ভাষা হইতে পারিবে না, বড়ো জোর কাজের ভাষা হইবে। কিন্তু পশ্চিম দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শুধু প্রাচীনভারতের হোমধূমপূত এবং বেদধ্বনিমুখরিত স্বপ্ন দেখিলেই চলিবে না, ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডারও আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্নং বহু কুর্বীত বলিলেই অন্নের সমস্যা মিটিবে না, তাহাকে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ভূরিপরিমাণে ফলাইতে হইবে। তাহার জন্য মাটি, হালবলদ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন য়ুরোপের ভূমি ও কৃষিবিজ্ঞান এবং পরিবেশ-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ দেশের জলবায়ু-মাটির সহিত সেই লব্ধ বিদ্যাকে মিলাইয়া দিতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন, অবিদ্যার সাধনা করিয়া মৃত্যু উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তার পর বিদ্যার সাধনা—অমৃতের সাধনা। বস্তুবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান, ভিষকশাস্ত্র—আরো নানা বিদ্যা, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, যাহা হয়তো অধ্যাত্মবিদ্যা নহে এবং তদ্দ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করাও যায় না। কিন্তু তাহার সাধনা না করিলে পঞ্চভূতাত্মক দেহটাকে কীভাবে রক্ষা করা যাইবে? ব্যাধি, পীড়া, বিপর্যয়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীতাতপের পীড়ন, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন, মহামারী—ইহাদের আক্রমণ হইতে দুর্বল দেহযন্ত্রটাকে কীভাবে রক্ষা করা যাইবে? দেহ নিপাত গেলে অধ্যাত্মবিদ্যা দাঁড়াইবে কোথায়? আত্মার যেমন দেহ-আধারের প্রয়োজন, তেমনি দেহকে রক্ষা করিবার জন্য অ-বিদ্যার অনুশীলনও প্রয়োজন। আমরা অধ্যাত্মবাদী বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ইষ্টনাম জপ করিলে মৃত্যু ছাড়িয়া দিবে না। একদা ভারতবর্ষ অবিদ্যারও যথেষ্ট চর্চা করিয়াছিল, নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না; লোকায়তিক, বার্হস্পত্য, চার্বাকপন্থীরা তো কোনো পারমার্থিক-সত্তাকেই মানিত না। বস্তুর বাহিরে সত্য নাই, এমন কথা বলিতেও কেহ কেহ কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ—সবই প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যাপার। অধ্যাত্মশাস্ত্রের পার্শ্বেই কামশাস্ত্র বুক ফুলাইয়া বসবাস করিয়াছে। উপনিষদ গীতার সঙ্গে অনঙ্গরঙ্গ ও কুট্টিনীমতম্ টীকা-টিপ্পনীসহ অবিরোধে ঘর বাঁধিয়াছে। শুনা যায় মণ্ডনমিশ্রের বিদুষী পত্নী উভয়ভারতী তর্কে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে আজন্মব্রহ্মচারী শঙ্করাচার্যকে কামশাস্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি গূঢ় প্রশ্ন করিলে আচার্য তাহার যথোচিত উত্তর খুঁজিবার জন্য একবৎসর সময় চাহিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইতেছে সেকালের সমাজে বিদ্যা ও অবিদ্যা, অন্যকথায় পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা ভাই-বোনের মতো পাশাপাশি বাস করিত। সুতরাং জীবনের শিক্ষা পুরা করিতে হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুয়েরই চর্চা করিতে হইবে। গার্হস্থ্য-আশ্রমবাসী ব্যক্তি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমভাবে প্রত্যেকটির সেবা করিবেন, যিনি কেবল একটিতে (হোক তাহা মোক্ষ) লগ্ন হইয়া থাকেন শাস্ত্র তাঁহাকে জঘন্য বলিয়াছেন। অতএব আধুনিক ভারতবর্ষকে যদি আত্মশক্তিতে জাগ্রত করিতে হয় তাহা হইলে 'বলা' ও 'অতিবলা' দুই মন্ত্রেরই সাধনা প্রয়োজন। একটিতে পার্থিব শক্তি, অপরটিতে আত্মার বিকাশ। দুই পদক্ষেপে মানুষের চলা অব্যাহত থাকে, গতিটি সুষ্ঠু হয়, চলাকে বাদ দিয়া যাহারা স্থাণুত্বের সাধনা করে, তাহারা 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট : ন পূর্ব ন পর'—হইয়া মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অপর দিকে যাহারা উদ্দাম অনিবার চলাটাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে তাহারা দিনশেষে হিসাব করিলে দেখিবে, তাহারা একস্থানে খাড়া থাকিয়া চলার ভান করিয়াছে। মনে হইতেছে, চলিতেছি, আসলে ''আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।'' যিনি স্থিতধী, সত্যসন্ধ ও সিসৃক্ষু, তিনিই যথার্থ গতি ও বিরতির সামঞ্জস্য করিতে পারেন। শিক্ষার অর্থ—এই দুই বৈপরীত্যের স্বাঙ্গীকরণ। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে ''শিক্ষার মিলন'' শীর্ষক প্রবন্ধে সুচিন্তিত যুক্তিক্রমের সাহায্যে এই মিলন দেখাইতে গিয়া বিপাকে পড়িয়াছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের কলমের খোঁচায় কিছু বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন। এইবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

দুই

রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালের ১২ মে হইতে ১৯২১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি—প্রায় চৌদ্দ মাস য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ১৬ জুলাই শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিদেশে বাস করিয়া তিনি পশ্চিমের প্রাণবহুল কর্মযজ্ঞ ও শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত নিকট হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতে তখন অসহযোগ আন্দোলনের যুগ, খিলাফৎ আন্দোলন চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা

গান্ধীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার কোনো কোনো কর্মপন্থা সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন : "I refuse to waste my manhood in lighting the fire of anger and spreading it from house to house." এই আগুনের আঁচ যেন শান্তিনিকেতনকে স্পর্শ না করে। "Santiniketan must be saved from the whirlwind of dusty politics." মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ লইয়া নিষ্ফল আন্দোলন করিতেছেন। তিনি কি ইতিহাসের চাকা উল্টাদিকে ঘুরাইয়া দিতে চাহেন? অ্যান্ড্রুজের নিকটে লেখা চিঠিতে তাহা কবুল করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা দূরদর্শী বলিতে হইবে। তুর্কীরাই কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে খলিফা পদ বাতিল করিয়া তুরস্ককে আধুনিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহাই ইতিহাসের নির্দেশ, যাহা রবীন্দ্রনাথ যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অবশ্য তখন ভারতে যেমন অশান্তির দক্ষযজ্ঞ চলিতেছিল, তেমনি য়ুরোপেও তো শান্তি ছিল না। বুদ্ধিজীবী দানবশক্তির অনলনিশ্বাস এবং অস্ত্রভাণ্ডারের ভয়াবহ ঝন্ঝনা য়ুরোপের নিরীহ মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতো ম্যামনের পূজা করে না, কুবেরকে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনও তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। মহাতাপস শিবই ভারতের প্রতীক, অন্তত হিন্দুভারতবর্ষের। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী এবং অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহিণী, শ্মশানে-মশানে তাঁহার অধিষ্ঠান, দারিদ্র্যই তাঁহার ভূষণ। আমাদের মধ্যবিত্ত সাধারণ ব্যক্তি মাঝে মাঝে অভাবে অনটনে কাতর হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু অল্পেই সে অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে, শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্ কেবল কথার কথা নহে। তাহাই ভারতের একমাত্র অন্বেষ্টব্য। কিন্তু পশ্চিমের শিব শান্তও নহেন, অদ্বৈতও নহেন। তাঁহার ঝোলাঝুলি খুঁজিলে ব্যাঙ্কের পাসবহি বাহির হইয়া পড়িতে পারে। অবশ্য ভারতীয় শিব ও পশ্চিমের শিবের একস্থানে মিল আছে। উভয়ের গৃহিণীই গৌরাঙ্গী। কিন্তু পরিহাসের কথা থাক্। ভারত যেখানে সাধকের কৃপা ভিক্ষা করে, পশ্চিম সেখানে 'an efficient accountant' হইয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া বসে। উগ্র স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তি এবং নিছক নীতিবাগীশ মানুষ মনুষ্যত্বের আধখানাও নহে, এ কথা কবুল করিতে রবীন্দ্রনাথ সংকুচিত হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বৈরাগ্যের নামে শূন্য ঝুলিরও সমর্থন করেন নাই। শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা স্বরাজলাভ ভারতের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ন্যাশনালিজ্ম্-এর লূতাতন্তু হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে ভারতবর্ষের ভরাডুবি হইবে—ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু চরখা ঘুরাইয়া দেশের স্বাধীনতা আসিবে, অর্থনীতির দিক হইতে চরখার সুতা দেশকে অন্নবস্ত্রে স্বয়ম্ভর করিয়া তুলিবে, এরূপ অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক ভোজবাজিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার কোনো কোনো অবৈজ্ঞানিক মত মানিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় মিলিবে 'কালান্তরে'। যাহা হউক, তাঁহার দেশে ফিরিবার পূর্বে এ-দেশে অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে উঠিয়াছে, প্রিন্স অব ওয়েল্স্-এর আগমন উপলক্ষে বোম্বাই নগরীতে দাঙ্গা বাধিয়া যায়, তাহাতে পঞ্চাশ জন নিরীহ মানুষ নিহত হইল, আহতের সংখ্যা চারিশতকেও ছাড়াইয়া গেল। যুক্তপ্রদেশের চৌরীচৌরাতে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া থানায় আগুনি লাগাইয়া দেয়, ফলে একুশ জন সিপাহি ও চৌকিদার জীবন্ত দগ্ধ হয়। মহাত্মাজী বুঝিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। তিনি আন্দোলন স্থগিত রাখিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে বসিয়া সব সংবাদই পাইতেছিলেন। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া সেই উদ্‌বেজিত আবহাওয়ায় রচনা করিলেন ''শিক্ষার মিলন''। ১০ আগস্ট তাহা শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের শুনাইলেন। যদিও শিক্ষার সমন্বয়ীকরণ তাঁহার মূল বক্তব্য, কিন্তু শ্রোতারা বুঝিলেন, সমকালীন রাজনীতির সমালোচনা প্রবন্ধটির প্রথমাংশের

অনেকটা জায়গা জুড়িয়া আছে। ইহার পাঁচদিন পরে ১৫ আগস্ট তিনি ঐ প্রবন্ধটি কলিকাতায় য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় পাঠ করিলেন—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। প্রকাশ্যেই তিনি গান্ধীজীর কর্মনীতির সমালোচনা করিলেন। তখন একচক্ষু সাইক্লোপ্স্-এর মতো অসহযোগ আন্দোলন একরোখা পথ ধরিয়া চলিয়াছে, উদ্ধত জাতিপ্রেম ফুঁসিয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজীর যে অসহযোগ আত্মিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে গ্রহণ লাগিল। শাসকশক্তিও সময় বুঝিয়া একটা আঘাতের বদলে দশটা আঘাত ফিরাইয়া দিল। অসহযোগ-অহিংসার দিকে পাশব হিংসা অলক্ষ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। শিক্ষার নামে সংকীর্ণ সংস্কার শিক্ষাসত্রের উন্মুক্ত বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিল। যাহা-কিছু য়ুরোপীয়, তাহাই শিক্ষাবিধি হইতে বর্জিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এই সংকটকালে নিজেকে নিরাপদ নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে গুটাইয়া লইলেন না, শিক্ষার সমস্যা আলোচনা করিতে গিয়া দেশের বৃহত্তর সমস্যা ও আদর্শভ্রান্তির দিকটিও ঐ প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন। মহাত্মাজীর কর্মপন্থার সমালোচনা এবং শিক্ষাকে পূর্ণতা দিবার জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের আনুকূল্য অনেকেই সহিতে পারিলেন না। আঁধির অন্ধকারে যাঁহারা ক্ষণকালের জন্য আবৃতচক্ষু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। সেই ক্ষোভ রোষের আকারে শরৎচন্দ্রের লেখনীমূলে আত্মপ্রকাশ করিল। ঐ বৎসরেই 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে' তিনি ''শিক্ষার বিরোধ'' শীর্ষক প্রব্ধ পড়িলেন যাহাতে রবীন্দ্রনাথের ''শিক্ষার মিলন'' প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা করিলেন, ভাষায় ব্যঙ্গের ঝাল-মসল্লাও মিশাইয়া দিলেন। যদিও যথোচিত বিনয়সহকারে বলিলেন, ''রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবল ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি''—কিন্তু এতটা সংকোচ ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও তিনি 'গুরুতুল্য পূজনীয়' রবীন্দ্রনাথের অভিমতের সমালোচনা করিতে গিয় ব্যঙ্গের ছিটেগুলি বর্ষণের ত্রুটি করিলেন না।

তিন

এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে প্রধানত কোন্ কোন্ যুক্তির সাহায্যে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছিলেন। দীর্ঘ কয়েকমাস ধনকুবের আমেরিকায় বাস করিয়া এবং রাজনৈতিক-বিক্ষোভ-উত্তাল য়ুরোপ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ঐ-সমস্ত দেশের কর্মযজ্ঞ ও শিক্ষাবিধি বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন দিক হইতে চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু প্রবন্ধটির গোড়ার দিকের অনেকটা অংশেই ছিল মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত, রাজনৈতিক আন্দোলনের সমালোচনা এবং ভারতীয় শিক্ষাসংস্কারের জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার উদার সহায়তা গ্রহণ। পশ্চিম দিকের জানালা বন্ধ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকর্মাদি হইতে সরিয়া আসিয়া দ্বৈপায়ন একপার্শ্বিকতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মঘাতী নীতি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতি যে প্রাচীন এশিয়ার মস্তকের উপর রাজত্ব করিয়া বিশ্বের যাবতীয় সুখ ও আনন্দ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ য়ুরোপ-আমেরিকা বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বাস্তববিদ্যার জোরে বিশ্বের কামধেনু দোহন করিতেছে। ইহার একটি মাত্র কারণ, তাহারা কোনো কিছু বাধার নিকট হার মানে নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকেই মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছে, এবং যজ্ঞদেবতার হাত হইতে যজ্ঞভাগ বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগেও ভারতবর্ষ বুদ্ধির ভীরুতা ও সংস্কারের

জড়তা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, আমরা যৌক্তিক বিজ্ঞানসাধনাকে সকলের উপরে স্থান দিতে পারিলাম না। তাঁহার মতে, এই মানসিক 'ইতি-উতি'-ভাব এবং বাহিরের ভীরুতাই আমাদিগকে শক্তিহীন নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বনিয়মকে বুদ্ধির নিয়মে আবিষ্কার করা, এবং সেই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ আশমানদারি হইতে দুনিয়াদারিকে রক্ষা করা—পাশ্চাত্য দেশ এই সিধা পথ ধরিয়া চলিয়াছে। অবশ্য সেই লৌহ পথটা যে সদা-সর্বদা নির্বিঘ্ন হইয়াছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। তাহাদের সভ্যতার রথ মাঝে মাঝে বিপথেও গিয়াছে, কোথাও ভোগের জাহাজ লোভোদ্ধত সমুদ্রের সফেন তরঙ্গে সলিলসমাধি লাভ করিয়াছে। তবে তাহারা কোনো বিপর্যয়কেই গ্রাহ্য করে নাই, মানুষ বা প্রকৃতি কাহারও নিকট হার মানে নাই। ভারতীয় পুরাকাহিনীতে আছে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। পুরাতন কাহিনীর তাৎপর্য এই যে, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দেবতাদের জানা ছিল না, মৃতকে বাঁচাইবার গূঢ় বিদ্যা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যই জানিতেন। তাই কচ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ যদি যথার্থ শিক্ষা পুরা করিতে চায়, তাহা হইলে দৈত্যগুরু অর্থাৎ পাশ্চাত্য গুরুর নিকট ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। যাহারা বিলাতি বিদ্যা বলিয়া স্বদেশী বিদ্যামন্দিরে তাহার ঠাঁই করিয়া দিতে চাহে না, তাহাদিগকে তিনি বুদ্ধির দিক হইতে কাপুরুষ বলিয়াছিলেন, ''এইরকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে-ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে বিদ্যা বাইরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।'' শাস্ত্র বলিয়াছেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয়কেই জানিতে হইবে, অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু পার হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করিতে হইবে। অবিদ্যা, অর্থাৎ যাহা অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, যাহা বাস্তব জীবনের বাধা মুক্তির জন্য প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাস্তব প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া যাহা সৃষ্টি হয়, নির্মিত হয়, তাহাও অনুশীলনের যোগ্য। কিন্তু অবিদ্যাই চূড়ান্ত লক্ষ্য নহে। ইহার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে, এইমাত্র। শোকদুঃখ, আধিব্যাধি, দারিদ্র্য, মহামারী—ইহাদের গ্রাস হইতে পার্থিব সত্তাকে রক্ষা করিতে হইলে অবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন। সেই বিদ্যায় যাহারা পারঙ্গম সেই আধুনিক শুক্রাচার্যদের আধুনিক যন্ত্রাগার হইতে সেই বিদ্যা আহরণের জন্য সচেষ্ট না হইলে অধ্যাত্মবিদ্যা দাঁড়াইবে কোথায়? ''অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তারপরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন। তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।'' অর্থাৎ তাঁহার মতে জড়বিশ্বে জড়ের প্রতিকূলতা এবং গোলামি হইতে বাঁচিবার জন্য ইহার বাস্তব রহস্য ভেদ করিতে হইবে। অবশ্য এ কথাও ঠিক পশ্চিমবিশ্ব জড়বিশ্বকে করতলগত করিতে গিয়া জড়েরই অধীন হইয়া পড়িতেছে—ইহাও একপ্রকার বিনষ্টির সাধনা। অতিভোগজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পশ্চিমের অপঘাতে মৃত্যু হইবার আশঙ্কা, খাদ্যাভাবজনিতশূন্য জঠরে ভারতবর্ষও মৃত্যুকে ঠেকাইতে পারিবে না। তবে তাহা অপঘাত মৃত্যু নহে, রোগে ভুগিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় শীর্ণ হইয়া ঘৃণ্য অবসান। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিতে ও মিলাইতে হইবে। দ্বৈপায়ন চেতনার উদ্ধত প্রতীক কিপলিঙের ছড়ার মতো 'পূর্ব পূবই, পশ্চিমও পশ্চিম, এই দুইজনে কখনো মিলিবে না' এ কথা রবীন্দ্রনাথ মানিতে পারেন নাই। দুই চেতনার স্বরূপটি তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ''পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে

রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে...।" বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা—উভয়কে মিলাইতে না পারিলে ভারতবর্ষ কী শিক্ষায়, কী রাজনীতিতে, কী সমাজবোধে, একপায়ে চলিবার চেষ্টা করিবে। ফলে পদে পদে পদস্খলন, পতন এবং অবশেষে মরণং ধ্রুব। রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তিক্রম ও 'থীসিস' কোনো দিক দিয়াই আপত্তিকর নহে। মহাত্মা গান্ধী, যিনি শুধু মহাত্মা নহেন, দেশের আত্মাও বটে, তিনি সমগ্র দেশকে সেই উদার পরিমণ্ডলে আহ্বান করিতে পারিতেন এবং মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক তাবিজ-কবচ-মাদুলির অনাবশ্যক ভার হইতে দেশের মনটিকেও রক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহার নিকট রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রত্যাশা। কিন্তু যখন কবি লক্ষ্য করিলেন, পুরাতন সংস্কারের যে জীর্ণ রথটা আধুনিক ভারতের রাজপথের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে, মহাত্মাজী অসহযোগ-অহিংস আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, চরকা এবং বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের ঢালাও আয়োজনের দ্বারা তাহাকেই খাড়া করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন; কলকারখানা, বিজ্ঞানের আবিষ্কারকেও ছোটো করিয়া তাহার ধূমনিশ্বাসী অভিশাপটাকেই বড়ো করিয়া দেখিয়া শিক্ষাকেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া অসহযোগের দড়াদড়ি কষিয়া বাঁধিবার পরামর্শ দিতেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আর কবিত্বের হর্ম্যে নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, এই সংস্কারান্ধ দৃষ্টির সমালোচনা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, দুর্বুদ্ধিই ন্যাশনালিজ্‌ম্-এর ছদ্মবেশে য়ুরোপকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে। পূর্বদেশেও সেই দুর্বুদ্ধির নির্বাধ প্রকাশ ঘটিতেছে। য়ুরোপ স্বাজাত্যের অহমিকায় প্রাচ্য বিশ্বে নানাপ্রকার অমানুষিক ব্যাপার ঘটাইতেছে। তাহারা গ্রাস করাকেই ঐক্য বলিয়া জানিয়াছিল, জাতীয় আত্মম্ভরিতাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই মহাযুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে হানা দিল, য়ুরোপের বহু মানুষ কামানের খাদ্য হইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ দিল। শান্তিপর্বে কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, আগামী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা সন্ধিপত্রের ছত্রে ছত্রে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ তাহারা পূর্বকে মানব শিকারের অভয়-অরণ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। এইখানেই তাহাদের পাপবৃত্তি মধ্যযুগীয় খৃস্টান ধর্মের সাধনা, রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের সংস্কারমুক্তি—সব-কিছুকেই লেহন করিয়া লইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকার পর তাহারা শান্তিভিক্ষু হইয়াছে। যখন তাহারা সভয়ে লক্ষ্য করিল, তাহাদের লোভের অজগরটা শুধু পূর্বদেশকে গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহাদেরও জঠরে পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখনই তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রশ্ন করিল, ততঃ কিম্? তাহারা মঙ্গলকে আঘাত করিয়াছে, তাই তাহাদের এই শাস্তি। আমরাও কি তাহা করি নাই? এখনো তো যুক্তি, বিবেক, সত্যকে ঝাঁটাইয়া বিদায় দিয়া তামসী পূজার জয়ধ্বনি করিতেছি না? রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে নানা দিক হইতেই সমস্ত প্রসঙ্গের পুনর্বিবেচনা করিয়াছেন। য়ুরোপ তাহার ঘরের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত ও উদ্‌বিগ্ন। তাহারা পূর্বপশ্চিমে ভেদ করিয়াছিল, অজগরের মতো গ্রাস করাকেই এক করা মনে করিয়াছিল এবং প্রাচ্যবিশ্ব তাহাদের ঐক্যনীতি মানিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া গালি দিয়াছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিকলাঙ্গ দেহ, ছিন্নভিন্ন মন ও ভাঙাচোরা সমাজনীতি লইয়া তাহারা অন্য পন্থার সন্ধান করিতেছে। বোধ হয় ওদেশে এখনো কিছু সৎ মানুষ অবশিষ্ট আছেন, এখনো তাঁহারা মনে করেন, জাতিবৈর দূর করিয়া ওয়েন্ডের উইল্‌কির *One World*-এর মতো এক-ভুবন গড়িতে গেলে ভারতবর্ষকে সঙ্গে লইতে হইবে। কিন্তু যখন তাহারা দেখে, আধুনিক ভারতবর্ষের লোকেরা তাহাদেরই স্কুলে শেখা বিদ্যার অর্ধেকটারও

কম অর্জন করিয়া তাহাই উদ্‌গীরণ করিতেছে, তখন তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারে, ঘরে তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে, বাহিরকেও নষ্ট করিয়াছে। ইহার সদুপায় কোথায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার মধ্য দিয়া দুই বিরোধী বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের বাতাস দিয়া ভিজা কাঠে আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করিলে শ্বাসরোধী ধূমশিক্ষা জীবনের স্বভাববৈশিষ্ট্যকে ঢাকিয়া ফেলিবে। পশ্চিম বিদ্যার নকলনবিশি নহে, পশ্চিম হইতে জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু বিশ্বাস রাখিতে হইবে আত্মশক্তির উপর। ''মোক্ষমুলর বলেছে আর্য, তাই শুনে সব ছেড়েছি কার্য''—এ-জাতীয় আত্মপ্রসাদ একপ্রকার হীনমন্য দাসমনোবৃত্তির পরিচায়ক। শুধু আমাদের জন্য নহে, 'অনাগত বিধাতা'দের জন্যও এখনই একটি সমন্বয়মূলক শিক্ষাদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিমের বস্তুদর্শন এবং ভারতের আত্মদর্শন, পশ্চিমের ভোগ এবং ভারতের ভোগবিরতি, পশ্চিমের মোহ এবং ভারতের মুক্তি যতই স্বতোবিরোধী হোক-না কেন তাহাদের মধ্যেও মিলনসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যদি ভারতবর্ষ সেই সমন্বয়ী শিক্ষা ও সাধনাকে জাতির মর্মমূলে সঞ্চার করিতে পারে, তাহা হইলে দারিদ্র্যের কলঙ্কচিহ্ন ধারণ করিয়া ভারতবর্ষকে পশ্চিমের দুয়ারে দাঁড়াইতে হইবে না। তাহার বাহ্যিক ঐশ্বর্যের হাঁকডাক না থকিলেও রহিয়াছে অন্তরের ঐশ্বর্য। যুরোপ যেদিন সেই সত্যটি আবিষ্কার করিবে সেইদিন সে অপঘাত হইতে মুক্তি পাইবে। ভারতবর্ষও যেদিন আধ্যাত্মিক তামসিকতা ত্যাগ করিয়া তাহার সনাতন ঋক্‌থ-কে হাতে পাইবে, তখন সেও মৃত্যুসাগর মন্থন করিয়া অমৃতাত্মাকে লাভ করিবে। এই দুয়ের মিলন চাই। আমরা যখন আপনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকি, তখনই আমাদের আত্মা কলুষিত হয়। তখন আমরা দীন, দয়াপ্রার্থী, ভীরু ভিখারী মাত্র। ভিখারীকে কেহ শ্রদ্ধা করে না। পশ্চিমের কাছে আমাদের ভিক্ষাপাত্রটা মেলিয়া ধরিলে তাহারা কৃপাভরে তাহাতে দুই-চারিটা পাউন্ড ডলার ফেলিয়া দিবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যেদিন বলিতে পারিবে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাধান্য উভয়েরই লক্ষ্য হওয়া উচিত; দাবাইয়া দলিয়া টিপিয়া পিষিয়া সত্যের কণ্ঠরোধ করা যায় না তখনই সে আপনাকে পাইবে। পশ্চিম প্রথম মহাযুদ্ধের আগুনে ঝলসাইয়া এই সত্যটা বোধহয় খানিকটা বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে কি? হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হইত না এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কবরের উপর ঘাস গজাইবার পূর্বেই আবার 'গণকবরে'র ক্ষুধার্ত গহ্বর খুঁড়িবার প্রয়োজন হইত না, বিদায়মুহূর্তে বিষণ্ন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় তাহার আভাস পাইয়াছিলেন।

চার

শিক্ষার মূল আদর্শ কী? প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিক্ষার মূল আদর্শ, মানুষের প্রকাশকে অব্যাহত রাখা, আত্মাকে প্রচ্ছন্নতা হইতে মুক্তি দেওয়া এবং একের সঙ্গে অপরকে মিলাইয়া দেওয়া। মহাত্মাজী-পরিকল্পিত অসহযোগনীতি প্রায়ই সেই কথাটা ভুলিয়া গিয়া একপার্শ্বিকতাকেই সমগ্রতা বলিয়া ভুল করিয়াছে। এই নির্মম সত্য কথাটা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেই-বা এমন করিয়া বলিতে পারিতেন? শিক্ষার মধ্য দিয়া নবযুগের উদ্‌বোধন করিতে হইবে, তাঁহার ''শিক্ষার মিলন'' প্রবন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ না রাখিয়াই বলিলেন, ''সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা

হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব...।" তাঁহার মন্তব্য ও অভিমত তাঁহার ব্যক্তিগত চিন্তা ও পরীক্ষামূলক শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষার খঞ্জত্ব অনেকটা দূর হইতে পারে—যদি আমরা তাঁহার উপদেশ ও প্রস্তাব আংশিকভাবেও গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার এই সুযুক্তিপূর্ণ অভিমত কাহারও কাহারও কাছে বড়ো বেশি আবেগবহুল ও কবিত্বময় বলিয়া উপেক্ষিত হইল। এই প্রবন্ধে প্রকাশ্যে এবং পরোক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের প্রশংসা, ভারতীয় চিত্তের জড়তা ও গতানুগতিকতার নিন্দা এবং মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনায় কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার যুক্তিপূর্ণ অভিমতেরও সমালোচনা করিয়াছেন, এবং সে প্রতিবাদ নিতান্ত নিরামিষ ধরনের ছিল না। শরৎচন্দ্র এই দলের বক্তব্যগুলি যুক্তির ক্রমানুসারে সাজাইয়া রবীন্দ্রসমালোচনায় নামিয়া পড়িলেন। আমাদের দেশের সমালোচনার অর্থ ছিদ্রান্বেষণ। শরৎচন্দ্র তাহার ব্যতিক্রম নহেন।

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর কর্মপন্থার সমস্তটা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। চরখা, অসহযোগ, বিদেশী বস্ত্রের দাহকর্ম প্রভৃতি ব্যাপার কবিগুরুর কাছে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই আন্দোলনের পক্ষে প্রচুর জনসমর্থন সত্ত্বেও তিনি সমস্ত আয়োজনের পশ্চাতে দুর্বুদ্ধির পদক্ষেপ শুনতে পাইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন'-এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় রচনা করিলেন 'শিক্ষার বিরোধ'। রবীন্দ্রনাথের অনেক যুক্তি ও সিদ্ধান্ত তাঁহার মনোমত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মনেও তিক্ততা ঘনাইয়া আসিয়াছিল—ইহার মূলে ছিল অযৌক্তিক ক্রোধ ও চণ্ডীমণ্ডপে-অনুষ্ঠিত গ্রাম্য দলাদলির ঘোঁটপাকানো কোন্দল। রবীন্দ্রনাথ-উপস্থাপিত শিক্ষার আদর্শের অন্তরে প্রবেশ করিতে অনেকেই বাধা পাইলেন। ফিরিঙ্গী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক এই ভাবিয়া খুশি হইলেন যে, রবীন্দ্রনাথ এতদিনে বুঝিয়াছেন যে পশ্চিমের শিক্ষা ভিন্ন ভারতের আশা নাই। এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্র চটিলেন বটে, কিন্তু তাহার কোনো কারণ ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে-যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাকে প্রতিযুক্তির দ্বারা ফিরানো যায় না। পশ্চিম-বিশ্ব প্রাচ্যদেশ অপেক্ষা অনেক আগাইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ কোথায়? তাহারাই তো আমাদের কাঁধের উপর চড়িয়া ছড়ি ঘুরাইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবাধ অনুশীলন এবং অতিশয় pragmatic বুদ্ধির জোরে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ আনন্দ তাহাদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। কামধেনুটি দোহন করিয়া যাবতীয় ক্ষীর সর ননী ভোজনের একমাত্র অধিকার যেন তাহাদেরই। আমাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে ধেনুটির দানাপানি জোগাইবার ভার। ইহার কী কারণ? ইহার কারণ—একদিকে তাহারা পশুবল ও হীন স্বার্থবুদ্ধিতে উদ্ধত, আর-এক দিকে তাহারা অগ্রপশ্চাদবোধযুক্ত অতন্দ্র বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী, তাহার সহিত হাত মিলাইয়াছে বিজ্ঞানমনস্কতা ও নব নব সৃষ্টির কলাকৌশল। সুতরাং বৈরাগ্যের কন্থাধারী ভারতবর্ষকেও তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানলব্ধ সত্যগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কোনো দিক দিয়াই অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তাঁহার গান্ধী-প্রতিকূলতা ও স্বরাজ-আন্দোলন সম্বন্ধে সংশয় শরৎচন্দ্রকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। ক্রোধ অনেক সময়ে আমাদের হিতাহিত জ্ঞান কাড়িয়া লয়, তখন কুযুক্তি-অযুক্তিকেই সুযুক্তি বলিয়া মনে হয়। সদুপদেশ নিম্বতিক্ত স্বাদ সৃষ্টি করে। তাই শরৎচন্দ্র যুক্তিতর্কের ধার না ধারিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

শরৎচন্দ্রের ধারণা, পশ্চিম-বিশ্ব যে সুখে স্বস্তিতে জীবন যাপন করে, অথচ আমরা উপবাসী আছি ইহার সব দায় তাহাদের। তাহারা যে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি করিয়াছে, মানুষকে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে, শাসনকার্যে জনবাণীকে ঈশ্বরবাণী ('vox populi vox dei') বলিয়া মানিয়াছে

তাহা কি শুধু মুনাফা শিকারের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে? শরৎচন্দ্র য়ুরোপের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকিলে দেখিতেন, রেনেসাঁস হইতে রিফর্মেশন পর্যন্ত—তাহারাই মানব-মুক্তির পথ খুলিয়া দিয়াছিল। চিত্তের বাধা ও প্রকৃতির প্রতিকূলতা—সব-কিছুকেই তাহারা জয় করিয়াছিল। তাহাদের বিদ্যাই তাহাদিগকে ভুবনের ঘাটে ঘাটে পণ্যের তরী বাহিয়া লইতে সাহায্য করিয়াছে। অবশ্য সে বিদ্যাকে যখন তাহারা কালা-ধলার ব্যবধান হিসাবে ব্যবহার করিল তখনই তাহাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে গ্রহণ লাগিয়াছে, তাহাদের নিজেদের মধ্যেই রক্তবীজের জন্ম হইয়াছে; তাহার অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়াকে মহাযুদ্ধের কবরখানায় খাদ্য-সন্ধানে ঘুরিতে দেখিয়া উপনিবেশ-শিকারীর দল চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা যে বিদ্যা দিয়া বিশ্ব জয় করিয়াছে, তাহা শাস্ত্রমতে পরাবিদ্যা না হইলেও, তাহা তাহাদের নিজস্ব পরিশ্রমলব্ধ বিদ্যা, ধার করা ব্যাপার নহে। এই মোটা কথাটা শরৎচন্দ্র কেন বুঝিতে চাহিলেন না তাহার কারণ স্পষ্ট নহে। রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিবাদ করিতে হইবেই বলিয়া যেন তাঁহাকে কলম ধরিতে হইয়াছে, এবং সেজন্য অযুক্তি-কুযুক্তি ও অযথার্থ কথার সাহায্য লইতে হইয়াছে। তাঁহার মন্তব্য : ‘‘কবি জোর দিয়ে বলেছেন, একথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাঁদের সত্যবিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেইরকম দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয়করা বিদ্যাটা সত্য শিক্ষা, অতএব শেখা চাই-ই একথা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না।” শরৎচন্দ্রের এ উক্তি কতটা বালকোচিত তাহা নিজে তিনি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বন্ধুমহলও কেন তাঁহার মন্তব্যের দুর্বলতা দেখাইয়া দেন নাই তাহাও জিজ্ঞাস্য। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মপন্থা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই, তাই কি শরৎচন্দ্রের এই অযৌক্তিক আক্রমণ? খৃস্টজন্মের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষ কেন বার বার পরপদানত হইয়াছে সে কথাটাও শরৎচন্দ্র তলাইয়া দেখিলেন না। পাশ্চাত্য গুরুমহাশয়গণ কালা পড়ুয়াদের কিছুই শিখাইবে না, কারণ তাহা হইলে সে-বিদ্যা কুলত্যাগ করিয়া নেটিভের ঘরে গিয়া সংসার পাতিবে। কিন্তু একালের ভারতীয়গণ কালোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান কারুবিজ্ঞানের শিক্ষা কাহার কাছে পাইল? মনু-পরাশরের খুঁট ধরিয়া একালের ভোজসভায় ডাক পাওয়া যাইবে কি? বিদ্যার জাতি নাই, অপরের ঘরে উঠিলেও তাহার কুলভঙ্গ হয় না। বরং অপরের ঘরে না উঠিলে তাহার সতীত্বের পরীক্ষা হয় না। কারণ চতুঃষষ্টি-কলাবিদ্যা বহুবল্লভা। ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য জাতি জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়াছে—কেবল পূর্ব দুনিয়া লুণ্ঠনের সাহায্যে নহে। আফগান লুঠেরাগণ অশ্বপৃষ্ঠে ও শকট বোঝাই করিয়া ভারতের ধনরত্ন লুঠিয়া লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের এই মানুষগুলি ধর্মীয় কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া কোনো দিন আধুনিক হইতে পারে নাই। একদা প্রচণ্ড শক্তিশালী অটোমান তুর্কী পূর্ব-য়ুরোপকে নতজানু হইতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগীয় সংস্কার ত্যাগ না করার জন্য তাহারা “sick man of Europe” বলিয়া সকলের পরিহাসের পাত্র হইয়া রহিল, কামাল আতাতুর্কের প্রচণ্ড প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা এখনো পুরাপুরি আধুনিক হইতে পারে নাই। কারণ তাহারা এখনো মধ্যযুগীয় সংস্কারের মধ্যে বাস করিতেছে।

পাশ্চাত্য রাজনীতি শোষণের নামান্তর মাত্র, কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সেই শোষণের প্রধান হাতিয়ার নহে। অবশ্য ধুরন্ধর রাজশক্তি বিজ্ঞানকে মানুষ-মারা কল হিসাবে ব্যবহার করিলে সে দায় বিজ্ঞানের নহে। ‘‘তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচা”-য় তরবারির গৌরব লাঘব হয়, গণ্ডদেশের প্রতিও সুবিচার করা যায় না। পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাইয়া মরুবালুরাশির অভ্যন্তরে-সুপ্ত ভোগবতীকে টানিয়া

বাহির না করিয়া তাহা যদি হিরোশিমা নাগাসাকির নিরপরাধ নরনারীর শির লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা হয়, তবে সে পাতক কাহার উপর বর্তাইবে? বোমাবারুদের সাহায্যে দুর্গম পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া পথ কাটা যায়, বদ্ধ জলধারাকে মুক্তধারা করা যায়। কিন্তু তাহা যদি দরিদ্র কৃষকের ভুট্টাক্ষেত ভাসাইয়া লইয়া যায়, ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, বিষবাষ্পে মানুষের গলনালী ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি বারুদের ফরমুলা আবিষ্কারক ফ্রায়ার রোজার বেকন ও শোয়ার্ট্‌র্জ-এর কঙ্কালকে কবর হইতে তুলিয়া গ্যাসচেম্বারে পুরিতে হইবে? অথবা আরো পিছাইয়া গিয়া বারুদের অজ্ঞাতনামা চীনা আবিষ্কারককে ইতিহাস ঢুঁড়িয়া বাহির করিয়া তাহার স্মৃতিটাকে রাস্তার নিকটতম আলোকস্তম্ভে ঝুলাইয়া অবমাননা করিতে হইবে? ও-দেশের পণ্ডিতগণ প্রাচ্যকে যে তাহাদের বিদ্যার অংশ দিবে না, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কোনো সন্দেহ নাই। অথচ প্রাচ্যদেশের আধুনিক সাজসরঞ্জাম পাশ্চাত্য বিদ্যালয় হইতেই পাওয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র অবেশেষে প্রশ্ন করিয়াছেন, ''কথা উঠতে পারে, মানবকল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি? হয়েছে বৈকি, কিন্তু সে নিতান্তই by-product-এর মত বলা যেতে পারে।" এই মন্তব্যও মহাত্মাজীর আধুনিক যন্ত্রশালা বিরোধিতার মতো। তিনি কলকারখানা ও যন্ত্রতন্ত্রকে মহাপাপ বলিয়াই মনে করিতেন। শরৎচন্দ্রও সেই একই ধরনের অবৈজ্ঞানিক মন্তব্যের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। ''সে নিতান্তই by-product" ইহার অর্থ বোধ হয় এই—পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য নরহত্যা, অর্থাৎ প্রাচ্যদেশের মানুষ নিকাশ করা, উপকার ছিটেফোঁটা যাহা হইয়াছে, তাহা by-product বা গৌণফল মাত্র। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ভারতের উপকারের চেয়ে অপকারই করিবে। ইহাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষ যে কোনোদিন মানুষ হইয়া উঠিবে সে সম্ভাবনা বিরল, রবীন্দ্রনাথও তাহা কিয়দংশে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তিনি তাহার উপর আর-একটু বিশ্বাস করিতেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের জাতি নাই, ভারতীয়েরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে জাতিগঠনের সুফলগুলি আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু কাহার অপরাধে আমাদের এই দুর্গতি? আমাদের শিক্ষা আশ্রয় পাইতেছে না কেন? ইহা কি পাশ্চাত্য গুরুমহাশয়দের কারসাজি? অথবা আমাদের বুদ্ধিগত অক্ষমতা? শরৎচন্দ্র তাহার কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া শেষপর্যন্ত অদৃষ্টের উপর সব অপরাধ চাপাইয়া দিয়াছেন—''আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানবজীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তাহার দৃষ্টির বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোনো হাত নেই...।" অদৃষ্টের উপর একান্ত আশ্রয় অসহায় পরাভূত দীনসত্ত্ব মনের শেষ অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথ যদি অদৃষ্টবাদ বাদ দিয়া থাকেন, তবে তাহা ভালোই করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের মন্তব্যটি স্মরণীয়, ''দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না।" এ মন্তব্য নির্জীবের কণ্ঠেই মানায়। শরৎচন্দ্র বলিতেছেন, tradition বাদ দিয়া পাশ্চাত্য গুরুর বাণী শিরোধার্য করিলে তাহা একপ্রকার আত্মহত্যাই হইবে। রবীন্দ্রনাথও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সব-কিছু দেওয়া-নেওয়াকে নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা তো তিনি সারা জীবন ধরিয়া প্রচার করিয়াছেন। শুধু শরৎচন্দ্র অপেক্ষা আর-একটু আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন, ভারতের ট্রাডিশন অর্থাৎ বহুকালাগত ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক আধুনিক সংস্কার—দুই ধারাকেই আমাদের শিক্ষাবিধানে সংযুক্ত করিতে হইবে। শরৎচন্দ্র প্রধানত কথাকার ও মানবজীবন-শিল্পী। চিন্তা বা বুদ্ধিবাদ তাঁহার প্রধান অবলম্বন নহে। তাই ভাবাবেগে উত্তেজিত হইয়া, কোন্‌টি যুক্তি আর কোন্‌টি অযুক্তি তাহা তাঁহার খেয়াল থাকিত না। ঐ প্রবন্ধেই তিনি উগ্রজাতিপ্রেমের উজানে ভাসিতে ভাসিতে কূল ছাড়িয়া কোথায়

ভিড়িয়াছেন, ভাবিলে তাঁহার যুক্তির অসারতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগে না। ট্রামগাড়ি, মোটর, বৈদ্যুতিক পাখা এবং বিদ্যুৎ-বাহিত আলোর মালা ও কলকারখানা—"ঐ যে বিদেশী সভ্যতার তোড়জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেছি, ওর কোনোটা কি আমাদের যথার্থ সম্পদ?" তাঁহার উত্তর—নিশ্চয় নহে। এগুলি আমাদের চেষ্টায় এদেশে প্রস্তুত করিতে পারিলে শরৎচন্দ্রের নজিরে ইহার উদ্ভাবক বিলাতি বিদ্যাকে গালি দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার বিচিত্র উক্তি আবার উদ্ধার করি, "ওসকল আমরা সৃষ্টি করিনি, করতেও জানি নে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা; আজও ওসকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ ওর কোনোটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে নি।" অথচ দেখা যাইতেছে, তাঁহার সময়েও অনেক ভারতীয় শিক্ষার্থী য়ুরোপ-আমেরিকা- জাপানে গিয়া বিদেশী চিকিৎসাশাস্ত্র, পূর্তবিদ্যা, বিভিন্ন প্রকার কারিগরিবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছে এবং নানাভাবে দেশকে স্বয়ম্ভর করিতে চেষ্টা করিতেছে। একালে বাস করিয়া রেড়ির তেলের শেজ জালাইয়া, হাতপাখা টানিয়া, কবিরাজী বাকল সংগ্রহ করিয়া, মলিন উত্তরীয়খানি কাঁধে ফেলিয়া চণ্ডীমণ্ডপ উত্তপ্ত করিলে দেশ আগাইবে, না পিছাইয়া পড়িবে, তাহা শরৎচন্দ্র ধীর মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই যে-কোনো বিদেশী বস্তুকে তিনি "আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জনা" —বলিয়া ঘৃণাপূর্ণ কোপকটাক্ষে ফিরাইয়া দিয়াছেন। ভাগ্যে গোটা দেশ তাঁহার মতে মত দেয় নাই এবং তাঁহার ভর্ৎসনাবাক্যে সংকুচিত হইয়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয় নাই, লেবরেটরি, লাইব্রেরি, যন্ত্রশালায় তালা ঝুলায় নাই। তাহা হইলে সমগ্র দেশ আরো এক শতাব্দী পিছাইয়া যাইত এবং মধ্যপ্রাচ্যের মতো বিশ্বের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিত। তবে শরৎচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধের শেষের দিকে এমন একটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও সে সম্বন্ধে বেশ খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেন নাই। কথাটা কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার মতো।

প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজ শাসনে বাস করিয়া ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেকটা গ্রহণ করিয়াছে, কোথাও কোথাও কিছু মৌলিক প্রতিভারও পরিচয় দিয়াছে, কোথাও-বা নকলনবিশির উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। তবু পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেকটা আয়ত্ত করিয়া ভারতবর্ষ স্বল্পপরিমাণে ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কি আগাগোড়াই 'one way traffic' হয় নাই? শরৎচন্দ্র এই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে" ইহা কি য়ুরোপ-ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস হইতে প্রমাণ করা যাইবে? আমরা পাশ্চাত্যের নিকট অঞ্জলি ভরিয়া অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিদ্যায় তাহাদের পাঠশালার পড়ুয়া হইয়া পাত পাতিয়া বসিয়া গিয়াছি। পশ্চিমের গুরু পূর্বদেশের ছাত্রকে হেলাভরে যাহাই দিন-না কেন, তাহা হইতেও আমরা আধুনিক জগতের বাঁচিবার মতো বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছি। কিন্তু আমরা তো হাত ভরিয়া গ্রহণ করিলাম, তাঁহারাও নাহয় ঝুলি ভরিয়া ভিক্ষা দিলেন, কিন্তু ইহার সমস্তটাই কি একপেশে হয় নাই? দুইশত বৎসর ঘর করিয়া, তাহারা আমাদের কোনো খোঁজ রাখিল না, টগরের মতো নন্দমিস্ত্রীকে হেঁসেলে ঢুকিতে দিল না, আমাদেরও যে একটা জীবন আছে, আছে তাহার নানা আলোছায়ার লীলা, তাহার সহিত তাহারা পরিচিত হইবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাইল না, শুধু শ্বেতজাতির ভুতের বোঝা বহিয়া মরিল ভাবিয়া আত্মসন্তুষ্টিতে ফুলিয়া উঠিল, এ সংবাদ শাসক ও শাসিত— কাহারও পক্ষেই শুভকর নহে। দুই-চারিজন পুরাতাত্ত্বিক, ইন্ডোলজিস্ট, ভারতপ্রেমিক এবং ক্বচিৎ কদাচিৎ হিন্দু স্টুয়ার্ট, উইলকিন্‌স্,

হোরেস হেম্যান উইলসন প্রভৃতি দুই-চারি জন খাঁটি ব্রিটন হয়তো ভারতের সাধনা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনো কোনো প্রাচ্যবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষক ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বড়ো মাপের গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে য়ুরোপ-আমেরিকার দু-চার জন ভারতপ্রেমিকের মুখে রামমোহন, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত শাসককুলের কোনো সম্পর্ক ছিল না। শরৎচন্দ্রের এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত : ''আমাদের সংসর্গে তার বহুযুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি। আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে রেখেছে যে, কোনোদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায়নি।'' কথাটা শরৎচন্দ্র যেমন ভাবেই বলুন-না কেন, ইতিহাস ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিবে। বাস্তবিক সুদূর শ্বেতদ্বীপের অধিবাসী নর্ডিক জাতির ধ্বজাবাহী ব্রিটনের নীলচক্ষু ও নীলশিরায় যে আভিজাত্য বহমান, তাহার দম্ভে তাহারা কখনো কালা-আদমিকে 'ভাই-বেরাদর' বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এমন-কি, খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিলেও কালা খৃস্টান ও মেটে খৃস্টান কোনো দিন খাঁটি ইংরাজের বৈঠকখানায় প্রবেশাধিকার পায় নাই, অন্তঃপুর তো দূরস্থান। শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজক ব্রাউন ধর্মযাজককে কখনো সমপর্যায়ভুক্ত মনে করেন নাই, তাই কোনো কোনো বাঙালি খৃস্টান ধর্মযাজক ব্রিটিশ চার্চের মতো ইন্ডিয়ান চার্চের পরিকল্পনা করিয়া শ্বেত প্রভুদের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, একজন পিয়ার্সন, একজন অ্যান্ডরুজ, একজন লেভি সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির প্রতিভূ নহেন। তাঁহারা যে-মাপের মানুষ তাহাতে তাঁহাদিগকে বিশ্বনাগরিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা যেখানে গিয়াছেন, তা সে জুলু-বান্টু-হটেনটট হউক, মাওরি হউক বা ভারতবর্ষের অরণ্যচারী আদিবাসীই হউক, সকলকেই আপন করিয়া লইতে পারিয়াছেন। কিন্তু শাসক ইংরাজ কি কখনো ভারতবর্ষ হইতে কোনো চিত্তসম্পদ, কোনো সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছে? কোনো কোনো অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী 'হোমে' ফিরিয়া যাইবার সময়ে কিউরিও শপ, যাদুঘর ও বৈঠকখানার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য পুরাতন পুঁথিপত্র, মুদ্রা, বিবসনা কালীমূর্তি ও স্ফীতোদর যক্ষকে সমাদরে স্থান দিয়াছে। ঐশ্বর্য ও সংগ্রহের দম্ভই তাহার মূল প্রেরণা, ভারতীয় চেতনা ও হৃদয়ের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিতেন যে, শাসক ইংরাজ যতই অমানুষ হউক, তাহাদের মধ্যে এমন দুই-চারি জন ছিলেন যাঁহাদিগকে জাতিগত ক্ষুদ্রতার দম্ভ স্পর্শ করে নাই। তাহা সত্য বটে। কিন্তু সংখ্যায় তাঁহারা কয়জন? বাদবাকি শাসক ইংরাজ এবং ইংলন্ডের সাধারণ নাগরিক ভারতবর্ষকে কী চক্ষে দেখিত, এখনো দেখিয়া থাকে, তাহা এমন নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ যে, ইতিহাসে তাহার পাঁতি খুঁজিবার প্রয়োজন নাই। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ এমন একটি পরিমণ্ডল হইতে সমস্ত শিক্ষা-ব্যাপারটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, কয়েকটি অসামঞ্জস্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পর্বতশিখর হইতে সমভূমির সবই একপ্রকার বলিয়া মনে হয়। মাটিতে নামিলে তবে ছোটোবড়োর পার্থক্য বুঝা যায়। সেই দিক হইতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য অযৌক্তিক নহে।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের চারি বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথও মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যান। তার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাটিয়া গেল, শিক্ষা লইয়া অনেক কমিশন বসিল, বিদেশ হইতে বহু বিশেষজ্ঞ আসিলেন, ভারী ভারী রিপোর্ট ছাপা হইল, তদনুসারে কিছু কাজও শুরু হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ''শিক্ষার মিলন'' প্রবন্ধে পূর্ব ও পশ্চিমের যে মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এখনো কি তাহার পুরা রূপটা ফুটিতে পারিয়াছে? শরৎচন্দ্র যেজন্য সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা কি অন্তর্হিত হইয়াছে?

রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া শিক্ষা বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছেন, অমূর্ত শিক্ষাকে যেভাবে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে রূপময় করিতে চাহিয়াছিলেন, উপাদান ও আয়োজনকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার আন্তর সত্তাটিকে ছাত্রদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, একালের আকাশস্পর্শী বিশাল ভবনের মধ্যে হাজার উপকরণ সাজাইয়া যে শিক্ষা-সরস্বতীকে স্থাপন করা হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গে বারাণসি শাড়ি, না কৃত্রিম তন্তুজাত বনেট, কোন্‌টি অধিকতর মানানসই হইবে তাহা লইয়া চিন্তার অবধি নাই। তবে যদি শিক্ষা-নিগমের কর্তৃস্থানীয়েরা মাঝে মাঝে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে হয়তো কোনো দূর-ভবিষ্যতের নবশিক্ষার্থীরা শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য বুঝিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, মানুষের অন্তর্জীবনে সুপ্ত দেবভাবকে জাগাইয়া তোলাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ‘দেবভাবের’ অর্থ—মানুষের বৃহৎ সত্তা, তাহার আদর্শ স্বরূপ—অসীমকে সীমায়িত করিবার জন্য মানসিক বিনয় বা ডিসিপ্লিন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরিয়া সেই বিষয় বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন, হাতেকলমে কাজ করিয়া শিক্ষাকে জীবনের মধ্যে পুনর্জীবিত করিতে চাহিয়াছেন, আমরা তাহার কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, অথবা আদৌ কোনো চেষ্টা করি নাই, তাহা ভবিষ্যৎ বিচার করিবে।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতি-সান্নিধ্য বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক বিশেষজ্ঞ সমালোচক একটি প্রাচীন কবিবচনকে স্মরণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'সকল ভুবনোপজীব্য' কবি। রবীন্দ্রনাথের উপজীব্য 'ভুবনের' মধ্যে বৈষ্ণব 'ভুবনও' ছিল, একথা স্বীকৃত হয়েছে সমালোচকদের দ্বারা। মতভেদ কেবল গ্রহণের পরিমাণ ব্যাপারে।

বৈষ্ণব কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি নিয়েছেন তার অল্প-বিস্তর বিবরণ সকলেই পাবেন বিভিন্ন রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনার গ্রন্থে। আমি একটি সুখবর জানাতে পারি—বিষয়টি একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হয়েছে। লেখক ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতো মনস্বী ব্যক্তি। সামান্য অপেক্ষায় এই প্রসঙ্গের প্রায় সমস্ত কথাই জানতে পারব। (গ্রন্থটি ১৩৬৮ সালে 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান' নামে প্রকাশিত হয়েছে)।

বলা বাহুল্য সেই গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে এমন একটি গুরু বিষয় সম্বন্ধে কোন দ্রুত উক্তি করতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। সুতরাং সামান্যভাবে কিছু কথা বলব, সেই ভালো।

আলোচনার অনেকগুলি বিষয় আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। যেমন ধরা যাক, বিদ্যাপতির রচনার ধ্বনিগুঞ্জন, যা সাক্ষাৎ বিদ্যাপতির ভাষা থেকে এবং বিদ্যাপতির ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ব্রজবুলি ভাষার মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রনাথকে যৌবন-সূচনায় একেবারে মাতিয়ে তুলেছিল। যৌবনরাগ তিনি বেঁধেছিলেন ব্রজবুলি ভাষার তারে; রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ হয়ে অভিনব বিদ্যাপতি হবার রোমান্সে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। 'এত বড়ো' একটা প্রসঙ্গ আমি বাদ দেব—বাদ দেব 'এত বড়ো' বলেই, কারণ ধ্বনিসিদ্ধ কবির শ্রবণ-সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পদাবলীর ঋণ—গভীর ও সূক্ষ্ম গবেষণার বিষয়।

আর বাদ দেব, যেটি কোনোমতে বাদ দেবার বস্তু নয় সেটিকে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোন্ কোন্ স্থানে বিদ্যাপতির ভাষা, অলঙ্কার ও চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এইটেই মূল আলোচনার বিষয়—কিন্তু আমার এই উচ্চাশাহীন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তা হতে পারে না।

বিদ্যাপতির প্রতিভার বহুমুখিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার তুলনা করেছেন ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর সম্পাদিত বিদ্যাপতি পদাবলীর ভূমিকায়। বিদ্যাপতির প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার একাংশের তুলনা আমি করেছি আমার 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' গ্রন্থে। বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথের শিবের মধ্যে তুলনামূলক বিচারও সেখানে আছে। সে সকল প্রসঙ্গও এখানে আলোচ্য নয়।

কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজনের একটি বিষয়কে বাদ দেওয়া যায় না—বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের ব্যাপারটিকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ বিষয়ের তথ্য সঙ্কলন করেছেন। তথ্য নিবেদনে তাঁকেই মোটামুটি অবলম্বন করব।

প্রথমে আনা যাক রবীন্দ্রনাথের ''জীবনস্মৃতি।'' ''জীবনস্মৃতি'', রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ''জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।'' রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ইতিহাসই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়। জীবনস্মৃতির কিছু অংশ—

> ''শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে (১৮৭৪-৭৬) আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।''

অতঃপর আছে ভানুসিংহের পদাবলী রচনার বিবরণ। 'মৈথিলী মিশ্রিত দুর্বোধ ভাষা' বালক রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং অপরিচিত প্রাচীন কাব্য-ভাণ্ডারের 'দুর্গম অন্ধকার' থেকে রত্ন তুলবার বাসনার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকেও 'রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার' বাসনা তাঁকে কীভাবে পেয়ে বসেছিল, তার কাহিনী নিজেই বলেছেন কবি। অক্ষয় চৌধুরীর কাছে ইংরাজ বালক-কবি চ্যাটার্টনের কথা শুনেছিলেন তিনি, যে চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের কবিতা নিখুঁত রকমে নকল করতে পেরেছিলেন এবং ষোল বছর বয়সে আত্মহত্যা করে মরেছিলেন। ষোল বছরের রবীন্দ্রনাথ 'আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে' রেখে দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার জন্য কোমর বাঁধলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে এক বয়স্ক বন্ধুকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের চেয়েও উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রাপ্তির সম্ভাবনায় পুলকিত করে তুললেন। কেবল সেই বন্ধুটিই বিভ্রান্ত হননি, রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী জার্মানী-প্রবাসী নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এই প্রাচীন ভানুসিংহ নামক পদকর্তার উপর গবেষণা করে ডক্টরেট সংগ্রহ করেছিলেন। একে বলা চলে গবেষণার ''উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।''

গোটা ব্যাপারটার রসভঙ্গ কিন্তু হয়েছে দুই ব্যক্তির দ্বারা। এক স্বয়ং ভানুসিংহ, দুই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত বন্ধু যখন ভানুসিংহের আবিষ্কারে ''বিষম বিচলিত'', তখন যশোলুব্ধ বালক কবি তাঁর ''খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া'' দিলেন যে, ''এ লেখা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না,'' কারণ—''এ আমার লেখা।'' তখন ''বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'নিতান্ত মন্দ হয় নাই'।''

আর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার জানিয়েছেন—

> ''নিশিকান্ত একুশ বৎসর বয়সে (১৮৭৩) বিলাত যান, ... ভসুরিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে The Yatras নামে একখানি ছোট বই লিখিয়া ডক্টর উপাধি পান। সে গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে ভানুসিংহের কোনো কথা নাই। ... সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভ্রমশূন্য নহে।''

অন্যায় সত্যাগ্রহ। এমন শোচনীয় পরিস্থিতিতে চ্যাটার্টনের আত্মহত্যা আর ''অনাবশ্যক'' থাকে কি? উক্ত বন্ধুর রুচির পৃষ্ঠপ্রদর্শন, 'জীবনস্মৃতি'কার রবীন্দ্রনাথের নিজ রচনা সম্বন্ধে অকরুণ

সমালোচনা (ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র'') এবং প্রভাতকুমারের নিরাসক্ত তথ্যগত নিষ্ঠুরতা—এমন ক্ষেত্রে পোস্ট ডেটেড্ আত্মহত্যাই একমাত্র করণীয়।

কিন্তু আসল কথা থেকে আমরা সরে গিয়েছি। সেই যেদিন—

> ''মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে।' লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।''

সেই খুশির আরো এক অপূর্ব রসালাপ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যা লিখতে পারেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এবং মুখে বলতে পারেন বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের কথা; দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার আরম্ভপথ থেকে ফিরে এসে জ্যোতিদাদার গঙ্গাতীরের বাগানে বাস করতে গেছেন :

> ''আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি-একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে-গাহিতে বৃষ্টিপাত-মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত।''

রবীন্দ্রনাথের ''আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রির'' সঙ্গে বিদ্যাপতি জড়িয়েছিলেন।

২

বিদ্যাপতি যেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনাভূতির সঙ্গে যুক্ত, যেখানে বিদ্যাপতির রচনা তাঁর অস্তিত্বের অনুভূতিকে স্পন্দিত করেছে, আত্মার প্রশ্বাসে এনেছে সুগন্ধি, বিদ্যাপতির বেদনাধ্বনি ('বিদ্যাপতি কহ, কৈছে গমায়ব, হরি বিনু দিন রাতিয়া') তাঁর সত্তার মূলে দিয়েছে টান—সেই বিদ্যাপতিই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনাদিকালের হৃদয়-উৎসের রক্তরসে সে বিদ্যাপতির পদ রচিত। আমরা এখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চার আরো প্রত্যক্ষ তথ্যে মনোনিবেশ করছি। কুড়ি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১২৮৮) ''বিদ্যাপতি পদাবলী'' সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের অন্তর্গত ঐ ''বিদ্যাপতি পদাবলী'' সম্পাদনা করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। রবীন্দ্রনাথ আলোচনার শুরুতে আদর্শ সম্পাদনার নীতি নির্দেশ করলেন, এবং সেই মাপকাঠিতে বিচার করতে লাগলেন অক্ষয় সরকার-কৃত বিদ্যাপতি পদাবলীর ব্যাখ্যা, অর্থনিরূপণ ইত্যাদিকে।

রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় খুশি হতে পারেননি। শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে আমি ভারতী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা দেখতে পেয়েছি। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বিরাগের যথেষ্ট পরিচয় আছে। যেমন—

''পাঠকেরা কি সম্পাদকবর্গকে একেবারে অভ্রান্ত দেবতা বলিয়া জ্ঞান করেন, অথবা তাঁহাদের স্বদেশের প্রাচীন-আদি কবিদের প্রতি তাঁহাদের এতই অনুরাগের অভাব, এতই অনাদর যে, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার দেয় স্বরূপে যৎসামান্য শ্রমস্বীকার করিতেও পারেন না? বঙ্গভাষা যাঁহাদের নিকট নিজের অস্তিত্বের জন্য ঋণী, এমন-সকল পূজনীয় প্রাচীন কবিদিগের কবিতা সকলের প্রতি যে-সে যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকিব? তাহারা কি আমাদের আদরের সামগ্রী নহে?''

নিশ্চয় আদরের সামগ্রী, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে ''যৎসামান্য শ্রম-স্বীকারের'' অভাবরূপ অপমানের ক্ষেত্রে প্রতিবাদে মোটেই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের 'সচেষ্ট' সমালোচনায় একদিকে ছিল বিরক্তির দংশন, অন্যদিকে অনুরাগের সত্যান্বেষণ। বৈষ্ণব পদাবলীর এই সমালোচনা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার যে দাবি করেছেন—''বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকর্তাদের সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা ইতিপূর্বে বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ''—প্রভাতকুমারের সে দাবি অগ্রাহ্য করা কঠিন। সেই সঙ্গে যোগ করা চলে, রবীন্দ্রনাথের ঐ সমালোচনা, সূক্ষ্ম, গভীর, কিন্তু—নিশ্চয় সর্বাংশে নির্ভুল নয়।

বিদ্যাপতির পদ্যাংশ এবং অক্ষয় সরকার-কৃত টীকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা ভালো, সেগুলি খুবই আকর্ষক।

''নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি।।
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উখারঙ্গে অঙ্গ।।'' (পৃ. ২)

সম্পাদক ইহার শেষ দুই চরণের এইরূপ টীকা করিতেছেন;—''প্রথম বর্ষার মতো নূতন নূতন ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দী) বর্ষা।''

রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষেত্রে অনুযোগ—সম্পাদক বদরি এবং নবরঙ্গের আভিধানিক অর্থ কুল ও নারাঙ্গা লেবু অগ্রাহ্য করেছেন।

সে ক্ষেত্রে তাঁর সংশোধন—''রাধা নির্জনে কতবার আপনার উরজ দেখেন, আপনার পয়োধর দেখিয়া হাসেন। সে পয়োধর কিরূপ? না, প্রথমে বদরির (কুল) ন্যায় ও পরে নারাঙ্গার ন্যায়।''

পুনশ্চ :

''খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ।।'' (পৃ. ৩)

সম্পাদক এই দুই চরণের অর্থ করিতেছেন : ''খেলার সময় হউক বা না হউক, লোক দেখিলে লজ্জিত হয় ও সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া একবার দৃষ্টি করে ও তখনি অপরদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে।''

এখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা—''খেলে, খেলে না; লোক দেখিয়া লজ্জা হয়। সহচরীদের মধ্যে থাকিয়া দেখে, দেখে না। অর্থাৎ খেলিতে খেলিতে খেলে না; দেখিতে দেখিতে দেখে না।''

পুনশ্চ :

“যব গোধুলি সময় বেলি
ধনী মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।।” (সং ১৬, পৃ. ১৭)

সম্পাদক টীকা করিতেছেন : “বিদ্যুৎরেখার সহিত দ্বন্দ্ব (বিবাদ) বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।”

রবীন্দ্র-কৃত অর্থ : “রাধা গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে মন্দিরের বাহির হইলেন, যেন নবজলধরে বিদ্যুৎরেখা দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল।”

জিজ্ঞাসা চিহ্ন না দিয়ে সম্পাদক মহাশয় যে অর্থ করেছিলেন অনেক সময় তাতে ভাবহানি হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। যেমন ‘ভারতী’র পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন—সম্পাদক “জিজ্ঞাসাসূচক ‘কি’ শব্দের উপর নিতান্ত নারাজ।”

পুনশ্চ :

“লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার?” (৩ সং, পৃ. ৪)

সম্পাদককৃত অর্থ, লোচন স্থির ভৃঙ্গের আকার, “যেন মধুমত্ত হইয়া উড়িতে অক্ষম।”

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যার শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেবার পক্ষপাতী। তৎকৃত অর্থ—“তাঁহার লোচন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়; মধুমত্ত হইয়া সে কি উড়িতে পারিতেছে না?”

ঐরূপ—

“দারুণ বঙ্ক, বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর?”

সম্পাদককৃত শেষ চরণের অর্থ—“আমার কালস্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইল।”

শেষ চরণে জিজ্ঞাসা আনার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ অর্থ করেছেন—“নিদারুণ ঈষৎ বঙ্কিমদৃষ্টি কি আমার কাল হইয়া উৎপন্ন হইল?”

অনুরূপ—

“চিকুরে গরয়ে জলধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা?”

সম্পাদক—“মুখশশির ভয়ে আঁধার কি বা রোদন করিতেছে।”

রবীন্দ্রনাথ—“মুখশশির ভয়ে কি আঁধার রোদন করিতেছে?”

নবীন রবীন্দ্রনাথ অর্থগ্রহণে ও ব্যাখ্যায় যে প্রবীণদের এখানে পরাস্ত করেছেন, তা রসিক পাঠককে নিশ্চয় বলে বোঝাতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাই পরবর্তীকালে বহুলাংশে গৃহীত হয়েছে, তা বিদ্যাপতি পদাবলীর পরবর্তী বিভিন্ন সংস্করণ দেখলেই বোঝা যাবে।

৩

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চা এখানেই সমাপ্ত নয়। বৈষ্ণব পদকারদের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ যৌবনে বিশেষ প্রবল। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় ''পদরত্নাবলী'' নামে বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই পদরত্নাবলী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারকে এক পত্রে বলেছেন—''তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না, এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন।''—(২৬শে আশ্বিন, ১২৯২)। রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ করতে মনস্থ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চা সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক ব্যাপার সম্বন্ধে প্রভাতকুমার গবেষণামুখে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন। ১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসে 'সাবিত্রী' পত্রিকায় এই 'বিজ্ঞাপন'টি প্রকাশিত হয়—

> ''বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
>
> প্রায় দশ বৎসর কাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্বে মুদ্রিত কয়েকটি সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে ... রবীন্দ্রবাবু কর্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।''
>
> ''১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ তারিখের (১২৯৩) মধ্যে প্রকাশিত হইবে। পিপল্‌স্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।''

প্রভাতকুমার লিখেছেন :

> ''এই সময়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) নামে উদীয়মান সাহিত্যিক The Poets of Bengal নামে একটি গ্রন্থমালা সম্পাদন করিবার সঙ্কল্প করেন। ... রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ নিজ সম্পাদিত খাতাখানি তাঁহাকে দিয়া দেন। ... কালীপ্রসন্ন তাঁহার সঙ্কলিত 'বিদ্যাপতি' ১৩০১ সালের পূর্বে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যবিশারদ লিখিয়া দিলেন—'শ্রীমোতিলাল চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।' (ভূমিকা ১৩০৫ আশ্বিন ১)। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ঐ খাতা তিনি কখন পান তাহা তিনি বলেন নাই। তবে বোধ হয় কালীপ্রসন্নের সঙ্কলিত গ্রন্থমালা প্রকাশের কথা জানিতে পারিয়া তিনি (রবীন্দ্রনাথ) 'বিদ্যাপতির পদাবলী' সম্পাদন করিয়া এবং প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়াও প্রকাশ করিলেন না। কালীপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে-খাতাখানি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনো ফেরত দেন নাই।''

কালীপ্রসন্নের ''বিদ্যাপতি পদাবলী'' প্রকাশের সংকল্প এবং সেই সংকল্পে রবীন্দ্রনাথের খাতা-আহুতি বাংলা সাহিত্যের কতখানি ক্ষতি করেছে, তা কালীপ্রসন্ন বা রবীন্দ্রনাথ কেউই পুরো জেনেছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ পরম প্রেমে খাতাখানি দিয়েছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন পরমানন্দে তা নিয়েছিলেন, মাঝখান থেকে রবীন্দ্রনাথের দশ বছরের পরিশ্রম ও প্রতিভা-আঁকা খাতাখানি হারিয়ে

গেল, যে 'আট আনা মূল্যে'র খাতাখানি পাবার জন্য, আমাদের কথা বাদ থাক, আমরা দরিদ্র, কয়েকশো বছর পরের মানুষ হয়তো আট লক্ষ (আট কোটি?) টাকা দিতে প্রস্তুত থাকবে। আত্মত্যাগী বাংলা দেশে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরো আছে, অন্তত একটি, ত্যাগধর্মে তা আরো মহান, চারশো বছরের পুরনো ঘটনা—কোনো এক বিদ্যাযশপ্রার্থীর কাতর মুখের দিকে চেয়ে নিমাই পণ্ডিত তাঁর রচিত পুঁথিখানি নাকি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেছিলেন!

ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়!

৪

রবীন্দ্রনাথের উদারতার বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভের দুটি কারণ—প্রথমত রবীন্দ্রনাথ কবি ছাড়াও আরো কিছু ছিলেন—শব্দ ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সক্রিয় জীবন্ত আগ্রহ ছিল। এই শব্দসিদ্ধ কবি (কথাটায় কে সন্দেহ করবে?) শব্দতত্ত্বকে বৃদ্ধবয়সেও গ্রন্থবিষয় করেছেন। কৈশোর থেকে শব্দ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের বিষয়ে উল্লেখ করেছি পূর্বে। সাবিত্রীর বিজ্ঞাপনে যে জানানো হয়েছিল, ''বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে ... এই সুন্দর মনোহর পদাবলী সকলের ক্রয় করা উচিত''—সেটা প্রচলিত বিজ্ঞাপন ছিল না—সেটা সত্যজ্ঞাপন।

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি তো নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম মনীষায় অদ্বিতীয়। কালব্যবধানের কারণে দুর্বোধ মৈথিল পদাবলীর অর্থগ্রহণের জন্য শব্দজ্ঞানের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অন্তর্নিবিষ্ট সুগভীর সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার, যা কবির মধ্যে কবি হয়ে প্রবেশ করতে পারে, যা আবেগের উত্তাপে গলিয়ে দিতে পারে কালের অন্ধকার, যা সহমর্মিতার নাড়ীর টানে তুলে আনতে পারে অতীতকে বর্তমানে। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তা করতে পারেন।

তথ্য নিবেদনে আর একটু অংশ এখনও বাকি আছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ গ্রিয়ার্সন-সংগৃহীত বিদ্যাপতির সৌখিন উৎকৃষ্ট পদাবলী-সংগ্রহ পড়ে ঐ পদাবলী গ্রন্থের মার্জিনে অনেকগুলি পদের গদ্যে ও পদ্যে পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ লিখে রেখেছিলেন। এমন ৫২টি পদের অনুবাদ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সেই পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদগুলি ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চার মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে কেউ দেখে নিতে পারবেন। অনুবাদগুলি উদ্ধৃত ক'রে মন্তব্য করবার লোভ আমি সংবরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। তাতে এই প্রবন্ধ আকারের ভদ্রসীমা অতিক্রম করবে (এখনো কি করেনি?)। ঐ অনুবাদগুলি একটি চমৎকার স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারে সহজেই।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের এই প্রচুর আগ্রহের পটভূমিকায় আমরা সহজেই অনুমান করে নেব, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নিশ্চয় একেবারে মুগ্ধ মধুকর ছিলেন। বিদ্যাপতি-পদ-সরোজের মধুকর যে তিনি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই, মুগ্ধও ছিলেন, কিন্তু মধুপান-শ্রান্তিও তাঁর রচনায় দেখা গিয়েছে। কথাটা বোধ হয় নরম হয়ে গেল। প্রশংসার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অতি কঠিন সমালোচনা করেছেন বিদ্যাপতির কাব্য-বস্তুর। বিদ্যাপতিতে তিনি সেই গভীরতা পাননি, যা পেয়েছিলেন চণ্ডীদাসে। রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনাকে স্মরণ করা চলে এই প্রসঙ্গে। কুড়ি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ''চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'' প্রবন্ধ, এবং তিরিশ বছর বয়সে ''বিদ্যাপতির রাধিকা''। প্রবন্ধ দুটির বক্তব্য প্রায় অনুরূপ, প্রভেদ রয়েছে সৌকর্যে। তিরিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ দশ বছর পূর্বেকার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নিশ্চয় বড়ো লেখক। ঐ দুটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে

যা বলতে চেয়েছেন, তার মূল কথা হল—"বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।" এবং "নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হইয়া ওঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতিকে ভাবের কবিত্ব থেকে খারিজ করলেন। রূপের কবিত্বে বিদ্যাপতির আসন পাকা রইল, কিন্তু হায়, সেটা যে ছোটো কবির চেহারা। আর, যিনি 'রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালবাসায় ভোলাবো'—একথা বলতে পারেন না, তাঁকে কি কবি বলা যাবে?

আমি রবীন্দ্রনাথের তিরিশ বছরের লেখা 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধ থেকে বিদ্যাপতির সমালোচনাত্মক অংশগুলি তুলেছি। তিরিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম যৌবনের ধারণায় অবিচলিত থাকলেও সমালোচনায় কিছু সংযত হয়েছেন। কিন্তু কুড়ি বছর বয়সে, অল্প বয়সের ধর্ম অনুযায়ী ("অল্প বয়সের ধর্মই এই, সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেখে"—'বিদ্যাপতির রাধিকা'), তিনি ভালো এবং মন্দকে রীতিমত স্বতন্ত্র করে দেখেছিলেন। চণ্ডীদাস পড়েছিলেন ভালো কবির দলে এবং বিদ্যাপতি মন্দ কবির দলে। "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি সত্য-কবি ও মিথ্যা-কবির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে যে-সব কথা বলেছেন, সেখানে বিদ্যাপতিকে স্পষ্ট ক'রে দ্বিতীয় দলে ফেলা হয়নি বটে, কিন্তু সমালোচকের মনোভাব বুঝতে ভুল হবার কথা নয়। সেখানে এমন সব কথাও বলা আছে :

> "নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুলা বড়-বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্মাণ করে। ... গোঁজামিলন দিবার কল্পনা, না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার, না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিল্‌টি-করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা।"

সর্বনাশ! সমালোচনার কথাগুলি যদি বিদ্যাপতির সম্বন্ধে লেখা হয় তো—ব্যাপারটা ভয়াবহ। যা হোক রবীন্দ্রনাথ নাম করেননি, এবং আমরা সন্দেহের অজুহাতে বিদ্যাপতিকে জালিয়াতির অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে পারি। মোটকথা বিদ্যাপতি 'সুখের কবি এবং চণ্ডীদাস দুঃখের কবি।' রবীন্দ্রনাথ ঐ দুই প্রবন্ধে উৎকৃষ্ট ভাবে ও ভাষায় চণ্ডীদাসের প্রেমসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাঁর প্রত্যেকটি কথা চণ্ডীদাসের কাব্য-সমালোচনায় গভীরতার সঞ্চার করেছে। চণ্ডীদাসের অন্তর্জগতের এই বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়।

অপরপক্ষে বিদ্যাপতির কাব্যধর্ম ও কাব্যরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আংশিক সত্য ও সার্থক, কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। বলতে পারি, চণ্ডীদাসের মতোই বিদ্যাপতিতেও 'ভাবের মহত্ত্ব' এবং 'আবেগের গভীরতা' ছিল; 'অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা', 'সমুদ্রের নিস্তব্ধতা ও ধ্যানলীনতা' ছিল না তা নয়; তা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—"বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে" —আমরা বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলব, ঐ 'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়' পদটি ছাড়াও বিদ্যাপতির আরো বেশ কিছু পদে চণ্ডীদাসের অনুরূপ "প্রেমের তীব্রতা ও প্রেমের আলোক" পাওয়া যাবে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আংশিক বিচারভ্রান্তির কারণ অনুমানের চেষ্টা করা চলে।

রবীন্দ্রনাথ হয়ত বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাননি। কিংবা বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক পদ অপেক্ষা দেহমূলক পদগুলি সংখ্যাগুরু বলে রবীন্দ্রনাথ বহুর ধর্ম দিয়ে বিদ্যাপতির কবিধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। সে প্রয়াসকে অনর্থক বলা চলে না; এবং আমার ব্যক্তিগত ধারণা হল, বিদ্যাপতি মূলত লৌকিক প্রেমের কবি। কিন্তু ঐ লৌকিক প্রেমই তীব্রতায় এমন অনেক গভীর মুহূর্তকে পদের মধ্যে স্পন্দিত ক'রে তুলেছে যে, সেখানে প্রেম সত্যই 'অশেষ' এবং তা মাত্র একটি জায়গায় নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। চণ্ডীদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পক্ষপাতের কারণ, এই সময়কার কাব্যে তিনি যে-দর্শনকে প্রকাশ করতে চাইছেন চণ্ডীদাসের মধ্যে সেই প্রেমদর্শনের অবস্থান লক্ষ্য ক'রে পুলকিত হয়েছিলেন তারই কৃতজ্ঞতায় চণ্ডীদাসস্তুতি করেছেন অকুণ্ঠে (যেটা মোটেই ভ্রান্ত স্তুতি নয়)। এই চণ্ডীদাসের বিপরীত দিকে আছেন বিদ্যাপতি। তাই বিদ্যাপতিকে বিপরীত বিচারে রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেছেন। প্রভাতকুমার চণ্ডীদাসের প্রতি আকর্ষণের এই দিকটির বিষয়ে বলেছেন :

> ''এই তুলনামূলক প্রবন্ধের (চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি) উপসংহারে তরুণ লেখক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতারই এক প্রকার মর্মব্যাখ্যা। সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবির চিত্ত যে-প্রেমের জন্য লালায়িত, যাহার জন্য দুঃখকে বরণ করিতে প্রস্তুত, সেই প্রেমই জগতে স্বীকৃতি লাভ করিবে, ইহাই ছিল প্রতিপাদ্য বিষয়।''

ঐ প্রেমের পরাকাষ্ঠা চণ্ডীদাসের মধ্যে কবি দেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণে এই চণ্ডীদাসীয় বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্বের দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন, তার আর একটি প্রমাণ দেওয়া যায়। অল্প পরে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর (শ্রাবণ ১২৮৯) পৃষ্ঠায় 'বসন্ত রায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে এই অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত দেখা যায়—বসন্ত রায় বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। বসন্ত রায় উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে পড়েন না, আর বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠ দুই বৈষ্ণব কবির একজন—তবু বিদ্যাপতি অপেক্ষা বসন্ত রায় শ্রেষ্ঠ? নিশ্চয়। কারণ বসন্ত রায় যে, তুলনায় 'সহজ ও স্বাভাবিক'।

তবে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এমন সহজিয়া থাকেন নি। পরবর্তীকালে উৎকৃষ্ট কাব্যের দৃষ্টান্ত দিতে তিনি চণ্ডীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতিকেই বেশী গ্রহণ করেছেন। কাব্যের জগতে 'প্রাণ'-কে কিনতে হয়, 'রূপ' দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে কাব্যবিচার করতে গিয়ে তা মেনেছেন। যৌবনকালে যৌবনের ধর্মে তিনি রূপকে চেয়েছেন, পীড়নদলিত দ্রাক্ষার মতো শুষে পান করেছেন বক্ষ, তার পরেই হতাশাজর্জর কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠেছেন—''ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য নহে তো মানব।'' রবীন্দ্রনাথের দেহক্ষুধা এবং ক্ষুধান্তে অবসাদের বিলাপোক্তিতে এই সময়ের কাব্য পূর্ণ হয়ে আছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যকে এ-ব্যাপারে বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত-রূপে গ্রহণ করা যায়। বিদ্যাপতি রবীন্দ্রনাথের ওই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের মধ্যেই ভাবরূপে সর্বাধিক বর্তমান। এবং বিদ্যাপতির প্রতিবাদও ওই কাব্যের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চার মধ্যে এই জিনিসটি বিশেষভাবে দেখা যায়। তিনি এইকালে বিদ্যাপতির ইন্দ্রিয়মূলক পদগুলির প্রতিই অধিক আকৃষ্ট, অন্তত তাঁর কৃত বিদ্যাপতির অনুবাদ, উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে তাই প্রমাণ হয়। বিদ্যাপতির ভক্তিপদাবলী বাদ দিয়ে দেহমাদকতার পদগুলিকে তাঁর একটি মন পরমানন্দে আস্বাদন করছে, অন্য একটি মন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলছে তারস্বরে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে তুলনার কালে বিদ্যাপতিকে নিছক দেহজীবী বলার মধ্যে তারই প্রমাণ রয়েছে।

ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য 'কড়ি ও কোমলে'র দৃষ্টান্ত নেওয়া উচিত। 'দেহের মিলন' নামক কবিতাটির রূপ নিম্নোক্ত প্রকার :

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে,
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়া করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহমন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

(পদটিতে জ্ঞানদাসের এক বিখ্যাত পদের প্রতিধ্বনি মেলে)।

এবার অন্য কয়েকটি কবিতার প্রথম লাইনগুলি তুললেই দেহমিলনের গ্লানির চেহারা ধরা পড়বে—

"সুখশ্রমে আমি, সুখী, শ্রান্ত অতিশয়—" (শ্রান্তি)
"দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—" (বন্দী)
"এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়—" (মোহ)
"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া—" (পবিত্র প্রেম)
"মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন—" (পবিত্র জীবন)
"এসো, ছেড়ে এসো সখী, কুসুমশয়ন—" (মরীচিকা)

কড়ি ও কোমলে বিদ্যাপতির ভাবকে গ্রহণ-বর্জনের ঐ রূপ। এখন ওই কড়ি ও কোমলে চণ্ডীদাসকে দেখা যাক। চণ্ডীদাসের পদ-সায়রে বাঁশি ডুবিয়ে কান্নার সুর তুলছেন রবীন্দ্রনাথ—সেই সুরের ব্যাকুলতায় চণ্ডীদাসের অর্চনা। কড়ি ও কোমলের গানগুলি চণ্ডীদাসের জন্য, সনেটগুলি বিদ্যাপতির। বিদ্যাপতির রাধিকার দেহ কঠিন সনেটের সাজ পরে দাঁড়িয়ে আছে—আর গানের সুরে অশরীরী হয়ে গেছে চণ্ডীদাসের শ্রীমতী। চণ্ডীদাস-নিঃশ্বসিত গানের দু' এক চরণ :

"আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে।...
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,

মরিব কাঁদিয়া রে...
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।...
ওই বাঁশিস্বর তার আসে বার-বার
সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।...
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল,
দেখে তারে আমি মরিব।" (বিরহ)

এবং—

"যদি আমারে আজ সে ভুলিবে সজনী
আমারে ভুলাল কেন সে?
ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে।...
যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।...
না না এত প্রেম সখী, ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধো না।" (বিলাপ)

এবং—

"কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।" (সারাবেলা)

এবং—

"ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে।
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে।।...
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবনডালা সাজায়ে,
ওই বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে।।" (গান)

৫

মূল আলোচনা শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চার একটা খসড়ার দ্বারা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের রূপ দেখাবার চেষ্টা করেছি মোটামুটি। বিদ্যাপতির কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ শেষ অবধি বজায় ছিল। বিদ্যাপতি কত গভীরভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন, সেইসব রচনায় তার প্রমাণ আছে। পরিণত বয়সে সাহিত্যের তত্ত্বালোচনার কালে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বিদ্যাপতির কাব্যাংশকে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার ব্যবহার করেছেন। তিনি যে 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারল' অংশটিকে ব্যবহার করবেন তাতে আশ্চর্য কিছু নেই, এটা তাঁর চিরকালের প্রিয়—'তথ্যসীমাকে ছাপিয়ে' ওঠবার যোগ্য 'এতবড় অদ্ভুত অত্যুক্তি' তিনি শ্রেষ্ঠ কাব্যে আর পাননি বোধ হয়। কিন্তু আরও একটি কাব্যাংশ, যার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল—তা 'যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস', 'হৃদয়ের নবীন বাসনাসকলের পাখা মেলে দেওয়ার প্রয়াসের' রূপ, কিংবা 'নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য'—সেই অংশটি কবির মনে কখন যে সৌন্দর্যের অক্ষয় রেখায় বন্দিনী চিরপ্রতিমার রূপ নিয়েছে, তা কবিও হয়ত জানতেন না। 'তথ্য ও সত্য' নামক প্রবন্ধে তথ্য ও সত্যের পার্থক্য বোঝাতে যা বলেছেন এবং যে-উদাহরণ দিয়েছেন, তা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য :

''বিদ্যাপতি লিখছেন—

যব, গোধুলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

গোধূলিবেলায় পূজা শেষ ক'রে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে, আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দ-রচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি? জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্ব-মুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য? তা কখনোই স্বীকার করতে পারি নে। বস্তুত মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্যমাত্র করে ছন্দে বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা-সংযোগে যে-একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে, সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।...

গোধূলিবেলায় একটি বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, এই তথ্যটিমাত্র আমাদের কাছে অতি সামান্য। এই সংবাদমাত্রের দ্বারা এই ছবিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আমরা শুনেও শুনি নে; একটি চিরন্তন এক-রূপে এটি আমাদের চিত্তে স্থান পায় না। যদি কোনো নাছোড়বান্দা বক্তা আমাদের মনোযোগ জাগাবার জন্যে এই খবরটি পুনরাবৃত্তি করে তা হলে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'না হয় বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, তাতে আমার কী।' অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ অনুভব করি নে বলে এ ঘটনাটি আমার কাছে সত্যই নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে ছন্দে সুরে উপমার যোগে এই সামান্য কথাটাই একটি সুষমার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল অমনি এ প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেল যে 'তাতে আমার কী!' কারণ সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই নে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই। গোধূলিবেলায় বালিকা মন্দির হতে বাহির হয়ে এল, এই কথাটিকে তথ্য হিসাবে যদি সম্পূর্ণ করতে হত তা হলে হয়তো আরও অনেক কথা বলতে হত;

আশপাশের অধিকাংশ খবরই বাদ গিয়েছে। কবি হয়ত বলতে পারতেন, সে সময়ে বালিকার খিদে পেয়েছিল, এবং মনে মনে মিষ্টান্ন-বিশেষের কথা চিন্তা করছিল। হয়ত সেই সময়ে এই চিন্তাই বালিকার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। কিন্তু তথ্যসংগ্রহ কবির কাজ নয়। এইজন্যে খুব বড়ো বড়ো কথাই ছাঁটা পড়েছে। সেই তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে বলেই সংগীতের বাঁধনে ছোটো কথাটি এমন একত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন সম্পূর্ণ অখণ্ড হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্য তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।" (তথ্য ও সত্য; সাহিত্যের পথে)

বৈষ্ণব কাব্যের এই এক আধুনিক সমালোচনা। কোনো একটি বক্তব্যকে প্রমাণ করবার জন্য বৈষ্ণব পদের দৃষ্টান্ত এখানে নেওয়া হয়েছে, সেইজন্য ধীর চিন্তা—সমালোচনার বুদ্ধি ও বোধের মিশ্রণ। কিন্তু বৈষ্ণব পদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন রচনাও আছে যার বিষয়ে একটি মাত্রই কথা বলা চলে—'ক্রিয়েটিভ'। বুদ্ধি যেখানে অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করেছে এবং অনুভূতি যেখানে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত রসসরসীতীরে আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছে—সেই অপূর্ব সৃষ্টিকর্মকে আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখতে পাব। আপাত বিসদৃশের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্যকে কবিরা কোন্ শক্তিতে আবিষ্কার করেন এবং সেই কবিশক্তির মধ্যে রমণীয়তার সঙ্গে পুরুষ-চরিত্রের প্রকাশ কিরূপ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে—তার যোগ্য দৃষ্টান্ত ঐ অংশে মিলবে। অংশটি উদ্ধৃত করা উচিত। মূল প্রবন্ধটির নাম "কেকাধ্বনি", 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র এক সুবিখ্যাত রচনা। যে-কেকারব শুনতে মোটেই মিষ্ট নয়, তার প্রতি কবিদের পক্ষপাত কেন—তার কারণ জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যর এক মহাগৌরব রচনা করেছেন—

"সেই (কেকারবের) মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতরঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে-একটি কাংস্যক্রেংকারধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া ওঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান; কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে; সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।"

কেকারব যেমন সুখশ্রাব্য নয়, তেমনি নয় দাদুরীরব। কবি সূত্র টেনে বলেছেন—

"বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্ত ভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তর-বিন্যাস নাই; শচীর কোনো প্রাচীন কিংকরী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসরবর্ণ।

নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্বে খেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতির্হীন, কর্মহীন, গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডিকে আরও ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে! তাহার নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লিরব ভালোরূপ মেশে; কারণ যেমন মেঘ যেমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লরবও আর-একটা আচ্ছাদন বিশেষ—তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ, তাহা বর্ষানিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।”

আমার বিবেচনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের অংশবিশেষের এইটেই সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য সমালোচনা।

(Tagore Centenary Souvenir (1961), Rabindra Centenary Committee, Muzaffarpur)

সংযোজন

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের বহু বৎসরের পরিশ্রমের ধন বিদ্যাপতি পদাবলীর পাণ্ডুলিপি মেরে দিয়েছিলেন—বাঙালী পাঠক এই সংবাদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-সহ নানা গবেষক-লেখকদের রচনা মারফত জেনেছেন। অ্যাঁ, ‘‘রাজকোষ হতে চুরি?’’ তদুপরি কালীপ্রসন্ন ‘‘কুসুমে কীট’’-এর সন্ধানী, ‘‘মিঠে কড়া’’-র ব্যাপারী। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাবোধ করতে অসুবিধা হবার কথা নয়, আমারও হয়নি—এই লেখাতে তার নিদর্শন আছে। কিন্তু সেই উপভোগ্য সুখে বাদ সেধেছেন ড. বিশ্বনাথ রায় নামক রবীন্দ্র-অনুরাগী গবেষক। নির্বিচারে, কোনো কিছুতে বিশ্বাস করায় অনিচ্ছুক এই সত্যসন্ধানী লেখক দেখেছেন যে, কালীপ্রসন্ন প্রায় বিনা অপরাধে দণ্ডিত। সেজন্য উক্ত ‘দণ্ডিত’ ব্যক্তির মরণোত্তর মুক্তির ব্যবস্থাপনায় ড. রায় সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর ‘গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের ‘বিদ্যাপতি পদাবলী : রবীন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ’ প্রবন্ধে নানা অকাট্য প্রমাণযোগে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ কালীপ্রসন্নকে মোটেই বিদ্যাপতি পদাবলীর পাণ্ডুলিপি দেননি —দিয়েছিলেন বিদ্যাপতি পদাবলীর ‘‘শব্দার্থ, ব্যাকরণের বিশেষত্ব এবং টীকা-টিপ্পনি’’ সংবলিত একখানি খাতা। সেই খাতা রবীন্দ্রনাথ দেন কালীপ্রসন্নর বিদ্যাপতি পদাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে। এই ঋণ কালীপ্রসন্ন বিদ্যাপতি পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘‘জীবনের শেষপ্রান্তে এসে’’ ‘‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’’-র সূচনায় যে-কথা বলেছেন তা সতর্কভাবে পড়লে (ড. রায় জানিয়েছেন) পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘‘পদাবলীর যে-ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত, আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। (অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বৈষ্ণব পদাবলীর) টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিইনি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরী করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি তার অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।’’

কালীপ্রসন্নকে পুরো ছাড় অবশ্য রায় মহাশয় দেননি। উপরের কথাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এও বলেছিলেন, ''তাঁর (কালীপ্রসন্নর) কাজ শেষ হয়ে গেলে এই খাতা আমি তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি।''

কলঙ্কের ছিটে তাহলে কালীপ্রসন্নর গায়ে লেগে রইলই, বিশেষত যখন দেখা যায় যে, খাতাটি হাতছাড়া হবার ফলে ''বৈষ্ণব পদাবলী বিষয়ে এই ধরনের লেখা (যাতে শব্দার্থ বিচার ছিল) পরবর্তীকালে আর তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) লিখতে দেখা যায়নি।''

আমরা এখানে এই কল্পনা করতে ইচ্ছুক, খাতাটি থাকলে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর শব্দচর্চায় মেতে থাকতে পারতেন, কেননা তাঁকে সুবৃদ্ধ বয়সেও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে দেখা গেছে।

তাছাড়া বহুদিনের এক সঙ্গী, যার অঙ্গে ভালবাসার নানা কালের অঙ্গুলিরেখা—তাকে হারানোর দুঃখ নিবিড়। ''বস্তুত এই খাতাটি কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিল। 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' পাঠের নিজস্ব পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে এই 'বাঁধানো খাতা'-রই উল্লেখ করেছেন তিনি। ... কৈশোর কাল থেকে দীর্ঘদিনের সঙ্গী ছিল বলেই পরিণত বয়সেও সেই 'বাঁধানো খাতাটির' কথা ভুলতে পারেননি কবি।''

সব জড়িয়ে মনে হচ্ছে, বিদ্যাপতি পদাবলীর কোনো 'পরিকল্পিত' পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা (রায় মহাশয়ের আরও ধারণা, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতি পদাবলী 'ইচ্ছা হয়ে মনের মাঝারে' থেকে গিয়েছিল, কদাপি পাণ্ডুলিপি জন্ম পায়নি) দীর্ঘদিনের মন্তব্যপুষ্ট বাঁধানো খাতাটি হারানোর দুঃখই রবীন্দ্রনাথের কাছে অধিক ছিল। সুতরাং নিবেদন—ড. বিশ্বনাথ রায়ের রচনার পরে ভবিষ্যতের লেখকগণ 'যা ছিল না' তার জন্য রোরুদ্যমান না হয়ে, 'যা রীতিমতো ছিল' তার বিহনে শোকার্ত হলেই বাস্তববোধ দেখাবেন।

মধ্যবর্তীকালে আমি আমার দুঃখকে 'পাণ্ডুলিপি হারানো' থেকে 'খাতা হারানোয়' স্থানান্তরিত ক'রে নিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

এক

রবীন্দ্রনাথের নিজের শিক্ষা চিরাচরিত পথে চলেনি। বাল্যকালে তাঁর লেখাপড়ায় বার বার বিঘ্ন ঘটেছে। হয়ত-বা সে-কারণেই পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বাংলা নিবন্ধগুলি স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত নিবন্ধসমূহ : (১) ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৯০৫; (২) শিক্ষা-সংস্কার, ১৯০৬; (৩) শিক্ষা-সমস্যা, ১৯০৬; (৪) জাতীয় বিদ্যালয়, ১৯০৬; (৫) আবরণ, ১৯০৬; (৬) তপোবন, ১৯০৯; (৭) ধর্মশিক্ষা, ১৯১১; (৮) শিক্ষাবিধি, ১৯১২; (৯) লক্ষ্য ও শিক্ষা, ১৯১২; (১০) স্ত্রী-শিক্ষা, ১৯১৫; (১১) শিক্ষার বাহন, ১৯১৫; (১২) ছাত্র-শাসনতন্ত্র, ১৯১৫।

দ্বিতীয় ভাগে পড়ে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত নিবন্ধসমূহ : (১) অসন্তোষের কারণ, ১৯১৯; (২) বিদ্যার যাচাই, ১৯১৯; (৩) বিদ্যা-সমবায়, ১৯১৯; (৪) শিক্ষার মিলন, ১৯২১; (৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, ১৯৩২; (৬) শিক্ষার বিকিরণ, ১৯৩৩; (৭) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ১৯৩৫; (৮) শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬; (৯) আশ্রমের শিক্ষা, ১৯৩৬; (১০) ছাত্র-সম্ভাষণ, ১৯৩৬।

স্বীকার্য, 'শিক্ষা'-গ্রন্থভুক্ত এই বাইশটি নিবন্ধ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, ইংরেজিতে ও বাংলায়।

ভারতে বৃটিশ শাসনকালে বৃটিশ রাজের উদ্যোগে যে-সব শিক্ষানীতি ও সংস্কার করা হয়েছিল সেগুলি ১৯০৪ থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্ঘঠিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের (১৯০১) সময় থেকে জীবনের শেষ দশক পর্যন্ত (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে ভেবেছেন ও হাতে-কলমে কাজ করেছেন। এই সময়সীমার মধ্যে ভারতে শাসন-কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে যে-সব শিক্ষা-সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তাদের নাম—বড়লাট কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও তার প্রতিবেদন (১৯০৪), কার্জন-ঘোষিত শিক্ষানীতি, ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে গোখলে আনীত প্রাথমিক শিক্ষা বিল (১৯১২)-এর প্রত্যাখ্যান, ভারতে বৃটিশ সরকারের শিক্ষানীতির ঘোষণা (১৯১২), স্যাডলার কমিশন নিয়োগ (১৯১৭) ও দু'বছর বাদে প্রকাশিত প্রতিবেদন (১৯১৯), পঁচিশ বছরে (১৯২০-৪৪) ভারতের সবকটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ, ভারতে সর্বপ্রথম বঙ্গ প্রদেশে শহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষানীতির প্রয়োগমূলক আইন প্রণয়ন (১৯১৯), 'বেঙ্গল রুর‍্যাল প্রাইমারি এডুকেশন' আইন প্রণয়ন (১৯৩০), বিশ বছরে (১৯২৪-৪৪)

বঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনরূপে প্রয়োগ। ১৯৪০ নাগাদ ভারতের সর্বত্র এই নীতির প্রয়োগ, দশ বছরে (১৯৩৪-৪৪) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অন্যান্য নীতির প্রয়োগ—যেমন, পলিটেকনিক, বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচী, বৃত্তিমুখী শিক্ষা এবং সর্বোপরি সার্জেন্ট প্ল্যান (১৯৪৪), যা ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছিল। যদিচ তার সুপারিশগুলি কাজে পরিণত হবার পূর্বেই ভারত স্বাধীন হয়ে যায় (১৯৪৭) এবং শিক্ষানীতি রূপায়ণে বৃটিশ সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। স্মর্তব্য, গান্ধিজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় (১৯৩৮) বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার একটা ছক প্রণীত হয়েছিল।

এই কালে বেসরকারী স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সব প্রধান ঘটনা ঘটেছিল এখানে সেগুলিকে স্মরণ করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বৃটিশ সরকার-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব-মুক্ত শিক্ষাসূত্র গড়ে উঠেছিল। যেমন—লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ, কাশীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ, লাল মুনশীরাম ওরফে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হরিদ্বারে গুরুকুল এবং বঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের দিনে (১৯০৫-০৮) বৃটিশ সরকারের তথা বড়লাট কার্জনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইতিবাচক গঠনমূলক রূপ নেয়। শিক্ষাগত অভিযোগগুলির স্বদেশী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়, বাংলার জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল স্থাপিত হয়। এর মূলে ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষাবিদ্। অতি অল্প সময়ে লাখ লাখ টাকা চাঁদা ওঠে, জাতীয় শিক্ষানীতির অনুপুঙ্খ খসড়া প্রণীত হয়। কলকাতায় স্থাপিত হয় ন্যাশনাল কলেজ, অরবিন্দ ঘোষ তার অধ্যক্ষ হন। কারিগরী শিক্ষার জন্য একটি কারিগরী স্কুল স্থাপিত হয়। বঙ্গের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের এটাই সূচনা। স্বীকার্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের গুরুকুল ও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম (বোলপুর) এই আন্দোলনের অগ্রগামী দূত। এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মাতৃভাষা বা ভার্নাকুলার জাতীয় শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ছেড়ে সরকারী বিদ্যালয়ে ফিরে যায়। কেবল টিকে থাকে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, যার পরবর্তী রূপ যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং (স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়)। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যেমন দ্রুত এসেছিল তেমন দ্রুত নেমে যায়, কিন্তু রেখে যায় কিছু ভাল ফল, যেমন—এই আন্দোলনের ফলে জনগণের শিক্ষা, বিশেষত বয়স্ক-শিক্ষা বিশেষ সমর্থন লাভ করে। গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে স্থাপিত হয় অনেক নৈশ বিদ্যালয়। রাজনৈতিক কর্মীরা নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ানোকে রাজনৈতিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা দেখা দেয়। এ বিষয়ে বৃটিশ সরকার কিছুই করেননি, অন্যদিকে গোখলে-আনীত প্রাথমিক শিক্ষাবিল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পরাস্ত হয়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষিত ভারত সরকারের শিক্ষানীতি এবং ১৯১৭-তে নিযুক্ত ও ১৯১৯-এ প্রকাশিত স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও সারা ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কিছু উন্নতি ঘটেনি। ভারতে বৃটিশ সরকারের মুখপাত্র সার হারকুর্ট বাটলার ঘোষণা করেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ঘোষণার প্রশ্ন ওঠে না। দেড়শ বছর ইংরেজ শাসনের পরও ভারতে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫ থেকে ৬। স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিশন-প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-উত্তর বিভাগ প্রবর্তন করেন (১৯১৭)। আশুতোষের এই কাজ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৪। সে সময় উচ্চতর শিক্ষায় ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৭৬ হাজার, তাদের মধ্যে ১৬ হাজার ছাত্রী। এর অর্ধেকের বেশি সংখ্যা ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী, ৮২ হাজার ফার্স্ট ডিগ্রি শ্রেণীর, মাত্র ৮ হাজার এম.এ., এম.এস-সি.-র ছাত্র। তখন ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩০ কোটি।

দুই

১৯০৫ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বারোটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষার চরিত্র, লক্ষ্য ও পদ্ধতি, শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজিভাষা ব্যবহারের উপযোগিতা বা ব্যর্থতা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতির ত্রুটি, জাতীয় বিদ্যালয়ের আদর্শ, ধর্ম-শিক্ষার আবশ্যকতা, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে বিদ্যাদানের আদর্শ, নারীশিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা—এইসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই বারোটি নিবন্ধে পাই।

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৯০৫) নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যা আলোচনা করেছেন তা হ'ল —কী করলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদেরকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করে শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। তিনি শিক্ষাকে ও শিক্ষার্থীকে পুঁথির গণ্ডির বাইরে আনতে চেয়েছিলেন। বিদেশী-চালিত কলেজীশিক্ষায় আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মায়নি, কেবলি কতকগুলো মুখস্থ বিদ্যার চর্চা হয়েছে। কলেজী শিক্ষার এই ব্যর্থতা ঘোচাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে সংস্রব ব্যতীত সবই নিষ্ফল—জ্ঞান, ভাব, চরিত্র নির্জীব ও নিষ্ফল। এই নিষ্ফলতা থেকে ছাত্রদের শিক্ষাকে যথাসাধ্য রক্ষা করা জরুরী বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। আর এই কাজে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে ডাক দিয়েছেন, কারণ বাংলার ভাষা সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, এই পরিষদের আলোচ্য বিষয়। পরিষদ ছাত্রদেরকে তাদের কর্মযজ্ঞে আহ্বান করুক, এটাই রবীন্দ্রনাথ চান, তাহলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হয়ে উঠবে। বাংলার উপভাষা, ব্যাকরণের বিচিত্র উপাদান, প্রাকৃত জনসম্প্রদায়ের নানা ধর্মাচার, লোকাচার, সামাজিক রীতিনীতি,—এক কথায় বঙ্গদেশের ঘরের কথা জানবার পথে তিনি ছাত্রদেরকে আহ্বান করেছেন। স্বীকার্য, এখানে রবীন্দ্রনাথ বস্তুসম্পর্ক রহিত কল্পনা ও ভাবনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞানের উপর জোর দিয়েছেন। চারপাশের জীবন্ত সমাজ ও গ্রামকে বাদ দিয়ে শিক্ষা নয়, এ কথাটা এখানে তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন।

স্বদেশী আমলেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'শিক্ষা-সংস্কার' নিবন্ধ (১৯০৬)। ঊনবিংশ শতাব্দে বৃটিশ সরকার-নিয়ন্ত্রিত আয়ারল্যান্ডে শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সেই স্যাকসন (বৃটিশ) শিক্ষাপদ্ধতি আয়ারল্যান্ডের কোনো উপকার করেনি, ক্ষতিই করেছে, কারণ 'ন্যাশনাল স্কুল' ওরফে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জোর করে স্যাকসন (বৃটিশ) পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, মাতৃভাষা (আইরিশ) বাদ দিয়ে স্যাকসন ভাষা (ইংরেজি) শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছিল, আর আইরিশ ভূ-বৃত্তান্ত ইতিহাস সমাজকথার চর্চা বন্ধ করা হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের শিক্ষাসংকটের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষাসংকটের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করতে ও সেই ভাষায় বিদ্যাচর্চা করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীর মন জখম হয়ে যায়। ১৩/১৪ বছর থেকে ১৯/২০ বছর বয়স পর্যন্ত এই ব্যর্থ প্রয়াসেই আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্যম

নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই বয়সটাই শিক্ষার সবচেয়ে অনুকূল সময়, কারণ এই কাঁচা বয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করতে পারে, তখনি সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্ত-মাংসের সঙ্গে পুরোপুরি মেশাতে পারে। আইরিশকে স্যাকসন করবার চেষ্টায় তার শিক্ষাকেই মাটি করা হয়েছে, তেমনি আমাদেরকে ইংরেজ করবার চেষ্টায় আমাদের শিক্ষাকে মাটি করা হচ্ছে। জার-শাসিত রাশিয়ায় এভাবেই মানুষের মন মরে যাচ্ছে তা টলস্টয় দেখিয়েছেন। ডিসিপ্লিনের নামে পরের হুকুম মেনে চলার ও পরের মতের প্রতিবাদ না করার যে শিক্ষাবিধান তাকে আমরা কোনমতে মেনে নিতে পারি না, এটাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

১৯০৬-এ স্বদেশী আন্দোলনকালে ও জাতীয় বিদ্যালয় গঠনকালে রবীন্দ্রনাথ আরো তিনটি নিবন্ধ লেখেন—'শিক্ষা সমস্যা', 'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'আবরণ'। এইসব নিবন্ধ থেকে অনুধাবন করা যায় রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার স্বদেশী ও শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে কতো গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল) অনুরোধে তিনি পরিষদের স্কুল বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাব এমন নয়।

'শিক্ষাসমস্যা' নিবন্ধে তাই তিনি জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী শিক্ষানীতি উদ্ভাবনের উপর জোর দিয়েছিলেন। য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থেকে মানুষ হয়, স্কুল তার কথঞ্চিৎ সাহায্য করছে। সেখানে শিক্ষার্থী যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা এই যে, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই। আমরা ইংরেজি স্কুলে পড়ি, তার সঙ্গে সমাজ, দেশ ও মনের যোগ বিচ্ছিন্ন। আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে, অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে, তার যথাস্থানে দেখতে পাই না। আমরা একে সজীব লোকালয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করতে জানি না। এখানেই আমাদের শিক্ষার গলদ।

বিদ্যালয়ের (ইংরেজি স্কুলের) এদেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করে আমাদের জীবনের সঙ্গে মেলাতে হবে তা-ই জানি না, অথচ ইহা জানাই সবচেয়ে জরুরী। এখানেই আমরা ব্যর্থ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের এই বিচ্ছেদ ছিল না। অধ্যয়নকালে গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্যপালনের যে পদ্ধতি ছিল তাতে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। চিরকাল উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থেকেই ভারতবর্ষের মন গড়ে উঠেছে। ইংরেজ আমলে শহরের স্কুলে আমরা সেভাবে মনকে গড়ে তুলতে পারছি না। এখানেই আমরা ব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন, খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, গাছপালা মানবসন্তানের শরীর-মনের সুপরিণতির জন্য অত্যন্ত দরকার। একদিন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় তার স্বীকৃতি ছিল। বৃটিশ আমলে তা নেই। তাই আমাদের শিক্ষাপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, আজও আমাদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বন আর গুরুগৃহ। একালে বন আমাদের সজীব বাসস্থান, গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। শহরের স্কুলে দুইয়ের কোনোটাই পাই না। শিক্ষার জন্য চাই উদার মুক্ত পরিবেশ, খোলামেলা আকাশ বাতাস। মনের বর্ধনকালে চাই বৃহৎ অবকাশ। চাই ইংরেজি মতের ডিসিপ্লিন নয়, স্বভাবের নিয়ম। তাই তাঁর প্রস্তাব—স্কুলের সঙ্গে অবশ্যই চাই খানিকটা খোলা জমি, চাই না বেঞ্চি-টেবিল। গাছের ছায়ায়, খোলা হাওয়ায়, তরুণ মন বিকাশলাভের অনুকূল পরিবেশ

পায়। আমাদের সাহেবিয়ানার পরিবেশে তা পায় না। চাই আশ্রম। অর্থাৎ অবকাশ, প্রকৃতির সান্নিধ্য। ডিসিপ্লিনের নামে তরুণ মনকে চেপে রাখলে তা বাড়তে পারে না। বিদ্যালাভ চাকরির জন্য নয়, মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য। একথা যদি সত্য হয়, তবে চাই বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান। বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত। চাই তারই অনুকূল পরিবেশ।

জাতীয় বিদ্যালয় (১৯০৬) প্রতিষ্ঠার পরই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'জাতীয় বিদ্যালয়' নিবন্ধ। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য তিনি বিচার করে বলেছেন, এই কাজ আমাদের আত্মনির্ভরতা জাগিয়ে তুলেছে। এতদিন আমরা ভেবে বসেছিলাম দেশের সব মঙ্গলবিধানের দায়িত্ব গবর্নমেন্টের। এমন দায়িত্ববিহীন পরনির্ভরতায় পৌরুষের ক্ষতি করে। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আমরা তার থেকে রক্ষা পেলাম। স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তার সর্বপ্রধান কর্মী, তখনই আমরা এর সার্থকতা পাব। জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তারই সূচনা। আমরা আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে পেরেছি, আমাদের ইচ্ছাই আমাদের প্রধান সম্বল তা জেনেছি, তার ফলে গবর্নমেন্টের উপর নির্ভরতা ঘুচবে। অনেকদিন পরে বাঙালি যথার্থভাবে একটা-কিছু পেল। এটার প্রয়োজন ছিল। এটা আমাদের শক্তি। দেশের ও দশের জন্য আমরা যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারি তা এখানে প্রমাণিত হল। এর ফলে আমাদের দেশে শক্তির অনাসৃষ্টি থেকে রক্ষা পেলাম। জাতীয় বিদ্যালয় এলো আমাদের নিশ্চেষ্টতা, জাড্য, আত্মশ্রদ্ধাহীনতার দিনে। আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়-স্বরূপে আবির্ভূত হল জাতীয় বিদ্যালয়। আজ তা মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কেটে ফেলে শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হব।

বিশ্বজগৎ ও আমাদের স্বাধীন শক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলো বেড়া তুলে দিয়েছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলোকেই আমরা সুবিধা ও নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলে জেনেছি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা এই ধরনের বাধার বেড়া তুলে দিয়েছি। 'আবরণ' নিবন্ধে একথাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য।

মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তেমনি মনের শিক্ষাও পূর্ণতা পায় না। আমরা সভ্যতা ভদ্রতার নাম করে শরীরকে কাপড় জুতো মোজা দিয়ে ঢেকে রাখি। তেমনি বই দিয়ে মনটাকে পুরোপুরি ঢেকে রাখি। মাস্টার-মশায় শিশুকাল থেকেই আমাদের বই মুখস্থ করাতে থাকেন। অথচ বইয়ের ভিতর থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নয়। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখেশুনে সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান। রবীন্দ্রনাথ সেই বিধানকে মান্য করতে চান। বইয়ের আবরণের বাইরে এসে নিজ অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের মুক্তি দিতে চান।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়েছে। আর ছোটরা বইয়ের মধ্যে মনটাকে বেঁধে রেখেছে। অবস্থাটা এই—জ্ঞান আনন্দের জন্য নয়, প্রাণের দায়ে, কতকটা মানের দায়ে। এর থেকে মুক্তি চাই। এটা সত্যকারের শিক্ষা নয়।

শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে অল্প হলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা। যা শিক্ষা নাম ধরে তার মনকে আচ্ছন্ন করে দেয় তাকে পড়ানো বলা যায়, কিন্তু তা শেখানো নয়। এর থেকে শিশুমনকে মুক্তি দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তীব্র ধিক্কার দিয়ে ‘আবরণ’ নিবন্ধে লিখেছেন :

> “বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয়; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা; তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হয়ে পড়ে—সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়নবশত চিরকালের মতো হারায়—তবু ইহা বিদ্যা, কারণ ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এতক'টা অঙ্ক এবং এতটা পরিমাণ বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে!”

‘ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা’ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত স্পষ্ট করে বলেছেন ‘তপোবন’ নিবন্ধে। যুরোপ এই শিক্ষা বলতে যা বোঝে, ভারতবর্ষ তা বোঝে না। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে তিনি ‘ন্যাশনাল শিক্ষা’ বলে গণ্য করেন না। তাঁর মতে, জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করিনে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা।

আর একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে তাঁর মত এখানে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে নিতান্ত কলেজী শিক্ষা বলে কখনই বিবেচনা করেননি। তাঁর মতে, শিক্ষা জীবনের সম্যক সামগ্রিক উপলব্ধি আর ভারতের সাধনা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ, কেবল কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয়; স্কুল-কলেজ পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

‘তপোবন’ নিবন্ধে (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বোধের শিক্ষালাভের উপর জোর দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে এসেছিল ধর্মশিক্ষার কথা। বোধের যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এখানেই উদারতম ধর্মবোধের ইঙ্গিত পাই। পরবর্তী নিবন্ধে—‘ধর্মশিক্ষা’য়—তিনি এ কথাকে বিশদ করেছেন। টেকনিক্যাল এডুকেশন জীবনের একমাত্র সাধ্য নয়, একথা তিনি বলেছেন ‘তপোবন’ নিবন্ধে। ‘ধর্মশিক্ষা’ নিবন্ধে তিনি জোর দিয়েছেন স্বাভাবিক ধর্মশিক্ষার উপর। ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেখানেই স্বাভাবিক বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। ‘ধর্মশিক্ষা’ নিবন্ধ লেখা হয় ১৯১১ সালে। সেদিনকার ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এখানে ব্যক্ত। বুদ্ধি ও ইচ্ছার টান বাহিরের দিকে এত বেশি যে অন্তরের দিকে কেবলই রিক্ততা : বেশির ভাগ আধুনিক সমাজের এই দশা; ব্রাহ্মসমাজে একই দশা, নিদারুণ অসামঞ্জস্য ঘরে বাহিরে। ভোগের উন্মত্ততায় বাহিরে প্রবল বেগে ছুটে চলার মত্ততা ঘরের শান্তিকে স্থৈর্যকে ধর্মীয় তপস্যাকে বিনষ্ট করছে। এর ফলে অন্যান্য আধুনিক সমাজের মতো ব্রাহ্মসমাজেও ভোগের তাণ্ডব, ধর্মচর্চা সেখানে উপেক্ষিত।

স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের এই সমাজ-বিশ্লেষণ নির্ভুল। তাঁর মতে পুরানো পৃথিবীতে সর্বত্রই শিক্ষা ব্যাপারটা ধর্মাচার্যদের হাতে ছিল, এখন তা রাষ্ট্রকর্তা সমাজপিতাদের হাতে। আজ পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ এ-সব

কথা লিখেছেন ১৯১১ সালে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের দেশেও এই বিচ্ছেদ ঘটছে। বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাই ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ছে। তাই আজ জিজ্ঞাসা, বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষা দানের সমস্যার আলোচনা করেছেন। আসলে তা আধুনিক ভারতীয় সমাজেরও সমস্যা।

আমরা মানুষের মনকে বাঁধব কী দিয়ে? তাকে ব্যাপৃত করব কিরূপে? তাকে আকর্ষণ করব কী উপায়ে? আমরা কি মনকে আষ্টেপৃষ্টে ধর্মের বেড়াজালে বেঁধে রাখব? ব্যাপকার্থে, কোনো আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ নয়, কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্সট-বুক কমিটির সংকলিত সামগ্রী নয়, তা জীবনের সামগ্রী, তা ভক্তের জীবনাশ্রয়ী। তা যদি হয়, তবে দেখতে হয়, কোনো আধুনিক সম্প্রদায়ের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? ব্রাহ্মধর্মের ক্ষেত্রে এই ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? অবশ্যই তা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। তার একমাত্র পথ—ব্রহ্মের বোধ, মুক্ত সত্যের চর্চা। এটাই সত্যকারের ধর্ম। এই ধর্মশিক্ষা স্কুলে কলেজে হবে কীভাবে? তা হতে পারে একটা আশ্রয়ে। সে আশ্রয় পাই আশ্রমে অর্থাৎ যেখান বিশ্ব-প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হয়ে একটি যোগাসন রচনা করেছে এমন আশ্রম।

রবীন্দ্রনাথ এই নিবন্ধে দাবি করেছেন, তিনি শান্তিনিকেতনে সেই আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, যা দিতে পারে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা। স্মর্তব্য, ১৯১১ সালে তিনি এই দাবী করেছেন। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল ১৯০১ সালে আর ১৯২১ সালে স্থাপিত হয়েছিল বিশ্বভারতী, যার 'মটো' 'যত্রবিশ্বভবত্যেক নীড়ম্'। এ কথাই 'ধর্মশিক্ষা' নিবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—''আমরাই তো জগৎপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেই জন্যেই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।''

বিলেতে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'শিক্ষাবিধি' নিবন্ধটি (১৯১২)। বিদেশে যাবার আগে তাঁর যে সঙ্কল্প ছিল তা নিবন্ধের সূচনায় ব্যক্ত—রবীন্দ্রনাথের সঙ্কল্প ছিল, এখানকার (বিলাতী) বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করে দেখেশুনে বুঝে নেবেন, শিক্ষা সম্বন্ধে বিদেশের কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তা দেখে যাবেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন দুই ধরনের শিক্ষাবিধির মধ্যে লড়াই। এক দলের মতে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করে নেবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। অন্য দলের মতে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করে সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করে নেওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। রবীন্দ্রনাথের মতে, এ দুয়ের মধ্যে লড়াই কোনোদিন মিটবে না, কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এই লড়াই। শাসন না হলে চলে না, স্বাধীনতা না হলেও তার রক্ষা নেই; একদিকে তার পড়ে-পাওয়া জিনিসের প্রবেশ-দ্বার খোলা, আর-এক দিকে তার খেটে-আনা জিনিসের আনাগোনার দরজা খোলা। এ দুয়ের সামঞ্জস্য সাধনই মানুষের পক্ষে সৎশিক্ষা।

কিন্তু তা হবে কী উপায়ে? রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র ও দুর্লক্ষ্য সে-কারণে তাকে নির্দিষ্ট করা কঠিন। এ অবস্থায় সকল জাতির পক্ষে আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু আমাদের দেশে সবই সৃষ্টিছাড়া। সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য, অথচ সে ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করে রাখার চেষ্টা অহরহ চলছে এ দেশে। সুতরাং আমাদের সমাজ আমাদের কালের

উপযোগী শিক্ষা দিচ্ছে না, দু-চার হাজার বছর আগেকার শিক্ষা দিচ্ছে। ফলে, মানুষ করে তুলবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের সামাজিক বিদ্যালয় ও রাজকীয় বিদ্যালয়—দুটোই প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। প্রথমটায় পুরনো শিকল আর দ্বিতীয়টার নতুন শিকল আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধে সে পরিমাণে মুক্তি দেয় না। এটাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ চান, যেমন করেই হোক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করতেই হবে। স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেদেরকে নিতে হবে। দেশের কাজে যাঁরা আত্মসমর্পণ করতে চায়। এটাই তাঁদের সবচেয়ে বড়ো কাজ বলে তিনি মনে করেন।

বিলেতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'শিক্ষাবিধি' (১৯১২) নিবন্ধটি, সেই সঙ্গে 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' (১৯১২)। পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় সমাজের জাড্য, নিশ্চেষ্টতা, লক্ষ্যহীনতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। কাছের থেকে দেখার চেয়ে অনেক সময় দূর থেকে দেখলে প্রকৃত অবস্থাটা ধরা পড়ে, এই নিবন্ধ তার প্রমাণ। আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে (১৯১২ সালে) সাংঘাতিক অবস্থাটা কী? রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের জীবনে কোনো সুস্পষ্টতা নেই। এটাই বিপজ্জনক। অথচ পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্য-ভেদের আহ্বান সবাই শুনেছে, তাদের জীবনে আছে স্পষ্ট লক্ষ্য। আমাদের এই শোচনীয় অবস্থাকে কাটাতে হলে চাই লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্টতা। রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে লিখেছেন, " 'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে'—এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে একথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।"

এই লক্ষ্য, উচ্চাদর্শ, স্পষ্টতা হোক আমাদের শিক্ষায় কাম্য।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন 'স্ত্রীশিক্ষা' নিবন্ধে (১৯১৫)। শ্রীমতী লীলা মিত্রের একটি পত্র নিবন্ধটির উপলক্ষ। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের মূল বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন—যা-কিছু জানবার যোগ্য তাই বিদ্যা, তা পুরুষকেও জানতে হবে, মেয়েকেও জানতে হবে—শুধু কাজে খাটাবার জন্য যে তা নয়, জানাবার জন্যই।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করব একথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। মেয়েদের শিক্ষা দিলে ঝাঁটা বঁটি শিলনোড়ার কাজটা কে করবে—এই যুক্তিতে মেয়েদের শিক্ষালাভ থেকে অনেকে বঞ্চিত করতে চান। রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মেয়েরা যদি-বা কাণ্ট-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করবে, পুরুষদের দূর-ছাই করবে না। সুতরাং শিক্ষা থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা উচিত নয়! তাই বলে তিনি মনে করেন না যে, শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-পুরুষে কোনো ভেদ থাকবে না। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষে পার্থক্য নেই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। এই সত্যটা মেনে নিয়েই স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। মেয়েদের স্বভাবকে রক্ষা করেই স্ত্রীশিক্ষার নানা আয়োজন হতে পারে। স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। এই সত্য মনে রেখে মেয়েদেরকে সুখে-দুঃখে পুরুষের সহচারী করে নেওয়া উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

'শিক্ষার বাহন' নিবন্ধ (১৯১৫) বহুপঠিত। ইংরেজি, না বাংলা—শিক্ষার বাহন হবে কোন্ ভাষা, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মতামত এখানে ব্যক্ত। স্মর্তব্য, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বৃটিশ সরকার তাঁদের শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছিলেন, তার অব্যবহিত পূর্বে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে গোখলে-আনীত প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' নিবন্ধ প্রকাশের দুবছর পরে (১৯১৭) স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, আরো দুবছর বাদে তার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল (১৯১৯)। প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ঘোষণার দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের মুখপাত্র স্যার হারকুর্ট বাটলার। তখন ভারতে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫ থেকে ৬। স্যাডলার কমিশনের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিশনের সুপারিশ প্রকাশের পূর্বেই স্নাতক ও স্নাতক-উত্তর পর্যায়ে কিছু প্রগতিশীল ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ করে লিখেছেন, ''দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি পেটাপেটি করিতে হয়, সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্জে মশায় ওরই মধ্যে এক জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন। তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পূরা হইবে না।''

শিক্ষাক্ষেত্রে আশুতোষের কীর্তির এই রবীন্দ্র-স্বীকৃতিটুকু মূল্যবান। এর পর রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন—যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাবে না? এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ : বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর-বাড়িতে যেমন ইংরেজি ভাষাবাহননির্ভরতা চলছে তা চলুক, বাহির-বাড়িতে বাংলাভাষাবাহনের উপর নির্ভর করা হোক। রবীন্দ্রনাথ এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। সত্তর বছর পরে আজো আমরা মাতৃভাষার উপর নির্ভর করেই সর্বস্তরে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি।

বিদ্যালয় পরিচালনায় অর্জিত নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই রবীন্দ্রনাথ এই নিবন্ধ লিখেছেন; লক্ষ্য করেছেন, একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করতে না পেরে যদি-বা তারা কোনমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরে যায়, উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলাতেই চিত হয়ে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে বহুসংখ্যক বসে-যাওয়ার (ড্রপ-আউট) অন্যতম কারণ এই ভাষাবাহন সমস্যা। যে বাঙালি ছেলে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করতে পারল না, আমরা কেন তাদের বিদ্যামন্দির থেকে যাবজ্জীবন আন্দামানে চালান দেব? এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বার বার তিনি দাবি করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার পথ খুলে দাও, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা পেতে দাও। রবীন্দ্রনাথ ইতঃমধ্যে দেখে এসেছেন জার্মানি ফ্রান্সে জাপানে আমেরিকায় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে দেশের চিত্তকে মানুষ করে তোলা হচ্ছে। তার অন্যতম উপায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ। রবীন্দ্রনাথ এ দেশে তা-ই চেয়েছেন।

তিন

দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা-নিবন্ধগুলি ১৯১৯ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। এগুলিতে যে-সব সমস্যা আলোচিত তার মধ্যে প্রধান মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দানের সমস্যা। প্রথম বিশ্বসমরোত্তর ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্কটের চরিত্র বিচার করে তিনি সঙ্কট-মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। তৎনির্দেশিত অনেক পথ আজো প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। প্রধান নিবন্ধগুলির বক্তব্য পর্যালোচনায় তা অনুধাবন করা যায় বলে আমার বিশ্বাস।

‘বিদ্যাসমবায়’ নিবন্ধে (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ ভারতে শিক্ষাদানের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। ভারত-ইতিহাস ও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান-পরিচয় এখানে পাই।

তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা কীভাবে বিদ্যাকে কিছু লোকের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত করেছিলেন। তিনি ঠাট্টা করে বলেছেন, আর-সব দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটিয়ে বেড়ে উঠছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ঋষিদের একচেটিয়া। দীর্ঘকাল আমরা বিদ্যাকে একঘরে করে রেখেছিলাম—অতি সম্মানের দ্বারা। এ পথ আত্মঘাতী পথ। এখনকার দুনিয়ায় জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করবার দিন আজ আর নেই বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ এসেছে। তাঁর দাবি—এ দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদানও তুলনা হবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে। আর তাই করতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করে জানা চাই।

সন্দেহ নেই, সেদিন (১৯১৯) এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দুঃসাহসিকভাবে আধুনিক। তুলনামূলক বিদ্যাচর্চার দাবি এখানে জোরের সঙ্গে প্রকাশিত। ইতিহাসদৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যার নদী আমাদের দেশে চার শাখায় প্রবাহিত—বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন। এর উদ্ভব ভারতচিত্ত-গঙ্গোত্রীতে। স্বীকার্য, ভারতের বিদ্যার স্রোতে বাহির থেকে এসেছে স্রোত। মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার স্রোতের সঙ্গে এসেছে য়ুরোপীয় বিদ্যার স্রোত, তা যুক্ত হয়েছে ঐ চার স্রোতের সঙ্গে। তাই রবীন্দ্রনাথের দাবি, আমাদের বিদ্যায়তনে এই ছয় স্রোতকে স্থান দিতে হবে। ১৯১৯-এ তিনি একথা লিখেছেন, বিশ্বভারতীতে (১৯২১) তাকে ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।

১৯২১-এ লিখেছেন ‘শিক্ষার মিলন’ নিবন্ধ। আজকের দুনিয়ায় পশ্চিমী দুনিয়ার লোক জয়ী হয়েছে। একথা অবশ্যমান্য। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, এই অধিকার ও জয় তারা পেয়েছে বিশেষ একটা সত্যের জোরে। পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে তাকে অবজ্ঞা করা যায় না। বিদ্যা-ই সত্য। সেই সত্যের জোরে পশ্চিমী দুনিয়া বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলে। বিশ্বঘটনার উপর কর্তৃত্ব করে বিজ্ঞানের সাধনার জোরে। তারা জাদু নয়, বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস-যুক্তিকে আয়ত্ত করেছে। বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ। পশ্চিমী দুনিয়া তা অধিকার করেছে। এখানেই তাদের জোর।

পশ্চিম দেশ দুটি বিষয় সত্য বলে জেনেছে : বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও এতটুকু ত্রুটি থাকতে পারে না; রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে। শেষোক্তের ফলে পশ্চিম দেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ শুরু হয়েছে।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে না আছে বিশ্বনিয়মে আস্থা না আছে ব্যক্তিবিশেষ ও পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যে আস্থা। আমরা নিজেদের বুদ্ধিবিভাগে কর্তাভজা। এখানেই আমাদের যথার্থ পরাধীনতা বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

এর থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ পথে সাহায্য করতে পারে শিক্ষা। তাঁর মতে, বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা বলে তিনি মনে করেন।

আগামী দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে বলে তিনি মনে করেন। এই আশা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে, একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন ১৯১৯-এ যখন প্রথম বিশ্ব সমরক্লান্ত য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'লীগ অফ নেশনস্'। আরো একটি বিশ্বসমর ও বহু রক্তাক্ত সংঘর্ষ পেরিয়ে আমরা আজো মানবজাতির মিলনতীর্থে পৌঁছতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ এখানে আশা ব্যক্ত করেছেন, শিক্ষাই সব দেশের জাতের মানুষকে মেলাতে পারে। তাই তিনি চেয়েছেন, আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রই সব দেশের অতিথিশালা যেখানে প্রতি দেশ বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে ধন্য হবে। দুঃখের কথা, বৃটিশ-শাসিত ভারতের যত কিছু সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা তার পনেরো আনাই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। এখানে বিশ্বের আতিথ্যের ব্যবস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন-সম্পদ নেই, কিন্তু সাধন-সম্পদ আছে। তার জোরেই ভারত সত্যসাধনার মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করুক।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' নিবন্ধটি (১৯৩২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ। য়ুনিভার্সিটির উদ্ভব য়ুরোপে। ভারতের মাটি থেকে তার উদ্ভব হয়নি। অথচ এদের পূর্বেই তক্ষশিলা-নালন্দা-বিক্রমশিলা বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা। সেগুলি য়ুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ। এ দুয়ের কোনো নিবিড় যোগ নেই। ঐসব বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। সেখানকার আচার্যদের যশ ছিল বহুদূর ব্যাপী; তাঁদের কাছে আসত সারা দুনিয়ার ছাত্ররা। ঐসব স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস ছিল আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের উদার শ্রদ্ধা যা প্রভূত ত্যাগ স্বীকারে অকুণ্ঠিত। তার সঙ্গে আজকের ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো তুলনাই চলে না। য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির উদ্ভব ছিল মধ্যযুগে য়ুরোপে ধর্মের পরিবেশে। এখনকার পাশ্চাত্ত্য য়ুনিভার্সিটি আধুনিক বিদ্যাচর্চায় প্রবৃত্ত। তার সঙ্গেও দেশের চিত্তের যোগ আছে। আমাদের দেশে তা হয়নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন ধরে (১৮৫৭-১৯১৭) ইংরেজি ভাষার অপ্রতিহত শাসন চলছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেখানে মাতৃভাষার জন্যে স্থান করে দিলেন আঙিনায়, স্থাপন করলেন গবেষণা বিভাগ। কেবল বিদ্যার ফসল জমানো নয়, ফসল ফলানোর বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এখানেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক পদে আজ তাঁকে বৃত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন-সেতুরূপেই তাঁকে এই আসন দেওয়া হয়েছে।

'শিক্ষার বিকিরণ' নিবন্ধে (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ ভারতে জনশিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। পূর্বেকার জনশিক্ষাব্যবস্থা ছিল দেশের মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। পূর্বেকার জনশিক্ষা-ব্যবস্থাগুলি ছিল চিত্তাকর্ষী। পালাগান কথকতা কীর্তনের মধ্য দিয়েই সারা দেশ জ্ঞানলাভ করেছে, রসভোগ করেছে। বৃটিশ আমলে তার জোগান বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু তার বদলে কিছু এল না। তার ফলে দেশের চিত্তক্ষেত্র শুকিয়ে গেল। শহরের লোকেরা পেল ইংরেজি শিক্ষা। ফলে দেশের মানুষে মানুষে ঘটল বিচ্ছেদ। নগরী হল সুজলা সুফলা। গ্রাম হল শুষ্ক নিরানন্দ প্রাণহীন। জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি বৃটিশ আমলে বিনষ্ট হয়ে দেশর সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, তা মরুভূমি

হয়ে গেছে, জল নেই, পাঁক আছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় যদি গ্রামদেশের মানুষের চিত্তকে সঞ্জীবিত করতে পারে তবেই সত্যকারের উপকার করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে গ্রামের মানুষের উপকার করতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তার পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকটা আজকের 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা'র কথাই তিনি বলেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ তিনি এখানে করেছেন।

'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' নিবন্ধে (১৯৩৫) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় মানবিক গুণসমূহ চর্চার উপর জোর দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে জীবনচর্যায় তিনি এর সমর্থন পেয়েছেন। অন্তরের পূর্ণতা সাধনই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন, সেক্ষেত্রে সংস্কৃতির চর্চা জরুরী। বাহিরে কর্মকুশলতা, অন্তরে সম্মানবোধ—এ দুটিই তাঁর লক্ষ্য। একদা বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এটাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। চাই আত্মবিশ্বাস। 'আমি সব পারি, সব পারব'—আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। রবীন্দ্রনাথ এটাই চান। 'আমি সব জানব, সব পারব', এর চেয়ে বড় মন্ত্র আর কিছু নেই। তাঁর মতে এটি আত্মার প্রবল শক্তি। এরই জোরে মানুষ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাণকে তুচ্ছ করে, কিছুতে ভয় করে না ব্যাধিকে স্বীকার করে না, বিপদকে গ্রাহ্য করে না। বিখ্যাত সুইডিস পর্যটক স্বেন হেডিনের অভিযানে এই প্রবল শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন সংস্কৃতি-চর্চা। সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' নিবন্ধে (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধন শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে তাতে বাধা পড়ে। মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশের সুযোগ ও অধিকার পেলে তা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আপন বিদ্যাচর্চার সূচনাপর্বের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, তাই কচি বয়সে রচনা করা ও (ইংরেজি ভাষার সঙ্গে) কুস্তি করাকে এক করে তুলতে হয় নি। ''নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতি প্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই করে কাঁথা বুনতে হয় না।''

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতি অশেষ মূল্যবান। 'জীবন-সায়াহ্নে' (১৯৩৬) এই বক্তব্যে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে তাঁর অভিমত চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। এই নিবন্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি (তথা ভারতীয়) ছাত্রদের দুর্গতির চরিত্র ও কারণসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ', এ কথার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলুম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব।'' 'শিক্ষায় ঐক্য-সাধন ন্যাশনাল ঐক্য-সাধনের মূলে'—একথা তিনি এখানে জোর দিয়ে বলেছেন। সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে গোখ্‌লের প্রয়াস একদা (১৯১২) বৃটিশ শাসকের কাছে বাধা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এখানে জানিয়েছেন, গোখ্‌লেকে বাধা দিয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোক। এ নিবন্ধেই তিনি জানিয়েছেন, ''শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়, সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।''

‘‘ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার’’ বহন করাকে আমাদের ভাগ্য বলে মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন। ‘‘ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে’’, তিনি সাহস করে একথা বলতে চেয়েছেন। ‘‘উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই’’, এই কঠিন তর্ককে রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন ভারতেরই সেদিনকার এক নবীন বিশ্ববিদ্যালয় হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিয়ে। সেখানে উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরে উর্দু শিক্ষাবাহনরূপে গৃহীত হয়েছিল। স্যার আকবর হায়দরিকে এই সাহসের জন্য তিনি তারিফ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার এই পর্যালোচনা থেকে আমরা তাঁর শিক্ষাবিষয়ক ভাবনায় সাহসিকতা, আধুনিকতা ও উদারতার পরিচয় পাই। স্বীকার্য, তাঁর চিন্তা পুঁথিগত নয়, বস্তুগত, জীবন থেকে আহরিত।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বিবেকানন্দযুগের পর রবীন্দ্রযুগ।

ইতিহাসের সত্য তাই। বয়সে সামান্য অনুজ বিবেকানন্দ ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসে রবীন্দ্রমানসের ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের আগেই যুগস্রষ্টা। স্বাভাবিক গ্রহণশীলতার গুণে রবীন্দ্রনাথই স্বামীজীর অনুগামী। সমসাময়িক হলেও জীবন ও মননের দ্রুতসঞ্চারে বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত ও বিশ্বে আগে বরণীয় হয়ে নবযুগসৃষ্টির অন্যতম পথিকৃৎ। রবীন্দ্র-মানসের গ্রহণে-বর্জনে বিবেকানন্দ-প্রভাবের এক বিশেষ ধরনের মূল্যায়ন। কথাটা বিপরীত দিক থেকেও স্মরণীয়। আর, এ তো জানা কথা যে, মূল্যায়নমাত্রেই বিচারসাপেক্ষ।

একালের খণ্ডিত বঙ্গের এবং সেকালের সমগ্র ভারতের রাজধানী—এ দু'জন শ্রেষ্ঠ মানবের আবির্ভাবনগরী কলকাতা সঙ্গতভাবেই এঁদের নামোচ্চারণে গর্বিত। নবজাগৃতি যদি আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার সাধনা হয়, আমরা এ দুই মহামানবের মাধ্যমে সে পরিচয় যেভাবে পেয়েছি, তেমন করে সামগ্রিক জীবনচেতনায় আর কারু কাছে পেয়েছি কি? অতীতের সত্য-সম্পদকে চিনতে পেরেছি তাঁদেরই আলোয়, ভবিষ্যতের পথসন্ধানে অনুভব করেছি তাঁদের দূরদৃষ্টির একান্ত সত্যতা। আমাদের ভারতবাসী, তথা বাঙালীসত্তা—এ দু'জনের মিলিত আশীর্বাদে সমুজ্জ্বল।

বিবেকানন্দ-চেতনার উৎস খুঁজতে গেলে স্বভাবতঃই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শেষ ক'বছরে দক্ষিণেশ্বরগামী তরুণ নরেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। আঠারো-উনিশ বছরের যে ছেলেটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহ-পরিমণ্ডলে বুদ্ধি-যুক্তির শাণিত তরবারি নিয়েই ধীরে ধীরে জগজ্জননীর পদতলে নিবেদিত—সেই নরেনের ব্রত মায়ের কাজে জীবনকে 'বলি দেওয়া'। 'বলিপ্রদত্ত' কথাটি স্বামীজীর রচনায় মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। পরম উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জীবনের সব সুখ-দুঃখের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হওয়া এ বলির নিহিতার্থ।

বাল্যে-কৈশোরে প্রাণচঞ্চল নরেন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত যৌবন যে যুগসৃষ্টি করতেই আবির্ভূত, সে-কথা উপলব্ধি করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভিজ্ঞান দিয়ে ধন্য করলেন। 'চালকলা বাঁধা'র ডিগ্রী অতিক্রম করে নরেন্দ্রনাথ ভারতের দরিদ্রনারায়ণদের সহযাত্রী হলেন এই ভারতের পথে প্রান্তরে। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের গণ্ডী ভেঙে এই বেরিয়ে অসার ফলেই সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ দেখা দিলেন পরবর্তী যুগে। ভারতের আত্মা যে এ দেশের দরিদ্র, মূর্খ, বঞ্চিতদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত, সে-কথা অনুভব করে এই নিদ্রিত জাতির উদ্দেশে তাঁর ডাক—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—'ওঠো জাগো'।

এক অর্থে এই ডাকই শতগুণে প্রতিধ্বনি নিয়ে স্বামীজীর আমেরিকা-ইংল্যান্ডের বক্তৃতা-মালায়

ও রচনাবলীতে অনুরণিত হলো ভারতের সর্বপ্রান্তে। যা ছিল সন্ন্যাসীর অমৃত-বার্তাপ্রচারের অভিযান, তারই পরিণতি রাজনৈতিক শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রাম। স্বাধীনতাকে স্বামীজী উপলব্ধি করতে চেয়েছেন সার্বিক বন্ধনমোচনের পন্থারূপে। তাই মানুষ্যত্বের ভিত্তিভূমিতে জাতীয়তার সৌধরচনা তাঁর অভীষ্ট। আত্মবিশ্বাসী, আপন অতীতে গৌরবান্বিত, ভবিষ্যতে দৃঢ়তর প্রত্যয়শীল—এই তাঁর ভারতবাসীসত্তার বৈশিষ্ট্য। 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু'—সর্বভূতে সমান প্রেমদৃষ্টির ফলে তিনি যতখানি ভারতবর্ষের, ততখানি সারা বিশ্বের।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নরেন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা তাঁকে ভালোভাবেই চিনতেন। ব্রহ্মসঙ্গীতের তিনি সে-যুগের অন্যতম সেরা গায়ক। সুতরাং তাঁর প্রথম যুগের চিন্তাধারা ব্রাহ্ম স্বাতন্ত্র্যে প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। সাধক দেবেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের ধ্যানের গভীরতা বুঝতেন। তবু জীবনের পরমপ্রাপ্তির সন্ধানে ব্রাহ্মসমাজের কোনো শাখার চরম আশ্রয় না নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলেই নরেন্দ্রনাথ সারা জীবনের কেন্দ্র খুঁজে পেলেন। ফলে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার সব ক'টি স্তরের উত্তরাধিকার তাঁর মননের গভীরে শিকড় মেলে এগিয়ে গেল। বিশ্বসত্তায় তাঁর মতো সমগ্র ভারতীয়তার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে রামমোহন বা কেশবচন্দ্র যাত্রা করেননি। আর ভারতের সংস্কৃতিদূতরূপে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে এসেছেন আরো পরের দিকে।

রবীন্দ্রমানসের মূলে একদা সামাজিক অদৃষ্টের পরিণামে 'পিরালি'-স্বাতন্ত্র্য অনেকটা ক্রিয়াশীল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলের হয়েও নিজেকে মনে করতেন 'ব্রাত্য'। অথচ নিজের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার না করে রয়ে গেছেন পিতৃদেবের আদি ব্রাহ্মসমাজের পরিমণ্ডলে। পৌরাণিক ধর্মের শোভন অলঙ্করণগুলি ধর্মের ক্ষেত্রে ততটা গ্রহণ না করলেও নিজের কাব্যকলায় গ্রহণ করেছেন সযত্নে। মূল প্রত্যয় রেখেছেন উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মবাদের আদর্শে। তাই মনীষী ও ভক্ত রবীন্দ্রনাথকে আপনজন বলে গ্রহণ করা সব স্তরের ভারতীয়ের পক্ষেই সম্ভব। পাশ্চাত্যের খৃস্টানুসরণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপন মানস-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব খুঁজে পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, তাঁর বিশ্বতোমুখী অধ্যাত্মসাধনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করেছেন। কিন্তু তাঁর 'ধ্রুবতারা' অন্যত্র। বিশ্ব এবং বিশ্বপিতঃ—এ দুয়ের উদ্দেশে তাঁর সমান অনুরাগ। তাই 'মানবব্রহ্মে'র সিদ্ধান্ত 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে নিশ্চিতভাবে প্রকাশিত। অপরপক্ষে বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রযত্ন সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণরূপ-মহাবৃক্ষের আশ্রয়েই নরেন্দ্রনাথের সর্বার্থসিদ্ধি। মানবরূপের সীমায় আবদ্ধ না থেকে সব রূপ-নাম-বরণের অতীত দেশহীন সর্বহীন উপলব্ধির অভিলাষী এবং অধিকারী। অসীম সত্তার সঙ্গে অদ্বয় অনুভূতির এ আভাস রবীন্দ্রকাব্যেও দেখা দিয়েছে তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতাবলীতে। কিন্তু মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের মনের কথা—'আবার যদি ইচ্ছা কর, আবার আসি ফিরে'। এই মানবজীবনরহস্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে বারংবার।

বিবেকানন্দ বেদান্তসত্যের প্রভাবে ইহজীবনের অতীত মহাজীবনের অন্বেষণেই ব্যাকুল। ফিরে ফিরে এ জগতে আসবার ইচ্ছা তাঁর অন্তরেও জাগে—সমগ্র বিশ্বকে তার ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ দৃষ্টিতে এ জগতে ভালো লাগার অনন্ত বিস্ময়। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে আত্মস্বরূপের বন্ধনমুক্তিই মানবজীবনের অভীষ্ট। তাই বিশ্বের কাছে তাঁর প্রচারের বিষয়বস্তু—বেদান্ত; সে তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক প্রচ্ছন্ন। আবার এক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর কাছে আদিবাণী—প্রথমজাত ধ্বনি ওঁ-কারস্বরূপ।[১]

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মন্থন করে বিবেকানন্দ যে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রাধান্য দেখেছিলেন,

রবীন্দ্রনাথ সামান্য মতভেদ সত্ত্বেও শেষ সিদ্ধান্তে ঐ একই মর্মবাণীতে উপনীত। পাশ্চাত্য তার গরিমায় যতই আচ্ছন্ন করুক, প্রাচীন আকাশেই মানুষের ভবিষ্যৎ সূর্যোদয় কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[২]

গণশক্তির অভ্যুদয়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নেতৃত্বের রূপান্তর-সম্ভাবনা বিবেকানন্দ প্রকাশ করেছেন তাঁর 'পত্রাবলী', 'পরিব্রাজক', 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে। সেকথা 'এবার ফিরাও মোরে' থেকে 'ঐকতান', 'কালের যাত্রা' অবধি রবীন্দ্রচেতনায় প্রসারিত। পূর্বগামীদের সমাজচেতনতা এঁদের চিন্তা ও রচনায় ছায়াপাত করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রসারিত এঁদের সাম্যদৃষ্টি। শূদ্রশক্তির এ জাগরণ অবশ্যম্ভাবী জেনে বিবেকানন্দ 'দরিদ্রনারায়ণে'র সেবার ভার নিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের নারায়ণ'কে নমস্কার করতে বললেন।

শিক্ষার বিপ্লবে স্বামীজী জনগণের কাছে শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। মহম্মদের পর্বতের কাছে যাওয়ার তুলনা স্মরণীয়। বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের ব্রত নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের উদ্‌যাপিত ব্রত এখনো অসমাপ্ত। কিন্তু শিক্ষার উপর এই বিশেষ লক্ষ্য যে আজ অবধি আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় উপরতলার অধিবাসীদের জন্য সীমাবদ্ধ রয়ে গেল—সেখানে আমাদের রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টির অভাব। স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ—দু'জনেই গণশিক্ষার ভিত্তিতে জাতিগঠনের পক্ষপাতী। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের মূলে স্বামীজী দেখেছিলেন শিক্ষার বিস্তার। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আজ অবধি চাকরি মূল লক্ষ্য হওয়ায় এখন অবধি গণ-জাগরণ কেবল ভোট জাগরণে সীমাবদ্ধ।

আপন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য মৌলিকতা। শিক্ষা যে চর্বিতচর্বণে জীর্ণ উপদ্রববিশেষ নয়, একথা রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে লেখা প্রবন্ধে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। বাঁধাধরা চিন্তার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারেননি বলেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপ্ত চিন্তাধারা বাংলার মনন-সাহিত্যে অপার বিস্ময়। বিবেকানন্দ পরাজ্ঞান এবং অপরাজ্ঞান—দুয়েরই প্রয়োজন স্বীকার করে আমাদের শিক্ষাচিন্তাকে নবযুগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে আধ্যাত্মিক-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অবলম্বন করে নবযুগের পঠন-পাঠন-প্রসারে তাঁর যেমন আগ্রহ, সেই সঙ্গে জীবনের মূলকেন্দ্রে সদসৎবিচারে সদাজাগ্রত বিবেকশক্তি-অবলম্বনে একটি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচনাও তাঁর দৃষ্টিতে আবশ্যিক। এদিক থেকে হার্বার্ট স্পেন্সার ও শঙ্করাচার্য—দু'জনকেই তিনি তরুণমানস-গঠনে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ মানব তাঁর চোখে বুদ্ধদেব—যাঁর অনুরাগী রবীন্দ্রনাথও।

বিবেকানন্দের সন্ন্যাসকে তেমন সমর্থন না জানালেও বুদ্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যের অমেয় শক্তিকে বারংবার স্বীকার করেছেন। ভারতীয় সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব যে বুদ্ধদেব-কেন্দ্রিক, সেকথা বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ দু'জনেরই স্বীকৃত। শ্রদ্ধার মানদণ্ডেই দু'জনের ব্যক্তি মহিমার পরিমাপ। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের যুগে কুমারিল্ল-শঙ্করাচার্য-রামানুজ-মধ্ব প্রমুখের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজী যতটা সচেতন, রবীন্দ্রনাথ ততখানি নন। বরং মধ্যযুগের সমন্বয়বাদী সন্তকবিদের কথা তিনি বেশী স্মরণ করেছেন। বৈদিক-উপনিষদ ভিত্তি থেকে রাজা রামমোহন অবধি ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনের ইতিহাসে তিনি গৃহস্থ ও কিছু পরিমাণে সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞদের কথা বেশী ভেবেছেন। ফলে আন্তরিক ঈশ্বরানুরাগ-সত্ত্বেও বৈরাগ্যবাদী হ'তে পারেননি। মায়াবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা রামমোহনের মতোই সংসার-আশ্রিত। অপর পক্ষে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল তোতাপুরী-শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের স্বাভাবিক ফল অনুযায়ী বিবেকানন্দমানসে মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপের প্রাধান্য।

কিন্তু সাকার-উপাসনার সঙ্গে সম্বন্ধও তিনি ধ্যানে ও মননে স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুধর্মের ব্যাপক সমগ্রতাকে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মসমন্বয় যেমন প্রত্যক্ষ ধর্মোপসন্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদৃষ্টির সঙ্গে তার একটু পার্থক্য রয়েছে। মানুষের মধ্যেই যে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, একথা মানলেও বিভিন্ন ধর্মের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে এক নিরন্তর সত্যের উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা রবীন্দ্র-জীবনে দেখা দেয়নি। কিন্তু বিশ্বমানবের অন্তরতম ঐক্যোপলব্ধির মাধ্যমে যে দেশকাল নিরপেক্ষ পরম সত্যের উত্তরাধিকার রবীন্দ্র-মানসে ধরা দিয়েছে—তার প্রসারতাও অনেকখানি। কিন্তু অদ্বৈত ও দ্বৈত—দুই পন্থাকেই পরিহার করার ফলে যে বিশিষ্ট অনুভবের জগতে রবীন্দ্রনাথ বিচরণশীল—ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনা সে চেতনাকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করাতেই ভারত-মানসের নিজস্ব শক্তি। এদিক থেকে রাজর্ষি অশোক থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত চেতনার সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিল ও অমিল দুইই লক্ষণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুলব্যবহৃত 'কামিনীকাঞ্চন' শব্দটির প্রসঙ্গও বিবেকানন্দ অনুষঙ্গে এক্ষেত্রে ভাববার কথা। যাঁরা ঐ দুই সাধকের মতো সংসারবাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে চান বা মনে করেন, এইটিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ—তাঁদের পক্ষে কাম বা অর্থের বাসনা ত্যাগ অবশ্য-কর্তব্য—একথা পৃথিবীর সব ধর্ম-মতেরই মূলকথা। যদি কারো পক্ষে তা সম্ভব না হয়, তখনই যোগ ও ভোগের সামঞ্জস্যের প্রশ্ন উঠতে পারে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কামিনীকাঞ্চন শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে বিরক্ত ছিলেন। যাঁরা মানবহৃদয়ের কামনাবাসনাকেও মূল্য দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের পক্ষে এইই স্বাভাবিক। মানব মনে অর্থ ও কামের আধিপত্যের দু'জন দিশারী—মার্কস্ ও ফ্রয়েড—তাঁদের অভিনন্দন জানাবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যেই স্বভাবকে অতিক্রম করার যে প্রবণতা রয়েছে, তারই ফলে সুপ্রাচীনকাল থেকে অর্থ ও কাম এ দুয়ের সঙ্গে সংগ্রাম, সংঘাত ও জয়লাভ—এও মানুষেরই ইতিহাস। বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ সে ইতিহাসের সাক্ষ্য।

একথাও স্মরণীয় যে, 'মায়া' কথাটির নিহিতার্থ নিয়ে রবীন্দ্রমানসে যে ধারণা ছিল, তার সঙ্গে শঙ্করাচার্য-বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যার কোনো মিল নেই। মায়া অর্থ যে একেবারে মিথ্যা নয়, একথা রাজা রামমোহনও সব সময় ভাবেননি। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর চিঠিতে বেদান্তের অমন সুলভ ব্যাখ্যা তাই সম্ভব। মায়া অর্থে 'সদসৎ অনির্বচনীয়'—যা সত্যের আকারে প্রকাশিত হলেও যথার্থ সত্য নয়। কিন্তু ব্যবহারিক পৃথিবী এই বহিরঙ্গ সত্যকে অবলম্বন করেই অগ্রসর। জগতের যথার্থ স্বরূপ 'ব্রহ্মসত্য'কে যে অনুভব করেছে, তার পক্ষে যথার্থ কল্যাণের অনুষ্ঠান সম্ভব—একথা জগতের সব মহামানব সম্বন্ধেই খাটে। ভারতবর্ষে মহামানবের মানদণ্ড এই ধ্যানদৃষ্টির আলোকে নির্ধারিত। সেক্ষেত্রে মায়াবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আজীবন বিতৃষ্ণা হয়তো দেবেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-বিমুখতার ঐতিহ্য থেকেই প্রসারিত। অথচ আচার্য শঙ্কর মায়াবাদী নন, ব্রহ্মবাদী।

কিন্তু জীবনসত্যের তুঙ্গতম শিখরে আরোহণের আগে বহু বিচিত্র বিশ্বসত্যের যে আনন্দময় প্রকাশ—তাকে আমরা জীবন থেকে প্রায় বর্জন করতে চলেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ জীবনানুভবের এই ব্যাপ্ত দিকটি তাঁর বহুমুখী সাহিত্যপ্রয়াসে আমাদের জাতীয়মানসে তুলে ধরেছেন। এই বর্ণাঢ্য যবনিকা হয়তো স্থায়ী নয়, তবু তারই মাঝে অনন্ত মাধুর্যের আভাস—এ কথাটি রবীন্দ্রমানস থেকে আমাদের সংস্কৃতির সব স্তরে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের বেঁচে থাকাকে মূল্যবান করেছে।

বাঙালী সংস্কৃতির আধুনিক রূপটির বহিরঙ্গ প্রধানতঃ রবীন্দ্র-নির্ভর। তার কারণ রবীন্দ্রমনোভূমির পশ্চাৎপটে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনশিল্প সচেতনতা। শান্তিনিকেতনে অরূপভাবনাশ্রয়ী সৌন্দর্যচেতনার সে আদর্শ জীবনযাপনের নানা ছন্দে রূপে রঙে রেখায় আমাদের কল্পনাকে উজ্জীবিত এবং ইহলোকের অন্তরময় রহস্য সম্বন্ধে সানন্দ জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসংস্কৃতির অনেকটা জুড়ে ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতি। আবার সে সংস্কৃতি পুরোপুরি হিন্দুপ্রবাহ থেকে বিযুক্ত নয় বলেই অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁদের অনুগামী শিল্পীরা জীবনবোধের নিজস্ব মাত্রা সংযোজন করেছিলেন আমাদের শিল্পচেতনায়। কবিতা, গান, ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য—এ সব কিছুতেই মিলে আমাদের এ যুগের মার্জিত রুচির অনেকখানি পাশ্চাত্য অনুকরণের বাইরে এই জোড়াসাঁকো-শান্তিনিকেতনের দানে পরিপুষ্ট। ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভাবিত জীবনাদর্শ ও মূলতঃ মহর্ষি-প্রণোদিত ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতির মিলন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু একদিকে সর্বস্বত্যাগী ঈশ্বর সন্ধানের বৈরাগ্য ও আর একদিকে জগৎ ঈশ্বরের আপন মূল্যবোধে অবস্থিত থেকেই বাসনা ও ভক্তির মিলন প্রচেষ্টা—দুয়ের মধ্যে ফাঁক থাকে যথেষ্ট। সুতরাং নিবেদিতার সে প্রচেষ্টা খুব একটা সফল না হলেও রবীন্দ্র-মানসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের অভিকর্ষে 'গোরা'র মতো মহাকাব্য সৃষ্টি। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে যেমন সর্বত্র বিরাজমান থেকেও বিবেকানন্দ শব্দটি অনুপস্থিত, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তেমনি বিশেষভাবে বিবেকানন্দের নামোল্লেখ ততটা দেখা না গেলেও তাঁর কর্মে, কল্পনায়, অনুভূতিতে এই অনুজ অগ্রগামীর অনেক নিহিত প্রেরণাই লক্ষণীয়।

বিশেষতঃ ভারতের তরুণমানসের জাগরণে বিবেকানন্দের আহ্বান যে অমোঘ, একথা তো সরসীলাল সরকারকে লেখা চিঠিতে কবি স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন। ভারত পরিক্রমার দ্বারা বিবেকানন্দ এবং পূর্ববঙ্গের গণ-সান্নিধ্যে বাসের ফলে রবীন্দ্রনাথ যে গণজাগরণের অবশ্যম্ভাবী স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার দ্বারাই তাঁদের কর্ম ও জীবনের লক্ষ্য অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত। সমাজতন্ত্রকে যাঁরা একমাত্র পাশ্চাত্যের দান মনে করেন, তাঁরা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের গণসংযোগের বিশেষ সত্যটি ভুলে যান। বিবেকানন্দ রাশিয়া বা চীনে যে গণবিপ্লবের সম্ভাবনা ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, সে গণবিপ্লবের প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন, প্রকাশ করেছেন 'রাশিয়ার চিঠি'তে। কিন্তু স্বামীজীর চিন্তাধারা লক্ষ্য করলে এ গণবিপ্লবের পরিণাম আগামী বিশ্বসভ্যতার কেন্দ্র ভারতবর্ষে হওয়ার কথা। আমাদের সাধনা ও সংগ্রামের কৃতকার্যতার উপর এ ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' ঃ বীরবাণী : বিবেকানন্দ।

২. সভ্যতার সঙ্কট।

রবীন্দ্র-মানস : দ্বিধা, সমন্বয় ও পরিণাম

রথীন্দ্রনাথ রায়

'বলাকা'র একটি কবিতায় কবি বলেছেন, ''জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে ফোটে তোমার মানস-সরোবরে।'' ক্রমবিকশিত অখণ্ড জীবন-পরিণতির এই সরল-সংক্ষিপ্ত আশ্চর্য-সুন্দর রূপকল্পটি জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ স্বীকৃতি। শিল্পের যেমন একটি বিশেষ রূপ আছে, তেমনই জীবন-শিল্পেরও একটি বিশেষ স্বরূপ আছে। জীবন থেকে জীবনান্তরে প্রসারিত একটি সত্তার ক্রমবিকশিত রূপ যেন জীবন-বিধাতারই গতিশীল স্বপ্নপ্রবাহ—আজও যা পূর্ণ নয়, কিন্তু পূর্ণতার প্রতীক্ষায় উন্মুখ। জীবনোপলব্ধির এমনই এক সন্ধিসীমায় কবি মাঝে মাঝে এই শ্রেণীর মন্তব্য করেছেন। সেই উপলব্ধির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য কম নয়—তাতে যেমন দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও ঋজু রাখা দুরূহ ব্যাপার, তেমনি দুরূহ এই বৈচিত্র্যের পথে পথে যে আপাতবৈপরীত্যের অসমতল ভূখণ্ড আছে, তাকে অতিক্রম করা। তাই প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কবির ছোটখাটো টুক্‌রো কথাকে যেমন-তেমন অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা যেমন সহজ, তেমনই দুরূহ কবির অখণ্ড জীবনাভিপ্রায়ের যথার্থ রূপ আবিষ্কার করা। কবির দীর্ঘ জীবনে যে-সমস্ত উপলব্ধি ঘটেছে, তার দ্বিধা ও বৈপরীত্য কম নয়। কিন্তু তাতে কবির অভগ্ন জীবনাচরণের মূল সত্যটিই নিঃসংশয়িত হয়েছে। শিল্পীর জীবনে, বিশেষত যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মত জীবনশিল্পী—তাঁদের জীবনে, এই দ্বিধা ও বৈপরীত্যের মূল্য কম নয়। দুই বিপরীত কোটির আপাতবিরোধী আন্দোলন কবির বাসনালোককে নিরন্তর সৃষ্টিরহস্যে স্পন্দিত করেছে।

'সোনার তরী' পর্বে প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা একখানি চিঠিতে কবি এই সময়ের একটি উপলব্ধির কথা বলেছেন। ''আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে, আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।'' লোকালয়াশ্রিত জীবন-বৈচিত্র্যের সঙ্গে এই পর্বে কবির পরিচয় ঘটেছে—আত্মরুদ্ধ অস্পষ্ট আচ্ছন্ন ভাবনাগুলি পদ্মা-লালিত জীবনের বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত! 'সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা' এবং 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' আপাতদৃষ্টিতে যতই বিপরীত হোক না কেন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির স্তরের সীমা পার হয়ে যখন শিল্পরূপ পেয়েছে, তখন তার মধ্যে আর কোন বিরোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এখানে 'যেতে নাহি দিব'র মত কবিতাও যেমন আছে, তেমনই আছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র মত কবিতা। এক সময় মোহিতলাল 'উর্বশী' কবিতার স্বত-বিরোধ খুঁজে পেয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণেই ('আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের 'বিহারীলাল চক্রবর্তী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ-সম্পর্কে কবি নিজে যে জবাবদিহি করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। ''নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী তারই প্রতীক। সে-সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য—সেইজন্য কোন কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে-কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য, সেইজন্য তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলী যাকে ইনটেলেকচ্যুয়াল

বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তাকে অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে তবে সেজন্য আমি দায়ী নই।”—কবির এই উক্তি থেকে সৌন্দর্যের আপাতবিরোধী দ্বিমুখী প্রকৃতির সমন্বয় কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক রচনাতেও তেমনি বহু বিপরীত মন্তব্য চোখে পড়বে। ‘কড়ি ও কোমল’-এর যুগে কবি বলেছিলেন, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।’ আবার সেই কবিই পরবর্তীকালে বলেছেন, ‘মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া সব সম্পদ খোয়ায়ে।’ মৃত্যুহীন জীবন-পূজারীর আকস্মিকভাবে মরণরসিক হয়ে ওঠা আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হলেও মূলে কোন বিরোধ নেই, সাধারণ দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু পরস্পরবিরোধী মনে হলেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রসারী চেতনার আলোকে এই দুই জগৎ এক হয়ে উঠেছে। এক অখণ্ড গতি-চেতনাকে কবি জীবন ও জগতের বৃহত্তর তাৎপর্যের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন, জীবন মৃত্যুর মহাসমুদ্রে স্নান করে প্রতিমুহূর্তে নতুন হয়ে দেখা দিল—এখানে জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখা পর্যন্ত যেন অবলুপ্ত হয়েছে।

“ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।।”

রবীন্দ্রনাথের বসন্ত অথবা তারুণ্যের মধ্যেও এই ধরনের একটি কবিভাষা আছে। ‘ফাল্গুনী’ নাটকের ব্যাখ্যায় কবি বলেছেন : “...পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে—যারা মৃত্যুকে ভয় করে তারা জীবনকে চেনে না;তারা জরাকে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে, প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।” কবি তাঁর এই উপলব্ধির আপাতবিরোধী উপাদান সম্পর্কে নিজেই যা মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : “সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। এই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হক তার মূলে একটি গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত।”

রবীন্দ্রনাথের প্রেমানুভূতির মধ্যেও একজাতীয় বিরোধ চোখে পড়ে। কবিতায় নাটকে ও কথাসাহিত্যে সর্বত্রই এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ চিহ্নিত। ‘কড়ি ও কোমল’-এর যৌবনস্বপ্নের মধ্যে যেমন একদিকে আচ্ছন্নতা ও বিহ্বলতা তেমনই অন্যদিকে অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার করুণ সুন্দর বিষণ্ণতা। সম্ভোগের নেপথ্যে এক ভোগাতীত বিস্ময় ও জীবনদ্বন্দ্বের বিচিত্র রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। যৌবনের ‘কুসুম কারাগার’ থেকে বৃহত্তর মানবজগতে নিজেকে মুক্ত করার সাধনা কবিকে পীড়িত করেছিল—তাই কীট্সীয় সৌন্দর্যসাধনার অতি-বিচিত্র রূপবিহ্বলতার জগৎ রবীন্দ্রনাথের প্রেমসৌন্দর্যমণ্ডলীর একটি বিশিষ্ট অবস্থা মাত্র, সবটুকু নয়। ‘মানসী’র ‘সুরদাসের প্রার্থনা’ কবিতাটি এই লগ্নের কবিমানসের আত্মকাহিনী। তাই জীবনদ্বন্দ্ব-জর্জরিত কবি সুরদাস বলেছেন,

“যাক্ তাই যাক্! পারিনে ভাসিতে
কেবলই মূরতি-স্রোতে,
লহ মোরে তুলি আলোক-মগন
মূরতি-ভূবন হতে।”

এই সময়ের 'রাজা ও রানী' নাটকে প্রেমের বিপরীত প্রবাহের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। বিক্রমের 'প্রচণ্ড আসক্তি' আর সুমিত্রার আদর্শায়িত কল্যাণ-পরিণাম প্রেমের দ্বন্দ্ব কবিমানসের একটি জটিল উপলব্ধির নাট্যরূপ মাত্র। সুমিত্রার মৃত্যু এই দ্বন্দ্ব অবসানের একটি অসাধারণ উপায়। পরিণত অভিজ্ঞতার আলোকে এই আত্মিক সমস্যা 'মহুয়া'-'তপতী'-'শেষের কবিতা'র যুগে পূর্ণতর রূপ পেয়েছে। এই পরিণতির জন্য একটি আত্মিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। 'খেয়া' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্ব এই প্রস্তুতির কালপরিধি। প্রকৃতি-সত্য, মানব-সত্য ছাড়াও আর একটি জগতের পরিক্রমা তখনও বাকি। বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ভাবচর্যার নিভৃত লগ্নে আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন ছিল। এই ভাবচর্যা জীবনাচরণেরই একটি অবস্থা, আবার জীবনাধিক তন্ময়তাও বটে। 'মহুয়া' কাব্যে কবি তাঁর প্রেম-কবিতার মধ্যে স্পষ্টত দুটো দল দেখতে পেয়েছেন। একটি—'প্রণয়ের প্রসাধনকলা' যার মধ্যে হাস্য-লাস্য-ভঙ্গি-উচ্ছলতা, কোনটিই বাদ পড়েনি; দ্বিতীয়টি—'প্রণয়ের সাধনবেগ' যার মধ্যে আছে প্রেমের ঋজু-দীপ্ত তপস্যা-পরায়ণা মহাশ্বেতা-মূর্তি। 'মহুয়া'র মধ্যে যে প্রকৃতিমুখ্য ভাবলাবণ্যের বাণীরূপ আছে, তারই মানব-মুখ্য কথাচিত্র। তাই 'শেষের কবিতা'য় এই ভাবদ্বন্দ্বের সংঘাত তীব্রতর। লাবণ্যের চিঠিতে এই সংঘাতের পূর্ণ পরিচয় আছে—শিল্পী অমিতর জন্য লাবণ্যের রইল 'সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়, সে আমার প্রেম।' আর মানবী-লাবণ্য অনায়াসে বলতে পেরেছে 'মোর লাগি করিয়ো না শোক, আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।'

প্রকৃতির আরণ্যক বাসনায় প্রেমের তির্যক অভিব্যক্তি স্বল্পাভাস-সুন্দর—কখনও প্রকৃতি পটভূমিকায়, কখনও বা ভূমিকায়। এখানেই প্রেমের সমন্বিত সৌন্দর্যের পূর্ণতা। কিন্তু মানবমনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে যতবার যুক্ত হয়েছে, ততবারই দ্বিধার সুর সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। যেখানে সমন্বিত হয়েছে, সেখানে প্রেম একটি বিশেষ ধরনের সৌন্দর্যচর্যায় পরিণত হয়েছে। ব্রাউনিং-এর যেখানে মানবানুগ প্রেম-বৈচিত্র্য, রবীন্দ্রনাথের সেখানে সৌন্দর্যচর্যা। অপরপক্ষে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে, 'চার অধ্যায়ে'র অতীন-এলার প্রেমকাহিনীতে যে উচ্ছ্বসিত দাবদাহের বর্ণাঢ্য ছবি আছে, তা থেকে শেষজীবন পর্যন্তও কবির সম্মুখে একটি প্রেমদ্বন্দ্বের স্বরূপ ছিল, তা উপলব্ধির পক্ষে কোন বাধা থাকে না। শিল্পীজীবনের প্রেমানুভূতি নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম কৈশোরে। 'বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা' ও 'গেটে ও তাহার প্রণয়িণীগণ' (ভারতী, ১২৮৫, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন) প্রবন্ধত্রয়ে তার শুরু, 'শেষের কবিতা'য় তার পরিণতি। তথাপি উত্তর-সপ্ততি রবীন্দ্রনাথ দ্বিধা-চঞ্চল কণ্ঠে বলেছেন, 'প্রেমে আর মোহে, একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।' গ্যয়টের মতো রবীন্দ্রনাথও তাঁর বহু রচনায় শিল্পজীবন ও প্রেমের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির মাধ্যমে প্রেমের যে সুসমঞ্জস ছবি ফুটেছে, শিল্পীর জীবন ও মানবজীবনের দিক থেকে সে-সামঞ্জস্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এই দ্বিধার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

মধ্যবয়সে কবি গভীর আত্মনিরীক্ষার মুহূর্তে বলেছিলেন, ''এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়—যে-সমাধান পরমশক্তি, পরমমঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি বলেছি।'' ইংরেজ সমালোচক শিল্পীকে 'গুড আর্টিস্ট' ও 'গ্রেট আর্টিস্ট'—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে সমালোচক এই শ্রেণীবিভাগ করতে কাব্যের চেয়ে কবিমানসের দিকেই প্রধানত দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করলেই 'মহৎ শিল্পী' হয় না, 'মহৎ শিল্পী'র

ভিত্তিমূলে আছে কবি-মানসের একটি বিশেষ প্যাটার্ন। সেই অখণ্ড মানসমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয় জগৎ ও জীবনের একটি সর্বঙ্কর অভিপ্রায়। জীবন-দ্বন্দ্বের আলোক-দীপ্ত সূর্যোদয়ে তার এক-একটি পাপড়ির উন্মোচন। দ্বন্দ্ব সেখানে ক্ষয়িষ্ণুতার অবসাদ আনে না, বরং নূতন পথ দেখায়; ‘‘এপার হইতে নবজীবনের পারে, চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।’’ এই নবজীবনের আর শেষ নেই। যতবার দ্বিধা, যতবার সংশয়, ততবারই নূতন পূর্বাচলের অনুসন্ধান। এই কারণেই মহৎ অর্টিস্টমাত্রেই গতিরাগের সুরকার। রেনেসাঁর কাল থেকে মানবেতিহাসের যে কয়েকজন ‘মহৎ শিল্পী’ আছেন, অন্যদিকে তাঁদের পরস্পরের প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, যে-জীবনকে তাঁরা দেখেছেন বহু দ্বিধাবঙ্কিম পথের ভিতর দিয়েও তার অভিপ্রায় সমগ্র ও অখণ্ড। মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিরেখায় দান্তের কাব্যে পুরাতন ও নূতন পৃথিবীর সামগ্রিক স্বপ্ন, রেনেসাঁর পূর্ণপ্রতিভা শেক্সপীয়ারের নাটকে সৃষ্টিরহস্যের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ও মননশীলতার সঙ্গে শাশ্বত মানব-অভীপ্সার উদার সমন্বয়-সাধক গ্যয়টের সমুন্নত দৃষ্টি, উচ্চতর জীবননীতি ও আপাতসুন্দর অকল্যাণের দ্বন্দ্বে কাতর ঋষি টলস্টয়ের অশান্ত জীবনজিজ্ঞাসা মানবেতিহাসকে যে সমুন্নত ও মুক্ততর প্রেরণা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তারই উত্তরসাধক। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যতই থাকুক তাঁর উপলব্ধিসঞ্জাত নির্দেশ ছেড়ে তিনি পথভ্রষ্ট হননি। সাময়িকতার ধূলি উড়ল, তর্কে-বিতর্কে জল ঘোলা হয়ে গেল, অথচ সবসময়ে তিনি নিজের কালের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হয়েও রইলেন সর্বকালের উর্ধ্বে। কবি বলেছেন, ‘‘সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি, তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে, তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই।’’ —(আত্মপরিচয়, পৃ ৩৬)

উত্তর-সপ্ততি রবীন্দ্রনাথের গহনময়তা ও অন্তর্গূঢ়তা অনন্যসাধারণ। আত্মোপলব্ধির এই মৌন মুহূর্তে কবির সম্মুখে এক চরম সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

শিল্প-সত্য ও আত্মতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্র-মানসের চূড়ান্ত পরিণাম। এই সত্যের উপলব্ধির পথে এসেছে নানা বিরোধ, নানা সংশয়, কিন্তু কাব্যাচরণের অভিপ্রায় তাতে ব্যাহত হয়নি। রবীন্দ্রমানসের বিস্তৃতি ও বহুভাষণের কেন্দ্রে অবস্থিত এই উপলব্ধিই তাঁর শিল্পীজীবনের প্যাটার্নকে রূপায়িত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে কবি তাঁর কবি পুরুষের মৌলিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে বলেছিলেন, “The ‘I am’ in me realizes its own extension, its own infinity whenever it truly realizes something else.” —(The Religion of an Artist)

জীবনের বহু বিরোধী উপাদান কীভাবে তার মূল সত্যের চারপাশে এসে সংহত হয়েছে তার কথা বলেছেন অন্যত্র—সেখানেই তাঁর শিল্পীজীবনের মহাসমন্বয় ও মহৎ পরিণাম। ‘‘আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে-প্রেমের এক দিকে দ্বৈত, আর এক দিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।’’ —(আত্মপরিচয়)

কবির এই স্বীকৃতির মধ্যেই তাঁর কাব্যাচরণের দ্বিধা, সমন্বয় ও পরিণামের মূল সুর পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্যাটার্ন অনুসরণ করেই একমাত্র বিচিত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব। জীবনের কেন্দ্রগত মর্মকোষ থেকেই বর্ণবিচিত্র পাপড়ির উন্মোচন।

> "Tagore's life-pattern was essentially melodic, with numerous improvisations indeed, but it was built round the radiant notes."
>
> — (Tagore a Study, Dhurjati Prasad Mukherjee)

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের এইখানেই অখণ্ড সত্য-সাধনা!

টলস্টয়, ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ

ভবানীগোপাল সান্যাল

কলাসৃষ্টির সার্থকতার দিক থেকে যে আপত্তি টলস্টয় তাঁর *What is Art* (১৮৯৮ খ্রীঃ) গ্রন্থে তুলেছেন তা আমাদের মনে প্লেটোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্লেটো কবির সৃষ্টিকে অনুকরণের অতিরিক্ত মূল্য দেননি। মৌলিকতার দিক থেকে কবির সৃষ্টি সত্যের দূরবর্তী। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি নাটক দর্শক চিত্তকে দুর্বল করে ও মনের ভারসাম্য বিচলিত করে। সাধারণতঃ মানুষ তার হৃদয়ের দুর্বল বৃত্তিসমূহকে সংযত রাখবার প্রয়াস করে থাকে। কিন্তু ট্র্যাজেডি দর্শনে তাদের মন শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়।

টলস্টয়ের বিরোধিতা প্রায় অনুরূপ। তাঁর মতে কয়েকটি ব্যতীত এ যুগের উপন্যাস, চিত্র ও ভাস্কর্য পাপের পঙ্কিলতায় পূর্ণ। বর্তমানে আর্ট নামে যা প্রচলিত তা মানব-সমাজের উন্নতির সহায়ক না হয়ে সৎ-প্রবৃত্তিসমূহের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ এই সাহিত্যকে সমর্থন করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। খ্রীস্টীয় জগতে আর্ট নামে যা সমাদৃত তাকে রক্ষণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর, টলস্টয়ের মতো প্লেটো বহুপূর্বে দিয়েছেন। যে আর্ট জীবনকে কলুষিত করে চলেছে তা নিন্দনীয়।[১]

ভবিষ্যতে যে নূতন আর্ট গড়ে উঠবে তা জাতির সীমাবদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হবে। যাঁদের মধ্যে থাকবে সৃষ্টির প্রবণতা বা ক্ষমতা তাঁরা শিল্পসৃষ্টিতে ব্যাপৃত হবেন। নূতন সৃষ্টিতে ব্যক্ত হবে স্পষ্টতা, সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা। আর্টের রসগ্রহণ করবেন সকল শ্রেণীর মানুষ। নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ ও আলস্যময় জীবন আর্ট সৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক, এই ভ্রমাত্মক ধারণা তিরোহিত হবে। শিল্পীরা যাপন করবেন সাধারণ মানুষদের মত জীবন। তাঁদেরও পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। যে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তাঁরা সৃষ্টি করবেন তা সকল মানুষকে আনন্দ দান করবে। এই উপলব্ধি ও সার্থকতা শিল্পীদের পক্ষে হবে পুরস্কার।

টলস্টয় সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ আদর্শের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রচলিত উপন্যাস সমূহে বর্ণিত প্রেমের কাহিনীকে তিনি নিন্দা করেছেন। সৎ সাহিত্যের, যাকে তিনি ক্রিশ্চিয়ান আর্ট বলেছেন, উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরাভিমুখীনতা ও মানবজাতির জন্য সৌভ্রাত্রবোধের সৃষ্টি। যাকে তিনি বলেছেন অখ্রীস্টীয় আর্ট তা স্বাদেশিক প্রেরণায় রচিত বা তা ধর্মের নামে বিশেষ মতবাদের শিক্ষা দেয়। এর ফলে ঐক্যবোধের পরিবর্তে মানুষের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়ে থাকে। সত্যকার আর্টের তাৎপর্য হলো যে তা সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে।

দু'প্রকারের অনুভূতির কথা টলস্টয় বলেছেন। এই অনুভূতি মানুষকে মিলিত করে। প্রথমটি হলো ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও দ্বিতীয়টি হলো সাধারণ অনুভূতির বন্ধন যথা আনন্দ, দয়া, প্রশান্তি প্রভৃতি। এই দু'প্রকারের অনুভূতি সার্থক আর্টের বিষয়বস্তু হতে পারে।

প্রথমটির দৃষ্টান্তরূপ তিনি হুগোর লে মিজারেবলস্, ডিকেন্সের গল্প উপন্যাস, আঙ্কল টমস্ কেবিন, ডস্টয়-ভস্কির সাহিত্য, জর্জ এলিয়টের আডাম বিডের কথা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য যার মধ্যে সুন্দর অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে আছে সময় ও স্থানের অতিশয়িত বর্ণনা, চিরন্তন প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় তার বিষয়বস্তুর দৈন্য স্বীকার্য। এই শ্রেণীর মধ্যে ডন কুইকজোট, মলেয়ারের কমেডি, ডিকেন্সের পিকউইক পেপার্স, পুসকিনের ও গোগোলের গল্প এবং কিছুটা মোঁপাসার সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

টলস্টয় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এতে করে, তাঁর বিচারে, তাঁর নিজের সাহিত্যও নিন্দিত হয়েছে। তিনি সমর্থন জানিয়েছেন চিরন্তন বিশ্বজনীন সাহিত্যকে। এ-যুগে অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট সাহিত্য বিশ্বজনীনতার দাবী করতে পারে না। বিশ্বজনীন সাহিত্যের মূলে আছে ধর্মবোধ যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য হলো 'মানব বিশ্বমানবের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য, ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেকে লইয়া কেবলই ভাঙ্গাগড়া করিতেছে।'

টলস্টয়ের মতে অতীতে যা ছিল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—যথা বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্ব, আইজাক, জোসেফ ও জ্যাকবের কাহিনী, ইলিয়াড ও অডেসি তা সকল মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে যে অনুভূতি তা সকল মানুষের নিকটে সত্য ও সার্থক। কিন্তু বর্তমানকালে সমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পীগণের সৃষ্ট সাহিত্য জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারে না। শিল্পীদের বক্তব্য হলো যে তাঁরা সৃষ্টি করেন ও যারা তার রস গ্রহণ করতে চায় তাদের তা নিজের দায়ে করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় শ্রেণীগত অহমিকাবোধ, যৌন আকর্ষণ ও জীবন সম্পর্কে ক্লান্তি। আধুনিক সাহিত্য তাই ভঙ্গী-সর্বস্ব।

এই ক্লান্তিবোধ জীবনে এনেছে বিষণ্ণতার সুর। ফরাসী সমালোচক ডুমিক বলেছেন যে আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ হলো জীবন সম্পর্কে হতাশা ও ক্লান্তি, বর্তমান সম্পর্কে অনীহা ও বিদ্বেষ এবং অতীতযুগ সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন মনোভাব ও দুঃখবোধ।

সাধারণ মানুষের নিকটে তাই এই সাহিত্য অর্থহীন, অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়।

আধুনিক কাব্যে দুর্বোধ্যতা একটি বড় লক্ষণ। এটি সমর্থনযোগ্য নয়। মালার্মের মতে, যেখানে অর্থ অনুমান করে নিতে হয়, সেই কবিতা সুন্দর। কবিতা যেখানে স্পষ্ট সেখানে তার তিন-চতুর্থাংশ আনন্দ বিনষ্ট হয়ে থাকে। টলস্টয় ডুমিকের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন যে এই দুর্বোধ্যতার অবসান ঘটানো প্রয়োজন।[২]

সত্যকার শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হলো জীবনবোধের গভীরতা ও তাকে সাহিত্যে সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা ও রূপসৃষ্টির প্রতিভা। বাস্তব পরিচয়ে চিহ্নিত সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এই সাহিত্য হয়ে পড়েছে জীবনের অনুকরণ-ধর্মী।

যে সঞ্চার-ধর্মিতার উপরে টলস্টয় গুরুত্ব অর্পণ করেছেন তা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমটি হলো অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্য, দ্বিতীয়টি প্রকাশের স্পষ্টতা ও তৃতীয়টি শিল্পীর আন্তরিকতা। অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য যে পরিমাণে প্রকাশিত হবে তা সেই পরিমাণে পাঠকমনকে উদ্বুদ্ধ করবে। শিল্পীর মনের সঙ্গে পাঠকের সহধর্মিতা স্থাপিত হয়ে সে আনন্দ লাভ করবে। শিল্পীর আন্তরিকতা হলো বড় কথা। এর ফলে তিনি তাঁর অনুভূতির অভিজ্ঞতা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করবেন।

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে এই কথা স্বীকৃত হলেও বলা হয় যে রসগ্রহণের জন্য সামাজিক মনের সংস্কার বা বাসনা প্রয়োজন। কাব্যরস গ্রহণের জন্য যদি পাঠক-মনে যদি রত্যাদি বাসনা না থাকে তবে রসগ্রহণ সম্ভব নয়। রসচর্বণার জন্য যে কারণসমূহ আছে তাদের প্রতীতি সহৃদয় চিত্তে। রবীন্দ্রনাথ কথাটিকে অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। 'সাহিত্য সর্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে মানুষের আনন্দ-নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চির-পুরাতন বিরহ বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত' (সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ২৫)। কিন্তু এই স্বাদ পাবার জন্য মানুষকে যত্ন করে শিক্ষা করতে হবে। রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা রসিকের অপেক্ষা রাখে। 'রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর সকলকেই বাদ দিয়ে কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।' (সাহিত্যের পথে, পৃ. ১৭)

টলস্টয় আপত্তি উত্থাপন করবেন যে মেঘদূত যদি সর্বমানুষের চিত্তে আনন্দ দিতে না পারে তবে তা প্রশংসার যোগ্য নয়। জনসাধারণ যদি বাইবেলের কাহিনী, সৃষ্টিতত্ত্ব, রূপকথা ও লোকগীতি সমূহের আনন্দ গ্রহণ করতে পেরে থাকে তবে খাঁটি সাহিত্যরসও গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কঠিন নয়। তাঁর মতে 'Great works of art are only great because they are accessible and comprehensible to every one'.

এই হেতু তাঁর বিশ্বাস হলো যে ভবিষ্যতের শিল্পী অনুধাবন করবেন যে উপন্যাস রচনা বা চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা রূপকথা রচনা, ঘুমপাড়ানি গান, চিত্তাকর্ষক ধাঁধা প্রভৃতি রচনা করবার মূল্য অনেক বেশী। টলস্টয় যুগ-ভাবনাকে স্বীকৃতি দেননি।

প্রকাশের স্পষ্টতা সম্বন্ধে টলস্টয় বলেছেন যে স্পষ্টতা হেতু পাঠকমন সহজে ভাবকে গ্রহণ করতে পারে। যে অনুভূতি তার মনে আছে তাকে সে ভাষায় ব্যক্ত হতে দেখে আনন্দলাভ করে। শিল্পীর আন্তরিকতা পাঠকমনে সাড়া জাগায়। শিল্পীর মানসিক অবস্থা তাকে প্রভাবিত করে থাকে।

সর্বোপরি কথা হলো যে শিল্পী অন্তরের তাগিদে প্রকাশ করবেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁর অনুভূতি পাঠকের নিজস্ব বলে মনে হবে। ভাব যত বিশিষ্ট হবে, যত গভীর ভাবে শিল্পী অনুভব করবেন, ততই তিনি গভীর প্রেরণায় তাকে পরিস্ফুট করতে পারবেন।

শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সঞ্চারধর্মিতা। শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে মানবজাতি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।[৩]

রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। রামায়ণ সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্‌বোধিত করেছে।

টলস্টয়ের মতে যে সাহিত্যসৃষ্টি 'must result from the author's need to solve an inner doubt'. এ হলো প্রকৃতপক্ষে প্রকাশের বেদনা।

রবীন্দ্রনাথের মতে কবি অন্তরের অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদ থেকে সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর বেদনাময় চৈতন্য নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেন। তাদের সংশ্রবে যা তিনি অনুভব করেন তা হয়ে ওঠে সত্য ও বাস্তব। 'বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরস একেবারে অব্যবহিতভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার জোর'। কবি সৃষ্টি করেন অন্তরের তাগিদে। তাঁর অন্তরের ধ্রুব আদর্শ আনন্দময়, সুতরাং তা অনির্বচনীয়।[৪]

টলস্টয়ের মতে সাহিত্যে তিনটি ধারা আছে। একটি হলো বিষয়গত। এই বিষয় হবে প্রয়োজনীয়, নৈতিক ও হিতকর।

দ্বিতীয় ধারাটি হলো নন্দন-তত্ত্বের। এ ক্ষেত্রে বিষয় শিল্পের সৌন্দর্য-রীতির উপরে নির্ভর করে।

তৃতীয়টি হলো বাস্তব। এখানে প্রয়োজন বাস্তবের যথাযথ পরিচয় দান।

শিল্পসৃষ্টি হলো মানসিক প্রক্রিয়া। শিল্পী মানবমনের অস্পষ্ট অনুভূতি ও চিন্তাধারাকে এমন উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করেন যাতে তা লোকমনে সঞ্চারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে।' রসবোধে আমরা আমাদের জানি ও সেই জানাতে আনন্দ পাই। রসবোধের মধ্যে বস্তুর অতীত এমন এক ঐক্যবোধ আছে যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হয়। 'এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।' তিনি বলেছেন যে রস-সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রস-সাহিত্যে।

টলস্টয় বলেছেন যে কবি হয়তো কোন কিছু অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছেন, এমন অনুভূতি, যা তাঁর কাছে নূতন বা অভিনব। তিনি যদি তা অপরের নিকটে ব্যক্ত করেন তা শ্রোতা বা পাঠকের মনে অনুরূপ ভাবোদ্রেক করবে না। প্রত্যয়বান হয়ে যদি তিনি তাঁর অনুভূত উপলব্ধিকে রূপদান করেন তা পাঠকচিত্তে সানন্দে গৃহীত হবে। যা পূর্বে ছিল অস্পষ্ট তা বিশ্বাসের গুণে ও আন্তরিকতা হেতু অপরের মনে সঞ্চারিত হয়। পাঠক তা গ্রহণ করে আনন্দিত হন। এই আনন্দ উভয়বিধ। গভীর অনুভূতির প্রকাশ শিল্পীর নিকটে আনন্দের বিষয় এবং পাঠকও সেই অনুভূতি গ্রহণ করে, শিল্পীর অভিজ্ঞতা লাভ করে আনন্দ পেয়ে থাকেন। একে রবীন্দ্রনাথ নৈকট্য বা সম্মিলন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

সুতরাং টলস্টয়ের মতে আনন্দ ফলশ্রুতি হলেও, তা আর্টের উদ্দেশ্য নয়। সৌন্দর্য আনন্দ দান করে, কিন্তু তা আর্টের লক্ষ্য নয়। সৌন্দর্যতত্ত্বকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেননা তার উদ্দেশ্য হলো আনন্দ দান। আর্টের প্রকৃত নির্দেশক হবে আধ্যাত্মিক অনুভূতি যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে টলস্টয় সাহিত্যের পরিমাণগত ফলকে আনন্দ বলে মেনে নিলেও সৌন্দর্যের ফল যে আনন্দ, সেই সৌন্দর্যতত্ত্বকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে 'In the same way beauty, or that which pleases us, can in no sense serve as a basis for the definition of art'.

আলঙ্কারিকগণ আনন্দকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ক্রৌঞ্চীর শোক বাল্মীকির মনে শোকভাব উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাঁর শোক লৌকিক শোক থেকে ভিন্ন, কেননা তা তাঁর চিত্তবৃত্তির আস্বাদন-রূপ করুণ রসে পরিণত হয়েছে। পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে যেমন জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি করে করুণ রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত শ্লোক রূপে উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে রসসৃষ্টি হয় ভাবের উচ্ছলতা থেকে, স্বচ্ছলতা থেকে নয়। এই রস চৈতন্যের আবরণ ভগ্ন করে বলে তা আনন্দ দান করে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হলো 'আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।' পুনর্বার তিনি বলেছেন যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে আর তাই হলো সাহিত্যের সামগ্রী। সুন্দর প্রমাণিত হয় নিবিড় বোধের আলোকে। গোলাপের আছে পাপড়ি, বোঁটা ও সবুজ পাতা। এই সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব। এই ঐক্য আমাদের অন্তরতম ঐক্যকে, ব্যক্তিপুরুষকে উদ্ঘাটিত করে বলে মন তাকে সুন্দর বলে গ্রহণ করে। এই

সৌন্দর্য আনন্দকে ব্যক্ত করে। পরিণামে তাই সৌন্দর্য ও আনন্দ সমার্থক। যেখনে বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ সেখানে অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করে আনন্দ পাই। ‘অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ’। আত্মারূপী একের আত্মীয়তার কথা বলা হলেও সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনা সামঞ্জস্যকে পেতে ও প্রকাশ করতে চায় সেখানে কাব্য রচিত হয়।

ক্রোচের মত ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক কেরিট বলেছেন, যে বস্তুর মধ্যে আমরা আমাদের অনুভূতির পরিচয় পাই তাই হলো সুন্দর।

ক্রোচের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল আছে। তাঁর মতেও সৌন্দর্য ঐক্যের প্রকাশ আর অসুন্দরের মধ্যে থাকে বিক্ষিপ্ততা। উপরন্তু সৌন্দর্য বস্তুগত সত্য নয়, তা হলো মানুষের উপলব্ধি।[৫]

টলস্টয়ের মতে সাহিত্যের সৌন্দর্য হলো যা স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও বিশিষ্ট রূপে ব্যক্ত। বাস্তবতা প্রসঙ্গে তাঁর মত হলো ‘the reality not so much of what exists, as of what goes on in the soul of the artist’.

রবীন্দ্রনাথের মতে, নিখিলের সংস্রবে এসে কবি যা অনুভব করেন তাই হলো বাস্তব। ‘কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, বিশ্বের মধ্যে সেই প্রমাণ আছে।’ অন্যত্র তিনি বলেছেন যেখানে রূপ সৃষ্ট হয় তার প্রতি মনের ঔৎসুক্য ব্যক্ত হয় ও তা যদি মনের শূন্যতা দূর করে তবে তাই হলো বাস্তব। ‘যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।’

সাহিত্যের তিনটি উপাদানের কথা টলস্টয় বলেছেন। যে বিষয়বস্তু সকল মানুষের নিকটে তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তা হলো নৈতিক। যেখানে প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ ও স্পষ্ট তা হলো সুন্দর। যেখানে শিল্পীর সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক বিশ্বস্ত ও আন্তরিক তা হলো সত্য।[৬] সুতরাং শিল্পীর চিত্ত হবে আলোকিত ও তিনি আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করবেন না। শিল্পসৃষ্টি হলো জীবনের একটি অপরিহার্য দিক। তাঁর মতে শিল্প হলো ‘one of the means of intercourse between man and man’. রবীন্দ্রনাথও এই অর্থে সাহিত্যকে সহিতত্ব রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্য মানুষের সঙ্গে মানুষের, কালের সঙ্গে অন্যকালের, দেশের সঙ্গে অন্যদেশের মিলন সাধন করে।

টলস্টয়ের মতে লৌকিক জীবনে ভাষার মাধ্যমে মানুষ তাঁর চিন্তাধারাকে প্রকাশ করে থাকে। শিল্পে সে সঞ্চারিত করে অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি অপরের মনে সার্থকভাবে সঞ্চারিত হয় সেখানে শিল্পের সাফল্য প্রমাণিত হয়। একটি বালক যদি এক নেকড়ের সংস্পর্শে এসে ভীত হয়, এমনকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও কল্পিত ভীতি তাকে আচ্ছন্ন করে, তখন তার বর্ণনা যদি অপরের মনে অনুরূপ ভাব জাগিয়ে তোলে, তখন তাকে বলা যাবে শিল্প-সৃষ্টি।

রাজা দুষ্মন্তকে দেখে আশ্রম মৃগের ভীতি-বিহ্বলতা ও পলায়ন কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করে আমরা ভয়ানক রস উপলব্ধি করি। নিছক বর্ণনায় তা সম্ভব হয় না। শব্দে সমর্পিত হয়ে বিভাবাদির সহযোগে তা রসে পরিণত হয়। সেই রস আমরা উপভোগ করে থাকি।

নন্দনতত্ত্বে ক্রোচে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন, বলে বলা হয়ে থাকে। এ কথা স্বীকার্য যে তিনি আর্টে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, এর আদর্শীভূত সত্যকে গ্রহণ করেছেন ও সর্বোপরি বিষয় (concept) ও রূপের (form) মধ্যে যে ঐক্য বর্তমান তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সংবেদনসমূহ ভাবানুভূতির ফলে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। দর্শনের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য

এই নয় যে দর্শন বা বিজ্ঞান যুক্তিভিত্তিক এই হেতু, গতিশীল ও কাব্য কল্পনাপ্রধান বলে স্থিতিশীল। প্রকৃত পার্থক্য হলো যে কাব্যে গ্রহণ করা হয় আবেগপ্রধান প্রতীক। আবেগের নিবিড়তা হেতু এক পরমাশ্চর্য জীবনী-শক্তি কাব্যদেহে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

শিল্পীর আছে স্বপ্নদৃষ্টি বা প্রতিভান (Intuition)। তিনি যে ছবি মনে কল্পনা করেন, তাই কাব্যে রূপলাভ করে থাকে। শিল্পের জন্ম শিল্পীর মনে।

কলাসৃষ্টি বস্তুগত সত্য নয়। শব্দ ছন্দ প্রভৃতির দ্বারা এর সৌন্দর্য নিরূপণ করা যায় না। বিশ্লেষণী শক্তির দ্বারা কাব্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ জানা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মতে 'প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে' সত্যকে পাওয়া যায় না। 'বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই। সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে'। ক্রোচের ন্যায় রবীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য হলো যে প্রকাশ হলো চাতুরী, তা হলো সৃষ্টি।

আর্ট, ক্রোচের মতে হলো প্রতিভান। এর তাৎপর্য হলো ধ্যান, ইতালীয় ভাষায় teoria. সুতরাং এর সঙ্গে হিতবাদের কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানের ন্যায় আর্ট প্রয়োজনীয় নয়, তার সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নেই।[৭]

রবীন্দ্রনাথের মতে, 'সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য'।

তাঁর মতে লোকহিতের দায়িত্ব সাহিত্যের নয়। সাহিত্যে বড় কথা হলো প্রকাশ ও শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। এখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হয়ে যায়। ক্রোচের বক্তব্য হলো 'great artists are said to reveal us to ourselves.' শিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের উপলব্ধি করে থাকি।

প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ শিল্পীকে প্রভাবিত করে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ক্রোচের বক্তব্য হলো যে উক্ত মূল্যবোধ জ্ঞানাত্মক ধারণার বিষয় (concept) ও এই ধারণা প্রতিভানে ও প্রকাশে প্রভাব বিস্তার করে না। তথাপি প্রতিভান যে জ্ঞানাত্মক ধারণা নিরপেক্ষ তা বলা কঠিন, কেননা তা বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

শিল্প ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট হয় না। সৎ ইচ্ছা মানুষকে সৎ করতে পারে, কিন্তু তা সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক নয়। এই হেতু নীতির সঙ্গে শিল্পের কোন সম্পর্ক নেই। দান্তের ফ্রানচেস্কা কলঙ্কিনী ও শেকস্পীয়রের কর্ডেলিয়া আদর্শ নারী, এই জাতীয় নৈতিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে সাহিত্যবিচার যথাযথ নয়।

রবীন্দ্রনাথও এই প্রশ্নটি বিচার করেছেন। 'সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব-নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কিনা, এই তর্কটা সাহিত্যবিচারে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করছে'। এর ফলে 'যোগাযোগের' কুমুদিনী মানব-সমাজে নারীজাতির প্রতিনিধি কিনা, তার মধ্যে নারী প্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কিনা, এই জাতীয় অসঙ্গত প্রশ্ন দেখা দেয়। 'সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু বলেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি বলে নয়।'

পূর্বোক্ত নৈতিক বোধের পরিপূরকরূপে প্রশ্ন ওঠে যে পাপের প্রতি অনীহাবোধ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাদান শিল্পীর ধর্ম কিনা। নীতিবিদ্‌রা শিল্পের আনন্দকে স্বীকার করেন বটে, যদি সেই আনন্দ নৈতিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

শিল্পে সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্নটি নিরর্থক। ক্রোচের মতে যার প্রকাশ সুন্দর নয় তাই হলো অসুন্দর। সৌন্দর্যের মধ্যে আছে ঐক্য, আর অসুন্দরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্লিষ্টতা। যাকে বলা হয় সুন্দর তার মধ্যে আছে সমগ্রতার পরিচয়। তাঁর মতে 'Life circulates in the whole organism : it is not withdrawn into the several parts.' অংশসমূহ বিশ্লিষ্টরূপে সুন্দর নয়। সমগ্রের সঙ্গে সমন্বিত হলে তা হয়ে ওঠে সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথেরও মতে সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে সুন্দর। ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হলো 'গোলাপের মধ্যে সুনিহিত, সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে ঐক্য নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য'। এই হেতু নিখিল ফুলের সুষমাকে আপন বলে গ্রহণ করে। যখন ফুলকে অনুভব করি তখন আমরা নিজেকে বিশেষভাবে অনুভব করি। 'গোলাপ আমারই আত্মবোধকে আনন্দ-দ্বারা নিবিড় করে তোলে, তাতে আমারই সত্তার বিকাশ।'

তবে অংশ ও সমগ্রের কথায় বলা চলে যে অংশসমূহেরও সৌন্দর্য আছে। নচেৎ তাদের সমবায়ে সমগ্ররূপ প্রকাশিত হতে পার্‌তো না।

ক্রোচের মতে শিল্পের বড় কথা হলো প্রকাশ।[৮] এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বাস্তব জীবনের শোকদুঃখ প্রকাশিত হলে তাকে শিল্পসৃষ্টি বলা যাবে কিনা। তাঁর মতে শিল্প আমাদের মনে বিচিত্র আনন্দবেদনা সৃষ্টি করে থাকে। আমরা নাটকের চরিত্রসমূহের সঙ্গে হাসি ও কাঁদি। কিন্তু বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী থেকে ঠিক এই জাতীয় অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয় না। লৌকিক জীবনের সুখদুঃখ আমাদের বিচলিত করে, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তারা গভীর ও সুন্দর।[৯]

ক্রোচের মতে শিল্পসৃষ্টিকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। অনুভূতি, প্রকাশ, সৌন্দর্যের আনন্দ ও বস্তুরূপ, যার প্রকাশ গল্পে, সুরে, রঙে ও রেখায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্তর হলো প্রকাশ ও তা রূপে ব্যক্ত হয়ে থাকে।

যাকে বলা হয় রূপ তার বৈশিষ্ট্য হলো স্বাতন্ত্র্য ও স্পষ্টতা। শিল্পসৃষ্টির পরিচয় হলো তার বিশিষ্ট রূপে। ডন কুইকজোট দীপ্যমান চরিত্র, কেননা তার গুণরাজি নিয়ে সে বিশিষ্ট। আর্টের যে স্পষ্টতা তা আদর্শ সৃষ্টির পরিচয় দেয়। বস্তুজগতে আমাদের কোন বিষয়ের ধারণা দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু শিল্পসৃষ্টি চিরন্তন কেননা তা দেশ ও কাল নিরপেক্ষ। শিল্প তাই আদর্শসৃষ্টি।

ক্রোচে প্রতিভান ও ধারণাত্মক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। প্রতিভান কল্পনাত্মক, তার নিকটে বাস্তব-অবাস্তবের পার্থক্য নেই। ধারণাত্মক জ্ঞান (concept) পার্থক্য নির্ণয় করে থাকে। প্রতিভান হলো 'dream of the contemplative life whose waking is philosophy.' প্রতিভান রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে ও এই রূপের আছে ঐক্য। বহু বিচিত্র এখানে এক অখণ্ড রূপ লাভ করে থাকে। তাই তাঁর বক্তব্য হলো 'Expression is a synthesis of the various or multiple in the one'.

কীট্‌স রচনা করেছেন *Ode to Autumn* নামক এক রূপবান কবিতা। এখানে নানা চিত্র ভাবগত ঐক্য লাভ করে রূপসৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে।

শরৎ ঋতুর শারীর-সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিক রূপ ও তার বিচিত্র সঙ্গীত সব মিলিত হয়ে, যে রূপ সৃষ্টি করেছে তা অখণ্ড ও সুন্দর। ক্রোচের তাই মত হলো 'Every expression is a single expression.'

প্রতিভানের প্রকাশের পশ্চাতে যে গভীর অনুভূতির পরিচয় আছে তা ধারণাত্মক জ্ঞানের মধ্যে থাকে না কেননা তার কার্যকারিতা বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ।[১০]

প্রতিভান অনুভূতি নির্ভর ও এই অনুভূতি প্রকাশে সহায়তা করে থাকে। প্রকাশ রূপে ব্যক্ত হয়।[১১] কলাসৃষ্টিতে আমরা বরণ করে নিই রূপকে, কেননা তার মধ্যে কল্পনা নিজেকে ব্যক্ত করে। তাই কেরিট বলেছেন 'Artistic imagination is always embodied but has no excrescences.'

ক্রোচের তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। তিনি বলেছেন 'বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব হোক না কেন, যতক্ষণ সে কোনো একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না।' রূপ অর্থে কতকগুলি গুণের সমাবেশও বোঝায়। এই গুণগুলি যখন রূপের মধ্যে মূর্তিমান হয় ভাব যখন রূপে ব্যক্ত হয় তা হয়ে ওঠে সার্থক। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও টমসনের কবিতায় নিসর্গসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হলেও ভাবের প্রগাঢ়তা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থে বেশী। আর এই প্রগাঢ়তা রূপসৃষ্টির অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রচনার আনন্দের প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাঙ্গণে শাঁখ বেজে ওঠে, এ কথা সকল কবিই জানে।'

ক্রোচে বিশুদ্ধ প্রতিভানের কথা বলেছেন যেমন চিত্রকর অঙ্কিত জ্যোৎস্নালোকিত কোন দৃশ্য অথবা গীতিকবিতার আত্মনিষ্ঠ আবেগ। তথাপি তাঁর মতে প্রতিভানের জন্য ধারণাত্মক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই জ্ঞান শিল্পের বিষয়বস্তু নয়, বরং তা অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং পরিশেষে তা রূপে ব্যক্ত হয়।

তাই তাঁর মতে 'the aesthetic fact, therefore, is form and nothing but form.' (*Aesthetic*, P. 16)

প্রতিভান উপাদান ব্যবহার করে। কিন্তু এই উপাদানসমূহ যদি নিছক ধারণাত্মক জ্ঞান হয় তবে তার সঙ্গে আর্টের কোন সম্পর্ক নেই। তবে তা যদি আবেগপ্রধান হয় তবে তা হয়ে ওঠে রূপের (form) অঙ্গ।

ধারণাত্মক জ্ঞান আবেগকে উদ্বুদ্ধ করে ও তা আবার স্থায়ী বা প্রধান আবেগকে জাগায়। এই আবেগ হলো শিল্পের বিষয়। 'The impressions reappear as it were in expression like water put into a filter which reappears the same and yet different on the otherside'. (*Aesthetic*, P. 15)

ক্রোচে বিষয়কে মূল্য না দিলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে তা রূপসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে থাকে। তিনিও একথা মেনে নিয়েছেন যে, বিষয়ের জন্য প্রতিভানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। শেকস্পীয়রের Othello ও বর্ণার্ড শ'র *How he lied to her husband*, উভয়ই প্রেম ও ঈর্ষা নিয়ে রচিত হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হেতু একটি হয়েছে ট্রাজেডি ও অন্যটি উপভোগ্য কমেডি। বিষয়ের স্বতন্ত্র মূল্য নেই, কিন্তু তা রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একাত্ম।

আর্ট বাস্তবের অনুকরণ নয়। রঙ্গীন মোমের মূর্তি জীবনের প্রতিরূপ হতে পারে। তা দেখে আমরা বিস্ময়বোধ করলেও অভিভূত হই না। ফোটোগ্রাফী আর্ট নয়, কেন না তা বস্তুরূপকে প্রতিফলিত করে। এর মধ্যে জীবনের প্রকাশ নেই। আর্টের লক্ষণ হলো তার জীবনীশক্তি; তার সুর, জীবনের প্রকাশ, ফোটোগ্রাফে তা থাকে না।

ক্রোচের মতে শিল্পীর মধ্যে থাকে আবেগ (passion) ও প্রশান্তি (serenity)। আবেগ হলো বস্তুর ধর্ম যা শিল্পী গ্রহণ করে থাকেন, আর প্রশান্তি হলো রূপ (form) যার সাহায্যে তিনি সংবেদন ও আবেগকে সংযত করেন।

ক্রোচে বস্তু বা বিষয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু মন তাকে কি ভাবে গ্রহণ করে, কি ভাবে তা প্রতিভান হয়ে ওঠে তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানব সংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক সক্রিয়।

দুঃশাসনের হাতে কৌরব সভায় দ্রৌপদীর অপমানের ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তবে তাকে 'আমরা মানব-ভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো করে দেখতে পারিনে।' কিন্তু মহাভারতের খাণ্ডববনদাহের ঘটনা বাস্তবতার নৈকট্য থেকে দূরে যাওয়ায় সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পায়।

মানবজীবনে ঘটনাসমূহ সুসংলগ্ন ভাবে হয় না। এখানে কল্পনাদৃষ্টির প্রয়োজন। 'আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমত'। উপরন্তু, যা আছে দূরে তাকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে নৈকট্য দিতে হবে। এই নৈকট্য ঘটায় বলে সাহিত্যকে সাহিত্য বলা হয়ে থাকে।

উল্লেখপঞ্জি

১। 'Rather let there be no art at all than continue the depraving art or simulation of art, which now exists' *(What is Art,* p. 262)

২। Ćest la lassitude de vivre, le mépris de Pepoque présent, lé regret d'un autre temps apercu a travers Pel'iusiontde l'ar, t (*What is Art* p. 153)

৩। 'The importance, the value of art consists in widening man's outlook in increasing the spiritual wealth that is humanity's capita', (*What is Art.* p. 54).

৪। 'সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয় আলোয়, আকাশে আকাশে, আবর্তিত হয়ে চলেছে। সৃষ্টির এই আকুতি মানব চিত্তকে উজ্জ্বল করে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল করে তোলে। এই ব্যাকুলতা হলো অন্তরবাসী একের বেদনা'। (দ্রষ্টব্য : তথ্য ও সত্য)

৫। 'For the beautiful is not a physical fact; it does not belong to things, but to the activity of man, to spiritual energy'. (*Aesthetic*, Croce p. 97)

৬। হেগেল সত্য ও সৌন্দর্যকে ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে উভয়ে সমার্থক। পার্থক্য হলো যে সত্য ভাব বা idea. এই idea যখন বাইরে রূপে প্রকাশিত হয় তখন তা অনুভূতির নিকটে হয় সুন্দর। সৌন্দর্য সত্যকে প্রতিফলিত করে।

৭। নীতির সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক না থাকলেও সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পী নীতির অধীন। সুতরাং আর্টের পক্ষে সম্পূর্ণ নীতি নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে ক্রোচের মতে শিল্পীকে পুরোহিতের ন্যায় তাঁর কর্তব্য করতে হবে। (*Philosophies of Beauty : Carritt, p. 237)*

৮। 'Every true intuition or representation is expression'. (p. 8) 'To intuite is to express' (P. 11)–*Aesthetic,* Croce.

৯। ‘And it is natural that they (অনুভূতি) do not trouble and afflict us as passionately as those of real life because those were matter, these are form and activity’. (*Aesthetic,* Croce. p. 81)

১০। ‘It (Intuition) is the essence of life that it vibrates concretely : concepts can never snatch and render a vital impulse, because they achieve generality at the cost of concreteness’. (*Towards a Theory of Imagination* : S.C. Sengupta p 73)

১১। ‘Art is an ideal within the four corners of an image, Here the aspiration and the imagery exist in and for each other’. (*Philosophies of Beauty* : Carritt, p. 241)

ডাকঘর—ইংরেজি রূপান্তরে

জ্যোতি ভট্টাচার্য

ইয়ানুশ কোর্চাক। শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ শিক্ষক, অনাথ ছেলেমেয়েদের আশ্রয় ও প্রতিপালনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। মানবপ্রেমী। সাহিত্যানুরাগী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইও কিছু পড়েছেন, অবশ্য অনুবাদে। পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরের বাসিন্দা, অনেকের শ্রদ্ধাভাজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে নাতসি জার্মান ফউজ যখন ওয়ারশ শহর সহ পোল্যান্ডের অনেকটা দখল করে নিল, তখন কোর্চাক-এর ওসব পরিচয় তুচ্ছ হয়ে গেল, একমাত্র পরিচয় হল তিনি ইহুদি। নাতসি-রাজের হুকুম হল, ইহুদিরা শহরের যেখানে-সেখানে বসবাস করতে পারবে না, চলাচল করতে পারবে না, রুজিরোজগার বাজারহাট করতে পারবে না। একটি গণ্ডি-কাটা ছোট্ট এলাকা তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল, সেই 'গেটো'-তে সব ইহুদিকে গিয়ে থাকতে হবে। গেটো-র অনেক রাস্তা পাঁচিল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হল, অনেক জানলা ইট দিয়ে রুদ্ধ করে দেওয়া হল। 'গেটো'-য় খাদ্যবস্ত্র, ওষুধপত্র সবকিছুরই জোগান নামমাত্র, অভাব ও বঞ্চনাক্লিষ্ট প্রাণীগুলো সেই সঙ্গে ভোগ করছিল উৎপীড়ন ও আতঙ্ক। এরই মধ্যে কোর্চাক তাঁর অনাথালয় চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুর্দশা যখন প্রায় চরম, সেই ১৯৪২ সালে, কোর্চাক একদিন স্বপ্ন দেখলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, বলছেন ডাকঘর-এর মারফত তিনি তাঁর 'ডাকঘর' বইটি কোর্চাকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এর কিছুদিন পরে কোর্চাক বইটি জোগাড় করলেন—চোরাপথে, কারণ আরো অন্য বইয়ের মতো এ বইকেও হিটলারশাহি নিষিদ্ধ করেছিল।

অনাথালয়ে কোর্চাক-এর এক সহকর্মিণী ছিলেন এস্‌তেরকা ভিনোগ্রনোভ্‌না। ইনি বোধ হয় কিছুদিন শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছিলেন—কোর্চাক-এর দেখা স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ এঁর উল্লেখ করেছেন, 'আমার এক ছাত্রী' বলে (পৃ ৮৪)। এস্‌তেরকার পরিচালনায় প্রায় তিন মাস প্রস্তুতির পরে অনাথালয়ের ছেলেমেয়েরা 'ডাকঘর' অভিনয় করল জুলাই মাসে! 'গেটো'-র বাসিন্দারা অনেকে নাটক দেখতে এলেন—নিষিদ্ধ নাটকের দর্শকদের মধ্যে কোনো কোনো নিষিদ্ধ ব্যক্তিও ছিলেন, যাঁরা হিটলারশাহির বিরুদ্ধে গোপন সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগ্রামের যোদ্ধা। আবহাওয়া তখন থমথমে—খবর পাওয়া যাচ্ছে ইহুদিদের ওপর আর-একটা বড়ো আক্রমণের ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই আবহাওয়ার মধ্যেই কোর্চাক ও তাঁর ছেলেমেয়েরা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাল—এই অভিনয় দেখে দর্শক-শ্রোতারা এক অদ্ভুত মুক্তির স্পর্শ পেল। এক সপ্তাহ পরে 'গেটো'-র বাসিন্দা আটতিরিশ হাজার ইহুদিকে (আবালবৃদ্ধ) চালান করে দেওয়া হল ত্রেব্‌লিয়াংকা বন্দিশিবিরে। বন্দিশিবিরে আসলে মানুষমারার কারখানা, কসাইখানা। যুদ্ধশেষে সেখান থেকে খুব অল্প প্রাণীই জীবন্ত ফিরেছিল। কোর্চাক তো ফেরেননি, যারা 'ডাকঘর' অভিনয় করেছিল সেই ছেলেমেয়েগুলোও কেউ বোধ হয় ফেরেনি।

পোলিশ ভাষায় অনুবাদে 'ডাকঘর' অভিনয়ের এই ঘটনার কথা আমরা জানতে পারছি জিল্ পারভিনের অনুসন্ধান-গবেষণার দৌলতে। অনেক বছর আগে মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পড়ে জেনেছিলাম ১৯৪০ সালে জার্মান বাহিনীর আক্রমণে প্যারিসের পতন ও ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পূর্বসন্ধ্যায় প্যারিস রেডিয়ো 'ডাকঘর' অভিনয় অনুষ্ঠান প্রচার করেছিল আঁদ্রে জিদ্-এর ফরাসি-অনুবাদে। দারুণ দুর্দশা ও অবমাননার সময়ে কোনো কোনো মানুষ 'ডাকঘর' থেকে কী সান্ত্বনা পায়! 'সহসা দারুণ দুঃখতাপে/সকল ভুবন যবে কাঁপে/...মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে' তখন এ নাটক কীসের পরশ নিয়ে আসে? তত্ত্বজ্ঞানীরা যেসব ব্যাখ্যা অনুমান করেছেন তার কোনোটাতেই মন সাড়া দেয় না।

১৯৯৩ সালে লন্ডনের 'নেহরু সেন্টার' ইংরেজি অনুবাদে 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হন। নাটক পরিচালনার ভার দেওয়া হয় 'প্যারালাল একজিসটেন্স' নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জিল্ পারভিনকে। মূল বাংলা থেকে নতুন অভিনয়যোগ্য অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় উইলিয়ম রাদিচে-কে।

নাটকটি পরিচালনার ভার নিয়ে জিল্ প্রথমদিকে বেশ দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন। অনেকটা আকস্মিকভাবেই এ সময়ে তিনি কোর্চাক, এস্তেরকা এবং ১৯৪২ সালে ওয়ারশ 'গেটো'-তে 'ডাকঘর' অভিনয়ের কথা জানতে পারেন। পোল্যান্ডে গিয়ে বেশ কিছু তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করে আনা ছাড়াও ১৯১৭ সালের কলকাতায় 'ডাকঘর' প্রথম মঞ্চস্থ হওয়া-সম্পর্কিত খবরাখবর সংগ্রহ করে জিল্ প্রস্তুত হলেন। এই নতুন 'ডাকঘর ওয়ারশ'-র ১৯৪২-এর অভিনয়ের পুনরভিনয়ের পালা—নাটকের-মধ্যে-নাটক ('প্লে উইদিন আ প্লে')।

নাটকের শুরু এক 'প্রস্তাবনা' (Prologue) দিয়ে। এস্তেরকা সেখানে কোর্চাকের কথা বলছেন, তাঁদের অনাথালয়ের কথা, 'গেটো'-র কথা—সবই খুব সংক্ষেপে। এখানে কোর্চাক ও ছেলেমেয়েদের দেখা যাচ্ছে, এস্তেরকা তাদের দিয়ে 'ডাকঘর' অভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাচ্ছে কোর্চাক-এর সঙ্গে নিভৃত আলাপে নিমগ্ন। আবার ঠাকুরদার ভূমিকায় তিনি অভিনয়ও করছেন, কোর্চাক-কে পরে রাজকবিরাজ সাজানো হচ্ছে।

'প্রস্তাবনা'টি কার রচনা,—রাদিচের অথবা পারভিন-এর—সে প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর বইটিতে দেখতে পেলাম না। রচনাটি বেশ ভালো। 'ডাকঘর' নাটকটিতে এভাবে প্রস্তাবনা-সংযোজিত করে উপস্থাপিত করা কি সংগত? বিশুদ্ধতাবাদী রবীন্দ্রভক্তরা হয়তো আপত্তি করবেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা একালের মধ্যেও জীবন্ত দেখতে চান, তাঁরা সম্মতি জানাবেন। মনে রাখা ভালো যে নিজের রচিত গানগুলির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এক ধরনের বিশুদ্ধতাবাদী হলেও অভিনয়ের জন্য নাটকে তিনি স্বয়ং নানারকম পরিবর্তন, সংযোজন ও বর্জন ঘটাতেন। 'ডাকঘর' নাটকেরই অভিনয়ের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি গান জুড়ে দিয়েছিলেন—সেগুলোর সবকটাই নাটকের মূল সুরের অনুবর্তী ছিল না। 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী'-কে ডাকঘর নাটকে শুনলে মন্দ লাগবে না, কিন্তু 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে/পার করে লও খেয়ার নেয়ে' অন্তত অমলের গান হতে পারে না। নাটক-প্রযোজনায় প্রযোজক-পরিচালককে অনেকটা স্বাধীনতা দিতে হয়। নব-প্রযোজনার গুণে পুরোনো নাটক নতুন হয়ে উঠতে পারে। জিল্ পারভিন 'ডাকঘর'-কে পুনর্জীবিত করেছেন। 'ডাকঘর' বাংলায় লেখা হয়েছিল ১৯১১ সালের শেষাশেষি, প্রথম প্রকাশ ১৯১২ সালের জানুয়ারি

মাসে। ১৯১২ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁছোলেন। নিজের বাংলা রচনার কিছু কিছু ইংরেজি অনুবাদ তিনি ইতিপূর্বেই শুরু করেছিলেন, অন্যরাও কেউ কেউ অনুবাদ করছিলেন। ‘গীতাঞ্জলি’ অনুবাদ ও প্রকাশের কথা সবাই জানেন। ‘ডাকঘর’-ও ১৯১২ সালে অনুবাদ করা হয়—অনুবাদক দেবব্রত মুখার্জি। দেবব্রত মুখার্জির অনুবাদের প্রথম খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক বদল করেছিলেন। ইংরেজিতে ‘পোস্ট অফিস’ প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। ইতিপূর্বে য়েট্‌স্‌-এর উৎসাহে আইরিশ অ্যাবি থিয়েটার ডাবলিন শহরে নাটকটি মঞ্চস্থ করে ১৯১৩ সালের মে মাসে, অল্পকাল পরে লন্ডনেও নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। বিশিষ্ট ধরনের শ্রোতা-দর্শকদের জন্য এ অভিনয় সফল হয়েছিল বলেই মনে হয়। অভিনয় অবশ্যই পাণ্ডুলিপি অনুসারে হয়েছিল, কারণ বই তখনো ছাপা হয়নি।

দেবব্রত মুখার্জির অনুবাদ বলে ‘পোস্ট অফিস’ পরিচিত হলেও রবীন্দ্রনাথ সে অনুবাদ সংশোধন করে অনুমোদন করেছিলেন। অতএব এ অনুবাদের দায়িত্ব পুরোটা না হলেও খানিকটা রবীন্দ্রনাথের ওপরে বর্তায়। অনুবাদ বেশ আড়ষ্ট, অভিনয়ের পক্ষে অনুকূল নয়। এই অনুবাদের ভাষার কয়েকটি গুরুতর ত্রুটির কথা আনন্দলাল তাঁর ১৯৮৭ সালের গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন—Ananda Lal, *Rabindranath Tagore, Three Plays,* pp. 90-91।

এটা বোঝা যায় যে ওই সময়টায় রবীন্দ্রনাথের রচনার ইংরেজি অনুবাদের জন্য বেশ তাড়াহুড়ো করা হয়েছিল। ‘গীতাঞ্জলি’-র ফরাসি অনুবাদের উৎসর্গপত্রে স্যাঁত্‌ লেজার লেজার-কে লেখা আঁদ্রে জিদ-এর উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ‘গীতাঞ্জলি’-র ফরাসি অনুবাদের জন্য জিদ-কেই একমাত্র অধিকার (exclusive right) দেওয়া হয়েছিল। জিদ-এর অনুবাদ-প্রচেষ্টায় ছিল নিষ্ঠা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়—সময় লাগছিল। ইতিমধ্যে এক ফরাসি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এক সোৎসাহ প্রবন্ধে লেখক ‘গীতাঞ্জলি’র কোনো কোনো অংশের স্ব-কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদ সম্ভবত খুবই খারাপ হয়েছিল, জিদ গভীর পীড়া বোধ করেছিলেন, এবং এই কর্মটিকে ‘ধৈর্যহীনভাবে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে নেওয়ার মতো’ (‘Cette defloraison impatiente’) বলে নিন্দা করেছিলেন। ফরাসি defloraison যদি ইংরেজি deflowering-এর সমার্থক বলে ধরি, তাহলেও শব্দটার আর-একটা মানে কুমারীর কৌমার্যভঙ্গ। ধৈর্যহীন কৌমার্যভঙ্গ একরকম বলাৎকারই বলতে হবে। জিদ আরো বলেছিলেন, অনুবাদের কাজ একটানা করা চলে না, ‘স্বতঃস্ফূর্ত রচনার তুলনায় অনুবাদে অনেকবার পুনর্বিবেচনা করতে হয়, ফিরে শুরু করতে হয়, অনুতাপ করে কাটাকুটি করে সংশোধন করতে হয়’ [une traduction necessite plus de retours, de repentir et de ratures qu’une inspiration spontanée]। রবীন্দ্রনাথের রচনার সেই সময়কার ইংরেজি অনুবাদে এরকম বারংবার পুনর্বিবেচনার অবকাশ ছিল না। এখন যাঁরা নতুন করে অনুবাদ করছেন, তাঁরা সে অবকাশ পাচ্ছেন, —এবং সম্ভবত তাঁরা স্বীকার করবেন যে আগেকার অনুবাদগুলো তাঁদের পুনর্বিবেচনার কাছে কিছুটা সাহায্য করছে। রাদিচে ‘ডাকঘর’-এর যে নতুন অনুবাদ করেছেন, দেবব্রত মুখার্জির অনুবাদের তুলনায় তা অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। অনুমান করি, অনুবাদকালে রাদিচে জিল্‌ পারভিন-এর নাট্যগোষ্ঠীর প্রস্তুতির সঙ্গে সজীব সম্পর্ক রেখেছিলেন, রঙ্গমঞ্চের জন্য সংলাপের যে বাক্যরীতি প্রয়োজন সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। দুটি অনুবাদের পার্থক্য লক্ষ করার জন্য কয়েকটি বাক্য বা বাক্যাংশ বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমে (ক) মূল বাংলা [রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩৯৫ সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী থেকে], তারপর (খ) দেবব্রত মুখার্জির ইংরেজি [ম্যাকমিলান, ১৯১৪র সংস্করণ, ১৯৪৮-এর পুনর্মুদ্রণ থেকে], শেষে (গ) রাদিচের ইংরেজি উদ্ধৃত করছি।

১. (ক) মুশকিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না—কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না।

(খ) What a state I am in ! Before he came, nothing mattered; I felt so free. But now that he has come, goodness knows from where, my heart is filled with his dear self, and my home will be no home to me when he leaves.

(গ) I'm in awful trouble. When he wasn't here, he wasn't here–there was nothing to worry about. Now that he is here, he's taken over my house, and if I lost him, it wouldn't seem like my house any more.

(গ) নিঃসন্দেহে (খ)-এর চেয়ে ভালো। 'কোথা থেকে এসে' শব্দ ক-টার অনুবাদ (Goodness knows from where) করতে গিয়ে মুখার্জি ঠিক করেননি, ওটা কথার মাত্রাই ছিল, অমল কোথা থেকে এসেছিল মাধব দত্ত সে খবর ভালো করেই জানত। 'কোনো ভাবনাই ছিল না' ইংরেজিতে 'I felt so free' হয় না।

২. (ক) বেরোতে পারলে আমি বাঁচি।

(খ) I'm dying to be about.

(গ) It will be so marvellous to go out.

দেবব্রত মুখার্জি লক্ষ করেননি যে I'm dying ইংরেজি বাক্যরীতি-সম্মত হলেও এ নাটকে এ জায়গায় 'dying'-এর প্রয়োগ বিভ্রান্তিকর,—অমল সত্যসত্যই মরণাপন্ন।

৩. (ক) —ও কখন জাগবে?
—এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

(খ) When will he awake?
—Directly the King comes and calls him.

(গ) —When will he wake?
—Soon—when the King comes for him.

'Directly' এ জায়গায় অচল। অবশ্য, রাদিচের 'soon' কতটা যথাযথ তা নিয়ে সংশয় থেকে গেল।

৪. (ক) বোলো যে, 'সুধা তোমাকে ভোলেনি'।

(খ) —Tell him Sudha has not forgotten him.

(গ) —Say, 'Sudha has not forgotten you.'

রাদিচে-র অনুবাদ মূলের অনুসারী, মুখার্জি অকারণে পরোক্ষ উক্তি (indirect speech) ব্যবহার করেছিলেন।

৫. (ক) সুধা—আমার বেনে-বউ পুতুল আছে, তার বিয়ে দিতুম।

(খ) I could have great times with my doll Benay the bride,...

(গ) I'd have my gypsy-doll—I'd arrange her wedding.

দেবব্রত মুখার্জি 'বেনেবউ' শব্দটার 'বেনে' পুতুলটার নাম বলে ভাবলেন কেন সে এক বিস্ময়।

বেনেবউ পুতুল এক বিশেষ চেহারার পুতুল। ইংরেজিতে রাদিচে'র gypsy-doll তার সঠিক অনুবাদ নয়, কিন্তু Benay the bride একেবারেই ভুল। আজকাল মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয় যে রবীন্দ্রনাথের নতুন অনুবাদকরা কেউ কেউ জন্মসূত্রে বাঙালি হলেও ইংরেজি যতটা জানেন বাংলা ততটা জানেন না। দেবব্রত মুখার্জি 'বেনেবউ' মানে জানতেন না।

রাদিচে'র অনুবাদেও খুঁটিয়ে দেখলে ভুলত্রুটি দেখা যেতে পারে। কিন্তু আপাতত তাঁর অনুবাদের চেয়ে বেশি নজর পড়ছে তাঁর ভূমিকার একটি জায়গায় এবং একটি পাদটীকার ওপর। ভূমিকার ৫ পৃষ্ঠা রাদিচে 'ডাকঘর'-এর রচনাকাল সম্বন্ধে দুটি উক্তি করেছেন—(১) ১৯০২ সালে স্ত্রীর মৃত্যু থেকে ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত পরপর কয়েকটি মৃত্যুর শোক রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' রচনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল; এবং (২) ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি এবং বঙ্গদেশে 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ'-এর বিকাশ এ সময়ে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সম্পর্কে বীতরাগ করে তুলেছিল (...the growth of revolutionary terrorism in Bengal, had disillusioned him with nationalist politics)।

১. কবির ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যুশোক ও অন্যান্য অভিজ্ঞতার দ্বারা কবির রচনা কতটা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়, সে প্রশ্ন বিতর্কিত এবং জটিল। 'ডাকঘর' রচনার পেছনে কবির শোকস্মৃতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন মনে হয় না। তার চেয়ে বরং নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা ২২ আশ্বিন ১৩১৮ তারিখের চিঠিটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ—'সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্চে ... বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুক হয়ে পড়েছে।' ১৩২২-এর ৪ পৌষ 'ডাকঘর' সম্বন্ধে বক্তৃতাতেও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'... একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে। ... আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না।...' (রচনাবলী, ৬/৭৮৭)।

লক্ষ করছি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের মৃত্যুশোক রাদিচের বিবেচনায় বেশি প্রাধান্য পায়। ইতিপূর্বে Selected Poems (Penguin)-এর প্রথম সংস্করণে তিনি তারিখ ভুল করে 'মরণমিলন' কবিতাটিতে এইসব মৃত্যুর পরে রচিত ধরে নিয়েছিলেন। 'মরণমিলন'-এর রচনাকাল ভাদ্র, ১৩০৯। কবিপত্নীর মৃত্যু অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। Selected Poems-এর সংশোধিত সংস্করণে দেখছি রাদিচে তারিখের ভুল শুধরেছেন কিন্তু আরো অদ্ভুত কথা বলেছেন—এ কবিতায় নাকি বিপ্লবী শহিদদের প্রাণদান কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু ছাড়াও কবির ব্যক্তিজীবনের আসন্ন মৃত্যুশোকের পূর্বাভাস (premonition) কাজ করছিল। রাদিচে এই বাতিকটা ছাড়লে ভালো করবেন।

২. ভারতের 'জাতীয়তাবাদী রাজনীতি' অথবা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্য এবং উপায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গ বেশ জটিল। রাদিচে যে কর্মপন্থাকে 'বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ' বলছেন তা সন্ত্রাসবাদ ছিল না, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি ছিল। ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রস্ত করে ব্রিটিশরাজকে ভারত থেকে বিতাড়ন করা যাবে এমন ভাবনা সে যুগের বিপ্লবীরা কেউই ভাবেননি। দ্বিতীয়ত, এই রুদ্রপন্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও আবেগে বিপরীত ধারার মিশ্রণ ছিল। তিনি এই পন্থার বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীতেই দেখা যায় যে ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর দ্বারা কেনেডি-হত্যার পরে রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে এক জায়গায় বলছেন—'...অপমান মোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালীর মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই', আর-এক জায়গায় বলছেন,

'অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল' [রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, ১৬৮-৬৯]।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতান্তর-এর পর্ব একাধিক—শুরুতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিবেদন-আবেদনের ও কৃপাভিক্ষার মনোভাবের বিরোধী, এ নিয়ে তাঁর গভীর ক্ষোভ বহুভাবে ব্যক্ত। সরকারের দান-দাক্ষিণ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে দেশবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গঠনমূলক স্বশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার একটা স্বপ্ন তিনি দেখতেন, সে স্বপ্ন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কাছে মর্যাদা বা স্বীকৃতি পায়নি। এখনকার ভাষায় বলা চলে, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নরমপন্থী ধারা রবীন্দ্রনাথকে কিছু কম প্রতিহত করেনি। রাদিচে এই জটিল ও দীর্ঘ প্রসঙ্গের উল্লেখ না করলেই ভালো হত। পাদটীকাটি রাদিচে-র ভূমিকার ৮ম পৃষ্ঠায়—রবীন্দ্রজীবনীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'ডাকঘর'-এর যে আধ্যাত্মিক রূপক-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার ওপরে নির্ভরশীল।

১৯১৪ সালের ইংরেজি 'পোস্ট-অফিস'-এর জন্য য়েট্স্ একটি ছোট্ট ভূমিকা লিখেছিলেন। তাতে উল্লেখ ছিল যে ১৯১৩ সালের অভিনয়ের পরে য়েট্স্-এর বন্ধুরা কেউ কেউ (বাঙালি বলেই মনে হয়) নাটকটিতে অনেক বিশদ রূপক খুঁজে পেয়েছিলেন ['discovered much detailed allegory']—প্রহরী, দইওয়ালা, ঠাকুরদা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ভাবের রূপক বা প্রতীক। য়েট্স্ নিজে নাটকটিকে এভাবে দেখতে চাননি,—নাটকটি তাঁর কাছে অতটা ব্যাখ্যাবুদ্ধিনির্ভর মনে হয়নি, মনে হয়েছিল আবেগনির্ভর এবং সরল [much less intellectual, more emotional and simple]। এ নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা যায় না তা নয়, কিন্তু ওরকম ব্যাখ্যায় নাটকটি নিহত হয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু 'ডাকঘর'-এর যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তিনি পরিবেশন করেছেন তার প্রথম বাক্যটিই স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। তিনি লিখেছেন, 'পৃথিবীর এক নাম মাধবী।' হরিচরণবাবুর অভিধানে পাওয়া যাচ্ছে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর বরাহ-অবতারে পৃথিবী বিষ্ণুর পত্নী হয়েছিলেন, অতএব, 'মাধবী' মানে পৃথিবী। এই সূত্র ধরে, এবং প্রভাতকুমারের ব্যাখ্যা থেকে আরো ইঙ্গিত পেয়ে রাদিচে তাঁর পাদটীকায় লিখেছেন, 'Madhavi, for example, (=Madhab Datta), can mean the World–the world of convention and anxiety in which Amal is trapped.'। মাধবী = মাধব দত্ত = ক্ষুদ্রবুদ্ধি পৃথিবী, এ এক উৎকট সমীকরণ। বেচারা মাধব দত্ত যে নিতান্তই রক্তমাংসের মানুষ, এবং অমল ছেলেটাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে—এ কথাটা নাটকের একটা বড়ো কথা।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নাটকের শেষে ঠাকুরদাকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা কোয়ো না।' মুশকিল হল, বিশ্বাসীরা এত বেশি কথা বলেন যে আমাদের মতো অবিশ্বাসীরাও দু-চার কথা না বলে পারে না। দেখে ভালো লাগল যে রাদিচে তাঁর অনুবাদে বেশ কয়টি বাংলা শব্দ হুবহু রেখে দিয়েছেন—ঠাকুরদা (মুখার্জি Gaffer করেছিলেন), মুড়িমুড়কি (মুখার্জি—puffed rice), ডাল (lentil—মুখার্জি), ইত্যাদি। অমলকে তার পিসেমশায় থেকে শুরু করে ঠাকুরদা, দইওয়ালা, রাজকবিরাজ অনেকেই প্রায়ই 'বাবা' বলছে,—মুখার্জি 'my dear', 'my darling', 'dear' ইত্যাদি দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন,—রাদিচে সরাসরি baba রেখে দিয়েছেন। একটা বাংলা নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজিতে সে নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে ইংরেজরা যদি দু-দশটা বাংলা শব্দ শিখে ফেলে তাতে ক্ষতি কী! কিন্তু 'ফকির'-এর ইংরেজি মুখার্জি যেখানে Fakir রেখেছিলেন,

রাদিচে Holy Man আনলেন কেন? Fakir শব্দটা তো ইংরেজি অভিধানে স্বীকৃত, উইনস্টন চার্চিল সাহেব গান্ধীজিকে naked fakir বলে শব্দটাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে গেছেন। 'দইওয়ালা'র ইংরেজি curd-seller এবং 'দই! দই!' বলে তার ডাকের ইংরেজি curds, curds না করে 'দইওয়ালা' আর 'দই' রেখে দিলেই বোধ হয় ভালো হত। দইওয়ালার প্রবেশের পূর্বে যে স্টেজ-ডিরেকশন রাদিচে রেখেছেন তাতে বলা হয়েছে Enter curd-seller with the traditional cry. 'doi, doi! doi, doi!' তারপরে সে 'দই! দই!' না বলে curds-curds বলছে, এটা ঠিক হচ্ছে না। আরো কিছু অসংগতি চোখে পড়ল। বইটিতে দশটি বেশ ভালো ফোটোগ্রাফ রয়েছে, তার মধ্যে দুটিতে এক 'ছায়া-অমল' [Shadow of Amal] দেখা যাচ্ছে। নাটকের বা ভূমিকার কোথাও এই 'ছায়া-অমল' সম্বন্ধে কিছু দেখতে পেলাম না!

বইটির শেষে কিছু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় 'ডাকঘর'-এর অনুবাদের একটি তালিকা রয়েছে—টেগোর সেন্টার আরো অন্য অনুবাদের সংবাদ জানতে চেয়েছেন। মোটকথা, বইটি ভালো বই। আমাদের নাট্যকাররা ও নাট্যকর্মীরা বইটি সংগ্রহ করে দেখলে উপকৃত হবেন বলে মনে হয়।

অবাঙালি ভারতীয়রা 'ডাকঘর'-এর পুরোনো ইংরেজি অনুবাদের বদলে এটি পড়লে বেশি আকৃষ্ট হবেন।

দ' পোস্ট অফিস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, টেগোর সেন্টার, লন্ডন (দামের উল্লেখ নেই)

'দেশ', ১৫ নভেম্বর ১৯৯৭

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারের আদর্শ

উমা রায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যাদর্শ প্রধানভাবে চারটি গ্রন্থে গভীর ভাবে ও ব্যাপক রূপে আলোচনা করেছেন। তাঁর আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য ও সাহিত্য—এই তিনটি গ্রন্থ ১৩১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত, যদিও গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল তার পূর্বেও নানা সময়ের। একমাত্র সাহিত্যের পথে গ্রন্থটিই বহু পরে ১৩৪৩ সালে অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। এই শেষোক্ত গ্রন্থটির প্রবন্ধগুলির কোনোটিই ১৩২১ সালের পূর্বে রচিত হয়নি। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেছেন এবং চিন্তা করেছেন তা নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তাধারায় ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের চরম উপলব্ধিটিকেই লক্ষ্য করা যায়—সেটি হচ্ছে রসের উপলব্ধি। সাহিত্যের পথের ভূমিকায় তিনি অলংকার শাস্ত্রকে 'রসসাহিত্যের রহস্য' বলেই উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে রসকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' ব'লে রসোপলব্ধিকে ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই তুলনার তাৎপর্যটিও রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ ক'রে তাঁর ঐক্য তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সূত্রমূলক ভাবে বিচার করলে একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের রসাদর্শের অনুরূপ যদিও এই সূত্রাকারে নিহিত তত্ত্বকে তিনি যে ব্যাখ্যা-রূপ দান করেছেন তাতে সূত্রগুলির মধ্যে কোনো কোনোটির অস্পষ্ট সংযোগ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে এবং একটি উপলব্ধির সমগ্রতার মধ্যে তাঁর সাহিত্যাদর্শটি জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—প্রত্যক্ষরূপধারণ করেছে। প্রাচীন সাহিত্যে যদিও তিনি প্রাচীন কাব্যগুলির অর্থাৎ সংস্কৃত কাব্যগুলির সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন এবং আধুনিক সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের কবি ও ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধেই করেছেন—তবু এই সমস্ত আলোচনার মূলে তাঁর একটি সাহিত্যিক বিচার পদ্ধতিকে আমরা স্পষ্টতই উপলব্ধি করি। ১৩১৪ থেকে শুরু করে ১৩৪৩ পর্যন্ত নানা সময়ে নানা বিষয়ে নানা সমালোচনার মধ্যেও তাঁর বিচারপদ্ধতির মানদণ্ডের একটি আশ্চর্য দৃঢ়তা উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং তাঁর সাহিত্যাদর্শের ভূমিকা হিসাবে এই বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা প্রয়োজন।

সাহিত্যের বিচার

কবি সৃষ্টি করেন কিন্তু তাঁকেও নূতন ক'রে সৃষ্টি করেন সমালোচক। তাই গ্রহকে ঘিরে চন্দ্রমালার মতন কবিকে ঘিরে বিরাজ করেন সমালোচক। সমালোচকের কাজ সমালোচনা করা অর্থাৎ লেখকের মনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই কাজ অনেক সময় ব্যবসাদারি ভঙ্গিতেও হ'য়ে থাকে কিন্তু সেটা সমালোচনার বিশুদ্ধ প্রাণের নিয়ম নয়। যে আবেগের প্রেরণায় কবি সৃষ্টি করেন সেই আবেগটুকু পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়াই সমালোচকের কাজ। সাহিত্যের কোন লক্ষণ উপস্থিত আছে বা কোন লক্ষণ উপস্থিত নেই—এটি নিয়ে বাজারদর কষাকষি রসিকের কাজ নয়। যা আছে তাতেই সমগ্ররূপটি কি ভাবে কতখানি ফুটে উঠেছে তাই হচ্ছে রসিকের বিচার। এই জন্য সমালোচক যাঁরা

সমালোচনার টাঁকশালের বাঁধাই বুলির চকচকে পয়সাকে চিনে রেখেছেন তাঁরা খনির আনকোরা সোনাকে পিতল বলে ভুল করতে পারেন, রত্নকে মনে করতে পারেন কাচ। কারণ যা পরিচিত তারই লক্ষণগুলিকে তাঁরা চিনে রেখেছেন, অপরিচিতের নবীন প্রাণের কাঁচা সোনাকে তাঁরা দেখেছেন কোথায়! তাই তাঁদের সমালোচনায় দেখা যায় রুচিরই দাপট যা আক্রোশ বা উত্তেজনার অগ্নিকাণ্ড সচরাচর করেই থাকে—যেমন গোঁড়া যাঁরা ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধানকে পালিত হ'তে না দেখলে রেগে অস্থির হন। তাই সাহিত্যের বিচার শক্তি দীর্ঘকালের রসচেতনার ফল স্বরূপেই আমরা পেয়ে থাকি। তারই অভাবে রুচির মিল হোলো না দেখে অনেকে দাক্ষিণ্য ও সৌজন্যের অভাব দেখিয়ে থাকেন। তাঁরা লেখককে গালাগালি দেন এবং অকরুণ মন্তব্যে লেখকের সামাজিক সত্তাকেও দশের চোখে হাস্যাস্পদ ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন। রুচির এই অদাক্ষিণ্য ও অক্ষমতাকে লক্ষ্য করে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বদলের হাওয়া বইল বলেই যে নিন্দের হাওয়া তুলতে হবে, তার কোনো কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব আছে, যে অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বলবার উপলক্ষ খোঁজে তার মন সঙ্কীর্ণ, তার মন রূঢ়।" —পঞ্চশোর্দ্ধম্—সাহিত্যের পথে

বাস্তবিকই সাহিত্যবিচারের গোড়ার সর্ত এই যে রুচিকে বর্জন করতে হবে। সাহিত্যরসাস্বাদনের পক্ষে যা অনিবার্য ও অবশ্যস্বীকার্য সেই "তন্ময়ীভবনযোগ্যতা" সম্ভবই হয় না যদি রুচির খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখি কবি ও পাঠকের মধ্যে—তথা কবিকৃতি ও পাঠকচিত্তের মধ্যে। কেননা রুচি অত্যন্ত উপরের বস্তু। আমাদের হৃদয়ের মাটিতে তার শিকড় গভীরের পথে অভিসার করে না—সামান্য শিক্ষার আকর্ষণেই তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায়। তাই সাহিত্যের বিচার রুচির চোরাবালির উপর স্থাপন ক'রে সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভবপর হয় না। প্রাচীন সাহিত্যে রামায়ণ প্রবন্ধেও রুচির প্রসঙ্গে এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিতবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে প্রকৃতি-ভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অতিশয্য দেখে নাই।"

—রামায়ণ—প্রাচীন সাহিত্য

কোন্‌টি বাস্তব বা অবাস্তব তার বিচার নির্ভর করবে না ভাবসংস্কারহীন চিত্তের উপর। রুচি দিয়ে বিচার করলে একই বস্তু বিভিন্ন মনের কাছে বিভিন্ন মূল্য পেয়ে থাকে। তাই সাহিত্য বিচার করতে গেলে চাই আপন সত্তার গভীরে ডুবে যাওয়া—যাতে ক'রে সম্ভব হ'তে পারে কাব্যের সত্তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের দুটি অংশ আছে—রসের অংশ আর ভাবের অংশ। যদিও সাহিত্যকৃতিতে এই দুটি অংশকে পৃথক করা যায় না তবু শব্দের বিকল্পবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে ধ'রে নেওয়া যাক যে এই দুটি অংশ পৃথক। এখন কথা হচ্ছে আমাদের সাহিত্যবিচার কোন অংশকে নিয়ে। এর উত্তর—ভাবের অংশ নিয়ে। এই ভাবের অংশের বৈচিত্র্য ও রসব্যঞ্জনার শক্তির উপরই সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। তেমনি এই ভাবাংশের সঙ্গে একাত্ম হ'তে পারলেই সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভব হয়—রসের বিচারও সম্ভব হয়। কেন না সাহিত্যবিচার সমগ্রতার বিচার, খণ্ডের বিচার নয়। রুচির জালে মনকে আবৃত রাখলে রসের বিচার সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> ''এক কালের মধুলোভী যদি অন্য কাল হইতে মধুসংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজ কালের প্রাঙ্গণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্যকালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে।'' —কাদম্বরীচিত্র—প্রাচীন সাহিত্য

সাহিত্যবিচারের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে এই—যেন শ্রেণীর কুহেলিকায় ব্যক্তি না হয় অদৃশ্য। এটি সাহিত্যরচয়িতার পক্ষেও যেমন সত্য সাহিত্যরসভোক্তার পক্ষেও তেমনি সত্য। প্রতিটি বস্তুই—তা সে মানবই হোক বা প্রকৃতিই হোক—ব্যক্ত হয়েই স্পষ্ট। এই ব্যক্ত হবার অর্থ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠা। আপন সীমা-স্বর্গের ইন্দ্র হ'য়ে ওঠে প্রতিটি বস্তু আপন ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে। সাহিত্যের যে কোনো চরিত্রই হোক না কেন—নগণ্য থেকে মহান পর্যন্ত—সমস্তই প্রকাশের মধ্য দিয়েই চরিতার্থ। অথচ এই ব্যক্তিরূপটির সাহিত্যমূল্য নির্ণয় করা সহজ নয়। কারণ একে কোনো শ্রেণীর মধ্যে ফেলতে পারি না।

একদা সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টিতে ছিল আদর্শবাদ। তখন সমস্ত বস্তুই আদর্শের অগ্নিদীপ্তিতে জ্যোতির্ময় হ'য়ে জ্বলত। তখন সমস্ত রাজাই ছিলেন—''চতুরুদধিমালামেখলায়া ভুবো ভর্তা'' এবং সমস্ত সুন্দরীই ছিলেন—''তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী''। তখন এমন দীঘি ছিল না যাতে ছিল না পদ্ম, এমন পদ্ম ছিল না যাতে ছিল না ভ্রমর এবং এমন ভ্রমর ছিল না যা ছিল না গুঞ্জনরত। সমস্ত মুখই হার মানাতো কমল ও চন্দ্রকে আর সমস্ত কমল ও চন্দ্রই ছিল বিকশিত ও উজ্জ্বল। এক কথায় ব্যক্তি ছিল নগণ্য এবং তাকে উপলক্ষ্য করে ভাবের মহিমা আত্মবিস্তার করত। কিন্তু ক্রমশ এলো সাহিত্যে চরিত্রের অভিব্যক্তি, সার্থক হ'লো আপন স্বাতন্ত্র্যে বস্তু তার ব্যক্তি বা প্রকাশকে লাভ ক'রে। সাহিত্যবিচারে এই ব্যক্তির রূপটি সমগ্রভাবে ধরে দেওয়া সহজ নয় অথচ কোনো একটি শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক'রে ফেলতে পারলে তাকে ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। এইজন্য অর্থাৎ পন্থাটি সহজ বলেই সাহিত্যবিচারে একে অনাদর করা হয়নি যদিও সাহিত্যবিচারের সাধু পন্থা এটি নয়। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলছেন তাঁর সাহিত্যবিচার প্রবন্ধে—

> ''আমাদের দেশ জাতমানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়োলোক বলি যার বড়ো পদ, বড়োমানুষ বলি যার অনেক টাকা আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিপূজক সমাজের তাড়ানায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। ... সেই জন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়।'' —সাহিত্যের পথে

সাহিত্যবিচারের আর একটি বড় অন্তরায় জাত্যভিমান। ওটি ইউরোপীয়, এটি ভারতীয় অতএব ভারতীয় সাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব পড়ায় তার জাতির কৌলীন্যে লেগেছে কলঙ্কের ছাপ—এমন ধরনের কথাও সাহিত্যবিচারে পাওয়া যায়। অথচ কত দুর্বল এই যুক্তি; মানুষের মনে মানুষের প্রভাব পড়বেই। শুধু তাই নয়—সেই প্রভাবে সাড়া দেওয়াটাই সজীবতার লক্ষণ। সাড়া না পেলেই বুঝি মানুষটা মনের দিক দিয়ে মরেছে। আত্মাভিমানে মত্ত হ'য়ে হৃদয়ের মুক্ত বাতায়নগুলি বন্ধ ক'রে দিয়ে যদি জাতরক্ষার দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে প্রাণপুরুষকে আর রক্ষা করা হয় না। এটা শুচি বায়ুর লক্ষণ। শুধু সাহিত্যে নয়—চিত্রে ও সঙ্গীতেও এই একই শুচিবায়ুর লক্ষণ অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিদেশী প্রভাব যদি অযোগ্য না হয় তাহলে স্বীকার করার ক্ষমতাটা গৌরবের। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> ''নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু, যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক যেন তাঁকে ভর্ৎসনা না

> করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার করে আপন সীমানা থেকে বার করে দিয়েছে। সে মরু থাক আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে। তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান্ হয়ে উঠবে না। বাংলা দেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে দাশুরায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক। এটা অন্ধ অভিমানের কথা।"
>
> —সাহিত্যবিচার—সাহিত্যের পথে

যে দানের মধ্যে আছে শাশ্বত সত্য সে তো বহিরঙ্গ দান নয় সে হচ্ছে অন্তরঙ্গ প্রাণায়ন—তার তাৎপর্য অনুকরণে নয়—স্বীকরণে—এটা অবশ্যই স্বীকার্য।

"সাহিত্যবিচার কালে বিদেশী প্রভাব বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণাঙ্করতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়"—ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে।

সাহিত্যবিচারের আর একটি বাধা প্রতিনিধি-প্রিয়তা। অর্থাৎ যে চরিত্রই সৃষ্টি হোক না কেন তা যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেছে কিনা—এমন তর্ক অনেক সাহিত্যসমালোচক ক'রে থাকেন। যেমন যোগাযোগের কুমু নারীজাতির প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা লাভ করেছে কিনা। বলা বাহুল্য এই ছোঁয়াচে মনোভঙ্গিটি সাহিত্যের আদর্শপ্রিয়তা থেকেই এসেছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্র হ'লেই তাকে পুরুষজাতি বা নারীজাতির উৎকর্ষ বিধায়ক হ'তে হবেই—এমন একটা দাবী যেন তাঁরা করে থাকেন। এটিও ভ্রান্ত প্রথা। কেননা সাহিত্যে সমস্ত চরিত্রই অসাধারণ—অর্থাৎ তারা কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য সৃষ্ট হয় না। এইজন্য সাহিত্যভোজের পংক্তিতে ভাঁড়ুদত্ত ও রামচন্দ্র একই স্থানে বসবার অধিকার পান কারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই অর্থাৎ প্রকাশের স্পষ্টতার মধ্যেই সাহিত্যের সৌন্দর্য।

সাহিত্যে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিও অনেকের কাছে একটি প্রিয় পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছেন—কী সংগ্রহ করবার জন্য এই বিশ্লেষণ। যদি কেউ বলেন আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান অংশগুলিকে বেছে আলাদা আলাদা করে সাজাবার জন্য—বুঝবার জন্য এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন তাহ'লে আবার প্রশ্ন হ'তে পারে অঙ্গী থেকে অঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে কি তাদের সৌন্দর্য-বিচার হয়। সৌন্দর্য বস্তুটিই যে সমগ্রতা। একটি চিত্রে যদি দশটি রঙ থাকে তাহ'লে সেই দশটি রঙকে আলাদা ক'রে চিনে নিতে পারলেই কি চিত্রের সৌন্দর্য—যা সমগ্রতার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে—ব্যক্তিকে লাভ করেছে—উপলব্ধি করা যাবে? নিশ্চয়ই তা যাবে না। তবে কেন এই বিশ্লেষণ—জিজ্ঞাসা করতে পারেন রসিক।

সাহিত্যের সমগ্রতার বিচারের দিক থেকে সত্যই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই তার কারণ বিশ্লেষণের দ্বারা বস্তুর বহিরঙ্গ উপাদানকেই বোঝা যায়—তার অন্তরঙ্গ স্বরূপকে ধরা যায় না। তাছাড়া সব উপাদানকে আবিষ্কার করবারও প্রয়োজন নেই। কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের দ্বারা এবং কল্পনার সংযোগের দ্বারা সাহিত্যিক চরিত্রের যে সম্পূর্ণতার সাধন হয় তার পক্ষে প্রচ্ছন্নকে টেনে এনে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপনা করবার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন—

> "বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এই শ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে

বলতে হবে যে সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে না। কেন না উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুরলোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হবে, বিশ্বজগতটাই সেই চাতুরী।" —সাহিত্য বিচার—সাহিত্যের পথে

মোট কথা সাহিত্যের বিচারে সাহিত্যিক বস্তুর বৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে না। তবে রসভোগের প্রণালীটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সাহিত্যিক বস্তু কিভাবে রসিকের রসচেতনার বিষয় হ'য়ে ওঠে সেটি বিশ্লেষণ করে দেখানো সম্ভব। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রেও সাহিত্যিক বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আলঙ্কারিকেরা করেননি তবে রসচেতনার প্রণালীটি নিয়ে তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। কি প্রক্রিয়ায় বাইরের বস্তু অন্তরের বস্তু হ'য়ে ওঠে এবং অন্তরের বস্তু বিশ্বের বস্তু হ'য়ে ওঠে অর্থাৎ তাঁদের পরিভাষায় কিভাবে লৌকিক কারণ কার্য ও সহকারীভাব অলৌকিক বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব হ'য়ে হৃদয়ে সুপ্ত লৌকিক বাসনাকে অলৌকিক স্থায়ি-ভাব-রূপে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং কি করে সেই উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাব চিরন্তন রসরূপটিকে অভিব্যক্ত করে এই রসপ্রণালীটি নিয়ে গভীর আলোচনা—বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দেখতে পাই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে। অবশ্য এ কথাও তাঁরা বলেছেন যে রস ও ভাবকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় না কারণ তারা অবিচ্ছেদ্যরূপেই অনুভূত হ'য়ে থাকে। তবু শব্দের বিকল্পবৃত্তিকে আশ্রয় করে তারা অভিন্ন অবস্থাতেও ভিন্নরূপে কল্পিত হয়ে পৃথক ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়। কাব্যের কোনো উপাদানই বাইরে থেকে আক্ষিপ্ত নয়—অন্তরের ভাবাবেগে সমস্তকেই সে অন্তর থেকে আহৃত করে রসসমুদ্রে বিলীন হয়। সুতরাং এই প্রক্রিয়াটি দেখানো যেতে পারে সাহিত্যবিচারে। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এক মত।

এই উপলব্ধিটি একটি সুন্দর উপমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন—

"ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষ্যে বলা চলে যে, এই ফলে সব প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে ওর প্রাণের লাবণ্য; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীব-বিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফরান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে; কিন্তু সেটা জড় পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তারপরে তার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এই ভাবে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রস বিচার।" —সাহিত্য বিচার—সাহিত্যের পথে

এখানে প্রাণের লাবণ্যটি হচ্ছে রসের পণ্য যা জীবনের ঘাটে ঘাটে দান-করছে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য লাবণ্য। এখানে এমন বিচার করা চলবে না যে আমে যেহেতু প্রচুর ভোজ্যবস্তু আছে—আঁটির অংশ কম অতএব এটি বিশুদ্ধ ভারতবর্ষীয় কেননা ত্যাগের জন্য ও নিজেকে করছে উৎসৃষ্ট। তুলনায় বীজবহুল র‍্যাস্‌প্‌বেরি গুস্‌বেরি খাঁটি পাশ্চাত্য কেননা পরের তুষ্টির আয়োজন ওরা কম রেখে নিজের প্রয়োজনকে—বংশবিস্তারকে—বড় ক'রে তুলেছে। অতএব আম হচ্ছে ভারতীয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির এবং র‍্যাস্‌প্‌বেরি ইউরোপীয় রাজসিক প্রকৃতির। এ বিচার রসের বিচার নয়—এ হচ্ছে জাতির বিচার। সাহিত্য বিচারে এ পদ্ধতি অচল।

অতএব—

"সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মূলত সাহিত্য

বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হ'তে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।"

—সাহিত্য বিচার—সাহিত্যের পথে

একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিই সমালোচক হ'তে পারেন—সত্যকারের অর্ন্তদৃষ্টি যাঁর আছে। তিনি ব্যবসাদারি চালে কাব্যপাঠ করেন না, করেন রসিকের দৃষ্টিতে। এঁদেরই বিচারের প্রতিভা আছে—আছে অসামান্য শক্তি যা মুহূর্তেই ক্ষণিকের মধ্যে শাশ্বতকে চিনে নিতে দেরী করে না। সাহিত্যের নিত্যত্ব বলতে যে রসবস্তু বোঝায়, যে ঐক্যের প্রকাশ বোঝায় যে সত্তার প্রকট প্রকাশ বোঝায় তাকে চিনে নিতে বিলম্ব তাঁদের ঘটে না; তাই তৈরি করা পালিশ করা কথায় বোঝাই দলের নৌকো তাঁদের হৃদয় ঘাটে ভিড়তে পায় না, সারস্বত-প্রসাদের দেউড়িতে যে তর্জন-গর্জন, হাঁকডাক, ঘুষো-ঘুষির ব্যাপার চলে তাকে এঁরা এড়িয়ে চলেন, একটি বিনীত সৌজন্যের উদার দাক্ষিণ্যে অবারিত থাকে তাঁদের হৃদয়দ্বার। এক কথায় তাঁরা পোষাক চিনে রাখেন না—চিনতে পারেন মানুষকে, পানপাত্রের কারুকার্যটাই লক্ষ্য করেন না—লক্ষ্য করেন রসের পানীয়ের আতিথ্যকে রুচির ধুলোয় হৃদয়কে অশুচি ক'রে রাখেন না অথচ প্রাণের দীপ্ত প্রকাশে গোলাপের সঙ্গে গোলাপের কাঁটাকেও আনন্দের অভিব্যক্তি ব'লে উপলব্ধি ক'রে চরিতার্থ হন।

এঁরাই সাহিত্যের যথার্থ বিচারক। এঁদের মনের ঔদার্য যা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাকেই শুধু গ্রহণ করে না—যা নিত্যকালের বস্তু এবং বিশেষকালের সম্মানচিহ্নে চিহ্নিত নয় তাকেও নিত্যকালের মর্যাদার আলোক উদ্ভাসিত ক'রে দেখতে পারে। সাহিত্য যে শুধু বাস্তব বা শুধু কল্পনা নয়—দুইয়ের সমন্বয়ে একটি সুষম বস্তু যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যও বটে, ইন্দ্রিয়াতীতও বটে সেটি এঁরা ভালো করেই জানেন।

এখন প্রশ্ন এই যে সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে যে বিচিত্র স্তর আমরা লক্ষ্য করি বিভিন্ন লেখকের লেখায় তার বিচার কি ভাবে হবে। সে কি উৎকর্ষ নিকর্ষের মানদণ্ডে মাপা হবে? উৎকর্ষ নিকর্ষই বা নিরূপণ করবার পদ্ধতি কি? রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য" নামক সমালোচনা গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করতে চায়; এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই জগতের সঙ্গে তার নিবিড় ঐক্য। বাইরের জগৎ অন্তরে এসে অন্তর্জগতে পরিণত হচ্ছে। তাকেই প্রকাশ করছেন কবি আপন হৃদয়ানুরঞ্জনে রঞ্জিত ভাষায়—ছন্দে অলঙ্কারে—হিল্লোলিত রসতরঙ্গে। এই রসই আনন্দ—এই রসই প্রেম। একমাত্র প্রেমের মধ্য দিয়েই মানুষ আপনাকে ঐক্যে স্থাপিত করতে পারে। সমস্ত প্রিয় বস্তু হৃদয়েরই বস্তু—বাইরের জগতে প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কিছু নেই। প্রকাশের সত্য লাভের জন্যই মানুষ যেন সর্বস্ব পণ করে বসে আছে—কি জীবনে কি সাহিত্যে। জীবনেও এটি আমরা লক্ষ করি। ধনী আপন ধনের মহিমা প্রকাশের জন্য দেউলে হয়—সর্বস্ব ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয় না, আতসবাজির মতন আপন তাপটুকু অজস্র স্ফুলিঙ্গদীপ্তিতে প্রকাশ ক'রে নিভে গিয়েও চরিতার্থতা অনুভব করে। প্রেমিক তার প্রেমের মহিমা প্রকাশের জন্য প্রেমিকার গালের তিলটির জন্য সমরকন্দ বোখারা দান করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে না। বর্বর সৈন্য লড়াই করতে যাবার সময় সর্বাঙ্গে রঙ চঙ মেখে চীৎকার শব্দে তাণ্ডব নৃত্যে নিজের হিংসার উদ্দামতাকেই প্রকাশ করে। প্রকাশ খুঁজে ফিরছে মানুষ সাহিত্যে, প্রকাশ খুঁজছে জগৎপ্রকৃতি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

এমনি ভাবে হৃদয়ের ধনকে বাইরের ক'রে ও বাইরের ধনকে হৃদয়ের ক'রে মানুষ বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যসাধন করছে। একবার সে নিজেকে বিস্তার করছে জগতের মধ্যে আরবার সে জগৎকে সিক্ত করছে আপন অন্তর রসে। জীবনের এই উপলব্ধিটিই সাহিত্যে প্রকাশিত হয়—প্রকাশিত হয় তার অনন্ত বৈচিত্র্যে, প্রকাশিত হয় তার গভীর সুষমায়। কবিকৃতিতে—তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক জীবনের কোনো না কোনো রূপ ধরা পড়েই।

একটি তুলনা দেওয়া যাক।

জীবন একটি বিশাল যন্ত্রের মত। তার একটি স্বল্পতমস্থানব্যাপী 'স্ক্রু'-ও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হ'লে যন্ত্র রইবে অনড়—অচল। যন্ত্রের অন্যান্য বড় বড় লৌহখণ্ডের অংশগুলিও ভেঙে পড়তে পারে অকস্মাৎ। যেমন এই যন্ত্রের ছোট বড় সমস্ত অংশই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েই যন্ত্রটিকে চালু রাখে, তেমনি জীবনেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি সম্মিলিত ভাবেই জীবনকে সম্পূর্ণ ও সুষমামণ্ডিত করে তোলে। এই জীবনের ঊর্ধ্বায়িত প্রতিফলন যে সাহিত্যে সেই সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য। কোনো সাহিত্যকৃতিই বড় নয় বা ছোট নয়। সমস্তই আনন্দের প্রকাশ। আনন্দের কোনো পরিমাণ নেই—আছে শুধু আস্বাদন।

অপরিমিত চিনিতে যে মিষ্টত্ব সেই মিষ্টত্ব এক দানা চিনতেও আছে। স্বরূপত এক দানা চিনির সঙ্গে এক জাহাজ চিনির কোনো প্রভেদ নেই—স্বাদবৈচিত্র্যও নেই। সাহিত্যও তাই। সৃষ্টির যে আনন্দ—একটি ক্ষুদ্র তৃণপুষ্পে আপন সীমার মধ্যে প্রকাশের আনন্দে অসীম হ'য়ে উঠেছে—সেই আনন্দই জ্যোতির্ময় সূর্যের মধ্যেও প্রকট হয়েছে। সৃষ্টির লীলায় কোনো ভেদ নেই। যেমন অভিনয়ে একটি ছোট অংশের অভিনেতা ও বড় অংশের অভিনেতার মধ্যে ভূমিকাগত ক্ষুদ্রত্ব বা মহত্ব নিয়ে বিচার নেই—অভিনয়পটুতার উপরেই গোটা নাটকটার রসাভিব্যক্তিত্বেই তাদের সার্থকতা—তেমনি সাহিত্যেও ক্ষুদ্র বিষয়বস্তু বা মহান বিষয়বস্তু নিয়ে বিভেদ হয় না—সীমার মধ্যে অসীমের আনন্দ প্রকাশেই তাদের সার্থকতা। সৃষ্টিলীলার আনন্দের জগতে সকলেই যে সমান মর্যাদার অধিকারী—এই কথা রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট কবিতায় বলেছেন—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই
সূর্য উঠি বলে তারে ভাল আছে ভাই।

এখানেও প্রকাশের আনন্দেই যে ক্ষুদ্র কোমল পুষ্পটি ও বিরাট জ্যোতিঃপিণ্ড সূর্যের মধ্যে হ'য়ে ওঠার চরিতার্থতা—তাই কবি ছন্দোবদ্ধ করেছেন।

সুতরাং এই আনন্দকে প্রকাশ করবার বীণাযন্ত্র হচ্ছেন সাহিত্যিক। তিনি আপনাকে সমর্পণ করেছেন বিশ্বরসিকের হাতে—ভূমার হাতে। মানুষ তার হৃদয়প্রদীপটি তুলে ধরেছে—দেবালয়ের আরতির জন্য—প্রদীপটি মাটির বটে কিন্তু শিখা তার দিব্য; সাহিত্যের মধ্যে মানুষ তার জীবনের রাগিনী বাজিয়ে চলেছে নানা সুরে নানা তালে। সেই মহারাগিনীর বিচিত্র তান তো একজনের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। বিশ্বের ঐকতানে সকল কবিই উপস্থিত আছেন—সকলেরই তারে বাজছে এক একটি সুর—এক একটি তান। সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ। তাই সাহিত্যবিচারের সব চেয়ে বড় কথা এই ঐকতানের তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব।" —বিশ্বসাহিত্য—সাহিত্য

সাহিত্যিক মানব উপলক্ষ্য মাত্র—তাঁর মধ্য দিয়ে বিশ্বমানব আপনাকে প্রকাশ করছে; তাই সাহিত্যিককে হতে হবে নিরপেক্ষ; সে নিজের ভাবনায় সমস্ত মানুষের ভাব বহন করছে, নিজের লেখায় সমস্ত মানুষের বেদনা প্রকাশ করছে। সুতরাং সাহিত্যবিচারেও দেখতে হবে কে কতখানি প্রকাশ করছে—এই মাত্র। এমনকি একজনের সাহিত্যকৃতির মধ্যেও লক্ষণীয় কখন কি ভাবে কতটা মানুষের বেদনা সত্তার সংবেদনায় পরিণাম-রমণীয়তা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর তুলনা দিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন—

"সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কী, তাহা আমাদের কারও সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয়, সেটুকু বার বার ভাঙা পড়ে;—প্রত্যেক মজুরকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়; ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মতো কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাহাকে ওস্তাদের মতো সম্মান করিয়া থাকে।"

সুতরাং সাহিত্যবিচারের শেষ কথা তুলনায় আলোচনা—যাকে ইংরেজিতে বলে Comparative Literature এবং বাংলায় যার নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য।

সাহিত্যের মধ্যে লক্ষণীয় মানুষ কেমন করে তার লক্ষ্যের কথাটি বলেছে—চেষ্টা তার কতখানি ফলবতী হয়েছে। মানুষের আত্মা প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে কোন নিত্যরূপ দেখাতে চেয়েছে সে নিজেকে রোগী না ভোগী না যোগী কোন পরিচয়ে পরিচিত করবার জন্য আনন্দবোধ করেছে এবং জগতের সঙ্গে তার আত্মীয়তা কতদূর সত্য হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"ইহাই জানিবার জন্য এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাকে কৃত্রিম রচনা বলিয়া জানিলে হইবে না; ইহা একটি জগৎ; ইহার তত্ত্ব আমাদের কোনো ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তাধীন নহে; বস্তুজগতের মতো ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই; অথচ সেই অসমাপ্ত সৃষ্টির অন্তরতম স্থানে একটি সমাপ্তির আদর্শ অচল হইয়া আছে।" —বিশ্বসাহিত্য—সাহিত্য

সাহিত্যে মানুষ আপনার বাস্তবসত্তাকে ভাবের সত্তায় পৌঁছে দিয়েছে। এই ভাবের জগৎ কতদূর পর্যন্ত সাহিত্যস্রষ্টা তথা সমস্ত মানবসমাজকে টেনে নিয়ে গেছে—সেটিও দ্রষ্টব্য। এ শুধু তথ্যস্থাপনের চাহিদা নয়—প্রাণের প্রকাশে মানুষ সাহিত্যকে চেয়েছে। তাই সাহিত্য একার নয়—সমস্ত মানুষের। সেই সমস্ত মানুষের প্রাণের আনন্দ-বেদনা কেমন ভাবে কতখানি প্রকাশ পেয়েছে সেই জানা অলস অবসরের কালক্ষেপণ নয়—এ হচ্ছে আত্মার আকুতি।

তাই সাহিত্যবিচারের শেষ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য গ্রন্থে বিশ্বসাহিত্য প্রবন্ধে ব'লে গেছেন—

"প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব, এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রক্তকরবীর চিত্রকল্প : সকাল ও বিকালে

নির্মলেন্দু ভৌমিক

এক

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ তত্ত্ব নাটকের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত। 'রক্তকরবী' একদিনের এবং 'মুক্তধারা' এক বেলার নাটক। 'রক্তকরবী'র সমস্ত ঘটনা এমনভাবে সাজানো যাতে একদিনেই সব ঘটনা ঘটে গেলেও অস্বাভাবিক বলে মনেই হয় না। ইচ্ছে করেই রবীন্দ্রনাথ একটি সময়-সঙ্কট বেছে নেন। সময়ের এই সঙ্কটময় লগ্নটাই এখানে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেইজন্য দৃশ্য সংখ্যাও কম। 'রক্তকরবী' কেবল একটি দৃশ্যের নাটক। মকররাজের বাতায়নতলে সব ঘটনা একদিনে ঘটে গেছে। যেমন দৃশ্য সংখ্যা কম, তেমনি রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যপটের ব্যবহারেরও পক্ষপতি ছিলেন না। দৃশ্যপট ব্যবহার না করবার জন্য নাটকের সংলাপে দৃশ্যপটের তথ্য এবং আবহ-সংবাদ বারবার দিয়ে থাকেন তিনি।

'রক্তকরবী' নাটকের প্রথমাংশে আছে সকাল বেলার আবহ-পরিবেশের কথা; দিন বাড়তে থাকায় সূর্যের তাপ প্রখরতর হতে থাকে, নাটকের ঘটনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সংলাপও খর ও ক্ষিপ্র হয়। বেলা গড়িয়ে আসতেই নাটকের অন্তিমাংশের সূচনা হয়েছে এবং দিনের শেষে রক্তিম গোধূলি বেলায় নাটকও শেষ হয়েছে।

নাটকটিকে এইভাবে বিন্যস্ত করবার পেছনে সকাল ও বিকেল—দিনের এই দু'টি ক্ষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মনোভাব ক্রিয়াশীল হয়েছে। সেজন্যেই এই নাটকে এই দু'টি ক্ষণকে নাটকের মূল বক্তব্যের পরিপোষক রূপে চিত্রকল্প করে তোলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সৌন্দর্যতত্ত্বের পেছনে কর্ম ও কর্ম থেকে অবসর, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের কথা সকলেরই জানা। মানুষের মন ও ব্যক্তিত্বকে তিনি 'ছোটো আমি' এবং 'বড়ো আমি'—এই দু'টি নামে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। কর্ম বা প্রয়োজনকে কবি কোনো দিনই অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন, কর্ম ও প্রয়োজনের জগৎটাকে অস্বীকার করলে বাস্তব জগৎটাকেই অস্বীকার করা হয়। কাজেই মানুষের কাছে কাজের ও প্রয়োজনের জগতের বিশেষ মূল্য আছে। এই কর্ম ও প্রয়োজনের জগৎটাই হলো ছোটো 'আমি'র জগৎ। 'ছোটো আমি' প্রতিদিনকার এবং সমগ্র জীবন ও ভুবনের প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু, কবি বলেন, মানুষ যেন এখানেই নিজের শেষ সীমা রচনা না করে। কর্ম ও প্রয়োজনের শেষ বা শুরুতে চাই সেই জগৎ থেকে অবসর বা বিদায় নিয়ে নিজেকে বিস্তৃত করা এটাকেই তিনি বলেন 'বড়ো আমি'র জগৎ।

দিনের বিভিন্ন ক্ষণ বা ঋতুর বিভিন্ন প্রভাবকে কবি কর্ম ও প্রয়োজনের জগৎ থেকে ঊর্ধ্বে ওঠার অনুকূল পরিবেশ রূপে গ্রহণ করেন। এই জন্যেই 'সকাল ও বিকেল' তাঁর চোখে বিশেষ

মর্যাদা পায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম, পূজা, এবং অন্যান্য পর্যায়ের গানের মধ্যেও সকাল ও বিকেল প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্য, সকাল পিছিয়ে গিয়ে ঊষা ও মধ্যরাত্রে; কিংবা বিকেল এগিয়ে গিয়ে রাত বা মধ্যরাতে বিস্তৃত হয়েছে। এই দুটি ক্ষণে মানুষের মনে বিশেষ অনুভূতির সঞ্চার হয়। সকালে কাজ আরম্ভ হয় না; বিকেলে কাজ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং, সকাল ও বিকেল—এই দুটি ক্ষণই 'বড়ো আমি'র প্রকাশের অনুকূল ক্ষণ। এমন কি, ঠিক দ্বিপ্রহরে, যখন সকলেই কাজের থেকে বিরাম নেয়, সেই মুহূর্তটকেও কবি বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি' (গীতবিতান/প্রকৃতি, ১৩) গানটির কথা উল্লেখ করা যায়।

অসংখ্য গান-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সকাল সন্ধ্যের (বিকেলের) বিশেষ প্রভাবের কথা বলেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই : আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে, পূজা, ১২৮। আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন, পূজা, ২০১। তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি, পূজা, ২৯৮। দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে, পূজা, ৬০৩। মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ, পূজা, ৬০৪। কে রঙ লাগালে বনে বনে, প্রকৃতি, ২৩৬। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার সাধের সাধনা, প্রেম, ৩৬। দিনান্ত বেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী পরে, প্রেম, ২৩৫। তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, প্রেম, ২৮৮। এ ছাড়া, পূজা পর্যায়ের ৩৩৪, ৫১৮, ৬০১, ৬০২ (এবং বিশেষ করে ১৪১ সংখ্যক গান) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এইসব গানগুলির মধ্যে দু'একটির ব্যাখ্যা করি। প্রায় সবগুলিতেই দেখা যাবে, দিন শেষে বা কাজের শেষে কোনো বিশেষ এক অনুভূতি; প্রেমের গান হলে প্রেমিক-পুরুষের আগমন; কিংবা, কাজের জন্য সকালে যে ছুটির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, বিকেলে সেই ছুটির হারিয়ে যাওয়া।

সন্ধ্যার অস্তরাগ স্বভাবতই মিলনের রক্তরাগে রূপ নিয়েছে। অস্তসূর্যের রক্তিমাভা কখনো হয়েছে আগুন। কিন্তু, গোধূলিবেলার মিলনের রক্তিমরাগ কখনো বা হয়েছে বিষাদে বিলীন। 'ছিন্নপত্রে'র শেষ চিঠিটি (সং ১৫২।১৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ লিখিত) এ বিষয়ে লক্ষণীয় :

> 'কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। ... কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ... তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!'

এই সন্ধ্যারূপিণীই কি 'রক্তকরবী'র শেষ দৃশ্যের নন্দিনী?

দুই

যে কথা কবি তাঁর বহু গানে বলেছেন, 'রক্তকরবী', নাটকে তারই অভিনব প্রয়োগ দেখা যায়। নন্দিনী 'আলোক', নন্দিনী 'আগুন', নন্দিনী 'হাওয়া'। সকাল বেলায় তারই ছোঁওয়া লাগল একে একে সবার মনে। দ্বিপ্রহর থেকে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগলো। বিকেল বেলায় যক্ষপুরীর প্রধান পুরুষ মকররাজও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছে 'মুক্তধারা' নাটকেও। মকররাজের দ্বিধার বাঁধ যেমন ভেঙেছে দিনের শেষে, মুক্তধারার নবনির্মিত বাঁধও তাই। অভিজিতের আত্মসমীক্ষার অনুকূল লগ্নও গোধূলি বেলা। বিশ্বজিৎ তা রাজা রণজিতের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন। রাজপুত্র সঞ্জয়কে অভিজিৎ বলেন :

'ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরী শিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিলে।'

অস্তবেলায় অভিজিতের এই পথযাত্রা, নাটকের শেষে নন্দিনীর যাত্রার সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয়। অস্তসূর্যের প্রসঙ্গে আগুন ও পাখির অনুষঙ্গ রবীন্দ্রকল্পনায় ফিরে ফিরে এসেছে। যেমন, 'গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত আকাশে' (পূজা, ৫১৭)।

অস্তরবির রঙীন রাগ রবীন্দ্রনাট্যে নানা আনুষঙ্গিক কল্পনায় যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ আইডিয়া হয়ে গেছে। প্রথমে তা হয়েছে 'রঙীন', তারপর 'লাল' রঙ, শেষে 'আগুন'। 'রঙ' প্রেম ও অনুরাগের প্রতীক। 'লাল' তেমনি বিদ্রোহ ও ভাঙনের প্রতীক। 'আগুন'ও তাই, তবে, সেই 'আগুনে'র সঙ্গে নটরাজ মহাদেব ভৈরব-রুদ্র প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। এবং সেই সূত্র ধরেই নৃত্যের কথা এসে গেছে।

অস্তরবির রঙীন রাগ এবং উদয়কালীন সূর্যের অরুণরাগ এক শিথিল অর্থে একই ভাবনার সঙ্গে জড়িত। তবে এখানে স্বভাবতই লৌকিক প্রেম-অনুরাগের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। 'রক্তকরবী' এবং 'মুক্তধারা'তে যেমন অস্তরবির প্রভাব ক্রিয়াশীল, 'চিত্রাঙ্গদা' এবং 'রাজা'তে তেমনি উদয়কালীন সূর্যের প্রভাব। অবশ্য, চিত্রাঙ্গদা এবং সুদর্শনা দুজনের লৌকিক প্রেম সেখানে সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত সত্যের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। এদিক থেকে 'অচলায়তনে' একটি সমন্বয় পাই। সেখানে মধ্য রাত্রিকে (অর্থাৎ তখনো সূর্য ওঠেনি, কিংবা সূর্য ডুবে গেছে) মূল ও শেষের পরিণতির পটভূমিকা করা হয়েছে।

এই সব মন্তব্য থেকে সূর্যের উদয় ও অস্তকালীন রঙ নাট্যচরিত্রকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, তা সহজেই বোঝা যায়।

তিন

সূর্যের উদয় ও অস্তকালের রঙের প্রভাবের প্রসঙ্গ 'সময়' বা অনুকূল লগ্ন একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। এইবার সে কথা বলি।

বিভিন্ন নাটকে রবীন্দ্রনাথ 'সময়' প্রসঙ্গটি তুলেছেন। দু' ভাবে তা আলোচিত হয়েছে। প্রথমত, রুদ্র-কাল-ভৈরব-নটরাজ প্রভৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ ও বিকাশের 'সময়'। নাটকের প্রথম ভাগে থাকে সেই 'সময়ে'র জন্য প্রতীক্ষা; 'সময়' তখনও না হওয়া। নাটকের শেষে, বিশেষ নাটকীয় পরিস্থিতিতে তাঁদের আবির্ভাবের ও জাগরণের 'সময়' হওয়া। সাধারণত, বিকেল বেলায় এই 'সময়' এসে থাকে। দ্বিতীয়ত, মানুষের দিক থেকে 'সময়' না পাওয়া। এই 'সময়' বলতে অবসর বা অবকাশ। প্রয়োজন ও কর্মের জগৎ থেকে ক্ষণেকের জন্য 'বড়ো আমি'র জাগরণের অনুকূল পরিবেশ রচনা করা। কাজ ও প্রয়োজনের জন্যই মানুষ যেন 'সময়' পাচ্ছে না। দিনের শেষে, ঘুমের দেশে যাবার আগে যে 'কাজ ভাঙানো গান' মানুষ শুনতে পায়, সেই সূর্য ডোবার বেলাতে, তখনই, মানুষ সময় পায়। 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী' এবং 'মুক্তধারা'র আগাগোড়া বিভিন্ন চরিত্রের মুখে এই 'সময়' শব্দটি শোনা যাবে—ওপরের দুটি অর্থেই। 'সময়' এসব ক্ষেত্রে একটি 'Key Word' হয়ে গেছে। শৈলী বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে Polysemy রূপে শব্দটির ব্যাখ্যা করা যায়।

কিছু উদাহরণ দিই। অধ্যাপক নন্দিনীকে বললেন : 'তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যা তারাটি,

তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।' এই উক্তিতে পাখির আভাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সন্ধ্যা-গোধূলির সঙ্গে পাখিকে composite symbol হিসেবে রবীন্দ্রসাহিত্যে মেলে।

মকররাজ নন্দিনীকে বলেন : 'যাও যাও, আর কথা কয়ো না, সময় নেই।' কিংবা, 'আমার সময় নেই, একটুও না।' নন্দিনীও রাজাকে বলে : 'আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।' রাজা জানেন, নন্দিনীকে সহজ ভাবে পেতে হবে, তার লগ্ন এখনো আসেনি : 'আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাইনে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয়নি।'

নাটকের শেষের দিকে রাজা নন্দিনীর সংলাপে এই সময়ের প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেয়েছে। ধ্বজাপুজোতে যাচ্ছে যারা তাদের একজন নন্দিনীকে জানায় : 'শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপুজোর রাজাকে বেরোতেই হবে।' রঞ্জনের সংবাদ না পেয়ে নন্দিনী রাজার কাছে তা জানতে চাইলে রাজা বলেন, 'তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।' তারপর :

নন্দিনী। রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা। কিসের সময়।

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

চিকিৎসক, সর্দার, মোড়ল—সকলেই 'সময়ে'র নানা অর্থ করে।

চিকিৎসক। ... কিন্তু প্রস্তুত থাকো সর্দার, আর বড়ো দেরি নেই।

সর্দার। ... আমাদের স্বর্ণপুরী যে রকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল, এমন কোনদিন হয় নি, ঠিক এই সময়টাতেই ... মোড়ল। ওই যে ৬৯ঙ, লোকে যাকে বিশুপাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন করবার সময় এসেছে। নানা অর্থে 'সময়' শব্দ ব্যবহৃত হলেও মূল অর্থ কিন্তু একটি বিশেষ লগ্নের আগমন। সেই বিশেষ লগ্নটি আসবে কর্মের থেকে ছুটি নেবার মধ্য দিয়ে, অবকাশের পটভূমিতে। এই জন্যেই চন্দ্রা ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতে চায়, নন্দিনীকে কিশোর বলে,—'আমি আজ কামাই করেছি।' কিশোরের এই কাজ কামাই করাটাই হল 'ফুল'। এই জন্যেই কিশোর রোজ সকালে নন্দিনীকে ফুল দিয়ে যায়। গোকুল নন্দিনীকে প্রশ্ন করে, 'এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে।' নন্দিনীর উত্তর : 'অকাজের প্রয়োজনে।' রঞ্জন সেই ছুটির প্রতীক, মরণ তার পূর্ণ অবকাশের সূচক। রাজাকে নন্দিনী তাই বলে, 'সে (রঞ্জন) যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।' কর্মের জগতে আবদ্ধ থাকলে সে ছুটিও হারিয়ে যায়। বিশু পাগল চন্দ্রাকে যে গান শুনিয়েছে, সে গানটিতেও এই তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। কাজের মেঘ যেন দিনের সূর্যটাকেও ঢেকে রাখে,

তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরি কাজে,
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
লুপ্তিনেশার চরম সাথী,...

ছুটি চাই, অবকাশ চাই, 'আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।' দিনাবসানেই তা মেলে। সেই সময়ে'র প্রতীক্ষায় সকলে আছে। ফাগুলাল বলেছে, 'আজ ছুটির দিন'।।

চার

আগেই বলেছি, 'রক্তকরবী'র সময়সীমা একটি সকাল থেকে সেই দিনের বিকেল বেলা পর্যন্ত। এইবার নাটক থেকে সেই সকাল ও বিকেলের দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করি।

এই নাটকের প্রথমাংশে যে সকালবেলাকে মেলে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'আলো' এবং 'সোনা'র প্রসঙ্গ। নাটকের প্রারম্ভেই কিশোর ও নন্দিনীর সংলাপে সকালের পটভূমিকাটি পরোক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারপর অধ্যাপক নন্দিনীকে বলেন, '...তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর।' নন্দিনী তেমনি অধ্যাপককে বলে, 'তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছ করে,...' নন্দিনীর সঙ্গে এই সময়ের সংলাপে অধ্যাপক সূর্যের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। গোকুল বলে, 'তুমি রাঙা আলোর সকাল।' রাজাকে নন্দিনী বলে : 'পৌষের রোদ্দুরে পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে' গানে পাই : 'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে।' কিংবা, 'আলোর খুশি উঠল জেগে।' ছুটির দিন বলে ফাগুলাল মদ খাচ্ছে। চন্দ্রা বলে, 'সকাল থেকেই মদ?'

এমনি ভাবেই সকালের পটভূমিকাটি রচিত হল। অতঃপর বেলা বাড়তে থাকে। রোদ প্রখর হতে থাকে। কাহিনী ঘটনার অগ্রগতি রোদের প্রখরতার রূপকে ব্যক্ত হয়। ধ্বজাপুজোর শোভাযাত্রা-কারীদের লক্ষ করে চন্দ্রা বলে, 'কী চমৎকার ঘোড়সওয়ার। বর্শার ডগায় যেন এক-এক টুকরো সূর্যের আলা বিঁধে নিয়ে চলেছে।' নন্দিনীকে রাজা বলেন, 'মধ্যাহ্ন সূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?' বিশু সকাল থেকেই সেদিন নন্দিনীর মধ্যে একটি বিশেষত্ব দেখতে পেয়ে দ্বিপ্রহরে বলেছে : 'পাগলী, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে?' এরপর দুপুরও গড়িয়ে গেল। নন্দিনীকে অধ্যাপক বলেন, 'তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয় গোধুলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।' কিশোরের কাজ কামাই করা কিংবা বিশুর সত্য কথা বলা ('আজ সত্য কথা বলেছিলুম'—এই অতীতকাল বাচকতা এখানে স্মরণীয়) সবই সকালের ঘটনা। এরপর নন্দিনী নিজেই বলেছে : 'দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ওই-কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে।' এসব ক্ষেত্রে আসন্ন বিশেষ ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন। 'অচলায়তনে'র পঞ্চক প্রায় নন্দিনীর ভাষাতেই বলেছে : 'আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল। ... আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে।' 'রক্তকরবী'তে এই গোধূলির পর আসন্ন এক রাত্রির কল্পনা করা হয়েছে। সকাল বেলাতে অধ্যাপক নন্দিনীকে বলেছিলেন 'মশাল'। নাটকের শেষে স্বয়ং মকররাজ নন্দিনীকে বলেন, 'প্রলয়পথে আমার দীপশিখা'।

পাঁচ

নন্দিনী যে গোধূলি বেলায় সূর্যের অস্তরাগের মধ্যে আপন 'সিঁথের সিঁদুরে'র প্রতিচ্ছায়া দেখেছিল সে রঙের কথা এ নাটকে একাধিক বার উচ্চারিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। অস্ত রবির রক্তরাগই 'রক্তকরবী'। 'রাঙা আলো' বলতেও তাই বোঝানো হয়েছে। 'রাঙা' শব্দ শেষে 'আগুনে' ('মশাল', 'দীপশিখা') পরিণত হয়েছে। রাজা বলেন, 'নন্দিনী, তোমার ভেতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন।' এই 'রাঙা আগুন' উদয় বা অস্ত কালের সূর্য। সর্দার নন্দিনীকে বলেছে, 'ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন'। 'রঞ্জন' শব্দের মধ্যে এই রঙের কথা আক্ষরিক ভাবেই আছে। নন্দিনীর দুটি মালা ছিল। একটি কুঁদ

ফুলের সাদা মালা, আর একটি রঞ্জনের জন্য অনুরাগে রঞ্জিত লাল মালা। সাদা মালাটি রাজা এবং সর্দারের জন্য। সর্দার সে মালাটি তার বর্শার ডগায় ঝুলিয়ে নিয়েছিল। নন্দিনী বলে, 'দেখো ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাবো।' রঞ্জনের দেহের রক্তরেখাকে বিশু বলে, 'ওই তাদের পরম মিলনের রক্তরাখি।' ফাগুলাল ও বিশু নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর কঙ্কণ তুলে নেয়। রঞ্জনের হাতেও ছিল নন্দিনীর পাঠানো রক্তকরবীর মঞ্জরি। অধ্যাপক নন্দিনীকেই বলেছেন, 'ওগো রক্তকরবী।' অর্থাৎ রক্তকরবী ধারিণীরই রক্তকরবী হয়ে যাওয়া।

অধ্যাপক এই রঙ ও রক্তের মধ্যে একদিকে 'ভাগ্য-পুরুষ'কে অন্যদিকে ভয়-রহস্যকে দেখেছেন। তথাপি, তিনি এই রঙের মধ্যে 'ক্ষণকালের দামে'র আনন্দকেও দেখেছেন। নন্দিনী কিশোরের কাছ থেকে যেমন ফুল নিয়েছে তেমনি একাধিক জনকে ফুল বা ফুলের মালা দিয়েছে। অধ্যাপক যে এই ফুলকে 'ক্ষণকালের দান' বলেন, নন্দিনীও তা স্বীকার করে। রঞ্জন আসবে, সেই 'আনন্দে' নন্দিনী এই রক্তকরবী ফুল অধ্যাপককে দিয়েছে। রঞ্জন যদি 'ছুটি' হয়, সেই 'ক্ষণকাল' যদি গোধুলি বেলার কর্মশেষের ক্ষণ হয়,তবে সেই 'আনন্দে'র কারণটি সহজেই বোঝা যায়। মকররাজ সেই আনন্দেই, সকল দ্বিধার বাধা কাটিয়ে উঠে, দিন শেষে ঘরের বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়েছেন।

ছয়

বিশু পাগলকে নন্দিনী বলেছিল : 'পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?' সেই বিশুকে যখন প্রহার করে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন নন্দিনীকেই সে বলে, 'পাগলী, শুনতে পাচ্ছিস ওই ফসল কাটার গান?' সকাল বেলায় কৃষকেরা ফসল কাটতে যাচ্ছে; আর বিশু যে গানের কথা বলছে, সেটা ফসল কেটে বিকেলে ঘরে ফেরার গান। সে জন্যেই বিশু বলেছে : 'মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল।' এর পরেই গান : 'শেষ ফলনের ফসল এবার, কেটে লও বাঁধো আঁটি, / বাকি যা নয় গো নেবার, মাটিতে হক তা মাটি।'

ফসল কাটতে যাওয়া এবং ফসল কেটে ঘরে ফেরা সকাল ও বিকেলের এই দুই কৃষিকর্মের একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা এই নাটকে আছে। শিল্পজীবী মকররাজ ফের কৃষিজীবীতে পরিণত হবেন, তারই ইঙ্গিত এটি। ফসল নিয়ে ঘরে ফেরা,—এর অর্থ জালের আবরণ ভেদ করে, রাজার ঘরে ফেরা। শিল্প সভ্যতার কটু-তিক্ত অভিজ্ঞতা অপদার্থ শস্যের মতোই ফেলে যেতে হবে : 'মাটিতে হক তা মাটি।'

অনুমান করা যায়, ফসল বলতে এখানে ধান। ধানকে কবি নিতান্ত ক্ষুধা মেটাবার এক প্রয়োজনীয় উপকরণ রূপেই দেখেননি। 'সোনারতরী'র বিখ্যাত কবিতা থেকে নানা রচনায় কবি এই ধানের নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে। এই যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান।'—গীতবিতান, প্রকৃতি, ১২৬। 'ধান' বলতে বাদলের গান। 'রক্তকরবী'তে তা জীবনের অক্ষয় সঞ্চয়, স্বর্ণময় সঞ্চয়। এই জন্যেই নন্দিনীর পরণে ছিল 'ধানী রঙের শাড়ী।' নন্দিনী তাই রাজাকে বলে : '...সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত।'

'গীতবিতানে'র কয়েকটি গান এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে, বিশেষ ভাবে সমভাবাত্মক

গান দুটি : 'এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে।/এবার ফসল কাটো যাও গো ঘরে', প্রকৃতি, ১৭৮। আর একটি : 'দিনান্ত বেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী 'পরে,/এপারে কৃষি হল সারা, যাব ওপারের ঘাটে', প্রেম, ২৩৫। এই দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে বিশুর উক্তির আক্ষরিক সাদৃশ্য সকলেরই চোখে পড়বে।

দুটি গানের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্যও লক্ষ্যণীয়। সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, দিনান্ত বেলায় ফসলের সঞ্চয় নিয়ে ঘরে ফেরা; এবং, সেই ফসলের কোনো বিশেষ প্রতীক হয়ে ওঠা। যেমন, 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ১৭৮—সংখ্যক গানে।

বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা তারা—
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথি আসিবে রাতে তাহারি তরে।।

তখন এই দিনের বেলার শীতের ফসল, সন্ধ্যা বেলায় আর এক প্রসঙ্গ হয়ে যায়। বাহিরের কাজের পয়লাদিনের সন্ধ্যায় সেই কাজ বা প্রয়োজনের বিষয়-প্রসঙ্গ ভিন্ন হয়ে ওঠে। দিনের শেষে হয় একজনের জন্য প্রতীক্ষা, নয় তার উদ্দেশ্যে চলা। যেমন : 'এই নিয়ে আজ দিনের শেষে একা চলি তার উদ্দেশ্যে'—প্রেম, ৩০৯। দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে 'রক্তকরবী'র যোগ ঘনিষ্ঠতর। এপারের কৃষিকর্ম সেরে দিন শেষে ওপারে যাওয়া। গোধূলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে পাখি ও ডানার সংযোগ লক্ষ্য করেন, এ গানে তাও আছে। নন্দিনীর বিছানায় যে নীলকণ্ঠ পাখির পালক দেখা গেছে, তা সে সকাল বেলায় পেয়েছে বটে, কিন্তু সূচনা সন্ধ্যা বেলাতেই। সন্ধ্যা বেলাতেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে নন্দিনী নীলকণ্ঠের ডানার পালক প্রার্থনা করে। আলোচ্য গানটিতে (প্রেম, ২৩৫) হংস বলাকা কবিকে দূরের পানে নিয়ে চলে। কোনো পার্থিব প্রাপ্তির কামনা নয়, কেবল দূরের ধ্বনি শোনা :

যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা—
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি
তাহার স্বরে।।

এই 'মাঝির গান' এবং দাঁড়ের 'ধ্বনি'ই রঞ্জন। এই জন্যেই রঞ্জনের উপমান হল নদী। নন্দিনী বলে, 'আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মতো।' তেমনি বিশুকে সে বলে : '...দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে (রঞ্জন) আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়'; '...আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে।'

কেবল রঞ্জনই নয়। স্বয়ং রাজা এবং বিশুর উক্তিতেও নদীর প্রসঙ্গ আছে। নন্দিনীকে রাজা বলেছেন : 'যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিন আগমনীর লগ্ন লাগবে।' নন্দিনীর উদ্দেশ্যে বিশু গায় : 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।' বিশুর অপর গান : 'আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে...'।

স্থলযাত্রাই হোক আর জলযাত্রাই হোক, দিন শেষে সকলেই এক বিশেষ লক্ষ্যে যাত্রা করেছে।

(প্রবন্ধটি 'কলকাতা পুরশ্রী' পত্রিকার ১৩ মে ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়)

* লেখক ২৫.০৮.২০১২ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ : উপসর্গ প্রসঙ্গ

পরেশচন্দ্র মজুমদার

১. গ্রন্থপরিচয়

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ছিলেন একাধারে কবি, গণিতজ্ঞ, নৈয়ায়িক এবং দার্শনিক। এছাড়া তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় রয়ে গেছে বাঙলায় শর্টহ্যাণ্ড এবং সংগীতের স্বরলিপি উদ্ভাবনে। তবে বাঙালির কাছে তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) কাব্যগ্রন্থের জন্য। কিন্তু তিনি যে একজন উঁচুদরের ব্যাকরণবিদ ছিলেন, সে-পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে তিনবার সভাপতি এবং সাহিত্য-সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনে (১৯১৩) মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধ সর্বপ্রথম সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ ও ৫ম বর্ষে দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। পরে তাঁর 'নানা চিন্তা' (১৩২০) গ্রন্থে প্রবন্ধটির একটি সম্পাদিত পাঠ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ করেন। এটিই বহু দিন বাদে (১৯৭৯) পুনর্মুদ্রিত হয় পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় (বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালার প্রথম প্রকাশ)।

বর্তমান আলোচনায় পূর্বোক্ত পুস্তিকাটিকেই আদর্শ পাঠ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। (দ্বি.) অর্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই পুস্তিকাটিই বোঝাবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর বহু প্রবন্ধই এখনও গ্রন্থিত হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধটি ব্যতিক্রম। বর্তমান প্রবন্ধটি থেকে বোঝা যায়, তিনি কেবল ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন না, ব্যাকরণেও বাচস্পতি ছিলেন। বস্তুত, 'উপসর্গের অর্থবিচার', আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের (semantics) একটি নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই দিকে লক্ষ্য করে যথার্থই বলেছেন—''তাঁহার প্রবন্ধে যে অসামান্য গবেষণা ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের মতো অধিকাংশ পাঠকের মনে সম্ভ্রম উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না" (রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪শ খণ্ড পৃ. ৮৩)। শুধু তাই নয়, তাঁর গবেষণার পথই যে 'বিজ্ঞানসম্মত রাজপথ' তা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন।

বস্তুত, এই একটি প্রবন্ধ থেকেই বোঝা যাবে, দ্বিজেন্দ্রনাথ পরাধীনতার যুগে বাঙালিত্ব ও ভারতীয়ত্বের ধ্যানে ও ধারণায় স্বাদেশিকতার পদচিহ্ন রেখে গেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর সূক্ষ্ম বিচার ও রসবোধের সমন্বয়ী স্বাক্ষর।

এখন **রবীন্দ্রনাথের** (১৮৬১-১৯৪১) ভাষাজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্ব[১] সম্পর্কিত দু'খানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। যথা—

১. শব্দতত্ত্ব (১৯০৯)।

২. বাংলাভাষা-পরিচয় (১৯৩৮)।

এই গ্রন্থদু'টি জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের চতুর্দশ খণ্ডে (প্রবন্ধ) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় এই গ্রন্থটিকেই আদর্শ ধরা হয়েছে। আলোচনায় পৃষ্ঠাঙ্ক এই খণ্ডের। (র.) সংকেতের অর্থ রবীন্দ্রনাথ।

পূর্বোক্ত দু'টি গ্রন্থের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। গ্রন্থদু'টির রচনাকালের মধ্যে প্রায় ৩০ বছরের ব্যবধান। ***প্রথম গ্রন্থটি*** একটি সংকলন-গ্রন্থ। এতে ১৩টি মূল প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। এছাড়া অতিরিক্ত ৯টি প্রবন্ধ পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত। প্রবন্ধগুলির শীর্ষনাম রয়েছে। ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি হলো :

১. বাংলা উচ্চারণ ঃ বালক, আশ্বিন ১২৯২।

২. স্বরবর্ণ অ ঃ সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯।

৩. স্বরবর্ণ এ ঃ সাধনা, কার্তিক ১২৯৯।

৪. টা টো টে ঃ সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯।

৫. বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ ঃ ভারতী, পৌষ ১৩০৫।

৬. বাংলা বহুবচন ঃ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫।

৭. সম্বন্ধে কার ঃ ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫।

৮. বাংলা শব্দদ্বৈত ঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩০৭ (৭ম ভাগ, ১ম সংখ্যা)।

৯. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩০৭ (৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা)।

১০. বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত ঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩০৮ (৮ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা)।

১১. ভাষার ইঙ্গিত ঃ ভারতী, আষাঢ়, শ্রাবণ, ১৩১১।

পরিশিষ্টের অন্তর্গত ৯টি প্রবন্ধ হলো—

১. একটি প্রশ্ন (বালক, ১২৯২)।

২. সংজ্ঞাবিচার (বালক, ১২৯২)।

৩. নিছনি ঃ ১, ২ (সাধনা, চৈত্র ১২৯৮; বৈশাখ ১২৯৯)।

৪. পহুঁ (সাধনা, ১২৯৯)।

৫. প্রত্যুত্তর ঃ ১, ২ (সাধনা ১২৯৯)।

৬. ভাষাবিচ্ছেদ (ভারতী, ১৩০৫)।

৭. **উপসর্গ-সমালোচনা** (ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৬)।

৮. প্রাকৃত ও সংস্কৃত (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮)।

৯. বাংলা ব্যাকরণ (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮)।

মোটকথা, পূর্বোক্ত ২০টি প্রবন্ধ বাং ১২৯২ থেকে ১৩০৮ অর্থাৎ মোট ১৭ বছরের মধ্যে লিখিত। এদের মধ্যে পরিশিষ্টের ৭-সংখ্যক প্রবন্ধটি (উপসর্গ-সমালোচনা) আমাদের আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। কিন্তু গ্রন্থটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি নয়। এটি একটি অখণ্ড রচনা। এতে মোট ২৩টি অনুচ্ছেদ আছে—সবগুলির শীর্ষনাম সংখ্যাবাচক।

লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সময় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) ১৯২৬ তখনও প্রকাশিত হয় নি। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' (১৯৩৯) তখনও অপ্রকাশিত। এমনকি বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'The History of Bengali Language' (C.U.), 1920 ইংরেজি বইটিও প্রকাশিত হয়নি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের বক্তব্য তাঁর একান্ত নিজস্ব।

অপরপক্ষে দ্বিতীয় গ্রন্থখানি ODBL-পরবর্তী রচনা ব'লে তাতে সুনীতিবাবুর ভাষাভাবনার প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। লক্ষণীয়, গ্রন্থখানি ''ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে'' উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সুনীতিকুমারের অবদানের কথাও স্মরণ করেছেন—''ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী। আর আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের, এমনকি তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি। প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বন্ধ প্রণালীতে (পৃ. ৪৩৮)''। কাজেই সুনীতিবাবুর ভাষাবিজ্ঞানচর্চা তাঁকে প্রভাবিত করে থাকতেই পারে। তবে তাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি, অনুমান এবং সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় না, তা তিনি যতই নিজেকে 'ব্যাকরণভীরু' ব'লে আড়ালে যেতে চান না কেন!

বর্তমানে আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের **'উপসর্গ-সমালোচনা'** প্রবন্ধটি (১৩০৬)। কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথের **'উপসর্গের অর্থবিচার'** প্রবন্ধের বিপক্ষে বিরোধী পক্ষের যে তীব্র সমালোচনা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছিলো, তারই প্রতিবাদ এটি। অর্থাৎ এই প্রবন্ধটি সমালোচনার সমালোচনা। কাজেই দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের দু'টি গ্রন্থ একই সূত্রে গ্রথিত। বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে—উভয় লেখকের ভাষাদর্শন সম্পর্কিত মতবাদ এবং বাঙলায় প্রচলিত সংস্কৃত উপসর্গগুলি বিচারের যথার্থ পদ্ধতি নির্ণয়।

২. দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ঃ ভাষা-ভাবনার দিগ্‌বলয়

রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রবন্ধটি (বাং ১৩০৬) একটি জবাবী প্রবন্ধ—এ-কথা পূর্বেই বলেছি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'উপসর্গের অর্থবিচার' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ ভাগ/৪র্থ সংখ্যা এবং ৫ম ভাগ/৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা করেন রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ঐ একই পত্রিকায় (৫/৪)। রবীন্দ্রনাথ, শাস্ত্রীমহাশয়ের মতবাদকে প্রথমেই খণ্ডন করেছেন এই ব'লে—''সেই রচনায় তিনি প্রবন্ধলেখকের মতের কেবলই প্রতিবাদ করিয়াছেন, সমালোচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কোথাও সমর্থনযোগ্য শ্রদ্ধেয় কোনো কথা আছে এমন আভাসমাত্র দেন নাই'' (র. ৮৩)।

এই হলো বর্তমানে আলোচিত প্রবন্ধটির প্রেক্ষাপট। প্রবন্ধটি আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষাভাবনায় যথেষ্ট পরিণতমনস্কতার পরিচয় আছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের দু'টি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কীয় গ্রন্থের মধ্যে এইটিই বাঙলার তুলনামূলক[২] ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের[৩] একমাত্র প্রবন্ধ এবং তা যথার্থ ভাষাবিজ্ঞান-রীতি সম্মত।

এখন এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ভাষাভাবনার দিগ্‌বলয়টি উদ্‌ঘাটন করা যাক—

প্রথমত, দ্বিজেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞান-স্বীকৃত কালানুক্রমিক (diachronic)[৪ক] পদ্ধতি সম্পর্কে হয়তো বিশেষ অবহিত ছিলেন না, তবে সমকালীন (synchronic)[৪খ] ভাষার তুলনামূলক রীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তিনি তাই প্রায়শই সমগোত্রজ ইংরেজি ভাষার শাব্দিক উপাদানগুলির সমর্থন নিয়ে সংস্কৃত উপসর্গগুলির রূপ ও অর্থ বিচার করেছেন, যেমন—পরা/পরাঙ্মুখ ঃ para : parallel (দ্বি. ৫১); অভি = ob(ject) (৫৩); প্র = pro; নি = in; সং/স = con/co; অপ = ab; বি =dis, de; অপি = epi। উদাহরণ হিসেবে তিনি অপি = epi সমীকরণে শব্দার্থের সাধর্ম্য লক্ষ্য করেছেন। বলেছেন অপি = epi—দুই-ই বহিরাবরণ জ্ঞাপক, তু, epidermis = শরীরের বহিশ্চর্ম; অপিধান = গাত্রাবরণ (দ্বি. ৬২)।

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্ষেত্র ছিলো প্রাচীন ব্যাকরণশাস্ত্র এবং ন্যায়দর্শন। তিনি যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-পারঙ্গম ছিলেন, তার সাক্ষ্য মেলে তাঁর দেওয়া সংস্কৃত উদ্ধৃতি এবং ব্যাখ্যা থেকে। যেমন ''উপসর্গের অর্থবিচার'' প্রবন্ধের সূচনায় তিনি বোপদেব[৫]-কৃত ব্যাকরণের উল্লেখ ও ভাষ্যকারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বাঙলা অনুবাদসহ—

> ''অহং চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ
> নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যেজড়বুদ্ধয়ঃ।''

''আমি ও ভাষ্যকার—আমাদের দুজনার উভয়েরই বুদ্ধি কুশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম; তাহা সত্ত্বেও আমরা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সাধ্যসাধনা করিয়াও শব্দাম্বুধির পার পাইলাম না—কী ছার জড়বুদ্ধি অপরেরা।''

অতঃপর তিনি দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটিয়ে আরও বলেছেন—''ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধকে একপ্রকার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধরূপে কল্পনা করিবার প্রথা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়দেশীয় দর্শনশাস্ত্রেই আবহমান চলিয়া আসিতেছে...'' (দ্বি. ৪৫)। আবার ''দার্শনিক হিসাবে যেমন ব্যাপ্য শ্রেণী ব্যাপক শ্রেণীর আশ্রিত, জ্যামিতিক হিসাবে তেমনি অংশ অংশীর আশ্রিত।''

বস্তুত, এইভাবে ব্যাকরণিক, নৈয়ায়িক, দার্শনিক এবং জ্যামিতিক শাস্ত্রকে আশ্রয় ক'রে তিনি 'অব' উপসর্গের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করতে চান। উদাহরণস্বরূপ, অবশেষ ঃ অবকাশ ঃ অবচ্ছেদ শব্দগুলির অর্থ 'অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ নিম্নের শেষাংশ অথবা জ্যামিতিক ভাবের নিচু অর্থ' (দ্বি. ৪৫)। দ্বিজেন্দ্রনাথের সাধারণীকৃত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই—

অধিকরণ সিদ্ধান্ত (premise)	ঃ	অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত (inference)
(যেমন, মানুষ জ্ঞানবান জীব)	ঃ	(যেমন, দেবদত্ত জ্ঞানবান জীব)
= ব্যাপক		= ব্যাপ্য
↓		↓
আশ্রয়	ঃ	আশ্রিত
↓		↓
অংশী	ঃ	অংশ
↓		↓
উচ্চ	ঃ	নিম্ন

সুতরাং ‘অব’ উপসর্গের প্রসারিত অর্থ দ্বিতীয় স্তম্ভ (column) অনুযায়ী দাঁড়াবে :

নিম্ন (নিচু)

↓

দেশে নিচু (তু. অবরোহণ, অবতরণ)	লৌকিকভাবে নিচু (তু. অবজ্ঞা, অবহেলা)	দার্শনিকভাবে নিচু (তু. অবধারণ, অবান্তর)	জ্যামিতিকভাবে নিচু (তু. অবশেষ, অবচ্ছেদ)

বলা বাহুল্য, এইজাতীয় জটিল যুক্তিজাল তর্কবিদ্যার পক্ষে হয়তো উপযোগী কিন্তু ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের পক্ষে তা অনাবশ্যক। আসলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক এবং নৈয়ায়িক। তাঁর যুক্তিপ্রতর্কে প্রযুক্ত হয়েছে ভারতীয় নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

এখন ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে **রবীন্দ্রনাথ**-এর সামগ্রিক ক্ষেত্রটির পরিচয় নেওয়া যাক। বাঙলাভাষার স্বরূপ সন্ধানে তিনি মূলত সমকালীন বা synchronic পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে **‘শব্দতত্ত্ব’** (১৩০৬) এবং **‘বাংলাভাষা-পরিচয়’** (১৯৩৮) নামক দু'টি গ্রন্থে এইজাতীয় পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে সর্বাধিক। এ-বিষয়ে তিনি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের জনক বললে অত্যুক্তি হয় না। সমকালীন ভাষাবিচার-পদ্ধতি তাঁর রচনাতে প্রযুক্ত হলেও (এবং তার জন্য তিনি এখনও প্রাসঙ্গিক) কালানুক্রমিক বা diachronic পদ্ধতিও তাঁর কাছে কম আকর্ষণীয় ছিলো না। এই প্রযুক্তি তাঁর দু'টিমাত্র প্রবন্ধে দেখা যায়। এই দুইটিই ‘শব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থে সংকলিত আছে। স্মর্তব্য, তখনও কিন্তু সুনীতিকুমারের ODBL গ্রন্থ (১৯২৬) প্রকাশিত হয়নি।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙলা ভাষা ছিলো সর্বভারতীয় আর্যভাষাগুচ্ছের মানদণ্ডে বিচার্য। তদানীন্তন ভাষাচার্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হ্যর্নলে এবং বীম্‌স। ‘শব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত **‘বাংলা বহুবচন’** প্রবন্ধটিতে (১৩০৫) তিনি সর্বপ্রথম বিদেশী ভাষাবিজ্ঞানীদের methodology গ্রহণ করেছেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটির প্রথম পাদটীকায় তিনি বলেছেন—“প্রাকৃতের পরবর্তী সমুদয় সংস্কৃত-মূলক ভারতবর্ষীয় ভাষার উল্লেখস্থলে হ্যর্নলে ‘গৌড়ীয় ভাষা’ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার উল্লেখ অনুসরণ করিব” (র. ২১)। এই প্রবন্ধটি আসলে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার তুলনামূলক (comparative) আলোচনা। তাই এখানে তিনি যেমন পশ্চিমা হিন্দী, মাড়োয়ারী, হিন্দী, নেপালী, মাগধী (= মগহী), কনৌজী, ব্রজভাষা, গঢ়বালি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষার উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন, তেমন চাঁদ, কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিদের নামোল্লেখ করেছেন। আবার উদ্ধৃত বহুবচন প্রত্যয়গুলির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য পদ্ধতি এবং মত অবলম্বন করলেও প্রত্যয়গুলির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য পদ্ধতি এবং মত অবলম্বন করলেও প্রত্যয়গুলির ব্যুৎপত্তি বিচারে তিনি নিজস্ব মতও পেশ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে তাই তিনি বলেছেন—“দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে-সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ্-সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ, গ্রিয়ার্সন-সাহেবের মৈথিলী-ব্যাকরণ এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।”—যদিও বলেছেন—“...আমাদের এই আলোচনাগুলি সংশয়পরিশূন্য নহে” (র. ২৮)।

‘বীমসের বাংলা ব্যাকরণ’ একই সময়ে রচিত (১৩০৫)। তবে এখানে রবীন্দ্রনাথ আরও সাহসী সমালোচক হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন—“এই ভ্রমসঙ্কুল ব্যাকরণটি লিখিতে গিয়াও

বিদেশীকে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে” (র. ১৫)। কিন্তু ‘‘বীম্‌স সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে যে সমস্ত ভুল করিয়াছেন, সেইগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ”ও কম শ্রমসাধ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, প্রবন্ধটি মূলত বাঙলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বমূলক আলোচনা।

‘‘**উপসর্গ-সমালোচনা**” (১৩০৬) প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভাষাসমীক্ষার পাশ্চাত্য রীতি ও পদ্ধতিকে আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে ভাষাবিজ্ঞানের অতুলনীয় সৃষ্টি। পূর্বেই বলেছি, এই পদ্ধতির মূল সূত্র হলো ‘‘তুলনামূলক আলোচনা” (র. ৯১) বা comparative method। ‘স্বজাতীয়’ (র.) ইউরোপীয় ভাষাগুচ্ছ থেকে আহরিত সমগোত্রজ (cognates) উপসর্গগুলিকে (prefix) তিনি তৌলন মানদণ্ডে বিচার করেছেন। এবং যে সংস্কৃত উপসর্গগুলি বাঙলায় এখনও ব্যবহৃত হয়, সেগুলির শব্দ ও অর্থের সাধর্ম্যের পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন অথবা নিয়মিত পার্থক্যের ঐক্য সন্ধান ক’রে সূত্রায়িত করেছেন। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় ভাষাচার্যদের তিনি অগ্রাহ্য করেননি। প্রয়োজনে প্রাচ্যরীতির ব্যাকরণ-ভাবনায় কদাচিৎ হেত্বাভাস বা fallacy-র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রাচীন বৈয়াকরণদের উপসর্গ-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিরোধী মতবাদগুলিকে অগ্রাহ্য বা নিয়ন্ত্রণ ক’রে তিনি পাশ্চাত্য-ভাবধারার আরোহী (inductive) পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, কখনও-বা নিজস্ব স্বাধীন মত পেশ করেছেন। এইজন্য তাঁর প্রবন্ধটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনায় স্বগোত্রজ ইউরোপীয় ভাষার উদাহরণ অনেক বেশী। বস্তুত, তাঁর দুটি প্রবন্ধে যে-সব পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের নাম ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তার সংখ্যা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। নামগুলির উল্লেখ আশা করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বন্ধনীভুক্ত পৃষ্ঠাসংখ্যা রবীন্দ্ররচনাবলীর জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (১৪শ খণ্ড-প্রবন্ধ) থেকে গৃহীত ঃ

১. বীমস্‌ (‘বীমসের বাংলা ব্যাকরণ’) (র. পৃ. ১৫, ১৯, ২৬)। মূল বইটি হলো John Beames : A comparative Grammar of the Modern Aryan Languages (1872-1879, reprint 1970)।

২. হ্যর্নলে (পৃ. ২১, ২৬, ২৮, ৫১, ৪৩৮)। মূল বই—R. Hoernle : A Comparative Grammar of the Gaudian Languages (1880)।

৩. ব্রুগমান (পৃ. ৩০)। মূল বই—Karl Brugmann : Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages (1886). Translated by J. Wright।

৪. ডাক্তার ব্রাউন রচিত অসমিয়া ব্যাকরণ (পৃ. ২৮, ৮১)। মূল বই—N. Brown : Grammatical notes on the Assamese Language (1848)।

৫. অধ্যাপক উইলকিন্স রচিত ‘গ্রীকভাষা’ প্রবন্ধের উদ্ধৃতি (পৃ. ৮৯)।

৬. চেম্বার্সের অভিধান (পৃ. ৯১)।

৭. গ্রীয়ার্সনের মৈথিলী ব্যাকরণ (পৃ. ২৮)। মূল বই—G. A. Grierson : Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language (1909)।

৮. কেলগ্‌ রচিত হিন্দী ব্যাকরণ (পৃ. ২৮)। মূল বই—S. H. Kellogg : A Grammar of the Hindi Language (1875)।

৯. সুনীতিকুমার (চট্টোপাধ্যায়) (পৃ. ৪৩৮, ৪৫৯, ৪৭৬)। মূল বই—The Origin and

Development of the Bengali Language (=ODBL, 1926)। ODBL গ্রন্থের নামোল্লেখ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থে নেই—যদিও সুনীতিবাবুর নাম বারবার এসেছে।

'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রবন্ধেও পাশ্চাত্য প্রভাব আছে, তবে প্রাচ্য ভাষাচার্যদের উপেক্ষা করে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন উইলকিন্সের গ্রীকভাষা প্রবন্ধ, জার্মান অভিধান, চেম্বার্স-এর অভিধান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তেমনি মেদিনী-কোষকার, দুর্গাদাস, সংস্কৃত অভিধান (শব্দকল্পদ্রুম, শব্দস্তোমমহানিধি) প্রভৃতির বক্তব্য পেশ করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক পাশ্চাত্যধারার দিকে, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্যধারার।

দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষাবিচার-পদ্ধতির সঙ্গে **রবীন্দ্রনাথের** পদ্ধতির পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভাষাচার্যদের সঙ্গে পার্থক্য তো শতযোজনের। বস্তুত, প্রাচীন বৈয়াকরণদের যত মত তত পথের অনুসন্ধানে না গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ এক অভিনব আধুনিক পদ্ধতিতে উপসর্গের স্বরূপসন্ধান করেছেন। এখন তাঁর কথাতেই তাঁর মতবাদের ভাষ্য রচনা করা যাক :

"উপসর্গের অর্থবিচারের যুক্তি-পদ্ধতি দুইরূপ হইতে পারে; (১) Scholastic deduction এবং (২) Baconian induction। এ-যাবৎ কাল প্রথম পদ্ধতিটিই আমাদের দেশের পণ্ডিতমহলে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, ... আমি এই দুই যুক্তি-পদ্ধতির দ্বিতীয়টি অবলম্বন করিয়া বিচারকার্য নির্বাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। Baconian পদ্ধতি এই যে, অগ্রে সুপরিজ্ঞাত fact সংগ্রহ, পরে সংগঠন। ... Scholastic পদ্ধতি এই যে, অগ্রে বারো মুনির বারো theory-র কোনো একটি theoryকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ, পরে fact কে গড়িয়া পিটিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দেওয়া। Fact কি না বৃত্তান্ত, theory কি না সিদ্ধান্ত। Scholastic পদ্ধতির আগে সিদ্ধান্ত পরে বৃত্তান্ত, Baconian পদ্ধতির আগে বৃত্তান্ত পরে সিদ্ধান্ত।" (পৃ. ৬২)। পরে আরও বলেছেন— "বিজ্ঞান-মহলে প্রমাণের ঐকান্তিক বলবত্তা কেবল গণিতের যুক্তি প্রণালীতেই সম্ভবে" (দ্বি.পৃ. ৬৩)।

দ্বিজেন্দ্রনাথের Baconian পদ্ধতিটি হলো এই—তিনি প্রথমে তুলনামূলক পদ্ধতির (comparative method) মানদণ্ডে বাঙলা ভাষার বিভিন্ন উপসর্গের বৃত্তান্ত সংকলন করেছেন এবং সেইসঙ্গে তাদের প্রয়োগ এবং অর্থ-বিচার করেছেন। উপসর্গের মূল অর্থ বোঝা যাবে, তাদের মিল এবং অমিলের তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য বিচার ক'রে। প্রয়োজনবোধে কখনো-বা ইংরেজি শব্দের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি **'প্র'** এবং **'নি'** উপসর্গের বৈপরীত্য (contrast)—দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় প্রতিযোগিতা—দেখিয়েছেন এইভাবে—

বাঙলা প্র = ইং pro, যেমন—	প্রশ্বাস	প্রবৃত্তি	প্রবেশ
	|	|	|
নি = ইং in	নিঃশ্বাস	নিবৃত্তি	নিবেশ

এইজাতীয় জোড়ের অভিমুখ বা বিপরীতার্থ বোঝায়—"প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখ দিকে; নি-উপসর্গের লক্ষ্য ভিতরের দিকে, যেমন প্রবেশ শব্দের প্র প্রবেশ-কর্তার সম্মুখ দিক দেখাইয়া দেয়; নিবেশ শব্দের নি লক্ষ্যবস্তুর ভিতরের দিক দেখাইয়া দেয়" (দ্বি.পৃ. ৩)।

বলা বাহুল্য এইজাতীয় বৈপরীত্য বিচার, form-কেন্দ্রিক নয়, lexeme বা শব্দার্থকেন্দ্রিক। দ্বিজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তৌলন পদ্ধতির সাহায্যে শব্দের উৎস নির্ণয় নয়, বরং শব্দার্থের উপপত্তি

(inference) বিচার। ফলে তাঁর বিচার-পদ্ধতি আধুনিক Sememics-এর কোঠায় পড়ে।[৬] বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলায় এইজাতীয় শব্দার্থ নির্ণয়-পদ্ধতির পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

"শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, উপসর্গের অর্থবিচার সম্বন্ধে তিনি একটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। ... (কিন্তু) তাহা বিজ্ঞানসম্মত রাজপথ। তিনি দৃষ্টান্ত পরম্পরা হইতে সিদ্ধান্তে নীত হইয়া উপসর্গগুলির অর্থ-উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফল সর্বত্র না-ও যদি হয়, তথাপি সেই প্রণালী একমাত্র সমীচীন প্রণালী। ... প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে এই প্রকার প্রণালী অবলম্বনে উপসর্গের অর্থনির্ণয় হইয়াছিল বলিয়া জানি না" (র. ৮৩)। বস্তুত, উপসর্গ-বিচারে ভাষাবিজ্ঞানসম্মত এই আরোহী (inductive) পদ্ধতি প্রয়োগই তাঁর শব্দার্থ সন্ধানের গোড়ার কথা।

দ্বিতীয় কথা, দ্বিজেন্দ্রনাথ শব্দের বিপরীতধর্মিতার পাশাপাশি অর্থের প্রসারণশীলতার অভিমুখও লক্ষ্য করেছেন। দুটি শব্দের খাড়াখাড়ি (vertical) অবস্থানরেখা যদি হয় ধ্রুবাক্ষ (polar axis), তবে শব্দার্থের বৈপরীত্য হবে মেরুমাত্রিক (polar opposition)। কিন্তু শব্দের অর্থ-অক্ষ যদি আড়াআড়ি (horizontal) প্রসারণশীল হয়, তবে তাদের অর্থ হবে বহুমাত্রিক। দ্বিজেন্দ্রনাথের উদাহরণ জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এইভাবে :

১.

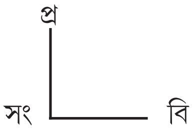

(পৃ. ১২)

২.

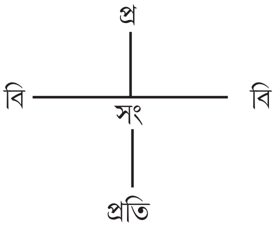

(পৃ. ১৩)

প্রথম জ্যামিতিক চিত্রে দেখি ঃ

প্র—উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখপ্রবণতা।

বি—উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ পার্শ্ব-প্রবণতা।

সং—উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা। (দ্বি. ২৭)

উদাহরণস্বরূপ—

প্র ঃ প্রক্ষিপ্ত = সম্মুখে ক্ষিপ্ত।

বি ঃ বিক্ষিপ্ত = আশেপাশে ক্ষিপ্ত।

সং ঃ সংক্ষিপ্ত = একস্থানে কেন্দ্রীভূত (দ্বি. ১১)

দ্বিতীয় জ্যামিতিক চিত্রে দেখি ঃ

প্র—উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখপ্রবণতা।

বি—উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ পার্শ্বপ্রবণতা ও বর্জনীয়তা[৭], বৈপরীত্য গৌণ।

সং—উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা।

প্রতি—উপসর্গের সঙ্গে প্র-উপসর্গের মুখ্য বৈপরীত্য, যেমন—

প্রাচী = পূর্ব; প্রতীচী = পশ্চিম (প্র ঃ প্রতি)[৮] (দ্বি. ১৫, ৪৮)।

মোটকথা দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তব্য, উপসর্গের অর্থ একমুখী নয়। তার পরিব্যাপন-ক্ষমতাও (diffusion of meaning) আছে। একটি সুন্দর উপমা দিয়ে তিনি ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন—"জেলে যখন জাল নিক্ষেপ করে, তখন জাল সম্মুখে প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে বিস্তারিত হয়" (দ্বি. ১৫)। অনুরূপ, "বৃক্ষ উচ্চে প্রবর্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাশেও বিবর্ধিত হয়" (তু. প্র-বর্ধিত ঃ বি-বর্ধিত)।

এইভাবে লেখক উদাহরণের সাহায্যে বি-উপসর্গের সাত রকমের অর্থ নিচের উদাহরণে স্পষ্ট করে তুলেছেন ঃ

১. বি-উপসর্গের মুখ্য অর্থ পার্শ্বপ্রবণতা, যেমন, বিজ্ঞান = পার্শ্বঘেঁসা আপেক্ষিক তত্ত্বজ্ঞান (তু. প্রজ্ঞা ঃ সংজ্ঞা); প্রকার ঃ বিকার।

২. বিবর্জন অর্থে—সবস্ত্র ঃ বিবস্ত্র; সজন ঃ বিজন।

৩. বৈপরীত্য অর্থে—যেমন, অনুরক্ত ঃ বিরক্ত; অনুলোম ঃ বিলোম।

৪. হেয়তা অর্থে—যেমন, সুশ্রী ঃ বিশ্রী; ধর্ম ঃ বিধর্ম।

৫. বিশেষত্ব অর্থে—যেমন, দ্বেষ ঃ বিদ্বেষ; ঃ হীন ঃ বিহীন।

৬. পরিবর্তন অর্থে—যেমন, প্রকৃতি ঃ বিকৃতি; প্রকাশ ঃ বিকাশ।

৭. অসামঞ্জস্য অর্থে—যেমন, অঙ্গ ঃ ব্যাঙ্গ; সদৃশ ঃ বিসদৃশ ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে, এইভাবে মূল অর্থ থেকে বিভিন্ন অর্থের (plurality of meaning) উদ্ভব ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ-এর ভাষাবিচার-পদ্ধতি ভিন্ন। তিনি উপসর্গের গাঠনিক দিকটির তুলনা করতে চেয়েছেন। বাঙলা (তথা সংস্কৃত) উপসর্গগুলির মূল অর্থকে আদর্শ ধ'রে অন্যান্য সমগোত্রীয়, যেমন, ইংরেজি, লাটিন, গ্রিক, জার্মান প্রভৃতি ভাষার (প্রায়-) সমার্থক শব্দাবয়বের তুলনা করেছেন এবং শব্দাবয়বের তুলনা করেছেন এবং শব্দার্থের সম্ভাব্য মূল উৎসটিকে চিহ্নিত করতে মনোযোগী হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ হলো ঐতিহাসিক-তৌলন পদ্ধতির (historical-comparative method) বিচার। অবশ্য এইজাতীয় পদ্ধতির সাহায্যে তিনি বিভিন্ন উপসর্গগুলির প্রত্ন-রূপ (proto-form) গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন নি—যেমন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা করে থাকেন। তিনি কেবল উপসর্গের অবয়ব ও শব্দার্থের নিকট-সম্পর্কই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-সংকলিত বাঙলা/সংস্কৃত এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাগুলির সমীকরণ এবং পরিচয় এই প্রবন্ধের শেষে নেওয়া হবে।

তৃতীয়ত, সংস্কৃতে সাধারণভাবে প্রচলিত ২০টি উপসর্গের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৪টি উপসর্গের বিশদ আলোচনা করেছেন। বাকি ৬টি উপসর্গকে (সু, দুঃ, অনু, উৎ, অভি, অপি) "বিচারের দায় হইতে অব্যাহতি" দিতে চেয়েছেন, "কেন না ইহাদের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই—সবই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট" (দ্বি. ৬১-৬২)। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঐ ১৪টি উপসর্গ ছাড়াও অতিরিক্ত কয়েকটি উপসর্গের সার্বিক আলোচনা করেছেন। কেননা, এগুলির রূপ ও অর্থ ইণ্ডো-জার্মানিক

(আসলে ইন্দো-ইউরোপীয়) ভাষাগুচ্ছের তুলনামূলক বিচারে সিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত। আশ্চর্যের বিষয় ১৮৯৯ (বাং ১৩১৬) সালে লিখিত এই প্রবন্ধের সমসময়ে কোনো তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ইংরেজি বই প্রকাশিত হয় নি বলেই মনে হয়। ব্যতিক্রম অবশ্য কার্ল ব্রুগ্‌মান-এর (Karl Brugmann) জার্মান থেকে অনূদিত “Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages” (1886)। রবীন্দ্রনাথের ‘শব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থে ব্রুগমানের উল্লেখ আছে (র. ৩০)। কাজেই তিনি হয়তো এ-বই দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত এই বিশাল গ্রন্থটি মাত্র কয়েক বছরে আয়ত্ত করা কঠিন ব্যাপার তো বটেই। লক্ষণীয় ‘ইণ্ডো-জার্মানিক’—এই প্রাচীন পরিভাষাটি (ইন্দো-ইউরোপীয় স্থলে) ব্রুগমানই ব্যবহার করেছিলেন।

চতুর্থত, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ—উভয়ের রচনাতেই বৈদিক ভাষার উল্লেখ আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সায়নাচার্যের বেদভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি আছে। সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়েরা ‘সং’ উপসর্গের অর্থ করেছেন ‘সম্যক রূপে’; তা তিনি মেনে নেননি। তাঁর মতে, ‘‘সায়নাচার্যকৃত বেদভাষ্যে ‘সংবদদ্ধং’ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে ‘সহবদত’; অতএব সং যে সহ, ইহা একপ্রকার বেদবাক্য” (দ্বি ৮)। ‘সং’ যে মূলে ছিল ‘সহ’, তা রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছেন। তাঁর উক্তি ঃ ‘‘বিখ্যাত ঋক্‌মন্ত্রে সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং শ্লোকে স্পষ্টতই সং শব্দের একত্ব অর্থ প্রকাশ পায়; শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রাচীন আর্যভাষায় সং শব্দের কোনো মূল ধাতুর অর্থ যে এক ছিল, সে-অনুমান অন্যায় নহে” (র. ৯১)।

তবে উপসর্গের উৎসবিচার সম্বন্ধে উভয়ের কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে। **দ্বিজেন্দ্রনাথের** মতে ‘‘বেদাদি প্রাচীনতম শাস্ত্রে অনেকানেক স্থলে উপসর্গ পৃথক শব্দাকারে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খুব সম্ভব যে, অত্যতি পূর্বকালে অর্থাৎ মান্ধাতারও মান্ধাতা আমলে সকল স্থলেই উপসর্গগুলি ইংরাজী Preposition-এর ন্যায় পৃথক শব্দাকারে ব্যবহৃত হইত (দ্বি. ৬১)। অপরদিকে **রবীন্দ্রনাথ** মনে করেন—‘‘য়ুরোপীয় আর্যভাষার prefix ও ভারতীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলি সাধারণত আমাদের চোখ এড়াইয়া যায় বলিয়া শব্দ ও ধাতুর অঙ্গে তাহাদের প্রাধান্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এবং তাহারা যে সম্ভবত আর্যভাষার প্রথম বয়সে স্বাধীন শব্দরূপে ছিল এবং কালক্রমে খর্বতা প্রাপ্ত হইয়া পরাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ সংশয় আমাদের মনে স্থান পায় না” (র. ৮২)। অন্যত্র আবার বলেছেন—‘‘আমাদের মনে প্রথমে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, যে-অর্থ ক্রিয়ার বিশেষণভাবে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তাহা উপসর্গ সম্বন্ধে প্রযুজ্য কিরূপে হয়” (র. ৮৩)।

রবীন্দ্রনাথের এই দুটি সংজ্ঞা একত্রে তুলনা করলে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মতে—

১. উপসর্গ আদিতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শব্দ ছিলো।

২. উপসর্গগুলি মূলত ছিল ক্রিয়াবিশেষণ (adverb)।

৩. কালক্রমে এগুলি খর্বতা প্রাপ্ত হয় এবং স্বভাবতই অনুমেয় যে—

৪. উপসর্গ নাম বা ক্রিয়াপদের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞাটি দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং ঐতিহাসিক ব্যাকরণসম্মত। বস্তুত, বৈদিক যুগে উপসর্গগুলি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র শব্দই ছিলো। তাই এগুলি বাক্যের যে-কোনো স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে (tmesis) অবস্থান করতে পারতো ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে, যেমন, ́প্র ণ আয়ূংষি...তারীঃ (ঋগ্‌বেদ); ́আ ত্বা বিশন্ত (ঋ.বে)। এগুলি ছিলো উদাত্ত স্বরযুক্ত

(pitch accented)। ক্রিয়াগুলি থাকতো স্বরহীন। স্বরযুক্ত উপসর্গগুলি বিযুক্ত হলেও ছিলো ক্রিয়াশ্রয়ী। তার প্রমাণ, একটি স্বরযুক্ত উপসর্গই একাধিক উহ্য ক্রিয়াকে চিহ্নিত করতো, যেমন—র্পরি মাম্ র্পরি মে প্রজাম্ র্পরি ণঃ পাহি যদ্‌ধনম্ (অথর্ববেদ)। অর্বাচীন স্তরে এগুলি নাম বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত (অর্থাৎ পরাশ্রিত) হলে তা নাম বা ক্রিয়ার অর্থ নিয়ন্ত্রণ করতো, যেমন—ভবতি ঃ অনুভবতি। কিছু উপসর্গ, অনুসর্গরূপে (postposition) (পাণিনির পরিভাষায় কর্মপ্রবচনীয়) রয়ে গেছে (তু. আ সমুদ্রাৎ, দেবান্ অনু)। [দ্র. অনুচ্ছেদ ৪।। (ক), পৃ. ১০৫]

উপসর্গগুলি যে অতি প্রাচীন স্তরে নিশ্চয়ই কোনো পূর্ণ শব্দ ছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষণীয়, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় কারক-বিভক্তিগুলির উৎপত্তি তার সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন, -কে < সং কৃত, -তে < সং অন্ত ইত্যাদি।[৯]

পঞ্চমত, বক্তব্য উপস্থাপনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ সমালোচকের দৃষ্টিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের মতবাদকে সমর্থন করেও তিনি নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য ন'-দশ পাতার মধ্যে সীমিত, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে উচ্চারিত। যথার্থ প্রাবন্ধিকের সমস্ত গুণই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

অপরদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বরূপে দার্শনিক, বিচারে নৈয়ায়িক, কিন্তু স্বভাবে শিল্পী। তাঁর দীর্ঘ রচনা কথকতার ভঙ্গিতে রচিত। তিনি যেন আগে কথক, পরে লেখক। অবশ্য তাঁর রচনায় সূত্রের চেয়ে ব্যাখ্যা বেশি, বক্তব্যের চেয়ে আলাপচারিতা। রচনায় দৃঢ়সন্নদ্ধতা অপেক্ষা স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তা এবং মজলিশি মানসিকতা বিচ্ছুরিত হয়েছে বেশি। একটি উদাহরণ (আর্য শব্দের বানান প্রসঙ্গে)—''আর্যের ... মস্তকে শিখা উড্ডীয়মান—জমকালো রেফ; আর তাহার গলদেশে উপবীত লম্বমান—দিব্য সর্পাকৃতি য-ফলা। অতএব আর্যের কাজ আর্য করুন...'' (দ্বি. ৩৫)। এমনকি বিদেশী নামের বঙ্গীকরণেও তিনি রসিকতা করতে ছাড়েন না। তাই Max Müller, তাঁর কাছে 'শ্রীযুক্ত Max Müller ভট্টাচার্য' (দ্বি. ৩৬) এবং দেকার্ত হয়েছেন 'দে-কর্তা' (দ্বি. ২৪)।

মোট কথা, সব মিলিয়ে তাঁর রচনা যেন রম্য প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে।

৩. দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরীতি

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রশংসাযোগ্য অবদান হলো, একাধারে তাঁর গদ্যরীতির অভিনব নমনীয়তা এবং জোরালো উপস্থাপনা। তাঁর বাঙলা ভাষারীতি সাধু গদ্য-আশ্রিত। গদ্যরীতি সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধুভাষা। তাঁর কাছে ''সাধু ভাষা পোষাগি ভাষা, ইতর ভাষা আটপৌরে ভাষা'' (দ্বি. ৩৯)।

তবে এই পোষাকী ভাষা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। এতে গ্রীক, লাটিন, ইংরেজি সংস্কৃত, সাধু এবং চলিত বাঙলার অবারিত দ্বার। দ্বিজেন্দ্রনাথের ইডিয়ম ধার ক'রে বলি, তাঁর ব্যবহৃত ভাষার উপাদানগুলি যেন ''গাত্রে গাত্রে সংলগ্ন করিয়া কোলাকুলি'' (দ্বি. ৫৯)। বাস্তবিকই বিষয়বস্তু ব্যাখ্যানে তিনি যেমন ন্যায়দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, 'ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞান' প্রভৃতি কোনো বিদ্যাকেই বাদ দেন নি, তেমনি ভাষাব্যবহারেও কোনো ভাষাকেই অচ্ছুত ব'লে মনে করেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথের মানসিক সক্রিয়তা এবং ভাষিক সচলতা প্রমাণে এখন কিছু উদাহরণ নির্বাচন করা যাক :

১. বানানে ইংরেজী শব্দ + বাঙলা প্রত্যয়/শব্দাংশ অথবা বিপরীত সজ্জা ঃ পক্ষত্ব কি না Partyত্ব (দ্বি. ৫২); অভিject (= object); তৎ বা that-ই যথেষ্ট (৩৪); co-পত্নী, co-জঠরজাত, co-হৃদয় (৯), প্রয়োজন = pro-যোজন (৪), in-পূর্বক (৪)।

২. ইংরেজি শব্দ + বাঙলা বিভক্তি ঃ 'বারো মুনির বারো theoryকে ... বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করার পরে factsকে গড়িয়া পিটিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দেওয়া' (৬২), 'মহর্ষি গৌতম যখন hypothesis-কে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন, তখন তাহা উল্টানো তোমার আমার সাধ্য নহে' (৪৪)।

৩. নির্বিচারে বাঙলা বাক্যে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ঃ ''ঝোঁকই বলো, টানই বলো তাহা লক্ষ্যকর্তার proclivity, লক্ষ্যবস্তুর প্রতি inclination" (দ্বি. ৩); ''এ income সরস্বতীর income—বুদ্ধির লোহার সিন্ধুকে তত্ত্বের income" (৫); ''নির্বাচন = বাক্যের ঠিক অর্থটি বাহির করিয়া তোলা—Define করিয়া তোলা" (৫৭); "conclusion যুক্তি-পথের মধ্য দিয়া বুদ্ধির বাহির হইতে ভিতরে আগমন করে..." (৬); ''অমুক has told a downright lie" (১৬); ''শিষ্টোচিত gentlemanly আচার-ব্যবহার" (১৯)।

৪. বাঙলা গদ্যে মাঝে মাঝে সংস্কৃতসিদ্ধ পদ ঃ "Baconian পদ্ধতির **প্রসাদাৎ**" (দ্বি. ৬২) [= ইংরেজি + বাঙলা + সংস্কৃত পদ]। ''**অস্মৎকৃত** টীকা" (৪৫); ''তৃতীয় পক্ষ জনসমাজেরও **তথৈবচ**—" (৩৬); ''ভাষাতত্ত্বের বিচিত্র-গতি বিষয়ে তাঁহাদের চক্ষু একেবারেই **বদ্ধ-কপাট**" (৩৬); ''**প্রণিধান** করা হউক" (৫৯)।

৫. সাধু ও চলিত ভাষার বিমিশ্রণ এবং চলতি উচ্চারণ ঃ ''দিক-বৈপরীত্য বিষয়ে প্রতিমুখিতা এবং পরাঙ্মুখিতার মধ্যে এইরূপ যখন **মিল** (=সাধর্ম্যের পরিবর্তে) রহিয়াছে, তখন দিক্-বৈপরীত্যের **লেজুড়** ধরিয়া..." (৪৯-৫০); ''উপরে উপরে সংলগ্ন হওয়ার নাম adhere। **হাড়ে হাড়ে** অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার নাম inhere" (৫৮); ''ব্রাহ্মণের **ব্যালাই** বা চাটুর্যে মহাশয় হইল কেন?" (৩৩); ''আর **গোটা দুত্তিন** স্থান তত্ত্বৎ প্রতিষ্ঠাতার নামে অনুসংজ্ঞিত" (৩৪); ...দুয়ের মধ্যে **একচুলও** ভাবের ইতর বিশেষ নাই" (৩৭); ''এমন কি **রাঁদুনে বামুনকেও** আমরা বামুন ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি" (৩৭); ''তীর্যক শব্দে **ত্যাড়চা** বা **কোনাকুনি** ভাবের দূরবর্তিতা বোঝায়" (৫১); ''কোনো একটি স্থানেও আমি **গায়ের জোরে** কোনো একটি মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করি নাই" (৬৪); **ভেল্‌কিবাজী,** শব্দের **মারপ্যাঁচ** (৩৬); কুল-**ঘ্যাঁসা** ঃ প্রদেশ **ঘেঁসিয়া** (৫৮); **সাঁটে** এইরূপ বলা যাইতে পারে (৩৯) ইত্যাদি।

বস্তুত, বাঙলা ভাষা ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রনাথের কোনো ছুঁৎমার্গিতা ছিলো না। ভাষাপ্রয়োগে তিনি সচেতনভাবে ভাষিক মিশ্রণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অপরদিকে পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ প্রবন্ধের পাতায় পাতায় সংহত হয়েছে। সেক্ষেত্রেও ইউক্লিড (খ্রি. পূ ৩০০) থেকে ম্যাক্সম্যুলার (১৮২৩-১৯০০) অথবা সায়ন (১৪ শতক) থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) —কেউই তাঁর দীর্ঘ নজর থেকে বাদ যাননি। তাঁর রচনায় যেমন বেদোপনিষদের প্রজ্ঞাবাণী অথবা পঞ্চদশীর (দ্বি. ৫) উল্লেখ আছে, তেমন ডারউইন (১৮০৯-৮২) এবং নিউটনেরও (১৬৪২-১৭২৭) প্রসঙ্গ আছে। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে তাঁর দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণশীলতা : ''অতএব ভাবিয়া দেখিলে প্রজ্ঞা বিজ্ঞানের মূলও বটে—ফলও বটে; তাহার সাক্ষী—বেকন[১০] এবং দে-কর্তার[১১] প্রজ্ঞাবাণীগুলি আরিস্ততেলিক এবং আরবিক বিজ্ঞানের ফল, কিন্তু নিউটনিক মূল। তেমনি বেদোপনিষদের প্রজ্ঞাবাণীগুলি প্রাচীনতর বিজ্ঞানালোচনার ফল এবং মধ্যমাব্দীয় বিজ্ঞানের মূল" (দ্বি. ২৪)।

শেষ কথা, দ্বিজেন্দ্রনাথের 'উপসর্গের অর্থবিচার' এবং রবীন্দ্রনাথের 'উপসর্গ-সমালোচনা' —প্রবন্ধদু'টির তুলনামূলক বিচার ক'রে সহজ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবিসার্বভৌম হলেও বিশেষত এই প্রবন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্যের ভার বেশী। বিপরীতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বরূপত পণ্ডিতমানুষ হলেও এখানে তিনি যথার্থ শিল্পরসিক এবং "সাহিত্যসেবক" (দ্বি. ৬৪)।

লক্ষণীয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য ধারায় আরোহী বা inductive পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তবে উভয়ের গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর পার্থক্য আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় সংস্কৃতে প্রচলিত উপসর্গগুলিই বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আরও অতিরিক্ত কিছু উপসর্গকে তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রনাথের উপজীব্য উপসর্গের অর্থবিচার, যার ফলিত বিচার সিদ্ধ হয়েছে অর্থের বৈপরীত্যের (semantic contrast)—তৌলন মানদণ্ডে। এমন বিচারের পদ্ধতি ভারতীয় ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রথম। রবীন্দ্রনাথ শব্দার্থ-বিচারের এই পৃথক মানদণ্ড এবং বিচারপদ্ধতির অভিনবত্ব লক্ষ্য করেছেন সপ্রশংস দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তিনি সদ্য-আবির্ভূত তুলনামূলক ঐতিহাসিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক এবং সমগোত্রজ সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় ভাষাগুলির রূপ (form) তুলনা ক'রে মূল উৎস নির্ণয় করা হয়। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের রচনায় গ্রীক, লাটিন বা অন্যান্য ভাষার উদাহরণ বেশী। এইজাতীয় উপাত্তের (data) সংগ্রহ এবং তুলনা থেকেই মূল ইণ্ডো-জার্মানিক (=ইন্দো-ইউরোপীয়) ভাষা পুনর্গঠন করা হয়ে থাকে।

৪. রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ঃ 'উপসর্গ' সমালোচনা'

আলোচ্য **প্রবন্ধটির প্রথমাংশে** রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধের সমালোচক রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর বিভিন্ন মত খণ্ডন করেছেন। এবং বর্তমান প্রবন্ধের শেষাংশে তুলনামূলক (comparative) পদ্ধতির সাহায্যে বাঙলায়-ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গগুলি বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বত্রই দ্বিজেন্দ্রনাথের মতের সমর্থন করেছেন, প্রয়োজনে তার বিশদীকরণ করেছেন অথবা নিজস্ব মতের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন।

প্রথমত, শাস্ত্রীমহাশয়ের যুক্তি : "আমাদের দেশীয় প্রাচীনতম শব্দাচার্যদিগের মতে...একই উপসর্গের ধাতুভেদে প্রয়োগভেদে নানা অর্থ লক্ষিত হয়। ওই সকল প্রয়োগের অর্থ অনুগত (generalize) করিয়া তাঁহার এক-একটি উপসর্গের কতকগুলি করিয়া অর্থ স্থির করিয়াছেন" (৮৩)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যুক্তি, কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে তাঁরা বিভিন্ন উপসর্গের অর্থ নির্ধারণ করেছেন তা জানা নেই, পরীক্ষা করবারও উপায় নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেদিনী-কোষকার 'অপ' উপসর্গের এই এই অর্থ নির্দেশ করেছেন—অপকৃষ্টার্থঃ, বর্জনার্থঃ, বিয়োগঃ, বিপর্যয়ঃ; বিকৃতিঃ, চৌর্যং, নির্দেশঃ, হর্ষঃ। এগুলির মধ্যে 'অপ' উপসর্গের অপকৃষ্টার্থ অথবা চৌর্যজাতীয় নীচার্থ (তু. abduction = অপহরণ) হয়তো ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু উপসর্গের 'হর্ষ'-অর্থ কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে! এছাড়া "আমাদের মনে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, যে-অর্থ ক্রিয়ার বিশেষণভাবে ব্যবহৃত হইতে না পারে তাহা উপসর্গ সম্বন্ধে প্রযুজ্য কিরূপে হয়।" এর অর্থ উপসর্গগুলি উৎপত্তি বিচারে ক্রিয়াবিশেষণ। কিন্তু উদ্ধৃত উদাহরণগুলি ক্রিয়াবিশেষণ নয় (র, ৮৩-৮৪)।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন বৈয়াকরণদের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত উপসর্গ প্রয়োগের ক্ষেত্রে "মেদিনীকোষকার সং-উপসর্গের যে 'শোভনার্থ' উল্লেখ করিয়াছেন, দুর্গাদাসের টীকায় তাহা নাই; দুর্গাদাসের ঔচিত্য আভিমুখ্য অর্থ মেদিনীকোষে দেখা যায় না" (র. ৮৪)।

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''প্রাচীন শব্দাচার্যগণ সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, তাঁহারা কিন্তু প্রবন্ধকারের (অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের) ন্যায় এক-একটি উপসর্গের সর্বত্রই একরূপ অর্থ হইবে, ইহা স্বীকার করেন না'' (৮৪)।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ কোথাও তা স্বীকার করেননি। তিনি উপসর্গগুলির মূল অর্থ সন্ধান করেছেন এবং সেই এক অর্থ থেকে নানা অর্থের পরিণাম কেমন হতে পারে, তাও আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—''একই ধাতু হইতে ঘৃণা, ঘৃত, ঘর্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্রার্থক শব্দের উৎপত্তি হইলেও মূল ধাতুর অর্থভেদ কল্পনা করা সংগত নহে। বরঞ্চ এক ধাতুমূলক নানা শব্দের মধ্যে যে-অংশে কোনো একটা ঐক্য পাওয়া যায় সেইখানেই ধাতুর মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।'' (৮৫)। এই পদ্ধতিই দ্বিজেন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছেন। তিনি এক উপসর্গের নানা অর্থভেদের মধ্যে বিশেষ একটি ঐক্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং সেই ঐক্যের মধ্যে যে আদি এবং মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে, তা ''ব্যাপ্তিসাধন প্রণালী দ্বারা (Generalisation) দ্বারা'' আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে এ এক আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং ''এ-সম্বন্ধে এই প্রথম প্রচেষ্টা''।

চতুর্থত, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, ''**নিশ্বাস** শব্দ **প্রশ্বাস** শব্দের বৈপরীত্যবাচক নহে। ... নিশ্বাস অর্থে অন্তর্গামী শ্বাস বুঝায় না, তাহা বহির্গামী শ্বাস। ... নিশ্বাস এই শব্দটি কোনো স্থলে নিঃশ্বাস এইরূপ বিসর্গমধ্যও লিখিত হয়, কিন্তু উভয় শব্দেরই অর্থ এক'' (র. ৮৫)।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে, ''...নি উপসর্গ ও নিঃ উপসর্গ এক নহে, এমন কি তাহাদের বিপরীত অর্থ। তাঁর মতে, ''নি উপসর্গের গতি ভিতরের দিকে, নিঃ উপসর্গের গতি বাহিরের দিকে'' (র. ৮৫), যেমন ''নিবাস এবং নির্বাসন' (র. ৮৫)। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর মূল প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—''সচরাচর আমরা বলি বটে যে, নিশ্বাস ফেলিতেছি। কিন্তু সেটা ভারি ভুল—বলা উচিত শ্বাস ফেলিতেছি। কেননা নিশ্বাস যদি সবিসর্গ হয়, তবে তাহার অর্থ শ্বাসবিহীন, আর তাহা যদি নির্বিসর্গ হয়, তবে তাহার অর্থ ভিতের টানিয়া লওয়া শ্বাস। দুয়ের কোনটিরই সহিত নিক্ষেপ ক্রিয়া সংলগ্ন হয় না (দ্বি. ৫৭)। এক কথায়, তাঁর মতে সবিসর্গ নিঃ = ex = out এবং নির্বিসর্গ নি = in (দ্বি. ৫৬)।

রবীন্দ্রনাথ এ-মত সমর্থন করেছেন এবং শব্দকল্পদ্রুম, শব্দস্তোমনিধি প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধানের সাক্ষ্য নিয়ে মন্তব্য করেছেন যে সেখানে অভাবার্থক 'নিঃ' উপসর্গকে নির্গত শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন—নিরর্গল, নিরর্থক। সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি—নির্গতমর্গলং যস্মাৎ, নির্গতোঽর্থো যস্মাৎ (র. ৮৬)। এছাড়াও তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের সমর্থনে ইউরোপীয় ভাষাগুলির উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন—''সংস্কৃতে যেমন নি ভিতর এবং নিঃ বাহির বুঝায়, জার্মান ভাষায় সেইরূপ ein ভিতর এবং hin বাহির বুঝায়। Einfahren অর্থ ভিতরে আনা, hinfahren শব্দের অর্থ বাহিরে লইয়া যাওয়া। লাটিন in উপসর্গে নি এবং নিঃ, ein এবং hin একত্রে সংগত হইয়াছে। innate অর্থ অন্তরে জাত, infinite অর্থ যাহা সীমার অতীত'' (র. ৮৬)। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত : ''...প্র উপসর্গের মূল অর্থ বাহিরে, অগ্রভাগে; নি উপসর্গের অর্থ ভিতরে এবং নিঃ উপসর্গের অর্থ ভিতর হইতে বাহিরে'' (র. ৮৬)।

পঞ্চমত, রবীন্দ্রনাথ আরও মনে করেন, শাস্ত্রীমহাশয় ''প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি'' এই বিপরীত শব্দজোড়ের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে 'বিস্তর সূক্ষ্ম তর্ক' করেছেন, ''জেদ করিয়া কষ্টকল্পনার পথে গিয়াছেন''। অথচ

''একথা অত্যন্ত সহজ যে প্রবৃত্তি নিবর্তনের দিক অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা বাহিরের দিকে ধাবিত হয়; নিবৃত্তি নিবর্তনের দিক অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা ভিতরের দিকে ফিরিয়া আসে" (র. ৮৬)। দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি সরল সমীকরণের সাহায্যে এই দুটি শব্দের অর্থ সূত্রায়িত করেছেন : ''প্র = pro = forth; নি = in, যথা, প্রবৃত্তি = pro-pensity; নিবৃত্তি = ভিতরের দিকে টানিয়া লওয়া" (দ্বি. ২)। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় ''এই সহজ **উপপত্তি** পরিত্যাগপূর্বক বিশেষ জেদ করিয়া কষ্টকল্পনার পথে গিয়াছেন। তিনি বলেন, ''প্রবৃত্তি কি, না প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ ভালো করিয়া থাকা, এবং ক্রিয়ার অবস্থা (কুর্বদবস্থা) (state of action) কোনো বস্তুর স্থিতির বা সত্তার প্রকৃষ্ট অবস্থা বলিয়া প্রকৃষ্ট বৃত্তি শব্দে ক্রিয়ারম্ভ বুঝাইতে পারে (র. ৮৬-৮৭)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আপত্তি : ''ক্রিয়ার অবস্থাই যে ভালোরূপ থাকার অবস্থা একথা স্বীকার করা কঠিন"। অনুরূপ, নিবৃত্তি শব্দের যে ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রী মহাশয় করেছেন, তাও তাঁর কাছে সংগত বলে মনে হয় নি। শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন, ''নিতরাং বর্ততে ইতি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিতরাং সম্পূর্ণভাবে বেষ্টাদি শূন্য হইয়া স্থিতি বা থাকা অর্থাৎ চেষ্টাবিরাম" (র. ৮৬-৮৭)। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে প্রাচীন শব্দাচার্যগণের সাক্ষ্য দিয়ে (যেমন, মেদিনীকোষে নি অর্থে 'মোক্ষঃ, অন্তর্ভাবং, বন্ধনম্') শাস্ত্রী মহাশয়ের মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

আলোচ্য অংশের প্রথম পর্বের শেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> ''যাহা হউক, সংস্কৃতভাষার উপসর্গের সহিত য়ুরোপীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলির যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে এবং উভয়ের উৎপত্তিস্থল যে একই, সমালোচক মহাশয় বোধ করি তাহা অস্বীকার করেন না। সংস্কৃত উপসর্গগুলির প্রচলিত নানা অর্থের মধ্যে যে-অর্থ ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় উভয় ভাষাতেই বিদ্যমান, তাহাকেই মূল অর্থ বলিয়া অনুমান করা অন্যায় নহে" (৮৭)।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে (র. ৮৮-৯১) রবীন্দ্রনাথ বাঙলায় প্রচলিত সংস্কৃত উপসর্গগুলির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।[১২] তুলনীয় শব্দগুলি ইউরোপীয় বর্গের ভাষা। অর্থাৎ সংস্কৃত উপসর্গগুলির সমগোত্রজ প্রতিশব্দ (cognates)। পূর্বাংশের আলোচনাটি ছিলো ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বকেন্দ্রিক। সেখানে প্রাধান্য ছিলো প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতবাদ। কথাপ্রসঙ্গে ইংরেজি বা অন্যভাষার প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছিলো দ্বিজেন্দ্রনাথের সূত্র ধ'রে। **প্রবন্ধের উত্তরাংশে** তিনি পুরোপুরি পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করেছেন, শব্দ ও অর্থের সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট হয়েছেন—যদিও এই দায়িত্ব গ্রহণে তিনি বিনয় প্রকাশ ক'রে বলেছেন—''...আর্য ভাষার নানা শাখার আলোচনা করিয়া উপসর্গের মূলে উপনীত হইতে যে-পাণ্ডিত্য অবকাশ এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদির সহায়তা আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই।" তবুও ''স্বল্পপ্রমাণ ও বহুল অনুমান আশ্রয়" ক'রে তিনি বাঙলাভাষা-চর্চার নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটন করেছেন, ঊনিশ শতকের শেষে রচিত তাঁর এই 'শব্দতত্ত্ব' (১৩০৬) গ্রন্থে। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থখানি রচনার পূর্বেই তিনি যে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানে যথেষ্ট নিষ্ণাত ছিলেন, তা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন—''...প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ Bopp, Beames, Hoernle, Maxmüller, Sayce, Whitney, Baily, Brugmann, Grierson ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সুপরিচিত গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথ কী নিষ্ঠা ও মনোনিবেশের সহিত পাঠ করেন, তাহার প্রমাণ ঐ সকল গ্রন্থপৃষ্ঠায় বহন করিতেছে।"[১৩] এ ব্যাপারে 'উপসর্গের অর্থবিচার' এই দীর্ঘ প্রবন্ধটির লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ যে তাঁর দীক্ষাগুরু, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যাই হোক, আলোচ্য প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ যে-উপসর্গগুলির মূল শব্দার্থ ও প্রয়োগ উদ্ধার করেছেন, স্থানাভাবে তার কয়েকটি মাত্র নিচে আলোচিত হবে। তবে মনে রাখা দরকার, দ্বিজেন্দ্রনাথ সু, দুঃ, অনু, উৎ, অতি, অপি—এই ছয়টি উপসর্গের বিস্তৃত আলোচনায় যান নি, উল্লেখ করেছেন মাত্র (দ্বি. ৬১-৬২)। রবীন্দ্রনাথ আবার কয়েকটি নতুন উপসর্গ যোগ করেছেন, যেমন—অন্ত, অন্তর্, পুরঃ, পুরা প্রভৃতি। আমরা এখানে কেবল উভয় প্রবন্ধে-ব্যবহৃত কয়েকটি সাধারণ (common) উপসর্গের তুলনা করবো।

এখানে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের মত বোঝাবার জন্য যথাক্রমে বন্ধনীভুক্ত (র.) এবং (দ্বি.) নির্দিষ্ট হবে। এছাড়া উভয়ের গ্রহণযোগ্য শব্দার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের অভিনবত্ব বোঝা যাবে। উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে বর্তমান লেখকের নিজস্ব অথবা সাম্প্রতিক পণ্ডিতদের কোনো মত আরোপিত হয়নি।

৫. দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ-সংকলিত কয়েকটি উপসর্গের তুলনা

১. প্র—(দ্বি.) —অর্থ ঃ সম্মুখপ্রবণতা, বহির্ব্যঞ্জক; যথা—প্রশ্বাস, প্রবাস, প্রবাহ, প্রসরণ; তু. ইং pro = forth; প্রবৃত্তি = pro-pensity ‘সম্মুখের দিকে ঝোঁক’; প্রবচন = pro-verb।

—(র.) —অর্থ ঃ সম্মুখগামিতা, লক্ষ্য সম্মুখের দিকে, বাহিরের দিকে; তু. গ্রীক pro- : prologue (প্রাথম্য অর্থে), proboskis ‘শুণ্ড’ (সম্মুখগমতা অর্থে) = *প্রভক্ষক ‘যাহা সম্মুখ হইতে খায়’, তু. জার্মান vorfuhren ‘to produce’; ইং pro, pre, per (যথাক্রমে অর্থ ঃ সম্মুখগামিতা, পূর্বগামিতা, পারগামিতা অর্থাৎ দূরগামিতা)।

২. নি—(দ্বি.) —অর্থ ঃ অন্তর্নিষ্ঠতা, লক্ষ্য ভিতরের দিকে; যথা—নিগমন ‘incoming’।

—(র.) —অর্থ ঃ উপসর্গের অর্থ ভিতরের দিকে; তু. ইং ni = in, যথা—ইং in(jection), ingress, induction, install; জার্মান einfahren (ভিতরে আনা), ein(fuhren) ‘to introduce’; অ্যাংলো-স্যাক্সন, ডাচ, জার্মান, গথ, ওয়েল্শ, আইরিশ, লাটিন in : গ্রীক en, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান i (n-বর্জিত)।

৩. নিঃ—(দ্বি.) —অর্থ ঃ বাহিরের দিকে, বহির্গামিতা, অগ্রভাগে ঃ তু. নিঃ = ex = out, যেমন—নির্বাসন, নিরীক্ষণ, নির্ধারণ, নিস্তেজ, নির্গমন।

—(র.) —অর্থ ঃ বাহির, বহির্গামিতা, ভাব হইতে বহিশ্চুতি; তু. জার্মান hin। যথা—জার্মান hinfahren ‘বাহিরে লইয়া যাওয়া’ (তু. einfahren ‘ভিতরে আনা’); লাটিন in (< নি + নিঃ, ein + hin একত্রে সংগত)। তু. ইং innate ‘অন্তরে জাত’, infinite ‘যাহা সীমার অতীত’।[১৪]

৪. পরি—(দ্বি.) —লক্ষ্যার্থ চতুর্দিকে ঃ তু. পরিধি ‘circumference’ পর্যায় (ক্রমে), ‘periodically’।

—(র.) মূল অর্থ ঃ নিকট ও চতুর্দিক; তু. গ্রীক peri (উপসর্গ), perigee, peri-helion (নৈকট্য-অর্থে); ইং periphery, periphrasis (পরিবেষ্টন অর্থে)।

৫. পরা—(দ্বি.) —অর্থ ঃ দূরতাপ্রতিপাদক, সোজাসুজি দূরত্ব; যথা—পরাঙ্মুখ, পরাজয়, পরাভব, পরাহত,পরাক্রম; তু. ইং parallel।

—(র.) —তু. গ্রীক paragoge, paralogism (দূরার্থে); ইং parallel, paraphrase (পাশাপাশি অর্থ)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধাকারে লিখিত রচনার উপসংহারে বলেছেন—বলেছেন বিনীতভাবে—''বর্তমান প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত কোনো একটি স্থানেও আমি গায়ের জোরে কোনো একটি মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করি নাই। অপক্ষপাতী এবং অকপট যুক্তি ও বিচার আমাকে যে পথে চালাইয়াছে, আমি সেই পথে চলিয়াছি। চাই আমি আর কিছুই না—বর্তমান প্রবন্ধে যে স্থানের যে যুক্তির যে-টুকু প্রামাণিকতা বা বলবত্তা সম্ভবে, সেই স্থানের সেই যুক্তির নিদেন ততটুকু প্রামাণিকতা নির্বিবাদে শিরোধার্য করা হো'ক—তা বই আমি অভ্রান্ত সত্যের কোনো দাবি রাখি না।"

অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ উপসংহারে প্রবন্ধের প্রথমাংশের মতই উদার সিদ্ধান্তে এসেছেন—''যাহা হউক অভিধানে উপসর্গগুলির যে-সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা না হইলেও তাহারা যে মূল অর্থ নহে এবং বিচিত্র আর্যভাষার তুলনা করিয়া যে মূল অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করা যাইতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে বহুল পরিমাণে তুলনামূলক আলোচনা উত্থাপন করিয়াছি।" পরিশেষে তিনি প্রবন্ধ-সমালোচক মহাশয়ের যুক্তির অসারত্ব সম্বন্ধে শেষ উক্তি করেছেন এইভাবে—''ফলত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অবহেলা সহকারে 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সর্বপ্রকারে অনুপযুক্ত হইয়াছে।"

পাদটীকা

১. "The new science of comparative philology aimed at no more than *comparing* one language with another, *illuminating* one language through another, *explaining* the forms of the one by the forms of the other, rather in the manner that botanists have compared species of flora, noting and classifying according to similarity or divergence." : R. Lord : Comparative Linguistics (1966), London, p. 8। স্মরণীয়, ভাষাতত্ত্ববিদ্যার জন্ম (Comparative Philology) ফ্রানৎস বোপ্-এর (Franz Bopp) 'On the system of conjugation in Sanskrit...' প্রকাশিত (১৮১৬) হওয়ার সময় থেকেই।

২. "**comparative historical linguistics / comparative philology** (is) a branch of linguistics which studies language change and language relationships. By comparing earlier and later forms of a languge and by comparing different languages, it has been possible to show that certain languages are related, e.g the Indo-European Languages. It has also been possible to reconstruct forms which are believed to have occurred in a particular language before written records were available. For example *p in an ancestor language to all the Indo-European languages is said to be related to /p/ in Sanskrit as in *pita* 'father' and /f/ in English as in *father.*" : J. Richards, J. Platts, H. Weber : Longman Dictionary of Applied Linguistics (1985), Longman, p. 51

৩. "**historical linguistics :** A branch of LINGUISTICS which studies the development of Language and languages over time; also known as DIACHRONIC linguistics. The data of study are identical to that of COMPARATIVE PHILOLOGY, viz. the extant records of older states of languages: but the methods and aims

are not the same. Historical linguistics uses the methods of the various schools of SYNCHRONIC linguistics (including SOCIOLINGUISTICS and PSYCHO-LINGUISTICS), especially in considering the reasons for language change." : David Crystal : A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1985), Basil Blackwell, p. 148

৪. ক/খ "**diachronic linguistics :** an approach to linguistics which studies how a language changes over a period of time, for example the change in the sound system of English from Early English to Modern British English. Diachronic linguistics has been contrasted with **synchronic linguistics** which is the study of a language system at one particular point in time, for example the sound system of Modern British English."

৫. বৈয়াকরণ বোপদেব (খ্রি. ১৩শ শতক) 'মুগ্ধবোধ' গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর পরিভাষা বহুস্থানেই পাণিনির পরিভাষা থেকে পৃথক। এই ব্যাকরণের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ টীকাকার রাম তর্কবাগীশ, বর্তমান উক্তিটি দুর্গাদাসের।

৬. The term **sememics** is used as part of the description of strata in STRATIFICATIONAL GRAMMAR; the 'sememic stratum', which handles the SYSTEMS of semantic relationship between LEXICAL ITEMS... : D. Crystal : A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1985), Basil Blackwell, Oxford. p. 275

৭. ''স্বীকার্য বিষয়কে ... সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য বর্জনীয় বিষয়কে আশেপাশে নিক্ষেপ করিবার আকাঙ্ক্ষা; এই সূত্রেই পার্শ্বপ্রবণতার সহিত বর্জনীয়তা কার্য-গতিকে জড়িত হইয়া পড়ে।'' (দ্বি. ১৫)।

৮. প্রবন্ধে এই একটিমাত্র উদাহরণ, হয়তো এটি প্রাচীনতম প্রয়োগের অন্যতম। সংস্কৃতে 'প্রতি' শব্দের অর্থ অভিলক্ষ্য, অভিমুখ (towards); যেমন, প্রতিধ্বনি, প্রতিমুখ। প্রকৃতপক্ষে প্রঃ প্রতি—বৈপরীত্য বিরল বললেই চলে।

৯. পরেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (২য় খণ্ড), ২০০৪ (১৯৮০), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৮৯-৯০ (১২.১ ঘ)।

১০. ইংলণ্ড অধিবাসী ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ্।

১১. ফ্রান্সের অধিবাসী দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ।

১২. পরেশচন্দ্র মজুমদার ঃ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ [২০০৮ (১৯৭১)], পৃ. ১৫১-১৫২ এবং বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (২য় খণ্ড), ২০০৪ (২য় সং) ff. ১২.৩, পৃ. ৩০১-৩০২

১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৪৬

১৪. শব্দ দু'টি লাটিন থেকে গৃহীত; ইং innate < লা. innatus; infinite < লা. infinitus.

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম

অপূর্বকুমার রায়

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো। (পরিশেষ/ধর্মমোহ)

সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত কবি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন রেলপথে (৩০ বৈশাখ, ১৩৩৩); আর, এই কবিতা রচনার অল্প কয়েকদিন আগে শান্তিনিকেতনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন,

> এ কি হল ধর্মের চেহারা? এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ দেখা যায়।[১]

মানবতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম মোহ নয়, মোহ থেকে মুক্তি—যে মুক্তি মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-নিরপেক্ষ অবারিত মানব অঙ্গনে আহ্বান করে, যেখানে সমস্ত বৈষম্য ও বিরোধের অবসান, যেখানে সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে রচিত হয় মিলনের সেতু, যেখানে মন্দির নেই, নেই স্বর্গধাম, যেখানে নাস্তিকও পায় বিধাতার আশীর্বাদ, কেন না, ধার্মিকতার আড়ম্বর না করে বুদ্ধির আলোকে সে মানবকল্যাণের পথকেই বেছে নেয়। ‘ধর্মের অধিকার’[২] শীর্ষক আলোচনায় তিনি বলেছেন যে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক করতে থাকে, একশ্রেণীর অভিমানকে আর-এক শ্রেণীর মাথার উপর চাপিয়ে দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সঙ্কুচিত ও শতখণ্ড করে, তবে সে জাতিকে হীনতার অপমান থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোনো সভা-সমিতি কন্‌গ্রেস কনফারেন্স এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল বিশ্বজগতে নেই। তিনি বলেছেন, ‘‘এই বিকারেই গ্রীস ও রোমের পতন হয়েছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণও রয়েছে তথাকথিত ধর্মাচরণের মধ্যে।’’ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন,

> মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। হয় না যে তার কারণ, ধর্মসম্বন্ধীয় সব-কিছুকেই আমরা নিত্য বলে ধরে নিয়েছি। ভুলে যাই যে, ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে বলেই বৈজ্ঞানিক মত মাত্রই নিত্য,

এমন গোঁড়ামির কথা যদি বলি তা হলে আজও বলতে হবে, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ধর্ম সম্বন্ধে এই ভুলই ঘটে; সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত।

(মানুষের ধর্ম/দুই)

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কোনও ধর্মমতের প্রশ্নহীন, অনুমোদনের পথ অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত বিশিষ্ট প্রত্যয়ে উপনীত হননি; তাঁর আপন গোষ্ঠীর মানুষের কাছে পরম সত্য বলে প্রতিভাত কোনও ধর্মমতকেও তিনি নির্বিচারে অনুসরণ করেননি। উনিশ শতকে যে-পরিবার উপনিষদে উচ্চারিত ঋষিবাক্য অনুসরণে ধর্মসংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল সে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ব্রাহ্মধর্মের আকর্ষণে চিরকাল আবদ্ধ থাকেননি।[৩] জীবনের প্রথম পর্বে বিশেষ উদ্যম নিয়ে তিনি এই নতুন ধর্মের আদর্শ প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন, এক সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অনুভব করলেন যে, ধর্ম নয়, অনুষ্ঠানগত আনুগত্যই তাঁর ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ক্রমশ সত্য হয়ে উঠেছে। এইবার ব্রাহ্মসমাজ থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রথাসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে মুক্তজ্ঞানের আলোকে ধর্মের মর্মানুসন্ধানে সক্রিয় হলেন।

এই সময় বাউল সম্প্রদায়ের এক ভিক্ষার্থীর কণ্ঠে পরিবেষিত একটি গানে অন্তরের অকৃত্রিম প্রকাশ লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হলেন। মন্দিরে বা শাস্ত্রে, প্রতিমায় বা প্রতীকে দেবতার অন্বেষণ যে নিরর্থক, দেবতা যে মানুষের মধ্যেই বিরাজমান, সেই বিশ্বাসই এই বাউল সংগীতে ব্যক্ত। অন্তরে অধিষ্ঠিত সেই মানব-দেবতার উদ্দেশে বাউল সাধকের বক্তব্য :

> মন্দির এবং মসজিদ তোমার পথকে করে অবরুদ্ধ,
> আমি তোমার আহ্বান শুনতে ব্যর্থ হই, ব্যর্থ হই সঞ্চরণে,
> যখন ধর্মশিক্ষক আর পুরোহিতের দল সক্রোধে আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়।[৪]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন, বাংলার এই বাউল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে নেই কোনও মন্দির, নেই কোনও মূর্তি, নেই কোনও শাস্ত্র বা অনুষ্ঠান। তাদের কাছে মানুষই দেবতা, মানুষে মানুষে প্রেমই তাদের ধর্মের মূলকথা, আর এই মানবপ্রেমই সকল ধর্মের সারকথা। বাউল সাধকের বিশ্বাস,

> প্রেমই সেই পরশপাথর যার স্পর্শে লোভ পরিবর্তিত হয় প্রেমে, আর এই প্রেমেরই প্রয়োজনে মর্ত্যের জন্য স্বর্গের বাসনা, মানুষের জন্য দেবতার।[৫]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যয়ই প্রকাশ করেছেন, তাঁর কোনও কোনও কবিতায় :

> তাই তোমার আনন্দ আমার পর
> তুমি তাই এসেছ নীচে।
> আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
> তোমার প্রেম হত যে মিছে।
> ....
> তাই তো, প্রভু, হেথায় এলে নেমে,
> তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
> মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
> সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে। (গীতাঞ্জলি/১২১)

প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি, 'খৃষ্টোৎসব'[৬] শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গীতিকবিতাটির প্রথম দুটি ছত্র উদ্ধৃত করে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বলেছিলেন যে আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে ... তিনি সত্যই আমাদের পরমসখা হয়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন।'' এই যুগল-সম্মিলনের পূর্ণ প্রকাশ স্মরণ করে কবি বলেছেন,

তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলি যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর। (গীতাঞ্জলি/১২০)

বাউল গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছিলেন ধর্মের সত্যস্বরূপ। তিনি 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন,[৭]

মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষ পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। ... সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, বাউল সাধকের এই ধারণার সঙ্গে বেদের বক্তব্যের মিল রয়েছে। এই 'অন্বেষণেরই' প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি—পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।[৮] এই অন্বেষণ যখন অন্তরে নয় বাইরে তখন 'পরম মানবের' দেখা মেলে না। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে বাউলের দলের গানে এ সত্যই প্রকাশিত :

কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না।
ও তোরা আয়রে ধেয়ে, দেখ্ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে।। (রাজা/২/পথ)

আমাদের 'মনের মানুষ' রয়েছে আমাদেরই অন্তরে, কিন্তু বাইরের আকর্ষণে আমরা সে কথা ভুলে যাই। আমাদের আঘাতে, আশায় এবং ভালবাসায় যে রয়েছে আমাদেরই কাছে, সেই 'মনের মানুষে'র দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি না। রবীন্দ্রনাথের একটি লিরিকে এই সত্য উপলব্ধির সহজ প্রকাশ অনবদ্য হয়ে উঠেছে :

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয়পানেই চাই নি।
আমার সকল ভালোবাসায়
সকল আঘাত, সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে
তোমার কাছে যাই নি। (গীতিমাল্য/৯২)

আর, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীও রচিত হয়েছে সেই পরম প্রেমিকের উদ্দেশে যার মোহনবাঁশী বিচিত্র সুরে মর্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে প্রেমের বারতা, যে বারতা মানুষকে স্বার্থমগ্ন বিচ্ছিন্নতা থেকে প্রেম ও সত্যের পথে পরিচালিত করে। মধ্যযুগের অনেক সন্ত কবিই যে মানুষের মধ্যেই দেবতার সন্ধান করেছেন সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি রজ্জব ও রবিদাসের কথা বলেছেন। রজ্জব তাঁর কবিতায় মানুষকে নরনারায়ণ বলে অভিহিত করেছন। তিনি মনে করেছেন, মানুষের এই অভিধা অসত্য নয়। রজ্জবের একটি কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ এখানে উপস্থিত করছি;

> God-man (nara-narayan) is thy definition, it is not a delusion but truth. In the infinite seeks the finite, the perfect knowledge seeks love and when the form and the formless (the individual and the universal) are united love is fulfilled in devotion.[৯]

> রবিদাসের কবিতাও প্রায় একই সুরে বাঁধা। তিনি নরহরির উদ্দেশে বলেছেন, তুমি আমাকে দেখতে পাও, আমিও তোমাকে দেখি এবং আমাদের প্রেম হয়ে ওঠে পারস্পরিক।[১০]

দেবালয় যে দেবতার আবাস নয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে দেবতাকে পাওয়া যায় না বাউল সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, সে-বিষয়ে একটু আগেই আমরা লক্ষ করেছি। তাঁর বহু কবিতাতেই উল্লেখিত সম্প্রদায়ের সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন প্রেক্ষণীয়। মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীর উদ্দেশে কবি বলেছেন,

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে। (গীতাঞ্জলি/১১৯)

যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আপন হৃদয়ে সে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য মন্দিরে যাওয়া অর্থহীন, যেখানে তথাকথিত 'স্তবের বাণীর আড়াল' দিয়ে আমরা দেবতাকে ঢেকে রাখি, তাঁর পূজার ছলে তাঁকেই ভুলে থাকি। সুতরাং কবি বলেন ঃ

কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়, (গীতিমাল্য/৮১)

যে 'জীর্ণ দেবতালয়' পুণ্যলোভীর ভিড় থেকে মুক্ত, যেখানে 'ঘন জনতার গর্জনে' 'পার্বণ-ক্ষণ' মুখরিত হয় না, যেখানে প্রতিমা চূর্ণ হয়েছে, বেদীতে বিরাজ করছে শূন্যতা, সেখানে মন্দিরের বাইরে 'বনফুলের উল্লাস' আর 'পূজার মন্ত্রে বিহঙ্গদলের অকৃত্রিম কলকাকলী'র আবেদনে দেবতা ফিরে ফিরে আসেন, যখন,

নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
... ...
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে—
প্রসাদ-অমৃত মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়। (পূরবী/ভাঙা মন্দির)

মন্দিরের তথাকথিত পবিত্র আবেষ্টনে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অনুসন্ধান যে অর্থহীন, তাঁর আবাস যে মন্দিরের বাইরে, শাস্ত্রশাসন নিরপেক্ষ উদার বসুন্ধরার বুকে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। বনবাণী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত মধুমঞ্জরি শীর্ষক কবিতাটির ভূমিকায় কবি বলেছিলেন, 'এ লতার কোনো একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে—জানিনে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরে যে দেবতা মুক্তস্বরূপ আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি, তাই নতুন করে নাম দিতে হল।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সে পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে। ... আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে। (মানুষের ধর্ম/দুই)

তাই, ধর্মের সত্য রূপের যাঁরা সন্ধান করেছেন তাঁরা সকলেই যুগে যুগে, দেশে দেশে একই কথা বলেছেন। তাঁরা সকলেই ধর্মকে শাস্ত্র এবং আচারসর্বস্বতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সর্বমানবের কল্যাণময় পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, পৌরাণিক যুগের কৃষ্ণ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম পুরোহিত-শাসিত শাস্ত্রসিদ্ধ বিধানের অমোঘতা মেনে নেয়নি; তিনি ধর্মের আবেদন আর্য-অনার্য নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য

প্রসারিত করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, রাখাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পুরাকাহিনী এ কথাই প্রমাণ করে। আর, যে ধর্মের মধ্যমণি হিসাবে কৃষ্ণ বিরাজ করেছেন সে ধর্ম—মূলত ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থল। পরবর্তীকালে, ঐতিহাসিক যুগে, গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন ধর্মীয় চেতনাকে সকল মানুষের কল্যাণমুখী করে তুলতে। যিশুখ্রিষ্টও একই পথে তাঁর প্রচারিত ধর্ম পরিচালিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> ...মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন বলি নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন। (খৃষ্ট/যিশুচরিত)

মধ্যযুগে যাঁরা ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধর্মের যথার্থ বাণী মানুষের কাছ পৌঁছে দিলেন তাঁদের আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করে প্রাচীর গেঁথে দুয়ার তুলে বিধাতাকে যাঁরা অচলায়তনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল এই সমস্ত মানুষের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে তাঁর মন্ত্রবর্জিত মানুষের কাছ থেকেই ধর্মের যথার্থ পাঠ গ্রহণ করলেন, তাঁরা বুঝলেন,

ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
... ...
যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে, দুয়ার তুলে,
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে। (পত্রপুট/২০)

ব্রাহ্মণ রামানন্দ একদিন গণ্ডি ভেঙে ওদেরই উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন পথে। তিনি নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে আলিঙ্গন করে সত্যকার শুচিতা লাভ করলেন। সেদিন তাঁর আপন ধর্ম-সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলেও তিনি একলাই সেদিন 'সকলের চেয়ে বড় জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের'।[১১] প্রকৃত ধর্মবোধের যখন উদ্‌বোধন হল, তখন রামানন্দ বললেন,

'আমার ঠাকুরকে একদিন যেখানে হারিয়েছিলুম,
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'
সূর্য উঠল আকাশে
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।
(পুনশ্চ/শুচি)

এই রামানন্দই অন্ত্যজ, অভাজন ভাজনকে আলিঙ্গন করে বললেন,

স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে

বইল সেই বিশ্বপাবনধারা।
ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল।
বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি,
তবু আজ দেখা হল না কেন।
এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন
তোমার ললাটে আর আমার ললাটে—
মন্দিরে আর হবে না যেতে।
(পুনশ্চ/স্নানসমাপন)

যে 'রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো', পথিকেরা যার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, সেই রবিদাসকেও আলিঙ্গন করলেন রামানন্দ। এই রবিদাসের কাছেই চিতোরের রানী (যাঁর নাম ঝালি) দীক্ষা নিয়েছিলেন হরিপ্রেমের। স্মৃতিশিরোমণি রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে এই দীক্ষাগ্রহণের জন্য তিরস্কৃত হয়ে রানী বলেছিলেন,

ঠাকুর, শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পারনি তা।
আমার ধুলোমাখা গুরু
ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। (পুনশ্চ/প্রেমের সোনা)

রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন,

পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
... ...
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি। (গীতালি/৯৯)

অথবা,

রৌদ্রে জলে আছেন সবার মাঝে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার 'পরে।
... ...
রাখো রে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে। (গীতাঞ্জলি/১১৯)

বিধাতা যখন তাঁর শুচিবসন ত্যাগ করে সকল কর্মে সর্বমানবের মধ্যে বিরাজমান, তখন মানুষের ধর্মও সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার আবেদন বিশ্বজনীন। ধর্মের আবেদন যখন বিশ্বজনীন না হয়ে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে তখন,

> সাম্প্রদায়িক দেবতা বিদ্বেষবুদ্ধির অহংকারের, অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়, শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্ব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে—স্বয়ং দেবত্ব অপমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরস্পর ব্যবহারে আতঙ্কিত করে তোলে।
>
> (মানুষের ধর্ম/দুই)

সাম্প্রদায়িক রূপে দেবতার প্রকাশ মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে এক ধর্ম তখন অপর ধর্মকে আঘাত করতে অগ্রসর হয় এবং সব ধর্মের সার সত্য বিশ্বামানবতা হয় ধূলিলুণ্ঠিত। সম্প্রদায় তখন এই বলে অহংকার করে, সত্য তার ধর্মকেই একমাত্র আশ্রয় করেছে। এর ফলে ধর্মচেতনায় গোঁড়ামি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে 'যে গোঁড়ামি সত্যেরে চায়/মুঠায় রক্ষিতে—/যত জোর করে, সত্য/মরে অলক্ষিতে।'[১২] রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম'[১৩] শীর্ষক গ্রন্থটির এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে, ''বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করতে চেষ্টা করে না, যেমন করে ধর্ম-ব্যবসায়ী ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষার্থে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রাম করে থাকে। এই গণ্ডি রক্ষাকেই তারা ধর্মরক্ষা বলে বিবেচনা করে। আর, সাম্প্রদায়িক ধর্মরক্ষকেরা ধর্মের বৃন্তটিকে এতই ক্ষীণ করে রাখে যে প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে শত্রুপক্ষ মনে করে।'' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> এইজন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানের হাত থেকে খৃষ্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্য বিশেষভাবে সাধনা করতে হয়। (খৃষ্ট/খৃষ্টধর্ম)

মধ্যযুগের নানা ভাঙাগড়ার মধ্যেও এই সাধনা ভারতবর্ষে অনির্বাণ রেখেছিলেন কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম, রবিদাস আর রজ্জব। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই সমস্ত মানুষ সে যুগে 'আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্মবিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন' করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ঐক্যের সাময়িক প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না, 'তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রচেষ্টা ধ্রুব'।[১৪]

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ রজ্জবের রচনা থেকে দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন,

> সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
> জন রজ্জব সাঁচী কহী রিঝি ভাবই রূঠ।।

পঙ্ক্তি দুটির বাংলা অনুবাদও করেছেন রবীন্দ্রনাথ : ''সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছেন এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।'' রজ্জবের এই বক্তব্যের ওপর আলোকপাতে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেন, ''রজ্জব বুঝেছেন এ কথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না তবু তারা তাকে সত্যের নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে—মিল নেই বলেই এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি। রাগারাগির দ্বারা সত্যের প্রতিবাদ, অগ্নিশিখাকে ছুরি দিয়ে বেঁধবার চেষ্টার মতো। সেই ছুরি সত্যকে মারতে পারে না, মারে মানুষকে।''[১৫]

রবীন্দ্রনাথ বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছেন ধর্মের সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক উৎসাহে স্বদেশের মানুষ বার বার এই শাণিত ছুরিকার শিকার হয়েছে। 'মানুষ বলেই যে মানুষের মূল্য সেইটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি'।[১৬] মানবপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধির অভাবে আমাদের দেশে ধর্মের সাম্প্রাদায়িক মোহ রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির উৎসাহে উত্তপ্ত হয়ে অনেক সময় জাতীয় ঐক্য বিপন্ন করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের ঐক্যের সমস্যা যেখানে ধর্ম সেখানে এই সমস্যার শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমাধান হবে সাময়িক এবং অর্থহীন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাধান যে শেষ অবধি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করে সে-বিষয় আমরা এই উপ-মহাদেশে প্রত্যক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধর্মবিষয়ে আমাদের দেশে এক ধরনের কঠিন বিরুদ্ধতা বিদ্যমান। এই বিরুদ্ধতার কারণ এই যে, ধর্ম আমাদের অন্তরের জিনিস না হয়ে শাস্ত্রমত আর বাহ্য আচারকেই মুখ্য করে তুলেছে। তথাকথিত ধর্মীয় প্রতিরোধ প্রসঙ্গে কবি মন্তব্য করেছেন,

> এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজের চারিদিকে অত্যন্ত মজবুত করে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই জন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিম প্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে। (কালান্তর/সমস্যা)

কবির বক্তব্য,

> ধর্মের সিংহদ্বার খোলা থাকলে তবেই ছোট বড়ো সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব—নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা স্বাজাত্য-অভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি, তবে ধর্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদপার্থক্য, এত বিরোধবিচ্ছেদ গলতে পারবে না। (শান্তিনিকেতন/১১)

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ধর্মের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ধর্মের সিংহদ্বার অবরুদ্ধ রেখেছে বলেই আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে এবং ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডির বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবি করেছে। আর, ''কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার থেকে বঞ্চিত।''[১৭]

অথচ, সব ধর্মের আদর্শই নিখিল মানবের পারস্পরিক মৈত্রী ও প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যিশুখ্রিস্ট পরমপিতার 'যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরম মানবের সঙ্গে আপন অভেদ দেখেছিলেন'; আর বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছিলেন, 'সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে—একেই বলে **ব্রহ্মবিহার**।'[১৮] রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, মানুষ 'যে দিকে পৃথক সেই দিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার চিরকালের আনন্দ; যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার স্বার্থ—যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার ত্যাগ।'[১৯] যেখানে মানুষের সঙ্গে

মানুষের মিলনসাধনার অবসান সেখানেই মানবিকতার চরম অবনয়ন। তখনই ব্যক্তি অথবা সমষ্টির স্বার্থে মানুষের সত্যকার ধর্ম পরিচালিত হয় ভ্রান্তপথে। রবীন্দ্রনাথ বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছেন, যুগে যুগে দেশে দেশে বিশিষ্ট ধর্মসাধকদের প্রচারিত প্রেম ও মৈত্রীর বাণী মানুষের অধার্মিক তথা অমানবিক আচরণ রোধ করতে পারেনি। আর, ধর্মের আড়াল দিয়েই মানুষ অধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই, ''মানুষ যখন বড়ো বড়ো দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে।''[২০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি, নবজাতক কাব্যগ্রন্থে সংকলিত বুদ্ধভক্তি শীর্ষক কবিতাটির উৎস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জাপানের কোন কাগজে পড়েছি, জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ মারছে বুদ্ধকে।' এই একই বিষয় নিয়ে লেখা অপর একটি কবিতায় বেদনাবিদ্ধ কবি যুদ্ধবাজদের হাতে ধর্মের বিকৃত ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন। বুদ্ধভক্তির বিকৃত প্রকাশ দেখে কবি লিখেছেন,

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়্‌মিড়্ করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভর্তি করতে
    বেরল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
    তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
....
ধূপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে
    'করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা'—
কেননা, ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
    অভ্রভেদ ক'রে,
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র,
    ধ্বজা তুলবে লুপ্ত পল্লীর ভগ্নস্তূপে,
    দেবে ধূলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
    দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
    তাই তো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের আশীর্বাদ নিতে।

(পত্রপুট/১৭)

আর, যে মানবপুত্র 'পরমপিতার প্রেমের বার্তা' এনে দিয়েছিলেন মানুষের দ্বারে, তাঁরই পবিত্র জন্মদিনে ধর্মযাজকেরা যখন গির্জায় গির্জায় তাঁর বাণী উচ্চারণ করে, তখন হয়তো 'গির্জার বাইরে ভ্রাতৃহত্যায় পৃথিবী রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।' তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতি মুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।'[২১] কবির মনে হয়েছে, মানবিক আদর্শের এই চরম অবক্ষয়ের মুহূর্তে মানবপুত্র যদি তাঁর নিত্যধাম থেকে মর্ত্যধামে নেমে আসেন তবে দেখবেন,

...দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন;
বুঝলেন শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়—
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।

(পুনশ্চ/মানবপুত্র)

এখানে উল্লেখ করতে পারি, বহুক্ষেত্রে মানবপুত্র কবিতাটির সঙ্গে আইরিশ কবি য়েট্‌স-এর The Second Coming কবিতাটির দৃষ্টিভঙ্গির অমিল সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের মতো য়েটসও খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন-মুহূর্তে মানুষের সার্বিক অবক্ষয়ের পটভূমে রক্তে-আবিল বন্যার বন্ধনহীন প্রকাশ লক্ষ করে বলেছিলেন, The blood dimmed tide is loosed, and everywhere/The ceremony of innocence is drowned। জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে স্বদেশের ও বিদেশের রক্তে আবিল রূপ দর্শনে বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখলেন,

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

(পরিশেষ/প্রশ্ন)

যারা পৃথিবীর বায়ু বিষাক্ত করে তুলেছে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেছেন কিনা, এর উত্তরের আশায় কবি বসে থাকলেন না, ঈশ্বরের দুয়ারে। স্বদেশের দিকে তাকিয়ে, তাঁর মনে হল, ধর্মের অচলায়তন ভেঙে ফেলার সময় হয়েছে। 'অচলায়তনে'র আচার্যের আবেদন কবি শুনতে পেলেন, আর্ত মানুষের কণ্ঠে : ''আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো।'' আর, দাদাঠাকুরের কণ্ঠেই তিনি বলেলন, ''আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে থাক না, আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন''।[২২] ধর্মমোহে উৎসাহিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার কঠিন সংকল্পে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকে কবি আহ্বান করলেন বড়ো রাস্তার মাঝখানে, সংগ্রামের পথে, ধর্মকারার প্রাচীরে সম্মিলিত আঘাত হানতে;

যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক জ্বালো। (পরিশেষ/ধর্মমোহ)

উল্লেখপঞ্জি

১। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও জড়তা শীর্ষক ভাষণটি শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত (৮ বৈশাখ, ১৩৩৩)। এই ভাষণটি ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক অনুলিখিত ও কবির দ্বারা সংশোধিত হয়ে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (আষাঢ়, ১৩৩৩)।
(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৬৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা)।

২। সঞ্চয়, ধর্মের অধিকার।

৩। Rabindranath Tagore, The Religion of an Artist, 1988 edition, P-15, Visva-Bharati, Calcutta.

৪। The Religion of man গ্রন্থে The Man of My Heart শীর্ষক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বাউল গানের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন :

Temples and mosques obstruct thy path.
And I fail to hear thy call or to move,
When the teachers and priest angrily crowd round me. রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই অনুবাদ অনুসরণে বর্তমান আলোচনায় বাউল সংগীতটির বক্তব্য বাংলায় পরিবেষণ করেছি।

৫। তদেব।

আর একটি বাউল গানের রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ :

love is the magic stone, that transmutes by to
touch greed into sacrifice
....
For the sake of this love heaven longs to become earth and gods to become man.

৬। রবীন্দ্রনাথ খৃষ্ট, খৃষ্টোৎসব।

৭। রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম, এক।

৮। তদেব।

৯। The Religion of Man, The Man of My Heart.

১০। তদেব।

রবীন্দ্রনাথ রবিদাসের একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন; Thou seest me, O Divine Man (narahari), and I see thee and our love becomes mutual.

১১। মানুষের ধর্ম/তিন।

১২। স্ফুলিঙ্গ/৮৪।

১৩। ধর্ম/ধর্মপ্রচার।

১৪। কালান্তর/বৃহত্তর ভারত।

১৫। মানুষের ধর্ম/তিন।

১৬। কালান্তর/হিন্দু-মুসলমান।

১৭। শান্তিনিকেতন/১৫/ছোটো ও বড়ো।

১৮। মানুষের ধর্ম/তিন।

১৯। শান্তিনিকেতন/১১/জাগরণ।

২০। তদেব/১৫/ছোটো ও বড়ো।

২১। খৃষ্ট/বড়োদিন।

২২। অচলায়তন/৬।

রবীন্দ্র-ঋতুচিত্র : বর্ষা-প্রসঙ্গ

রামেশ্বর শ

নিদাঘের দাবদাহে দগ্ধ-কণ্ঠ জীবকুলের আকুতি বিফল হয় না—বর্ষা বুঝি আসে। ...

ম্রিয়মাণ যারা, তারা থাকে নব জীবনের আশায়, বিশীর্ণ প্রকৃতি অপেক্ষা করে—ঐ বুঝি শোনা যায় তার পদধ্বনি—

'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।'

কিন্তু যার আগমনের জন্য এত আকুতি, এত আয়োজন, সে সহজে আসে না। আগে পাঠায় তার বার্তাবহ। প্রকৃতিকে সে সচেতন করে যায়, সুপ্ত, ম্রিয়মাণকে উত্থিত জাগ্রত করে যায়, তার উদ্দাম নট-লীলা বিশ্বকে আলোড়িত করে যায়। কালবৈশাখীর নৃত্যের তালে-তালে কবির মনও নেচে উঠে-গেয়ে ওঠে—

'হে উতলা, শোনো কথা শোন,
মেঘ যদি ডাকে গুরু গুরু
নৃত্যমাঝে নেচে উঠে ঊরু
কাহারে করিবে রোষ—
কার 'পরে দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু।।'

উদাস প্রকৃতি প্রত্যাশা করে তার শূন্য কাননে সেই নব-সৌন্দর্যের নব-প্রকাশ। নিষ্পত্র বৃক্ষপঞ্জরে শ্যাম-সম্ভারের আনন্দ-সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশের বাসনায় ব্যাকুল। থেকে-থেকে সচল সমীরণে শ্রাবণের কৃষ্ণাভ উত্তরীয় গগনের প্রান্ত দিয়ে উঠে যায়, তবু তার দেখা নেই! সময় কাটে।...

সে-ও না এসে পারে না। বিশ্বের সকল মেঘপুঞ্জ গলে ঝরে পড়ে অবিরাম ধারায়। মহোল্লাসে কবি বর্ষাকে বরণ করেন, কুলবধূদের আহ্বান জানান তাঁর মনোহারিকা, অভিসারিকারূপে—

'কোথা তোরা অয়ি তরুণী...
*   *   *   *
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—

এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়-সুখ-ভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবকুললোচনা
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী।'

কবির আহ্বান তারা শোনে, তারা সাড়া দেয়, উচ্ছ্বসিত আনন্দে বর্ষাকে বরণ করে, কবির সাথে অভিনন্দনী গায়—

'আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,
আকাশভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।'

বৃষ্টিতে তাদের মন ছুটে যায়—

'ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।'...

অন্তরে কলধ্বনি ওঠে। হৃদয়দ্বার ভেঙ্গে যায়, বন্ধন মানে না, বুঝি—

'হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।'

হৃদয়ের নৃত্য কবির চোখে ধরা পড়ে—

'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মত করিছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচেরে।'

সজল সমীরণে চলে-যাওয়া শৈশবের দিনগুলি মধুর স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসে, কবির মনে পড়ে আষাঢ়-সন্ধ্যায় বসে ছড়া আবৃত্তি করা—

'দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ্।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঢঙ্ ঢঙ্।'...

কলাপ-কলাপীর নৃত্যের তালে তালে সঙ্গীত ধরে দাদুরী, কুসুমের বাসে মন মেতে ওঠে—

'যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তালকুঞ্জ-তিমিরে।
...ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত দাদুরী বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।'

তখন 'শতশত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা' কবিকে বাইরে নিয়ে যায়। ঘরের গণ্ডির বাইরে এসে কবি আর এক নূতন রূপ দেখেন, দেখেন কার নবীন সাজ—

কেতকী-কেশরে কেশপাশ সুরভিত, ক্ষীণ কটিতটে করবী-শেফালির মালিকা-বেষ্টনী, নয়নে অঞ্জন আঁকা, স্মিত বিকশিত বদন, কদম্বরেণুর ফুল-শয্যা। এ কোন্ শুভ মুহূর্ত! এ যে সেই মহামিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ! ... তবে 'সে' কোথা? সে আসে না কেন?—বিলম্ব করে কেন? বুঝি আহ্বানের অপেক্ষা করে—চায় আগে মাধবের মুরলী-ধ্বনি। মাধবী-প্রকৃতিকে কবি আহ্বান জানান—

'জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলোনা,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম-রাগে ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে।
কোথা পুলকের তুলনা
নীপশাখে সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।'

এমন সময় সহসা—

'ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা
কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।'

—এগিয়ে আসছিল সে; কিন্তু তার ভয় হল, সে ফিরে গেল—দূরে চলে গেল।

কবির প্রাণ উন্মুখ।—সে কি আর আসবে না? সময় কেটে যায়, তার দেখা নেই। কবির মনে জাগে বিরহ 'রাত্রে হাওয়া দেয়; ধরণী-শয্যার 'পরে বসে বুক ব্যথিয়ে উঠে।' মনে হয়, 'তারি পাশে আছি তবু নির্ব্বাসন!'...

বর্ষাসুন্দরী আর বর্ষাকবি—দুই শাশ্বত প্রেমিক-জোড়। প্রেমে-বিরহে চলে তাদের এমনই লীলা।

কিন্তু এখন এসেছে দীর্ঘ বিরহ। এবার প্রেমিকের আত্মগোপন—প্রেমিকার হৃদয়-বেদনা। প্রেমিকা বর্ষা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার প্রিয় প্রেমিক কবিকে—কোথায় তিনি? তার উত্তর উৎসারিত বিরহ-বাণী দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে যায়—

'বর্ষাসুন্দরী নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে?'

—হে বর্ষাকবি, বিরহিণী বর্ষার এই বিচ্ছেদ-বেদনার অবসান হবে কবে? আবার কবে হবে সেই মিলন?

বাংলা ব্যাকরণ ও রবীন্দ্রনাথ

সুভদ্রকুমার সেন

এক

কোনো এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তাঁর কবিতা বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী হয়নি। নিজের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কতদূর সত্য বা মিথ্যা সে বিচার না করেও একথা বলা যায় যে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এত বিচিত্র পথে সঞ্চরণ করেছে যা প্রকৃত অর্থেই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুমুখিতার কথা মনে করলেই আমার বুদ্ধদেব বসুর একটি লাইন মন পড়ে যায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর An Acre of Green Grass বইয়ে লিখেছেন, 'Rabindra Nath Tagore is a phenomenon'। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচিত্রতা ও ব্যাপকতার পরিচয় বোধ হয় একমাত্র এই শব্দটি দিয়েই বোঝানো যায়।

কিঞ্চিদধিক দুশ বছর ধরে ভাষাতত্ত্ব (রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শব্দতত্ত্ব কথাটি ব্যবহার করেছেন) দেশে বিদেশে আলোচিত হচ্ছে। কলকাতাবাসী হিসেবে এটা আমাদের পরম শ্লাঘার বিষয় যে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল কলকাতায়। সতেরশ ছিয়াশি সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি স্যার উইলিয়ম জোন্স সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক সভায় যে সভাপতির অভিভাষণ দিয়েছিলেন সেই অভিভাষণের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রথমে জার্মানিতে ও পরে ইউরোপের অন্যত্র ও ইংল্যান্ডে এই শাস্ত্রের রীতিমত চর্চা শুরু হয়। বর্তমান শতাব্দীতে আমেরিকা এই বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টির ফলে ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রথম কেন্দ্র খোলা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাষাতত্ত্বের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে একথা ভেবে আমি আনন্দ পাই যে আমাদের এই শুকনো হাড়ের মতো তথাকথিত নীরস বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার করস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে ''ব্যাকরণ'' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কী পরিমাণ জাগ্রত কৌতূহল ছিল তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। পরিচয় যে সম্পূর্ণ হবে সে দাবী করি না। ভাষতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করতে হয়। তার অবকাশ এখানে নেই। তবে বক্তব্য উপস্থাপনের আগে দু-একটি সাধারণ কথা বলে নিতে চাই।

দুই

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের শেষ দিকে ব্যাকরণ শব্দটি যে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে লিখেছি তা আশাকরি মনস্ক পাঠকের নজর এড়ায়নি। ব্যাকরণ শব্দটির অভিধা নিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। সাধারণভাবে ব্যাকরণ বললে আমরা কি বুঝি? ব্যাকরণের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে অল্প

বয়সে, বিদ্যালয়ের নিচু ক্লাশে। আমরা শিখি যে ব্যাকরণ হল সেই শাস্ত্র যা আমাদের কোনো ভাষা শুদ্ধভাবে বলতে বা লিখতে শেখায়। ব্যাকরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা মতিলাল নন্দীর জবানীতে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন খাপছাড়া-র বিখ্যাত সেই তিন নম্বর ছড়াটিতে। আর সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে ব্যাকরণ মানেই নত্বষত্ব, সমাস সন্ধি, কারক বিভক্তি অথবা সাবজাংটিভ মুড বা অ্যানালিসিসের জটিল ঘূর্ণাবর্ত। ব্যাকরণ এক কথায় কতগুলি 'এই করবে' আর 'এই করবে না' জাতীয় নিয়মের সমাহার। এই ধারণা কিন্তু কোনো একটি দেশে বা কোনো একটি কালের মধ্যে সীমায়িত নয়। পশ্চিমী দুনিয়ার অনেক কিছুরই সূত্রপাত গ্রীসে। ইংরেজি 'গ্রামার' শব্দটি লাটিনের সূত্রে গ্রীক থেকে পাওয়া। মূল গ্রীক কথাটি হল 'গ্রাম্মাটিকোস' (grammatikos)। কথাটির অর্থ 'যে লিপি পাঠে সক্ষম'। ব্যাকরণ অর্থে গ্রীকরা যে শব্দযুগ্ম ব্যবহার করতেন তা হল 'টেখ্নে গ্রাম্মাটিকে' (tekhne grammatikē), যে শুদ্ধভাবে পড়তে এবং লিখতে পারে। অর্থাৎ ব্যাকরণের একমাত্র কাজ হল শুদ্ধভাবে পড়তে বলতে এবং লিখতে শেখান। এই ধারণা গ্রীস থেকে রোমে এবং তার পর সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই ধারণা কেবল মাত্র পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রচলিত ছিল মনে করলে ভুল হবে। পতঞ্জলি তাঁর মহাভষ্যের গোড়ায় ব্যাকরণ কেন পড়তে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি কারণ খুব চিত্তাকর্ষক। বোধ হয় ইন্টাররেস্টিং বললেই ভাল হত। দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরদের পরাজয়ের কারণ তাদের অশুদ্ধ উচ্চারণ। হে অরয়ঃ কে তারা 'হেলয়' উচ্চারণ করতে করতে সদানীরা নদীর অপর পাড়ে পালায়। ব্যাকরণ সম্বন্ধে এই শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আজো দৃঢ়মূল। তবে ধারণাটি ঠিক নয়। ধারাপাত গণিত শিক্ষার একটি সোপানমাত্র, গণিতের শেষ কথা নয়। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারে আবদ্ধ ব্যাকরণও তেমনি ব্যাকরণশাস্ত্রের চূড়ান্ত নয়। এই ধরনের ব্যাকরণ যা আমরা বিদ্যালয়ে পড়ি তা ব্যাকরণশাস্ত্রের খণ্ডিত বা আংশিক রূপ।

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিদ্যালয়ে পাঠ্য ব্যাকরণ যদি ব্যকরণশাস্ত্রের আংশিক পরিচয় হয় তো ব্যাকরণশাস্ত্রের বাকি অংশের পরিচয়টা কি? বিদ্যালয় পাঠ্য নিয়মতান্ত্রিক ব্যাকরণের কথা বাদ দিলে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ভাষার সামগ্রিক রূপটি সন্ধান করা। এই সামগ্রিক রূপটির পরিচয় আবার বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। কোনো একটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রচলিত যে রূপটি তার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ব্যাকরণের চূড়ান্তরূপ পাই পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে। আবার যে কোনো ভাষার দীর্ঘ ইতিহাসকে অনুসরণ করে সেই ভাষার কালবাহিত পরিবর্তনের ধারাগুলিকে নির্দিষ্ট করে সেই ভাষার একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করা যায়। এই ধরনের ব্যাকরণের খুব ভালো উদাহরণ হেনরি সুইটের দুখণ্ডে New English Grammar। এই বইয়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তনের সামগ্রিক চিত্রটি খুব সহজ করে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও আর এক ধরনের ব্যাকরণ হতে পারে। যে ব্যাকরণে পরস্পর সম্পৃক্ত একাধিক ভাষার তুলনা করে সেই ভাষাগুলির একটি সামান্য (common) রূপ অঙ্কনে প্রয়াস হতে পারে। ঐ সামান্যরূপটি নির্ধারিত হলে ঐ ভাষাগুলির উৎস—যদি অবশ্য সেই উৎস লুপ্ত হয়ে থাকে—সন্ধানের কাজটিও সহজ হয়ে পড়ে। এই ধরনের ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কার্ল ব্রুগমান ও বেরথলট্ ডেলব্রুকের জার্মান ভাষায় লেখা Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen।

এই তিন ধরনের ব্যাকরণকে যথাক্রমে বলা হয় বিবরণাত্মক, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক

ব্যাকরণ। এই ত্রিবিধ ব্যাকরণই নিজ নিজ পদ্ধতিতে ভাষার সামগ্রিক রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সঙ্গে বিবরণাত্মক ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ যোগসূত্র আছে। কোনো ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার অর্থই হল সেই ভাষার বিভিন্ন স্তরের বিবরণাত্মক ব্যাকরণ রচনা। অথবা উলটো দিক থেকে বলা চলে যে কোনো ভাষার কালানুক্রমিক বিবরণাত্মক রচনা করা হলেই সেই ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনার কাজটি সহজ হয়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে এই তিন ধরনের ব্যাকরণের উদ্দেশ্য এক। সেই উদ্দেশ্য হল ভাষার সামগ্রিক রূপটি আঁকা। পক্ষান্তরে বিদ্যালয় পাঠ্য ব্যাকরণকে বলা যেতে পারে প্রায়োগিক ব্যাকরণ। যে ব্যাকরণ ধাতস্থ না হলে আমরা ভাষা ''সিদ্ধ''ভাবে ব্যবহারই করতে পারি না। বলা বাহুল্য যে এই প্রবন্ধে ব্যাকরণ শব্দটিকে এই সীমিত প্রায়োগিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি; ব্যবহার করা হয়েছে শব্দটিকে ব্যাপক—অর্থাৎ সামগ্রিক ব্যাকরণ—অর্থে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই ব্যাপক অর্থে ব্যাকরণশাস্ত্রের যোগাযোগটা কি? এ প্রশ্নের উত্তরটা সহজ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাঙলা ভাষার সামগ্রিক ব্যাকরণ রচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। আর সব চেয়ে বড় কথা হল যে, 'এই কাজটা করতে হবে' বা 'কাজটা করে ফেলা উচিত' এই ধরনের কোনো আপ্তবাক্য—যা শুনতে আমরা অভ্যস্ত, উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হননি। রীতিমত হাতে কলমে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি।

আশঙ্কা হচ্ছে যে, পাঠক ভাবতে শুরু করেছেন যে অতি উৎসাহের চোটে রবীন্দ্রনাথ যে একজন দিগগজ বৈয়াকরণিক ছিলেন সেই কথাটা প্রমাণ করবার জন্যে আমি কোমর বেঁধে লেগেছি। এ রকম আশঙ্কা অমূলক নয়। ইদানীং এই প্রবণতা খুব বেশি নজরে পড়ে। আমরা আমাদের প্রিয় মহাপুরুষদের মহত্ব যে সর্বব্যাপী একথাটা দশে পাঁচে গলা ফাটিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে না পারলে যেন সোয়াস্তি পাই না। ভক্তি আমাদের এমনই অন্ধ করে দেয় যে আমরা বুঝি না যে নিজেদের মানসিক সংকীর্ণতার বশে সেই মহাত্মাদের কত অবমাননাই না করছি। রবীন্দ্রনাথ কোনো অর্থেই ভাষাতাত্ত্বিক বা বৈয়াকরণ ছিলেন না। একথা তিনি অনেকবার বলেছেন। বাংলা ভাষা পরিচয় পুস্তিকার ১২৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন :

> আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন, আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষা বিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলুম নিম্নে তা উদ্ধৃত করে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে।—
>
> 'আমার পক্ষে যা সবচেয়ে দুঃসাধ্য তাই তুমি আমাকে ফরমাশ করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তির ব্যাখ্যা করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মানুষের শরীর বিজ্ঞানের উপদেষ্টা মঞ্চে চড়াতে চাও। অহংকারে মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অজ্ঞ করে—মধুসূদনের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, দর্পহরণ করবার প্রয়োজন ঘটবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কৃপা করেন। আমার এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারিনি, প্রতিমুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি। ভয় আছে, পাছে আমার স্পর্ধা দেখে তাত্ত্বিকেরা 'হায় কৃষ্টি', 'হায় কৃষ্টি' বলে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন। কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শারীরতত্ত্বের যাথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্যলাভ করে তা হলেই ধন্য হব।...'

উদ্ধৃতি হয়তো দীর্ঘ হয়েছে। তবে এর সবটাই নিছক রসিকতা বা সহজাত বিনয় মনে করবার কারণ নেই। বক্তব্যের মধ্যে সততা ও অন্তরিকতা আছে। এ ধরনের স্বীকারোক্তি তিনি একবার নয়, বহুবার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাষাশিল্পী। তাঁর শিল্পকর্মের প্রধান মাধ্যম ভাষা। সেই কারণে ভাষা সম্বন্ধে তাঁর ছিল সৃষ্টিশীল শিল্পীর অনুসন্ধিৎসা। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা নিছক অনুসন্ধিৎসাই ছিল না। তার সঙ্গে মিলে ছিল তাঁর পরিশ্রমী আগ্রহ। তবুও একথা ঠিক যে গবেষকের লক্ষ্য ও তাঁর লক্ষ্য এক হলেও প্রকৃতিগত ভিন্নতাও ছিল। বাংলাভাষা পরিচয় থেকে যে অংশটি উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে এই কথাটি তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন।

তিন

যে কোনো অবস্থায় বা পরিপ্রেক্ষিতেই ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে ভাষার ব্যবহার আয়াসলব্ধ এবং সচেতন প্রযত্নের ফল। সাহিত্যে—বিশেষ করে কবিতায়—ভাষা ব্যবহারের এই সচেতন প্রযত্ন পরিশীলিত শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছয়। যেহেতু কবিতা রচনাকর্মে কবিকে আরোপিত সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিতে হয় সেই কারণে ভাষা ব্যবহারে কবিরা হয়তো বা একটু বেশি মাত্রায় স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল হন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্পর্শকাতরতা বা সংবেদনশীলতা বলতে কী বোঝাতে চাইছি। ভাষার মূল উপাদান শব্দ, যা এক বা একাধিক ধ্বনি সমবায়ে গঠিত। শব্দের আবার দুটি অঙ্গ : অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ হল শব্দের ধ্বনিগতরূপ যা আমাদের কর্ণগোচর। আর অন্তরঙ্গ হল তার অর্থ বা দ্যোতনা যা মর্মগোচর। সাধারণ বাক্‌ব্যবহারে আমরা শব্দের এই দুই অঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন নই। সাধারণ কথাবার্তায় আমরা একটা মোটামুটি অর্থ বুঝতে পারলেই খুশি। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি কথার অর্থ সম্বন্ধে আমরা মাথা ঘামাই না। আর তার ফলে আমরা শব্দ ব্যবহারে অসাবধান হয়ে পড়ি। এই অসাবধানতার ফলে শব্দের আন্তরশক্তি অপচয়িত হয়। এই ধরনের অপচয়ের একটা ভাল উদাহরণ 'দারুণ' শব্দটি। সাধারণ বাক্‌ব্যবহারে আমরা বেশির ভাগ সময়ই শব্দের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে মনস্ক নই। যখন আমরা অজানা কোনো ভাষা শুনি বা কোনো ব্যক্তির উচ্চারণে বিকৃতি বা বৈষম্য লক্ষ্য করি তখনই আমরা শব্দের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন হয়ে পড়ি। কবিরা শব্দের এই দ্ব্যঙ্গ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। এই সচেতনতাকেই সংবেদনশীলতা বলতে চাই। এই সচেতনতার জন্যই কবি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক কথাটিকে বেছে নিতে পারেন। 'নেড়ি কুকুর' বা 'থ্যাঁতা ইঁদুর' কোনোটাই সাহিত্যের পাতে পরিবেশন করবার উপযুক্ত নয়। নেড়ি কুকুরকে ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নিলেও 'থ্যাঁতা ইঁদুর' সম্বন্ধে মনের খুঁতখুতুনি যেতে চায় না। কিন্তু কোনো এক কবিতার চরণে কবি যখন লেখেন 'ব্যাঙের খাঁটি কথাটা আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি' তখন নেড়ি কুকুর আর ট্র্যাজেডির সহাবস্থান আমাদের মনে মোটেই অস্বস্তিকর কোনো অনুভূতি জাগায় না। পংক্তিটিকে সহজভাবে গ্রহণ করি। পংক্তিটি মনের মধ্যে অনুরণিত হয়। অন্য এক কবি যখন অন্য এক কবিতায় অক্লেশে লেখেন 'থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্ত মাখা ঠোঁটে' তখন প্রয়োগের অনিবার্যতা নিয়ে মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না।

এই সংবেদনশীলতা বা স্পর্শকাতরতা জন্মলব্ধ হতে পারে। যাকে জার্মানে বলে Sprachgefühl। আবার আয়াস লব্ধ অর্থাৎ ভাষা বিষয়ে কৌতূহল আর সচেতন বিশ্লেষণজাত-ও

হতে পারে। যিনি অসাধারণ Sprachgefühl-এর অধিকারী তিনি যদি ভাষা সম্বন্ধে কৌতূহলী হন এবং সেই কৌতূহল নিরসনে অক্লান্তকর্মী হন তবেই হয় সত্যিকারের সোনায় সোহাগা। কালিদাস ব্যক্তি মানুষটি সম্বন্ধে কিছুই আমাদের জানা নেই। তাই ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সংবেদনশীলতা কতখানি বিশুদ্ধ Sprachgefühl আর কতখানি আয়াসলব্ধ তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা নিরর্থক। তবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে আক্ষরিক অর্থে বেণীবন্ধন ঘটেছিল সে কথা প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রনাথের Sprachgefühl যে কী আশ্চর্য রকম শাণিত ছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত একটি ঘটনায়, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ভাষায়। আর ভাষা সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব এই প্রবন্ধের অপরার্ধে।

জীবনস্মৃতির ‘পিতৃদেব’ অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত ‘গীতগোবিন্দ’ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার গদ্যের ভাগ ছিল না। গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম। ... গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপান ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্রছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড় আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি ‘অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণং হরি বিরহদহনবহনেন বহু দূষণং’ এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিয়াছিলাম সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম।

সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। বিশেষত এগারো বারো বছরের ছেলের পক্ষে রীতিমত অসাধ্যসাধন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা না লিখে পারছি না। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের ধ্বনিগত লালিত্য ও মাধুর্য সর্বজনবিদিত। কৌতুকরসাশ্রিত এই গানটির ধ্বনিমাধুর্যই কম কি? গানটি হল :

মনোমন্দির সুন্দরী! মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা! অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।
রোষারুণরাগরঞ্জিতা! বঙ্কিম-ভুরু-ভঞ্জিতা!
গোপন হাস্য-কুটিল-আস্য কপট কলহ গঞ্জিতা।
সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী! ভয় ভঙ্গুর ভঙ্গিণী।
চকিত চপল নবকুরঙ্গ যৌবনবনরঙ্গিণী।
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা। মধুকরভর কুণ্ঠিতা
লুব্ধ পবন-ক্ষুব্ধ-লোভন মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা।
চুম্বনধনবঞ্চিনী দুরূহগর্বমঞ্চিনী।
রুদ্ধ কোরক-সঞ্চিত-মধু কঠিন কনককঞ্জিনী।।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর আইডিয়াটি যে তাঁর নিজস্ব নয় সে কথা রবীন্দ্রনাথ বইটির ভূমিকায় নিজেই স্বীকার করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে বা রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার বই পড়ে এ তথ্য আমাদের সকলেরই জানা। ঐ ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ আরো কিছু মন্তব্য করেছেন যাতে আমার বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিইনি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি। যদি ফিরে পেতুম তা'হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজে ইচ্ছামতো মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।

ভাষার গঠন, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ী কৌতূহলের পরিচয় অন্যত্রও আমরা বহু পাব। এখানে শুধু একটা কথা পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী যখন লেখা হয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তাঁর নিজের কথায় 'তখন আমি চোদ্দয় পা দিয়েছি।'

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতখানি সে বিচারের ভার সাহিত্য রসবেত্তার। সুতরাং সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকি। তবে ভাষাগত সাদৃশ্যে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ও বিদ্যাপতি অনুপ্রাণিত কবিদের রচনার কাছাকাছি তা বোঝা কঠিন নয়।

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গেল রয়নী,
নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব,
বিফল রে এ পীরিতি লেহা—
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন,
বিফল রে এ মঝু দেহা।
* * *
ভানু নিবেদয় চরণে
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি
নহি টুটে জীবন মরণে।

ব্রজবুলিতে পদ রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যদি তিনি শ্রীসুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' পুস্তকের ব্রজবুলি শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ে নিয়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর রস আর একবার আস্বাদনে আগ্রহী হন।

অল্প বয়সেই নয় ব্যাকরণশাস্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল বারবার এবং গভীর। তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত তথ্য থেকে। নিছক জানার আগ্রহে তিনি যে সব 'নীরস' ব্যাকরণ পড়েছিলেন তার তালিকাটা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তালিকাটি মোটামুটি এই রকম :

১। The Prakrita Prakasa or the Prakrit Grammar of Vararuchi, with the commentary of Vamaha–edited by E.B.Cowell, Trübner & Co, London, 1868.

২। Handbook of Pali by O. Frankfurter, Williams & Norgate, London 1883.

৩। Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages by Karl Brugmann, English Translation by Joseph Wright, Trübner & Co, London 1888.

৪। A Sanskrit-English Dictionary by Sir Monier Monier-Williams, Clarendon Press, Oxford, 1899.

৫। The Origin and Development of the Bengali Language by Suniti Kumar Chatterji, Calcutta University Press, Calcutta, 1926.

এই বইগুলি যে 'মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি/পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,/সোনার জলে দাগ পড়ে না,/খোলে না কেউ'-বৎ নয় সেই কথাটি প্রমাণ করবার জন্যে ব্রুগমানের জার্মান বইয়ের প্রথম খণ্ডের রাইটকৃত অনুবাদের ৬৭ পৃষ্ঠার একটি প্রতিলিপি প্রবন্ধের শেষে দেওয়া গেল।

চার

আগেই বলা হয়েছে যে ব্যাকরণ—বিবরণাত্মক, ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক যে ধরনেরই হোক না কেন—ভাষার সামগ্রিক কাঠামোটি ধরতে চেষ্টা করে। পৃথিবীতে যত ভাষা চলিত আছে, এমন কি যে সব ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে অল্প কয়েকটিকে বাদ দিলে বেশির ভাগ ভাষাকেই কয়েকটি শ্রেণী বা গুচ্ছে ভাগ করা গেছে। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যে সব বিভিন্ন ভাষা আছে তাদের মধ্যে সাম্য যেমন আছে বৈষম্যও আছে বিস্তর। এমনকি একই উৎসজাত ভাষাবর্গের দুটি ভাষার মধ্যে প্রকৃতিগত মিল আর অমিল দুই-ই আছে। গ্রীক এবং সংস্কৃত একই উৎসজাত। গ্রীক আর সংস্কৃতের মধ্যে মিলের চাইতে অমিল কিছু কম নয়। তাই সংস্কৃতজ্ঞকে গ্রীক শিখতে গেলে গ্রীক ভাষার ব্যাকরণটি আয়ত্ত করতে হয়। ঠিক তেমনি কোনো গ্রীকবিশারদকে সংস্কৃত শিখতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতেই হবে। অর্থাৎ গ্রীক এবং সংস্কৃত সহোদরা হলেও তাদের ভাষা কাঠামোয় বেশ কিছু ভিন্নতা আছে। ক্লাসিকল ভাষার ক্ষেত্রে এই ব্যাকরণগত পার্থক্য মেনে নিতে কোনো সঙ্কোচ হয় না। মুশকিল বাধে আধুনিক ভাষার ক্ষেত্রে। সমস্যাটা হয় এই যে আধুনিক ভাষার নিজস্ব ভাষা ছাঁদকে অস্বীকার করে সেটাকে আমরা ক্লাসিকল ভাষার কাঠামোয় পুরে দিতে চাই। একটা উদাহরণ দিয়ে আমার কথাটা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা যাক। লাটিনে magistro যে dative case অর্থাৎ সম্প্রদান কারক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক ইংরেজিতে 'to the master'কে কোনো অর্থেই dative বা সম্প্রদান কারক বলা চলে না। তেমনি সংস্কৃতে 'বৃক্ষাৎ' যে অর্থে পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত অপাদান কারক বাংলা 'গাছ থেকে' সে অর্থে অপাদান কারক নয়। আরো সোজাসুজিভাবে বলতে গেলে বলতে হয় লাটিনে বা সংস্কৃতে যত কারক আছে তার সবগুলি আধুনিক ইংরেজি বা আধুনিক বাংলায় নেই। লাটিন magistro বা সংস্কৃত বৃক্ষাৎ হল inflected form বা সুবন্ত পদ। ইংরেজি to the master বা বাংলা গাছ থেকে হল phrase বা বাক্যাংশ যা একাধিক বিশ্লিষ্ট শব্দের দ্বারা গঠিত। প্রশ্ন হতে পারে এ রকমটা হচ্ছে কেন? উত্তর খুব সোজা।

এই গোলমালের কারণ লাটিন আর সংস্কৃত ভাষায় কাঠামোর মধ্যে জোরজবরদস্তি করে ইংরেজি আর বাংলা ভাষাকে পুরে দেবার জন্যে। সেই চিরাচরিত সমস্যা। গোলাকার বৃত্তের মধ্যে চৌকো একটি কাঠের গোঁজকে ঢোকানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস। সমস্যাটির অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক। অর্থাৎ ইংরেজি বা বাংলা ভাষার নিজস্বতাকে স্বীকার করবার মতো মানসিক ঔদার্যের অভাব। আর এই ধরনের মানসিক জড়ত্ব বা রক্ষণশীলতার ফলে ইংরেজি বা বাংলা ব্যাকরণ বলে যে বস্তুটি আমরা বাল্যকালে গলাধঃকরণ করি তা লাটিনের সঙ্গে ইংরেজির এবং সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার এক অনুপাদেয় অপাক খিচুড়ি।

এই রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ। এই ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য তিনি প্রথম পেশ করেন বাংলা ব্যাকরণ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির রচনাকাল তেরশ আট সালের পৌষ মাস। এরও আগে অবশ্য বারশ বিরানব্বই সালের আশ্বিন মাসে লেখা এক প্রবন্ধের শেষে তিনি মন্তব্য করেছিলেন :

> এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাক বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।

'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁরই লেখা একটি প্রবন্ধ 'বাংলার কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়' প্রবন্ধের সমালোচনার উত্তরে। রক্ষণশীলদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান।

রবীন্দ্রনাথ এই দাবির অসারত্ব দেখিয়েছেন এই বলে যে, বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের প্রভেদ প্রায় মৌলিক স্তরের। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্যাঘ্রেন খাদিতঃ এই বাক্যটির বাংলা অনুবাদে যে বাক্যটি পাই—বাঘে খাইল—সেই বাক্যটিকে কোনোমতেই সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিতে সিদ্ধ করা যায় না। শুধু তাই নয় বাংলা ও সংস্কৃতের 'গুরুতর অনৈক্য' দেখিয়ে তিনি লিখছেন :

> আমার করা চাই—এই চাই ক্রিয়াটা কী? ইহার আকার দেখিয়া ইহাকে উত্তম পুরুষ বোধ হয়; কিন্তু সংস্কতে ইহাকে মম করণং যাচে বলা চলে না। বাংলাতেও 'আমি আমার করা চাই' এমন কখনো বলি না। বস্তুত 'আমার করা চাই' যখন বলি, তখন অধিকাংশ সময়েই সেটা আমি চাই না, পেয়াদায় চায়। অতএব এই 'চাই' ক্রিয়াটা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন্ জিনিসটার কোন্ সম্বন্ধী। আমাকে তোমার পড়াতে হবে, এখানে তোমার সর্বনামটি সংস্কৃত কোন নিয়মমতে সম্বন্ধ পদ হয়। এই বাক্যের অনুবাদ ত্বং মাং পাঠয়িতুম অর্হসি; এখানে ত্বং কর্তৃকারক ও প্রথমা এবং অর্হসি মধ্যমপুরুষ—কিন্তু বাংলায় 'তোমার' সম্বন্ধপদ এবং 'হবে' প্রথম পুরুষ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে এ সকল বাক্য সাধ্য অসাধ্য, বাংলা ভাষার নিয়মে এগুলিকে পরিত্যাগ করা ততোধিক অসাধ্য।

এরপর রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে যদি আমরা কেবলই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মতে সমান পথে চলি তো এমন প্রয়োগ-ও ঘটতে পারে যা সংস্কৃত এবং বাংলা দুইয়ের কাছেই সমান বর্জনীয় হবে :

> ...মানী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'মানিনী' হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী বিদ্যালয়ের মসীচিহ্নিত বালিকাকে যদি 'দাগিনী' বলা যায় তবে ছাত্রীও হাঁ করিয়া থাকিবে, ও তাহার পণ্ডিত-ও টাকে হাত

> বুলাইবেন। ... সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা লিখিবার সময় কেহ যদি ''ভো স্বদেশিন্'' লেখেন তাঁহাকে অনেক পণ্ডিত সমালোচক প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কেহ যদি ''ভো বিলাতিন্'' লিখিয়া রচনায় গাম্ভীর্য সঞ্চার করিতে চান তবে ঘরে পরে সকলেই হাসিয়া উঠিবে।

এইরকম অনেক উদাহরণের সাহায্যে—সংস্কৃত সম্প্রদান কারকের সাদৃশ্যে বাংলায় সন্তাড়ন কারক, সংলালন কারক, সম্ভোজন কারক, সঞ্চালন কারক প্রভৃতির আবশ্যকতা—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বাংলার নিজস্ব প্রকৃতিকে অস্বীকার করে তাকে সংস্কৃতের কাঠামোর মধ্যে পুরে দিতে চাওয়া যে নিরর্থক তা-ই নয় মস্ত বড় ভুলও বটে।

> মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।

এই প্রবন্ধের অন্য এক জায়গায় যা লিখেছেন তা আরও প্রণিধানযোগ্য :

> বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধা মতো বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটি তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উর্দু ভাষায় পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে হিন্দির বৈমাত্রেয় সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, গলায় কলার এবং সর্বাঙ্গে বিলাতি পোষাক পরেন, তবু তাহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা খুঁজিয়া বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃত শব্দ কটা আছে তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষ রূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্যভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ।

এর পরের অংশে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা সেই সময়ের পক্ষে রীতিমত বৈপ্লবিক। বাংলা ব্যাকরণ রচনা করতে হলে তার উপাদান কী হবে :

> সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে এখনকার ঘর গড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে-সব কথা গ্রাম্য হইতে পারে,ছাপাখানার কালীর ছাপে বঞ্চিত হইতে পারে, সাধুভাষার ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যবসা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে গতিবিধি রাখিতে হয়।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা ব্যাকরণের একমাত্র অবলম্বন হবে বাংলার তদ্ভব উপাদান। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তদ্ভব শব্দটি ব্যবহার করেননি। পরিতাপের বিষয় যে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর তিরাশি বছর কেটে গেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ একটিও লেখা হয়নি। অবশ্য কিছুদিন আগে শ্রীসুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্তে'র নবতম সংস্করণে খাঁটিবাংলা ব্যাকরণের একটি রূপরেখা করে দিয়েছেন। তবে বিস্তারিত একটি ব্যাকরণ এখনো প্রত্যাশিত।

বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে। তার মধ্যে দুটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। একটি হল 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' (পৌষ, তের শ পাঁচ সাল) আর অন্যটি হল 'ভাষার ইঙ্গিত' (আষাঢ়-শ্রাবণ, তের শ এগার সাল)।

'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' বস্তুত পুস্তক সমালোচনা। বীমসের ভুল ত্রুটিগুলি দেখাতে রবীন্দ্রনাথ কসুর করেননি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন, ''কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই তখন [সাহেবি অজ্ঞতাকে পরিহাস করিবার] প্রলোভন সংবরণ করিতে হয়।''

বীমস বাংলাধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায় পদে পদে ভুল করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বীমসের প্রতিটি ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। বীমসের ভুল হওয়ার কারণ হল এই যে বাংলায় বানান ও উচ্চারণের মধ্যে যে ফারাক আছে তার কার্যকরণ সূত্রটি তিনি ধরতে পারেননি।

> বীম্স্ বলিতেছেন, বাংলা স্বরবর্ণ অ কোথাও বা ইংরেজি not rock প্রভৃতি শব্দের স্বরের মতো, কোথাও বা bone শব্দের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়।...
>
> বীম্স্ সাহেব লিখিতেছেন, সিলেব্‌লের (syllable) শেষে অ স্বরের লোপ হইয়া হসন্ত হয়। কলসী ও ঘটকী শব্দ তিনি তাহার উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

লিখিত ও কথিত বাংলার ব্যাকরণে প্রভেদ আছে। বীমসের ব্যাকরণে কোথাও বা লিখিত বাংলার কোথাও বা কথিত বাংলার নিয়ম নির্দিষ্ট হওয়ায় অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সাধু ভাষায় লিখিত সাহিত্যে আমরা ঘটকী শব্দের ট হইতে অকার লোপ করি না। অপর পক্ষে বীমস সাহেব যে-নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কী কথিত কী লিখিত কোনো বাংলাতেই সর্বত্র খাটে না; জনরব বনবাস বলবান পরচর্চা প্রভৃতি শব্দ তাহার উদাহরণ।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনাই করেছেন।

'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ধারণার কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন :

> বাংলা ব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই একটা বিষয়ে বোঝা পড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলা ভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনোমতেই ত্যাগ করা চলে না, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।... ... ...
>
> সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের বাহ্য উপায়। অতএব, মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনই বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর বীররসের প্রয়োজন হয়।
>
> বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদ ঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে; তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন বাংলার সংস্কৃত অংশকে বাদ দিলে যে অংশটা থাকবে তার উপাদান বা material জোগাড় কী ভাবে হবে? তার উত্তর যে রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন সে কথাও আগে

বলা হয়েছে। উপরন্তু বাংলা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে উপভাষাগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। অবশ্য 'উপভাষা' এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাকৃত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

> এই যে-বাংলায় আমরা কথাবার্তা কহিয়া থাকি, ইহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে। যে-বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বাংলার সমস্ত প্রদেশেই অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে।
>
> সেই ভেদগুলি ঠিক হইয়া গেলে ঐক্যগুলি কি বাহির করা সহজ হইয়া পড়ে। বাংলা দেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলা ভাষা বাঙালীর কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলা ভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।
>
> কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানাদিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে।
>
> ভাষার অমুক ব্যবহার বাংলার পশ্চিমে আছে পূর্বে নাই বা পূর্বে আছে পশ্চিমে নাই, এরূপ একটা ঝগড়া যেন না ওঠে। এই সংগ্রহে বাংলার সকল প্রদেশকেই আহ্বান করা যাইতেছে। পূর্বেই আভাস দিয়াছি ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাংলা ভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

এই উদ্ধৃতির পর সত্যের খাতিরে একটা কথা বলা উচিত। রবীন্দ্রনাথ যে পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন সে পথে এগিয়ে যাবার মতো উৎসাহ বা দক্ষতা আমরা দেখাতে পারিনি। বাংলার উপভাষাগুলির জরীপ করা সম্ভব হয়নি। রচিত হয়নি এমন কোনো অভিধান যাতে কেবলমাত্র খাঁটি বাংলা শব্দ—অর্থাৎ তদ্ভব শব্দ—সংকলিত হয়েছে। বেশির ভাগ বাংলা অভিধানে সংস্কৃত শব্দকে নির্বিচারে ঢুকিয়ে দিয়ে ভিজে কম্বল ভারী করা হয়।

আর একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ যখন খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে বারবার লিখছেন সেই সময় রক্ষণশীল মহল থেকে এমন কথা শোনা যাচ্ছিল যে সংস্কৃত অংশকে বাদ দিয়ে 'যেসকল শব্দ লইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাষার গুরুত্ব ও মাধুর্য কতদূর রক্ষিত হইবে তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়।' এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তাহার গুরুত্ব মাধুর্য ওজন করা ব্যাকরণকারের কাজ নহে। সেই ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। সে-ভাষা যে ইচ্ছা ব্যবহার করুক বা না করুক তিনি উদাসীন। কাহারো প্রতি তাঁহার কোনো আদেশ নাই, অনুশাসন নাই। জীবতত্ত্ববিদ্‌ কুকুরের বিষয়ও লেখেন; শিয়ালের বিষয়ও লেখেন। কোনো পণ্ডিত যদি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আসেন যে, তুমি যে শিয়ালের কথাটা এত আনুপূর্বিক লিখিতে বসিয়াছে, শেষকালে যদি লোকে শেয়াল পুষিতে আরম্ভ করে। তবে জীবতত্ত্ববিদ্‌ তাহার কোনো উত্তর না দিয়া তাঁহার শেয়াল-সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা শেষ করিতে প্রবৃত্ত হন।

ভাষার সম্বন্ধে বোধ অভ্রান্ত ছিল বলেই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ এত সহজে বুঝতে পেরেছিলেন।

পাঁচ

ব্যাকরণের একতম লক্ষ্য ভাষার কাঠামোটি নিরূপণ করা। এই কাঠামোটি ত্রৈস্তরিক। এর ত্রিস্তরে আছে ধ্বনিতত্ত্ব (phonology), রূপতত্ত্ব (morphology) এবং পদবিধি (syntax)। কোনো একটি ভাষার ব্যাকরণ অর্থাৎ কাঠামোটি বুঝতে গেলে এই তিনটি স্তরের সবকটিকেই ভালো করে বুঝে নিতে হবে। শব্দতত্ত্বে যে তাঁর আগ্রহ অপরিসীম একথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার উল্লেখ করেছেন। শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যত প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে ধ্বনিতত্ত্বের ওপর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশি। রূপতত্ত্ব ও পদবিধি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির তুলনায় এই প্রবন্ধগুলি প্রতিভার স্পর্শে অনেক বেশি ভাস্বর। প্রবন্ধগুলি চন্দ্রহীন তামসী রাত্রির বুকে হীরক প্রভ নক্ষত্রের মতো দীপ্তিমান। ধ্বনিতত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহের কারণ বোঝা শক্ত নয়। কাব্যের আত্মা না হলেও ধ্বনির প্রতীক-দ্যোতকতা অবশ্যই কবিতার একটি মৌল উপাদান। তাই শব্দতত্ত্বের এই স্তরটির সম্বন্ধে কবির ঝোঁক খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ', প্রকাশিত হয় বার শ বিরানব্বই সালের আশ্বিন মাসে। এই প্রবন্ধে বাংলায় বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণে যে গরমিল আছে অর্থাৎ লিখিতরূপ ও কথিতরূপের মধ্যে যে ফারাক আছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে সাধারণ আলাচনা করে নিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অ-ধ্বনি ও-ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় তার বুদ্ধিগ্রাহ্য নিয়ম বের করবার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কীভাবে এই ধ্বনিরূপান্তরকে ব্যাখ্যা করেছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে রবীন্দ্রনাথের ধ্বনির প্রকৃতি ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে বোধ যে কী রকম তীক্ষ্ণ ছিল সেটা দেখাবার চেষ্টা করব। প্রবন্ধের মুখবন্ধের শেষের দিকে তিনি লিখছেন :

> হরি শব্দের হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হর শব্দের হ সেরূপ উচ্চারণ করি না, দেখা শব্দের একার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর এক রূপ। পবন শব্দের প অ-কারান্ত ব ও-কারান্ত ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো কিন্তু বিশ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ শশ্-এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি—ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দের ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ পড়ি—গর্ধোব। লিখি সহ্য, পড়ি—সোজ্ঝ। এমন কত লিখিব।
>
> আমরা বলি আমাদের তিনটে স-এর উচ্চারণে কোনো তফাৎ নাই, বাংলায় সকল স-ই তালব্য শ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়; কিন্তু আমাদের যুক্ত অক্ষর উচ্চারণে একথা খাটে না। তার সাক্ষ্য দেখো কষ্ট শব্দ এবং ব্যস্ত শব্দের দুই শ-এর উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য শ, দ্বিতীয়টি দন্ত্য স। 'আসতে হবে' এবং 'আশ্চর্য' এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শ-এর প্রভেদ রাখা হইয়াছে। জ-এর উচ্চারণ কোথাও বা ইংরেজি Z-এর মতো হয়, যেমন লুচি ভাজতে হবে এস্থলে ভাজতে শব্দের 'জ' ইংরেজি Z-এর মতো।
>
> সচরাচর আমাদের ভাষায় অন্ত্যস্থ ব-এর আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু জিহ্বা অথবা আহ্বান শব্দে অন্ত্যস্থ ব ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ পাঠকদের আমি অনুরোধ করব এই উদ্ধৃতিটি যেন দু-বার পড়েন। ভাষাতত্ত্বে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা আছে বা যাঁরা ভাষাতত্ত্বের কারবারী তাঁদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ দুটি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলছি। কেন বলছি সে কথা বলি। আমরা জানি যে ভাষার ক্ষুদ্রতম একক

(unit) ধ্বনিতা বা স্বনিম (phonéme)। এই স্বনিম বা ধ্বনিতার এক বা একাধিক প্রায় সমরূপ প্রকারভেদ থাকে। সেই প্রকারভেদগুলিকে বলে পুরকস্বন (allophone)। এই পুরকস্বনগুলি একটি ভাষায় বিশেষ বিশেষ সংস্থানেই ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপারকে বলা হয় প্রতিযোগী ব্যবহার (complementry distribution)। ধ্বনিতত্ত্বের এই বিশ্লেষণের আদিকর্মিক ফের্‌দিন দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure)। পরবর্তীকালে বিবরণাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে এই তত্ত্ব খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। সোস্যুরের phonéme এবং পরবর্তীকালের phonéme প্রয়োগিক দিক থেকে সর্বদা সমার্থক নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে সোস্যুরের ধারণা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আগে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। আর রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ইংরেজির আঠার শ পঁচাশি খ্রীষ্টাব্দে! কত সহজে ভাষাবিজ্ঞানের একটি মৌলিক কথা—ধ্বনির রূপান্তরের একটি প্রবণতার কথা তিনি বলেছেন। এই-ই হল প্রতিভা। আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন বলেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের আমরা পেয়েছি। পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আটটি পরিবেশ নির্দেশ করে বলেছেন যে এই সব পরিবেশে অ ধ্বনি বাংলায় ও ধ্বনিতে পরিবর্তিত হবে। পরিবেশগুলিকে সনাক্ত করে সেইগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি একটি সাধারণ সূত্র বের করবার চেষ্টা করেছেন :

> দুয়েকটি ছাড়া যতগুলি নিয়ম উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বুঝাইতেছে ই কিংবা উ-এর পূর্বে অ-এর উচ্চারণ ও হইয়া যায়। এমন কি ই-কার উ-কার অপভ্রংশে লোপ হইলেও এ নিয়ম খাটে। এমন কি য ফলায় ও ঋ ফলায় ই কারের সংস্রব আছে বলিয়া তাহার পূর্বেও অ-এর বিকার হয়। ই-কারের পক্ষে যেমন য-ফলা, উ-কারের পক্ষে তেমনই ব ফলা। উ-এ অ-এ মিলিয়া ব ফলা হয়; অতএব আমাদের নিয়মানুসারে ব ফলার পূর্বেও অকারের বিকার হওয়া উচিত। কিন্তু ব ফলার উদাহরণ অধিক সংগ্রহ করিতেপারি নাই বলিয়া একথা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে দুই তিনটি মনে পড়িতেছে তাহাতে আমাদের কথা খাটে; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরি মন্বন্তর। এইখানে গুটি কতক ব্যতিক্রমের কথা বলা আবশ্যক। ই উ য ফলা ঋ ফলা ক্ষ পরে থাকিলে ও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না; যথা অকিঞ্চন অকুতোভয় অখ্যাতি অনৃত অক্ষয়।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ স্বরবর্ণের দ্বারা সাধিত একটি ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরূপটি কী রকম অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করেছেন। একাধিক অক্ষরের (syllable) শব্দে যদি ই-কার বা উ-কার পরবর্তী অক্ষরে থাকে তো পরবর্তী অক্ষরের স্বরধ্বনিরর প্রভাবে পূর্ববর্তী অক্ষরের কোনো কোনো স্বরধ্বনির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ ধ্বনি পরিবর্তনটি বিশেষ পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। প্রাচীন ইংরেজিতে এর ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে। আর এই ধ্বনি পরিবর্তনের ফলেই ইংরেজি man শব্দের বহুবচনে men আধুনিক জার্মানে Männ-এর বহুবচনে Männer হয়েছে। চলিত বাংলাতে-ও এই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসব।

ই-কার এই স্বরধ্বনিটি যে কেবলমাত্র স্বরবর্ণের প্রকৃতি বদলাতে পারে তাই নয় ক্ষেত্র বিশেষে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতিও বদলে দিতে পারে। খুব সম্প্রতি ফোক জোসেফসন (Folke Josephson) এক প্রবন্ধে হিটাইটের ওপর ই-কারের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেছেন :

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিয়ম মানে না, অর্থাৎ ই উ য ফলা ঋ ফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও ইহাদের আদ্যক্ষরবর্তী অ 'ও' হইয়া যায়; মন্দ মন্ত্র মন্ত্রণা নখ মঙ্গল ব্রহ্ম।

বস্তুত 'নখ' ছাড়া কোনো শব্দটিকেই যথার্থ ব্যতিক্রম বলা চলে না। 'নখ' ছাড়া বাকি শব্দগুলিতে অ-কারের ও-কারে পরিণত হওয়ার প্রবণতার মূলে আছে নাসিক্য ধ্বনির সামীপ্য। নাসিক্য ধ্বনির সামীপ্য জনিত স্বরধ্বনির বিকারের উদাহরণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রবন্ধটি লেখার সাত বছর পরে আঠারো শ বিরানব্বই সালে রবীন্দ্রনাথ 'স্বরবর্ণ অ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে বাংলা উচ্চারণ প্রবন্ধের সংযোজন। যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ আগের প্রবন্ধে জোর করে বলতে পারেননি সেকথাটা এই প্রবন্ধে পরিষ্কার করে বলেছেন :

বাংলায় প্রধানত ই এবং উ এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবে অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিকার ঘটিয়া থাকে।

উদাহরণস্বরূপ তিনি গত/গতি, সর/সরু, গণ/গণ্য (য-ফলা), কর্তা/কর্তৃ (ঋ ফলা) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ পেশ করেছেন।

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ আরো দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'স্বরবর্ণ এ' (কার্তিক) আর 'টা টো টে' (অগ্রহায়ণ)। দুটি প্রবন্ধই অসাধারণ। প্রথম প্রবন্ধে আদ্যক্ষর রূপে এ স্বরবর্ণের উচ্চারণ বৈষম্য—কোথাও বিশুদ্ধ এ আর কোথাও বিকৃত অ্যা—নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে তিনি যে সাধারণ সূত্রটি বের করেছেন সেটি যে নেতিমূলক তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে কোন্ পরিবেশে এ-কারের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটবে না তা নির্দেশ করা সহজ কিন্তু কোন্ পরিবেশে এ-কারের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটবে অর্থাৎ অ্যা হয়ে যাবে তা চিহ্নিত করা শক্ত। এ-কারের পর ই-কার বা উ-কার থাকলে এ-কারের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটবে না। যেমন, জেঠা (= জ্যাঠা) কিন্তু জেঠি। আবার একা (= অ্যাকা) কিন্তু একটু।

এইখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও একটা কথা বলি। অবশ্য সূক্ষ্ম বিচারে বিষয়টি আদৌ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সহজপাঠের একটি অতি পরিচিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একটি অদ্ভুত মিলের ব্যবহার করেছেন। এই মিলটি সম্বন্ধে অনেকেই অসুখী। মিলটি হল : গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন/দুমুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন। অনেকের মনেই প্রশ্ন, দেন (= দ্যান)-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেন-এর মিল ঘটালেন কী ভাবে? উত্তরটি সোজা। এখন আমরা সেন (পদবী) শব্দটিকে উচ্চারণ বিচারে সংস্কৃতায়িত করে ফেলেছি। বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী সেন শব্দের উচ্চারণ হওয়া উচিত শ্যান। যেমন, ফেন যেন হেন ইত্যাদি। গ্রাম্য উচ্চারণে 'সেন' এখনো 'শ্যান'।

এ-কারের উচ্চারণ বিকৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দন্ত্য ন এবং চ অক্ষর দুটিকে বিকারজনক বলে উল্লেখ করেছেন। চ-এর প্রভাব বিকারের উদাহরণ প্যাঁচ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা ও সততার কথা না বললে অন্যায় হবে। রবীন্দ্রনাথ যখনই কোনো ধ্বনি পরিবর্তনের কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন তখন যদি কোনো ব্যতিক্রম তাঁর নজরে পড়ে থাকে তো সেটি উল্লেখ করতে ভোলেননি। তিনি বলেছেন যে অকারান্ত শব্দ পরে থাকলে এ-কারের বিকৃতি হয় না। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উদাহরণের মধ্যে 'তেজ' একটি উদাহরণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন লেজ (লাঙ্গুল) শব্দটি কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম।

প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ একটি সাধারণ সূত্র বের করেছেন। এই সূত্রের সাহায্যে বাংলা ভাষার একটি রূপতত্ত্বগত ধ্বনি পরিবর্তনের (morphophonemic change) হদিশ পাওয়া গেল। সূত্রটি হল এই :

> যে-সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে বিশেষ্যরূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ই-কার এ-কারে বিকৃত হইবে এবং অসমাপিকা রূপে যে সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে 'এ' সংযুক্ত থাকে বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই এ-কার অ্যা-কারে পরিণত হইবে।

যথা :	অসমাপিকা ক্রিয়া	বিশেষ্যরূপ
	কিনিয়া	কেনা
	মিলিয়া	মেলা
	লিখিয়া	লেখা
	দেখিয়া	দ্যাখা
	ঠেলিয়া	ঠ্যালা

"এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।"

'টা টো টে' প্রবন্ধে নির্দেশক প্রত্যয়ের রূপ বৈচিত্র্য কেন হচ্ছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ভাষায় উচ্চারণে যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় তা কার্য-কারণ সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার প্রতিটি স্তরের একটা প্যাটার্ন আছে। সেই প্যাটার্নটি ধরতে পারলেই সেই ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি বা ছাঁচটিকে বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের একটি মৌলিক প্যাটার্ন ধরতে পেরেছিলেন আর তাই আমরা জানতে পারি যে কেন বাংলা নির্দেশক প্রত্যয়টির বিভিন্ন রূপ হয়। কেন বলি একটা আম, কিন্তু দুটো জাম বা তিনটে লিচু। আমরা জানতে পারি :

(১) এ-কারের পরে টা অবিকৃত থাকে। যেমন, এটা, সেটা।

(২) ই-কারের পরে টা টে হয়ে যায়। যেমন, এইটে, সেইটে।

(৩) উ-কারের পর আ ও হয়। তাই দুটা যথা নিয়মে হয় দুটো।

এই যে সূত্রগুলোর উল্লেখ করা হল সেগুলো যে নির্দেশক প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, অন্যত্রও সমানভাবে খাটে। তাই হিসাব কেন হিসেব হয়, মরিচা কেন মর্চে হয়, করিয়া কেন ক'রে হয় তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ভাষাতত্ত্বের জটিলতা স্বীকার করে নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে করিয়া আর ক'রের মধ্যে * কইরিয়া বলে একটি রূপকে ধরতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সহজাত প্রতিভায় করিয়া আর করে-র মধ্যে সহজ সম্পর্ক নির্ণয় করে দিয়েছেন। যেখানে ই-কার খুব স্পষ্টভাবে নেই সেখানে কেন এই ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে—যেমন, অভ্যাস/অভ্যেস, কৈলাস/কৈলেস—তার ব্যাখ্যাও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন।

ধ্বনিতত্ত্বের ওপর রবীন্দ্রনাথের আর একটি মৌলিক প্রবন্ধ 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ'। রচনাকাল তের শ সাত। প্রবন্ধটির গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি প্রায় সম্পূর্ণ। কয়েকটি মাত্র শব্দর উল্লেখ নেই। আদ্যক্ষর আ দিয়ে যে শব্দগুলি দেওয়া আছে তার মধ্যে আঁকুপাঁকু নেই। এই রকম আমার জানা আর যে-কটি শব্দ

নেই সেগুলি হল কেঁউ কেঁউ, গুজ গুজ, ছিট ফিট, ভোঁ ভাঁ। এখানে কেউ যেন মনে না করেন যে রবীন্দ্রনাথের ভুল ধরে আমি নিজেকে তালেবর বা লায়েক প্রমাণ করতে চাইছি। যেটা বলতে চাইছি সেটা হল যে রবীন্দ্রনাথ তালিকাটা এত বিস্তারিতভাবে করেছেন বলেই ফাঁক ফোকরগুলো চোখে পড়ে। কাজটা বড় করতে পারাটাই পুরোযায়ীর (pioneer শব্দের রবীন্দ্রনাথকৃত প্রতিশব্দ) কৃতিত্ব। দুটো একটা বাদ পড়া কোনো দোষের নেই। বস্তুত জ্ঞানের সীমা বিস্তারিত হয় এইভাবে। রবীন্দ্রনাথ তালিকাটি করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তালিকাধৃত শব্দগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করে এই ধরনের শব্দের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

> ...বাংলা ভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।
>
> যে-সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি। এরূপ ভিন্ন জাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাষা বিপর্যয়ের উদাহরণ কেবল বাংলায় নহে, সর্বত্রই পাওয়া যায়।...
>
> কিন্তু আমাদের তালিকাধৃত শব্দগুলি সে শ্রেণীর নহে। তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত। সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে তাহারা রীতিমতো সৈন্য নহে অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে ইহারাও বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভরতি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাংলা ভাষায় বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।
>
> পূর্বেই আভাস দিয়াছি, বাংলা ভাষায় সকল প্রকার ইন্দ্রিয় বোধই অধিকাংশ স্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।...
>
> ...সাঁ করিয়া গেল, এবং গট গট করিয়া গেল উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে; অথচ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির অন্তর শক্তি অর্থাৎ প্রতীকীভাবটাই রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল খুব বেশি। তার কারণ বোঝাও মোটেই শক্ত নয়। শব্দগুলি কবির কল্পনাকে বোধ করি উদ্দীপ্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ধ্বন্যাত্মক শব্দের ধ্বনিগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের প্রত্যেকটির প্রতীক-দ্যোতকতা নির্দেশ করেননি; তবে ব্যাপারটা তাঁর নজর এড়িয়েও যায়নি। তিনি লিখেছেন :

> অবস্থা বিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে; ধপ করিয়া যে লোক পড়ে তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিস কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিস কচাৎ করিয়া কাটে।

প্রবন্ধের উপসংহারে কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলেছেন :

> আমার তালিকা অকারাদি বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সময়াভাববশত সেই সহজ পথ লইয়াছি। উচিত ছিল চলন কর্তন পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা। তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত, কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কী না। ঐক্য থাকাই সম্ভব। ছেদন বোধক শব্দগুলি চ কারান্ত অথবা ট কারান্ত; কচ এবং কট—তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন কচ, এবং গুরু অস্ত্রে কট। এই পর্যায়ের সকল শব্দই ক বর্গের মধ্যে সমাপ্ত; ক্যাঁচ, খ্যাঁচ, গ্যাঁচ, ঘ্যাঁচ।

এই প্রসঙ্গে 'বাংলা শব্দদ্বৈত', প্রকাশকাল তের শ সাত সাল, আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লেখার উৎসাহ পান ব্রুগমানের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ পড়ে।

> ব্রুগ্‌মান তাঁহার ইন্ডোজর্মানীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণে লিখিতেছেন, একই শব্দকে দুই বা ততোধিকবার বহুলীকরণ দ্বারা পুনর্বৃত্তি (repetition), দীর্ঘকালবর্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইন্ডোজর্মানীয় ভাষার অভিব্যক্তিদশায় পদে পদে এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রমাণ পাওয়া যায়।
>
> * * *
>
> যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্যভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

রূপতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রকাশিত হয় তের শ ছয় সালের বৈশাখ মাসে। প্রবন্ধটি লেখার একটি ইতিহাস আছে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'উপসর্গের অর্থবিচার' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী সেই প্রবন্ধের ওপর একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখন। প্রবন্ধের নাম, উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি ঐ সমালোচনার সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি পড়লে বোঝা যায় যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কাঠামো সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কী আশ্চর্য রকমের স্বচ্ছ ছিল। এই প্রবন্ধে তিনি নতুন কথা কিছু বলেননি, তবে যে বিশ্লেষণরীতি, যুক্তি পরম্পরা আর উদাহরণ দিয়ে তিনি নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন তা পড়লে পাঠক আমার বক্তব্যের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারবেন।

বাংলা রূপতত্ত্বের ওপর রবীন্দ্রনাথের অসামান্য মৌলিক প্রবন্ধ 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়'। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তের শ আট সালে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের প্রথমেই বাংলার নিজস্ব কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন :

> বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকৃত বাংলা ও কোন্‌গুলি সংস্কৃত তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, একথা মানি না। সংস্কৃত ইন্‌ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন হয় না। বাংলা অন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন কিন্তু তাহা শতৃ প্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া একবচনে জিয়ন্ত ফুটন্ত ইত্যাদি রূপ ধারণ করিতে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না।

মুখবন্ধের পর রবীন্দ্রনাথ বাংলার নিজস্ব প্রত্যয়গুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত তালিকায় মোট বাষট্টিটি প্রত্যয় আছে। বাংলা প্রত্যয়গুলিকে সনাক্তকরণের কাজ শুরু করেছিলেন রামমোহন রায় তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণে। কিন্তু সে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা ভাষার প্রত্যয় নিয়ে এত ব্যাপকভাবে আলোচনা কেউ করেননি। বাংলা ব্যাকরণের এই বিভাগটিরও তিনি পথিকৃৎ।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সমালোচনা করেছিলেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। সে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল অগ্রহায়ণের ভারতী পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ সেই সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন 'বাংলা

ব্যাকরণ' প্রবন্ধে সে কথা আগে উল্লেখ করেছি। তবে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার সুফলও ফলেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার অষ্টম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায়। পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় ব্যোমকেশ মুস্তফী ঐ বিষয়ে আলোচনা করে একটি অতিরিক্ত প্রত্যয় তালিকা প্রকাশ করেছিলেন।

রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'বাংলা ব্যকরণে তির্যকরূপ', প্রকাশিত হয়েছিল তের শ আঠারো সালে। প্রবন্ধটি একটু স্বতন্ত্র চরিত্রের। এই প্রবন্ধের পটভূমি খানিকটা তুলনামূলক ব্যাকরণ আশ্রিত এবং প্রবন্ধটি রূপতত্ত্বের সীমারেখা ছাড়িয়ে পরিধির স্তরকেও স্পর্শ করেছে। তির্যকরূপ শব্দটি রবীন্দ্রনাথ oblique form-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি নতুন পরিভাষার প্রচলন করেছিলেন। সেগুলির কথায় পরে আসব। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন বাংলায় কোন পরিবেশে তির্যকরূপ ব্যবহৃত হয়, আর কোথায় হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> সামান্য বিশেষ্যপদ যখন জীববাচক হয় প্রায় তখনই তাহা তির্যকরূপ গ্রহণ করে। কখনো বলি না, 'গাছে নড়ে' বলি 'গাছ নড়ে'। কিন্তু 'বানরে লাফায়' বলিয়া থাকি। কেবল কর্তৃকারকেই এই শ্রেণীর তির্যকরূপের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু তাহার বিশেষ নিয়ম আছে।

কারণ নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে 'সকর্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্য বিশেষ্য-পদ কর্তৃকারকে তির্যকরূপ ধারণ করে।' কিন্তু তার পরেই তিনি দেখিয়েছেন যে এ নিয়মটি কার্যকর নয়। কেননা 'বানরে লাফায়' এই বাক্যে তির্যকরূপ ব্যবহৃত হয়েছে বটে কিন্তু ক্রিয়াটি অকর্মক। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ সকর্মক-অকর্মক ছাড়াও আর একটি শ্রেণী বিভাগে বাংলা ক্রিয়া ভাগ করতে চেয়েছেন—সচেষ্টক এবং অচেষ্টক। সচেষ্টক ক্রিয়া যুক্তবাক্যে জীববাচক সামান্য বিশেষ্যপদ কর্তৃকারকে তির্যকরূপ গ্রহণ করবে। ক্রিয়া অচেষ্টক হলে তির্যকরূপ গ্রহণ করতেও পারে নাও পারে। যেমন, 'প্লেগে স্ত্রীলোকেই অধিক মরে' এই বাক্যটিতে অচেষ্টক ক্রিয়ার সঙ্গে তির্যকরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধের অপরাংশে তির্যকরূপের প্রয়োগ সংক্রান্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তের শ আঠারো সালে রবীন্দ্রনাথ আরো চারটি প্রবন্ধ রচনা করেন—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসে। এর মধ্যে দুটি প্রবন্ধে বাংলা নির্দেশক প্রত্যয়—টি ও টা, খানি ও খানা, গাছা ও গাছি এবং টুকু—সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধটির বিষয় বাংলা বহুবচন। শেষ প্রবন্ধটিতে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ গঠনের পদ্ধতিই আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি উল্লেখযোগ্য নতুন কথা শুনিয়েছেন :

> বাংলায় বৃহত্ব অর্থে আ ও ক্ষুদ্রত্ব অর্থে ই প্রত্যয় প্রয়োগ হইয়া থাকে, অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহাদিগকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।
>
> রসা রসি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, বড়া বড়ি,...
>
> কোনো কোনো স্থলে এই প্রকার রূপান্তরে কেবল ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব ভেদ বুঝায় না একেবারে দ্রব্য ভেদ বুঝায়। যথা, কোঁড়া (বাঁশের) কুঁড়ি (ফুলের), জাঁতা জাঁতি, বাটা (পানের) বাটি।

তের শ আঠারো সালের পর রবীন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আর একটি নিবন্ধ রচনা করেন; বাংলা ভাষা পরিচয়। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় তের শ পঁয়তাল্লিশ সালে। দুটি বইয়ের মধ্যে দীর্ঘ সাতাশ বছরের ব্যবধান। বাংলা ভাষা পরিচয় মূলত ভাষ্য জাতীয় রচনা। বাংলা ভাষার গতি প্রকৃতি

আলোচনা করতে করতে পাঠককে চোখের সামনে যা যা দ্রষ্টব্য জিনিস সেগুলিকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। লেখক কোনো সমস্যারই গভীরে প্রবেশ করছেন না, পাঠককে সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন। আলোচনার সূত্রে সাধুভাষা চলিত ভাষার কথাও এসেছে। এই পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথ ধ্বনি, শব্দ ছাড়াও ভাষার অতিরিক্ত একটি মাত্রার কথা বলেছেন, সেটা হল—ভঙ্গি।

দুটি বইয়ের রচনাশৈলীতেও পার্থক্য আছে। শব্দতত্ত্ব মূলত গবেষণাধর্মী লেখা। এর একাধিক প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গদ্যভঙ্গি এই ধরনের লেখার উপযুক্ত। বাংলা ভাষা পরিচয়ের গদ্য অনেক লঘু। তবে শব্দতত্ত্ব বইয়ে লঘু শৈলীর ব্যবহার দেখি যখন রবীন্দ্রনাথ কোনো সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। একটা উদাহরণ দিই। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে লিখেছিলেন :

> রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন 'থ্যাঁলো মাংস'—এই থ্যাঁলোটা কী। অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বলিতে পারিলেন না।...

রবীন্দ্রনাথের উত্তর : পণ্ডিত মহাশয়ের যে এত প্রচুর শ্রম ও দুঃখের কারণ হইয়াছি, ইহাতে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

ছয়

রবীন্দ্রনাথ শব্দতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন ইংরেজির আঠারো শ পঁচাশি সালে। ভাষাতত্ত্ববিষয়ক শেষ রচনা ইংরেজির উনিশ শ আটত্রিশ সালে। দুটি লেখার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অর্ধশতাব্দীরও বেশি। এই অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বিরাট গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ছাত্র শ্রীসুকুমার সেনের একাধিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন শুরু করেন তখন জমি প্রস্তুত করার সময়। পুরোযায়ী হিসেবে তাঁকে অনেক কিছু করে নিতে হয়েছিল। তাঁকে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ তৈরি করে নিতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট পরিভাষার মধ্যে 'তির্যকরূপে' পরবর্তীকালে গৃহীত হয়েছে। যে সব পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার একটা তালিকা দেওয়া হল :

১। অপভ্রংশ (ধ্বনিতাত্ত্বিক বিকৃতি অর্থে) ২। প্রাকৃত (চলিত অর্থে) ৩। অনুযোজনা (suffixation অর্থে) ৪। নৈমিত্তিক ক্রিয়া (নিজন্ত ক্রিয়ার পরিবর্তে) ৫। সচেষ্টক ও অচেষ্টক ক্রিয়া (এর সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে)।

রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন যে তিনি ব্যাকরণিয়া নন। তবে শব্দতত্ত্বে তাঁর উৎসাহ বরাবর-ই জাগরূক ছিল। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে তাঁর বোধ ছিল অভ্রান্ত। তার উল্লেখ আগেই করেছি। এখানে যে দুটি কথা বলতে চাই সে দুটির প্রথমটি হল যে তিনি বাংলা ভাষার কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলা ভাষার বিশেষত্বগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাষাতাত্ত্বিকদের সেই বিষয়ে গবেষণা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় কথাটি কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ।

ইউরোপে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার শুরু হয়েছিল ইউরোপে সংস্কৃতানুশীলন শুরু হবার পর থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটালেন দুই জার্মান পণ্ডিত কার্ল ব্রুগমান এবং হেরমান অসটফ। এঁরা দুজনেই লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ছিলেন। ভাষাতত্ত্বে এঁরা যে পরিবর্তন আনলেন তার জন্যে এদের নামকরণ হয়েছিল নব্যব্যাকরণিয়ার দল (junggrammatiker)। নব্যব্যাকরণিয়াদের নতুন বক্তব্যের একটি হল যে কোনো ভাষায় যদি কোনো ধ্বনি পরিবর্তন হয় তো সেই পরিবর্তন ব্যতিক্রমহীন (ausnahmslose Lantge setze)। অর্থাৎ ধ্বনি পরিবর্তন নিয়মাধীন। যদি কোনো আপাত ব্যতিক্রম দেখা যায় তার কারণও পাওয়া সম্ভব। সাদৃশ্য (Analogy)-জনিত পরিবর্তন-ই এর কারণ। তাঁরা আরও বলেছেন ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় উপভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নব্যব্যাকরণিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য বিস্ময়কর। আমার এক এক সময় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ হয়তো বা Morphologische Untersechungen পড়ে থাকবেন। তবে তা নানা কারণেই অসম্ভব। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি কাব্যচর্চার পাট শিকেয় তুলে ব্যাকরণচর্চায় মন দিতেন তবে আড়াই হাজার বছরের ব্যবধানে আমরা শালাতুর গ্রামের ব্যাকরণিয়ার যোগ্য উত্তরাধিকারীকে পেতুম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এই দিকটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর দি অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ বইয়ের ভূমিকায়। উৎসাহী পাঠককে সে অংশটি পড়ে নিতে অনুরোধ করি।

সাত

প্রবন্ধের শেষে একটি পরিশিষ্ট যোগ করতে চাই। ভাষাতত্ত্বে উৎসাহ থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের Sprachgefühl যে কত তীক্ষ্ণ হয়েছিল তার দু-একটি অন্যতর উদাহরণ না দিলে আমার ধারণায় আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পাঠক, আপনি চণ্ডালিকা গীতিনাট্যের প্রকৃতির মায়ের গানগুলি স্মরণ করুন। গানের মধ্যে নিটোল গদ্যের লাইন কী অনায়াসে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো,
তোর আঙিনা হয়নি যে নিকোনো।
তোলা হল না জল, পাড়া হল না ফল।
কখন্ বা চুলো তুই ধরাবি।
কখন্ ছাগল তুই চরাবি।

এই ধরনের আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। আর একটি ভাল উদাহরণ তাঁর প্রথম জন্মদিনের গানটি যার সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার সেন বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৯৩)-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ তো গেল এক ধরনের ব্যাপার। ভাষাতত্ত্বে তাঁর সাবলীল অধিকারের ফলে তিনি কত অক্লেশে কত আশ্চর্য শব্দ তৈরি করেছেন, ভাষাতত্ত্বের পরিভাষাকে কী নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তিনি মংপুর স্ত্রীলিঙ্গে মংপবী, অনিলের স্ত্রীলিঙ্গে অনিলানী, লাহোরবাসিনী এই অর্থে লাহোরিণী ব্যবহার করেছেন অক্লেশে। গল্পে ব্যবহার করেছেন আনুকৌলব। খাপছাড়ায় নড়িষ্ঠকে মিলিয়েছেন গরিষ্ঠের সঙ্গে।

পরিশেষে প্রজাপতির নির্বন্ধ থেকে একটি পংক্তি উদ্ধার করতে চাই। শৈলবালা যখন পুরুষবেশে চিরকুমার সভার সভ্য হতে চলেছে তখন রসিকের উক্তি :

কিন্তু ভাই শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণচর্চা সার্থক।

পুঁথির বানান, পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা এবং রবীন্দ্রনাথ

করুণাসিন্ধু দাস

১

মুখের বাণী লেখায় রেখায় ভর দিয়ে রক্ষা করতে গেলে লেখক-লিপিকরদের নানা সমস্যা সব দেশে সব কালে। যেমনটা বলি, তেমনটা লিখে ফেলার পর্যাপ্ত লিপি-বাহন ভাষার প্রায়শ থাকে না। উপরন্তু কালের ব্যবধানে মুখের ভাষায় বদল হতে থাকলে পুরোনো লিখিত রূপের পরিচয় সংস্কার তা মেনে নিতে সবসময় প্রস্তুত থাকে না। অন্য ভাষা থেকে সংগ্রহ করা ঋণ-শব্দ নিয়ে সমস্যাটা বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। উত্তমর্ণের মান রাখতে লেখ্যরূপ যতদূর সম্ভব অবিকৃত থাকলেও মুখের কথায় দেশীয় ধ্বনিবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকার বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বাংলায় তথাকথিত তৎসম সংস্কৃত শব্দগুলো লেখ্যরূপে স্বে মহিম্নি বিরাজ করলেও উচ্চারণে কতদূর সরে গেছে তা পরখ করার জন্য দুই বাংলার বাঙালীর কণ্ঠে সংস্কৃত পাঠ লক্ষ করতে বলি। দুই ব-কার একাকার গণ্য করার ঐতিহ্য এখানে কয়েকশ বছরের। দুই ন-কার, তিন শ-কারও ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করেছে অনেককাল। লেখার রূপে তবু এরা সব কটি থেকে গেছে বলে অনেক সময় সাহসী কলমে একে অপরের স্থানে দখল নেয় স্বচ্ছন্দে। বাঙালির সংস্কৃত লেখা প্রাচীন প্রয়োগসিদ্ধ ব্যাকরণসম্মত বিকল্প-বিধানের সুযোগ নিয়েছে অকাতরে, লোকভাষার তাগিদে নিয়মরেখা ছাড়িয়ে আরও প্রসারিত করে নিয়েছে ব্যবহারের সীমা। ভরতমল্লিকের 'সুখলেখন' গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের চিরায়ত লেখ্যরূপের এমন ব্যতিক্রমের বহু নমুনা-সমীক্ষা চোখে পড়ে। বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ঋণ-শব্দ উচ্চারণানুগ বানানে লেখার ছাড়পত্র এখানে স্পষ্ট। বাংলা পুঁথির লেখক-লিপিকরদের হাতে তৎসম, তদ্ভব, দেশি সবরকম শব্দ তাদের স্থানিক কালিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লেখ্যরূপ পেয়ে আসছে কয়েক শতাব্দী জুড়ে, এটা কম গৌরবের কথা নয়। মান্যরূপ রক্ষার শুদ্ধাচার তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলে থাক। অডিও রেকর্ড প্রযুক্তি উদ্‌ভাবনের সুযোগে এখন যা সম্ভব, বহু শতাব্দী আগে থেকে ভাষার রূপ-রূপান্তর-বিবর্তনের প্রত্যক্ষ নজির লিপিবদ্ধ রাখার গুণে পুঁথির লিখন ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনের মুখ্য উপকরণ। লিপির ক্রমবিকাশ পর্যালোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়ও এতেই নিহিত।

পুঁথির বানান মুদ্রিত গ্রন্থপাঠে অভ্যস্ত চোখে অদ্ভুত, বিশৃঙ্খল ও পীড়াদায়ক মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্পর্ধার বশে এইসব 'ভুল' সংশোধনের উৎসাহ প্রকাশ করাও সম্ভব। সম্পাদকের এমন ভাষা-সংরক্ষণী ভূমিকা কিন্তু কোন শুভবুদ্ধিতে সমর্থনযোগ্য নয়। এমনিতেই প্রতিলিপি করার সময় কালের ব্যবধান ও অন্যান্য কারণে মূল পুঁথির কিছু বিকৃতি ঘটে যেতে পারে। একই গ্রন্থের অনেক পুঁথি মিললে এইজন্য তাদের লিপিকাল বুঝে পূর্বাপর কালক্রম চিহ্নিত করে মূলপাঠ নির্ণয়ে উদ্যোগী হতে হয়। কোন পাঠকেই তুচ্ছ ও হেয় ভাববার জো নেই, কেননা দেশকালের চিহ্ন বহন

করছে তা। আগামী দিনে আরও কোনো পুঁথি মিললে তার আলোকে পাঠনির্ণয় নতুন মাত্রা পেতে পারে। এইজন্য চূড়ান্ত নির্ণয় করে ফেলেছি, এমন আত্মশ্লাঘা পুঁথি-সম্পাদকের মানায় না। কার্যকর সিদ্ধান্তে আসার জন্য অতএব উদার পন্থা গ্রাহ্য। তা হল একটি পুঁথিকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য চিহ্নিত করে সেই পাঠ আপাতত মূল গ্রন্থকলেবর হিসেবে গণ্য করা এবং অন্যান্য পুঁথিতে লভ্য পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় সন্নিবেশ করা। বানান সমস্যাও যে তাতে মিটবে না, তা বলা বাহুল্য। সম্পাদক কি পুঁথির বানান বদলে আধুনিক প্রচলিত বানানে সম্পাদিত পাঠ সন্নিবেশ করবেন? সেক্ষেত্রে পুঁথির বানান কোথায় যাবে? সব কয়টি পুঁথির সব কয়টি বানান বৈচিত্র্য, পাঠান্তর পাদটীকার পরিসরে কীভাবে স্থান পাবে? এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছেই। ভারতের মতো বাংলাদেশেও তা প্রসারিত। সম্প্রতি সম্পাদকেরা এক দিকে সম্পাদিত আধুনিক পাঠ রেখে পাশের সারণীতে অবিকৃত বানানে নির্ধারিত পুঁথির পাঠ ও বানান সন্নিবেশ করে একটি গ্রাহ্য মডেল উপস্থিত করেছেন। এটি সুবিবেচনা ও সমর্থন দাবি করছে আমাদের।

২

পুঁথিচর্চায় রবীন্দ্রনাথের আয়োজন ও দিগ্‌দর্শন সকলের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগায়। ‘সাধনা’ (মাঘ, ১২৯৮) পত্রিকায় ‘প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার’ প্রবন্ধ লেখার পর্ব থেকে বিশেষভাবে পুঁথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা সবেতেই তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ও নেতৃত্ব ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিশ্বভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার সুফল আজও ভোগ করছে। পুঁথি সংগ্রহের জন্য Behar Herald পত্রিকায় (১৯/২/১৯২৩) স্বাক্ষরিত আবেদন প্রচার করে তিনি জানিয়েছিলেন—‘Realising the urgent necessity of preserving old manuscripts of Sanskrit and Vernacular literature from destruction and disappearance from India, Viswa-Bharati has undertaken to collect edit and utilise them for public benefit... any old manuscripts sent to us that have a literary or historical importance will be gratefully received by our institution and preserved in Viswa Bharati library in Santiniketan with care. পুঁথি অনুশীলনকে তিনি বিদ্যাচর্চার অন্যতম রাজমার্গ গণ্য করতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র পুঁথি অনুসন্ধানী ভূমিকা তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। প্রাচীন সাহিত্যের আগ্রহী পাঠক হিসেবে পুঁথির গৌরব তিনি মানতেন। তার অবিকৃত রূপ সংরক্ষণ কতদূর আবশ্যক, তা নিয়ে কোন দ্বিধা তিনি প্রশ্রয় দেননি। দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’-এর আলোচনা প্রসঙ্গে ‘ভারতী’ (১৩০৫) পত্রিকায় তিনি লেখেন—

> ‘বাংলা ভাষাতত্ত্ব সন্ধানের একটি ব্যাঘাত প্রাচীন পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা। কবিকঙ্কন চণ্ডী .... প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলি অল্পে অল্পে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন আদর্শ পুঁথি কোন এক পুস্তকালয়ে যথাসম্ভব সংগৃহীত থাকিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সুবিধার বিষয় হয়।’

এরপর ১৩১৩ বঙ্গাব্দে বরিশাল সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বিষয়টি তিনি আরও স্পষ্ট করেন। [বঙ্গীয় সাহিত্য] ‘পরিষৎ স্বদেশের ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্যকথা .... সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের হিতসাধনের ইহাই ভিত্তিস্থাপন। ... প্রাচীন পুঁথি পুরালিপি প্রাচীন মুদ্রা ... সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে।’ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কাশীতে অনুষ্ঠিত উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণে (৬/৩/১৯২৩) একই বিষয়ে সমবেত

সাহিত্যপ্রেমীদের তিনি জানান—'এ দেশে যে সব বহুমূল্য পুঁথি আছে তা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আমি জানি, একজন জাপানি পুরোহিত নেপাল থেকে তিন-চার সিন্ধুক বোঝাই করে মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র চালান করে দিয়েছেন। এজন্য সংগ্রহকারকে দোষ দেব কী করে। যারা চেয়েছিল তারা পেয়েছে, যারা চায়নি তারা হারালো, এই ত সঙ্গত। কিন্তু এই বেলা সতর্ক হতে হবে। প্রাচীন পুঁথিসংগ্রহ এবং রক্ষা করবার একটি প্রশস্ত স্থান হচ্ছে কাশী। এখানকার বঙ্গসাহিত্য পরিষদের সভ্যেরা এই কাজকে নিজের কাজ বলে গণ্য করবেন, এই আমি আশা করি।' শুধু সংগ্রহ নয়, পুঁথি অনুশীলনের মার্গদর্শনও করেছেন তিনি। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৫, তৃতীয় সংখ্যায় চণ্ডীদাসের নূতন পদাবলী সম্পাদনাকে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে 'ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৩০৫ সংখ্যায় 'সাময়িক সাহিত্য' শিরোনামে তাঁর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—'সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন গ্রন্থসকলের যে সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। .... আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।' 'ছাপাখানা চলন হবার পরে প্রাচীন গ্রন্থের ওপর দিয়ে যে শুদ্ধির প্রক্রিয়া চলে এসেছে সেটা বাঁচিয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ' প্রায় দুষ্কর মনে হয়েছিল কবির। 'এককালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলুম।' তার অনাস্বাদিতপূর্ব ভাষা-রসের ভাণ্ডারে আধুনিক সম্পাদকের সংশোধনদণ্ডের খোঁচা ও স্থূলহস্তাবলেপ শিরসি মা লিখ এই তাঁর প্রত্যাশা। বানান বিতর্কে সোৎসাহ যোগদান শুধু নয়, সিদ্ধান্ত স্থাপনেও অংশ নিয়েছেন তিনি এই কথা মনে রেখে। মূলত তদ্ভব শব্দের বানান নিয়েই এই মীমাংসার জোর পড়েছে, দেখা যায়। 'বাংলা বানান' প্রবন্ধে (১৩২৩) তাঁর মন্তব্য : 'প্রাকৃত ও পালি, বানানের দ্বারা নির্ভয়ে নিজের শব্দেরই পরিচয় দিয়াছে, পূর্বপুরুষের শব্দতত্ত্বের নয়। কেননা বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন করিতে পারে, হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়।' স্বাধীন যদৃচ্ছাচারের ডামাডোলে বানানোর মান্যপথ নির্ণয়ের জন্য পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তিনি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তা প্রধানত এই তদ্ভব শব্দ প্রসঙ্গে হলেও বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ তাতে একেবারে বাদ পড়েনি। তাঁর নিজের পক্ষপাত বরাবর ছিল ধ্বনি-অনুযায়ী বানানের অনুকূলে। বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮ সংখ্যায় মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট অভিমত : 'যে-সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃতভাষায় বানান ইহার উদাহরণস্থল। জোড়া, জোয়ান, জাঁতা কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি, অথচ অন্য অনেকস্থলে করি নাই।' অনেক বছর পর রাজশেখর বসুকে লেখা একটি পত্রে (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১) বিষয়টি আরও একবার উল্লেখ করে তিনি লিখছেন—'অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব।'

তৎসম শব্দ নিয়েও ভাববার অবকাশ আছে বৈকি। 'ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ ... ধ্বনিরূপ বদলে সে হয়েছে মোন্।' (রাজশেখর

বসুকে লেখা পূর্বোক্ত পত্র)। বাংলা পুঁথির বানানের অনন্যতা এখানেই যে তৎসম শব্দগুলিও সেখানে ধ্বনি অনুযায়ী বর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে আদি সংস্কৃত রূপের স্মৃতি নস্যাৎ করে দিয়ে। 'বাংলা ভাষায় ষত্বণত্ব বৈচিত্র্য ধ্বনির মধ্যে নেই বললেই হয়। সেই কারণে প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুঁথিতে লোকভাষা লেখবার সময় হ্রস্বদীর্ঘ ও যত্বণত্বকে সরল করে এনেছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল না পাছে সেজন্য তাঁদের কেউ মূর্খ অপবাদ দেয়।' (পূর্বোক্ত পত্র)। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে কবিসার্বভৌম উপাধি গ্রহণ করে (কার্তিক, ১৩৩৮) কবি তাঁর অভিভাষণে একইভাবে বলেছেন—'আমি সেকালের পণ্ডিতদের বাংলায় লেখা অনেক পুরানো পুঁথি দেখেছি, তার বানান তাঁরা বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত জেনেই করেছিলেন। তাঁদের যত্বণত্ব জ্ঞান ছিল না, একথা বলা চলে না।'

৩

'প্রাচীন বাঙালি বানান সম্পর্কে নির্ভীক ছিলেন, পুরানো বাংলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়' ('বাংলা বানান', ১৩২৩) এই বাক্য মনে রেখে অতঃপর পুঁথির বানানের কিছু নমুনা উপস্থিত করা যেতে পারে। যদুনন্দন দাসের 'উজ্জ্বলকিরণ' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুঁথি সংখ্যা ২১সি, ১১৬০), বৈষ্ণববন্দনা ও বিদগ্ধমাধব, নৃসিংহদাসের হংসদূত, মুকুন্দদাসের আত্মবিবরণ ইত্যাদি (বিশ্বভারতী লিপিকা পুঁথিশালায় রক্ষিত) পুঁথি থেকে এগুলি সংকলিত।

ক. উচ্চারণের স্বার্থে য-মাত্রই জ দিয়ে লিখিত। যেমন, জদু, জবে, জার, জেই, সংজুত, জায়ে, জখন, জারা, জত্নে, জত, জায়, জাতনা, জন্ত্রণা, জেই জন, জাহার জেবা, জথাদিষ্টং, জাহে সোল কলা, জদি না মারে, জুধিষ্ঠির, জৌবন।

খ. শ/ষ/স নির্বিচারে ব্যবহৃত। যেমন, কৃস, সঠ, সয্যা, স্যামলা, বিসাখা, সোভা, উৎকর্শ, বিসেষ, বিস্বাষ, হর্শ, উদাশীন, পর্শ, প্রদর্সন, বংসী, ইসত (= ঈষত্), স্পর্স, সঙ্কা, পসু, যুন/সুন (= শুন), আশি (= আসি), সয়ন, বষতী (= বসতি), যুনিয়া (= শুনিয়া), নৃশীংহ (= নৃসিংহ), সিব, প্রশাদ, সিথিল, ষকল, উল্লাশ, যুনে পুন্যবান, কৃষ্ণদাষ, কির্ত্তিবাশ।

গ. হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ লুপ্ত। যেমন, ভিম, ধির, নিল, দুর, বিজ, বীক্ষাত (= বিখ্যাত), ক্রিড়া, জীহ্বা, মহিসি, গাম্ভির্য্য, নির, জিবন, পরকিয়া, দিপ্তি, তিক্ষন, উৎকীন্তিতা।

ঘ. স্বরান্তর। যেমন, পরক্ষ, প্রথিবি, প্রথিবী, প্রিয়সি (= প্রেয়সী), মিত্যু (= মৃত্যু), ত্রিতিয়, হিদয়, নরত্তম, বেক্ত, ললীত, প্রথকেতে, ক্ষেমা, বোন (= বন), শশোধর, কোটীল্য, যোবন, সমিদ্ধি।

ঙ. অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ ভেদ লুপ্ত। যেমন, বিপ্রলম্ব, সম্বন্ন, কোস্তব (= কৌস্তভ), কনিষ্টা, প্রস্তাপ, অবস্তা, যতেশ্বরি (= যূথেশ্বরী), ক্ষোব (= ক্ষোভ), সভে (= সবে)।

চ. অশৈষ্টুতা, বৈষ্টব, দুষ্খে, অতিসহীষ্টুতা।

ছ. মালিন্যতা, মাধুর্যতা, বৈশিষ্টতা।

জ. পাশাপাশি দুটি স্বর। ধুমাইতা, নাইকা (= নায়িকা), যদিঅতা (= যদিয়তা), তদিঅতা (= তদীয়তা), তোমাঅ, সইঞ্চতা, স্থাই।

ঝ. জীভ্বা, বিভ্বল।

ঞ. যতি (= অতি), যভিলাষ (= অভিলাষ)।

ট. ডেড় (= দেড়), আষাড়।

ঠ. সংখেপ, বীক্ষাত (= বিখ্যাত)।

ড. মুচ্ছা, ইত্সা (= ইচ্ছা)।

ঢ. আহাজ্য (= আহার্য), ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৫) প্রত্যাশা করেছিলেন—'অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসঙ্কোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।' পুঁথির বানানে লেখক-লিপিকরদের সত্যসন্ধ উচ্চারণ-অনুগামী ভূমিকা, সংকোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে সঙ্কটমোচনের সাহসী পদক্ষেপগুলি একালের উন্নাসিক সম্পাদনার কটাক্ষপাতে যেন সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট না হয়। 'বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি অনুসারী করব এমন সাহস আমার নেই' বলে বিনয় প্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথই এক্ষেত্রে অভয়মন্ত্রের সন্ধানে আমাদের পুরোনো বাংলার লেখভাণ্ডার চিনিয়ে দেন, যে 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' অপেক্ষা করছে পুঁথি সন্ধানী জিজ্ঞাসু সহৃদয় পাঠকের জন্য। 'সাধনা'-র পাতায় ত্রিশ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন—'আমাদের দেশেও কি অনেক প্রাচীন পুঁথি নানা গোপন স্থানে পুনরাবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া নাই? ... বিদেশীরা পুঁথিরাশির মধ্য হইতে আমাদের লুপ্তশাস্ত্র উদ্ধার করিতেছে এবং সেইগুলিই অলসভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া আমরা মনে করিতেছি পৃথিবীতে আমাদের তুলনা কেবল আমরাই।' তিন দশক পর কাশীতে সভাপতির ভাষণে (১৯২৩) একইভাবে আকুল আহ্বান ছিল তাঁর—'আমাদের দেশের অতীতের লুপ্তপ্রায় সমস্ত কীর্তির যথাসম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যেন করি ... নিজেদের চিত্তকে সাধনার বৃহৎ ক্ষেত্রে জাগরূক রাখবার জন্য।' সাড়া দেবার দায় আমাদের অতএব ফুরোবে না।

তথ্যসূত্র ঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশমখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রকাশ মার্চ ১৯৮৯

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত অপ্রকাশিত পুঁথি নং ২১সি এবং ১১৬০

৩. বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন থেকে প্রকাশিতব্য বাংলা পুঁথি পরিচয়, সপ্তম খণ্ড-এর খসড়া।

৪. অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ সম্পাদিত পদ্মাপুরাণ (১৯৯৩) ও সংগ্রামহুসন (২০০২)।

ক. বানাননীতি ও মূলনীতিসঞ্চালন, বাংলা পাণ্ডুলিপি সমীক্ষা, পৃ. ৮৭-১১১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, প্রথম পুনর্মুদ্রণ জুন ১৯৯৪

খ. পুরোনো বাংলা পাণ্ডুলিপির বানান, প্রবন্ধ সমুচ্চয়, পৃ. ৪৯-৬১, জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

৫. অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার : রবীন্দ্র উদ্যাগ, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ১৩৯৯

আধুনিক ভারত-সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

বীতশোক ভট্টাচার্য

উনিশ শতকের রুশ বুদ্ধিজীবী স্যার আইসাআ বার্লিনের আলোচনার এক বিষয় ছিল। তার মধ্যে তলস্তয়ের প্রসঙ্গও এসেছিল। ইতিহাসের দর্শনের দিক থেকে তলস্তয়ের একান্তবাদ ও অনেকান্তবাদের দ্বন্দ্ব বোঝাতে তিনি শেয়াল ও শজারু নামের এক পুরনো গ্রিক গল্পের নীতির উল্লেখ করেছিলেন। কেউ কেউ সব কিছুকে একটা কেন্দ্রীয় দর্শনের আওতায় নিয়ে আসতে চায়। কমবেশি সংসক্ত বা গ্রন্থিত একটা তন্ত্র গড়ে তোলে। সামান্য ও সাংগঠনিক ঐ একমাত্র সূত্রের নির্ভরে তাদের অস্তিত্ব ও উচ্চারণ তাৎপর্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে ভাবে। এরা হল শজারুপন্থী। আর কেউ কেউ আছে যারা অনেক লক্ষ্যের সন্ধানী। তাদের অন্বেষণসূত্রের প্রান্তগুলো অসম্পর্কিত এমনকী পরস্পরবিরোধী। যদি কোনও এক সংশ্লেষে সেগুলো বাস্তবে সমন্বিত করতে হয় তবে সংহতির মূল খুঁজতে হয় তাদের মনস্তত্ত্বে ও শারীরিকতায়। কোনও নীতিক বা নান্দনিক সূত্রে সেগুলো বিজড়িত হতে পারে না। এরা হল শেয়ালপন্থী। শেয়াল অনেক কিছু জানে, শজারুর জানা বলতে একটাই। এই দুই পক্ষের মধ্যে আছে এক অসেতুসাধ্য ব্যবধান। স্যার আইসাআর মতে তলস্তয় আসলে স্বভাবে শেয়ালপন্থী অথচ তিনি নিজেকে শজারুপন্থী বলে ভাবতেন। এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারে। জীবন ও জগৎ বিষয়ে একান্তবাদ ও অনেকান্তবাদের যে আততি এখানে তার ওপর আলো এসে পড়বে।

ইউনেস্কোর কল্পনা রবীন্দ্রভাবনায় ছিল। ইউনেস্কো তিনজন জাতীয় কবিকে ঘিরে বর্ষব্যাপী সারস্বত উৎসব করেছে। এই তিনজন হিস্পানিভাষার কবি পাবলো নেরুদা, পর্তুগিজভাষার কবি ফার্নান্দো পেসোআ আর বাংলাভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এঁদের মধ্যে প্রবীণ। সাপটা হিসেবে স্প্যানিশে কথা বলে ২৮০ মিলিয়ন মানুষ, পর্তুগিজে ১৬০, আর বাংলায় কথা বলে কম করেও ১৫০ মিলিয়ন মানুষ। নেরুদা বোধহয় এঁদের মধ্যে সবথেকে বেশি জনপ্রিয়। পেসোআ পর্তুগিজ ভাষার জাতীয় কবি কামোঞেসের স্থান অধিকার করতে পারবেন না হয়তো, গত চার দশক ধরে তাঁর অজস্র রচনা মূলে ও অনুবাদে সাধারণ পাঠকের কাছে অতি দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। রবীন্দ্ররচনা যেভাবে গৃহীত হতে পারবে এমন আশা করা অন্যায় হবে। এঁরা পাশ্চাত্যের, রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রাচ্যের কিংবা এশিয়ার। রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশের মানুষ, এঁরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। নেরুদার স্থান আন্দোলনের ফেনশীর্ষে, রবীন্দ্রনাথের পথ রাজনীতি থেকে বেঁকে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও পেসোআ উভয়ের দ্বৈভাষিক অস্তিত্ব আছে, ইংরেজিতে রচনা রয়েছে দুজনের। নেরুদা লম্পট, পেসোআ মদ্যপ, রবীন্দ্রনাথ শুচিবায়ুগ্রস্ত। পেসোআ বহুনামিক অথচ আত্মঅবলোপী, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মদিনকে পূজ্য অনুষ্ঠানে রূপ দিতে অনাগ্রহী বলা যাবে না। নেরুদা ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই নোবেল পারিতোষিক পেয়েছেন। অবশ্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া না-পাওয়ায় আর তেমন কিছু এসে যায়

না। এ বছর তলস্তয়ের মৃত্যুশতবার্ষিক উদ্‌যাপিত হচ্ছে, নোবেল পারিতোষিক তলস্তয় পাননি। তলস্তয়ের মৃত্যুর বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এক পল হেইসে, তাঁর বিষয়ে আমরা নামমাত্র জানি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি, এই প্রায় শতবর্ষের পটে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা লিখিত হয়েছে। আর-একটু বড়ো বিস্তারে, উনিশ বিশ ও এই একুশ শতকের সূচনার পৃষ্ঠপটে, তাঁর ভূমিকার প্রকৃত মূল্য অঙ্কিত হতে পারে। কৃষ্টি শব্দের বদলে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি শব্দটি পছন্দ করেছিলেন, তাঁর লেখায় সংস্কৃতি ও সভ্যতা শব্দদুটি স্থান বিনিময় করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্তত পরোক্ষভাবেও রবীন্দ্রনাথ কোনও পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করেননি এমন কথা বলা যাবে না। আর শুধু বাঙালির রুচির বদল নয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ এবং অন্যত্র বঙ্গ-ভাষীয় এবং ভারতবাসীর দৃষ্টিকোণ ও দর্শনের পরিবর্তন ঘটিয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক ভারতসংস্কৃতির রূপরেখায় রবীন্দ্রনাথের আদল কীভাবে কতটুকু ফুটে উঠতে পারল তা এখন ভাবনার কথা।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে কলকাতায়। কলকাতা রাজধানী এবং সাহিত্যধানী। কলকাতা মাদ্রাজ বোম্বাই ভারতের তিন সমুদ্র উপকূলে রবীন্দ্রনাথের জাহাজ ভিড়েছে। দক্ষিণ ভারতে রবীন্দ্রনাথ গৃহীত হয়েছেন সব থেকে কম, দ্রাবিড় বর্গের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও ছিল কম। মধুসূদন দাক্ষিণাত্যকে চিনেছেন ঘনিষ্ঠভাবে, দক্ষিণে বিবেকানন্দের অভিঘাতও লক্ষ করবার মতো। পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখা করে এসেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ নয়, মৌন সাধক অরবিন্দকে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছে। আফগানিস্তান ও নেপাল ব্রিটিশ আওতার বাইরে ছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ এই দুই দেশ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন। ব্রহ্মদেশ ও ভারত উপমহাদেশ তখন ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত। বর্মাকে চিনেছেন শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্ররচনায় সে পরিচয়ের আভাস নেই। ব্রিটিশের আধুনিক উপনিবেশ ভারত, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের উপনিবেশ ছিল দ্বীপময় ভারত। ঔপনিবেশিকতার সেই স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট রচনা ও ভ্রমণকথাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তাও লক্ষ করবার বিষয়। ইন্ডিয়া হল ইস্ট ইন্ডিয়ার অংশ : পাশ্চাত্যিকতার এই সংঘাত রবীন্দ্রভাবনায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে এমন হতে পারে। নতুনত্ব, আধুনিকতা, পশ্চিমি সংস্কৃতি : কলকাতার কেন্দ্রে বসে অন্তত তিন পুরুষের এ উত্তরাধিকারের দায়ভাগ রবীন্দ্রনাথে বর্তেছিল।

রবীন্দ্রনাথের শেষভাষণের বিষয় ছিল রামমোহন রায়। মেট্রোপলিটন মনের অধিকারী রামমোহন, কন্‌টিনেন্টাল কালচারে অভ্যস্ত রামমোহন এবং ব্রাহ্মদের কাছে অগ্রগণ্য সংস্কৃতজ্ঞ রামমোহন : উভযোজী এক সম্পর্কে অন্বিত করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শস্থানীয় রামমোহনের এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। রামমোহনের মৃত্যু হয়েছিল বিলেতে, ভারতপথিক রামমোহন তাঁর সময়কার বেশিরভাগ মানুষের চোখে অভারতীয় থেকে গিয়েছিলেন। রামমোহনের মতোই রবীন্দ্রনাথের ধর্মপ্রাণতা ও দেশপ্রাণতা তাঁর সংস্কৃতির চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের তৈরি ওরিয়েন্টালিজম-এর আবহে রবীন্দ্রনাথকে বড়ো হয়ে উঠতে হয়েছিল; তাঁদের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর কল্পনা এবং ধর্মগোষ্ঠীর ধারণা তাঁর অগোচরে রবীন্দ্রমানস গঠনে সাহায্য করেছে। রামমোহনের বেদান্ত কলেজের পরিকল্পনা ছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কিন্তু বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছিলেন। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশে গতি সঞ্চারিত করল। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনে দর্শন থেকে

ধর্মতত্ত্বকে পৃথক করে দেখতে পেরেছিলেন। এখনও রবীন্দ্রনাথের পাঠক রবীন্দ্রদর্শন ও রবীন্দ্র-ধর্মতত্ত্বকে মিলিয়ে দেখে থাকেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষায়তনকে ইউরোপীয়ান আধুনিক কলেজের আদলে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রাচীন ভারতের তপোবনকে প্রতিস্থাপিত করতে চাইলেন। কল্পনার রোমান্টিক প্রাচীন ভারত আর নৈবেদ্যে-র ক্ল্যাসিকাল ভারত : এ দুয়ের মধ্যে একরকম দোটানা ছিল। প্রাচীন ভারতের জাতিবর্ণের বিধান আধুনিক গুরুকুলের সংবিধিকে কতদূর নিয়ন্ত্রণ করবে—এই টানাপোড়েন আচার্য রবীন্দ্রনাথকে খুব একটা অস্থির করে তুলতে পারেনি। বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের চারিত্রপূজার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের নায়ক চরিত্রের প্রেরণাও হয়তো, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে বিদ্যাসাগরের সত্যস্বরূপ প্রতিফলিত হল না। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মণ্যদর্শন রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি, অথচ ব্রাহ্ম হয়েও সেন্সাস রিপোর্টে তিনি নিজেকে হিন্দুরূপে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের মূলে হিন্দুধর্মের চেয়ে খ্রিস্টানধর্ম বেশি কার্যকর।

রামমোহনের আরবি-ফারসিতে ব্যুৎপত্তির কথা বলা হয়ে থাকে। ঠাকুরবাড়িতে ফারসি চালচলন ব্রিটিশ আভিজাত্যের এক কেতাদুরস্ত বিকল্পরূপে চর্চিত হয়েছিল। কিন্তু ফারসি আর ইসলাম পর্যায় শব্দ নয়। রামমোহনে মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে যে ভাবনা ছিল রবীন্দ্রচেতনায় তার ভগ্নাংশেরও প্রকাশ নেই। বুদ্ধ এবং খৃষ্ট সম্পর্কে তিনি মুখর, মহম্মদ সম্পর্কে মৌন। উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত হিন্দু তরুণদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম এবং আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কতদূর পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে তার প্রতিযোগিতা ছিল। মুসলমান তরুণেরা ছিল সে প্রতিযোগিতার দূরে বাইরে। ব্রাহ্ম গিরিশচন্দ্র বাংলায় কোরান অনুবাদ করেছিলেন, সে কোরান মুসলমান সমাজে রীতিমতো পাঠ্যবস্তু ছিল না। বাংলার মুসলমান সমাজের থেকে রবীন্দ্ররচনার একপ্রকার দূরত্ব থেকে গেল। রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনমূলকতার তত্ত্ব ভারতীয় মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। শান্তিনিকেতনের অমর্ত্য সেন কোরান পড়েছেন, পড়েছেন ইংরেজি অনুবাদেই। অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্সেস-এর ভূমিকায় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, মুসলমানরা যদিও দীর্ঘকাল বাংলায় রাজত্ব করেছে তাহলেও, এমনকী মুসলমান আমলেও, বাংলা সাহিত্যে ইসলামধর্মের তেমন কোনও অভিঘাত লক্ষ্যগোচর হয় না। হয়তো ইসলাম-ধর্ম সম্পর্কে মত প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের সন্তর্পণ সংকোচ ছিল। রাবীন্দ্রিক বাউল ভাবনায় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংশ্লেষের চেতনা চরম রূপ লাভ করতে চেয়েছে। সূফী ধর্ম-দর্শনের হাওয়া খেলত ঠাকুরবাড়ির আবহে, শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহন সেনের মধ্যযুগীয় ভারতীয় সন্তদের মিলনমূলক সাধনচর্চার ধারাও এই মনোভঙ্গিকে পুষ্ট করেছে। ফাল্গুনী নাটকে অন্ধ বৃদ্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ রবীন্দ্রনাথে বাউলের রূপ ও স্বরূপের ভাববিগ্রহের সৃষ্টি হল। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির এক প্রায়-চূড়ান্ত পর্ব প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথকে চলে যেতে হয়েছে। বড়ো ইংরেজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লালিত ধারণাও শেষে স্খলিত হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তবু মানবপ্রত্যয়ে বিশ্বাস গচ্ছিত রাখতে পারছেন ভেবেছিলেন। সিপাই বিদ্রোহের সময় দিল্লিতে ফারসি ও উর্দু দুই ভাষার সিদ্ধহস্ত লেখক গালিব এক প্রকার ট্র্যাজেডির দ্রষ্টা। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্‌কালে ছায়া ঘনিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথ যখন লাহোরে গিয়েছিলেন তখন ইকবালের সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারল না কেন? এ এক প্রশ্ন। আরও বড়ো জিজ্ঞাসা এই যে, ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় গরমিলের মূল সূত্রটি কী? হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে ইংরেজ সরকার কোনও প্রকার মধ্যস্থতা করে বিবাদ মিটিয়ে দেয় না, এই ব্যাপারটিও রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু ব্রাহ্মধর্মে অন্তরিত হননি, সে অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ে তাঁর ধারণাও হিন্দুদের থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু এবং অথবা ব্রাহ্ম থেকেও ধর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যোগাযোগ উপন্যাসে পজিটিভিস্ট বিপ্রদাসের মূর্তি গড়া হয়েছে, আর মধ্যকালীন ভারতীয় ধর্মসাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের মূলে আছে কোঁত্কথিত পজিটিভিজমে ধর্ম-অনপেক্ষ ও পার্থিব পূর্বেকার সন্তদের মধ্যে সুশৃঙ্খল ও সপ্রেম প্রগতির লক্ষ্যে অগ্রসর মানবধর্মের প্রবর্তন। পজিটিভিজম ইউরোসেন্ট্রিক দর্শন, এ দর্শন কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক এবং পুরোপুরি ঔপনিবেশিক ভারতকে ধর্মতত্ত্বের পরবর্তী কোনও স্তরে বিবর্তিত হবার সুযোগ দেবে না, রাবীন্দ্রিক বিপ্রদাসের মুখে তাই বিষাদের ছায়া স্বাভাবিকভাবেই ঘনীভূত।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে বুদ্ধদেব একজন শ্রেষ্ঠ মানব। আনন্দকুমারস্বামী বুদ্ধজীবনকে কিছু প্রতীকের সমবায় কল্পনা ভেবেছিলেন। বুদ্ধ ও বুদ্ধবাদ সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং অন্যান্য দেশিবিদেশি ভারততত্ত্ববিদের অভিমত এবং ঠাকুরবাড়ি ও বিশ্বভারতীয় বুদ্ধবাদ চর্চার প্রবণতা এবং শিল্পে সাহিত্যে বুদ্ধবাদের প্রতিফলনসঞ্জাত নান্দনিক বোধ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বাণীতে এক নতুন আয়তন রচনা করেছিল। ধম্মপদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা ছিল, অবশ্য ধম্মপদের কাব্যমূল্য অতি অল্প। ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতক অনুবাদের প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি রথীন্দ্রনাথকে দিয়ে বুদ্ধচরিত-এর গদ্যানুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। লাহোর থেকে প্রকাশিত বুদ্ধচরিত-এর ইংরেজি অনুবাদ এবং ফরমিকির ইতালিয় অনুবাদের সংবাদও রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। পালিভাষা রবীন্দ্রনাথের অধিগত ছিল এবং অনুমান ভুল নয় বোধ হয়। যে বুদ্ধবাদ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিকল্প-সন্ধানী, পুরোহিততন্ত্রের বিপক্ষে, বর্ণভেদে ও বলিদানে অসম্মত এবং প্রতিমাপূজনের বিরোধী সেই প্রাচীন বুদ্ধবাদের করুণা ও প্রজ্ঞা রবীন্দ্রনাথকে সহজে স্পর্শ করতে পারল। ষড়্দর্শন, তন্ত্র ও লোকায়ত দর্শনের বিপরীতে বুদ্ধবাদী ধর্ম ও দর্শন ঔপনিষদিক ব্রাহ্মভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ নির্বাণ ধারণা পৃথক তবু রবীন্দ্রনাথের বেদান্তভাবনার সঙ্গে বুদ্ধবাদের এই সংশ্লেষ তাঁর জীবনের দর্শনকে পূর্ণ করে তোলার সহায়ক হল। বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্তধারণায় বৌদ্ধধর্মের এরকম কোনও মিশোল ছিল না।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে ফিউডাল বলেছিলেন, পরেকার মার্কসবাদীরা তাঁকে বুর্জোয়া বলেছে। রবীন্দ্রগীতি ও নাট্যে রাজতন্ত্রের অভিঘাত দৃষ্টিগোচর এবং রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁর বেশ কিছু গল্প বুর্জোয়ামানসের প্রতিফলন নয়। ভারতীয় ফিউডালিজম ও তৎকালীন বুর্জোয়াবিকাশের পটভূমি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ভূমিকা স্বতন্ত্র বিচারের বিষয়। মধ্যকালীন ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ও সমস্যার সময় যে সমাজদর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটল রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ তার প্রকাশক। তার ভিন্নতর প্রকাশ ঘটতে পেরেছিল ডিরোজিও-র মাধ্যমে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী ও অনুসারী। উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে ধনতান্ত্রিক গঠন ও ঔপনিবেশিক পীড়ন নিবিড় হয়ে উঠতে থাকলে ঐ সমাজদর্শন দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং সৈয়দ আহমদ খানের মাধ্যমে পূর্ণতরভাবে বিকশিত হল। রবীন্দ্রনাথের বেদান্তচিন্তনপ্রণালী সচ্চিদানন্দভিত্তিক এবং তা দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুসারী। সেখানে আর্যামি না থাকলেও আর্যসমাজের প্রেরণা ক্রিয়াশীল। না রামকৃষ্ণের দর্শন, না বিবেকানন্দের সমাজদর্শন কোনও কিছুর প্রতি রবীন্দ্রনাথ কোনও আন্তরিক আকর্ষণ বোধ করেননি, বরং দয়ানন্দের ঐ ত্রিমূর্তিধারণা রবীন্দ্রনাথকে একান্তভাবে অধিকার করে নিতে পেরেছে। পেলব রবিয়ানা

বিবেকানন্দের ব্যঙ্গের বিষয় ছিল, ভাবাকুল কবি-কথাসাহিত্যিকের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও সামান্য সূত্র বিবেকানন্দ খুঁজে পাননি, সংগীত হয়তো যোগসূত্র রচনা করতে পারত। বিবেকানন্দ, গান্ধি এবং রবীন্দ্রনাথ তিনজনেরই ব্রহ্মচর্য ও আশ্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত রয়েছে। সিস্টার নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের যোগাযোগের সেতু ছিলেন না, গান্ধির ড্রেসকোড ও শারীরিকতা সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ নজর কেড়েছে, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এখনও এসব বিষয়ে অন্বেষণের যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথকে প্রায়-পরিচ্ছন্ন দুটি কালপর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। বিশ শতকের সূচনা থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে তিলক, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটেছে। বিবেকানন্দ, তিলক, গান্ধি ও অরবিন্দ গীতার স্বতন্ত্র ও সময় উপযোগী ভাষ্য উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতা সম্পর্কে পরিবেশনযোগ্য কোনও বক্তব্য নেই। যোগাযোগ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনার প্রতিষ্ঠায় গীতার একটি শ্লোকের বিচ্ছিন্ন ভূমিকাকে এক্ষেত্রে সাক্ষ্যরূপে পেশ করা চলে না। যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গীতার সৃষ্টি তার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের মনে না-ধরবারই কথা। ভারত ইতিহাসের চরমপন্থী পর্বে গীতা স্বদেশিদের এক অবিচল ভারকেন্দ্র হয়ে থেকেছে। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শেষের দিকে অনুশীলন সমিতির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, সরলাদেবী চৌধুরানী ও সিস্টার নিবেদিতা এ বিষয়ে যতটা উৎসাহী, রবীন্দ্রনাথ ততটাই অনাগ্রাহী, জীবন ও রচনায় সন্ত্রাসবাদীদের বৈভীষিক উদ্যম সম্পর্কে তাঁর বিমুখতা ঘুচল না। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর একদা-নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল, পথের দাবী ভালো না-লাগার কারণ তিনি দর্শাতে পেরেছিলেন বলে মনে করেছিলেন। সন্দেহ হয়, চরমপন্থী পর্বে তাঁর উদাসীনতা স্বাধীন ভারতের ইতিহাস রচনার কেন্দ্রীয় প্রকল্পে তাঁর জীবনের থেকে বড়ো ভূমিকা নির্ধারণের মসৃণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। মুৎসুদ্দি ও জমিদারের আবহে এবং ব্রিটিশ সরকারের সাংস্কৃতিক অবদমননীতির কাছে বিনতি স্বীকারের মানসিকতার আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ অন্য কিছু হয়ে উঠতে পারলেন। তাঁর কথাসাহিত্যের একটা বড়ো অংশ ভারকেন্দ্রের এই বিচলনের ফলে স্থানাঙ্ক পালটাল। বঙ্কিমচন্দ্র দেবীচৌধুরানী-র কল্পনা করেছিলেন, আনন্দমঠ লিখেছিলেন, রবীন্দ্রভাবনা বীর্যবতী চিত্রাঙ্গদা-র ধারণাতেই লগ্ন হয়ে থাকল।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস-ভাবনার তুলনামূলক বিবেচনা সম্ভব। তিলক শিবাজী উৎসবকে গতি দিয়েছিলেন, মধ্যযুগেই শিবাজী-বিষয়ে মারাঠি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটিকে কোনও কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। স্বদেশের ঐতিহাসিক নিয়তির সঙ্গে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও তিলকের প্রগতিভাবনা যে প্রত্যক্ষ ঐক্যসূত্রে বাঁধা, দেশের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাবলির সমাধানের সন্ধানে তাঁরা যেমন অটুটভাবে সংলগ্ন, রবীন্দ্রনাথের মতো স্রষ্টার পক্ষে তেমন একান্ত অভিনিবেশ আশা করা অন্যায়। উপনিবেশ-বাদের বিরোধিতার এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের তত্ত্ব ও প্রয়োগের যোগরচনায় এবং জনগণের অবস্থার উন্নয়নবিধানে বিবেকানন্দ ও তিলকের মতো একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। গান্ধির রামরাজ্য আর বিবেকানন্দের ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র দুই-এর থেকে সুদূর ও স্বতন্ত্র অবস্থান রবীন্দ্রনাথ রচনা করতে পেরেছিলেন। উদারপন্থী বা গণতন্ত্রী দুটি ঐতিহাসিক প্রবণতায় আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ, সংস্কারব্রতী বা নিয়ম-মেনে-আমূল সংস্কারে সাহসী রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব তাঁর সময় ও সমাজের সংঘাতেরও ফল।

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক ধর্মতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না, দার্শনিক হলে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারতেন না, রবীন্দ্রদর্শন বিষয়ে রাধাকৃষ্ণণের দর্শনগ্রন্থ প্রণয়নের পরেও তাঁকে দার্শনিক বলা যাবে না। রাসেল বিলম্বিত রোমান্টিক বায়রনের জীবন ও রচনাকে পাশ্চাত্য দর্শনের এক অধ্যায় চিহ্নিত করেছেন, রাসেলের কাছে রবীন্দ্রদর্শন আনমিটিগেটেড রাবিশ রূপে প্রতিভাত। শিকাগো ধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দের পরে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু তাতে কোনও আলোড়ন-আন্দোলন অনুভূত হয়নি। চিনের শিক্ষাসত্রের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিতে অনুরুদ্ধ হয়ে রাসেলের পরের বছর রবীন্দ্রনাথ চিনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই ভাষণের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। অন্ত্যজ ব্রাত্য অস্তিত্ব, সুফি-বাউলদের প্রান্তিকায়িত অবস্থিতি এবং মধ্যকালীন ভক্তিমার্গীদের ভাবনার মিশ্রণে রচিত খ্রিস্টান এবং অথবা সিমিটিক সন্তপ্রতিম তাঁর ভাববিগ্রহ ও বাণী মহাসমরের আবহাওয়ার অনুকূল ছিল। তাঁর থেকে একেবারে ভিন্ন মতাবলম্বী চিনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণের ফলে আপ্লুত, চিন ভ্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বিস্ময়কর বাক্‌সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় সে অর্থে তাঁর তীর্থদর্শন যে অর্থে ভারতে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের তীর্থদশন। রাশিয়ার চিঠি-র মতো পত্রাঙ্কিত রচনাবলী কেন রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হল না এই অভিযোগ করা যেতে পারে। গুরুতর অভিযোগ হল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি-তে সোভিয়েত লেখকদের সম্পর্কে গোর্কির মতো সমাজতান্ত্রিক লেখক সম্বন্ধেও কোনও উল্লেখ নেই কেন? মাদাম কামা গোর্কির 'ঝোড়ো পাখির গান' রচনাটিকে ইশতেহারের চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী বলেছিলেন, সে-গানে রবীন্দ্রনাথের হয়তো সায় ছিল না। নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদ সম্পর্কে ভল্ট-ফাক বা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের নমুনা রবীন্দ্ররচনায় মেলে। নেহেরু ভারত আবিষ্কারে বেরিয়ে রুশদেশ ভ্রমণ সেরে ফিরে-আসা রবীন্দ্রনাথকে এভাবে আবিষ্কার করেছিলেন : দি অ্যারিস্টোক্রাটিক আর্টিস্ট টার্নড ডেমোক্রাট উইথ প্রলেতারিয়ান সিমপ্যাথিস। এ যেন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ ছোটোগল্প।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনাবলীর বক্তব্য আর তাঁর ইংরেজি রচনাবলীর বক্তব্য সবসময় এক নয়। ইংরেজির সূত্রে পাশ্চাত্যের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সুবোধ্য হয়ে ওঠার তাগিদে রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথকে বিবেচনার নিরিখ কিছু পালটে দিতে পারে সে ভয় থাকছে। বাংলা গীতাঞ্জলি আর ইংরেজি গীতঞ্জলি এক নয়। সমৃদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রহরী রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি রচনায় আরও মুক্তমনে পরম্পরাকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। ঐতিহ্যকে শুদ্ধ করে, মিস্টিকতায় মণ্ডিত করে, পরিশীলিতভাবে লোকায়ত পরিবেশনের উপযোগী করে তুলবার ঐ শিল্পায়াসের আর-এক উদাহরণ তাঁর কবীরের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য আলোচকেরা রবীন্দ্রনাথে যথাযথভাবে প্রবেশ করতে পারছেন না, এমন অভিযোগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের বাংলা ইংরেজির এই উভযোজী অবস্থান বিষয়েও সতর্ক থাকবার প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। ব্র্যাডলে, বেয়র্গসঁ এবং উইলিয়ম জেমসের মতো দার্শনিকদের ভাববাদিতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার বিচার সম্ভব। ধর্মচেতনা ও মিস্টিসিজম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাকে পরিচায়িত করবার ধারাটি তার সঙ্গে সংলগ্ন। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ সকলের রচনাবলী গুণে ও পরিমাণে কম বেশি উৎকৃষ্ট। তরু দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য কবিখ্যাতির তুলনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় ধর্ম ও

মিস্টিকতার বোধ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাকে কীভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সময় ও সমাজের সুরে সুর মেলাতে পেরেছিল বলেই ফিটজজেরাল্ড-এর ওমর খৈয়াম এবং রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ইংরেজিভাষী মহলে বিশেষভাবে গৃহীত হতে পেরেছিল। খলিল জিব্রানের অনুবাদ পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হল, তা দেখে গীতাঞ্জলি-র রচয়িতার সমাদরের কারণ কিছুটা অনুমান করা যায়।

দ্য রিলিজন অব অ্যান আর্টিস্ট নামক আত্মজীবনীক ইংরেজি রচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন, সারস্বত ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-আন্দোলন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সিপাই-বিদ্রোহ—এই তিন আলোড়নের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের উত্থান ঘটেছে। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ও প্রধান ভূমিকা ছিল। জীবন-চরিতকার বিদ্যাসাগর অবশ্য প্রিন্স দ্বারকানাথের জীবনী লিখবেন মনস্থ করেছিলেন। সাহিত্য আন্দোলনের আলোচনায় অনুল্লেখের জন্য এখানে মধুসূদনের নাম বিশেষভাবে মনে আসে। মধুসূদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা থেকেই এ জাতীয় তথ্য-বিকৃতি সম্ভব। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা জাতীয় আন্দোলন রূপে সিপাই-বিদ্রোহকে সমকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রায় কেউই স্বীকার করে নেয়নি। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে রাজভাষা ইংরেজিতে লিখতে শুরু করলেও পরে বাংলায় সরে এসেছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় বাংলায় এবং তারপর ক্রমশ বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই লিখতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথই বোধহয় একমাত্র নোবেল পুরস্কার প্রাপক সাহিত্যিক যিনি এভাবে নিজভাষা থেকে অন্যভাষায় নিজেই রচনার অন্তরণ ঘটালেন। সিস্টার নিবেদিতা, এডুইন আরনল্ড, জিম করবেট ও ভেরিয়ার এলুইনের মতো ইংরেজিভাষী ভারতে এসেছেন এবং ভারতীয় বিষয় নির্ভরে ইংরেজিতে লিখেছেন। আফ্রিকার কোনও সাহিত্যিক ইংরেজি লেখার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে অন্তত কিছুকালের জন্যে তাঁর নগণ্য স্বজাতীয় ভাষায় লিখনের স্পর্ধা দেখিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই কম করেও তিনজন ভারতীয় লেখক ইংরেজি ভাষার রচয়িতারূপে যশস্বী হয়েছেন। এখন ভারতীয়দের ইংরেজি লেখার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছ। প্রসাধন ও ইংরেজি লিখনকলা উভয়ের বাজার ভারতে এখন অতি প্রশস্ত। ইংরেজি একটি ভারতীয় ভাষা, এবং বাংলার মতো তত অগ্রগণ্য নয় এমন ভারতীয় ভাষাও যে শ্রেষ্ঠ সারস্বত সম্মানের জন্য মনোনীত হতে পারে এ সাহস রবীন্দ্রনাথ সঞ্চয় করতে দিয়েছেন।

ভারতের বাস্তবতা ও ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষাকে কীভাবে গড়ে দিয়েছে তা দেখবার বিষয়। একদিকে গোরা'কে সিপাহি-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক সময়ের জাতক বানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক ধরনের বিপর্যস্ত আত্মপ্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন, অন্যদিকে ঘরে-বাইরে এবং চার অধ্যায় উপন্যাসে স্বদেশি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। উপনিষদ, বেদান্ত ও ভক্তিধর্ম তাঁর জীবনদর্শনের ভাবভিত্তি রচনা করেছে, কিন্তু উপনিষদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, বেদান্তের কর্মযোগ এবং ভক্তির ভাবাবেগশোধিত নিঃশর্ত দাস্যের মনোভঙ্গি তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। পুণ্যাহ উপলক্ষে জমিদার রবীন্দ্রনাথ দারিদ্রসীমার নীচের চাষিদের থেকে নজরানা আদায়ে তৎপর; তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় এবং 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছোটাগল্পে সে দাস্যের স্বরূপ প্রতিফলিত।

রবীন্দ্রবিশ্ববীক্ষায় বিজ্ঞানভাবনাও এক প্রধান বিবেচ্য বিষয়। লামার্ক, ডারউইন, টমাস হাক্সলে প্রমুখ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। বিশেষত তাঁর উত্তরকালের কবিতায় বিজ্ঞানের অধিকার ক্রমে বিস্তৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিজ্ঞানভাবনার পরিচয় সেই পটভূমিতেই গ্রাহ্য। বিশ্বপরিচয় নামের পুনর্লিখিত পাঠ্যপুস্তিকাটিকে তাঁর বিজ্ঞানচেতনার সাক্ষ্যরূপে

দাখিল করা উচিত হবে না। এবং অন্যায় হবে গোয়েটের বিজ্ঞানভাবনার সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার তুলনা। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কথাসাহিত্যে প্রযুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর চেতনা পরিচ্ছন্ন ছিল বলা যাবে না। *রক্তকরবী* নাটকে খনিশ্রমিকরা যন্ত্র দিয়ে সোনা তোলে, কৃষকরাও যন্ত্র দিয়ে সোনার ফসল ফলায়, কিন্তু এখানে তিনি যন্ত্র ব্যবহারকারী শ্রমিকদের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে পারেন না, রূপকের অবতারণা করে কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টিকে আরও দুর্বল করে ফেলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রিয় বান্ধব কিন্তু জগদীশচন্দ্রের যুগান্তকারী বেতারযন্ত্রের বদলে উদ্ভিদবিদ্যা চর্চায় তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বকে তিনি তুলনায় বেশি মূল্য দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিষয়ে পথিকৃতের কাজ করেছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের কাজের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান তাঁর অকালপ্রয়াত তরুণ বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চেয়ে বেশি ছিল না। একদা সচিব প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বিজ্ঞানচর্চার ধারা ও ধরনের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন তা বলা যায় না। হীরাকুদ বাঁধ নির্মাণে প্রশান্ত মহলানবিশের কৃতিত্ব ও *মুক্তধারা* নাটকে বাঁধনির্মাণে যন্ত্ররাজ বিভূতির কৃতিত্বের মূল্যাঙ্কনের জন্য তিনি একই নিরিখ ব্যবহার করেছেন কিনা তা জানতে কৌতূহল হয়।

আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের লিখিত রূপ পাওয়া যায়, বিজ্ঞান কিন্তু দুজনের আলোচ্য বিষয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কথিত অসীম ও সীমার দ্বন্দ্ব আসলে ব্রহ্মের ধর্মীয়-দার্শনিক বোধ এবং ব্রহ্মাণ্ডের সীমাহীনতার বৈজ্ঞানিক চেতনার দ্বন্দ্ব। মন্ত্র তপস্যা সাধনা বৈরাগ্য প্রভৃতি পরিভাষার পুনরাবৃত্ত প্রয়োগে স্বচ্ছন্দ ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে এবং রচনার কিয়দংশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরীক্ষা-পরীক্ষার দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে প্রয়োগগত ক্রিয়াশীলতা সত্য অবধারণের একটি উপায়। ইন্দ্রিয়গত অনুভব মননগত উপলব্ধিতেও সত্যতা পায়। তাছাড়া আবেগগত অবধারণে সত্যকে সুন্দর রূপে লাভ করা সম্ভব হয়। বৈদান্তিকের বিদ্যা অবিদ্যার দ্বন্দ্ব, রবীন্দ্রনাথের ভক্তিধর্ম ও বিজ্ঞানভাবনার অসমন্বিত দ্বন্দ্বে রূপ পেল। নীতিতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব আসলে এক কিন্তু আধুনিক ভাষিক দর্শন অনুযায়ী এ দুটি বিষয়ই বলে বোঝানোর প্রসঙ্গ নয়। অথচ নীতি ও সৌন্দর্যের সমীকরণে রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের একটি অংশ নিত্য নিয়োজিত। রবীন্দ্রনাথের নান্দনিকবোধ কিছুটা নিওক্ল্যাসিকাল এবং মূলত রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব এবং প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সংশ্লেষে সঞ্জাত। এ তত্ত্ব অরবিন্দের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নয় আবার অবনীন্দ্রনাথের প্রয়োগকুশলতায় এর পুষ্টি ঘটেনি। অচলায়তন নাটকের সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে নাটের গুরু সেজে বসতে অভ্যস্ত ছিলেন, বিশ্বভারতীতে তিনি কালানুচিত গুরুদেব সম্বোধনে পরিতুষ্ট হতেন। গুরুবাদী রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্বে রস হল শেষ কথা এবং শিল্পচর্চা হল সাধনা। সাধনা তাঁর এক ইংরেজি নন্দনতত্ত্বের বই-এরও নাম। রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞেয়বাদ সম্পর্কে অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন না। সেকালের বুদ্ধিনিষ্ঠ যুক্তিবাদীদের সঙ্গে যেমন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, যদুনাথ সরকার এবং জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতার নতুন মূল্যায়ণ সম্ভব।

সিস্টার নিবেদিতা ও দীনবন্ধু এন্ড্রুজের মতন ভারতবন্ধুদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সফল সাহচর্য বিশেষ বিবেচনার বিষয় হতে পারে। ইয়েটস্ পাউন্ড ব্রিজেস প্রমুখ কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ সন্ধানেও ব্যস্ততা লক্ষিত হয়। এবং বলতে সংকোচ হয়, রবীন্দ্রগবেষণার প্রধান অভিমুখ এখন বিদেশিদের দিকে, এবং বিশেষত ইংরেজিবাহিত। বিদেশিদের সমীপে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র পাঠ্যবস্তু, এবং বিস্মিত অপরিচয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা আলোকিত করতে পারেন। পাশাপাশি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব এবং রবীন্দ্ররচনায় অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের

অভিঘাত—এই অন্যোন্য মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে তত আলোচনা চোখে পড়ে না। এমন অনুপস্থিতির একটি উদাহরণ : ১৯৩৯-এ ভাল্লাথোল শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, এখানে তিনি কথাকলি নৃত্যের একটি প্রদর্শনীও করেছিলেন। ভাল্লাথোল কেরল কলামণ্ডলম্-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং কথাকলি ভরতনাট্যম প্রভৃতি ধ্রুপদি নৃত্যের বিকাশে তাঁর ভূমিকা বিশ্রুত। এবং ভাল্লাথোল কাব্যরচনা ও অনুবাদকর্মের জন্য যশস্বী, জাতীয় আন্দোলনে তাঁর গান রবীন্দ্রনাথের সংগীতের মতো প্রেরণা-সঞ্চারী। জাতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন মলয়লমের এই মহাকবির বিশ্বভারতীতে পদার্পণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্র বধির বিঠোফেনের মূর্চ্ছনায় আলোড়িত, হেলেন কেলারের সঙ্গে তাঁর স্পর্শগম্য সাক্ষাৎকারও উল্লেখের বিষয়, কিন্তু বৃদ্ধ বধির ভাল্লাথোলের অন্তঃকর্ণে সেদিন শান্তিনিকেতনে কীভাবে কবিতা ও নৃত্যের যুগ্ম পদপাত ধ্বনিত হল তা ইতিহাসে লেখে না। নাচের ক্ষেত্রেও সাংকর্য দূষণীয় নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানও ঐশ্বর্যবান, কিন্তু মিশ্ররীতিতে রচিত তথাকথিত রবীন্দ্রনৃত্য রাবীন্দ্রিক সৃজনপ্রক্রিয়ার সব থেকে দুর্বল নিদর্শন। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্য সমানভাবে সঙ্গত নয় বলেই তাঁর গীতিনৃত্যনাট্য অপেরার প্রেরণাসঞ্জাত হয়েও কখনও শ্রেষ্ঠ অপেরার দাবি করতে পারবে না।

বিশ্বভারতীতে গান্ধি ও সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের কোনও বিশদ ঐতিহাসিক বিবরণ নেই। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে যায়। গান্ধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতান্তর ঘটলেও তাঁদের মনান্তরের কোনও উদাহরণ নেই। গান্ধি বিশ্বভারতীতে নৃত্যগীতি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, গান্ধির সাংস্কৃতিক অসহযোগর তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না। লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা স্বদেশে উপনিবিষ্ট হলেও তা স্বদেশের রাজনীতিবিমুখ। বিশ্বকে একটি নীড়ে সংহত করবার সংকল্পে গঠিত বিশ্বভারতীতে সেসময় সব বহিরাগত বিদেশির ভূমিকা সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। কেবল ত্রিপুরার রাজার সম্মাননা নয়, ভারতীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজকীয় আতিথেয়তা তাঁর উপযুক্ত মনে হত, টাটা বিড়লা সারাভাইদের মতো শিল্পপতিদের দাক্ষিণ্য তিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের আনুকূল্যে বারবার বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হয়েছে, মার্কিন ধনকুবেরদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বিদেশি সংবাদপত্রের কটাক্ষের কারণ হয়েছিল। এই সবই বিশ্বভারতীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে, একথা বললে তা সর্বাংশে সত্য হবে না। তাঁর সময়ের অন্যান্য দেশনেতার মতো ভারতকে এশিয়ার যোগ্যতম প্রতিনিধি রূপে উপস্থাপিত করবার প্রবণতায় রবীন্দ্রনাথও আক্রান্ত, এবং প্রতিভূরূপে তিনি নিজেকেই যে যোগ্যতম বিবেচনা করতেন এমন প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারতকে তেমন তীর্থক্ষেত্রে রূপায়ণে ব্যর্থ হল। জনগণমনঅধিনায়ক গানের বিরুদ্ধে একসময় ব্রিটিশ রাজভক্তির অভিযোগ করা হয়েছিল। এখনও ভিন্নধরনের আঞ্চলিক অভিযোগ আছে। তবু রবীন্দ্রনাথ দুটি রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা এবং দুটিরই রচনা বাংলা ভাষায়। জনগণমনঅধিনায়ক গানটি প্রত্ন রীতির মিশ্রবৃত্তে সংস্কৃত শব্দের সান্দ্র প্রয়োগে এমনভাবে সৃষ্ট যে মিলিটারি ব্যান্ডে এর সুর বাজানো সম্ভব, অঞ্চলনির্বিশেষে এর উচ্চারণ স্বচ্ছন্দে গ্রাহ্য। সংস্কৃত পরম্পরার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্ত ছিলেন, উনিশ শতকি প্রবণতাবশে রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের প্রতি তাঁর সারস্বত আনুগত্য ছিল তুলনায় বেশি। ক্লাসিকাল লিটারেচারের বাংলা তিনি করেছিলেন প্রাচীন সাহিত্য এবং কালিদাস ও বাণভট্ট তাঁর রচনা ও সমালোচনাসাহিত্যে নতুন ভবে রপায়িত হয়েছেন। সংস্কৃতের সমীপে অনুগত হলেও বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যে তাঁর প্রত্যয় ছিল। এ প্রত্যয় থেকে তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, এ

ভাষার অনেকটাই তাঁর হাতে গড়া। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সেরা ভাষাবিদ এবং বাংলা শব্দভাণ্ডারে তাঁর অনবরত অপ্রতিহত উদার অধিকার শেকস্পিয়রকে মনে করিয়ে দেয়। লেনিন রুশভাষায় অকারণে ফরাসি শব্দের অনুপ্রবেশ বিষয়ে সতর্কতা জরি করেছিলেন, আর ইংরেজি-হিন্দি মেশানো আধুনিক খিচুড়ি-বাংলার অনান্দনিকতা রবীন্দ্রগদ্য প্রতিপদেই স্মরণ করিয়ে দেবে। রবীন্দ্রনাথ শেকস্পিয়রের নাটকের আবহে মানুষকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেকস্পিয়র আত্তীকরণের কোনও বিশিষ্ট নমুনা মেলে না। সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগরও ভ্রান্তিবিলাস রচনা করেছিলেন। শেকস্পিয়রের তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে সনেটপ্রতিম রচনাটি ইংরেজি গদ্যকবিতায় অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন, তার যথাস্থান হয়েছে শেকস্পিয়রের বাসভূমিতে এক প্রস্রাবাগারের পার্শ্ববর্তী স্মারকফলকে। দান্তের ছশো বছরের জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানে মধুসূদন তাঁর মহাকবি দান্তে নামের বাংলা সনেটটিকে ফরাসি ও ইতালির ভাষার সনেটে রূপান্তরিত করে পাঠান, ইতালিয় সম্রাট জাতীয় কবির প্রতি প্রাচ্যের কবির অর্পিত এই শ্রদ্ধার্ঘ্যের সসম্মান প্রাপ্তিস্বীকার করেন। এ হল ১৮৬৫-র ঘটনা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং সেরা বিশ্বসাহিত্যিকদের একাধিক তালিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে গণ্য করেছেন। হ্যারল্ড ব্লুমের অনুরূপ তালিকায় রবীন্দ্রনাথ নেই। স্প্যানিশভাষীরা নেরুদাকে হোমর বলে, পর্তুগিজরা জাতীয় কবি বলতে প্রধানত কামোঞেসকে বোঝায়, ভারতে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হতে শোনা যায়। ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নন, কবিগুরু বাল্মীকি। ওই ত্রয়ীর মধ্যে একমাত্র কালিদাসই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার ভারতীয় সাহিত্যকোষে রবীন্দ্রনাথের জন্য দুপৃষ্ঠার বেশি পরিসর থাকে না। তিন হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরায় ভারতে বহু সাহিত্যিক এসেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন। অগ্রগণ্য ও বিশিষ্ট একজন, কিন্তু তাঁকে সর্বপ্রধান বললে সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ভাষা-পরিকল্পনা করেছেন, ফলে চলিত ভাষা বাংলায় একমাত্র সাহিত্যিক উপভাষারূপে গৃহীত হতে পেরেছে। দুই বাংলায় রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা সমানভাবে কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাঁচ খণ্ডের এক খণ্ড যদি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক হয় তা হলে ভারসাম্যের অভাব ঘটে। ইউনেস্কো তামিলকে ঐতিহ্যবাহী ভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বাংলা এখন আর একমাত্র নয়। ভাষাভিত্তিক ভারতীয় প্রদেশ গঠনের প্রেরণা এসেছে পাশ্চাত্য থেকে। ভারতে এই নীতি প্রয়োগের ফল এখন শঙ্কিতভাবে লক্ষ করবার বিষয়। বিশ্বের মুমূর্ষু ভাষাসমূহের মধ্যে আছে বেশ কিছু ভারতীয় ভাষা। এই পটভূমিতে যান্ত্রিক ঐক্য বিধানের বদলে বহুভাষিকতার বৈচিত্র্যই অন্বিষ্ট। এবং রবীন্দ্রনাথও হতে পারেন সেই সেতু যা আমাদের এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় আর এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে পারাপার করতে দিতে পারে। মৈথিলি থেকে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় *ভানুসিংহের পদাবলী*তে, *চিত্রাঙ্গদা* থেকে সহজে চলে যাওয়া যায় *কিরাতজনকৃতি*তে। প্রাচী ও প্রতীচী, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, মুসলমান ও হিন্দু, মার্ক্সিস্ট ও অমার্ক্সিস্ট এদের তন্নিষ্ঠ সংশ্লেষকরূপে রবীন্দ্রনাথ এখনও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে এবং নির্ঘণ্টে অক্ষরানুক্রমে রবীন্দ্রনাথ নামশব্দে এসে মন্তব্য করেছেন : সর্বত্র উল্লিখিত।

রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র উল্লিখিত হন কারণে, এমন বলা যাবে না। রবীন্দ্রপরিকর অমিয় চক্রবর্তী মন্তব্য

করে গিয়েছেন : রবীন্দ্রগবেষণা যা হয় তা প্রায়ই চর্বিতচর্বণ। রবীন্দ্রসংগীত তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী হবে, রবীন্দ্রাথের এমন ভরসা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সব গান সবার শুনতে ভালো লাগে না। অজ্ঞেয়বাদীদের পূজাপর্যায়ের গান ভালো না লাগতে পারে। কেউ কেউ রবীন্দ্রগীতির চেয়ে নজরুলগীতি বেশি পছন্দ করেন। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড একসময় ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। এখনও পরীক্ষার নাম করে তাঁর সংগীতের অপপ্রয়োগ ঘটতে পারে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের কূট তত্ত্ব আলোচনাসূত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ হয়েছে। পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের মর্মে প্রবেশ করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ এমন আক্ষেপ করেছিলেন। উত্তর-রবীন্দ্র বাঙালি সাহিত্যিকেরা পাশ্চাত্যের ধ্রুপদি সংগীতের কে কত মর্মজ্ঞ এই নিয়ে অমীমাংসিত এক প্রতিযোগিতা আছে। রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রকবিতার ভালো প্যারডিরচনাও সৃষ্টিশীল কর্ম। রবীন্দ্রনাথের সব গান সব কবিতা সমান ভালো নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে। ভালো সব কবিতা নিয়ে ভিন্ন রুচির সহৃদয় পাঠকের খুব একটা অমিল হবে না বোধ হয়। শম্ভু মিত্রের আবৃত্তিতে যে স্বাধীনতা ছিল তার ফলে রবীন্দ্রকবিতার উচ্চারণ একধরনের মুক্তি পেয়েছে মনে হতে পারে। অশ্রদ্ধেয় করে তোলার দ্রুত ও বিবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও যাঁর রচনা থেকে যায় তিনি মহত্ত্বে পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ এমন একজন হতে পারেন।

রাশিয়ায় চেখভ নিন্দিত হচ্ছেন দেখে রবীন্দ্রনাথ কষ্ট পেয়েছেন। গল্পগুচ্ছও রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক বিক্রীত বই নয়। রবীন্দ্রনাথের ধারা বেয়ে এখনও ছোটোগল্প লেখা হচ্ছে। ভারতের নাট্যতাত্ত্বিক ও পরিচালকেরা বর্তমানে রবীন্দ্রনাট্য অভিনয়ের উপযোগী বলতে রাজি হবে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাটক তাঁরা বর্জন করতেও পারছেন না। মঞ্চস্থ না হলেও নাটকের পাঠগত উপযোগ থেকেই যায়, তার মূল্যও কম নয়। রবীন্দ্রনাটকে পাশ্চাত্যের প্রতীক-সাংকেতিকতার চিহ্ন খোঁজা হয়ে থাকে। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল না। কিন্তু বাংলার যাত্রাপালা ও সংস্কৃত নাটকের প্রকরণ রবীন্দ্রনাট্যে কীভাবে বিনির্মিত হয়েছিল তার পূর্ণ পরিচয় এখনও অলভ্য। নীরদচন্দ্র চৌধুরী রবীন্দ্রচিত্রকে ছবি বলতে নারাজ ছিলেন। এখন এদেশে নিলামে রবীন্দ্রনাথের থেকে অমৃতা শেরগিলের ছবি বহুগুণ মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। এক্সপ্রেসনিস্ট ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্রের মিল ও অমিল দেখানো আলোচনার অভাব অনুভূত হয়। ব্লেক বা ডি. এইচ লরেন্সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির তৌলন আলোচনাও চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রচিত্রাবলির প্রকাশ প্রত্যাসন্ন, কিন্তু যান্ত্রিক প্রতিলিপি দেখে রবীন্দ্রনাথ কেন কারও ছবি সম্পর্কে মত প্রকাশ অনুচিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে একই সঙ্গে এদেশে রেনাসেন্স, রিফর্মেশন আর এনলাইটেনমেন্ট তিনটি ব্যাপারই ঘটেছিল এমন দেখাতে চাওয়ার মধ্যে মাত্রাজ্ঞানের অভাব সূচিত হয়। ইংরেজি বা জর্মান সাহিত্যের ইতিহাসে শেকস্পিয়র গোয়েটের যথাস্থান থাকলেও রবীন্দ্রনাথের বেলায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সৃষ্টিছাড়া অপরিমিতির আয়োজন থেকে যায়। সাংস্কৃতিক অবদমনের এক আবহে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে বিকাশে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল। কবিতার মধ্যে কেরানির দিনচর্যার উল্লেখ থাকলে অভিষিক্ত প্রেমের নান্দনিক সুরটি কেটে যাবে জেনে রবীন্দ্রনাথ তা বর্জন করেছেন। এলিয়টের প্রথম পর্যায়ের কবিতা এমন সমস্যার মুখোমুখি হয়নি।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর অন্তত দেড়মাস রবীন্দ্রনাথকে শান্ত হয়ে ভেবে নিতে হয়েছে যে, তিনি স্যর উপাধি ত্যাগ করবেন কিনা। ব্রিটিশ ভারতে একা রবীন্দ্রনাথ স্যর খেতাব পাননি, এবং এক রবীন্দ্রনাথ স্যর উপাধি ত্যাগ করলেন কিনা তাতে ব্রিটিশ সিংহের কোনও মাথাব্যথা

ছিল না। গান্ধিও এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেননি, এটিই রবীন্দ্রনাথের বিলম্বিত সিদ্ধান্তের সমর্থনযোগ্য একটি তথ্য হতে পারে।

রবীন্দ্রযুগ বলে কোনও যুগ নেই। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সময় আছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সামাজিক রাজনীতিক গদ্যেরও এখন আর তেমন প্রাসঙ্গিকতা নেই। না থাকলেও এখনকার সমস্যার তখনকার সমাধান কী ছিল? কিংবা সমাধানের চেষ্টা কীভাবে করা হয়েছিল? তাও উৎসারিত আলোর ইশারার মতো এসে কিছু জানায়। গণতন্ত্র, জাতীয়তা, মানববাদ, ধর্ম-অনপেক্ষতা এমনকী সমাজতন্ত্র বিষয়ক যেসব আদর্শ ও নীতি বঙ্গভাষী ও অন্যান্য ভারতীয়কে ভবিষ্যতের পথে পরিচালিত করবে তাদের সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার কোনও মূল বিরোধ নেই, বরং ক্রিয়াশীল প্রেরণা আছে। বাংলাদেশ ও ভারতে পূর্বে গুরুত্ব না পাওয়া সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রাসঙ্গিক নন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে যে ভাষিকতার প্রবল উদ্‌যাপন তার অনেকখানি প্রণোদনা রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হাত হতে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসহিষ্ণুতা, নারীপ্রগতিচেতনা, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ভাবনা, গ্রামোন্নয়নপ্রয়াস ও পরিবেশভাবুকতা—এ সবই ভাবনাধারার ইতিহাসের মূল্যবান অধ্যায়। ভারত ও বাংলাদেশ দুই গ্রামে গ্রন্থিত। রবীন্দ্ররচনায় শুধু গ্রামীণ সংস্কৃতির স্থানবর্ণিমা নেই। নিসর্গ ও মানুষ উভয়ের প্রকৃতি সে রচনায় চিত্রিত। রবীন্দ্রনাথের যে পল্লিপ্রাণতার সন্ধানও এ মুহূর্তের অন্বিষ্ট। কুমুদরঞ্জন ও জসীমউদ্দীনের কবিতা, সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র, তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য যে উৎস হতে উৎসাহ পেয়ে এসেছে। শিল্পী রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনের হয়েও যে সমাজের বাইরেকার মানুষ। ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে, এমনকী প্রতাপের পরিধি থেকে যারা দূরে, রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছেই হয়ে উঠতে পারেন সব থেকে উত্তর-আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ যেখানে লোকায়ত সেখানে তিনি চিরায়ত। স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একপ্রকার অবজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। আশু সে অপবাদের খণ্ডন প্রয়োজন।

স্মৃতির সুরভি স্বভাবত উন্মনা করে। তা হলেও রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের অনুষঙ্গ বেয়ে-আসা স্মৃতির ঘেরাটোপে আটকে থাকা কাজের কাজ হবে না। সব অবরোধ থেকে মুক্তি : রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার এই হল নিহিত সুর। মুক্তিফৌজ শব্দটিও তাঁর বানানো।

আধুনিক জর্মান দর্শনে আশার-দিগন্ত এই পদবন্ধের চলন চোখ টানে। বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র নজরুল জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে বাংলাভাষাবাহিত আশার দিগন্তকে এভাবে বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যাতে অতীত বর্তমানে পরিণত হয়েছে, বর্তমান ভবিষ্যতে সম্ভবপর হবে।

রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রতিক ভাবনাধারার পটভূমিতে এখনও জীবন্ত এক ভূমিকা। বারবার রবীন্দ্ররচনায় মরা চিঠির মার্কা মেরে দেওয়া হয়েছে। জরুরি অবস্থায় রবীন্দ্রসংগীতে নিষেধ জারি করা হয়েছে। সহজপাঠ বুর্জোয়ার রচনা বলে প্রত্যাখানের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা ও তাঁর নবজাগ্রত মানববাদের ধারণা তাঁর ডাকঘর নাটকের রাজার চিঠির মতো ঘনিয়ে আসছে, আসছেই। লিখন তাঁর ধূলায় ধূলি হবার নয়। প্রামাণিকভাবে পুরাতন রবীন্দ্রনাথ অন্বেষণের উপাদেয় বিষয়। আমরা সকলেই দ্রুত সে-পুরাতনত্বের অংশভাগী হয়ে যাব। তাছাড়াও, আমাদের কাছে যেসব সমস্যা গুরুত্বে পূর্ণ অতীতের রবীন্দ্রপ্রতিভা জ্ঞানে-কর্মে-চিন্তায়-আনন্দে একেবারে অন্যভাবে তাদের সমাধানের যেসব উৎস উৎসারিত করে দিয়ে গিয়েছিল তা থেকে স্নিগ্ধ হয়ে ফিরে আসা এ উষর সময়ের লক্ষ্য হোক।

RABINDRANATH AS A SONG-MAKER

Sati Ghosh

In estimating Rabindranath as a composer, we must remember that he was a poet first, then a song-maker. It was his poetic genius which inspired to compose songs and it will not be fair to judge his songs merely from the musical stand-point without reference to the literary expression of his mind revealed in them. This is the reason why in Rabindranath's songs we find a wonderful combinaion of poetry and music and really speaking, the happy marriage of words and melodies is their chef characteristic.

In the cultural life of Rabindranath in his childhood Indian classical music played the foremost part and his originality in song-making had to assimilate its great influence exerted on him. But in this class of music, words have no scope as the expression of ideas. No care is taken for creating adequate words to be combined with tunes to express different thoughts. Variation of tunes and use of adequate notes are the medium through which ideas and feelings are sought to be expressed, and this expression is purely subjective. The subjective character of Indian classical music has removed it far from the grasp of the general mass and has confined it within a talented few.

At the back of the originality of Rabindranath Tagore in composing suitable words for tunes and composing suitable tunes for words was the inspiration of his elder brother Jyotirindranath Tagore, who in spite of being senior to him in age by ten years did not neglect him as a youngster and took him in confidence as an associate when he was only fifteen. At this young age, Rabindranath had rendered Hindi songs in Bengali with the help of Jyotirindranath. After some years Jyotirindranath started experimenting with Hindi tunes by playing them on the Piano and the task of Rabindranath and Akshoy Chowdhury, a friend of Jyotirindranath was to compose suitable words for these tunes.

This experiment by the two brothers inspired Rabindranath to write the Musical Drama *Valmiki Pratibha* at the age of nineteen. In the songs composed for this drama, we have many different kinds of tunes; the tunes from classical Hindi music, European music as well as the new original tunes which he and his brother Jyotirindranath had composed.

When Rabindranath composed this drama, his capacity for composing original tunes was not of high standard, but this-drama definitely proves that adequate words of high poetical excellence can be combined with the intricate and difficult tunes, of classical style.

After *Valmiki Pratlbha*, another great inspiration in song-writing came in Rabindranath's life when he composed *Mayar-Khela* (Ways of Love). At the time when he wrote this drama, his heart and mind were full of music only and he was almost free from the influence of orthodox Indian Music of the classical type. When composing the tunes of "Mayar Khela," Rabindranath went of experimenting by blending Hindi tunes, one with another, continually and tried to create something new out of it.

In the year 1900, when Rabindranath was writing the poems of *Kshanika* (The Momentary) he was full of devotion for God. A definite change can be noticed in the underlying thoughts of his songs composed at this time. His earlier songs had been full of sentimental expression and emotional outbursts while in these songs he gives expression to his yearnings for universal manhood and his deep love for the mysterious Lord behind-creation, thus rising much above mortal longings.

From this time we observe the influence of "Baul" melodies on his songs. He utilised this vein to a great extent in his songs composed during the period of Swadeshi movement.

There is a marked influence of European Music on Rabindranath's songs, but he did not imitate it on all occasions. The influence of Western tunes can be noticed in his early compositions but in later days, he had lost all enthusiasm for such imitation. But in the case of national anthems, he found, Western melodies–very suitable. The regular rythm supplied him great inspiration. He found that, some European tunes with, very regular time-beats give a peculiar force to the musical expressions and are very suitable for expressing heroic feelings. This is why he combined the rythm of European with the dignified tunes of Indian classical music and set his national anthems to it.

Rabindranath had taken many tunes and even thoughts from Hindi songs, but he never had learnt Hindi songs like a disciple from any "Ustad" or expert. Whenever he heard a good Hindi song he at once learnt it and rendered it into Bengali. He had great talents for learning songs as soon as he heard them and mastering difficult tunes in a short time. He had a rich melodious voice which he could raise to a very high pitch and so could sing very well. He did not maintain the orthodoxy of Indian classical music in his songs but he observed some of its rules. For example, in describing the beauty of Nature in the morning or evening, he used tunes meant to be sung in the morning or evening strictly according to the rules of Indian classical music.

An important point to note about the songs of Rabindranath is that he never composed words to suit musical rythm. He wrote songs in accordance to the rythm of poetry and thus had created many new meters in course of composing songs. Song-writers usually compose words first and adjust tunes to them later on. To Rabindranath's mind, thoughts and tunes came simultaneously and he adjusted words and rythm to them afterwards.

That Rabindranath preferred poetry to tunes when composing songs is amply proved by his charming songs describing the cycle of different seasons.

This type of choric songs was quite new to Indian music, and nothing like it can be traced in its history even from very early times. According to critics, Rabindranath's songs about the Rainy Season, Spring, Autumn, Summer and Winter are the best of their kind and are the most valuable contribution to modern Indian music.

The most important point about Rabindranath's songs however is the humanity of their appeal. The infinite delicacy in thought and sentiment blends with an almost uncanny sensitiveness in expression which endow some of his songs with a perfection of lyrical charm hardly to be matched in language.

Rabindranath had written some light and humorous songs, but they are very few in number. In the core of Rabindranath's songs is the yearning cry of the soul, the hankering for the infinite and the anguish of the romantic heart to solve the mystery of the unknown.

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

রবীন্দ্র-জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা

উ ত্ত র প ক্ষ

রবীন্দ্রসংগীত : শ্রদ্ধার বর্ণবিপর্যয়

অরুণকুমার বসু

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে

‘খাপছাড়া’ কাব্যের শুরুটা এইরকম :

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন,
গোদল পাড়ার এল মাধু কর।
দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা,
কিসের নেশায় পাওয়া চোখটা,
চারদিকে তার জুটল অনেক ছেলে।
যা-তা মন্ত্র আউড়ে শেষে
একটুখানি মুচকে হেসে
ঘাসের পরে চাদর দিল মেলে।

ডুগডুগি-বাজানো, পথের ধারে ভিড়-জমানো জাদুকরের আর-এক জাতের নমুনা কিছুদিন আগে শহরের যত্রতত্র দেখা যেত। একটি ছোটোখাটো বাঁদরের অঙ্গে ফ্রক পরিয়ে চেনে বেঁধে লোকটা বাঁদরটির দাঁত দেখিয়ে তাকে ডাকত ‘হ্যামা মালিনী’ বলে। রবীন্দ্রনাথের ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্য প্রকাশের পর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও ঠিক এমনি ডুগডুগি বাজিয়ে ছেলে জুটিয়ে মুচকে হেসে এমন ‘যা-তা মন্ত্র’ আউড়ে ‘মিঠে কড়া’ নামে কাব্যের একটা চাদর ফুটপাথে পিছিয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এমন ডুগডুগি-বাজিয়েরা মাঝে মাঝেই দেখা দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রজন্মের সার্ধশতক উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এমন কিছু ডুগডুগি-র ধ্বনি অনেকেই শুনেছেন। তাঁর সুপরিচিত কিছু গানের সুরের সঙ্গে নিজের সুর মিশিয়ে উদ্ভট এক নতুন সুরসৃষ্টির আত্মরতি রূপেন উপেন নৃপেন ভূপেনদের হাততালি-সহ এঁরা উপভোগ করেন। নৃত্যনাট্যের বিশেষ কোনো গান অন্য ঢঙে গেয়ে বা গাইয়ে তার আত্মপ্রসাদও কোনো কোনো অকালপক্ক শিল্পী অনুভব করে থাকেন। মিডিয়ার লোকেরা এইসব নিয়ে কিছু-কিছু বাগ্‌বিতণ্ডার হাফ-আখড়াইও ভালোই জমিয়ে তোলেন। কোনো কোনো তরুণ শিল্পী প্রায়ই প্রকাশ্য-পরিবেশনে রবীন্দ্রসংগীতের মাঝখান থেকে গানটি আরম্ভ করেন। ক’রে, বাহবা দাবি করেন এই নতুনত্বের জন্যে। একদিক থেকে ব্যাপারটা অন্তত অনেকের

কাছে সন্তোষজনক। কারণ তাঁরা তৎক্ষণাৎ বুঝে যান, গায়কটি রবীন্দ্রসংগীতটির ভাব-অর্থ-আবেদন ইত্যাদি সম্পর্কে নিটোল গণ্ডমূর্খ। তাতে অবশ্য তাঁর কিছু এসে-যায় না। রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে ঢোল বাজিয়ে, একফালি গামছার উপর শালীনতারক্ষার ভার দিয়ে, যাঁরাই গাজন-মেলায় মাতেন, তাঁদের সকলের প্রায় একই মনোভাব, কালের দাবিতে রবীন্দ্রনাথের গানকে একালের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু এই যুক্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকে না। যা ধ্রুপদী, যা কালোত্তীর্ণ, তাকে অবিকৃত রাখাই সকল কালের শিষ্টতা সভ্যতা ও শালীনতার ধর্ম। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। তাই 'ডাকঘর' নিয়ে, 'রক্তকরবী' ও 'শ্যামা'কে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ও সময়ের দাবির স্বঘোষিত অহংকারে, বেশ কিছু ভাঙচুর ঘটানো হচ্ছে। গানের উপর ব্যভিচার তো যথেচ্ছ। অবশ্য, একটি শ্রেণির মতে রবীন্দ্রনাথের গান তো বর্তমানে অনেক জনপ্রিয়। বহু খ্যাতিমান জনপ্রিয় ও উচ্চমার্গের শিল্পীরাও রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে ধারণ করে রবীন্দ্রসংগীতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এঁদের দাবি, রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রোতৃসমাজ এখন বৃহৎ। অভিজাত শিক্ষিত উচ্চকোটি মহলে রবীন্দ্রসংগীত এখন রীতিমতো আকর্ষক সংস্কৃতি, যাঁরা বহুদিন রবীন্দ্রসংগীতের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতেন। রবীন্দ্রসংগীত-বিমুখ বনেদি মহলে রবীন্দ্রসংগীতের এই কদরবৃদ্ধির সংবাদে পুলকিত না হয়ে, ভিন্ন এক ভ্রূকুটিও তোলা যায়। যেমন তুলেছেন এই সময়ের এক বুদ্ধিজীবী। তাঁর সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাকে কিছু প্রশ্রয় দিতেই হবে :

> ...রবীন্দ্রনাথের গান এখন যেহেতু প্রচুর মানুষ গেয়ে থাকেন, শোনেন, নানা পরিসরে তার তুমুল ব্যবহার হয়, যে-কেউ তা রেকর্ড করে ফেলতে পারেন বা মঞ্চে গাইতে উঠতে পারেন। ফলে এই বিস্ফোরণের শব্দের আড়ালে ছোটো কম্পাঙ্কের মেধাবী তরঙ্গ তেমন কানে আসতে পায় না। তাছাড়া ইদানীংকার পরিস্থিতিতে যে কোনও মানুষই রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার অধিকার ন্যায্য বলে মেনে নিয়েছেন। তা-নিয়ে যা-কিছু মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও একরকম বৈধতা পেয়ে গেছে।

সকলেই একটা বিষয়ে কথা বলতে থাকলে আসলে এক কোলাহল তৈরি হয়, গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বার্থে এই কোলাহলকে স্বীকৃতি না দিয়ে আমাদের উপায় নেই। কিন্তু কোলাহল আর পলেমিক্স-এর একটা চরিত্রগত ফারাক থেকে যায়। বাড়তি কোলাহল মেধাবী বিচারবোধের তন্ত্রীকে আহত করলেও আমরা নিরুপায়। কেন না, স্বীকার করি বা না করি মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে ছবি দেখবার মতো, শপিং মলে গিয়ে মার্কেটিং করবার মতোই রবীন্দ্রসংগীত এখন এক শ্রেণির ভোক্তার স্ট্যাটাস-সিম্বল। যুগের হাওয়ার গতি যেখানে অবাধ সেখানে আমার-আপনার মতো চুনোপুঁটির কী-কতটুকু ক্ষমতা! আর কিছু-না হলেও এই নব্য রবীন্দ্র-ভোক্তাদের ড্রয়িং-রুমের বাহারী মিউজিক সিস্টেমের পাশের র‍্যাকে অন্তত শান-নামক এক উঠতি শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীত অ্যালবাম থাকে, থাকে বাবুল-সুপ্রিয়র গাওয়া অ্যালবামও। কে কেমন গাইল সেটা বড়ো কথা নয়, তাঁরা যে রবীন্দ্রনাথের গানের অ্যালবাম কিনছেন বা শুনছেন, এইটেই বড়ো আহ্লাদের ব্যাপার। যদি খুব ভুল না বলি তাহলে পূর্বোক্ত ওই দুই মুম্বই-কেন্দ্রিক কণ্ঠশিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রগানের অ্যালবাম গত কয়েকমাসে সর্বাধিক বিক্রীত অ্যালবামের বাণিজ্য সাফল্যে গরীয়ান। সমীক্ষা ও বিজ্ঞাপন এই তথ্যই জানায়। এঁদের সাংগীতিক শিক্ষা নিয়ে কিছু মন্তব্য করার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে আমরা কেউ কেউ এক সময়ে বিশ্বাস করেছি, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গেলে শিক্ষার পাশাপাশি একরকম দীক্ষাও লাগে। হয়তো দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে

> বিশ্বাসও পাল্টায়। অথবা তাকে পালটে ফেলতে হয়। তবু এই কুলপ্লাবী রবীন্দ্রগানের ঝরনাতলার নির্জনে দাঁড়িয়ে দু-একটা নাছোড়বান্দা প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি।[১]

সে সব 'প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি' রবীন্দ্রসংগীতের পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বরলিপিতে ও গ্রন্থে মুদ্রিত- বাণী, পুনরাবৃত্তির রীতি, যতি চিহ্ন-সমস্যা ইত্যাদি খুঁটিনাটি নিয়ে। এই প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট থেকে সে সব দূরেই থাক। তবে মিডিয়া থেকে যেমন উঁচুমহলের কদরের সংবাদ মেলে, তেমনি তার সাম্প্রতিক বিকৃতি নিয়েও সাধারণ শ্রোতার অভিমত বেরিয়ে আসে। 'দৈনিক একদিন' পত্রিকার একটি পাঠকের পত্রে একদা বড়ো হরফের শিরোনামটি ছিল এই রকম 'রবীন্দ্র-ধর্ষকদের শাস্তি দিতে সংগঠিত হওয়া দরকার'। পত্রাংশটি এই প্রকার :

> 'অনন্য গান' ('নবপত্রিকা' ১৯মে, ২০১৩) শীর্ষক বিমল বসুর লেখাটি (এই পত্রে উদ্ধৃত নেই) রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষার্থী ও শিল্পী আগ্রহী ও অনুরাগী সকলেরই ভালো লাগবে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির অনন্যতাকে এত পরিপাটী-শৃঙ্খলায় এবং মূল্যবান মতামতে সংহত করে বলবার মতো গুণী মানুষের আজ বড়ই অভাব। লেখকের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, বেদনা ও ক্ষোভ পাঠক মাত্রকেই স্পর্শ করবে, সচেতন করবে। তবে যে ক্রমবর্ধমান যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাঁর এই প্রতিবাদের আহ্বান, তার পন্থা ও পদ্ধতির কথা অন্যভাবে ভাবতে হবে। ... যে সব শিল্পী রবীন্দ্র-সংগীতের শুভ্রতাকে কলুষিত করতে বসেছে বলে আমাদের অভিযোগ, তাদের অর্ধশিক্ষিত, মূঢ়, অপবুদ্ধিচালিত বলে গাল দিলেই তাঁরা সব লজ্জায় জিভ কাটবেন, এটা দুরাশা। তাঁদের অপযুক্তিগুলিকে খণ্ডন করতে হবে। 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' বা 'এক্সপেরিমেন্ট', 'ফিউশান', 'যুগের দাবি', 'সময়ের অনিবার্য সংকেত', 'পাবলিক খাচ্ছে', 'পণ্যায়ন', 'বাণিজ্য', 'বিশ্বায়ন' বিস্তর অপযুক্তি শ্যাওলার মতো ভাসছে। সেই ভাসমান শৈবালদলের উপর জলকীটের মতো এই আধুনিক অকালপক্ক স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞ ও হাততালি-তুষ্ট সংগীতজীবীর দল ধরাকে যা জ্ঞান করার তাই করছে। করুক। উদাসীন থাকতে বলছি না। লড়াই আজ দর্শনতত্ত্ব শোনানোর দ্বারা সম্ভব নয়। প্রকাশ্যে ধিক্কার, উচ্চারিত তিরস্কার, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ কীভাবে সংগঠিত করতে হবে, তার ভিন্ন কৌশল ভাবতে হবে।[২]

রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে হারমোনিয়াম না এসরাজ কী বাজবে, কি-বোর্ড চলবে কিনা, এ-সব তর্ক অবান্তর। আক্রমণ অন্যদিকে, প্রতিবাদ তাই প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হোক। ডুগডুগি-বাজিয়ের সঙ্গে মোকাবিলার প্রস্তাব।

'মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব'

সার্ধশতবর্ষের উপলক্ষ, উত্তেজনা, হুজুগই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির নানা মহলে পরীক্ষানিরীক্ষার নামে বিকৃতি-ব্যভিচারের প্রত্যক্ষ কারণ নয়। রবীন্দ্ররচনার স্বত্বরক্ষার দায়িত্ব যতদিন বিশ্বভারতীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, ততদিন বহু কারণে-অকারণে বহু শিল্পীর গানের উপর বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড অন্যায্য হেনস্থা চাপিয়ে দিয়েছেন, এমন অভিযোগের অন্ত ছিল না। সে-সবের সত্যমিথ্যা বিচার-সাপেক্ষ। তবে স্বত্বরক্ষার নিয়ন্ত্রণে উদ্দাম বিশৃঙ্খলা কিছুটা মুখ গোঁজ করে ছিল। স্বত্ববিধি অন্তর্হিত হতে হতেই শুরু হল স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, আত্মম্ভরিতার নির্বিচার উল্লাস। ২০০২ সালে আশা অডিয়ো বের করে অজয় চক্রবর্তীর কণ্ঠে বারোটি 'রবীন্দ্রনাথের গান', ক্যাসেটের নাম 'অজানা খনির নূতন মণি'।[৩] ২০০২ সালে সারেগামা ইন্ডিয়া প্রকাশ করে বারোটি 'রবীন্দ্র-কাব্যগীতি'র ক্যাসেট 'প্রথম প্রদীপ' : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।[৪]

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেই সময়ের প্রবীন শিল্পী। বাংলা গানকে তিনি অর্ধশতকের বেশি সময় যাবত ভারতীয় সংগীতের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মহৎ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, তাঁর অতুল-অলৌকিক স্বর্ণকণ্ঠে এবং লঘু সংগীতের সুরকাররূপে। রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীরূপেও তিনি সর্বজনঅভিনন্দিত। রবীন্দ্রসংগীতকে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করে তোলাও তাঁর অন্যতম সাধনা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। অজয় চক্রবর্তী তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পী। কিন্তু তিনিও শাস্ত্রীয় সংগীতে দেশে বিদেশে সম্মানিত। এঁরা দুজনে পৃথক্‌ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিকৃত করেছেন, নিজেদের আত্মমর্যাদাকেও ম্লান করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধকার দায়িত্ব সহকারেই এই দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছেন।

'প্রথম প্রদীপ' ক্যাসেটের অন্তর্গত গানগুলির পরিচিতি 'রবীন্দ্র-কাব্যগীতি', রবীন্দ্রসংগীত শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ক্যাসেট-সিডির প্রথায় রবীন্দ্রপ্রতিকৃতির বিবর্ণ একটি আভাস থাকলেও শিল্পীর বর্ণময় চিত্রের তলায় লেখা 'অপ্রকাশিত ও সুরারোপিত গান সহ'। যথা সময়ে এই দুটি শব্দের দুর্জ্ঞেয়তা ও দুর্বোধ্যতা ধরা পড়বে।

ক্যাসেটের প্রথম পিঠের গানগুলি : 'তুমি কি কেবলই ছবি'; 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'; 'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা'*; 'শুকতারকার প্রথম প্রদীপ হাতে'*; 'বাদল বেলায় গৃহকোণে'*; 'পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে'*। ক্যাসেটের দ্বিতীয় পিঠের গানগুলি : 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' (সুর পঙ্কজ কুমার মল্লিক বলে উল্লিখিত); 'আমার প্রিয়ার ছায়া'; 'হে নিরুপমা'; 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়'; 'আর নাইরে বেলা, নামল ছায়া'; 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন'।

* এই তারকা চিহ্নটি (অস্পষ্টভাবে) প্রথম পিঠের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ গানের পাশে আছে। তাই ক্যাসেটের ইনলে পৃষ্ঠায় আছে * সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নিচে ইংরাজিতে লেখা EXCEPT * MARKED, ALL SONGS ARE APPROVED BY VISVABHARATI MUSIC BOARD অর্থাৎ তারকাচিহ্নিত গানগুলিই 'অপ্রকাশিত ও সুরারোপিত', এবং সেইগুলির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ক্যাসেটটির পরিচিতি 'রবীন্দ্র-কাব্যগীতি', কিন্তু বারোখানি গানের মধ্যে চারটি অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ গান রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিচিত কাব্যগীতি নয়। সবগুলিকে একত্রে 'রবীন্দ্র-কাব্যগীতি' বলা কি সংগত? 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' নিয়ে বহু বিতর্ক বহু আলোচনা ইতিপূর্বে এত হয়ে গেছে যে, তার পুনরাবৃত্তি অবান্তর। 'তুমি কি কেবলই ছবি', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', 'হে নিরুপমা', 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়' এবং 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' এগুলি অবশ্যই কবিতার উপর সুরারোপ। কিন্তু 'আমার প্রিয়ার ছায়া' এবং 'আর নাইরে বেলা নামল ছায়া' যথাক্রমে 'সানাই' এবং 'গীতাঞ্জলি'র অন্তর্গত হলেও পূর্বোক্তগুলির তুলনায় কবিতার সুরারোপিত বা স্বতন্ত্রভাবে 'কাব্যগীতি' রূপ বলা যাবে কি না, রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞরা বিবেচনা করবেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চারটি রবীন্দ্র-কবিতায় স্বয়ং সুরারোপ করেছেন। যতদিন দেশে স্বত্ববিধি বলবৎ ছিল। ততদিন সংগত কারণেই বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি এই সুরারোপ অনুমোদন করেননি। অননুমোদনের স্পষ্ট কারণ সুরারোপণকারীর যোগ্যতা বা আরোপিত সুরের গুণাগুণ বিষয়ক নয়। কারণ : রবীন্দ্রনাথের রচনার উপর অন্য কারও সুরারোপণে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির স্পষ্ট তীব্র নিষেধাজ্ঞা। কারণ : বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন

রচনায় অন্য কারও সুরযোজনায় সম্মতি দেননি। এই প্রস্তাব অনুমোদন করেননি (পঙ্কজকুমার মল্লিকের ব্যাপারটি নিতান্তই নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রম)। সংগীত সমিতি রবীন্দ্রনাথের আপন ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আদর্শ-অভিপ্রায় যথাযথ মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ রাখতে দায়বদ্ধ। এই ব্যাপারে অন্তর্জাতিক স্বত্ববিধি বিশ্বভারতীর সহায়ক ছিল। কিন্তু যেই বিধির মেয়াদ শেষ হল, তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, কবির বিশ্বাস, আদর্শ, অধিকার উল্লঙ্ঘনের, অস্বীকার বা অমান্য করার, এক কথায় অশ্রদ্ধা প্রকাশের অবৈধ অশালীন প্রতিযোগিতা শুরু হল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুর দিয়ে নকল রবীন্দ্রনাথ বনে যাবার ইচ্ছা অনেককে চঞ্চল করে তুলল। রবীন্দ্রনাথের সুর-না-দেওয়া গানে বা যে-কোনো কবিতায়, নিজের খর্বতার গর্বময় দাবিতে সুরসংযোগের স্বরচিত অধিকারে তাঁরা মেতে উঠলেন। সে-সবের গুণাগুণ, শ্রবণরম্যতার বিচার আদৌ অপ্রাসঙ্গিক। মূল প্রশ্ন, মহাপ্রতিভার সৃষ্টির উপর অপরের হস্তাবলেপের অধিকার নিয়ে। কিন্তু কুব্‌জ বা বামনের দুরাকাঙ্ক্ষা যুগপ্রসিদ্ধ। কোনো কোনো অশুভবুদ্ধি হয়তো মেঠো উনুনে গোবিষ্ঠা সরবরাহ করে ইন্ধনও জুগিয়েছেন। শোনা যায়, স্বয়ং মৈত্রেয়ী দেবী এই রচনাগুলিতে সুরসংযোগে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে প্ররোচিত করেছিলেন। সারা জীবন তিনি রবীন্দ্রসান্নিধ্যে রবীন্দ্রস্নেহে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছেন। তিনি কি জানতেন না, কবির রচনায় অপরের নিজস্ব সুরার্পণে স্বয়ং কবির কী পরিমাণ অনিচ্ছা, বিরোধিতা ও প্রতিবাদ ছিল? তবু তিনিই এই দুষ্কর্মে উৎসাহ জোগালেন? একথা কি বিশ্বাস্য? 'অহো কী অদ্ভুত কৌতুক'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উক্ত ক্যাসেট প্রকাশের পর মৈত্রেয়ী দেবী নাকি স্বয়ং একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর ভূমিকার কথা স্বীকার করেছিলেন।[৫]

এবার সুরারোপিত গান বা কবিতার দিকে চোখ ফেরানো যাক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একালের ভারতীয় লঘুসংগীতের ক্ষেত্রে একজন লব্ধগৌরব সুরকারের নাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনোনীত কবিতায় তাঁর সুরারোপ এতই সাধারণ, এতই কান-সহা এবং স্বাভাবিকেতর, এতই বহুব্যবহার-জীর্ণ স্টাইলে আড়ষ্ট যে প্রাণ আন্দোলিত হয় না, মন মুগ্ধ হয় না, শ্রবণ পুলকিত হয় না, বুদ্ধি রোমাঞ্চিত হয় না। এগুলিকে অসাধারণ বলতে পারলে সমালোচনার ঝাঁঝ বরং লঘু হলেও হতে পারত। কিন্তু সেখানেও ফাঁক ও ফাঁকির গাঢ় সহাবস্থান। রবীন্দ্ররচনায় সুরাভিষিক্ত তাঁর প্রথম গান 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা' (ইনলে কার্ডে 'হায়' শব্দটি নেই। হায়, তাহলে শ্রোতা এই গান কী ভাবে খুঁজে পাবেন?) উৎসর্গ কাব্যের এই সুপরিচিত কবিতাটি (উৎসর্গ ১২ সংখ্যক) প্রায় এক নীতিবাক্যসদৃশতা লাভ করেছে। তা হল, মহাসূর্য যতই ব্যাপ্তবিশাল হোক তবু একটি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুও তার ক্ষুদ্র বুকে সূর্যকে প্রতিফলিত করে। বুদ্ধিগ্রাহ্য এই কবিতায় শিশিরবিন্দুর ক্ষুদ্রতার আক্ষেপ ও সূর্যের উদার সান্ত্বনা দ্বিরালাপে উক্তির চিহ্নিত আধারে প্রকাশিত। তাই সতর্ক কাব্যপাঠের দ্বারাই ভাবগ্রহণ সহজ হয়। সুরে আবৃত্তির মতো যেন কবিতাপাঠ শুনছি, গানটি শুনলে তাই মনে হয়। স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ইত্যাদি বিভাজন কবিতায় নেই। তাই গানেও কবিতা পাঠের ঢঙই রক্ষিত। যদিও সুরের গঠনে অন্তরা ('শিশির কহিল কাঁদিয়া' এবং 'শিশিরের বুকে আসিয়া') বোঝাবার চেষ্টা আছে। কিন্তু শিশিরটুকুকে সান্ত্বনা দানের জন্য সূর্যের রশ্মি যদি নত হয়ে শিশিরের কানে কানে তার স্নেহসূচক সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করবে, শ্রোতার যদি এমন প্রত্যাশা জাগে, তবে তা মুহূর্তের মধ্যে বিধ্বস্ত হয় 'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো' এই অংশের তারা—গ্রামে নিয়ে যাওয়া উচ্চস্বর শুনে। কথার সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্যের যে রহস্য স্বয়ং কবির গোপন অথচ অনায়াস-স্বচ্ছন্দ সিদ্ধি, তা অক্ষমের হাতে পড়ে এই দুর্গতিই পায়।

সুরারোপিত পরবর্তী কবিতাটি আগে উদ্ধৃত করি, কারণ শ্রোতা বা পাঠক এটি রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাসংগ্রহে খুঁজে পাবেন না। এমনই রহস্যময় ব্যাপার :

শুকতারকার প্রথম প্রদীপ হাতে
আলোর আভাস জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু উদয়-তোরণে
তোমারে জাগাব বলে
তরুণ আলোর কোলে।
যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি
যে জাগায় মোছে ধরার মলিন-ধূলি
অসীমের কাছে মুক্ত করে সে
পূর্ণ মাধুরী ডালি।
জাগে সুন্দর জাগে নির্মল
জাগে আনন্দময়ী
জাগে জড়ত্বজয়ী
রুধিয়া তোমার দ্বার
বন্ধ করিয়া রেখো না
রাতের অন্ধকার
বহুক উদার বায়ু
শিরায় শিরায় রক্তে তোমার
বহুক অমৃতআয়ু
বিজয়লক্ষ্মী-পাদপীঠতলে
আপনারে কর দান
তোমার জীবনে ব্যর্থ না হোক
কবির যে আহ্বান।।[৬]

বিচিত্র এই রবীন্দ্র-কথিত বা রবীন্দ্রলিখিত কবিতাটি মৈত্রেয়ী দেবীর পুনর্নির্মাণ, যার সন্ধান তিনি ছাড়া আর কারও জানা নেই। উপকরণগুলির সম্ভাব্য উৎস হল নবজাতক কাব্যের উদ্বোধন কবিতার ('প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে') শেষ স্তবক :

যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি
মুক্ত করে সে পূর্ণ-মাধুরী-ডালি।
জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
জাগি এ সুপ্রভাতে,

বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহো আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।

এই কবিতাটির প্রথম সুচনা ১৯৩৮ (১৩ অক্টোবর), গ্রন্থপরিচয়। বিশ্বভারতী রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪শ খণ্ড দ্র পৃ ৪৬৬। তদুপরি জানা যায়, 'উদ্বোধন' নামে কবিতাটির প্রথম পাঠ প্রকাশের উৎস 'শতদল'।[৭] কষ্টিপাথর। প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ। গ্রন্থপরিচয় থেকে আরও জানা যাচ্ছে :

"উদ্বোধন কবিতাটির যে-পাঠ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ছিল। উক্ত পাঠ অনুসারে নিম্নোদ্ধৃত নূতন চারটি ছত্রের অনুবৃত্তি-স্বরূপ নবজাতকে মুদ্রিত পাঠের শেষ একাদশ ছত্র (পৃ. ৭)

শুকতারকার প্রথম প্রদীপ হাতে
অরুণ-আভাস জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু তোমারে জাগাব বলে
তরুণ আলোর কোলে—"

সুররোপিত গানের প্রায় সবটাই উদ্ধার করা যায় বিখ্যাত রচনা 'প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে' (২৫ বৈশাখ ১৩৪৫) কবিতাটি থেকে। শেষ স্তবকটি বাদে প্রথম দুটি স্তবকে সুরারোপ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তারপর সেটিকে তিনি তাঁর সমগ্র সংগীত সৃষ্টি গীতবিতান-এর ভূমিকা রূপে স্থাপন করেন। সুর-না-দেওয়া স্তবকের অংশবিশেষে আরও কিছু বাক্য পরে যোজিত হয়েছিল। তারই সঙ্গে আরও কিছু শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য রহস্যচ্ছলে কবি যোগ করে থাকবেন, অথবা বর্জন করেছিলেন। হয়তো এই সংস্কার-কাটাকুটি-বর্জন ব্যাপারগুলি ঘটেছিল কবির মংপুতে/কালিম্পঙে অবস্থানকালে, মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিচারণায় তার উল্লেখ আছে। বহুবছর পরে সেই অংশকে ইচ্ছামতো একটি কবিতার আকারে রূপ দিয়ে, তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় চরণকে প্রথম চরণে রূপান্তরিত করে একটি সর্বজনীন সম্বোধনকে ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতায় রূপান্তরিত করায় ও আধুনিক গানের জনপ্রিয় শিল্পীকে দিয়ে সুর করিয়ে শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করলেন। একে কী বলা যায়? শ্রদ্ধা? কেন তবে ঘটল এই বিকৃতি! বিড়ম্বনা! বিভ্রান্তি!

হেমন্ত সুরারোপিত তৃতীয় কবিতা 'বাদল বেলায় গৃহকোণে'। এটির উপর সুরারোপের প্রস্তাব শিল্পী-সুরকারকে যে-ই দিয়ে থাকুন, তিনি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শিল্পীকে অপদস্থ করেছেন। কারণ শিল্পী অভ্যাসবশত সুর করেছেন। কবিতার ভাষা তার গূঢ়ার্থ, কবির আন্তরিক অভিপ্রায় বা রহস্যবোধের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে এই শিল্পীর নেই। তাই তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইলে, আধুনিক গীতিকারের রচনায় যেমন সুর করেন, তেমনি সুরই করেছেন। আর শ্রোতাও একটি আধুনিক গানই শোনেন, দুর্ভাগ্যবশত যার গীতিকারের নাম রবীন্দ্রনাথ। বিভ্রান্তি কোথায় দেখা যাক। মূল কবিতার সম্পূর্ণ রূপটি চোখে-দেখা দরকার। কবিতাটি সানাই কাব্যের অন্তর্গত, শিরোনাম 'নামকরণ'। উদ্ধৃতি :

বাদলবেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে,

তাই সে আমার শোনামণি।
প্রচলিত ডাক নয় এ যে
দরদীর মুখে ওঠে বেজে,
পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে
প্রাণের ভাষাই এর খনি।
সেও জানে আর জানি আমি
এ মোর নেহাত পাগলামি,
ডাক শুনে কাজ যায় থামি
কঙ্কণ ওঠে কনকনি।
সে হাসে আমিও তাই হাসি
জবাবে ঘটে না কোনো বাধা,
অভিধান-বর্জিত ব'লে
মানে আমাদের কাছে সাদা।
কেহ নাহি জানে কোন্ খানে
পশমের শিল্পের সাথে
সুকুমার হাতের নাচনে
নূতন নামের ধ্বনি গাঁথে
শোনামণি, ওগো সুনয়নী।

কালিম্পং গৌরীভবনে বাসকালে ২৪মে ১৯৪০ তারিখে লিখিত এই কবিতা হয়তো মৈত্রেয়ী দেবীর উদ্দেশেই কবির কাব্যকৌতুক। আপ্যায়নকারিণীর রবীন্দ্ররচনা নীরবে শোনার চিত্ররূপটি নিয়েই কবির কৌতুক। কবির আনন্দ সর্বদা মৈত্রেয়ী দেবীকে বিমুগ্ধ শ্রোতা হিসেবে পাওয়া। তাই নতুন নাম দিচ্ছেন তাকে—শোনামণি। কিন্তু গানে তা শোনাচ্ছে সোনামণি। নিজস্ব অর্থে। তাহলে কবির নতুন ডাকের মজা গেল কোথায়? 'প্রচলিত ডাক নয়, এ যে' এর তাৎপর্য রইল কী? 'অভিধান বর্জিত বলে' এই কথাগুলির বা অর্থ কী? কবিতার শিরোনামই তো 'নামকরণ'। বেচারি শিল্পীর কোনো দোষ নেই। কারণ পছন্দের অধিকার নিশ্চয় তাঁর উপর ছিল না।

এছাড়াও শিল্পী শুরু করেছেন ভুল ছন্দে। এটি যন্মাত্রিক কলাবৃত্তের কবিতা নয়, অর্থাৎ :

বাদলবেলায়। গৃহকোণে ৬+৪
রেশমে পশমে। জামা বোনে, ৬+৪
নীরবে আমার। লেখা শোনে, ৬+৪
তাই সে আমার। শোনামণি ৬+৪

এটি ভুল মাত্রাবিভাজন, ভুল পর্বনির্দেশ। যথার্থ ছন্দরূপ এই :

বাদলবেলায় গৃহ। কোণে ৮+২
রেশমে পশমে জামা। বোনে, ৮+২
নীরবে আমার লেখা। শোনে, ৮+২
তাই আমার শোনা। মণি ৮+২

সমগ্র কবিতাটি পাঠ করলে সঠিক মাত্রা ও পর্বের হিসেব বোঝা যাবে। শিল্পী-সুরকারকে এই নির্ভুল ছন্দটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। তাই কানে যে পর্বরূপ সঠিক মনে হয়েছে সেই ভাবে অক্লেশে সুর বসিয়েছেন। যেখানে বাধা এসেছে সেখানে গোঁজামিলে পার পেতে চেয়েছেন, সূক্ষ্মকাণে ধরা পড়ে।

'পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে' 'অসম্ভব' শিরোনামের এই কবিতা সানাই কাব্যভুক্ত। বিষয়, কবির অতীত প্রেমের বিষণ্ণস্মৃতির আবহ মনে-পড়া। এই নির্বাচন সুখকর হয়নি। সুরও, সেই মুদ্রা দুষ্ট পুনরাবৃত্তিতে শ্রুতিকে প্রসন্ন করে না।

রবীন্দ্ররচনায় সুরারোপ একটি অনুচিত প্রয়াস, এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করা বাহুল্য মাত্র। আর সুরযোজনায় শিল্পী ও সুরকার তাঁর নিজস্ব মুদ্রাদোষের শিকার হয়েছেন বারবার, অপচেষ্টার বিড়ম্বনা সযত্নে প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রসংগীত কথা ও সুরের যুগল মিলনে একটি অপরূপ গ্রন্থনা। গীতিকারের কাগজটিকে হারমোনিয়ামের উপর বসিয়ে রিড-টেপা মাত্র নয়। তবু রবীন্দ্র-রচনায় অপরের সুরারোপ? 'মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।'

'কিছুতে কিছু আসে যায় না।'

রবীন্দ্রসংগীত কথা ও সুরের এক অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য, সার্বভৌম ও নান্দনিক সৃষ্টি। কোথাও তার উপর কোনো বিচ্যুতি, সংস্কার, রূপান্তর বা সংযোজন এক অক্ষম হঠকারিতা। অথচ শিক্ষাভিমানী অনেকেই অনেক খঞ্জ কৈফিয়তে তাতে হস্তক্ষেপ করতে যান। শুভবুদ্ধির সমালোচনায় পরম উপেক্ষায়, অসহিষ্ণু ভাষায় বলেন, গ্রাহ্য করি না। অপবুদ্ধি-প্ররোচিত এই ঔদ্ধত্য কোনো প্রতিরোধ-প্রতিবাদে বাধা পায় না। তাই কোথাও কোনো প্রতিবাদ না থাকায় রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে পরীক্ষা, ধৃষ্টতা, বিকৃতি অপ্রতিহত বেগে ঘটে চলেছে গণমাধ্যমে বা লোকমুখে শোনা যায়। হয়তো, সব খবর কানেও আসে না।

চলচ্চিত্রের রঙ্গভূমি এই জাতীয় বিকৃতিবিলাসের বড়ো নির্ভয় ঠেক বলে মনে হয়। মায়াবন-বিহারিণী হরিণী গানের অরাবীন্দ্রিক ব্যবহার হয়েছে বেডরুম ছবিতে। বং কানেকশানের অন্তর্বর্তী 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' তো শুনে থাকি একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কেচ্ছা। দত্ত ভার্সাস দত্ত ছবিতে দুই শিল্পীর কণ্ঠে 'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে' গানেও সেই রবীন্দ্রদ্রোহিতা। আশা অডিয়ো প্রকাশিত টেগোর অ্যান্ড উই দ্বিতীয় খণ্ডের সিডি-তে জনৈক অবাঙালি ও দুই বঙ্গীয় শিল্পী রবীন্দ্রনাথের তোমায় গান শোনাব এই গানের প্রচলিত সুরের উপর মর্ষকামিতার ছাপ রেখে গেছেন। এঁদেরই কেউ ভানুসিংহের নামাঙ্কিত পদ 'শুন লো শুনলো বালিকা'-র প্রচলিত সুরের শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছেন। 'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে' গানেও সেই দুর্গতি ঘটানো হয়েছে। ইন্টারনেটে এঁদেরই কণ্ঠে জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক' গানের সম্পূর্ণ রূপটিকে প্রকাশ্য রাজপথে শ্লীলতাহানির সদম্ভ শিল্পে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে বলে রবীন্দ্রসংগীত-অনুরাগীদের কাছে শুনেছি।

স্বত্ববিধি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রত্যাহৃত হয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় সৃষ্টির স্বত্বাধিকার যতদিন বিশ্বভারতীর উপর ন্যস্ত ছিল, ততদিন রবীন্দ্রনাথের রচনার শালীনতা ধর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে মুখ লুকোয়নি। এখন স্বত্বাধিকার জনগণের উপর বর্তেছে, যাঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত উচ্চারণ ছিল 'আমি তোমাদের লোক'। একটি প্রচলিত রসিকতা শুনেছি। ট্রেনের কামরায় লেখা, 'এই গাড়ি জনগণের সম্পত্তি।' সেই কামরায় যতগুলি বিদ্যুৎপাখা লাগানো ছিল তার একটিও নেই। সেখানে কালি দিয়ে লেখা, 'আমার সম্পত্তি আমি বুঝিয়া পাইলাম।'

জনগণ এখন রবীন্দ্রসম্পত্তি বুঝে পেতে শুরু করেছেন। আগেই অজয় চক্রবর্তীর নামোল্লেখ করা হয়েছে। স্বত্বলোপের পরে ২০০২-এর ডিসেম্বরে আশা অডিয়ো থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের গান' ক্যাসেট। তার শীর্ষনাম হল, 'অজানা খনির নূতন মণি'। 'অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার' রবীন্দ্রনাথের একটি গানের প্রথম চরণ হলেও সেই গানটি এই ক্যাসেটে নেই। তাই উক্ত গানটির সঙ্গে ক্যাসেটের বা ক্যাসেটভুক্ত গানগুলির কোনো সম্পর্ক নেই বোঝা গেল। তাহলে 'অজানা খনি' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে স্পষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথর গান সমগ্রভাবে কি অজানা খনি? উন্মাদও এমন ভাবনা প্রশ্রয় দেবে না। তবে কি সূক্ষ্মভাবে বলা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের জানা-গানের মধ্যেই রয়ে গেছে নিশ্চয় কোনো অজানা খনি, যেখানে থেকে তিনি নূতন মণি-র সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু ইনলে কার্ডে শিল্পী তাঁর গানের ভূমিকা-স্বরূপ অনেক কথা বললেও এই নামকরণের উক্ত ব্যাখ্যা এড়িয়ে গেছেন, শ্রোতাদের জন্য একটি প্রশ্নচিহ্ন উপহার দিয়ে।

শিল্পী স্বয়ং যা বলতে চেয়েছেন তা হল এই :

> ''রবীন্দ্রনাথের গানের ভিত্তি ভারতীয় সনাতন রাগ সঙ্গীত। তাই এই গানগুলির আবেদন সামগ্রিক ও চিরন্তন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা, ঠুমরীর রূপ। সেই কারণেই ভারতীয় রূপসঙ্গীতের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ক্রিয়াত্মক শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত এই গানের পরিবেশন, আমার মতে, এর রচয়িতা ও তার অন্যান্য সৃষ্টির মর্যাদাহানির নামান্তর।''

এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদনীয় কিছু নেই, তবে অজানা খনির নূতন মণির-র ব্যাখ্যা নেই। আর ধ্রুপদের সঙ্গে ঠুমরী-র উপর গুরুত্বদান কি রবীন্দ্রসংগীত যথার্থ দাবি করে? কীর্তন ও দেশী গানের দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের ভিত্তি গড়ে তোলেননি? ইতিপূর্বে রবীন্দ্রসংগীতকে তার যোগ্য মর্যাদায় স্থাপন করে গেছেন যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে, যেমন, কনক দাস, সতী দেবী, সাহানা দেবী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বীরেন রক্ষিত, সুবিনয় রায়, নীলিমা সেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন কমবেশি শাস্ত্রীয় সংগীত ততটাই শিখেছিলেন কেউ 'ওস্তাদ' বা 'পণ্ডিত' এইসব তকমার গর্বে চলাফেরা করতেন না। তাহলে এঁরা অজয় চক্রবর্তীর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'অনন্য সৃষ্টির মর্যাদাহানি' ঘটিয়েছেন?

উক্ত ইনলে-কার্ডের ভিতরের বাক্যগুলি পদে পদে বাগাড়ম্বর-স্ববিরোধিতা, বহু জীর্ণ পরিত্যক্ত বিতর্কের একঘেয়ে পুনরুক্তি। তিনি মনে করেন, ''রাগের গাম্ভীর্য ও *কাব্যের গভীরতাকে* একত্রে পূর্ণতা দান করার এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে তিনিই একমাত্র সফল হতে পারেন যিনি ভারতীয় রাগসঙ্গীতে সুদক্ষ হবার সমান্তরালে বাংলা ভাষায় একজন গুণী ও বিদ্বান হবেন।'' (বক্রাক্ষর ইচ্ছাকৃত আমার।) সাধু মন্তব্য। তাহলে তিনি নিজেকে 'বাংলা ভাষায় একজন গুণী বিদ্বান' বলে মনে করেন? যদি মনে করেন, তবে আমরা তার পরিচয় থেকে শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত কেন? যদি মনে না করেন, তবে তিনি এইসব 'রবীন্দ্রনাথের গানে' কণ্ঠক্ষেপ করলেন কেন?

শুদ্ধ সংগীতশিক্ষায় স্বরলিপির সীমাবদ্ধতার কথা নতুন করে বলা বাহুল্য। কিন্তু তিনি যখন মন্তব্য করেন, ''রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় সঙ্গীত ভাবধারার প্রাণশক্তি নীরস স্বরলিপির মধ্যে আবদ্ধ থেকে বারবার নিজের ভাবার্থ ও মহিমা প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হোক এটা কখনই কাম্য নয়। স্বরলিপি-নির্ভর রবীন্দ্রনাথের গানের পরিবেশনে এই গানের বিকৃত রূপকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে আমি মনে করি।''

আবার সেই পুরাতন বিতর্ক! সত্তর-আশি বছর আগে এই বস্তাপচা গলিত তর্কে দিলীপকুমার রায় রবীন্দ্রনাথকে ভজাতে পারেননি। স্বরলিপি-নিবদ্ধ সুররূপের বাইরে 'শিল্পীর স্বাধীনতার' নামে অনভিপ্রেত যথেষ্ট সুরবিহার বা ইমপ্রোভাইজেনকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কোনো মহাপণ্ডিতম্মন্যকেও আর নতুন করে বাহবা দেওয়া শিষ্ট রুচিশীল রবীন্দ্র সংস্কৃতির শুদ্ধাচারীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্যাসেটের গানগুলি হল—প্রথম পিঠে 'আমি চঞ্চল হে'; 'ও কেন ভালোবাসা'; 'সুখহীন নিশিদিন'; 'বাণী তব ধায়', 'আমিই শুধু রইনু বাকি', 'চির সখা, ছেড়ো না মোরে'। দ্বিতীয় পিঠে 'আজি কমলা মুকুল দল খুলিল'; 'চিত্ত পিপাসিত রে'; 'কার মিলন চাও বিরহী'; 'কথা কোস-নে লো রাই'; 'রাখো রাখো রে'; 'অসীম কালসাগরে'। গানগুলি কালানুক্রমিক ভাবে গৃহীত হয়নি, কোনো ভাবের পর্যায় অনুসরণ করেনি। কেবল রাগ-সুর ইত্যাদির দিক থেকেই শিল্পীর প্রয়োগবিদ্যার উপাদান হয়েছে।

আমি চঞ্চল হে একটি কবিতার উপর কবির সুরারোপ। কবিতার বাণী ও ধ্বনিকে গুরুত্বদানই এই জাতীয় গানের আদর্শ। সুর তার সহায়ক মাত্র। কবিতাটির সুর কাব্যের নিগূঢ় নিহিতার্থকে প্রকাশ করার ভূমিকাই পালন করে। এ গানে ভৈরবীর স্বরবিন্যাস এসেছে স্বাভাবিকভাবে, উদারা থেকে তারা-য় সঞ্চারিত হয়েছে ধীরস্থির গম্ভীর গতিতে। কবির ভিতর মহলের চঞ্চলতা তার বাহির-মহলের নিরুপায় স্থবিরতার গায়ে যেন তরঙ্গের মতো ধাক্কা দিচ্ছে। এই অচলতা ও অস্থিরতার অসহায় অথচ অবাধ্য বিরোধ প্রকাশেই গানটির সৌন্দর্য। শাস্ত্রীয় সংগীতের পালোয়ানি কেরামতি দেখানোর গান এটি নয়। আলোচ্য ক্যাসেটের পূর্বোক্ত ইনলে-পৃষ্ঠায় শিল্পীর আপন স্বীকৃতি এই প্রকার :

> ''রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানত গীতিকবিতা ও কাব্যাশ্রিত সঙ্গীত। এর অনন্যসাধারণ কাব্য-মাধুর্যকে প্রকাশ করার জন্যই কখনও কখনও বিভিন্ন ভারতীয় রাগের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাগপ্রকাশক ও রাগের ভাবপ্রকাশক আদর্শ 'বন্দিশ' বলতে যা বোঝায় তার উদাহরণ এগুলি নয়। এগুলি এমন রচনা বলে আমি মনে করি যেগুলির কথার ভাবকে সম্যকভাবে প্রকাশ করার জন্য একটি নির্বাচিত রাগের ভাবকে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি তাই রাগের গান নয় বা এগুলির উদ্দেশ্য রাগের স্বরূপ বর্ণনা নয়।''

শিল্পী এই সত্যে আস্থাবান হলে 'আমি চঞ্চল হে' গানটি কেন বাছলেন? এটি তাঁর কণ্ঠের গান নয়। তাই গানটি তাঁর অক্ষম পরিবেশনা। আর 'চ ঞ্চ ল হে' তাঁর বিকৃত ক্লিষ্ট উচ্চারণে হয়েছে 'চন্ন্ন্চল হে'। একটি অপরূপ বুদ্ধিগম্য কাব্যসংগীতের এই বোধবুদ্ধিবর্জিত উচ্চারণে শ্রোতার রসগ্রহণের সহিষ্ণুতা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

'ও কেন ভালোবাসা' গানটি তাঁর দ্বিতীয় শিকার। এই গান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ''গানটির স্বরলিপি অনুসরণ করলে গানের সাধারণ যতি, ছন্দ, ভাব বিনষ্ট হয়।'' তাঁর এই আবিষ্কার তাঁরই মৌলিক গবেষণা। গানটি কবির মাত্র বাইশ বছর বয়সের রচনা। এই বয়সে কবি তৎকালীন নাগরিক জীবনের আখড়াই হাফআখড়াই কবিগান খ্যামটা চালের গানে রুচিহীন পরিবেশনকে তিরস্কৃত করার জন্যই সেগুলিকে পরিমার্জিত করে, শোভন সুন্দর পরিপাটী শিল্পিত আকারে রূপায়িত করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবনের সৃজনশীলতার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচ্য শিল্পীর বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। তাই এই গানটিকে তিনি ঠাকুরবাড়ির শৈল্পিক রুচি ও শুচির পরিমণ্ডল থেকে ছিনতাই

করে তাকে খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলের বাইজিদের হাতেই সমর্পণ করেছেন। তাই গানটির প্রচলিত স্বরলিপি তাঁর অপছন্দের কারণ। সমস্যা হল, গানটি যেমনভাবে রবীন্দ্রনাথ গাইতেন, স্বরলিপিটি তারই সনিষ্ঠ সতর্ক শ্রদ্ধেয় প্রতিরূপ। অজয় চক্রবর্তী মশায় রবীন্দ্রনাথের সেই বাইশ বছরের গায়নরীতিকেই কলঙ্কিত করে কবির অসম্মান ঘটিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, ভারতীয় রাগসঙ্গীত কখনই ''স্বরলিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই সঙ্গীত পরিপূর্ণতা ও যাথার্থ্য লাভ করেছে অন্যান্য সঙ্গীত সাধকদের কণ্ঠে। আমাদের গুরুস্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞদের অসামান্য পরিবেশনার গুণে মহিমান্বিত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে ভারতীয় রাগসঙ্গীত।'' তাই এই ইনলে কার্ডে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ-এর সাদাকালো ধূসর ফটো ও তার নিম্নে অজয় চক্রবর্তীর রঙিন ফটো—এই গুরুশিষ্যের যুগলবন্দি। কিন্তু গুরু জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের হাতে রবীন্দ্রনাথের এহেন ধোলাই, পরিষ্কারণের কোনো উদাহরণ আমাদের স্মরণে নেই।

'সুখহীন নিশিদিন' গানটি একটি তারানা ভাঙা ব্রহ্মসংগীত। তার মূল তারানা-রূপ কালোয়াতিকে সংযত করে একটি শোভন বাংলা কাব্যগীতি তথা ভক্তিগীতি রচনাই ছিল আটত্রিশ বছর বয়সের কবির ইচ্ছা। তাঁকে যেন বিদ্রূপ করেই অজয় চক্রবর্তী মশায় রবীন্দ্রনাথের রূপায়ণের সঙ্গে মূল তারানার কালোয়াতিকে ফিরিয়ে এনেছেন। যে-কোনো নিম্নমানের শাস্ত্রীয় সংগীতের ছাত্রই এ কাজ করতে পারেন, তার জন্য এক ভারতবিখ্যাত ওস্তাদের কী প্রয়োজন? এই একই জিজ্ঞাসা এই ক্যাসেটের 'বাণী তব ধায়', 'রাখো রাখো রে', অসীম কালসাগরে', 'আজি কমলমুকুল দল খুলিল', 'কার মিলন চাও বিরহী' 'চিত্ত পিপাসিত রে' গানগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য। রাগসংগীতকে রবীন্দ্রসংগীত করে তোলাই এক প্রতিভাধর শিল্পীর সাধনা। রবীন্দ্রসংগীতকে রাগসংগীতের স্থূলতায় নামিয়ে আনা এক নিষ্প্রতিভ শিক্ষার্থীর বদভ্যাস মাত্র। এর জন্যে এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন ছিল না। শিল্পী যখন স্বয়ং ''রাগসঙ্গীতে সুদক্ষ হবার সমান্তরালে বাংলা ভাষায় একজন গুণী ও বিদ্বান'' বলে বিশ্বাস করেন তখন এই গানগুলির জন্যে বাণী নিজেই রচনা করে নিতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল, 'অল্পবিদ্যা কিনা ভয়ংকরী'। তাই 'কথা কোস-নে লো রাই' গানটিকে কী বাঁধা রাগপ্রধানীয় গতে ফেলে চটকানো হয়েছে—বাহাদুরির চূড়ান্ত, রূপ! হায় অদৃষ্ট। এ কাজ বাইশ বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথ অনেক ভালো ভাবেই করতে পারতেন। কারণ তিনি বিষ্ণু চক্রবর্তী যদুভট্টদের মতো গুণীদের কাছে তালিম পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে গ্রাম্য নারীদের মুখে একটি লঘু কৌতুকের গান। তাই 'তোরা যাসনে যাসনে যাসনে দূতী' দাশরথি রায়ের এই গানটির সুরটাকেই ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু এসব কথা এই মহাগুণী শিল্পীর কাছে গ্রাহ্য হবার নয়। বিশিষ্ট সংগীততত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী-র লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিই :

''...রবীন্দ্রগানের মর্মজ্ঞ শঙ্খ ঘোষের স্পষ্ট উচ্চারণ :

'অজানা খনির নূতন মণি' ক্যাসেটটি আমি বারবার শুনতে চাইব কি না, আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর হবে 'না'।...

রবীন্দ্রনাথের গানের কথাগুলিতে এসব অতিরিক্ত রাগকৌশল আমার রুচি/পছন্দের বাইরে। অবশ্য এতসব বিদগ্ধ রসিক ও শিল্পীজনের বিরুদ্ধ মতামত ও তির্যক ব্যঙ্গ সম্পর্কে স্বয়ং অজয় চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত নির্বিকার ও আত্মম্ভরিতায় অসহনীয়। তিনি স্পর্ধাভরে অবিনয়ী অশিষ্টতায় বলেছেন :

কে কী বলল, কে রবীন্দ্র স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইনি বলে গাল পাড়ল, কী ধৃষ্টতা বলল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তাদের কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না।

আমাদের লেখা এবারে শেষ হয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের মতো সংগীতকার সারা পৃথিবীতে এখনো দু'জন আসেননি। কাজেই সেই অনন্য স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি ও তার গায়ন প্রসঙ্গে যে বৃত্তান্ত এতক্ষণ আমরা লিখলাম তার পরিণামে মনে এল দিলীপকুমারের সেই পূর্বকথিত উক্তি : 'আপনি ... বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের caricature নিবারণ করতে পারবেন না।' এই উক্তি আজ কিন্তু উলটোভাবে ফলে গেল। বাজে শিল্পীর দ্বারা নয়, মস্ত বড় এক ওস্তাদ অনিবারণীয় ঔদ্ধত্যে রবীন্দ্রনাথের গানে হস্তাবলেপ করে গেলেন।[৮]

রবীন্দ্রনাথের গানের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে উন্মাদের তাতা থৈ থৈ চলছে চলবে। শুভবুদ্ধির সমালোচনাকে তারা গ্রাহ্য করে না। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেও ছিল। জন্মশতবর্ষের পরেও ঘটেছে, স্বত্বলোপের পরে, এবং সার্ধশতবর্ষ পেরিয়ে। তাই কবিরও প্রশ্ন ছিল : 'রাত কত হল? উত্তর মেলেনা।'

অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে—
ওকি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল!
ও কি ঘূর্ণাতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ!
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয় নিনাদ!
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরি নিঃসৃত গদ্গদকলমুখর পঙ্কস্রোত;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয়-ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে;
বলে, 'হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল!'
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে;
বলে—কিছুতে কিছু আসে যায় না। (শিশুতীর্থ)

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। প্রবুদ্ধ বাগচী-র প্রবন্ধ 'সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে' : নতুন কবি সম্মেলন, শারদীয়া ২০১৩, পৃ ২৪৫-৫৫

২। একদিন দৈনিক, ডাকবাক্স (চিঠিপত্র), ১১ জুলাই ২০১৩

৩। ক্যাসেট AA3073 STEREO PLATINUM, আশা অডিয়ো

৪। ক্যাসেট FPVS 843777 STEREO, সারেগামা এইচ এম ভি

৫। কোনো কোনো দৈনিক পত্রিকায় এই সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণ বেরিয়েছিল।

৬। প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭-এর 'কষ্টিপাথর' এই নামের বিভাগে প্রকাশিত কবিতাটি :

শুকতারকার, প্রথম প্রদীপ হাতে
আলোক-আভাস-জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু তোমারে জাগাব বলে
তরুণ আলোর কোলে,—
যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,—
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি
মুক্ত করে সে পূর্ণমাধুরী-ডালি।
জাগে সুন্দর জাগে নির্মল
জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
আজ এ সুপ্রভাতে,
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে
        লহ আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
        নিখিলের আহ্বান।

৭। 'শতদল' সম্ভবত কোনো পত্রিকার নাম। তবে প্রবাসী-তে শতদল শব্দের সঙ্গে আর কোনো তথ্য ছিল না।

৮। সুধীর চক্রবর্তী : গান হতে গানে, পৃ ২৭০

চিঠিপত্রে স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ

অলোক রায়

কবিকে যে তাঁর জীবনচরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এ কথা রবীন্দ্রনাথ কতবার কতভাবে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। 'মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে' সে তো কবি নয়, আবার 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো।' তাহলে কবিকে কোথায় পাব, কীভাবে পাব? ইউরোপে জীবনচরিত রচনার প্রধান উপাদান ডায়েরি আর চিঠি। রবীন্দ্রনাথ ডায়েরি লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না, তবে সম্ভবত দু'বার দিনপঞ্জি রচনার চেষ্টা করেন ('পঞ্চভূতের ডায়ারি'-কে অবশ্য আলোচনার বাইরে রাখব), প্রথম যৌবনে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' রোজনামচা হিসেবে উপভোগ্য, তবে সেখানেও তথ্য নথিভুক্ত করার থেকে আত্মপর্যালোচনা প্রধান হয়ে উঠেছে, আর পরিণত বয়সে লেখা 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' নামেই দিনপঞ্জি, আসলে 'গাছতলায় শুকনো পাতার নীচে ঝড়ে-পড়া কাঁচাপাকা' ফল যা 'সাহিত্যের ভোজে ব্যবহার করার বাধা নেই।' ডায়েরি লেখা যে কবির স্বভাবসংগত নয়, আমরা তা জানি। রবীন্দ্রনাথের মনে হয় 'ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতিদিন থেকে ছোটোবড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়।' পরে তা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যে জীবনচরিত লেখা হয়, তার মধ্যে জীবনটাই বাদ পড়ে যায়, রচিত হয় 'মৃত চরিতের কবর', তাকে স্মরণস্তম্ভ বলতে পারি। কিন্তু সমগ্র জীবনের সত্য তার মধ্যে মেলে না। তুলনায় অল্প বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লেখার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরার পথ খুঁজে পেয়েছেন, ভর্তি মনের অবস্থায় জরুরি কথা ছাপিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে যে মুখরতা, তা কখনও প্রকাশ পায় বৈঠকি আলাপে, কখনও ডায়েরির স্বগত লিখনে, কখনও বকুনি চালান হয় চিঠির সহজ রাস্তায়। 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮) নামে পত্রসংকলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ধ্বনিহীনতার বয়সে পৌঁছে 'সেদিনকার বাণীমুখর ঋতুর ফসলের' কথা বলেছেন। সর্বজনের দরবারে যে 'সাধারণ সাহিত্য' তার স্থান রবীন্দ্র-রচনাবলীতে, আর অন্তরঙ্গ মহলের জন্য লেখা 'চিঠির সাহিত্য' যার পরিমাণও নিতান্ত কম নয় যথা 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'পথে ও পথের প্রান্তে' ও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত আপাতত উনিশ খণ্ড 'চিঠিপত্র'। এর বাইরে আরও কত চিঠি পড়ে আছে পত্রিকার পাতায়, রবীন্দ্রভবনে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে তার হদিশ আমাদের জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি অনেকদিন পর্যন্ত আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভাইঝি ইন্দিরা বা স্ত্রী মৃণালিনী অথবা পুত্রকন্যাদের উদ্দেশে লেখা চিঠি এক সময়ে ছেপে সাধারণের সাহিত্য হিসেবে বাজারে বিকোবে, একথা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি। পরে যে তিনি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেননি, তাও নয়। তবে অনেক সময় পত্রপ্রাপকের কাছ থেকে নিজের লেখা চিঠি বা চিঠির কপি ফেরত চেয়েছেন, কারণ ব্যক্তির দাবিকে ছাপিয়ে গিয়েছে সাধারণের দাবি। ক্রমশ চিঠির পরিমাণ কমেনি বরং দাবিদার যত বেড়েছে, চিঠির সংখ্যাও তত বেড়েছে। চিঠি পেয়ে কবি প্রাপ্তিস্বীকার করবেন

না, এমন ঘটনা বোধহয় শেষ শয্যাগ্রহণের আগে পর্যন্ত ঘটেনি। কবিতার মতো এসব চিঠি বারবার পড়তে হয়, কারণ, 'যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,/যে আমি আমাকে বুঝিতে বুঝাতে নারি' তাকে ধরা যায় একমাত্র কবির চিঠিতে। কোনও একদিন প্রকাশিত হবে রবীন্দ্রনাথের 'পত্রসমগ্র', আর সেদিন হয়তো লেখা সম্ভব হবে সেই কাঙ্ক্ষিত কবিজীবনী, যা 'সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ' করবে না, চেষ্টা করবে কবির 'প্রাণপুরুষ'কে আবিষ্কার করতে।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এক পরম বিস্ময়। কী বিচিত্র বিপুল সেই সৃষ্টি। কোনও খণ্ড সীমায় সাহিত্যশাস্ত্রীর আদেশ-নির্দেশে তার পরিচয় মেলে না। কবির কর্মজীবনও বহুধা বিস্তৃত—সেই শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতন, কলকাতার জোড়াসাঁকো থেকে ইউরোপ-আমেরিকা। বাইরে প্রশান্ত স্থির স্থিতধী পুরুষ, ভিতরে চিরচঞ্চল অস্থির প্রাণবান পুরুষ। এই পৃথিবীতে হাজার বন্ধনে মানুষ বাঁধা থাকে, সমাজ-সংসার, দেশ-কাল, কর্ম ও ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ রচনা করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সব কিছুর মধ্যে থেকেও যেন সব কিছুর বাইরে। ১৯২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে তিনি লিখেছেন, 'কতকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল; ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বসতে পারিনি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম; শত্রুরা ভাবে, অহংকারেই দূরে দূরে থাকি।'

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের যে-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও জীবনাবসান, যেখানে কেটেছে তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ, সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। লোকজনের ভিড় যে শুধু তাঁর পছন্দ হত না তাই নয়, পরিবারের যে-বন্ধন সেটিই ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মনে পড়বে মহর্ষিও এক সময় নিজের বাড়ি ছেড়ে ভাড়াবাড়িতে থাকতে ভালবাসতেন। শিলাইদহ-পতিসরে বাসা বাঁধার আগেই সম্ভবত কলকাতার জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রনাথের আর ভাল লাগছে না। অল্পদিনের বিলেতপ্রবাস, মুসৌরি, চন্দননগর, সদর স্ট্রিটের ভাড়াবাড়ি, দার্জিলিং, কারোয়ার, লোয়ার সার্কুলার রোডের বাগানবাড়ি, গাজিপুর, সোলাপুর—মনে হয় কলকাতায় আর মন বসছে না। এর অনেকদিন পর ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন ছায়াময় হয়ে এসেচে—তার একটা কারণ, ছেলেবেলায় যাদের সঙ্গে আমার জীবনের পারিবারিক গ্রন্থি বাঁধা হয়েছিল তারা প্রায় সবাই কোথায় অপসারিত—পরলোকে এবং ইহলোকে; এখন জোড়াসাঁকোর বাড়িটা নদীর সেই বালুময় পথের মতো যাতে নদীর স্রোত আর চলে না।' (১০ মে ১৯২২)। আত্মীয়-পরিজন সবাই যে তখন জোড়াসাঁকো ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তা নয়। বিয়ের পর স্ত্রীকে জোড়াসাঁকোতে রেখে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে বাইরে-বাইরে থাকতে হয়েছে। নববধূ এই বিশাল পরিবারের সঙ্গে যতটা সাধ্য খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বহু বিষয়েই অশান্তি দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে স্ত্রীকে নানা আশ্বাস উপদেশ দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানে 'কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃতে পল্লিগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক' (জুন ১৮৯৮) হয়েছেন। স্থানাভাব বা অন্য কারণে জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গণে নতুন বাড়ি 'বিচিত্রা ভবন' তৈরি হয়েছে। তবু কলকাতায় কবির মন টেকে না, শেষের দিকে তিনি কলকাতায় এসে জোড়াসাঁকোয় না উঠে শহরে অন্যত্র উঠতেন—'জোড়াসাঁকো আমার পক্ষেও দুর্গম ফলে আশ্রয় নিতে হচ্ছে বরানগরে' (২২ জুলাই ১৯৩৪), আরও পরে 'কলকাতা আমার জন্মস্থান কিন্তু আমার আবাস্য নয়।' (২৬ আগস্ট ১৯৩৯)।

ইন্দিরা দেবীকে লেখা যে-চিঠির কথা একটু আগে বলেছি, সেখানে রবীন্দ্রনাথ পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে বলেছেন, 'আমার পারিবারিক আসক্তি তেমন প্রবল নয়, কোনও মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণির মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে যে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয়—অবশ্য, পরিবারের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাদের আমি বিশেষ ভালবাসি—কিন্তু সে তারা পরিবারের লোক বলে নয়।' নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতি 'আসক্তি'র কারণ, তারা নিজের ছেলেমেয়ে বলে নয়, পরিবারের একজন বলে নয়, 'যথার্থ আত্মীয়তা' আছে বলে।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনও টান ছিল না বললে ভুল হবে, অন্তত চিঠিপত্রে ধরা আছে স্নেহাতুর, কখনও আবেগবিহ্বল হৃদয়ের প্রকাশ। একদিকে স্ত্রীকে লিখছেন, 'ভালমন্দ দুই অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করবার শক্তি অর্জন করতে হবে—ক্রমাগত পদে পদে রাত্রিদিন এই অভ্যাসটি করতে হবে—যখনই মনটা বিকল হতে চাইবে তখনি আপনাকে সংযত স্বাধীন করে নিতে হবে তখনি মনে আনতে হবে সংসারের সমস্ত সুখ দুঃখ ফলাফল থেকে আমি পৃথক...' (ডিসেম্বর ১৯০০)। অন্যদিকে মাধুরীলতাকে কখনও লেখেন, 'তোর শরীর তেমন ভাল নেই শুনে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে' (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩)। মীরাকে 'তোর আর খোকার জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে' (১৯১৫)। 'তোদের জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। আবার বোম্বাই পুনা অঞ্চলে প্লেগের উপদ্রব আছে বলেও ভাবনা হয়' (২৫ নভেম্বর ১৯১৫)। 'তোর জন্যে আমার মন দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে আছে। রোজ ভাবি একখানা চিঠি আসবে, কোথায় আছিস কেমন আছিস জানতে পারব। ... সংসারে স্নেহ করলেও সুখী করবার ক্ষমতা কারও নেই। দুঃখ ভোগ সকলেরই ভাগ্যে আছে। মনকে সেই দুঃখের উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আপনার মধ্যে যে মানুষটা দুঃখ পায় তাকে দূরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হয়' (১১ মার্চ ১৯২৭)। আসলে উদ্বেগও সত্য আবার উদ্বেগ তাড়াবার চেষ্টাও সত্য। সুখদুঃখ নিয়ে এক ধরনের সমদর্শিতা হয়তো মুনিঋষিদের মধ্যে ছিল, কিন্তু বারবার (কখনও স্ত্রীকে, কখনও মেয়েকে, কখনও বিদ্যালয়ের শিক্ষককে লেখা চিঠিতে) রবীন্দ্রনাথ 'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্ প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ' শ্লোকটি উদ্ধৃত করলেও তিনি যে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সব উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুঃখশোক অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, তা নয়। শোকাভিভূত হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। বউঠানের অকালমৃত্যুর প্রতিক্রিয়া হয়তো কোনও চিঠিতে ধরা নেই ('পুষ্পাঞ্জলি' বা গদ্যপদ্য অনেক লেখার মধ্যে আছে), তবে স্ত্রী-বিয়োগের পর বা দুই কন্যা, কনিষ্ঠ পুত্র এবং দৌহিত্রের মৃত্যু যেমন কবির জীবন ও কাব্যে স্থায়ী রেখাপাত করেছে, তেমনই চিঠিতে দু'ভাবে নথিবদ্ধ হয়েছে।

শোকদুঃখে রবীন্দ্রনাথ কাতর হতেন না, এমন কথা বললে অত্যন্ত ভুল হবে। মৃণালিনী দেবীর প্রয়াণের পর দীনেশচন্দ্র সেনকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন' (৪ ডিসেম্বর ১৯০২)। হয়তো এখানে যে ঈশ্বরনির্ভরতা ও আদর্শবাদের প্রকাশ ঘটেছে, তা কিছুটা প্রথানুগ—শোকবার্তা-জ্ঞাপন ও প্রকাশের একটি প্রচলিত রীতি রবীন্দ্রপত্রাবলিতেও দেখা গিয়েছে। মাধুরীলতা যেদিন মারা গেলেন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সেদিন সঙ্গে ছিলেন। সেদিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথের একটি কাজ ছিল, প্রশান্তচন্দ্র জিজ্ঞাসা

করলেন, 'আজকের ব্যবস্থার কি কিছু পরিবর্তন হবে? বললেন, না বদলাবে কেন? তার কোনও দরকার নেই।' রেণুকা যেদিন মারা যান, অন্যদিনের মতো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এসেছেন, 'কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেদী মহাশয় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কেমন আছে? কবি শুধু বললেন, সে মারা গিয়েছে। শুনেছি যে, ত্রিবেদী মশায় কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।' রামেন্দ্রসুন্দর নিষ্ঠাবান ঈশ্বরবিশ্বাসী স্থিতধী পুরুষ ছিলেন, তবু নিজের মেয়ের ছ'মাস রোগভোগে মৃত্যু হওয়ায় কাতর হয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'ছয়মাস কি যে অসুরিক যাতনা সহিয়াছে, তাহা কি লিখিব। পাষাণের মতো বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছি—এক মুহূর্তের জন্য কোনও প্রতিকার বা উপশম করিতে পারি নাই। বিশ্বব্যাপারের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি—নগ্ন মূর্তি মরণের সম্মুখে প্রণাম করিয়াছি। পরম কারুণিকের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া যে শান্তি, সে শান্তি লাভে আমি বঞ্চিত' (৮ জানুয়ারি ১৯২০)। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে লেখেন, 'আপনি যে দুঃখ পাইয়াছেন আমিও সদ্য সেই দুঃখ দহন হইতে বাহির হইয়াছি। আমার কন্যাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদিন রোগের কষ্টে কাতর হইতে দেখিয়াছি তাহার কোনো প্রতিকার করিতে পারি নাই—অথচ পিতার উপর শেষ পর্যন্ত তাহার নির্ভর ছিল। ... [কিন্তু] এমন কিছু দিয়া হৃদয়মন ভরিতে চাই যাহাতে (মা বা মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।) যাহা যায় সে ক্ষতি ত মানিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি সত্যের আশ্রয়ভূমি পর্যন্ত যায় তবে এত বড় ক্ষতি বহন করিবার শক্তি জগতে আছে কোথায়? কিন্তু স্পষ্টই ত দেখি, ক্ষতি বহন করিয়াই না কে পিঠের দিকে ফেলিয়াই হাঁ আপনাকে নিত্য প্রকাশ করিতেছে' (২৩ জানুয়ারি ১৯২০)। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' উপলব্ধি হয়তো মহর্ষিদেবের কাছ থেকে পাওয়া, কিন্তু আমরা পরে দেখব কোনও ধর্মীয় অনুশাসন বা ব্রাহ্মসমাজের নির্দেশ পালনে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ জীবনে অনেক শোকতাপ পেয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, নিজের দুঃখকে অন্যের কাছে প্রদর্শন করার মধ্যে এক ধরনের হীনতা আছে। নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কন্যা মীরাদেবীকে লিখছেন, 'নীতুকে খুব ভালবাসতুম তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে' (২৮ আগস্ট ১৯৩২)। সকলে বলেছিল এবার বর্ষামঙ্গল উৎসব বন্ধ থাক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন তা হতেই পারে না। শোক একান্ত ব্যক্তিগত, পবিত্র—অন্য কেউ তার ভাগ নিতে পারে না, এই জন্যই 'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি,/লজ্জা দিয়ো না!/সকলের নয় যে আঘাত/ধোরো না সবার চোখে।' (বিশ্বশোক, ২৭ আগস্ট ১৯৩২)। মীরাদেবীকে লেখা এই চিঠিতেই ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব মৃত্যুভাবনা—'শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে।' 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) উপন্যাসে নীরজা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, সে যখন থাকবে না তখনও বিশ্বচরাচর একই রকম থাকবে, 'ওই বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। ... সেদিন তুমি মনে রেখ আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে।'

পরিবারের ধারণা রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র, যেমন বন্ধুত্বের ধারণা। ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে

অতিরিক্ত সংবেদনশীল হওয়ায় অন্যের সঙ্গে তিনি মিলতে চাইলেও যেন মিলতে পারেন না। বন্ধুর সঙ্গ তিনি চাইতেন না তা নয়, কিন্তু কোথাও যেন একটি দূরত্ব রক্ষিত হত। ১৯২৭ সালের ২ জুলাই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'জানি না, কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুত্বের সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস, সেই অভাবটা হচ্ছে, আমার হৃদ্যতা-প্রকাশের প্রাচুর্যের অভাব। ... যখন বয়স হয়েছে পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি রক্ষা করতে পারিনি। এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এই চারজনের নাম মনে পড়চে।' রামানন্দর সঙ্গে দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সম্পর্ক রক্ষা করেছেন, যদিও মাঝে-মাঝে সেখানে ভুল বোঝাবুঝি ও সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছে। 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যখন প্রথমে 'সবুজপত্র' ও পরে 'বিচিত্রা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তখন রামানন্দ নিজেকে বঞ্চিত ও প্রতারিত মনে করতে থাকেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্বন্ধটিকে রামানন্দ 'সাহিত্যিক সম্পর্ক শূন্য করা শ্রেয়ঃ মনে' করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ বন্ধু ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থসাহায্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে তাঁর মহিমাপ্রচার, বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা, এমনকী পরিবারজীবনে নিত্যসাহচর্য সত্ত্বেও আচার্যের ভাগিনেয় অরবিন্দমোহন বসুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠ গ্রহণকে কেন্দ্র করে বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ ঘটে। অবলা বসুকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'অরবিন্দকে যে আদর্শে তৈরি করলে আপনাদের মনের মত হত তা আমি হয়তো করিনি, কারণ করা হয়ত আমার পক্ষে অসাধ্য ... আমার হাতে যা ছিল আমি যেটুকু পারি তা আমি ওর সম্বন্ধে করেছি—সে জন্য যেটুকু অপরাধ সে সম্পূর্ণই আমার' (১২ এপ্রিল ১৯১২)। যদুনাথ সরকারের প্রতি রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কারণ, তিনি 'ব্যক্তিগত অন্ধসংস্কার বা মিথ্যা ভাবুকতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্যসন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট' হন না। বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডে প্রথমে যদুনাথের সহায়তা ও সমর্থন মিললেও পরে তাঁর মনে হয়েছে, ''বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge-কে, intellectual discipline-কে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষক ও সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্ক মস্তিষ্ক 'বিশ্বমানবের শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে'।" (৩১ মে ১৯২২)। যদুনাথের এই অভিযোগে মর্মাহত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন যার মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন আছে, গভীর বেদনার প্রকাশ আছে, প্রতি আক্রমণ আছে, 'আমার কর্মের প্রতি আপনার এমন অবজ্ঞাবিমিশ্রিত অশ্রদ্ধার তীব্রতায় আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের এখানে ত্রুটির অভাব নাই, ত্রুটি অন্যত্রও আছে, কিন্তু যথাবিহিতরূপে আপনি তাহার সন্ধান ও যথোচিতভাবে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন?' (২ জুন ১৯২২)। ক্লান্ত শরীর ও মন কবিকে এতই উদ্বেজিত করেছে যে, অল্পদিন পরে তিনি যদুনাথকে আক্রমণ করে এক বিস্ফোরক পত্র লেখেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে (চিঠিপত্র ১২ খণ্ড)। উদ্দেশ্য ছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় চিঠিটির প্রচার। সৌভাগ্যক্রমে 'প্রবাসী'-সম্পাদক সেটি ছাপেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে বাইরে বিরোধ না হলেও 'অধিকাংশ গুরুতর বিষয়ে মতবিরোধ' ছিল।

তবে এই চিঠির মধ্যে শান্তিনিকেতনের বিদ্যায়তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ-নৈরাশ্যের যে-প্রকাশ ঘটেছে, তার সঙ্গে যদুনাথকে লেখা চিঠির বক্তব্য মিলিয়ে দেখা যেতে পারে—'আমার এখানে ভাবাবেশের অস্পষ্টতায় বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টি কলুষিত হইয়া যায় এমন কথা

আমার কোন কোন বন্ধুমহলেও প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি—কিন্তু তাঁহারা এখানকার কাজ নিকট হইতে দেখেন নাই এবং ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কার বশত তাঁহাদের ধারণা নির্মূল নহে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বভারতীতে কৃষিবিদ্যা থেকে হস্তশিল্প, বিজ্ঞান গবেষণাগার থেকে হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যা-ভাষাচর্চা থেকে ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্যের সম্মিলনকেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশের উপেক্ষা সহ্য করে 'কাজ' করে গিয়েছেন, সঙ্গত কারণেই সে জন্য তিনি গর্ববোধ করতে পারেন। অথচ তিনি সেই কাজের স্বীকৃতি পাননি। বিশ্বভারতীকে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে আগাগোড়া প্রতিষ্ঠান ও পরিবার কষ্ট পেয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল সহমর্মী সহকর্মীর—ব্রহ্মবান্ধব-রেবাচাঁদের পর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, সুবোধ মজুমদার, কুঞ্জলাল ঘোষকে দিয়ে যতদিন সম্ভব বিদ্যালয় চালিয়েছেন। তখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন অর্থাৎ, 'কঠিন নিয়মের আবশ্যকতা', 'ছেলেদের মধ্যে যাতে কোনোরকম ইন্দ্রিয়শৈথিল্য না ঘটে', 'উঁচু দরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই' প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে সব সময় উপস্থিত থেকে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারতেন না। ফলে কোনও একজন শিক্ষকের উপর 'সমস্ত কর্তৃত্বভার' অর্পণ করতে হত। শিক্ষকদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল, পরস্পরের মধ্যেও বিবাদ-বিতর্ক দেখা দিত। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আনুকূল্য লাভের জন্য প্রতিযোগিতাও ছিল। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে-নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও সংগঠনী শক্তি প্রয়োজন, তা কবির ছিল না। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন, 'একটি বৃহৎ কাজের ভার লইলেই নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। আমিও আমার স্বভাবের অসম্পূর্ণতা নানারূপেই অনুভব করি। তৎসত্ত্বেও আমার উপর যে ভার পড়িয়াছে তাহা আমাকে বহন করিতেই হইবে। ... আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্বলতা আপনার কর্মপরিত্যাগের কারণ' (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। এইভাবে কত শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন, আবার ছেড়েও গিয়েছেন। বিদ্যালয় ক্রমশ প্রসার লাভ করেছে। ১৯১০ সালে পরিচালক সমিতির সর্বাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ। পরে ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার ফাউন্ডর-প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিশ্বভারতী পরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। একদিকে তিনি প্রতিষ্ঠানকে এতদিন পর সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিলেন (সঙ্গে বাংলা বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব ও শান্তিনিকেতনের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি), তৈরি হল কনস্টিটিউশন, অন্যদিকে অনেকদিন আগে থেকেই মনে হচ্ছে, 'আমার ভয় হচ্চে বিশ্বভারতীতে খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড় হয়ে ওঠে। এ রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অংশটা আইডিয়া সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দ—আর যে অংশটা নিয়ম ও ব্যবস্থা সেইটেই হচ্চে বিষম দায়...।' কিংবা 'আইডিয়া জিনিসটা সজীব, কিন্তু কোনো ইনস্টিট্যুশনের লোহার সিন্দুকে তা বাঁচিয়ে রাখা যায় না—মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্তে গেল' (১৭ অক্টোবর ১৯২৩)। বিশ্বভারতীকে নিয়ে অন্য ধরনের সমস্যারও শেষ নেই। ১৯২৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম-সচিবকে একটি চিঠি দিয়ে জানান, তাঁর অনুপস্থিতিকালে 'প্রতিষ্ঠাতা আচার্যপদের দায়িত্ব' তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে দিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বভারতী-সংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্তাব মেনে নিলেও সদস্যদের মধ্যে অনেকে বিরূপ সমালোচনা করেন। আহত ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে চিঠিতে লেখেন, 'কিছুকাল পূর্বে সংসদের সভায় রথীর প্রতি আমার ভারার্পণ সম্বন্ধে কোন কোন সদস্য বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, এ কি apostolic (?) succession হতে চলল। সে কথা শুনে অবধি বুঝতে পেরেছি আমাদের কর্মে বুলির রাজত্ব

বড় হয়ে উঠচে। যে-ভার আমার সে-ভার আমি প্রাণ দিয়ে পেয়েছি—আমি জানি সে ভার কার উপরে দেওয়া চলে—কেবল ভোটের মধ্যে এমন মায়ামন্ত্র নেই, যার দ্বারা ঠিক মত নির্বাচন হতে পারে, সংসদে যে তা হয় না তার পরিচয় সর্বদাই পাই ...। অসুস্থ শরীরেও যে ভার আমি নিজের পরে নিয়েছি, তার দরদ কতখানি তা সেই সভ্যেরা কখনই বুঝবেন না যাঁরা বিশ্বভারতীর জন্য যথার্থভাবে কিছুই ত্যাগ করেননি। আমি যখন রথীর পর ভার দিয়েছি—ভোটওয়ালা সভ্যদের সেই দরদ না থাকতেই তারা বিচারের অধিকারী। রথীর সঙ্গে আমার আত্মীয় সম্বন্ধ আছে বলেই রথী বাধা পেত এবং বাধা পেয়েছে, সেই বিপদের সম্ভাবনা আমি স্বীকার করতে রাজি নই—ডিমক্র্যাসির জয়পতাকা শূন্য আকাশে অভ্রভেদী করবার উপলক্ষেও না' (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯)। বিশ্বভারতীর আইডিয়াকেও বাস্তব রূপ দেওয়া কতটা সম্ভব হয়েছে, তা নিয়েও রবীন্দ্রনাথের মনে সংশয় ছিল। অমিয় চক্রবর্তীকে ১৯২৯ সালের ১০ মার্চ তিনি লিখছেন, 'শান্তিনিকেতনেও যদি আমরা বিদেশকে স্বদেশে না টানতে পারি তাহলে ওই আশ্রমের আদর্শ একেবারেই ব্যর্থ হল। শুধু ক্লাস চালানো আমাদের কাজ নয়। আত্মীয়তার সম্বন্ধকে ওখানে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করতে হবে। যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ং-এর নীড়ও বাঁধতে পারিনি, এক গাছেও আশ্রয় নিইনি। আমরা আছি নানা পক্ষী নানা বৃক্ষে। এমন হয় কেন—নিজেদের একবার জিজ্ঞাসা কোরো।'

পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত রূপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। আদি ব্রাহ্মসমাজের রীতি মেনে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়েছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের যোগ প্রায় সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল আর রবীন্দ্রনাথ পিতার নির্দেশে সমাজের সম্পাদক থেকে শুরু করে অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেছেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনার ভারও গ্রহণ করেছেন এক সময়ে। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজকে যুগোচিত পরিবর্তন করতে চেয়েও পারলেন না, শেষে কনিষ্ঠ জামাতার উপর সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। অথচ তাঁর মনে হয়েছে, 'একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে টাকার শৃঙ্খলে বাঁধা আদি ব্রাহ্মসমাজ একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা। আর কিছুকাল পরে স্বয়ং কটিটাই অন্তর্ধান করবে, আর যিনি বন্দী ছিলেন তাঁরও ঠিকানা পাওয়া যাবে না। কেবল শিকলটা ঝমঝম করবে। প্রথা জিনিসটা যেখানে সত্যকে বিদ্রূপ করে সেখানে সেই প্রথার মত লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছুই নেই।' (ইন্দিরা দেবীকে লেখা, ১৪ এপ্রিল ১৯৩১)। নিজেকে ব্রাহ্ম বলে পরিচয় দিতেও তখন তাঁর মনে আপত্তি জেগেছে, হেমন্তবালা দেবীকে তিনি লিখছেন, 'ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি না। ... আমি ধর্মসমাজের তকমাপরা ছাপ-মারাদের মধ্যে কেউ নই—রাজার দত্ত উপাধি আমি ত্যাগ করেছি, সম্প্রদায়ের দত্ত উপাধিও আমার নেই।' (৮ নভেম্বর ১৯৩২)।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্রাত্য বলতে ভালবাসতেন। হেমন্তবালাকে তিনি একাধিকবার লেখেন, 'তোমাদের দিক থেকে আমি ব্রাত্য, আমি একঘরে, আমি অস্পৃশ্য' (১৭ আগস্ট ১৯৩৪)। 'আমি আজন্ম ব্রাত্য। মর্ত্যধরণীর বুকের কাছে আমার বাসা—এখানকার মাটির ভাঁড়ে যে অমৃত পাই তাই আমার যথেষ্ট। পারত্রিকের ঠিকানা জানি নে, যারা সেখানকার বিবরণ জটিল ভাষায় বিস্তারিত করে বলতে আসে তাদের কথা বুঝতে পারি নে বিশ্বাসও করি নে' (১০ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। সমাজ সংসার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাস করেও নিঃসঙ্গ, একা, স্বতন্ত্র। 'জোড়াসাঁকো আমার পক্ষে দুর্গম' (২২ জুলাই ১৯৩৪)। শান্তিনিকেতনেও কখনও নিরাশ্রয়—'রথীই বলো বৌমাও বলো এঁরা জীবন্মুক্ত, ইচ্ছাধীন এঁদের কর্ম—আমারই কেবল মুক্তি নেই, তাঁরা অনায়াসেই বলতে পারেন, যাব না, করব

না, বা মাঝ আসরে উঠে পালান—আমার তা বলবার জো নেই, আমি বদ্ধ জীব' (ইন্দিরা দেবীকে ১৭ অক্টোবর ১৯৩৪)। বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—'পরবাসী বাহিরে অন্তরে।' বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লেখেন, 'আমি মানুষটা স্বভাবতই একা। নিজে নিজে চিন্তা করি, চেষ্টা করি, লেখায় প্রকাশ করি, কিন্তু কাউকে চালনা করতে পারি নে। ছেলেবেলা থেকে সমাজ থেকে দূরস্থ বাড়িতে বাস করে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার আমার পক্ষে যথেষ্ট সহজ হয়নি। লোকে মনে করে সে অহংকার। কিন্তু আমার উপায় নেই' (১৩ মে ১৯৩৩)। একদিকে নিজের অক্ষমতার জন্য ক্ষোভ, অন্যদিকে নিজের আদর্শ রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা জীবনের মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত চিঠিপত্রে ধরা আছে। জীবনীকার বা সাহিত্যব্যাখ্যাতারা অনেক সময়ে আলোচনার সুবিধার জন্য বা সরলীকরণের তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে বেঁধে ফেলতে চান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এতই অনন্য, সর্বক্ষেত্রে এতই স্বতন্ত্র যে, তাঁর দীর্ঘজীবন ও বিপুল সৃষ্টিকে কোনও সাধারণ সূত্র দিয়ে বাঁধা যায় না। হয়তো এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁর মন ও সৃষ্টিকে নির্বাধ নির্মুক্ত করেছে।

গদ্যকবিতার সূত্র ও রবীন্দ্রনাথ

পবিত্র সরকার

১

গদ্যকবিতা সম্বন্ধে সাধারণ বোধ যে অস্পষ্ট তা 'প্রিন্সটন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড পোয়েটিক্স' (১৯৭৪) লক্ষ করেছে। তারা বলেছে, বাইবেল থেকে উইলিয়াম ফকনারের উপন্যাসের ভাষা পর্যন্ত গদ্যকবিতার নির্দশন হিসেবে তোলা হয়েছে। আমরা এখানে বিদ্যাসাগর বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর বর্ণনা গদ্যকবিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত হতে দেখেছি। কিন্তু 'এনসাইক্লোপিডিয়া' খুবই খাঁটি কথা বলেছে একটি। তা এই যে, গদ্যকবিতা হল "a highly conscious (somtimes self conscious) art form" (p. 664)।

বলা বাহুল্য, বাংলা-গদ্যকবিতার ক্ষেত্রেও এই সংজ্ঞা মান্য। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* হোক, *লিপিকা* হোক, *কালের যাত্রা* হোক—সবই গদ্য-কবিতার পূর্বসূত্র হিসেবে গৃহীত হতে পারে, কিন্তু সেগুলি গদ্য-কবিতা নয়, একধরনের "heightened prose"। একথা সকলেই জানেন যে, বোদ্‌লেয়ারই প্রথম তাঁর *Petits Poems en Prose* বা *Le Spleen de Paris* (1869-এ সম্পূর্ণ) প্রকাশিত আত্মসচেতন গদ্যছন্দ রচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে র‍্যাঁবো, নোভালি, হোল্ডরলিনের হাতে তার একটি স্বীকৃত রূপ দাঁড়িয়ে যায়।

আমরা রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের অনুধাবন করতে গিয়ে তাঁর এই সচেতন বা আত্মসচেতন অনুসন্ধানকে লক্ষ করব এবং বাংলা সাহিত্যে বা তাঁর নিজের রচনায় তার পূর্বরূপ সন্ধানের নিরর্থক চেষ্টা না-করে তাঁর আত্মসচেতন প্রয়াসের বিবর্তন লক্ষ করব।

'গদ্যকবিতা' কথাটা অন্তত রবীন্দ্রনাথের স্পষ্টছন্দহীন রচনার ক্ষেত্রে একটু বিভ্রান্তিকর, এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এই একটিই। একথা আমরা যেমন বলছি, তেমনই দেখতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ধরনের কবিতার ভাষাকে নিছক গদ্য বলতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু 'গদ্যছন্দ, গদ্যকাব্য' কথাগুলি তিনি নিজেই এতবার ব্যবহার করেছেন 'গদ্যকবিতা' কথাটা তার থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই বর্তায়। 'গদ্যকবিতা' কথাটি তিনি নিজে ব্যবহার করেননি, কিন্তু সাধারণ পাঠক ও সমালোচকেরা এ শব্দটি সদাসর্বদা ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু যে অর্থে ব্যবহার করেন তা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত অর্থ কি না তা নিয়ে নতুন করে ভাবার দরকার হয়ে পড়েছে।

'গদ্যকবিতা' বা 'গদ্যকাব্যে'র সাধারণ লৌকিক অর্থ গদ্যে লেখা কবিতা/কাব্য। একটা সময় হলে কথাটা সোনার পাথরবাটি ধরনের কিছু বলে অভিযোগ উঠত, কারণ তখন কবিতার ভাষা গদ্য হতেই পারত না। যদিও পৃথিবীর নানা সাহিত্যেই গদ্যে কবিতা লেখা হয়েছে প্রাচীন শতাব্দী-গুলিতেও; যেমন চিনা সাহিত্যে, তবু কবিতার ভাষা ছন্দিত এবং মিলনযুক্ত ভাষা, তা-ই সাধারণ নিয়ম। কবিতার এই প্রকরণ তৈরি হয়ে যায় তার মৌখিক ঐতিহ্য থেকে, কারণ কবিতা শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর থাকলেই

তাতে ছন্দ ও মিল, বিশেষত ছন্দ স্মৃতিসহায়ক উপায় বা mnemoneic device হিসেবে ব্যবহৃত হয়; অবশ্য তার একটা সৌন্দর্যের ভিত্তিও আছে। আর গদ্যে লেখা কবিতার পিছনে থাকে লিখন বা মুদ্রণের প্রাগিতিহাস। লেখা বা মুদ্রিত না হলে গদ্য কবিতা রচনা আদৌ হত কি না সন্দেহ। যে সব দেশে গদ্য কবিতা দেখা দিয়েছে তার সব কটিতেই মুদ্রণের দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

কিন্তু লিখন বা মুদ্রণের দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেই যে গদ্যকবিতা প্রাচীন সময় থেকেই লেখা হবে, এমন সিদ্ধান্ত সর্বত্র করা যাবে না, আজ আমরা যে-অর্থে গদ্যকবিতা বুঝি ... যার ছন্দও নেই মিলও নেই—লিখিত বা মুদ্রিত প্রতিবেশ পেলেই তার উদ্ভব ঘটবে—তার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেটা নির্ভর করে এক-এক দেশের কবিতার ঐতিহ্য ও পরম্পরার উপর। কোনো দেশ হয়তো আধুনিক সময় পর্যন্ত ছন্দকেই কবিতার একমাত্র বাহন হিসেবে মেনে এল, তারপর সাংস্কৃতিক ঋণ হিসেবে গ্রহণ করল গদ্যকবিতাকে। অন্য দেশের অন্য ভাষার কোনো লেখকের/লেখকের রীতির প্রভাবে। এমন ঘটেছে আইসল্যান্ডিক সাহিত্যে, সেখানকার নোবেলজয়ী লেখক হালডর লাখ্‌নেস দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি-র অনুবাদ সেই ভাষায় গদ্যছন্দের কবিতার সূচনা করে।[১] ব্রাজিলীয় পোর্তুগিজ সাহিত্যে বা চীনের সাহিত্যও 'আধুনিক' ধরনের গদ্যকবিতার উদ্ভবের পিছনে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুবাদের কিঞ্চিৎ ভূমিকা ছিল, সে কথা নানা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।[২] ওসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হয়তো বাইবেলের গদ্যশৈলীর পুরোনো আদলের পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভ্যালকে উশ্‌কে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদলের পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভ্যালের ক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটেছিল, না বাংলা কাব্যছন্দের যে বিপ্লবের সূচনা মধুসূদন শুরু করেছিলেন তারই স্বাভাবিক বিবর্তনের পরিণাম—সে প্রসঙ্গের আলোচনাও এই সূত্রে জরুরি, কিন্তু আপাতত সে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবু মূল কথাটা বলে নেওয়া যায়। আমাদের মতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আকস্মিক, তা বাংলা ছন্দমুক্তির কোনো বিবর্তনের পথ ধরে আসেনি। অমিত্রাক্ষর, গৈরিশ ছন্দ থেকে গদ্যছন্দে একটা বড় লাফ বা quantum jump ঘটেছে—যার রহস্য সূত্র শুধু বাংলা কবিতার ইতিহাসে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে না। বরং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কাব্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে তার ঠিকানা আছে। *গীতাঞ্জলি*-র ইংরেজি অনুবাদ (১৯১২) থেকে *পুনশ্চ* (১৯৩২)... এই একটা সূত্র রবীন্দ্রনাথ, নিজেই দিয়েছেন *পুনশ্চ*-এর ভূমিকায়। কিন্তু মাঝখানের এই কুড়ি-একুশ বছরের ফাঁকটার যথেষ্ট ব্যাখ্যা আমাদের তৈরি করে নিতে হবে। এবং *লিপিকা* (১৯২২)-র মধ্যবর্তী ধাপ সত্ত্বেও *পুনশ্চ*-তে কেন রবীন্দ্রনাথ কবিতার মতো করে সাজানো গদ্যছন্দে লিখতে মানসিকভাবে এমন প্রস্তুত হলেন যে, গদ্যছন্দের একটি আলাদা নন্দনতত্ত্বই তৈরি করে নিলেন, তার ঐতিহাসিক কার্যকারণ এখনও আমাদের কাছে ততটা স্পষ্ট নয়। হয়তো নাট্যসংলাপের ভাবপ্রধান ও কবিত্বময় গদ্যশিল্প, বিশেষত *কালের যাত্রা*-র (১৯৩২-প্রকাশে *পুনশ্চ*-র সমকালীন) সংলাপের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেই সঙ্গে এলিয়টের বিভাষিক উপস্থিতি, *শেষের কবিতা*-র গদ্যের উদ্ভাবন ইত্যাদির কথাও স্মরণযোগ্য। এ বিষয়টা আলাদা করে দেখার দরকার আছে।

২

আমরা *পুনশ্চ* ও তার পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের তৈরি গদ্যছন্দ বা গদ্যকাব্যের যে ব্যাকুল নতুন নন্দনতত্ত্ব, সেটিকে একটু অনুধাবন করি। তার আগে পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করবার জন্য, এই তথ্যটি হয়তো জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, মোট চারটি কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা আশ্রিত—

...*পুনশ্চ, শেষসপ্তক* (১৯৩৫), *পত্রপুট* (১৯৩৬) এবং *শ্যামলী* (১৯৩৬)। অর্থাৎ ১৯৩২ নাগাদ দুটি এবং ১৯৩৬-এ দুটি এই চারটি বইয়ে, খুব ধারাবাহিক ভাবে না হলেও, মোট চার-পাঁচ বছরের মধ্যে গদ্যছন্দের সংক্রমণ ঘটেছিল কবির উপর। এই সংক্রমণ ওই সময়সীমার মধ্যে যেমন অব্যাহত অনবচ্ছিন্ন নয়, তেমনই ওই সময়খণ্ডের বাইরে পাই কাব্যছন্দের বিপুল সমুদ্র : ফলে ওই চারটি কাব্য দ্বীপের মতোই যেন জেগে থাকে। *লিপিকা* ছাড়া তার আগে ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-র সেই দূরবর্তী দৃষ্টান্ত, আবার *শ্যামলী*-র পরে গদ্যছন্দের লেখা কোনো কবিতাই নেই, যেন-বা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন তৈরি অস্ত্রটা খুব সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করে আবার তুলে রেখে দিলেন। যে অস্ত্র খাপ থেকে বার করবার সময় এত বিচার-বির্তক-যুক্তিবিস্তার করেছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সময় কোনোই উচ্চবাচ্য করলেন না, জীবনের বাকি পাঁচ বছরে তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করলেন। ওই চার-পাঁচ বছরেও গদ্যছন্দের প্রতি তাঁর আনুগত্য যে ঐকান্তিক নয়, তাও আমরা লক্ষ করি। পাশাপাশি একই সময়ে গদ্যে যেমন লিখছেন কবিতা, তেমনই লিখছেন ছন্দে।[৩] এছাড়া ছন্দমিলের গানও লিখেছেন অসংখ্য। মাঝখানে প্রকাশিত ছন্দের কাব্য আছে, আবার *শেষ সপ্তক*-এর সংযোজন অংশে ছন্দ-মিলের কবিতাও আছে, কোনো কোনো কবিতা গদ্যরূপেরই পদ্যরূপান্তর, যেমন গদ্যের 'তিন' ও পদ্যের *বাতাবির চারা, চার ও শেষ পর্ব, দশ দুঃখ যেন জাল পেতেছে, ছাব্বিশ ও মর্মবাণী, সাতাশ* ও *ঘটভরা* (এই পদ্যটি ছন্দিত হলেও মিলবর্জিত), *পঁয়ত্রিশ* ও *প্রশ্ন, ছত্রিশ* ও *আমি, সাইত্রিশ* ও *আষাঢ়*, আটত্রিশ ও *যক্ষ*। তারপর তথাকথিত গদ্য কবিতাতেও যেন বা অজান্তে ছন্দ এসে আক্রমণ করেছে, যেমন *পুনশ্চ*-র *বাঁশি* কবিতায়, বা *কোমল গান্ধার*-এ। যেন রবীন্দ্রনাথ মাঝপথেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, কিংবা কৌতূহলী হয়ে দুটি রীতিই নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন কোন্‌টির স্বাদ কী তৈরি হয়। আমরা পর-পর প্রকাশিত কবিতার বইগুলির একটি তালিকা যদি করি ওই চার-পাঁচ বছরের, তাহলে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দব্যবহারের মানচিত্রটি হয়তো আর একটু স্পষ্ট হবে...

পুনশ্চ	১৯৩২		
বিচিত্রিতা	১৯৩৩ পদ্য	প্রহাসিনী	১৯৩৯ পদ্য
শেষ সপ্তক	১৯৩৫	আকাশ প্রদীপ	১৯৩৯ পদ্য
বীথিকা	১৯৩৫ পদ্য	নবজাতক	১৯৪০ পদ্য
পত্রপুট	১৯৩৬	সানাই	১৯৪০ পদ্য
শ্যামলী	১৯৩৬	রোগশয্যায়	১৯৪০ পদ্য
খাপছাড়া	১৯৩৭ পদ্য	আরোগ্য	১৯৪১ পদ্য
ছড়ার ছবি	১৯৩৭ পদ্য	জন্মদিনে	১৯৪১ পদ্য
প্রান্তিক	১৯৩৮ পদ্য	ছড়া	১৯৪১ পদ্য
সেঁজুতি	১৯৩৮ পদ্য	শেষ লেখা	১৯৪১ পদ্য

১৯৩৬-এর পরে রবীন্দ্রনাথ আবার খুব সহজে ছন্দে ফিরে এলেন, আর গদ্যের বাঁধনে ধরাই দিলেন না কবিতায়। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর কবিতার শরীর ও ভাববস্তু এক রইল। গদ্যে যেসব অভিজ্ঞতা, সংবাদ, তথ্য ও অনুভবকে তিনি প্রথমবারের মতো আমন্ত্রণ করেছিলেন, গদ্যকে প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে তার সবগুলিকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন তা নয়। বরং গদ্যকাব্যের জগৎ তাঁর ছন্দের কবিতায় পরবর্তীকালে মাঝে মাঝেই জেগে উঠতে লাগল, শেষদিকের বহু

কবিতায় গদ্যের অভিজ্ঞতা ও ছন্দের নিজস্ব দাবির দ্বন্দ্ব একভাবে নিরসন করলেন তিনি। *নবজাতক*, *সানাই* এবং *রোগশয্যায়*, *আরোগ্য*, *জন্মদিনে* ও *শেষ লেখা*-র কিছু কিছু কবিতায় তার সাক্ষ্য আছে। এ সব কাব্যগ্রন্থের কবিতায় যে শিথিল ছন্দমালা দেখা দিল, তা যেন গদ্যকবিতাচর্চারই এক অনিবার্য পরিণাম। সে বিষয়টাও এখানে আমাদের আলোচনার বস্তু নয়, অন্য উপলক্ষে তার সন্ধান করা যেতে পারে।

৩

পরিপ্রেক্ষিতটিকে এইভাবে দেখিয়ে দেওয়ার পর গদ্যছন্দের নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সূত্রগুলিকে এখানে পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করা যাক।

বস্তুতপক্ষে এই নন্দনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গেই করেছেন রবীন্দ্রনাথ। *ছন্দ*-গ্রন্থের শেষ অংশে গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি চিঠি,[৪] ছিন্ন রচনা, *সাহিত্যের স্বরূপ* বইয়েও চিঠিকে কেটেছেঁটে প্রবন্ধের রূপ দেওয়া কিছু রচনা,[৫] যার দু-একটি দেখা *ছন্দ*-তেও পাই, রবীন্দ্রনাথকে প্রায় তার্কিকের বা প্রচারকের অবস্থানে নিয়ে যায়। এরকম মনে হয় যে, তিনি যেন এক নতুন সত্যের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছেন—ছন্দ, কবিতা ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে এক নতুন বাণী, যে সম্বন্ধে অন্যকে বলতে এবং অন্যের কাছে তার প্রতিষ্ঠা দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। তার স্বরূপটি সম্বন্ধে অন্যের মনে বিভ্রান্তি জেগে ওঠা ঘটনা বা সম্ভাবনা দেখলে সে বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টায় তাঁর ক্লান্তি নেই। আমরা তাঁকেই অনুসরণ করব, তাঁর এই নতুন উদ্ভাবনার বিষয়টি তাঁর কাছে কীরকম তা বোঝাবার জন্য; রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য আলোচনার মতোই এগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা করার মূল উপায় হল তুলনামূলক দৃষ্টান্ত, প্রায়ই যা মেটাফরের চেহারা নেয়। আমরা আগে গদ্য ও পদ্যের তফাতের বিষয়টি সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করি।

ক. চাল বা চলনের তফাত

'গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের।'[৬] তাতে 'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন'[৭] নেই; যেন-বা খানিকটা 'গানের আলাপের' মতো, যাতে 'তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না।'[৮] কবিতার মতো গদ্য নাচে না, কিন্তু 'নাচের আসরে বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।'[৯] গদ্যকাব্য নাচে না, চলে। কিন্তু এই চলার বিষয়টাও সযত্নে ব্যাখ্যা করেন, অধিকাংশ সময়ে দৃশ্য বর্ণনা ও মেটাফর দিয়ে। রঙ্গমঞ্চের নর্তকীর ছন্দ এ তো নয়, তা বোঝানোর জন্য রূপময় হয়ে ওঠে তাঁর কথা... 'একবার সরিয়ে দাও ওই রঙ্গমঞ্চ, জরির আঁচলা-দেওয়া বেনারসি শাড়ি তোলা থাক পেটিকায়। নাচের বন্ধনে তার তনুদেহের গতিকে নাইবা সংযত করলে, তাতেই কি রস নষ্ট হল? তাহলেও দেহের সহজ ভঙ্গিতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় যে বেদনায় ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে সে মুক্ত বলেই যে নিরর্থক,'[১০] তা নয়।

খ. গদ্যের নিজস্ব ছন্দ

আরিস্তোতল কথিত এবং বহু-উদ্ধৃত "the other harmony of prose" কথাটিকে স্মরণ করায় এমন কথা রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ সম্পর্কে বারবার বলেন। পাঠকদের মনে পড়বে, ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন।[১১] এখানেই তাঁর কাছে কবিতার গদ্যছন্দ নিছক প্রাত্যহিক গদ্য থেকে আলাদা হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে সাহিত্যের ভাষার তিনটি মূল প্রস্থান দাঁড়ায়...

১. অর্থপ্রধান, বক্তব্যপ্রধান গদ্য, যার মূল লক্ষ্য জ্ঞাপন;

২. ভাবপ্রধান (expressive) গদ্য, যার মূল লক্ষ্য সংবেদন, উদ্‌বেজন ইত্যাদি; কবিতার গদ্য এরই একটি রূপ।

৩. ছন্দোবদ্ধ কবিতা; এর মধ্যে বাংলায় পাই মিলহীন, প্রবহমাণ, মুক্তক, গৈরিশ ইত্যাদি নানা রূপ।

এ ছাড়া তো রইল মানুষের প্রাত্যহিক কথোপকথনের গদ্য। কিন্তু সে গদ্যের সঙ্গে সাহিত্যের গদ্যের—সে-গদ্য অর্থপ্রধান হোক আর ভাবপ্রধান হোক—তফাত আছে। মুকারোভ্‌স্কির মতো চেক শৈলীবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। কথ্য গদ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসজ্জিত, অবিন্যস্ত, অসংবদ্ধ; তাকে অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে ভাগ করা যায় না, তা পরপর সাজিয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই একটি অখণ্ড একাগ্রমুখী বক্তব্য তৈরি হয়। কথ্য গদ্য অধিকাংশ সময়ে ব্যাকারণের নিয়ম মেনে তৈরি হয় মাত্র, সেখানে সাহিত্যের গদ্য কখনও বাচন (discourse)-এর যুক্তিশৃঙ্খলার, কখনও বা সৌন্দর্যের নিয়ম মেন সংবদ্ধ হয়। কাজেই সাহিত্যের গদ্য আলোচনায় প্রাত্যহিক গদ্য প্রাসঙ্গিক নয়।

তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায়, ওই যে ভাবপ্রধান গদ্য যার একটি রূপ কবিতার গদ্যশৈলী, তার নিজস্ব কোনো ছন্দ আছে কি না। এই বিষয়টি প্রবোধচন্দ্র সেনকে খুব ভাবিয়েছিল।[১২] তিনি প্রথমে রবীন্দ্রনাথের যে-কথা কবিতার ছন্দ 'ভাষার ছন্দ,'[১৩] একে 'হেঁয়ালি' বলে নির্দেশ করে, পরে এই হেঁয়ালির রহস্য নিজেই উন্মোচন করেছেন। 'এই গদ্য-কবিতায় দেখতে পাই গুচ্ছে গুচ্ছে সাজানো বাক্‌পর্ব-রাশি; এই বাক্‌পর্বগুলি মূলত গদ্যরীতির মতো ভাবেরই পর্ব, তাই তার পর্বগুলি পদ্যের ধ্বনিপর্বের মতো সুপরিমিত ও সুনিরূপিত নয়। কাজেই তাতে সহজেই গদ্যের ভাবানুসারী যতি, প্রস্বর ও অন্বয় সুরক্ষিত হয়। ... আপাতদৃষ্টিতে ভাবছন্দ কথাটিকে হেঁয়ালি মতো বোধ হলেও গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে তার সার্থকতা উপলব্ধি হবে।'[১৪]

প্রবোধচন্দ্রের হয়তো আর একটু বলা উচিত ছিল। সব গদ্যের ছন্দ বাক্‌পর্বের ছন্দ নয়। প্রবন্ধে যে ধারাবাহিক গদ্য লেখা হয়, যাতে ছোট-বড়, কখনও কখনও বেশ দীর্ঘ ও জটিল বাক্য সাজিয়ে অনুচ্ছেদে তৈরি করা হয়, তার সঙ্গে কবিতায় গদ্যের বাক্‌পর্বের মাপ এক নয়। কবিতার গদ্যভঙ্গিতে থাকে মূলত নাতিদীর্ঘ বাক্য, এবং সে-কবিতা পড়তে গেলে বা আবৃত্তি করতে গেলে পঙ্‌ক্তির মধ্যে সাজানো বাক্যে নৈঃশব্দ্যের বা বিরামের ভূমিকা বেশি। এই নিবন্ধের উপরের পঙ্‌ক্তিগুলি, বা উপরের বাক্যটি পড়ার যে চলন, তার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র-উদ্ধৃত এই অংশটি পড়বার চলন এক হবে কি?—

মহাকাল,/সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের/তরঙ্গ-শিখরে/
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে/সৃষ্টি,/
আবার নেমে যাচ্ছে/ধ্যানের তরঙ্গ তলে//

প্রচণ্ড বেগে চলেছে/অব্যক্তির চক্রনৃত্য//
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে/
তুমি আছ/অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম,/দাও আমাকে/তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা/
জীবন আর মৃত্যু/পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে/
যেখানে আছে/অক্ষুব্ধ শান্তি/
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নি-শিখার/অন্তরতম/
স্তিমিত নিভৃতে/
দাও আমাকে শান্তি।[১৫]

এখানে শুধু বিরামের বহুলতা নয়, বিরামের ওজনের তফাতও লক্ষ্য করবেন দীক্ষিত পাঠকেরা; বাক্যের শেষে বিরাম একটু বেশি, কিন্তু বাক্যমধ্যের বিরাম তুলনায় সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য কখনোই খুব বেশি নয় বলে, এক বাক্যান্তিক বিরামের সঙ্গে অন্য বাক্যান্তিক বিরামের দূরত্ব কম। বিরামগুলি যে কবিতার ছন্দের যতির মতো সমদূরস্থিত নয়, তাও পাঠক লক্ষ করবেন। এর জন্যই আমরা বলতে চাই, পদ্যছন্দে নৈঃশব্দ্য বা Pause-এর সংক্রমণ বেশি, গদ্যে ততটা নয়। গদ্য গড়তে গিয়ে এত বেশিবার বিরাম বিষয়ে সচেতন না হলেও চলে, উচ্চারণের স্বাভাবিক বাক্‌পর্বের সঙ্গে গদ্যছন্দের পর্ববিভাগের হুবহু সাদৃশ্য নেই, এই ছন্দের পর্বও একটি শিল্পিত রচনা।

গ. এর ধ্বনিঃস্পন্দ

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ধ্বনির সচেতন এবং শিল্পিত বিন্যাসকেও এই ভাবের ছন্দের সঙ্গে জুড়ে দেন। যদিও বলেন 'শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার,'[১৬] তবু শব্দচয়নের ব্যাপারটি তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায়। 'ভাবকে এমন করে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে। বাছাই করে সুবিন্যস্ত সুবিভক্ত করে ভাবের শিল্প রচনা করা যায়। বর্জন-গ্রহণ-সজ্জীকরণের বিশেষ প্রণালীতে ভাবের প্রকাশে সঞ্চারিত হয় চলৎশক্তি।'[১৭] এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি শংকরাচার্যের *সৌন্দর্যলহরী*-র এই শ্লোকটি তুলে দেন—

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভার তিমিরদ্বিষাং
বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্করিণম্।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী—
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিবসীমান্তসরণি।[১৮]

এ শ্লোকের ছন্দ আছে একটি, তার নাম শিখরিণী। কিন্তু ছন্দের পর্বের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে অনুপ্রাসের আর্বতন, ব্, ত্, ন্, দ্, র্, স্ ইত্যাদি কয়েকটি ধ্বনির একক ও যুক্ত যাতায়াত। এখানে স্পষ্টভাবেই বাছাইয়ের ও সজ্জার একটি ভূমিকা আছে। সাধারণ গদ্যে সে সবের এত স্পষ্ট ভূমিকা থাকে না। আর এই ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার গদ্যে এত সচেতন ধ্বনি-শৃঙ্খলসজ্জার প্রয়াস আমরা লক্ষ করি না। তবে কিছুটা সচেতন বিন্যাস তো থাকেই। আমরা আবার রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য থেকেই খানিকটা তুলে নিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করি—

গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমাল আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া-কাঁথা আর শাল-দোশালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে-বেসুরে ঝনাঝন ঝংকার লাগিয়ে দিল।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস, কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।[১৭]

এই অংশে খুব স্পষ্ট না হলেও শ্, ঝ্, গ্, ত্ ইত্যাদি ধ্বনির অনুবর্তন, আছে অর্থের কনট্রাস্ট্ বা বিরোধের ব্যবহার, আছে মেটাফরের একাধিক প্রয়োগ। শুধু ধ্বনির দিক থেকেই যদি দেখি, তাহলেও এর মধ্যে সাধারণ গদ্যের তুলনায় যে-একটি পৃথক সচেতন 'রচনা'-র ব্যাপার আছে, তা চোখে না-পড়েই পারে না। শুধু ধ্বনির অনুবর্তন বা অনুপ্রাসে নয়, আছে ধ্বনির বিষমতার বা বিরোধ-বিন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের মতো শব্দের অধিরাজ-কবি অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই অনুপ্রাসের প্ররোচনা এড়িয়ে যেতে পারেন, কিন্তু অনুপ্রাস-বর্জিত অংশেও ধ্বনির ঘাত-প্রতিঘাত, কবিতার মতো না হলেও, নিশ্চিত জেগে ওঠে। কিছু কিছু উদাহরণ তুলি—

পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।
আমার ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল
দিগন্তপ্রবাসী বিরহের জনহীনতায়;
আর তেপান্তরের মাঠে কল্পলোকের রাজপুত্র
ছুটিয়েছে পবনবাহন ঘোড়া
মরণসাগরের নীলিমায় ঘেরা
স্মৃতিদ্বীপের পথে।

এই অংশের শব্দবন্ধগুলি দৈনন্দিনতা থেকে দূরবর্তী। 'সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণ', 'দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতা', 'পবনবাহন ঘোড়া', 'মরণসাগরের নীলিমা', 'স্মৃতিদ্বীপ'—এ সব পদবন্ধের একটিও দৈনন্দিন অনুষঙ্গ নয়, তা ঊর্ধ্বায়িত কবিকল্পনা আর পদবন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ।

মনে আছে একদিনের কথা।
রাত্রি থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি;
ভোরের বেলায় আকাশের রং

যেন পাগলের চোখের তারা।
দিকহারানো ঝড় বইছে এলোমেলো,
বিশ্বজোড়া অদৃশ্য খাঁচায় মহাকায় পাখি
চার দিকে ঝাপট মারছে পাখা।

আশা করি রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যের চাল, ছন্দ ও ধ্বনিঃস্পন্দে যে নিছক গদ্য, ভাবপ্রধান টানা গদ্য এবং কবিতা থেকে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছিল, তা উপরের আলোচনা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হবে।

৪

অভিজ্ঞতাবস্তু

রূপগত, বিশেষত ভাষার শরীরভিত্তিক ওই সব লক্ষণ বুঝে নিয়ে এবারে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আমাদের আসতে হবে, তা হল গদ্যকাব্যের 'বিষয় বা অভিজ্ঞতার জগৎ'। রবীন্দ্রনাথ এর উপরেও অনেক কথা বলেন, গদ্যছন্দসংক্রান্ত তাঁর রচনাগুলিতে। *পুনশ্চ*-এর ভূমিকায় তিনি যে কাব্যের অধিকার-কে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়ার[২০] কথা বলেন, তা এই দিক থেকেই। রবীন্দ্রনাথ আবার খানিকটা তুলনাত্মক অলংকারের সাহায্য নিয়ে বলেন, কবিতার (ছন্দের কবিতার) বিষয় যেন 'সুন্দরী রমণী', কিন্তু গদ্য কাব্যের বিষয় যেন পুরুষ, পুরুষের নিজস্ব সৌন্দর্য, রমণী সৌন্দর্য যার উপমার নয়।[২১] পরে *পুনশ্চ* প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেন, এ 'কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে।'[২২] এখানেও এসেছে পুরুষের উপমা। অন্যত্র নারীর উপমাটিকে আরো বিশদ করেন তিনি—এই যে নারী, 'অশোকের গাছে যে আলতা-আঁকা নূপুর-শিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল; না-হয় কোমরে আঁটো-আঁচল-বাঁধা, বাঁহাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়ছে আলগা হয়ে; সকলের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক্ করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না, না-হয় গদ্য-লিরিকই হল।'[২৩] অন্যত্র বলেন, ছন্দের কবিতা যেন করবীগাছ, আর গদ্যকাব্য যেন বটগাছ।[২৪] আর-এক জায়গায় দেখিয়ে দেন, 'কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল এখন আর তা নেই। এখন সে সমস্তকেই আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়, এখন স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।'[২৫]

কীরকম এই বাস্তব অভিজ্ঞতার বিস্তার, যা তাঁর গদ্যকাব্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে চান রবীন্দ্রনাথ? নীচে কয়েকটি নমুনা দেখা যাক তার—

অন্য পারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে সরষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত...[২৬]

কোপাই / পুনশ্চ

আমার ভালোবাসা
যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো
অনেকদিন হল চাষি যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে।

তবু মানতেই হবে যে, এ ধরনের আধুনিক অলংকরণ এই চারটি কাব্যগ্রন্থে খুব বেশি নেই, হাতে গোনার অতিরিক্ত সংখ্যায় নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অলংকরণ ছন্দের কবিতার পুরোনো সৌন্দর্যের সূত্রকেই মান্য করেছে। আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণে এইটা ধরা পড়ে যে, *পুনশ্চ*-এ ও *শ্যামলী*-তে দৈনন্দিনতার অনুষঙ্গ একটু তুলনায় বেশি। কবিতার নামগুলি যদি লক্ষ করি, তাহলেও দেখব *পুনশ্চ*-এ *কোপাই, খোয়াই, পত্র, পুকুরধারে, ছেলেটা, সহযাত্রী, ক্যামেলিয়া, শালিখ, সাধারণ মেয়ে, একজন লোক, বাঁশি, শেষ সপ্তক*-এর *পাঁচিলের এধারে, ফুলকাটা চীনের টবে* (উনিশ), *পাড়ায় আছে ক্লাব* (একত্রিশ), *তুমি গল্প জমাতে পার* (বিয়াল্লিশ) ইত্যাদি, *পত্রপুট*-এ *তেঁতুলের ফুল* ইত্যাদিতে দৈনন্দিনতার অভিক্ষেপ আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্মৃতি, প্রেম, সংগীত সৌন্দর্যের ইত্যাদি আবেগের দ্বারা দৈনন্দিনতা থেকে পরিচিত রোমান্টিক উত্তরণ ঘটে। বস্তুত সৌন্দর্যের একটি ব্যাপক আবহমণ্ডল ঘিরেই থাকে এই কবিতাগুলিকে। কিন্তু এ সৌন্দর্য প্রাত্যহিককে ছুঁয়ে থাকতে চায়। মৃত পচা পশুর চিতপাত দেহে বোদলের এমন সৌন্দর্য দেখেছেন যে, তাকে শয্যায় সকাম দয়িতার সঙ্গে তুলনা করেছেন এক তীব্র তির্যক নন্দনতত্ত্বে, সেই তির্যক নন্দনতত্ত্ব অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নয়। এখনও কুৎসিত তাঁর চোখে মূলত, কুৎসিতই, যেমন *পুনশ্চ*-র *বাঁশি* কবিতার গলির নোংরা জঞ্জালের বর্ণনা, কিন্তু, এবং কান্তবাবুর কর্নেটের পিলু-বারোয়াঁর সুর 'দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো' এ গলিটাকে ঘোর মিছে করে দেয় বলেই, তাকে উদাসসৌন্দর্যময় স্মৃতিমেদুরতায় উড়িয়ে নিয়ে যায় বলেই, কবিতায় তার কৃপণ স্থান করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, অন্তত এই ধরনের কবিতায়।

তবু কুৎসিত আর সুন্দরের মাঝখানে আছে একটা মস্ত বাস্তবের জগৎ, যা স্বতই সুন্দর না হলেও যা অসহনীয়রূপে কুৎসিত নয়, যাকে দেখলে মনে কোনো অপছন্দের অনুভব জাগে না। তার মধ্যেই পড়ে সংসারের বেশির ভাগ বস্তু, ঘটনা, দৃশ্য। এই নানা বস্তু ঘটনা ও দৃশ্য আমাদের জীবনযাত্রা ও অভিজ্ঞতাকে ঘিরে থাকে। আমাদের মনোভাবের নানা মাত্রা অনুযায়ী আমরা সংসারের যাবতীয় তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে এইভাবে ভাগ করে যদি দেখাই—

১. সুন্দর, কাম্য, উপভোগের জগৎ;

২. অসুন্দর কিন্তু সহনীয় ও স্বীকার্যের জগৎ;

৩. অসুন্দর ও অসহনীয়ের জগৎ।

তাহলে তৃতীয় জগৎটিকে রবীন্দ্রনাথ এ পর্বের কবিতায় তথ্য হিসেবে এনে তা থেকে উত্তরণের নানা উপায়ই সন্ধান করেছেন, তা আমাদের অগোচর থাকে না। এটা রোমান্টিকতার এক মৌলিক স্বভাব। অর্থাৎ এই কুৎসিত বিষয়গুলিকে নিয়ে তাঁর একটা অস্বস্তিই আমরা লক্ষ করি। *সাহিত্যের পথে* (১৯৩৬) বইয়ের নানা প্রবন্ধে এই বিষয়টি বিভিন্ন সূত্রে এসেছে। আধুনিক কাব্য থেকে একটু তুলে দিই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে—'অঘোরপন্থীরা যে বেছে-বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল

হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয় তাহলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়।'[৩০]

দ্বিতীয় জগৎটাকে স্পষ্ট করে সুন্দর বা কুৎসিত কিছুই বলা যাবে না, কিন্তু অনেক সময় প্রতিবেশে, বিন্যাসে, বা আবেগের স্পর্শে তা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। এর মধ্যে সহনীয় রকমের বিরূপ বা কুৎসিত থাকতে পারে, তাকে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'ভাবের সৌন্দর্য' বা 'চরিত্রের সৌন্দর্য' —তাই দিয়ে শিল্পের সুন্দর করে তোলা যেতে পারে। আধুনিক কাব্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে নন্দনবোধ—নিরপেক্ষ বাস্তবকে নন্দনের পৃথিবীতে নিয়ে আসার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন এজরা পাউন্ডের 'নন্দনতত্ত্ব' কবিতায়, কিংবা এমি লোয়েলের লাল চটিজুতো বিষয়ক কবিতায়।[৩১] আমরা মনে করি না, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতায় যে বোধভিত্তি নির্দেশ করেন এ প্রবন্ধে—যে বিশ্বকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে 'নির্বিকার তদ্‌গতভাবে'।[৩২] দেখতে পারাটাই 'আধুনিকতা'—তা যথার্থ। শিল্পে ব্যক্তিগত আসক্তি থাকবেই, বিজ্ঞানের সঙ্গে এখানেই শিল্প আলাদা। কিন্তু সহনীয় ও স্বীকার্য বাস্তবকে সৌন্দর্যের পরিমণ্ডলে নিয়ে আসা আধুনিকতার একটি বড় লক্ষণ—এটা রবীন্দ্রনাথের এসব কবিতায় একটু বেশি পরিমাণ আছে। আর তার সৌন্দর্যের বা ভাবুকতায় জগৎ একটু বেশি পরিমাণেই আছে যা সব রকমের কবিতায় অনায়াস বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যেও তার জায়গা বড় কম নেই। তবু এসব কবিতাকে পৃথক করে দেয় শুধু তার বিষয় নয়, তার এই ভাষারীতি যাতে বাক্‌পর্বের অনুষঙ্গী বাচন, প্রবহমাণতার প্রচুর স্বাধীনতা এবং আধুনিক ধরনের কথনশৈলীর অবতারণার একটা ব্যাপক চেষ্টা আছে।

কলেজের ইকনমিক্‌স ক্লাসে
খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে
চশমা-চোখে মেডেল পাওয়া ছাত্র—
হালের লেখা কোন্ উপন্যাস কিনতে হবে,
ধারে মিলবে কোন্ দোকানে
'মনে-রেখো' পাড়ের শাড়ি,
সোনায়-জড়ানো শাঁখা,
দিল্লির-কাজ-করা লাল মখমলের চটি।
আর চাই রেশমে-বাঁধাই করা
অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়ছে না।[২৭]

ছুটির আয়োজন, *পুনশ্চ*

হাটের দিন
মাঠের মাঝখানকার পথে
চলেছে গোরুর গাড়ি।
কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা,
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচুশাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা।[২৮]

এগারো, *শেষ সপ্তক*

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠেছে ব্যাঙ্কে,
যখন হুঁশ ছিল না আর কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোরবাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই-একটি ছেলেকে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।
সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারে বারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।

অমৃত, *শ্যামলী*

উপরে বর্ণনার দিক থেকে মনে হওয়া সম্ভব যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জীবন-অভিজ্ঞতার সীমানা খানিকটা প্রসারিত হয়েছে। যেসব ছবি বা আখ্যানবয়ন কেবল গল্পে উপন্যাসে চলত সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ কবিতার আধারে ধরবার চেষ্টা করছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন সব সংবাদ বা তথ্যাবলি কি আনা যেত না কবিতায়—যেভাবে আনা হয়েছে *চৈতালি*-তে, কিংবা *সোনার তরী*-র *যেতে নাহি দিব* কবিতার কিছু সাংসরিক অনুপুঙ্খে? কিংবা ‘কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ি’র মতো শিশু কবিতায়? কিন্তু তাতে এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, *চৈতালি*-র কবিতাগুলির অনুপুঙ্খ কখনোই এত বিস্তারিত নয়, *যেতে নাহি দিব*-তে সরস কনট্রাস্ট তৈরির জন্য এই গার্হস্থ্য বস্তুনিচয়ের চমৎকার তালিকা, আর শিশু-কবিতার রস বড়দের কবিতার রস থেকে আলাদা।

দ্বিতীয়ত, শুধু বর্ণনায় নয়, অলংকরণেও রবীন্দ্রনাথের নজর পড়েছে আধুনিক উপমান সংগ্রহের দিকে, এবং সেখানেই তাঁর নন্দনতত্ত্বে পরিবর্তনটা বেশি চোখে পড়ে। আমরা নীচের এই দৃষ্টান্তগুলি দেখি...

মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।

হাইড্রলিক জাঁতায়-পেষা কাব্যপিণ্ড

কবিতাটিকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল-ডাঙার অগ্নিবাসে চড়ে

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।

গিয়েছ সমুদ্রপারে,
ভারতে সরকারের
ইম্পীরিয়াল রথযাত্রায় লম্বা দড়িতে
হেঁইয়ো বলে দিতে হয়েছে টান।

সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।

আমার ছুটি চারিদিকে ধু ধু করছে।

ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।

বাদলের দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে

লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা বলে
ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।

৫

তবু হয়তো এ গদ্যছন্দ আজকের কবির গদ্যছন্দের মতো নয়, এই রীতি নয় সাম্প্রতিক গদ্যকবিতার রীতির সদৃশ। বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যের ভাষাও কীভাবে তাঁর ছন্দের কবিতার ভাষাকে স্মরণ করায় তার কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করব।

এক. তৎসম শব্দ ও প্রাচীন ধরনের সমাস তিনি প্রচুর ব্যবহার করেন, যেমন—

জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণিতে
রুষ্টরুদ্রের প্রলয় ভ্রুকুঞ্চনের মতো
লেখা হচ্ছিল
ধাবমান আলোকের জ্বলদক্ষরে
সুদূর নক্ষত্রের
হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী।

দুই. বহুল পদ্যে, এবং তাঁর নিজেরই শেষদিককার গদ্যে, ব্যবহার করেন ক্রিয়াপদকে এগিয়ে আনা, যাকে বলা হয় বিপর্যাস বা inversion। গদ্যে inversion অসম্ভব বা অনপেক্ষিত নয়, কিন্তু তার বহুলতা এক ধরনের মুদ্রাদোষ হিসেবে চিহ্নিত হয়—

আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
চলল জীবনযাত্রার রথ
এ-পথে-ও-পথে।
আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি।
চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।

তিন. বিষয়বস্তুর দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যিক' সৌন্দর্যময় আবেগময় বিষয়কে বেশ উদারভাবেই আমন্ত্রণ করেছেন এ চারটি কাব্গ্রন্থে। *পুনশ্চ* ও *শ্যামলী*-তে তুলনায় একটু কম, *পত্রপুট* ও *শেষ সপ্তক*-এ তুলনায় একটু বেশি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে'[৩৩] এ হবে 'রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থভারসহ গদ্য নয়, তৈজস গদ্য।'[৩৪]

এই কবিতাগুলিকে গদ্যপদের একটা সন্ধিস্থল, কবিতার অধিকারকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়েছে। তবু কেবল সংক্ষিপ্ত একটি ভালোবাসার মতো কেন রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে আঁকড়ে ধরে আবার ছেড়ে গেলেন, সেইটে এক রহস্য। আশা করি পণ্ডিতেরা তার উন্মোচন করবেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা নিয়ে যুক্তিজাল আরম্ভের বছর সাতেক পরে *ডাস্ ভর্ট* পত্রিকায়[৩৫] বেরটোল্ট ব্রেশ্‌ট তাঁর নিজের গদ্যকবিতা (“Rhymeless Verse with Irregular Rhythm”) লেখায় যুক্তি দিয়েছিলেন। দুয়ের যুক্তির মধ্যে কিছুটা মিল লক্ষ করবার মতো। দুজনেই চারপাশে জীবনকে দেখে, সমাজের ছবির একটা সমান্তরালতা সন্ধান করেছেন ছন্দে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মূলত রোম্যান্টিক, নারী-পুরুষের পৃথক চলনের মধ্যে পুরুষালি পৃথিবীর ছন্দভাঙা নতুন নন্দনতত্ত্বের মধ্যে আর-এক ধরনের নতুন সৌন্দর্য সন্ধান করেছে তা। ব্রেশ্‌ট শ্রেণিবোধের আর একটু অবস্তরে গিয়ে শ্রমিকের স্লোগানের কাটা-কাটা উচ্চারণ কথায় ধাক্কা, সেই সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অঙ্গভঙ্গির (gest) ছন্দ আনবার চেষ্টা করেছেন তাঁর মিলহীন, অসমছন্দের কবিতায়। কারণ তাঁর মতে কথার উচ্চারণ হওয়া উচিত gestic বা অঙ্গভঙ্গি ভিত্তিক। তাঁর এই নতুন ছন্দের পূর্বসূত্র হিসেবে তিনি নাম করেছেন র‍্যাঁবো-র *নরকে এক ঋতু*-র “heightened prose”-এর। শ্রমিকের জীবনের “discordances and interferences” সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, ফলে তাঁর নতুন কবিতা তা হয়ে দাঁড়ায় “a protest against the smoothness and harmony of conventional poetry ... an attempt to show human dealings as contradictory, fiercely fought ever, full of violance.”[৩৬]

বলা বাহুল্য, ব্রেশ্‌টের এই শ্রেণি সংঘাতের যুক্তি রবীন্দ্রনাথের নয়। কিন্তু দুজনেরই একটু যুক্তি আছে। অর্থাৎ প্রিন্সটন এনসাইক্লোপিডিয়ার ওই ‘self-conscious art’ হিসেবে দুজনের গদ্যকবিতাই গড়ে উঠেছে। পরবর্তী বাঙালি কবিদের মধ্যে এক বুদ্ধদেব বসু ছাড়া কাব্যভাষা বা গদ্যকবিতার এই self-consciousness ছিল কি না তা আমাদের সংশয় উদ্রেক করে। মনে হয়, তাঁরা এলিয়ট বা রবীন্দ্রনাথ থেকে গৃহীত উত্তরাধিকার হিসেবেই অনেকে এ মাধ্যমটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১-২. দ্র. Laxness, Halldor, 1961, Gitanjali in Iceland, Tagore Centenary Volume, Sahitya Akademi, p. 332 এবং Meireles Cecilia, ‘Togore and Brazil’, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। দ্বিতীয় প্রবন্ধের এই পঙ্‌ক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য... *the free verse so characteristic of the period with its long Biblical cadences could easily suggest Tagore’s influence in some of the known writers of this period : Tasso de Silveira, Murillo Araujo, Francisco Karam and later, perhaps, Emilio Moura.* p. 336.

চীনের কবিদের উপর রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ প্রভাবের সংবাদ পাওয়া যাবে শিশিরকুমার দাস ও তান ওয়েনের *বিতর্কিত অতিথি* (প্রমা) গ্রন্থে।

৩. দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৬৩, *রবীন্দ্রজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫ যেমন *পত্রপুট*-এর আঠারো সংখ্যক ছন্দের কবিতা লিখছেন ৫ বৈশাখ ১৩৪৩, আবার গদ্যে ১৪ ও ১৫ সংখ্যক কবিতা লিখছেন ১৮, ১৯ বৈশাখ।

৪. দ্র. *রবীন্দ্ররচনাবলী*, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (পরে শুধু ‘র-র’) চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৮৮

৫. ওই, পৃঃ ৫২০-২৯
৬. ওই, পৃঃ ২৬৩
৭. ওই, পৃঃ ২৬৪
৮. ওই, পৃঃ ২৬৫
৯. ওই, পৃঃ ২৬৭
১০. ওই।
১১. *চারিত্র পূজা*, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ দ্র।
১২. 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার ছন্দ', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের (সম্পা), ১৯৪১, পৃঃ ২৭৮
১৩. র-র, চতুর্দশ, পৃঃ ২৮৭
১৪. ১২-র সূত্র, পৃঃ ৩৩-৩৪
১৫. ওই, পৃঃ ৩৪
১৬. র-র, চতুর্দশ, পৃঃ ২৭১
১৭. ওই, ওই।
১৮. ওই, ওই।
১৯. র-র, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৯
২০. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২৬৪
২১. ওই, পৃঃ ২৬৫
২২. ওই, পৃঃ ২৬৬
২৩. ওই, ওই।
২৪. ওই, পৃঃ ২৭২
২৫. ওই, পৃঃ ২৮৫-২৮৬
২৬. র-র, তৃতীয়, পৃঃ ১
২৭. ওই, পৃঃ ৯১
২৮. ওই, পৃঃ ১৬১
২৯. ওই, পৃঃ ৪২৮
৩০. র-র, চতুর্দশ, পৃঃ ১
৩১. ওই, পৃঃ ৩৪৫
৩২. ওই, পৃঃ ৩৪৮
৩৩. ওই, পৃঃ ২৮০
৩৪. ওই, পৃঃ ২৬৫
৩৫. দ্র. Willet, John, 1964, *Brecht on Theatre*, London, Methuen & Co. pp. 115-221
৩৬. ওই, পৃঃ ১১৬

দেড়শততম জন্মবর্ষের আলোকে দুই মহামানব

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের এই দুই মহামানবের জন্যে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। দু'জনেই তাঁদের অলোক সামান্য প্রতিভার জন্যে বঙ্গসন্তান হয়ে শুধুমাত্র ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই অভাবনীয় খ্যাতকীর্তি হয়েছেন। উনিশ শতকে এই বাংলার মাটিতে, জলবায়ুতে, আকাশে-বাতাসে। বিধাতা-পুরুষ এমন কিছু উপাদান ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যার প্রভাবে, গ্রহণে ও স্বীকরণের মধ্য দিয়ে নব-নব ব্যক্তিত্বে ভাস্বর মহামানবদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। এখানে আমরা তাঁদের মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে মাত্র দু'জন বিশ্বজয়ী বাংলার অসাধারণ মহাত্মার কথা বলতে চলেছি। কথা সূত্রে আরো একজন অবতারী ঠাকুরের কথা আসবে। সকলকেই প্রণাম।

জন্মের বৎসরটি হিসেবের মধ্যে গণ্য করলে বছর দুয়েক পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের দেড়শত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এই বছর অর্থাৎ ২০১২ সালে স্বামীজী—বিবেকানন্দের সার্ধ জন্মশতবৎসর নানা স্থানে, নানাদেশে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হচ্ছে দু'বছর পূর্বে বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও সার্ধশততম জন্মবৎসর এদেশে ও বিদেশে পালিত হয়েছে। তবুও শ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কথা স্মরণে আছে এমনই আনন্দ যে যে-কোনো সময়েই তাঁদের কথা বলা ও লেখা যেতেই পারে। অবশ্য এঁদের জন্মের বিশেষ বিশেষ বৎসরকে কেন্দ্র ক'রে সেই লেখা বা আলোচনা যে একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করে—একথা খুবই সত্য। আমার কৃতীছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীমান ড. তরুণকুমার মুখোপাধ্যায় আমাকে উপর্যুক্ত বিষয় সম্পর্কেই দু'চার কথা লিখতে অনুরোধ করেছেন। বয়োধর্মে ও চোখের দৃষ্টির ক্ষীণতার জন্যে লেখার কাজ খুবই মন্থর হয়ে এসেছে। তথাপি ছাত্রের দাবির নিকট হার মানতেই হলো শেষ পর্যন্ত।

যাইহোক, প্রথমেই বলি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আশি বছর আমাদের 'এই দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো' পৃথিবীতে ছিলেন। এটি আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। তিনি জীবনের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করেছেন, প্রকৃতির আমন্ত্রণে সমস্ত অন্তর দিয়ে সাড়া দিয়েছেন। মানব ও প্রকৃতির সেই মহান-স্রষ্টাকে প্রাণের গভীরে অনুভব করেছেন নানাভাবে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ছিল তাঁর অত্যন্ত সজাগ, তীক্ষ্ণ ও অতীব সাড়া-প্রবণ। তাঁর সকল অনুভব, সকল চিন্তা-ভাবনা, সকল হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ সকল তান ও গানকে বিচিত্রপথে বিচিত্র ভাবে ভাষায় ও বিচিত্র আঙ্গিকে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর সময়টিতে আমাদের মনকে নিয়ে যেতে পারলে এবং সহমর্মিতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে চাইলে এক এক সময় মনে হয়, তাঁর পরে বুঝি আর কারো কিছুর বলার রইল না।

বিবেকানন্দ মূলত একটি বিশেষ জগতের, ধর্মজগতের মানুষ। মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে (১৮৬৩-১৯০২) এই ধরাধাম থেকে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন। কিন্তু এই স্বল্পবৃত্ত জীবন নিয়ে তাঁর

এদেশে আবির্ভাব যেন এক ধূমকেতুর উদয়—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্যরূপে 'অখণ্ডের দেশ-থেকে-আসা' এই মহামানব তাঁর জ্ঞানে—কর্মে আলোচনায় রচনায় ও বাগ্মিতায় সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন তুলে দিয়েছিলেন তাঁর ধর্মচিন্তায়—বিশেষত ভারতীয় হিন্দুর সনাতন আর্য ধর্মের কথায়। আর্যঋষিদের ধ্যানলব্ধ অমূল্য চিন্তা, শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাঁর আলোচনা, রচনা বা বক্তৃতায় ছিল প্রবলতম আবেগ, জোর এবং কঠোরতম যুক্তি ও সেই সঙ্গে অকল্পনীয় পাণ্ডিত্য। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে হতবাক্ হয়ে যেতেন। তাঁর মতো দুর্লভ ধর্মজ্ঞানীর চিন্তায়, মানবপ্রেমের আন্তরিকতায় ও দরিদ্র এবং নিঃস্বদের জন্য কান্নার টানে বিদেশিনী ধর্মপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা এদেশে এসে তাঁর কাজেই জীবনোৎসর্গ করে গেছেন। ধর্ম বিষয়েই স্বামীজীর বক্তব্য, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও রচনা (অধিকাংশই ইংরেজিতে) প্রচুর। এগুলি অত্যন্ত সারগর্ভ ও মূল্যবান।

চিন্তাশীল স্বামীজী তাঁর চারপাশে বিশেষত তাঁর দেশ ভারতভূমির নানা বিষয় নিয়েও যথেষ্ট ভেবেছেন। সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাষা—ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি চিন্তা করেছেন। নানাদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের বহু বিষয় নিয়ে তুলনা দর্শন-চিন্তা, সাম্যবাদ-ভাবনা—কথ্য ভাষার প্রতি অনুরাগ, এদেশের গঙ্গানদীর প্রতি তাঁর মমতা প্রভৃতি কতো রকমের চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে এসেছে। *ভাববার কথা, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজকের কথা* ইত্যাদি বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থও কিছু আছে তাঁর। এগুলির মূল্যও যথেষ্ট। একথা স্মরণে রেখেও বলবো তাঁর চিন্তাজগতের বেশির ভাগ স্থানই অধিকার করেছিল ধর্মচিন্তা। বরং আরো একটু সূক্ষ্ম ভাবে বললে বলা চলে ধর্ম ও দর্শন চিন্তাই তাঁর সমস্ত মনকে একরূপ অধিকার করেছিল। এই দুয়ের আলোচনায় তিনি খুবই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। ভিতরের কোন্ এক রহস্যময়ী শক্তির প্রণোদনায় সকলকে অভিভূত করে তাঁর অপূর্ব জলদগম্ভীর স্বরে স্তব্ধ চিত্তে সকলকে শোনাবার জন্য তিনি এক দৈববিভূতি নিয়েই এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। অতুলনীয় বাগ্মীর অতি দুরূহ বিষয়কে অতি সহজবোধ্য ভাবে ইংরেজি ছোট ছোট বাক্যে পরিবেশণ করা ও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকে নাড়া দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর।

বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার দিকটি নিয়েই সংক্ষেপে কিছু প্রথমেই বলতে চাই। তারপর রবীন্দ্রনাথের কথা। বলাই বাহুল্য স্বামীজী ধর্মজগতেরই একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। দেশ-বিদেশের সকল ধর্মশাস্ত্রে তিনি ছিলেন গভীরভাবে নিষ্ণাত। আমরা জানি জীবনের একটি বিশেষ লগ্নে ধর্মসংক্রান্ত এক জিজ্ঞাসা তাঁকে অধীর করে তুলেছিল। এর সমাধান সূত্র না পেয়ে যখন তিনি উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন, তখন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর প্রাণের সকল সংশয় তৃষ্ণার নিবারণ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ, কিছুকাল তাঁর সহজ সরল ধর্ম ব্যাখ্যান শ্রবণ ও তাঁর স্পর্শে ঈশ্বর-বিশ্বাসে নিঃসংশয় হন তিনি। এই গুরুর তিরোভাবের পর তিনি সারা ভারত পরিব্রাজক রূপে ভ্রমণ করে দেশের প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেশবাসীর 'জীবনে জীবন যোগ করে'। গুরুর শিক্ষা, নিগূঢ় প্রেরণা, নিজের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলস্বরূপ তিনি আমেরিকার চিকাগো শহরের ধর্মসম্মেলনে কয়েকদিন অবিস্মরণীয় বক্তৃতা করে তিনি সারা বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই সঙ্গে ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের মহিমা সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হল। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড পরে এদেশের নানা স্থানে স্বামীজী ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা করতে থাকলেন।

ধর্মসম্পদে আমরা ধনী হলেও কালে কালে সনাতন আর্য ধর্মে অনেক আবর্জনা ও ত্রুটি প্রবেশ করেছিল। সুপ্রাচীন যাগযজ্ঞবহুল বৈদিক ধর্ম মননশীল ঔপনিষদিক ধর্মে এসে ঠেকেছিল একদা।

আবার উপনিষদের ধর্মও নিরাকার আত্মচিন্তার পথ থেকে সরে এসে সাকার দেহকে মূল্য দিয়ে পৌরাণিকতায় আশ্রয় নিয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মধ্যযুগের সাধুসন্ত এবং শ্রীচৈতন্য এঁরা প্রত্যেকেই ধর্মের বিশেষ বিশেষ সংকটকালে আবির্ভূত হয়ে যুগোচিত প্রয়োজন ও দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একই ধর্মকে নবভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। উনিশ শতকে সম্পূর্ণরূপে বহিরাগত সমৃদ্ধ ও সুসভ্য জাতি ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে এদেশের ধর্মচিন্তায় যখন প্রবল অভিঘাত এসে লাগে তখনই যুগ-প্রয়োজনে যেমন যুগাবতার যুগপুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, তেমনি তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দেরও।

পূর্বেই বলেছি, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আঘাত আমাদের ধর্মের ওপর এসে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমাদের ধর্মও ঠিক তার বিশুদ্ধিকে বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছিল। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা যাকে স্বামীজী একটি নূতন শব্দ সৃষ্টি করে বলতেন—'Don't touchism' সমগ্র হিন্দু সমাজকে পঙ্গু করে তুলেছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্বের কোনো কৃত্য পালন না করেও সকল বর্ণের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইতেন ও তাঁদের ঘৃণা করতেন। তাছাড়া ধর্মের নামে আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্যে দেবতাকে আড়াল ক'রে রাখা হতো। শাস্ত্রের নানা নির্দেশ ও অনুষ্ঠানের অপব্যাখ্যা তখন করা হত। এর ফলে শিক্ষিত ইংরেজি জানা এদেশের যুবকদের মনে বিরূপ ধারণা জন্মাত। এর ফলে এই বাংলায় উনিশ শতকে ধর্ম নিয়ে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম এহেন পরিস্থিতিতে এদেশে শিকড় গেড়ে বসতে চেয়েছিল। হিন্দুযুবকদের মধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণ ও সংশয়-প্রবণ চিত্তে কেউ কেউ আত্মহত্যাও করছিলেন। এমনকি রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো লেখকগণ এই চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারেননি। এঁরা সকলেই একটি উদার ভিত্তির ওপর হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ধর্মের স্বরূপ সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সত্য কথা বলতে কি, সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই দেশের এই গুরুতর সংকট কালে ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। স্বামীজী কিছুদিন কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মে আশ্রয় নিলেও সেখানে তাঁর মন আশ্বস্ত হয়নি শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে আশ্রয় করে সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলেন।

এবার আমরা তাই বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তায় অগ্রসর হচ্ছি। গুরুর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে ধর্মের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ গভীর। সংসারের নানা কাজকর্মে লিপ্ত থেকে পরে সুযোগ মতো ধর্মচর্চা করলেই হবে। এমন ভুল ধারণা দূর ক'রে দিলেন স্বামীজী। তিনি জানালেন ধর্ম হলো উপলব্ধির বিষয়। ঈশ্বরকে জানা, পাওয়া, আর তার সঙ্গে মিলন বা একাত্ম হওয়ার যে প্রয়াস—তাই হল ধর্ম। এ-জীবনেই তা সম্ভব। আর একাগ্রতা ও মননের দ্বারা ইন্দ্রিয় জগতের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের তাঁকে অনুভব বা উপলব্ধি। স্বামীজী বলেছেন, "Religion is realisation. It is not to know, in the ordinary sense of the word, not intellectual understanding, not a mere rationalistic comprehension of the real things, not mere groping in the dark, but intense realisation, much more real than this world is to our senses"।[১] নানা প্রসঙ্গে স্বামীজী ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, সকলের হাত দিয়ে ঈশ্বর কাজ করেছেন, সকলের পা দিয়ে চলছেন, সকলের মুখ দিয়ে খাচ্ছেন। প্রত্যেক জীবেই তিনি বর্তমান। তিনি সকলের মন দিয়ে মনন করেন। অনুভব বা উপলব্ধির বিষয় ধর্মকে ব'লে স্বামীজী প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন বলেছেন এবং পরিচিত জগতেই অসীম অনন্তকে খুঁজেছেন। ধর্মের মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় জগতে ঈশ্বরকে খুঁজলেও পরে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কথা তিনি

বলেছেন গুরুর অনুসরণেই। জীবকে 'দয়া' করতেও তিনি চাইতেন না গুরুর কথায়। তিনি সেদিন বোঝেন 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায় সংসারের সকল কাজে তাকে আনা যায়'। 'অদ্ভুত আলোক' পেয়েছিলেন ঠাকুরের কথায়। বিবেকানন্দ মনে করতেন ধর্ম মানে কতকগুলো মতবাদ, বিধিনিষেধ স্বীকার করা বা বিশ্বাস করা নয়, কিংবা গির্জা বা মন্দিরে যাওয়া বা কোনো বিশেষ ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন নয়। ধর্মের অর্থ তদাকারকারিত হওয়া বা হতে চেষ্ট করা। প্রত্যেক মানুষের "Soul is divine, the goal is to manifest this divine within by controlling nature, external and internal".[৩] আর এরই জন্য কাজ করা, পূজা করা, মনোসংযমী হওয়া, দর্শনশাস্ত্র পড়া ইত্যাদির সাহায্যে মুক্ত হতে চেষ্টা করা—এইটেই ধর্মের সর্বস্ব আমাদের সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত করে আছে ধর্ম। শুধু বর্তমান জীবন নয়, ভূত, ভবিষ্যৎকেও যুক্ত করে রেখেছে ধর্ম। ধর্ম হল সনাতন ঈশ্বরের সঙ্গে সনাতন আত্মার সম্পর্ক। ধর্ম কোনদিন পরিবর্তিত হয় না। মানুষের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তরই ধর্ম।

প্রশ্ন উঠবে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মে ঈশ্বর ও আত্মাকে মানা হয়নি। তাহলে এখানে স্বামীজীর ধর্মের সংজ্ঞার্থ কীভাবে প্রযোজ্য হবে? একথার জবাবে স্বামীজী বলেছেন, বুদ্ধ যে বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন এবং মহাবীর যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন তা সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত জগতে পৌঁছেই। সেখানেই তাঁদের সত্য দর্শন। আর তাই তো ধর্ম। ধর্ম মানুষকে যথার্থ মানুষ করে, পশু-মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে, ধর্ম মানুষকে অনন্ত মহাজীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। অনন্তের অনুসন্ধান ও তাকে নিজ সত্তার সঙ্গে একীভূত করার জন্য মানুষের যে নিরন্তর সংগ্রাম তাই তো ধর্ম। এখানেই তো মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব। আনন্দের দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে এখানকার আনন্দ অতি উচ্চস্তরের।

ধর্মের প্রয়োজনের কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের হিতবাদীদের কথা এনেছেন। জীবনে পার্থিব সুখের কথা বিবেকানন্দ অস্বীকার করেননি; কিন্তু জোর দিয়ে তিনি একথাও বলেছেন যে পার্থিব সুখ-সন্ধানী ব্যক্তিদেরও ধর্মানুশীলন করতে হবে। হিতবাদীরা সমাজের পক্ষে ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেননি বলে স্বামীজী প্রতিবাদ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন হিতবাদীদের মত সব কালের সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। তাঁরা যে সমাজের ওপর এতো গুরুত্ব দিচ্ছেন তা পরবর্তীকালে থাকবে না। তাই তাদের বিধি-বিধান চিরন্তন নয়। মানব মনকে গতিশীল করবার জন্য ধর্মই শ্রেষ্ঠ নিয়ামক শক্তি—"It is the greatest motive power that moves the mind"।[৪]

স্বামীজী ধর্মের মূলতত্ত্ব বিষয়ে অবহিত ছিলেন, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অমর। স্বামীজীর ধারণায় আমাদের অমর আত্মা ঈশ্বরকেই কামনা করছে। পার্থিব আত্মার বহুবিধ বন্ধনে আত্মা পীড়িত; তাই সে তার নিজস্ব সত্তাকে বা স্বরূপে বিস্মৃত। এই বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য চলছে তার সর্বদা সংগ্রাম। এই মুক্তির চিন্তাকে মানুষ কখনো বর্জন করতে পারে না। রুশো বলেছেন—"Man is born free, but everywhere he is in chains"।[৫] এখানে যে বন্ধন, তা সামাজিক বন্ধন, রাজনৈতিক বন্ধন—দুর্বলের ওপর সবলের বন্ধন— মানবপ্রেমিক রুশোর এ উক্তি তাই হিতবাদীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই মনে আছে ও অত্যাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি মনকে বিরূপ করে; কিন্তু স্বামীজীর চিন্তার মূল আরো গভীরে। তিনি মুক্ত আত্মার প্রকৃতি কবলিত হওয়ার অক্টোপাশ বন্ধনের কথা বলেছেন। আর এ-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছে কারো মধ্যে দেখা দিলে বুঝতে হবে তিনি ধর্ম-পথের পথিক হয়েছেন। তাঁর কথায় "The first impulse towards becoming religions"।[৬] আর এই ভিতরের সম্বেগই হল জগতের উন্নতির মূল।

"The idea of freedom you can not relinguish, your actions, your very lives will be last without it"। প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি আমাদের মুক্ত না করে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধতে চাইছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে যে আমরা মুক্ত "some inner voice tells us that we are free"।[৭]

বিশ্বের সকল মানুষের অনশ্বর আত্মার ঈশ্বর-আকৃতি এবং তার জন্যে পার্থিব-বন্ধন ছেদন ক'রে নিজেদের সীমিত সত্তাকে অসীমতা দান যদি সত্য হয় এবং নিজেকেই ঈশ্বর বলে অনুভব করাটাই যদি সত্য হয়, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হয়, তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটিও যে খুবই ঘনিষ্ঠ তা স্পষ্ট হয়। সব ধর্মের সার-সত্যের মধ্যে যখন কোনো পার্থক্য নেই। সকলেই যখন মুক্তিকামী এবং 'আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক'—বলেই জানে, তখন এ পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে এমন মারামারি, হানাহানি ও রক্তারক্তি কেন? ধর্মীয় পার্থক্যকে বড় করে তুলে এক এক জাতি পরস্পরকে কেনই বা ঘৃণা করে? এর জবাবে স্বামীজী জানান যে ধর্মের সার সত্যের দিকে কারো নজর নেই। ধর্মের বহিরঙ্গের কতকগুলি দিককে নিজেদের স্বার্থে মনের মতো ব্যাখ্যা করে পারস্পরিক বিদ্বেষকে মানুষ জীইয়ে তোলে। আর এরই জন্য বিবেকানন্দ ধর্মের তিনটি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। একটি তাঁর দার্শনিক দিক—যেখানে থাকে ধর্মের মূল বিষয় বা মূলতত্ত্ব। একটি পৌরাণিক দিক—যেখানে থাকে সাধারণ বা অসাধারণ পুরুষদের জীবনকাহিনি। আর তৃতীয় অংশটি হল আনুষ্ঠানিক দিক—যেখানে পূজাপদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান, নানারকম অঙ্গন্যাস, পুষ্প, ধূপধুনো ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু প্রয়োগের কথা। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় তাদের নিজেদের সকল দিকগুলিকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ভাবে ও অন্যদের সব কিছুকে কুসংস্কার বলে। গোঁড়ামি বশত সম্প্রদায় বিশেষের এমন আচরণই যত কিছু বিভেদ-বিদ্বেষের মূল, ধর্মের ক্ষেত্রে।

তাছাড়া আরো একটি কারণও লক্ষণীয়। বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতি ও জয়যাত্রার যুগে যুক্তির কষ্টিপাথরে স্বামীজী সুপ্রাচীন সনাতন হিন্দুধর্মকে যাচাই করে নিয়েছিলেন—এবং তার সার সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, অভিব্যক্তিবাদ, কার্যকারণতত্ত্ব, বস্তু গঠনের শুধু অনুপরমাণু নয়, পজিট্রন, ইলেকট্রন প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিভাগগুলি আলোচনা করে ঈশ্বরকে এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে ঐ সমস্ত যুক্তির আলোকেও সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। অবশ্য এর সঙ্গে এই বাংলায় একদা হিন্দুধর্মের অতিশয় রক্ষণশীল সমর্থক শশধর তর্কচূড়ামণির বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দুধর্মের নিয়মনীতিগুলির সামঞ্জস্য দেখানোর হাস্যকর যে পন্থা তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ বিষয়ে স্বামীজীর বিজ্ঞানসম্মত পথে ধর্মব্যাখ্যা আমাদের বিস্মিত করে।

স্বামীজী ধর্মের ক্ষেত্রে বিভেদ, ঘৃণা ইত্যাদি দূরীকরণের জন্যও চিন্তা করেছিলেন। তাই ধর্মের একটি সার্বভৌম রূপ সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। অবশ্য ধর্মের এই সর্বজনীন রূপ পূর্ব থেকেই ছিল; কিন্তু মানুষের স্বার্থপরতার জন্যে সে রূপ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা মুসলমান সম্প্রদায়ে ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলই। কিন্তু তবুও মুসলমান ও খ্রিস্টান কি সেই ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পারেন? হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে স্বামীজী ধর্মের সেই সার্বভৌম রূপটিকে যুগোচিত আলোকে তুলে ধরেছিলেন। এই ধরনের চিন্তার মূল শ্রীমদ্ ভগবদগীতার একটি শ্লোক স্বামীজীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এক একটি মণি যেন এক একটি পৃথক্ ধর্মমত। আর স্বয়ং ভগবান সূত্ররূপে প্রতিটির মধ্যেই অবস্থান করেছেন।

''ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাঃ ইব''। বহুত্বের মধ্যে একত্বই হল সৃষ্টির নিয়ম। সুতরাং

স্বামীজীর মতে ধর্মের একটি আদর্শ অসম্ভব নয়। তাছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে নিজ জীবনে স্বামীজী নিজ গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ধর্মসমন্বয়ের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন। সকল ধর্মমত সত্য—একথা প্রাচীনকাল থেকে মানুষ শুনে এলেও বাস্তবে সকল ধর্মকে একসূত্রে বন্ধনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই অনেক ভেবেই বিবেকানন্দ প্রতিটি ধর্মের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রত্যেকটি মানুষকে অন্যের সঙ্গে মেশাবার চেষ্টায় সর্বজনীন ধর্মের একটি আদর্শ স্থির করেছিলেন। এটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে এর জন্য প্রথমেই কোনো একটি ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদ বা অনুষ্ঠান যেমনই হোক, তাকে লুপ্ত করার চেষ্টা অন্যায়—তাকে যেমন চলছে, চলতে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে যেখানে আছে, তাকে উপরে তুলতে হবে বা সাহায্যে করতে হবে। সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে স্বামীজী বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। একটি বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন ভগবান। বৃত্তটির আছে নানা ব্যাসার্ধ। প্রত্যেকটি ব্যাসার্ধ যেন এক একটি ধর্মমত—আর বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ এক একটি ব্যাসার্ধ ধরে চলছে—সকলেরই লক্ষ্য হল ঐ কেন্দ্রস্থল—সেখানে গেলেই তো সব বিভেদের অবসান।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ ও তাদের স্বভাব-প্রকৃতিও নানারকমের। তবুও স্বভাব প্রকৃতির দিক থেকে এদের প্রধান চারটি ভাগে স্বামীজী ভাগ করেছেন। ভগবদগীতার বক্তব্যকে বোঝানোর জন্যে তাঁর এমন বিভাগ। (ক) উদ্যমশীল কর্মঠ ব্যক্তি (খ) ভাবুক প্রকৃতির মানুষ (গ) অতীন্দ্রিয়বাদী যোগী এবং (ঘ) দার্শনিক। উদ্যমশীল কর্মঠ ব্যক্তিরা সংসারে শুধু সৎকাজ করতে চান। ভাবুকশ্রেণির মানুষ শিব-সুন্দরের পূজারি—প্রেম ও প্রেমময় ভগবানের এরা পূজারি, পৃথিবীর সব অবতার মহাপুরুষ এদের পূজ্য। অতীন্দ্রিয়বাদী যোগীরা মানবমনের ক্রিয়া সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী—মানুষের অন্তরে কোন্ শক্তি ক্রিয়াশীল, কীভাবে তাদের বশীভূত ও পরিচালনা করা যায়, তা জানতে তাঁরা আগ্রহী। আর সর্বশেষে দার্শনিকের দল—এঁরা প্রত্যেকটি বিষয় মেপে দেখেন—মানুষের দেখার উপরেও তাঁদের বুদ্ধিকে নিয়ে যেতে চান। এই চারটি মানুষের শ্রেণি চারটি পথে ঈশ্বরানুসন্ধান করছেন যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—এই চারটি পথের কথা গীতায় আছে এবং এরা পরস্পর বিরোধীও নয়। বিবেকানন্দ এখানেই না থেমে আরো একটুখানি অগ্রসর হয়েছেন এবং ঐ চারটি পথকে একটিমাত্র পথে মেলাতে চেয়েছিলেন যাতে ঐ একটিমাত্র পথে যেতে পারলে, সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শটি উপলব্ধি সহজ হয়। তাই Ideal of a Universal religion-কে বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, "I want to propagate a religion that will be equally acceptable to all minds; it must be equally philosophic, equally emotional, equally mystic and equally conducive to action."[৮]

সমস্ত রকম মনের উপযোগী, সমপরিমাণ দর্শনমূলক ভক্তিপ্রবণ ও কর্মপ্রেরণাময় হবে তাঁর সেই আদর্শ ধর্ম। এ ধর্মের সঙ্গে পূর্বোক্ত চারটে দিকের থাকবে সামঞ্জস্য। কর্মীর দৃষ্টিতে এ হল ব্যক্তির সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির অভেদভাব। কর্মী কর্ম ছাড়া কিছু জানেন না। কিন্তু কর্ম করার একটা রহস্য আছে। কর্ম দুঃখ নিয়ে এলে কর্ম বন্ধ করতে হবে—কারণ আসক্তি। তাই অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে হবে। এ হলো কর্মযোগ। গীতা—নির্দেশিত যোগের পথেই স্বামীজী তাঁর আদর্শ ধর্মের সন্ধান পান। রাজ যোগ হল মনস্তত্ত্ব বিষয়ক যোগ। মনোবৃত্তির সাহায্যে এখানে পরমাত্মার সঙ্গে যোগস্থাপনের উপায়। একাগ্রতা এখানে খুব দরকার। ভক্তিযোগে প্রেমের পথে ভগবানের সঙ্গে মিলন। ভক্তেরা এই যোগে সব প্রেমিক। পুষ্প-মাল্য, গন্ধ দ্রব্যে পূজা। এঁদের প্রেম নিষ্কাম।

আর জ্ঞানীরা চান নিখিল সত্তার সঙ্গে ঐক্যবোধ। দৃশ্য জগতের বাইরে যেতে চান এঁরা। জড়-বিজ্ঞান এঁদের তৃপ্ত করে না। তাঁকে লাভ করেই এদের পরমা তৃপ্তি। এই চার যোগের কোনো একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রও নয়। এক একটিতে একটি বিশেষ পথের প্রাধান্য। তাই জ্ঞানপন্থী যিনি কর্মকে বা প্রেমকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারেন না। আবার যিনি ভক্তিপন্থী, তিনি জ্ঞান ও কর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন না। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্বামীজীর মুখেই শোনা যাক। "God is existence, knowledge and Bliss Infinite. But existence without knowledge and love can not be. Knowledge without love and love without knowledge can not be. So what we want is the harmony of all these—existence, knowledge and love. we want harmonious and not onesided development."[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সীল-মোহরের মধ্যেও এই চারটি যোগের মিলনসূত্রটি দেখানো হয়েছে। এর পরিকল্পনা তো স্বামীজীর। এখানে দেখি তরঙ্গায়িত একটি হ্রদের মধ্যে একটি পদ্ম বিকাশোন্মুখ—একটি হংস ও সূর্যের জ্যোতি বিকীরিত হচ্ছে। আর সব কিছুকে ঘিরে আছে একটি সাপ। এর ব্যাখ্যা করেছেন স্বামীজী এইভাবে। তরঙ্গময় জল হলো সংসার প্রবাহের কর্মের প্রতীক। পদ্ম হল ভক্তির প্রতীক। আর সব কিছুকে আবৃত করে রাখা সাপটি হলো রাজযোগের জেগে থাকা কুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক। আর পরমাত্মার প্রতীক হচ্ছে হংস। আরো একটু দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে জলের সঙ্গে পদ্মের, হংসের ও সাপের যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি পদ্মের সঙ্গে সূর্যেরও। রাজযোগ আর তিনটি যোগের সঙ্গেও যুক্ত তাই সব কিছুকে ঘিরে রয়েছে সাপ। এ সমস্তের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই হংস বা পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

যাইহোক, এইভাবে গীতার ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে স্বামীজী যে বিশ্বজনীন ধর্মের কথা ভেবেছিলেন, তাতে যে-কোনো একটি পথ ধরেই মানুষ চলতে পারে এবং তাতে অন্য পথগুলির সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বা সেগুলিকে পরিহার করে নয়। বরং সেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়েই। কিন্তু এ পথ বাস্তবে গ্রহণ সকলের পক্ষে কতদূর সম্ভব হবে, তা ভেবে দেখতে হবে—যদিও গীতার বক্তব্য ও স্বামীজীর অপরূপ ব্যাখ্যাও খুবই যুক্তিপূর্ণ।

এ-বিষয়ে স্বামীজীর জীবিত কালেই আর এক অবতারী পুরুষ শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র বলেছেন—'ধর্ম এক ঈশ্বর এক। সব প্রেরিত পুরুষগণ একই বার্তাবহ'। আবার 'অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে', কিংবা 'বাঁচা-বাড়ার মর্ম যা, ধর্ম বলে জানিস তা'। সপরিবেশ বাঁচা-বাড়ার উৎসই হল ধর্ম। গীতোক্ত সাধনার পথগুলির যে কোনো একটির মধ্যে অন্য তিনটি মিশে আছে। তাই যে-কোনো একটি পথ ধরেই মানুষ ধর্মসাধনার পথে চলতে পারে। আর ধর্মসাধনা হল জীবনচর্যা ছাড়া কিছুই নয়। ধর্মের ছায়াতলে জীবনের সব কাজ করে চলতে হবে। ধর্মের পথই বাঁচার পথ, আমাদের যথার্থ বৃদ্ধির পথ-দেবগুণ লাভ করার পথ। এই বোধ থাকলে সম্ভবত সকল সমস্যার সমাধান ঘটতে পারে। এর ইঙ্গিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দিয়ে গেছেন। স্বামীজী সেই পথেই চলেছিলেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যুগ-প্রয়োজনে তাকে আরো সহজ পথে নিয়ে গেছেন কিছু পরিবর্তনের মধ্যে। ধর্মকে এক না বলা পর্যন্ত সমস্যার সমাধান অসম্ভব। একথা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের।

স্বামীজী আমাদের পূর্বেই জানিয়েছেন যে বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে তোলার জিনিস নয়। তা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আছে। সব ধর্মেই ঈশ্বর আছেন। তিনি সর্বত্রই এক—একথা মনে রাখতে হবে। মানসিক ঔদার্য ও সকল ধর্মকে বরণের সহনশীলতা চাই। 'যত মত তত পথ' থাকলেও যে কোনো একটি গ্রহণ করেও ঐ কথা স্মরণে রেখে চিত্তকে উদার করে তোলা চলে। পূর্বে বিশ্বজনীন

ধর্ম-প্রবর্তনের প্রয়াস দু'বার ব্যর্থ হয়েছে। একটি বিশেষ ধর্মকে সর্বজনীন বলে অন্য ধর্মগুলিকে অস্বীকার করা হয়েছে ও অন্য মতাবলম্বীদের কাছে তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—এরই প্রতিক্রিয়ায় ঘটেছে ধর্মযুদ্ধ। আবার বিভিন্ন ধর্ম থেকে ভালো ভালো জিনিস নিয়ে নূতন ধর্ম গড়ার চেষ্টা মহামতি আকবর করেছিলেন 'দীন-ই-ইলাহি ধর্ম' প্রবর্তন করে। কিন্তু তাও স্থায়ী হয়নি। স্বামীজীর কথায় এ-ধর্মে অত্যাচার থাকবে না অন্য ধর্মের ওপর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাসী হবেন—পুরুষ-নারী সকলের মধ্যে যে মানবতা। সকলের মধ্যে যে দৈব প্রকৃতি তা বিকশিত করতে সহায়তা করবে এ ধর্ম।

কিন্তু সকল ধর্মের মধ্যেই যে ঈশ্বর আছেন, তাঁর স্বরূপ সর্বত্র এক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যাঁরা ঈশ্বরের উপাসক এবং যাঁরা ঈশ্বরকে একটি নাম ও রূপের মধ্য দিয়ে ভজনা করেন তাঁরা তাদের দেবতাকেই 'পরমতম সত্য' ব'লে বিশ্বাস করেন। ভক্তিপন্থী এই সব পূজারী যদিও জ্ঞান ও কর্মকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন না, তথাপি তাঁদের দেবতার রূপ-কল্পনা ভিন্নপন্থীদের কাছে গ্রহণীয় নাও হতে পারে। এইভাবে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধও কিছু বিচিত্র নয়। তাই স্বামীজীর অন্তরের কথা হল ধর্ম বিভিন্নতা যখন থাকবেই তখন জোর করে মঠ—মসজিদ ভেঙে ফেলাও অন্যায় তাই উপাসককে বেদান্তের ব্রহ্ম ধারণায় আসতেই হবে। আর সেই অরূপ অব্যক্ত, নির্গুণ পরম সত্যকে উপলব্ধি করতেই হবে। এই উপলব্ধি যাঁর হবে তাঁর কাছে সকল বাদই গ্রহণযোগ্য হবে। তখন অরূপদেবতা, সৃষ্টি ও লয়ের উৎস সর্বজনীন শক্তি—যা ঐ ব্রহ্মেই প্রচ্ছন্ন, তাকেও বোঝা সহজ হবে। এই বোঝা হলে ব্রহ্ম বা Impersonal God-ই যে বিশ্বের সব ধর্মের মূলে-তা উপলব্ধি করা যাবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিষ্য স্বামীজী দুজনেই এই সত্য জানতেন। অবশ্য ঠাকুরের জন্যই বিবেকানন্দের চিত্তে এই সত্য ধরা পড়েছিল।

বঙ্গ সন্তান বীর বিবেকানন্দ বাংলার ধর্ম-সমস্যাকে প্রথম অনুভব করেছিলেন; পরে সারা ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি সেই ধর্মসমস্যাকে ভারতীয় ধর্ম-সমস্যা বলে জেনেছিলেন। কিন্তু এখানেই তিনি স্থির থাকেননি। দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালবাসার জন্যে তিনি অবজ্ঞাত, দারিদ্র্য পীড়িত, পরাধীন ভারতজননীর অতীত মহিমাকে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত করতে চেয়েছিলেন। দুর্বল, পরাণুকরণে মত্ত জাতিকে বীর্যমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যও তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ধর্মচিন্তাই বিশ্ববাসীর সঙ্গে তাঁর নৈকট্য এনে দিয়েছিল। তিনি তাই বিশ্বের সকল মানুষকে আত্মার আত্মীয় বলে মনে করতে পেরেছিলেন। আর সেই কারণেই তো সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন এক ধর্মাদর্শের বেদীমূলে তিনি বিশ্ববাসীকে আনতে চেয়েছিলেন। প্রবহমান ইতিহাসের গতিধারা লক্ষ্য করে সমগ্র দুনিয়ায় তিনি শ্রমজীবী মানুষের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির যা কিছু ভালো তাকে তিনি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন। তাঁকে আমরা নানাভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছি, কিন্তু বাস্তবে তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিনি।

আজ আমাদের স্বাধীন দেশ—নানা সমস্যায় বিড়ম্বিত—মারাত্মক হয়ে উঠেছে জাতীয় সংহতি রচনার পথ। স্বামীজীর স্বপ্ন ও প্রদর্শিত পথে আমরা চলতে পারলে বহু সমস্যার সমাধানে আমাদের কোনো অসুবিধেই হতো না। উচ্চ আদর্শের অভাবে জাতীয়তাবাদ মানুষকে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ও ভোগতান্ত্রিকতার দিকে ঠেলছে। এতে শুধু দেশের নয়, সমগ্র জগতের ক্ষতি হচ্ছে। আর এরই জন্যে আধ্যাত্মিক আদর্শে বীর্যবান নিঃস্বার্থ সেবকের প্রয়োজন। স্বামীজীর ধর্ম আজকের দুনিয়ায় এই কথাই বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত করছে। তাঁর সার্ধশত বৎসরে তাঁর বক্তব্যকে নিবেদন করে শেষ করছি।

রবীন্দ্রনাথ ঃ এবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা। পূর্বেই বলেছি দু'বছর আগেই তাঁর জন্মের দেড়শতবৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। তবুও তাঁর কথা কোনোদিন ম্লান হবার নয়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা বিষয়ে কিছু আলোচনা করছি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয়ক চিন্তার সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার সাদৃশ্য একরূপ নেই বললেই চলে। অথচ দুজনের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা চিন্তার মধ্যে নানাস্থলেই সে-সাদৃশ্য স্পষ্ট। দুজনেরই জন্ম কলকাতায়, দুজনেই সমসাময়িক এবং চিন্তার জগতে দুজনেই সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। দুজনেই অতীত ভারতের গৌরবকে পুনরুদ্ধার করে বিশ্বজনের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। দুজনেরই দেশপ্রীতি, মানবপ্রেম এবং বিশ্বমৈত্রীবোধ গভীর। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসম্পর্কিত নানা আলোচনার মধ্যে যেখানে যেখানে বিবেকানন্দের সঙ্গে এক আধটুকু সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি, শুধু সেই দিকগুলি কিছু কিছু তুলে ধরতে চাই। কবি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত—নিজেকে হিন্দু বলে বারবার পরিচয় দিলেও তাঁর ধর্ম ঠিক হিন্দুর ধর্মও যেমন নয়, তেমনই তা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মও নয়। তাঁর পিতা মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থটি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মূল ভিত্তিটি গড়ে দিলেও জীবনের পথে চলতে চলতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ও নানা গ্রন্থ পাঠ করে নিজস্ব দৃষ্টিতে তিনি ধর্ম সম্পর্কে একটি বিশেষ উপলদ্ধিতে এসে পৌঁছেছিলেন। বৈদিক ধর্ম, উপনিষদের ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, মধ্যযুগের সাধু-সন্তদের বাণী, বাউলদের ধর্ম—সব কিছু এসে মিশেছিল তাঁর চিন্তা ও চেতনায়। 'ধর্ম' গ্রন্থ (১৯০৯) এবং সতেরো খণ্ডে সমাপ্ত শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা 'শান্তিনিকেতন' নামে গ্রন্থগুলিতে এবং 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' সম্পাদনাকালে নানা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অতি গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা আছে।

প্রথমেই আমরা বলতে পারি জন্ম থেকেই রবীন্দ্রনাথ এক অরূপ দেবতায় বিশ্বাসী। তাঁর ওপর অটল-অচল বিশ্বাস জীবনের কোনো পর্বেই এক মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দেরও শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে আসার পর থেকে এই ঈশ্বরের অস্তিত্বে সুদূর বিশ্বাস জন্মেছিল এবং তাঁর সকল শক্তির মূল উৎস ছিল এই ঈশ্বর। ঈশ্বরকে লাভ করা, তাঁকে পাওয়াই ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বলে স্বামীজীর মতো রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন। ধর্ম যে এই ঈশ্বরেরই অনুসন্ধান-তা যে উপলব্ধির ব্যাপার এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতের বিশেষ পার্থক্য নেই। ঈশ্বরকে 'পাওয়ার' অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা ক্ষমা দ্বারা সন্তোষের দ্বারা সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।''[১০] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এখানেই থামেননি—চরম ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে তিনি বুদ্ধের 'ব্রহ্মবিহার' বলেছিলেন—'যেখানে অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত' করা হয়। এই শেষোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার মিল না থাকলেও ঈশ্বর-প্রাপ্তি বা তদাকারবারিত হওয়ার সূত্রটি দুজনেরই প্রায় এক।

ঈশ্বর যে বিশেষ সম্প্রদায়ের নন সব ধর্মের ঈশ্বরই যে এক, সব ধর্মের অবতারগণ যে সমানভাবে পূজ্য—এ চিন্তা বিশ্বমনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা পর্বেই দেখা দিয়েছে। এই সময়েই কবি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে খ্রিস্ট ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ভাষণ দান করেছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে এবং এর কিছুদিনের মধ্যে এখানে ভগবান বুদ্ধ ও হজরত মহম্মদের স্মরণোৎসব পালনের রীতি প্রচলিত হল। মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে তাঁদের

সংস্কারমুক্ত চিত্তে প্রেমের পথে ঈশ্বরোপাসনার বাণীকে নিজের প্রাণের বাণী বলে তিনি মনে করলেন এবং এ-ধারণাও তাঁর হল যে সেই সুদূর অতীত থেকে ভারতীয় ধর্মসাধনার স্রোত তাঁর মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার প্রধান কথা প্রেমতত্ত্ব। প্রেমের পথে যেমন মধ্যযুগের সাধু-সন্তগণ প্রেমময়কে পেতে চান, রবীন্দ্রনাথও তেমনি প্রেমের পথে-ভক্তির পথে ঈশ্বরের আরাধনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এ-চিন্তায় বৈষ্ণবীয় প্রেমসাধনার প্রভাবও অবশ্যই লক্ষণীয়। তবে কঠোরভাবে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনের অনুশাসন মানবার মানুষ তিনি নন। তাই পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। রবীন্দ্রনাথ ভক্তির সাধনায় মত্ততাকে, অসংযমকে বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। তাই যে ভক্তি ''তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে'' তা তিনি চাননি—তাঁর ভক্তি হ্রী-ধী ও শ্রী-সমন্বিত। স্বামীজী 'ভক্তিযোগ' এ প্রেমের পথে ঈশ্বর-উপাসনা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে এর সার্থকতা ও উপযোগিতাকে দেখিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু তিনি এর বিকারের দিকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রীয় পথে কিছু বলেননি। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যেমন প্রত্যেকদিন ঈশ্বরের ধ্যানে বসতেন—রবীন্দ্রনাথ আর্টিস্ট বা জীবনশিল্পী হয়েও প্রত্যেকদিন উপাসনা করতেন এবং বিশেষ মন্ত্রকে ধ্যান করতেন, মন্ত্র তাঁর কাছে মননের জিনিসকে 'বাঁধবার উপায়' ছিল।

গীতার কর্মযোগের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর ব্যাখ্যার কিছু মিল লক্ষ করা চলে। জ্ঞানবাদীর সংসার ও কর্মের সকল প্রকার বন্ধনকে অস্বীকার করা এবং ব্রহ্মকে শুধুমাত্র 'নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প ও নির্গুণ' বলায় রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। একটুখানি নিজস্ব চিন্তায় তিনি জানালেন, 'কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।'[১১] স্বামীজী তাঁর 'কর্মযোগ' এ কর্মের রহস্য আলোচনা করে গীতোক্ত পন্থায় কর্ম কীভাবে বন্ধনের কারণ হতে পারে না তা দেখিয়ে দিয়েছেন। অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করতে এবং সর্বকর্মফল ঈশ্বরে নিবেদন করতে তিনি বলেছেন ঈশ্বর-উপাসনার ক্ষেত্রে। তাহলেই আনন্দলাভ সুনিশ্চিত। স্বামীজী এই আনন্দের দিকটি নিয়েও কিছু আলোচনা করে বলেছেন আধ্যাত্মিক রাজ্যের আনন্দই সবচেয়ে বেশি।

ঈশ্বর নির্গুণ না সগুণ—এ নিয়ে বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তিনি বলেছেন ঈশ্বরের এই দুই বিশেষণের কোনটি সত্য তা নৈয়ায়িকেরা বিচার করবেন কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মকে অন্বেষণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা বলবেন তিনি 'উভয়ই'। মনের এক এক অবস্থায় তিনি কখনো নির্গুণ বা কখনো সগুণ। 'মায়াবাদ' এবং দ্বৈত-অদ্বৈত নিয়েও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেছেন তবে ভারতীয় দর্শনের দিক থেকে এ-সব আলোচনা তিনি করেননি। 'সত্যে'র দিক থেকে বিচার করলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী-দের যে বিরোধ নেই—রবীন্দ্রনাথের এ কথায় স্বামীজীরও কোনো আপত্তি নেই। তবে মায়াবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বেশ নতুন। আমাদের সংসারে আমাদের চারপাশে যে আপাত-প্রতীয়মান নানা সংশয় নানা দ্বন্দ্ব—সেগুলিই তাঁর মতে মায়া বা মিথ্যা। সুতরাং একে অস্বীকার করলে চলবে না। তবে এই মায়াকে কাটিয়ে উঠতে হবে একথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আমাদের ''অন্তরাত্মার ভিতরে এক বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে।''—এই মায়ার বন্ধন কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ভারতীয় দর্শনের আর একটি তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষভাবে ছাপ ফেলেছিল যার সঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্যের পুরোপুরি মিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''এই বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নেই,

একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন।"[১২] অবশ্য এ-ক্ষেত্রে উপনিষদের মূল সূত্র দুজনেরই আশ্রয়।

ধর্মসমন্বয়ের চিন্তা বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল। বাংলা ১৩১৫ সালের শান্তিনিকেতনের মাঘোৎসবের ভাষণদানকালে তিনি উৎসবটিকে ব্রাহ্মোৎসব বলতে চাননি—'ব্রহ্মোৎসব' বলে তার সর্বজনীনতার দিকটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ উৎসব কোনো সম্প্রদায় বিশেষের নয়—এ হল মানব সমাজের উৎসব। 'নবযুগের উৎসব' প্রবন্ধে তিনি 'ধর্মসমন্বয়ে'র কথা বললেন।

তিনি আরো জানালেন যে আমাদের ব্যক্তিগত সীমিত ও সংকীর্ণ মন একটি বৃহৎ মনোলোকের সঙ্গে ভালভাবে মিলিত হতে চাইছে। আর এই মিলনের জন্যে মানুষ নিজের বাইরে পরিবার, পরিবারের বাইরে দেশ এবং দেশেরও বাইরে বিশ্ব-মানব-সমাজের দিকে নিজের চিত্তকে প্রসারিত করবার জন্যে চেষ্টা করছে—এই আত্মব্যাপ্তিই—নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের মতে নবযুগের ধর্ম। মনে রাখতে হবে যে এই আত্মব্যাপ্তি বেদান্তের 'সর্বভূতে ঈশ্বর' এবং আমার সঙ্গে ঈশ্বরের একাত্মতা বোধ থেকেই আসতে পারে। ভারতীয় হয়েও সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে বিবেকানন্দের দুশ্চিন্তা এবং তাঁর বিশ্বপ্রেমের মূলেও রবীন্দ্রীয় ঐ 'ব্যপ্তি-পরিবার-দেশ ও বিশ্বে' ব্যাপ্ত হবার ক্রমটিও অনুমান করা যেতে পারে।

আবার বিভিন্ন ধর্মের মিলন প্রসঙ্গে বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের দিক থেকে এমন একটি কথা বলেছেন যার সঙ্গে বিবেকানন্দের অভিমত প্রায় এক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ছোটই হোক আর বড়ই হোক বিভিন্ন ধর্ম নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই চলুক। শক্তির পূর্ণবিকাশ হলেই মিলন দেখা দেবে। তাঁর কথায়, "এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে।"[১৩] বিবেকানন্দের এই চিন্তা সূত্রের কথা আমরা পূর্বে বলেছি। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসের ধারা মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণীটি—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মন্ত্রটি শুনতে পেয়েছিলেন। এই ঐক্য ও সমন্বয়ের সুর রবীন্দ্রীয় ধর্মচেতনারও মূলে। আবার স্বামীজীও ছিলেন ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র। কতকগুলি রাজ্যের উত্থান-পতন বা কয়েকজন শাসকের জয়-পরাজয়ের ঘটনাপঞ্জীকেই স্বামীজী ইতিহাস মনে করেননি। কোনো দেশের আদর্শ ও ভাবধারার কথাই সে-দেশের যথার্থ ইতিহাস। আর আমাদের দেশের সেই ভাবধারাকে বহন করে নিয়ে এসেছেন সুদূর অতীত যুগ থেকে সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও ঋষি ও সাধু-সন্তেরা। বাইরের সব কিছু উৎকৃষ্টকে স্বী-করণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঐ আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আর এই ভাবধারাই জাতীয়তার উন্মেষ ঘটিয়ে শেষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। কিন্তু ঐ ভাবধারার মূলেও রয়েছে সেই অধ্যাত্ম জগতের একত্বের বাণী—মিলনের সঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি হলেও তাঁর যে দর্শন তা মূলত অধ্যাত্ম-দর্শন। অতীত ভারতের সংস্কৃতি ও আরণ্য-পরিবেশের ওপর ছিল তাঁর নিগূঢ় আকর্ষণ। অতীত ভারতের 'যে জীবন ছিল তপোবনে' কিংবা 'যে জীবন ছিল রাজাসনে'—মুক্তদীপ্ত সে মহাজীবনকে চিত্ত ভরে বরণ করে নেবার কি আগ্রহই না তাঁর ছিল। বারবার তিনি নানা রচনায় কাব্যে প্রবন্ধে তপোবন-আদর্শের পুনরুজ্জীবন কামনা করেছেন। তাঁর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ঐ তপোবন আদর্শের যুগোচিত রূপ। এই আশ্রম সুগভীর একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ওপর অপরূপ প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে গুরু-শিষ্যের মধুর

সম্পর্কের সূত্রে অবস্থিত। স্বামীজীরও অতীত ভারতের প্রতি ছিল সীমাহীন শ্রদ্ধাবোধ। বর্তমান জীবনে উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা সঞ্চারের জন্য তিনি প্রায়ই অতীত ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা বলতেন। অতীত ভারতের যে অধ্যায়ে ঋষি এবং দ্রষ্টারা চরম ও পরম সত্যকে প্রত্যক্ষেরও অধিক সত্যরূপে অপরোক্ষ করেছিলেন—সেইকালেই ছিল যথার্থ ভারতবর্ষ।

বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথও ধর্মকে কোনো গ্রন্থবদ্ধ বস্তু বলে মনে করতেন না। ধর্ম যেখানে জীবনে পরিব্যাপ্ত সেখানেই তা স্বাভাবিক। আর পাঁচটি বিষয় যেমনভাবে শিক্ষা করা যায়, ধর্মশিক্ষা সেভাবে হতে পারে না যা শিক্ষা করা যায় তা সম্প্রদায় বিশেষেরই ধর্মমত। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত চিন্তার সঙ্গে তো বিবেকানন্দের বক্তব্যের কোনো বিরোধ দেখি না বরং মিলটিই অধিকতর চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আসল ধর্ম ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার। তিনি নিজে বহু অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে যে মানবধর্মে উপনীত হয়েছিলেন তারই কথা মনে রেখে যথার্থ ধর্ম শিক্ষার পরিচয় দানকালে বলেছেন যে প্রতিদিন জীবনের কর্ম ও সেবার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে মনের বন্ধন-মুক্তি ও সুন্দরের যে অনুভূতি তাই হল ধর্ম-শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাই কবিজনোচিত পন্থায় তিনি সেবা ও কর্মের সঙ্গে প্রকৃতিকে যুক্ত করেছেন এবং ঈশ্বরের অনুভূতির পরিবর্তে সুন্দরের অনুভূতির কথা বলেছেন। কিন্তু এই সুন্দরই তো দ্বৈতবাদীর বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর দেবতাই। সেবা, কর্ম, বন্ধনমুক্তি ও ঈশ্বরের অনুভব স্বামীজী নির্দেশিত সবই এখানে পাচ্ছি—যে নির্জনতায় ধ্যানের কথা স্বামীজী বলেছেন তাতে প্রকৃতিরও স্পর্শ যে নেই তা নয়। এখানে স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মূল সূত্রগুলি কিন্তু অনেকখানিই সমধর্মী। তাছাড়া ধর্ম যে উপলব্ধির বিষয় এবং তা যে জীবনে পরিণত করার বস্তু—এ কথা স্বামীজীও বলেছেন এবং পূর্বে তা দেখানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের ধারাটি লক্ষ করলে তত্ত্বের দিক থেকে যে পরিণতি দেখি, তার সঙ্গে স্বামীজীর জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-সাধনার সামঞ্জস্য সূত্রটি সহজেই চোখে পড়ে। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ বৈদিক ঋষিদের পথে প্রকৃতি-অনুভবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। এ ঈশ্বর কিন্তু অরূপ ও Impersonal বলে পরবর্তী কাব্য-জীবনে তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি। তাই মানসিক এই অবস্থায় তাঁর অরূপ কিন্তু Personal ঈশ্বরের অর্থাৎ জীবনদেবতার পরিকল্পনা। কিন্তু দীর্ঘকাল এই অরূপ অথচ Personal ঈশ্বরের সঙ্গে নানা লীলায় যোগ দিয়েও অন্তিমে আবার কবি অস্বস্তি বোধ করেছেন। তাই তখন কবি রূপময়, স্পর্শযোগ্য মানুষ দেবতার ভাবনায় এসেছেন। মানুষ দেবতার সেবাধর্মকেই তখন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে জেনেছেন। এর সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের কী আশ্চর্য মিল।

ভগবান বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজী দুজনেরই ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। বুদ্ধ সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান প্রবন্ধ ও কবিতা বাদ দিয়েও বলতে পারি যে রবীন্দ্রীয় জীবন-দর্শনে বুদ্ধের প্রেম-করুণা ও মৈত্রীর বাণী বিশেষভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে। বৌদ্ধজাতকের বহু কাহিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার উপাদান যুগিয়েছে। এই বুদ্ধদেবের প্রেম মৈত্রী ও করুণার কথা বিবেকানন্দেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তাঁর 'জীবে প্রেম' এর মূলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ছাড়াও বুদ্ধের প্রভাবের কথাও মনে রাখতে হবে। যদি একে প্রভাব নাও বলি, অন্তত তাঁর সেবা-প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করেছিল একথা বলতেই হবে। কালিফোর্ণিয়ায় শেক্সপিয়র ক্লাবে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী 'Buddhistic India' নামে যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য জ্ঞান ও শ্রদ্ধার পরিচয় মেলে। স্বামীজী বুদ্ধের একটি

বাণীতে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন 'Tremendous'। কিন্তু সে কোন বাণী—"Have no God ; have no soul; stand on your feet and do good for good's sake—neither for fear of punishment nor for [the sake of] going elsewhere". এই বাণীর মধ্যে তিনি বুদ্ধের এমনই একটি নৈতিক শক্তিকে লক্ষ করেছিলেন যা মানুষের চরিত্রগত। মানুষের এই 'চরিত্র'ই থাকে—আর সব লুপ্ত হয়ে যায় বলে বুদ্ধের ধারণা। "All that have Passed and died, they have left for us their characters, eternal possession for the rest of the humanity;" বুদ্ধের এই দিকটি সম্পর্কে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেননি।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ শান্তির কবি, সামঞ্জস্যের কবি, সমন্বয়ের কবি—পরিপূর্ণতার কবি। 'শক-হুন-দল-পাঠান-মোগল' এই ভারতে যুগে যুগে এসেছে এবং এক দেহে লীন হয়ে গেছে। বাইরের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে স্বীকরণ (assimilation) করে নিয়ে ভারত তার নিজস্ব ভাবধারাকে বহমান রেখেছে—সেখানে একের মন্ত্র, মিলনের বরণ-শঙ্খ বারবার নিনাদিত হয়েছে। স্বামীজী একস্থলে বলেছেন সব ধর্মের পতাকাতলে খুব শীঘ্রই লেখা হবে এই কয়েকটি কথা—

"Help and not fight"

"Assimilation and not destruction"

"Harmony and Peace and not disension"

ধর্মপ্রসঙ্গে না হলেও রবীন্দ্রীয় আদর্শের মূল কথাগুলি বিবেকানন্দের কণ্ঠেও আমরা শুনছি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের ধর্ম-ভাবনার ক্ষেত্রে যে বিপুল পার্থক্য আছে তা আমার জানি। তথাপি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুজনের চিন্তার যে সাদৃশ্য চোখে পড়েছে, সেগুলির কতকটা এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি। ধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাও যে গভীর ও বিস্তৃত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর ভাবনার মৌলিকতা ও গভীরতা স্বীকার করে নিয়েও বলব যে তিনি নব-যুগের জন্যে যে মানব-ধর্মের কথা বলেছেন তার সঙ্গে স্বামীজীর ভাবনার পার্থক্য প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। তাঁর সমকালে দেশ ও বিশ্বজুড়ে যে ধর্ম-সংকট ঘনীভূত হয়েছিল, তা সমাধানের জন্যে তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেননি বা এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার কথাও তিনি ভাবেননি। অবশ্য কবির পক্ষে এ-কাজে আত্মনিয়োগ না করাটা দোষের নয়। নিজের সীমিত ক্ষেত্রে ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলেছেন তাতে সমগ্র দেশের চিত্ত মথিত হয়ে ওঠেনি (ওঠবার কথাও নয়)। সাধারণ মানুষ আশ্বস্তও হননি (হওয়ার দাবিও অর্থহীন)। অপরপক্ষে ধর্মচিন্তাই যাঁর সমগ্র জীবন সেই বিবেকানন্দের ধর্মীয় বক্তব্য সমগ্র বিশ্বকে সচকিত, বিস্মিত ও মোহিত করেছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁর ধর্মালোচনা শুনে প্রাণের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন এবং ধর্মের যথার্থ স্বরূপ জানতে পেরে নিজের সঙ্গে বিশ্ব ও স্রষ্টার সম্পর্ক বিষয়েও নিঃসংশয় হয়েছেন।

আর রবীন্দ্রনাথ কবি—কবি সার্বভৌম। জগৎ, জীবন ও স্রষ্টাকে যতদিক দেখে যতখানি সুন্দরভাবে দেখা ও দেখানো যায়, তা তিনি দেখিয়েছেন। দৃষ্টি ও সৃষ্টির মৌলিকতায় ও চারুত্বে তিনিও বিশ্বজয়ী বিশ্বকবি। দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুজনের অবদান অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। এমনতর মহাপুরুষদের অযুত নমস্কারের মধ্যে দিয়ে এ আলোচনার উপসংহার হল।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I & IV, p. 162

২। Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, p. 162
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।
৪। শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।
৫। Complete Works Vol. I, p. 219
৬। তদেব।
৭। Complete Works Vol. II, p. 66
৮। রাজবিদ্যা—রাজ মহাযোগ।
৯। Complete Works Vol. V, p. 219
১০। Complete Works Vol. II, p. 125
১১। শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্র রচনাবলী।
১২। রবীন্দ্র রচনাবলী।
১৩। আত্মসমর্পণ, (রর)।

নিভৃত গ্রাম্য ভারতবর্ষ

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ নতুন ইতিহাস রচনা করেননি, কিন্তু ইতিহাসের নতুন পাঠ নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপ রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা একেই ইতিহাসের সেরা উপাদান বলে মনে করেছিলেন। তাই ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গুরুত্বহীনতায় তাঁরা কিছুটা বিস্মিতই হন। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ইতিহাসকেই গুরুত্ব দিতে চান। তাই রাষ্ট্রসর্বস্ব ঐতিহাসিকদের মৃদু কটাক্ষ করে তিনি অনায়াসে বলতে পারেন, ''ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কীসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।''[১] সব খেতে এক জাতের ফসল ফলে না। তেমনই সব দেশের ইতিহাসের এক উপাদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রকৃত উপাদানগুলি সম্পর্কে তিনি বিরোধীদের সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন।

ভারতীয় সভ্যতা তাঁর মতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই সমাজকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে এখানে কোনোদিন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ইউরোপের দেশগুলি নিজের নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার জন্য অনায়াসে পরস্পরের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে যায়। ''সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়।''[২] এইভাবেই ইউরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে থাকে এবং পরপর দুটি মহাযুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি হয়। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিভূমি অবশ্যই ভারতবর্ষ নয়। ইতিহাসের প্রচলিত ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে তাই অনায়াসে বলতে পারেন, ''আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না।''[৩]

রাষ্ট্র ও সমাজ যেখানে অবিচ্ছেদ্য সেখানেই মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি। কেননা সেখানে রাষ্ট্রের বিপদের অর্থ সমাজের বিপদ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে রাষ্ট্রের জন্ম বা বিলুপ্তিতেও ভারতীয় সমাজে ভাঙন ধরে না। তাই বারে বারে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু মূল সামাজিক কাঠামোটিকে তারা তেমনভাবে আঘাত করতে পারেনি। অবশ্য আঘাতের পটভূমিও ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে বিচিত্র উপকরণের সাহায্যে ভারতবর্ষ ঐক্যমূলক সভ্যতার একটি ভিত্তি রচনা করতে পেরেছিল। তাই প্রত্যাঘাতের কোনও নিদর্শন নেই। রাষ্ট্রদেহে বিদেশিদের মেলানো সম্ভব নয়, কিন্তু সমাজদেহে অনায়াসে সকলকে মেলানো যায়। ''ভারতবর্ষ চিরকাল এইভাবেই বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে এসেছে, ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন

ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিস্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"[৪] বিখ্যাত 'ভারততীর্থ' কবিতায় কবি একেই 'একদেহে হল লীন' বলতে চেয়েছিলেন।

এই মনোভাবের জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রচলিত কাঠামোকে রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনীমাত্র' বলে মনে হয়েছিল। 'ওরা কাজ করে' কবিতায় এগুলিই 'শিশুপাঠ্য কাহিনী' হিসেবে চিহ্নিত। এইসব কাহিনীতে যতটা চমক আছে ততটা অন্তর্নিহিত সত্য নেই। এখানে আমরা কেমন খুঁজে পাব, "কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।"[৫] উপহাস করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। ইতিহাসের একটি বিকল্প পাঠপদ্ধতিও তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না, কিন্তু তাকেই ইতিহাস বলে চালানোটা তাঁর মতে আপত্তিকর। ভারতবর্ষের যথার্থ প্রাণসত্তাটির সন্ধান করাই হবে ঐতিহাসিকের যথার্থ কাজ। ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা ইউরোপের জাতিগুলি যে করেনি তা নয়। কিন্তু তারা তা করেছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করার মাধ্যমে। তাই পলিটিক্যাল উন্নতির মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাণশক্তিটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, 'ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির' ভিত্তির ওপর তা দাঁড়িয়ে আছে।

এইভাবে ক্রমশ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি নতুন ব্যাখ্যার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে যাই। 'য়ুরোপীয় ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ' এখানে পাওয়া যাবে না ঠিকই কিন্তু নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে একটি ঐক্যসূত্রে সেও গ্রথিত করে রেখেছে। এই সূত্রটি হয়তো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু তার প্রভাব অসামান্য। রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকেই এই সূত্রটির সন্ধান করেছেন তিনি। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী-কথা'র ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন, "রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।" রামায়ণে আর্য-অনার্যের সংঘাতকে তিনি সামাজিক বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মহাভারত সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত এর মধ্যে "কত পরিবর্তন, কত সমাজ-বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ" দেখতে পাওয়া যায়।[৬] কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নয় সামাজিক বিপ্লবের মাপকাঠিতে এই দুই মহাকাব্যের বিচার নিঃসন্দেহে অভিনব। আর অভিনবতর এই সিদ্ধান্ত, "গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন বিপ্লব, অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ।"

'রক্তকরবী' নাটকের প্রস্তাবনা অংশেও রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে রূপক আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে এখানে কৃষিপ্রধান আর্যসভ্যতার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি লুকোনো আছে। রাম ও রাবণকে তিনি দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ হিসেবেই শুধু দেখেননি তাদের মধ্যে মানুষের দুই শ্রেণিগত রূপও লক্ষ করেছেন। তাই সেখানেও শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে ওঠে। অনার্য-অধ্যুষিত দেশে আর্যদের ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তারের ইতিবৃত্তের কথা এই প্রসঙ্গেই বোধহয় তাঁর মনে

পড়ে যায়। আর্য-অনার্য সভ্যতার একদিকে ক্রমাগত সংঘাত আবার এই সংঘাতের মধ্যেই মিলনের প্রক্রিয়ার 'সিন্থেসিস' ঘটতে থাকে। বৌদ্ধ প্রভাবের প্রাবল্যের দিনে পুনরায় সমাজের অভ্যন্তরে সংঘাতের সূচনা কিন্তু ক্রমশ সেখানেও ভারত-ইতিহাসের চিরন্তন ঐক্যতত্ত্বই বিভেদের অবসান ঘটায়, বুদ্ধদেব হিন্দুদের দশম-অবতারে পরিণত হন। রবীন্দ্রনাথ সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এইভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমন্বয় সাধনের অবিচ্ছিন্ন ধারাটির সন্ধান করে যান। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে মুসলমানদের আগমন কাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সবসময়ই ইতিহাসের তথ্যের প্রতি তিনি নির্ভর করেছেন এমনও না। এসবই তাঁর নিজের ব্যাখ্যা, বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কী হতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা। কট্টর ঐতিহাসিকেরা তা নাও মানতে পারেন।

অবশ্য ঐতিহাসিকেরও তো কিছুটা স্বাধীনতা থাকে। নেমিয়ার বলেছিলেন, Historians imagine the past and remember the future. ইতিহাস চেতনায় রবীন্দ্রনাথ এই পথেরই পথিক। তাঁর বর্তমানই তাঁকে অতীত সম্পর্কে ভাবিয়েছে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচলিত করেছে। তা ছাড়া সমাজ বিবর্তনের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নতুন করে লেখার কথা যখন তিনি বলেন তখন তিনি আধুনিক ঐতিহাসিকদেরই দলে। পানিক্করের মতো প্রথিতযশা ঐতিহাসিকও একদা মনে করেছিলেন যে ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস হতে হবে a history of social growth and development and not primarily a political history. সমসাময়িক দেশকালই যে রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের এই নতুন ধারার কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল—একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরোধ, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, জাতি ও বর্ণগত বৈষম্য এমনকি বিদেশি মতাদর্শ প্রভাবিত স্বদেশচেতনা—এই সবকিছুই প্রতিবাদের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছিল। এটা কোনও কবির কাজ নয়, যথার্থ চিন্তানায়কের কাজ। বিভেদ ও বৈষম্যের তীব্রতাই তাঁকে ঐক্যমূলক ভারতীয় সভ্যতার কথা ভাবিয়েছিল। বিশেষ করে পরাধীন দেশবাসীকে এই মিলনমন্ত্রটি শোনানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি প্রায় একাই গ্রহণ করেছিলেন।

বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের তীব্র ধর্মীয় বিরোধ তাঁকে ক্রমাগত পীড়িত করছিল। এ সব ক্ষেত্রেও তিনি কবি নন, যথার্থ সমাজ-বিজ্ঞানী। সবাই যখন দেশপ্রেমের জোয়ারে ভেসে চলেছে তখন সমাজের গভীরে চাপা 'সোস্যাল টেনসন-টি' বরীন্দ্রনাথের চোখে ঠিকই ধরা পড়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের ভিতরে থেকেই তিনি কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করেছিলেন। বিলিতি দ্রব্য বর্জন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে তাতে ইংরেজের ক্ষতি হবে এবং দেশবাসীদের লাভ হবে। অথচ রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে এই কষ্ট স্বীকারের মধ্য দিয়ে ''আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখ স্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপন করিয়া লইব।''[৭] কিন্তু তাঁর মতো করে অনেকেই ভাবেনি, বিলিতি বর্জনের বিপরীত দিকটি রাজনৈতিক নেতাদের চোখে পড়েনি। দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানের কাছে বিলিতি বর্জনের ব্যাপারটি কখনও কখনও যে অত্যাচারেরই নামান্তর হয়ে উঠেছিল 'ঘরে-বাইরে'র পঞ্চুর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। হাটে বিলিতে কাপড় বেচার অপরাধে জমিদার হরিশ কুণ্ডু তাকে একশো টাকা জরিমানা করেছিল। ''ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল, তবে ছাড়া পাবি। ও থাকতে

না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সামর্থ্য নেই, আমি গরীব, আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে পুড়িয়ে ফেলুন।"

পঞ্চুর কথা জমিদারের ভাল লাগেনি, তার শাস্তির ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু বিক্ষোভ চাপা দেওয়া যায়নি। রবীন্দ্র-জীবনীকার এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে লিখেছেন, ''সস্তায় সুন্দর মসৃণ বিলাতি বস্ত্রের স্থানে মহার্ঘ্য মোটা বোম্বাই কাপড় ক্রয় করিতে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায়ই অনিচ্ছা দেখা যাইত। সস্তা মিহি লাট্টুমার্কা ধুতি, রেলির 'উনপঞ্চাশ' থান কাপড় ফেলিয়া কেন তাহারা এসব কিনিবে? দেশ কি, ইংরেজ কোথায় কাহাকে অত্যাচার অপমান করিতেছে ইত্যাদি কথা তাহাদের নিকট অত্যন্ত অস্পষ্ট। বরং তাহারা দেখে, জমিদার, মহাজন বা বর্ণহিন্দুর অত্যাচার হইতে তাহাদের রক্ষা করে ইংরেজ শাসক বা তাহারই অধীনস্থ শিক্ষিত কর্মচারীরা।"[৮] সন্দীপ এবং তার দলবল এই ধরনের উগ্র স্বাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিত বলেই নিখিলেশ তাদের ধিক্কার দিয়ে বলেছিল, ''দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু।" অবশ্য সব স্বদেশসেবক সন্দীপ নয়, সব জমিদার হরিশ কুণ্ডু নয় আবার নিখিলেশের দলেও খুব বেশি লোক ছিল না। কিন্তু পঞ্চুদের যন্ত্রণা বেড়েই চলেছিল। দরিদ্রতর মুসলমান কৃষকেরা সস্তার বিলিতি নুন বা সস্তা বিলিতি কাপড়ের লুঙ্গি কেনা ছেড়ে দিয়ে বেশি দামের বেশি মোটা কাপড় কিনবেই বা কেন? এতেও বিভেদ হয়তো বাড়ত না, কিন্তু দেশকে যথার্থভাবে আপন করে নেওয়ার সামগ্রিক প্রচেষ্টাই বা কোথায়? বিভেদের আসল কারণটি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন বিখ্যাত 'লোকহিত' প্রবন্ধে। ''যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক আড়ম্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রু গদ্‌গদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের ওপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না।"

তাঁর মতে এই সত্যটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট হতে না দেওয়া। তাই সমগ্র মানুষকে কাছে টানাটাই তাঁর কাছে বড় বলে মনে হয়েছিল। এর জন্য চাই 'মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহার।' কার্জনের বঙ্গবিভাগের চেয়েও দেশের মানুষের বর্ণ বা ধর্মগত বিভাগ অনেক ক্ষতিকর। ইংরেজের দেশবিভাগ না হয় আন্দোলন করে রদ করা গেল কিন্তু ক্রমশ নিজেদের মধ্যে যে বিভেদ দেখা দিচ্ছে তা দূর করার উপায়ের সন্ধানই ছিল বড় কাজ। কিন্তু ''সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট ব্যাপারটাকেই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে কোনও প্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।"[৯] এ এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। এই মন্তব্যের চল্লিশ বছরের মধ্যেই আরও ব্যাপক ও মর্মান্তিক দেশবিভাগ। আর সম্ভবত বিষবৃক্ষের বীজ পোতা হয়েছিল ওই সময়েই। লক্ষণীয় এই যে বয়কট বা বিদেশি বর্জন আন্দোলনের কথা ভারত-ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে নিয়ে আসেন। তাঁর কাছে এই পর্বটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিকেরই হয়নি। বোঝাই যায় যে তিনি তথ্যের ইতিহাস রচনা করতে বসেননি, ভগবত ইতিহাস রচনা করেছেন।

এই কারণেই অন্যত্র তিনি ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করতে চেয়েছিলেন, History of Idea

এবং History of tact (A vision of Indian History)। তিনি নিজে প্রথম পদ্ধতির অনুগামী। ভাবগত ইতিহাস বলতে তিনি কী বোঝেন তা এই উক্তিতেই স্পষ্ট, ''ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়।''[১০] বস্তুত এই মডেলটিও তাঁকেই বোধহয় তৈরি করে নিতে হয়েছিল। কল্পনার দ্বারা ইতিহাসকে গ্রহণ করলে ইতিহাসের আসল যে চেহারাটি ধরা পড়বে, তা হল সমকালীন মানবমনের ইতিহাস, তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ইতিহাস। বাস্তব তথ্য বা 'সেরেস্তার নথি' অবশ্যই এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবটা নয়। এর সঙ্গে কল্পনাকে মেলাতে হবে। 'রক্তকরবীর' যক্ষপুরী সম্পর্কে কবি একদা বলেছিলেন যে এর ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু ''কবির জ্ঞানবিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।'' এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটা প্রত্যক্ষ জগৎ তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে নিজের বিশ্বাসকে কবি মিলিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, ''বৃত্তান্ত ত চাকর, তাহার প্রভু আইডিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিমূলক কল্পনা।''[১১]

ইতিহাস-ভাবনার ক্ষেত্রে কবিকে দুটি দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। প্রথমত, ভারতীয় ইতিহাসের সত্যকার উপাদানটিকে তিনি খুঁজে বের করেছিলেন এবং ভারতীয় ইতিহাসের মূলগত ঐক্যটির কথা সকলকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত সেই ঐক্যসূত্রটি যাতে ছিন্ন হয়ে না যায় সেদিকেও তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যে অত্যধিক রাষ্ট্রনীতি-সর্বস্বতা মানব-মনকে ক্রমাগত অবহেলা করে চলেছে, তাদের আত্মমর্যাদাবোধকে ক্ষুণ্ণ করছে। স্বদেশি-আন্দোলনের চরম কোলাহলের মুহূর্তেও এই ঘটনাটি তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, ''কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।''[১২] এই মনোভাব ছিল নিম্নবর্গের মানুষের ক্ষেত্রেও। ওই একই প্রবন্ধে সমাজতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ কথা বলে ওঠেন, ''যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।'' ঘরে-বাইরের নিখিলেশকে দিয়েও তিনি বলিয়েছিলেন, আমার ভারতবর্ষ ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ নয়। এই সমস্ত উক্তির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্যের মূল ভিত্তিটিতে কোথায় এবং কেন ফাটল দেখা দিচ্ছে তা এতেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রাজনীতিবিদদের কাছে তাঁর তেমন কোনও প্রত্যাশা ছিল না। তাই তিনি নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়েছিলেন। কেবল তথ্যনির্ভর ইতিহাস পড়ার বিপদটি যে কোথায় তা তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন, ''আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাঁড়ি, ডোম, কৈবর্ত, বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে।''[১৩] ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে দেশমাতৃকার বন্দনা যে প্রকৃতপক্ষে কেবল মাটির বন্দনা, মানুষের নয়, চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি তা স্পষ্ট করে দেন। ''ভারতমাতা' যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের

জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"[১৪] দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন দুঃখের জীবন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে দেশসেবার মাতামাতিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। চরঘোষপুরে গিয়েই গোরা সর্বপ্রথম শহরের শিক্ষিত সমাজের বাইরে আসল ভারতবর্ষকে দেখতে পেয়েছিল। ''এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ কত দুর্বল—সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন"—সে সম্পর্কে গোরার ধারণা এই গ্রামেই স্পষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্বরূপ সন্ধানে নেমে এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ দুই ভারতবর্ষের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন। একটি ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ, অপরটি নিভৃত, প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ। তার আগে কোনও ঐতিহাসিকই এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন বলে জানা নেই। আশ্চর্যের বিষয়, এই নিম্নবর্গের জীবন-ইতিহাসই যে প্রকৃত ইতিহাস এই মহাকবির কাছে থেকেই আমাদের তা প্রথম জানতে হয়েছে। প্রবন্ধে বা উপন্যাসে তো বটেই কবিতাতেও এই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই ঘুরে ফিরে আসে। 'ওরা কাজ করে'-র মতো অতিপরিচিত কবিতাতে তো বটেই *সেঁজুতি*-র এই স্বল্প-পরিচিত কবিতাতেও এই 'গ্রাম্য ভারতবর্ষের' জয়গান—

ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা,
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ রবে না তারা,
বইবে নদীর ধারা—
জেলেডিঙি চিরকালের নৌকো মহাজনি,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি। (নতুন কাল)

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের অধিকার ও যোগ্যতা যে এই 'দ্বিতীয় ভারতবর্ষের' আছে এ ব্যাপারে কবির কোনও সংশয়ই ছিল না। কিন্তু এদের সমস্যার সমাধানের পথও তাঁর নিজস্ব। এক্ষেত্রেও তিনি ভারতীয় রাজনীতিক অথবা বিদেশি ঐতিহাসিক কারও সাহায্য নেননি। তাঁর মনে হয়েছিল প্রবল আত্মশুদ্ধির অভাবই এদের পিছিয়ে রেখেছে, আত্মঅধিকার সম্পর্কে অচেতন রেখেছে। তাই কোনও রাজনৈতিক দলের সাহায্য নিয়ে নয় নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি একদা তাঁর প্রজাদের আত্ম-সচেতন করতে গিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা ভাল হয়নি; ''আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি না কেন।' তারা বললে, 'কপাল'। আমি বললেম, কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একটা কুয়ো দিসনে কেন? তারা তখনই বললে, আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।"[১৫] সমাজতত্ত্বের এটি নিখুঁত বিশ্লেষণ, এখানে কোনো করুণা বা বিদ্রূপতা নেই। বই সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও ভাগ্য-নির্ভরতার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং দূরত্ব। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ক্ষেত্রে যা সত্য, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও তা সমান সত্য। তাই রবীন্দ্রনাথ বারবার আমাদের এই সত্যটির কথা মনে করিয়ে দিতে চান যে কোনও বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়কে নিয়ে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস গড়ে উঠতে পারে না। কারণ সমগ্র ভারতবাসীই এই ইতিহাসের উপকরণ মাত্র। এই উপকরণগুলিকে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দিলেই রচিত হবে নতুন ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই প্রক্রিয়াটি নীরবে অথচ নিশ্চিতভাবে যে কাজ করে চলেছে সে

সম্পর্কেও তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। ''নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি।''[১৬]

উল্লেখপঞ্জি

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস।

২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা।

৩। তদেব।

৪। ভারতবর্ষের ইতিহাস।

৫। তদেব।

৬। নূতন ও পুরাতন, স্বদেশ।

৭। অবস্থা ও ব্যবস্থা, আত্মশক্তি।

৮। ভারতে জাতীয় আন্দোলন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৯। সদুপায়; সমূহ।

১০। ইতিহাস কথা।

১১। মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস।

১২। লোকহিত।

১৩। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।

১৪। তদেব।

১৫। শিক্ষার মিলন।

১৬। স্বদেশী সমাজ।

মেঘদূত অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ

নরেশচন্দ্র জানা

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতা ‘রূপান্তর’ শিরোনামায় ১৩৭২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে বেদ, উপনিষৎ, ধম্মপদ, কালিদাস-ভবভূতি, ভট্ট-নারায়ণ, বররুচি প্রমুখ কবিদের কিছু কিছু শ্লোকের অনুবাদ রয়েছে। এখানে কেবলমাত্র কালিদাসের যে-সব শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া গেছে, সেগুলিই আলোচিত হল।

সংস্কৃতের অনুবাদ খুবই দুরূহ কাজ। সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনি-গৌরবপূর্ণ। বাংলায় তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে ‘ছন্দ’ গ্রন্থে বলেছেন—‘সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।’

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রচনার যে অনুবাদ করেছেন, তাতে মূলের ধ্বনিগৌরব যথাযথ রক্ষিত হয়নি।

যাই হোক, আমরা ‘মেঘদূত’ কাব্যের সূচনায় ‘পূর্বমেঘ’-এর শ্লোকগুলির অনুবাদ রয়েছে, তাই নিয়ে আলোচনা করছি। প্রথমে মূল শ্লোক উদ্ধৃত করে পরে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ দেওয়া হল—

মেঘদূত ।। সূচনা

পূর্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ।। ১

যক্ষ সে কোনো জনা আছিল আনমনা,
সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত—
বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি—শিখরে মরে ফিরি
একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা,

যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায়
সীতার স্নানপূত জলধারা ।। ১

পাঠান্তর

অভাগা যক্ষ যবে
করিল কাজে হেলা
কুবের তাই তারে দিলেন শাপ—
নির্বাসনে সে রহি
প্রেয়সী-বিচ্ছেদে
বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-
শিখর-আশ্রমে
হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি
স্নিগ্ধ ছায়াবৃত
সীতার স্নানে পূত সলিলধার ।। ১

পাঠান্তর

কোনো-এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা,
তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল
মহিমা-সম্পদ্‌
যত-কিছু ।। ১
কান্তাবিরহগুরু
দুঃখদিনগুলি
বর্ষ কাল-তরে
যাপে একা,
স্নিগ্ধপাদপছায়া
সীতার-স্নানজলে-
পুণ্য রামগিরি-
আশ্রমে ।। ২

কালিদাসের মেঘদূত অসামান্য রচনা। এটি আগাগোড়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত। এই ছন্দের ধ্বনিগৌরব বাংলায় ফুটিয়ে তোলা একান্ত কঠিন। রবীন্দ্রনাথ শ্লোকটির একাধিক রূপান্তর করেছেন, দেখা যাচ্ছে। এর কারণ বোধ হয়, মূলের ধ্বনিরূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। যথাক্রমে তিনটি অনুবাদের আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম অনুবাদটি মূলানুসারী তবে কিছু সংযোগ-বিয়োগ করেছেন। 'কশ্চিৎ স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'-র রূপান্তর 'যক্ষ সে ... আনমনা' সুন্দর হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'সেবার অপরাধে' মূলে নেই। 'শাপেনাস্তং ... বর্ষ-ভোগ্যেন'-র রূপান্তর 'বিলয়গত ... যাপে দুখতাপে' মোটামুটি সার্থক। 'বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু'-র রূপান্তর 'নির্জন রামগিরি ... দূরবাসী' অনেকখানি বাড়ানো হয়েছে। 'তরুষু' বর্জিত হয়েছে এবং 'ঝরনা' মূলে নেই, সংযোজিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, শ্লোকটির অর্থ বজায় থাকলেও ধ্বনিরস অক্ষুণ্ণ থাকেনি। ছন্দে প্রথম দুই পাদে ও পংক্তিপ্রান্তে মিল রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুবাদে 'কশ্চিৎ'-এর রূপান্তর করা হয়েছে 'অভাগা'। 'কশ্চিৎ'-এর অর্থদ্যোতনা এতে ফুটে ওঠেনি। 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'-র রূপান্তর 'করিল কাজে হেলা' মূলকে অনুসরণ করেছে। 'নির্বাসনে সে রহি', 'সবে দারুণ জ্বালা' এসব মূলে নেই। 'স্নিগ্ধ ছায়াতরুষু'-র রূপান্তর 'সেখানে পাদপরাজি স্নিগ্ধছায়াবৃত' মূলের ধ্বনি কিছুটা ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতির অনুবর্তন করে ছন্দ রচনা করেছেন। এতে মন্দাক্রান্তার গতিভঙ্গি অনেকখানি অব্যাহত থেকেছে।

তৃতীয় অনুবাদটিতে লক্ষণীয় যে, মূলের শব্দের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছেন। 'অস্তংগতিমতমহিমা'-র রূপান্তর 'অস্তগত হল মহিমা-সম্পদ্' করেছেন। 'কান্তাবিরহগুরুণা' প্রায় অবিকল বজায় রেখেছেন। শ্লোকটির শেষার্ধ 'জনকতনয়া ... আশ্রমেষু'-র রূপান্তর 'স্নিগ্ধপাদপছায়া ... আশ্রমে' মূলেরই প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। প্রথম দুটি অনুবাদে এতোখানি মূলানুসরণ ছিল না। প্রথম অনুবাদে 'ভর্তুঃ'-র রূপান্তর 'প্রভু' যথাযথ, দ্বিতীয় অনুবাদে 'কুবের' টীকাকার থেকে নেওয়া। তৃতীয় অনুবাদে 'দেবতা' ঠিক হয়নি। যদিও দ্বিতীয় অনুবাদে মন্দাক্রান্তা ছন্দের গৌরব অনেকখানি বজায় রয়েছে তথাপি কবিত্বের দিক থেকে মনে হয়, প্রথম অনুবাদটি সবচেয়ে সফল।

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ।। ২

মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস
প্রেয়সীবিচ্ছেদে বিমলিন।
কনকবলয়-খসা বাহুর ক্ষীণ দশা,
বিরহদুখে হল বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে,
যক্ষ নিরখিল গিরি-'পর
ঘনঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে,
দন্ত হানে যেন করিবর ।। ২

মূলের থেকে রূপান্তরে অনেকখানি বাড়িয়েছেন, তবে এতে অবান্তর তেমন কিছু সংযোজিত হয়নি। মূলের ভাবের অনুগামী হয়ে এই সংযোজনা সার্থক হয়েছে বলা যায়। ‘অবলাবিপ্রযুক্তঃ’-র রূপান্তর ‘প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বিমলিন’ সুন্দর। ‘রিক্তপ্রকোষ্ঠঃ’-র রূপান্তর ‘বাহুর ক্ষীণ দশা’ মূলানুসারী না হলেও অসার্থক নয়। ‘তস্মিন্নদ্রৌ’ বর্জিত হয়েছে। ‘আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে’র রূপান্তর ‘একদা ... আসে’-তে মূলের ধ্বনিরস অটুট থাকেনি। ‘বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ’-র রূপান্তর ‘দন্ত হানে যেন করিবর’ মূলের অর্থ দ্যোতিত করেনি। ‘মেঘমাশ্লিষ্টসানুং’-এর রূপান্তর ‘ঘনঘোর ... সানুদেশে’ বিস্তারিত হলেও চমৎকার হয়েছে। আদর্শ অনুবাদ না হলেও মোটামুটি সার্থক হয়েছে, বলা যায়।

বিসর্জন ঃ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য প্রথম ভারতীয় ছবি

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

১৯২৭ সালের ২১ মে বম্বের টাইমস অব ইন্ডিয়া কাগজে একটি ছোট নিউজ রিপোর্ট বেরিয়েছিল, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে খবরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খবরটির হেডলাইন ছিল : A First Picture। নাটকটি হল স্যাক্রিফাইস। বম্বের ওরিয়েন্টাল পিকচার্স কর্পোরেশনের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এই ছবিটি শুধু যে ভারতবর্ষের মধ্যেই দেখানো হবে বলে ঠিক হয় তা নয়, ইয়োরোপ এবং অ্যামেরিকাতেও দেখানো হবে বলে ঠিক হয়। ছবিটি যাঁরা পরিবেশন করছেন তাঁরা ছবিটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ছবিটির কাজ চলছে বম্বের শারদা স্টুডিওতে। স্টুডিওর মধ্যে কালীমন্দিরের যথোচিত পরিবেশ-উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। মন্দিরের বড় বড় থাম, প্রবেশদ্বারের উঁচু সিঁড়িতে পুরান কাঠের কারুকাজ, পৌরাণিক কল্পনা অনুযায়ী দেবী- প্রতিমার ভয়ঙ্কর মূর্তি—সব কিছুই নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে। অভিনয়ের সময়ে সূর্যের আলো এবং কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর চমৎকার ব্যবহার করে সামগ্রিকভাবে আলোর কাজটি খুবই দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে। ছবিটির কিছু কিছু অংশ জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে তোলা হয়েছে, যে অম্বর-প্রাসাদ রাজপুতদের ঐশ্বর্যময় যুগের বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভে সমৃদ্ধ। ছবিটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে, পরের মাসের মাঝামাঝি (জুনের মাঝামাঝি) মুক্তি পাবে। কোনও কারণে না হলে বর্ষার পরে মুক্তি পাবে।

এই রিপোর্টটি থেকে বোঝা যায়, খবরটি প্রকাশিত হবার সময় বম্বের স্টুডিওতে এবং জয়পুরের অম্বর দুর্গপ্রাসাদে রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকের ইংরিজি রূপান্তর Sacrifice-এর চলচ্চিত্র-রূপের কাজ প্রায় শেষ। এই খবরটি প্রকাশিত হবার প্রায় দু-মাস বাদে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি কাগজে The Peoples, Weekly, Bloomfonteen, S.A. এই ছবির সম্পর্কেই আরও একটি বিস্তৃত খবর পাওয়া যাচ্ছে। খবরটি এরকম : ভারতবর্ষের রাজপুত বীরদের অন্যতম অভিজাত পুরুষ রাজপুতনার জয়পুরের মহারাজ তাঁর রাজ্যের সমস্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং প্রাসাদগুলি ভারতীয় কবি ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক ‘স্যাক্রিফাইস’-এর চলচ্চিত্ররূপ দেবার জন্য ওরিয়েন্ট পিকচার্স কর্পোরেশনকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্য সম্পদগুলির মধ্যে হাতি, উট এবং মহারাজার সৈন্যসামন্তও রয়েছে। প্রাচীন রাজধানী অম্বরের ঐতিহাসিক প্রাসাদের পটভূমিতে ছবিটির প্রধান দৃশ্যগুলির অন্তত একটি দৃশ্য অভিনীত হবে। প্রাসাদটি বর্তমান মহারাজার রাজধানী জয়পুর থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে। রাজ্যের প্রাচীন বংশগৌরব-চিহ্নিত বর্মটিও মহারাজা পরিবেশকদের ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। যে চিত্রনাট্যটির ছবি তোলা হচ্ছে সেটির ছবি তোলার অনুমতি দিয়েছেন কবি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটককে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া হল। নাটকটি কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকও বটে। ছবির বহির্দৃশ্যগুলি গত এপ্রিল মাসে তোলা

হয়েছে। স্টুডিওর দৃশ্যগুলি এখন প্রায় সম্পূর্ণ। স্টুডিওর দৃশ্যগুলি বম্বের শারদা ফিল্ম কোম্পানির নতুন সাজানো স্টুডিওতে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন অভিনয়াংশে ইয়োরোপীয় ও বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পীরা অভিনয় করছেন। প্রথম ভারতীয় ছবি 'লাইট অব এশিয়া' যে রকম ব্যাপক খ্যাতি পেয়েছিল সেই ছবিরই যোগ্য অনুবর্তী হবার সম্ভাবনা রয়েছে এই ছবিটির।

অভিনয়ে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পীরা একসঙ্গে অভিনয় করবেন এ খবর থাকলেও পরে প্রকাশিত সংবাদে দেখা গেছে 'All Indian Cast'। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। প্রায় দশ মাস বাদে ১৯২৮ সালের ২৬ মে তারিখে লন্ডনের Daily Film Renter কাগজে প্রকাশিত খবরে দেখতে পাচ্ছি : ভারতীয় পরিবেশে ভারতীয় পরিচালনায় ভারতীয় অভিনেতাদের অভিনয়সমৃদ্ধ হয়ে 'স্যাক্রিফাইস' ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পরিবেশনের প্রাপ্য অংশের (Quota) আইনকানুন যথাযথ মেনেছে। ... প্রযোজক হলেন এম গান্ধি। এঁর প্রযোজনায় বেশ কিছু ছবি ইতিপূর্বেই খ্যাতি পেয়েছে। এবং প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিদর্শকের ভার নিয়েছিলেন পি এম তলোয়ারখান। তিনি কোম্পানির (ওরিয়েন্ট পিকচার্স কর্পোরেশন) জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকের গল্পটি ভারতীয় দেবী কালীমাতাকে কেন্দ্র করে রচিত। দেবীর কাছে মানুষ ও জন্তুর বলি নিয়ে গল্পটি গড়ে উঠেছে। ছবিটির ট্রেড শো হবে আগামী শুক্রবার। দুদিন বাদে লন্ডনের Daily Telegraph কাগজে (২৮ মে, ১৯২৮) যা রিপোর্ট বেরিয়েছে তার হেডলাইন রয়েছে 'British Quota Film'। এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইউনিভার্সাল পিকচার্স অব অ্যামেরিকা যে সব ছবি এসেছে (ইয়োরোপ ও ইংল্যান্ডে) পরিবেশন করেন সে সব ছবির মধ্যে ইয়োরোপীয়ান মোশন পিকচার্স কোম্পানি অন্তত পাঁচ-ছটি ছবি ১৯২৯ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে পাবেন। সাম্প্রতিক আইন অনুযায়ী শতকরা সাড়ে সাত ভাগ ছবি যে তাঁদের প্রাপ্য তা পূরণ করতে গিয়েই এই কটি ছবি তাঁদের দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি দুটি ব্রিটিশ ফিল্ম (ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতের ছবি ব্রিটিশ ফিল্মসের মধ্যেই পড়ে) তাঁরা পেয়েছেন। তার প্রথমটি স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্যাক্রিফাইস'। ছবিটি ভারতীয় পরিবেশক শ্রীগান্ধি ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্যেই তৈরি করেছেন। দ্বিতীয় ছবিটি আইরিশ বিদ্রোহের পটভূমিতে তোলা Irish Destiny।

১৯২৮ সালের ২৯ মে Glasgow Bulletin-এও এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরের সঙ্গে ভারতীয়রা যে ভারতীয় 'প্রতিভা' নিয়েই ছবি তুলেছেন তার প্রশংসাও করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অন্য ভারতীয় দুটি ছবির নামও করা হয়েছে—Shiraz এবং Light of Aisa। এদিকে বম্বের টাইমস অব ইন্ডিয়া কাগজে ৩০ মে, ১৯২৮ সালের সংখ্যায় ইউনিভার্সাল পিকচার্স যে ছবিটি ভারতের বাইরে দেখাবার ওয়ার্ল্ড রাইট পেয়েছে সে খবর দিয়ে বলা হয়েছে, শ্রীতলোয়ারখান এবং শ্রীগান্ধি কয়েক সপ্তাহ আগে স্যাক্রিফাইস ছবিটি লন্ডনে নিয়ে গেছেন। অবশ্যই, ছবিটির প্রশংসনীয় গুণাবলীই যে তার বিশ্বস্বত্ব পাবার কারণ, তাও বলা হয়েছে।

লন্ডনের The Times পত্রিকাতেও একই দিনে এই রিপোর্ট বেরিয়েছে। পরের দিন লন্ডনের Kinematography Weekly কাগজে (৩১ মে, ১৯২৮) ওই রিপোর্টের সঙ্গে প্রযোজক পরিচালকদের দিক থেকে একটি বিশেষ দাবির কথা বলা হয়েছে। 'Incidentally, the producers claim that Sacrifice is the first purely Indian Film made experimentally for international exhibition.'

Morning Post কাগজের ২০ জুন, ১৯২৮ সংখ্যায় এই রিপোর্টের সঙ্গেই একটি গুরুত্বপূর্ণ

মন্তব্য আছে : "It is understood to have passed the censor, a rather important matter in view of Tagore's dedication 'to those heroes who bravely stood for peace when human sacrifice was claimed for the Goddess of War'."

বোঝা যায়, নাটকের বিভিন্ন দ্বান্দ্বিক মাত্রা—প্রেম বনাম কর্তব্য, কর্তব্য বনাম বিবেক, রাজক্ষমতা বনাম পৌরোহিত্যের প্রতাপ, হিংসা বনাম অহিংসা, সংস্কার বনাম মানবিক উদারতা ইত্যাদির মধ্য থেকে হিংসা-অহিংসার মোটিফ-টিকে আপাতত প্রাধান্য দিয়ে 'স্যাক্রিফাইস'কে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ছবিটির গল্পের প্রশংসা করে ফিল্মের কতকগুলি দৃশ্য ও অভিনয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে হস্তী-যূথের রাজকীয় শোভাযাত্রা রাজপ্রাসাদ এবং রঘুপতির অভিনয়ে 'the priest—a horrible, shaggy, half-naked old fellow—is played with undoubted strength'। তবু সমালোচকের মনে হয়েছে, সুযোগের পুরোপুরি সদ্‌ব্যবহার করা হয়নি। বীরোচিত চারিত্রিক প্রকাশ একটু 'mild and dressy'। সংলাপও একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যানধর্মী। বোধহয় টাইটেলিং-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শব্দ ব্যবহারের সারল্যই এর কারণ বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

লন্ডনের Bioscope কাগজের ৬ জুন, ১৯২৮ সংখ্যায় ছবিটির পরিবেশনা, গল্পসূত্র, দর্শক-উপভোগ্যতার কারণ, ব্যবসায়িক সম্ভাবনা এবং অভিনয় সম্পর্কে বিস্তৃত মন্তব্য করা হয়েছে। সমলোচনার মূল বক্তব্য প্রায় মর্নিং পোস্টের মতোই। কিন্তু নাটকের উৎসর্গে যে যুদ্ধবিরোধী মানবিক আত্মত্যাগের কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য সকলে বুঝবে কিনা সন্দেহ, এমন মন্তব্য রয়েছে।

কোন্ চরিত্রে কে অভিনয় করেছিলেন সে সম্পর্কে কৌতূহল হয়। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে সকলের নাম পাওয়া যায় না। ভুল শোনার জন্যে বা অসতর্কতার জন্যে নামের বানানেও ভুল আছে। লন্ডনের Cinema কাগজে ১৩ জুন, ১৯২৮ সংখ্যায় যে রিপোর্ট, তাতে বোঝা যায়, গোবিন্দমাণিক্যের অভিনয় করেছিলেন জানিবাবু। অপর্ণার অভিনয় করেছিলেন কেমি জুবিদা বানু এবং রঘুপতির চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন জাল খাম্বাটা। জয়সিংহের অভিনয় কে করেছিলেন বলা নেই। শুধু বলা হয়েছে, 'the part of Jaising, which needs nobility and interpretation has been entrusted to too young an actor'। জয়সিংহ এবং অপর্ণার অভিনয় যাঁরা করেছেন তাঁরা যে একটু বেশি ছেলেমানুষ এমন মন্তব্য 'বায়োস্কোপ' কাগজেও করা হয়েছে।

যাই হোক, আর্ন্তজাতিক পরিবেশনের জন্যে ওরিয়েন্ট পিকচার্সের প্রথম ভারতীয় ছবি বলে যে 'স্যাক্রিফাইস'কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার ট্রেড শো হয়েছিল শুক্রবার, ১ জুন, ১৯২৮ লন্ডনে। এই ট্রেড শো-র খবর বেরিয়েছে Madras Mail, South Wales News—Cardiff, Bioscope—London, Daily Film Renter—London ইত্যাদি কাগজে। ১২ জুন, ১৯২৮ Madras Mail কাগজে লন্ডন থেকে পাঠানো সংবাদে বলা হয়েছে : "Sacrifice, a film story adopted from Dr. Tagore's book of the same name was privately exhibited in London to a distinguished gathering including Lord Winterton, Lord Hardinge, Sir John Simon and the Maharaja of Coochbehar."

কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা আর্কাইভ্‌সে এই গুরুত্বপূর্ণ ছবিটির হদিস পাওয়া কি সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথের শেষকটি কবিতা

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা' কাব্যগ্রন্থে তাঁর শেষ জীবনে রচিত ১৫টি কবিতা সংকলিত হয়েছে—এগুলির মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া ছটি কবিতার (১, ২, ১১, ১৩, ১৪, ১৫) সঙ্গে তাঁর বাস্তবজীবনের শেষ কটি দিনের (২৫ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই ১৯৪১) ঘটনাকে মিলিয়ে পড়ার ইচ্ছা থেকেই এই প্রবন্ধ রচনার পরিকল্পনা। কবিতা কটিতে কবির সর্বশেষ 'আত্মকথা'—তাঁর আত্মোপলব্ধি-র কথাই বলা হয়েছে। এই আত্মোপলব্ধি ঘটেছিল বড়ো বেদনার মধ্য দিয়ে।

২৫ জুলাই কবিকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে আসা হয় তার প্রস্টেট গ্লান্ডের অপারেশনের জন্য; মৃত্যুর কঠিন আঘাতের জন্য কবি মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন; তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন মিশে যায় তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতনের মাটিতে। কবি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর শেষ দিন এগিয়ে আসছে, এই কঠিন সত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে কদিন আগেই শেষ লেখার ১১নং কবিতায় কবি লিখেও ছিলেন—

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুকে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

জীবনের কঠোর দুঃখ, কঠিন তপস্যার মধ্য দিয়ে আত্মদর্শনের অভিজ্ঞতার কথাই বলা হয়েছে এই

কবিতায়। বিধাতার দেওয়া সকল দুঃখ বেদনা তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু মানুষের হাতের অস্ত্রোপচারের আঘাত বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দেহের উপর হোক সেটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তিন তিন জন প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ লোলিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ ইন্দুভূষণ বসুর মিলিত ইচ্ছার কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। শান্তিনিকেতন থেকে শেষ বিদায়ের দুঃখ তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল।

অসুস্থ শরীরে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা আসার ধকল তাঁর সহ্য হল না, তিনি পরদিন ২৬ জুলাই আরও ক্লান্ত, আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরদিন একটু সুস্থ বোধ করায় সকাল বেলাতেই মুখে মুখে একটা কবিতা বানিয়ে ফেললেন—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

আত্মজিজ্ঞাসার এই প্রশ্ন মনে উদয় হতেই কবি অবাক হয়েছিলেন। এবং এই কবিতাটি সম্পর্কে একটি সকৌতুক মন্তব্য করেছিলেন তাঁর হেড নার্স নির্মলকুমারী মহলানবিশের কাছে।

> "জানো, আজও আর একটা কবিতা হয়েছে সকালে। একী পাগলামি বল তো? প্রত্যেক বারই ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু তারপরে দেখি আবার একটা বেরোয়। এ লোকটাকে নিয়ে কি করা যাবে?"[১]

ভেতরের এই লোকটাকেই কবি বারবার প্রশ্ন করেছেন—'তুমি কে?' (শেষ সপ্তক ৪৬ নং) 'কে তুমি' (শেষ লেখা ১২ সংখ্যক), কখনো বা দেখতে চেয়েছেন 'আপনার আত্মার স্বরূপ' (জন্মদিনে ১৩ সংখ্যক)। উপনিষদের ঋষিকবিদের মনেও জেগেছে ঐ একই প্রশ্ন 'কস্তং'? কে তুমি? যার একটি মাত্র উত্তর তাঁদের মনে এসেছে—

'যো অসাবসৌ পুরুষঃ সোমেস্মি'

জন্মদিনের ১৩ সংখ্যক কবিতায় সেই কথাই বলেছেন কবি—

আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে!
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক আবরণ
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।

সুতরাং 'কে তুমি' এই প্রশ্নের উত্তর জানতে নিজেকেই জানতে হবে—'আত্মানং বিদ্ধি' নিজেকে জানো Know Thyself। সেই আপনাকে জানা হয়ে গেলে আর কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। উপনিষদের ঋষিকবিদের যথার্থ উত্তরপুরুষ রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সব সংশয়মুক্ত হয়ে আত্মপরিচয় পেয়েছিলেন, জীবনের অন্তিমলগ্নে নিজেকে জেনে ব্রহ্মেতে বিলীন হয়েছিলেন। কবির সেই ব্রহ্মোপলব্ধির তথা আত্মোপলব্ধির কথা আছে তাঁর সর্বশেষ কবিতায়। ঐ কবিতার আলোচনা করার আগে 'শেষ লেখা'র আর একটি কবিতার কথা (১৪ নং) একটু বলে নিতে হয়। এই কবিতার শুরু হয়েছে এইভাবে—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

কবিতাটি রচিত হয়েছে ২৯ জুলাই ১৯৪১ বিকাল বেলায়। পরদিন দুপুরে কবির দেহে অস্ত্রোপচার হবে—যদিও কথাটা তাঁকে তখনও পর্যন্ত জানানো হয়নি; কিন্তু কবি কি কিছুই বুঝতে পারেননি? মৃত্যুর পদধ্বনি কি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন? তা না হলে এই কবিতায় 'কষ্টের বিকৃত ভান', 'ত্রাসের বিকট ভঙ্গি', 'অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা'র কথা বললেন কেন, কেনই-বা এই কবিতার পরবর্তী অংশে মৃতুর, 'ভয়ের মুখোশ' পরে মানুষকে প্রবঞ্চনা করার কথা কল্পনা করলেন? শেষ সময়ে কবি অবশ্য মৃত্যুভয় জয় করে পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে তাঁর সত্তাচৈতন্য তথা ব্যক্তিচৈতন্যকে নিঃশেষে বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। জন্মদিনের বারো সংখ্যক কবিতায় সে কথা অনেক পূর্বেই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—এই কবিতায় কবি তাঁর সুদীর্ঘকালের বাণীর সাধনাকে উপহাস পরিহাস করে 'বহু আবর্জনা বহু মিছে' বলে পিছনে ফেলে চলে যেতে চেয়েছেন সেইখানে—

যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকার হীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে।

পার্থিব জীবনের সকল কীর্তি-খ্যাতি প্রশংসার ঊর্ধ্বে উঠে তাদের আত্মপরিচয়ের 'বাহ্য আবরণ' বলে পরিত্যাগ করে কবি অনন্তের পথে যাত্রা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ ইচ্ছা কবির একান্ত আন্তরিক।

কবির নিরাসক্ত মনের শেষ ইচ্ছা যে পূরণ হয়েছিল তার প্রমাণ আছে শেষ লেখার শেষ কবিতায় তার পূর্ববর্তী রচনা 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' কবিতায় 'ছলনা'র উল্লেখ আছে; আর এ কবিতায় তিনি এক ছলনাময়ীর কথা বলেছেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী।

কবির সর্বশেষ রচনা বলেই যে কবিতাটি মূল্যবান তা নয়, ঋষিপ্রতিম কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের চরম এবং পরম উপলব্ধি—সত্তায় পরম জিজ্ঞাসার চরম উত্তরটি এতে আছে বলেই এই শেষতম রচনার মূল্য অপরিসীম। কবিতাটি ৩০ জুলাই (১৯৪১) সকালে কবি মুখে মুখে রচনা করেন, একটানা বলতে পারেননি, একটু থেমে থেমে বলেছেন এবং প্রথম দফায় শেষ করেছেন এই বলে,

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।

কবিতার আদিরূপ যে এখানেই শেষ হয়েছিল তার প্রমাণ আছে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের বাইশে শ্রাবণ গ্রন্থে। কবিতাটি রচনা শেষ করে রাণী চন্দের মুখে আগাগোড়া শুনে তাঁর সমালোচক মন কিছুটা অতৃপ্তি বোধ করে, তাই দ্বিতীয় ঝোঁকে অপারেশন টেবিলে নীত হওয়ার অল্প আগে সেদিন সকাল সাড়ে ৯টার সময় ''আরও তিনটি পংক্তি রাণীকে মুখে মুখে বলিয়া বলিলেন—সকালের কবিতাটির সঙ্গে জুড়ে দিস।''[২]

পংক্তি তিনটি এই—

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

তারপরেও কবির মনে হয়, ''কিছু গোলমাল আছে—তা থাক, ডাক্তারেরা তো বলছে অপারেশনের পরে মাথাটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে, ভালো হয়ে পরে ঠিক করব খন।''

এইখানে কবির সমালোচক সত্তার কথাও একটু বলে নেওয়া ভাল। রবীন্দ্রনাথ ক্রান্তদর্শী কবিমনীষী তিনি একাধারে কবি ও সমালোচক ছিলেন এবং সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি নিজের লেখার নিজেই সমালোচনা করেছেন প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে। নিজের কাব্য সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ সমলোচনার পরিমাণ বিস্ময়কররূপেই বৃহৎ।[৩] পরোক্ষভাবে তাঁর আত্মকাব্য আলোচনার পরিমাণও বিপুল—আজ পর্যন্ত সেই সব পাঠান্তর সংশোধন সংযোজনের পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়নি—তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপিতে অনেক কাটাকুটি মাজাঘষার পরিচয় আজও লুকিয়ে আছে। এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কথা এই যে নিজের লেখা সংশোধন করার অভ্যাস তাঁর আবাল্য বার্ধক্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাল্যকৈশোরের অনেক রচনাই তিনি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনায় পুনর্মুদ্রিত করেননি, অনেক লেখাই প্রুফে 'ছাপার অযোগ্য' বলে কেটে দিয়েছেন (সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'সন্ধ্যা' কবিতাটি, দ্রঃ

সন্ধ্যাসঙ্গীতের পাঠভেদ, পুলিনবিহারী)। পরিণত বয়সের অনেক লেখার উপরেই তিনি নির্মম ভাবে কলম চালিয়েছেন, তাঁর সেই ধূম্রলোচনী সমালোচনার কথাও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে যাই যখন দেখি রোগজীর্ণ শরীরে কবিতা লেখাই যখন অন্যের পক্ষে অসম্ভব রবীন্দ্রনাথ তখনও কবিতা রচনা করেছেন এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও মনে মনে করে তার অসংগতি আবিষ্কার করেছেন। অপারেশনের পর মাথাটা ভাল হয়ে গেলে তিনি তাকে সংশোধন করে দেবেন এমন কথাও ভেবেছেন। তাঁর এ কারয়িত্রী প্রতিভা ও ভাবয়িত্রী প্রতিভা অর্থাৎ কবি-প্রতিভা ও সমালোচক প্রতিভা যে জীবনের শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল তার বড়ো প্রমাণ কবির এই কবিতা সৃষ্টি ও তার সমালোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। হৃদ্বৃত্ত ও চিদ্বৃত্তির যুগপৎ সমন্বয়েই শিল্পকর্ম সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে। কবির অন্তরে সর্বদা একজন সমলোচক বিরাজ করেন— রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য। সেই সত্যই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল এই শেষতম কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও।

কবিতাটির সূচনায় ব্যবহৃত 'ছলনাময়ী' শব্দটি সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ''অভিধান ও ব্যাকরণের শাসন যদি অস্বীকার না করা যায়, শব্দকে যদি তদর্থে গ্রহণ করিতে হয় তবে ছলনাময়ী যে একটিমাত্র সত্তার প্রতি অবিচলিত ঈঙ্গিত করিতে থাকে তাহা বিশ্বপ্রকৃতি।''

আমাদের মনে হয় সমালোচকের এই ব্যাখ্যা যথার্থ। তবে এর সঙ্গে আরও একটু টীকা জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে 'কুহক' অর্থেই মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মায়াবাদের উপরেই বেদান্ত দর্শনের শাঙ্করভাষ্যের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদেও প্রকৃতিকেই মায়াজ্ঞান করতে বলা হয়েছে।

'মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরঃ'

আবার প্রকৃতিকে মায়া বা ছলনায়মী বলেই উপনিষদ ক্ষান্ত হয়নি, মায়ার দুটি রূপের কথাও সেখানে বলা হয়েছে—

'অন্য দেবাহুঃ বিদ্যয়াঃ অন্যদাহুরবিদ্যয়া' কেউ কেউ বিদ্যা দ্বারা কেউ বা অবিদ্যা দ্বারা মায়াকে ব্যাখ্যা করে। বিদ্যা অর্থে যা ব্রহ্মবোধক ও মোক্ষসাধক এবং অবিদ্যা অর্থে যা বিশ্ববোধক ও ভোগসাধক তাকেই বুঝতে হবে। প্রকৃতি অবিদ্যারূপে শব্দপর কিন্তু ব্রহ্ম শব্দাতীত—তাই শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যক্ত করা যায় না। কবি নিজেও ব্রহ্মের অশব্দপর রূপের কথা অন্যত্র বলেছেন। ব্রহ্ম বা সত্যের বিরাট অব্যক্ত অর্থ যেন শব্দের সঙ্গে ছায়ার ছায়া হয়ে লেগে থাকে, শব্দের দ্বারা যা কিছু বলা হয় তা মিথ্যা বা মায়া। কবির কথায়—

এরা সত্য কী যে   বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া   যাই বলি শব্দ সেটা
অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।

এই শব্দরূপ অবিদ্যার মায়াজাল পেতে কবি দীর্ঘকাল নিজেকেই যেন প্রবঞ্চিত করেছেন। তাই জন্মদিনের ১২নং কবিতার সূচনাতেই লিখেছেন,

''করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।''

নিজের স্বরূপ পরিচয় ভুলে কবি দীর্ঘজীবন ধরে প্রকৃতির ছলনাময়ী রূপের কাছে—তার অবিদ্যারূপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন; পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচর আচ্ছন্ন করে প্রকৃতির নিপুণ হাতে যে মায়াজাল পাতা আছে তার ফাঁদেই ধরা দিয়েছিলেন। আর ধরা দিয়েছিলেন বলেই এত অজস্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আজ আসন্ন মৃত্যুর ছায়াতলে জীবনের সত্যস্বরূপ দর্শনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় নচিকেত কবি মায়ার কুহক ধরতে চেয়েছেন, কারণ তিনি জানেন মায়ার এ কুহক যে ধরে ফেলতে পারে, অনায়াসে সে তার ছলনাজাল অতিক্রম করে যায়—

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।

আর তখন,

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।

ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েও মায়ার হাত এড়াবার জো নেই। সেখানেও মায়ার ছলনাজাল পাতা। তাই অন্তরের চিরস্বচ্ছ আলোয় ব্রহ্মদর্শন করলেই পরম শান্তি লাভ সম্ভব হয়। ব্রহ্মকে পেতে হলে মায়ার রহস্যাধিকার মুক্ত হয়ে নিজেকেই ব্রহ্মভাবে ভাবিত করতে হয়—'অহং ব্রহ্মোস্মি' বা 'সোহহং' ভাবসিদ্ধ হতে হয়। শাস্ত্রে বলে 'ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম আপ্যেতি'—ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকে পেতে হয়। আর এই ভাবসিদ্ধ হতে হলে 'ওঁ' শব্দ মাত্রকে আশ্রয় করে মনকে আত্মসংস্থ করে স্থির হতে হয়—

'আত্ম সংস্থ মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'—গীতায় শ্রীভগবান নিজে একথা বলেছেন। সকল প্রসিদ্ধ উপনিষদে ওঁ প্রণবমন্ত্রেই উপাসনা করতে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মধর্মেও এই একটি মাত্র শব্দই আশ্রেয়।

সুতরাং অন্তিমকালে কি ধর্মীয় দৃষ্টিতে আর কি কবিদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মাতিরিক্ত সব কিছুকেই মায়িক পদার্থ মনে করেছেন, যা মায়িক তা মোহকারী প্রকৃতি এবং প্রকৃতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শ্রী বা সৌন্দর্যও মায়ার ছলনা বলেই শেষ সময়ে কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান তথা আত্মজ্ঞান লাভের পথের এই প্রতিবন্ধকের কথা বলা না হলে যে সর্বশেষ কবিতার শেষ কথাটি না বলা রয়ে যায়। তাই ঐ শেষ কবিতার শেষ তিন ছত্রে শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভের উপায়ের কথা বলে কবির কথা ফুরিয়েছে। এরপর দেহে অস্ত্রোপচারের দুঃখের তপস্যায় সত্যের দারুণ মূল্য দিয়ে জীবনের সকল দেনা শোধ করে দিয়ে তিনি মৃত্যুর হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করেছেন। এরপর যে কটা দিন (৩০ জুলাই থেকে ৭ আগষ্ট ১৯৪১) তিনি টিকে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর মতে, ''একে কি বেঁচে থাকা বলে। আমি তো ঘুমিয়ে আছি।''[৪]

প্রথম যৌবনে পরিহাসের সুরে এক সময় ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে কবি বলেছিলেন, 'হয়ত কোন দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।'

এই পরিহাসবাণীই যে কবির জীবনে শেষ পর্যন্ত সত্য উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। জীবন্মুক্ত কবি অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জেনে প্রকৃতির মায়ার ছলনাকে অতিক্রম করে 'ব্রহ্মত্ব' প্রাপ্তির চিন্তা করতে করতে তাঁর কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। জীবনের এই চরম ও পরম উপলব্ধির মুহূর্তে কবি দেখেছেন,

'সম্মুখে শান্তি পারাবার'

মৃত্যুর তরণীতে ওঠার অনেক আগেই সত্যদ্রষ্টা এই ঋষিকবি তাঁর প্রাণের কর্মধারের কাছে অন্তরের আকূতি জানিয়ে রেখেছিলেন—

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

আত্মোপলব্ধির সাধনায়—সীমার মধ্যেই অসীমকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে সেই মুক্তি দাতার কৃপা, তাঁর ক্ষমার মত অত্যাবশ্যক আর কি আছে? ব্রহ্মের কাছে কবির প্রার্থনা মন্ত্রটি যেন প্রাপ্তির আনন্দস্তবেরই রূপ নিয়েছে—

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চির সাথি,
লও লও হে, ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুব তারকার।

আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে—আত্মার ধ্রুব জ্যোতির আলোয় পথ দেখে মৃত্যুর অন্ধকার পার হয়ে কবিসাধক জ্যোতির মধ্যগত জ্যোতিতে স্থির হয়ে চলেছেন। মর্ত্যপ্রেমিক কবি মর্ত্যের অসংখ্য বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সব কাজ শেষ করে মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় করে ব্রহ্মের কৃপায় ব্রহ্মকে লাভ করলেন—২২শে শ্রাবণ ১৯৪৮ (৭ই আগস্ট ১৯৪১) দিবা দ্বিপ্রহরে বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'ওঁ পিতা নোহসি', 'অসতো মা সদ্গময়ো', 'শান্তং শিবং অনন্তম্' ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রাদিত্য, আদিত্যে বিলীন হলেন।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। বাইশে শ্রাবণ, নির্মলকুমারী মহলানবিশ পৃ. ২১৯-২০ (১৩৬৭)
২। তদেব।
৩। এ বিষয় মল্লিখিত 'রবীন্দ্রকাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধটি রচনায় ঐ গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।
৪। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, রাণী চন্দ, পৃ. ১০০, ১৩৫৯

রবীন্দ্রনাথ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

সিপাহি বিদ্রোহের তিন বছর আগে বাংলা-বিহার সীমান্তে সাঁওতাল বিদ্রোহ তীব্র আকার নেয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহকে অনেক ঐতিহাসিক 'ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার আন্দোলন' বলে অভিহিত করেছেন। অথচ সাঁওতাল বিদ্রোহকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আসলে এই আদিবাসী বিদ্রোহ মূলত ছিল গ্রামীণ এলাকায়। আর সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল বড় বড় শহরের সেনা ছাউনিতে। বারাকপুর লখনউ কানপুর মিরাট তখন ছিল খুব পরিচিত নাম, অন্যদিকে ভাগ্নাদিহি কিংবা সিউড়ির কাছাকাছি গ্রাম ছিল অখ্যাত। সিপাহি বিদ্রোহ ঘটেছিল পরাধীন ভারতবর্ষের ব্যাপক এলাকা জুড়ে, আদিবাসী বিদ্রোহের পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ এলাকায়। পরবর্তী-কালের গবেষণায় জানা যায়, এই সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোনোভাবেই উপেক্ষা করবার মতো নয়।

উনিশ শতকে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল কম। দূর দূর অঞ্চলের খবর তেমনভাবে রাজধানী কলকাতায় পৌঁছত না। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহের টুক্‌রো টুক্‌রো খবর যে প্রকাশিত হয়েছিল সে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। যদিও সেকালের অধিকাংশ নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা এই বিদ্রোহকে 'বুনোদের উৎপাত', 'অসভ্যদের হাঙ্গামা' বলে মনে করতেন। আদিবাসীদের ওপর কী ধরনের অবিচার ও শোষণ চলেছে, কীভাবে তাদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ভারতীয় হিন্দু মহাজন ও ব্রিটিশ প্রশাসক কীভাবে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও মানবিক সবকিছুকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিল, সেসবের কোনো প্রতিক্রিয়া সেদিনের নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা যায়নি। যেটুকু প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তাও নেতিবাচক। দু-একজন উদার মানুষ ছিলেন এর ব্যতিক্রম।

অথচ এই বিদ্রোহের সংবাদ যে একেবারেই নগরে পৌঁছয়নি তা তো নয়! ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই লন্ডনে বসে কার্ল মার্কস ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বিষয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করেন এবং 'নোট' নিতে থাকেন। তাঁর এইসব 'নোট' ছিল ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সেগুলি একত্রিত করে পরে প্রকাশিত হয় 'নোটস্ অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' গ্রন্থে। তিনি লেখেন, Outbreak of the Santals, a half-savage tribe, in the Rajmahal Hills of Bengal; put down after seven months' guerrilla warfare, in February 1856.

সাগরপারে বসেও তিনি এই বিদ্রোহের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ভারত-ইতিহাসের ঘটনা হিসেবে এর গুরুত্ব তিনি বুঝেছিলেন। এই ভাবনায় কিন্তু সেদিন আমরা উদ্দীপিত হতে পারিনি।

ভারতের আর একজন রেনেসাঁ পুরুষ বেশ কিছুকাল পরে আদিবাসীদের ওপর ব্রিটিশের

অত্যাচার শোষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এই বিদ্রোহকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর কাছে এসব কোনো উৎপাত বা হাঙ্গামা বলে মনে হয়নি।

১৩০০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লেখেন—'ইংরেজের আতঙ্ক'। প্রথমেই লক্ষণীয়, সাঁওতাল বিদ্রোহ যে ইংরেজ রাজশক্তির কাছে আতঙ্ক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল এবং তার ফলেই যে নিরীহ মানুষের রক্তে রাঙা মাটি লোহিততর হয়ে গিয়েছিল, কবি তা উপলব্ধি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—১৮৫৫ খৃস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না। তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ দিকে পথের মধ্যে পুলিশ তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেন্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে তথ্য পেয়েছিলেন তার ভিত্তিতে তিনি একথা বলেছেন। পরে কালীকিঙ্কর দত্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের গবেষণায় আমরা জানি, ইংরেজ ভালোভাবেই সাঁওতালদের জানত, তারাই আইনবলে তাদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে অরণ্য-আবাস থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করে। হিন্দু মহাজন ও মহেশ দারোগার মতো অচ্যাচারী অমানুষ পশুরা ইংরেজ প্রশাসকদের প্রত্যক্ষ মদতেই এসব কাজ করত। আর সাঁওতালরা যে লুটপাট করেছিল তা সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘরের খাদ্য নয়, তারা জমিদার-মহাজন-মজুতদারের গোলা লুট করেছিল। এইসব কাজে সাধারণ গরিব হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরাও ছিল আদিবাসীদের সহযোগী। এক করুণ অবিচারের বিরুদ্ধেই ছিল এই লুটপাটের মানসিকতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি সব সময় প্রতিফলিত হয়েছে সাঁওতালদের পক্ষেই। যেকালে আদিবাসীদের কোনো অধিকারই স্বীকৃত হয়নি, যেকালে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ তাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন সেই কালে রবীন্দ্রনাথের এই সহানুভূতিশীল মানবিক মানসিকতা নিঃসন্দেহে কবির মহান হৃদয়ের পরিচয় বহন করে।

আবার ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'রাজা প্রজা-সমূহ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে তিনি লিখলেন, ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে মহাজন কর্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া দলবদ্ধ সাঁওতালগণ গবর্মেন্টের নিকট দুঃখ নিবেদন করিতে আসিয়া যে দুর্যোগ ঘটাইয়াছিল তদুপলক্ষে মনস্বী সার উইলিয়ম হান্টার সাহেব লিখিতেছেন—

> The Anglo-Indian Community is naturally liable to apprehensions and hasty conclusions incident to a small body of settlers surrounded by an alien and a greatly more numerous race...with the Government rests the heavy responsibility of counteracting the natural tendency to panic on the part of the public.

হতভাগ্য সাঁওতালদের দুঃখ কেহ দেখিল না, তাঁহাদের নালিশ কেহ বুঝিল না, যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া তাহারা দাবানলপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় তাহাদের অরণ্যবাসভূমি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল, তখন রাজসৈন্যগণ তাহাদিগকে গুলিবর্ষণে দলে দলে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে এই হত্যাকাণ্ড যখন প্রচুর সাঁওতাল-রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিল তখন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণ কিরূপ ধুয়া তুলিলেন?

হান্টার সাহেব এ সম্বন্ধে ক্যালকাটা রিভিয়ু নামক বিখ্যাত পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধবিশেষের উল্লেখ করিয়া তাহার 'গ্রাম্যবঙ্গবৃত্তান্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

> In short, no one knew anything about the wrongs or the peaceful industry of the Santals. They were simply 'adult tigers' or 'bloodthirsty savages' and the reviewer, dismissing the ordinary plan of punishing only the actual rebels as insufficient adopts a proposal to deport across the seas, not one or two ringleaders but the entire population of the inflicted districts.

এইরূপ অসংগত এবং অসংযত ভাষা ইংরাজ-চালিত পত্রে মধ্যে মধ্যে শুনা গিয়াছে এবং নিশ্চয়ই কালে কালে আরও শুনা যাইবে। তাহার কারণ হান্টার-সাহেব পূর্বেই নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা আতঙ্ক; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, সাধারণ মনের সেই উদ্দাম আতঙ্কের প্রতিকূলে রূঢ়ভাবে ধৈর্যরক্ষা করা গবর্মেন্টের গুরুতর কর্তব্যের অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন ১৩০০ বঙ্গাব্দে, আবার পাঁচ বছর পরে সেই একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। অসহায় অরণ্যবাসী গরিব উৎপীড়িত আদিবাসী সাঁওতালদের ওপরে ইংরেজ রাজপ্রভুদের নির্মম গুলিবর্ষণ কবিকে আন্তরিকভাবে বিচলিত করেছিল বলেই তিনি এই প্রসঙ্গ ভুলতে পারেননি। তীর-ধনুক হাতে নিরীহ সাঁওতালরা মুখোমুখি হয়েছিল উন্নত অস্ত্র বন্দুক ও বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলির সামনে। তার পরিণতি কী ঘটেছিল তাই রবীন্দ্রনাথকে বেশি যন্ত্রণাকাতর করে তুলেছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ একটি রাজনৈতিক দর্শনের কথা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তিনি সরকারি ইংরেজদের সহিষ্ণুতা বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন, তিনি বলেছেন—লর্ড ক্যানিং প্রভৃতি মনস্বী রাজনীতিজ্ঞগণের গবর্মেন্ট সমুদ্রতীরে শৈলতটের মতো উদার অটল এবং ক্ষমাশীল ছিল। তিনি এঁদের বড় ইংরেজ বলেছেন। অথচ 'ধৈর্যশীল' সেই সরকারি প্রভুরা সেই সময়ে ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে 'দায়িত্ববিহীন বেসরকারি ইংরাজ-সমাজের উদ্‌বেলিত অসহিষ্ণুতা গবর্মেন্টকেও অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অশোভনরূপে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।' তাঁর বিচারে ছোট ইংরেজদের জয় ঘোষিত হচ্ছে। তা যদি না হত তবে সাঁওতাল আদিবাসীদের এমন বিনা দ্বিধায় হত্যা করার প্রবণতা দেখা যেত না। ইংরেজের সুশাসনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল, শেষ বয়সে 'সভ্যতার সংকটে' সেই আস্থা চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই আশাভঙ্গের সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও চল্লিশ বছর পিছিয়ে গিয়ে যখন তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন। আশাভঙ্গ তো একদিনে ঘটে না, তারও বিবর্তন থাকে, থাকে ইতিহাসগত পরম্পরা।

সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজ কেন আতঙ্কগ্রস্ত হল? ইংরেজদের তরফে বলা হল, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নাগরিক সংখ্যায় কম, তারা বিভিন্ন ভারতবর্ষীয় জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। এমন পরিবেশে সামান্য গোলযোগেই তারা বিপদের আশঙ্কা করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তা প্রবল হয়ে ওঠে। তাই তখন ধীরভাবে কোনো কিছু বিবেচনা করার মতো পরিস্থিতি থাকে না। তাড়াতাড়ি একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রবৃত্তি জন্মায়।

রবীন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক দর্শনকে উপহাস করেছেন। এইসব প্রতিকূল অবস্থায় সরকারকে তো বেশি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, অবস্থা বিবেচনা করতে হয় এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার কী করলেন?—সাঁওতাল-উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা

করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরেজ-রাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন, তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমতো আইনের সংশোধন, পুলিসের পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেই জেনেছিলেন—ইংরেজ মুখে যতই আইনের কথা বলুক বাস্তবে তা ঘটা ও ঘটানো অসম্ভব ছিল। এ অভিজ্ঞতা প্রতিটি পরাধীন ভারতবাসীরই হয়েছে।

সেইসব অভিজ্ঞতার নিরিখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ইংরেজ আইন করল, বিদ্রোহ প্রশমিত হল, নিরীহ সাঁওতাল আদিবাসী গোষ্ঠীর নেতা-কৃষক-দিনমজুরদের বিনা বিচারে মাঠের মধ্যে ফাঁসিকাঠ তৈরি করে গণহত্যা করা হল, কিন্তু ইংরেজ সমাজের উষ্মা তাতে কমল না। তারা বলল, বিদ্রোহীরা যা চেয়েছিল সবই যদি পেয়ে গেল তাহলে তো বিদ্রোহের সার্থকতাসাধন করে একপ্রকার পোষকতা করাই হল। সাঁওতালরা কতটা সুবিচার পেয়েছিল তা তো ইতিহাসই বলে দিচ্ছে। সাঁওতালদের যারা রক্তপিপাসু বন্য ব্যাঘ্র বর্বর প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছিল তারা যে কোন্ সুবিচারের মহিমা ও দয়া দেখাতে পারে তা তো কবির অজানা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ইংরেজ রাজপ্রভুদের এইসব আচরণের উৎস ভয় থেকে। কেননা, মনে একবার ভয় প্রবেশ করলে বিচার থাকে না, দয়াও থাকে না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব-আশঙ্কা হয় সেখানে মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না—নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করে। ইংরেজ যখন কোনো কারণে আমাদের ভয় করে তখনি সেটা আমাদের পক্ষে বড় ভয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়—তখনি ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন, সরকারের নীতি যেমনই থাক, ইংরেজ কর্মচারীগণ সরকারের যন্ত্র নয়, তারা মানুষ। তাঁর এই উদার আশঙ্কা সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সাঁওতালদের প্রতি অবিচার কবিকে যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল এবং কলম ধরতে বাধ্য করেছিল সেই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে রবীন্দ্রনাথ চিনতেন। শান্তিনিকেতনের পাশেই ছিল সাঁওতাল পল্লী। বছরের পর বছর ধরে তিনি দেখেছেন অনেক সাঁওতাল নারীপুরুষকে। এই জনগোষ্ঠীর সততা সৌজন্য সরলতা পরিচ্ছন্নতা ভদ্রতাবোধ ও বিনয় তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এরা কখনও করুণা চায় না। অসাধারণ পরিশ্রমী, পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে। ভিক্ষা চায় না, কাজ চায়। কখনও অন্যের সঙ্গে বিরোধিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে না। এরা গরিব কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধে দৃঢ়। এইসব গুণ কবিকে মুগ্ধ করেছিল। আর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই সরল নিরীহ জনগোষ্ঠী যখন প্রতিরোধে সামিল হন তখন এক ব্যাপ্ত অবর্ণনীয় জটিল অবিচার নিশ্চয়ই তাদের নিস্তরঙ্গ সভ্য জীবনে প্রবল অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন। আর এই জনগোষ্ঠীর প্রতি মুগ্ধতা ছিল বলেই বিদ্রোহীদের প্রতিই ছিল তাঁর মমত্ব ও সহানুভূতি।

রবীন্দ্রমননে সুভাষ

জ্যোতির্ময় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ গান্ধির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন মুক্তকণ্ঠে—'হঠাৎ সেই তামসিকতার মধ্যে দেশের সুপ্ত প্রাণে কে ছুঁয়ে দিলে সোনার কাঠি, জাগিয়ে দিলে একমাত্র আত্মশক্তির প্রতি ভরসাকে, প্রচার করলে অহিংস্র সাধনাকেই নির্ভীক বীরের সাধনারূপে।'

কিন্তু একই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীনভাবে জানালেন—'আমি নিজের সম্বন্ধে একথা স্বীকার করব যে, মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চারিত্রপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হতেম তাহলে অন্যরকম প্রণালীতে কাজ করতুম। কী সে প্রণালী, আমার অনেক পুরাতন লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি। আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আমার প্রভাব নেই।'

গান্ধিই যে কর্ণধার রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করে নিয়েও লিখেছেন, কর্ণধার যে ঘাটের দিকে নৌকো চালিয়েছেন সেদিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। গান্ধীর দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের মতো তিনি বলতে পারবেন না—

'তাই ঊর্ধ্বে আর ঘাট নেই। আরো আছে এবং তার জন্যে আরো মাঝির দরকার হবে।'

সেই মাঝি কে?

১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক'-এর পদে বরণ করে নিলেন সুভাষচন্দ্রকে। লিখলেন—'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।'

আমরা যখন সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠনে ও মানসিকতায় বিবেকানন্দের প্রেরণা সন্ধান করি তখনও সর্বাগ্রে মনে রাখা ভালো যে বিবেকানন্দ বা সুভাষচন্দ্রও স্ববিরোধিতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। সততা নির্ভুল ছিলেন না তাঁরাও। ব্যক্তি মানুষরূপে তাঁদের মেজাজমর্জিগত স্বাতন্ত্র্য, দুর্বলতা ও স্নেহমোহবন্ধনজনিত সীমাবদ্ধতাও একান্তভাবেই মানবিক।

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসদৃষ্টির অভাবেই বিবেকানন্দ-র প্রায় সমবয়সী হয়েও, বিবেকানন্দর মৃত্যুর অন্যূন এক দশকেরও পরে আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেছিলেন যিনি, সেই রবীন্দ্রনাথেরও সম্যক্ পরিচয় অদ্যাবধি বহুলাংশে জটিল ও ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমকালে ব্যক্তির প্রতি দায় যেমন আছে, তেমনি আছে দেশ, কাল ও মানবতার প্রতিও দায়বদ্ধতা। এই দ্বিমুখী দায়িত্ব-পালনে অত্যাবশ্যক বস্তুনিষ্ঠা কোনো 'মহাপুরুষে'র কাছেও সহজলভ্য নয়। কেননা, সময়ের কিছুটা দূরত্ব ও ব্যবধান ছাড়া কোনো 'ডায়নামিক' ব্যক্তিত্বেরও সম্যক্ উন্মোচন সহজ হয় না। আবার সময়ের এই ব্যবধান কখনো কখনো অতীতের বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য ও দলিল উদ্ধারে যেমন সহায়ক হয়, তেমনি বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনার কুলকিনারাও অনেক সময়ে পেয়ে ওঠা অসম্ভব হয়। সুভাষচন্দ্রের অভিযাত্রী জীবনের

ও মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুর সমস্ত তথ্য কি কোনোদিন আমরা জানতে পারব? মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যু! নানা অর্থেই সুভাষ মৃত্যুঞ্জয়ী। আমরা শুধু তাঁর জন্মদিন তেইশে জানুয়ারিই উদ্‌যাপন করতে পারি, তাঁর কোনো মৃত্যুদিন পালন করতে পারি না তথ্যনিষ্ঠ থেকে।

অথচ, যেভাবে যেখানেই হয়ে থাক, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের মতো আমাদের অনেকগুলি প্রশ্নের মীমাংসার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। যে কোনো মূল্যেই হোক সর্বাগ্রে দেশের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর একাগ্র লক্ষ্যের বিষয়। তিনি কি সেজন্য সর্বপ্রথম তদানীন্তন সোভিয়েতেরই সাহায্য পেতে আগ্রহী হয়েছিলেন? সেই সহায়তা তিনি কি পাননি? তারপরেই কি তিনি ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন?

এক্ষেত্রে তাঁর নীতি কী, রণকৌশলই বা কী ছিল? শেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে তাঁর রণকৌশলকেই কি আমরা তাঁর নীতি হিসাবে চিহ্নিত করব? কে নিঃসংশয়ে বলে দেবে, সে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ বিবরণ? তাঁর মৃত্যুরহস্যের উন্মোচনই বা কীভাবে সম্ভব? কারা তাঁকে হত্যা করল? কীভাবে? কোথায়? প্রায় পৌনে পাঁচশো বৎসর আগে চৈতন্যের মৃত্যুও নাকি স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি। কেউ তাঁকে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে প্রতিস্পর্ধীজ্ঞানে হত্যা করেছিল বা করিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র অগ্রণী আধুনিক ভারতীয় জননেতাদের মধ্যে একমাত্র সামরিক ব্যক্তিত্ব। শুধুই রাজনৈতিক নেতা মাত্র নন। এই সুভাষচন্দ্রকে তাঁর সমকালীন বিশ্বের কোনো নেতা প্রতিস্পর্ধীজ্ঞানে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে চিরদিনের মতো অপসারিত করে থাকতেই পারেন। কেননা, অবিভক্ত ভারতবর্ষের মতো প্রায় একটি উপমহাদেশের অবিসংবাদী রাজনৈতিক-সামরিক নেতৃত্বরূপে সুভাষচন্দ্র তাঁর দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বিশ্বের একটি বড়ো অংশে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। বিশ্বের অন্যান্য অগ্রণী নেতারা সুভাষের আকর্ষক ব্যক্তিত্ব, নির্ভীকতা, সুদৃঢ় সংকল্পে সাংগঠনিক প্রতিভা প্রভৃতির নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ও সামরিক অভিযাত্রী জীবন ও ব্যক্তিত্ব তাঁদের কাছে ঈর্ষণীয় প্রতিভাত হতেই পারে। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের বিশাল এই উপমহাদেশের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক-সামরিক নেতার পদে অসমসাহসী সুভাষচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে মদত জোগানোর সদিচ্ছা বিশ্বের আর কোনো রাষ্ট্রনেতার হতেই বা যাবে কেন? বরং সম্ভবপর ক্ষেত্রে সেই প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্ব সুভাষকেই চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়াই স্বস্তিকর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তথাকথিত শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরকেই সম্ভব করে তোলা হলো, দেশ-বিভাগের মূল্যে এই উপমহাদেশকে চিরদুর্বল ও অসংখ্য সমস্যাগ্রস্ত রেখে। সুভাষচন্দ্রকে তার আগে বা পরে কখনো কোথাও হত্যাই করা হয়েছিল।

কিন্তু এ সবই কমবেশি প্রমাণভিত্তিক, তবু অনুমানমাত্র হয়েই থাকবে। সুসম্পূর্ণ প্রমাণ কখনো পাওয়া যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের জীবনের অন্তিম, সর্বাধিক উজ্জ্বল ও চাঞ্চল্যকর অধ্যায়টির কতটুকুই বা জেনে যেতে পেরেছিলেন ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট তাঁর প্রয়াণের দিন পর্যন্ত? ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরীণ রেখেছিল, সেখান থেকে ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি তাঁর 'মহানিষ্ক্রমণ'। সারা দেশ সেই সংবাদ জেনেছিল ২৬ জানুয়ারি। উদ্বিগ্ন গান্ধি, নৈতিকতার ধ্বজাধারী যে গান্ধি অসুস্থ ও অতিষ্ঠ সুভাষচন্দ্রকে নীতিহীনভাবে পন্থপ্রস্তাবের (১২ মার্চ

১৯৩৯) মাধ্যমে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেন, সেই গান্ধিও উদ্বিগ্ন টেলিগ্রাম পাঠালেন শরৎচন্দ্র বসুর কাছে।

এখন আমরা জানি, 'সুভাষচন্দ্র যুদ্ধকালীন ব্রিটেনে বিপদের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী দেশ, প্রথম জার্মানি ও পরে জাপানের সহায়তায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানতে চেয়েছিলেন, যার ফলে আসল স্বাধীনতা' এবং 'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং অক্ষশক্তির সহায়তায় ভারত-মুক্তির প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও আদৌ মূল্যহীন নয়। যেমন গৌরবোজ্জ্বল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির লড়াই। সুভাষ ছিলেন নেতা, হলেন দেশবাসীর 'নেতাজী'। নেতাজি ও আইএনএ ব্রিটিশ শাসকদের নীতি ও কর্মপন্থার উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছিল। তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের গতিপ্রকৃতির উপর, জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপর'।—দ্রষ্টব্য ঃ গৌতম নিয়োগীর 'গান্ধী-সুভাষ বৈপরীত্য ও বিরোধের সন্ধানে', পরিচয়, শতবর্ষে সুভাষ সংখ্যা এবং সুধী প্রধানের 'সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি'।

কিন্তু এসব ঘটনা তো রবীন্দ্রনাথ দেখে বা জেনে যেতে পারেননি। তিনি শুধু সুভাষচন্দ্রের 'মহানিষ্ক্রমণ'-এর ঘটনা জেনেছিলেন। পরবর্তীকালের অর্থাৎ আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত, সুভাষ-সম্পর্কিত যেসব তথ্য এখন জানা যাচ্ছে, তার কতটুকু রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন? খুবই বিস্ময়কর মনে হয় এই 'মহানিস্ক্রমণে'র ঘটনা ১৯৪১-এর জানুয়ারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে লিখেছিলেন নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি ক'বৎসর আগেই ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসেই? জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রথম পর্যায়ে তাঁকে কেন্দ্র করে যে সংশয় ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই কথা দিয়েই শুরু করেছেন অনুচ্ছেদটি—

> সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি, তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে।

এর পরবর্তী অংশেই রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষায় তাঁর মনঃপূত 'দেশনায়ক'কে অভিনন্দিত করেছেন—তাতে মনে হয়, রবীন্দ্রসৃষ্টি যেন ভবিষ্যৎদৃষ্টির মহিমায় প্রোজ্জ্বল, 'মহানিষ্ক্রমণ'-এর এবং পরবর্তী সংগ্রামের পূর্বাভাস যেন নিম্নোক্ত বাক্প্রতিমা-প্রগাঢ় গদ্যাংশে সুচিহ্নিত—

> আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি, তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। ... দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

এ তো গেল সুভাষচন্দ্রের 'মহানিষ্ক্রমণ'-এর পূর্বাভাস রবীন্দ্ররচনায়। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রয়াণের মাস তিনেক আগেই সে 'মহানিষ্ক্রমণ'-এর অত্যুজ্জ্বল ঘটনা রবীন্দ্রসাহিত্যে নতুন কোনো সৃজনশীলতাকে কি আদৌ অর্গলমুক্ত করেনি? প্রয়াণ বৎসর ১৯৪১-এর ১৫ থেকে ২২ মে পর্যন্ত লিখিত 'বদনাম' গল্পটির উপসংহারে 'সদুর কথায় বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল' অংশটির মধ্যভাগের পরে আছে—

'রবিঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ—

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
তোদের আছে!'

'হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টারবাবু।

এই গান অনেকবার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনেরো দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো-বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক।...'

সুভাষকে ভেবে সুভাষকে নিয়ে অনিল বিপ্লবীর জন্ম ও জীবন! তাই, এই হল রবীন্দ্রনাথের সুভাষ-স্মরণ, সুভাষ-বরণ! মৃত্যুর মাত্র মাস দেড়েক আগে। গল্পটির রচনা শেষের তারিখ ২১ জুন, ১৯৪১ সাল।

'গীতাঞ্জলি' 'সং অফারিংস' : নোবেল প্রাপ্তির শতবর্ষ

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র কিছু ইংরেজি অনুবাদ, 'গীতিমাল্য', 'চৈতালি', 'নৈবেদ্য', 'কল্পনা', 'খেয়া', 'অচলায়তন', 'শিশু', 'স্মরণ' এবং 'উৎসর্গ'-এর কয়েকটি কবিতার অনুবাদসহ যখন 'Song Offerings' (১৯:২ প্রকাশ) নামে বিশ্বসভায় স্বীকৃতি পেল নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে (১৯১৩ খ্রি.) তখন থেকেই আমরা কিন্তু বলে আসছি যে, ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য। সংবাদটায় কিছু ভ্রান্তি আছে। বাংলা 'গীতাঞ্জলি' তথা 'গীতাঞ্জলি' নামক রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থকে কি পশ্চিম মহাদেশ জেনে বুঝে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল? রবীন্দ্রনাথের স্ব-কৃত এই অনুবাদগুলি কি সত্যিই গীতাখ্য কাব্যগ্রন্থগুলির আস্বাদ নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে? 'গীতাঞ্জলি' যার কবিতার সংখ্যা ১৫৭ তার সব কটি তো দূরের কথা মাত্র অর্ধাংশের মত নিয়ে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থভুক্ত কবিতা সহ ১০৩টি কবিতার সংকলন Song Offerings দুই মলাটের মধ্যে গ্রন্থিত হয়। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র অন্যান্য কবিতাগুলি কেন Song Offerings-এ ব্রাত্য বিবেচিত হল সেই প্রশ্নের জবাব একমাত্র রবীন্দ্রনাথই দিতে পারেন। প্রশ্নটা অবান্তর নয় তা সত্ত্বেও। বাংলাভাষা যাঁদের আয়ত্তাতীত তাঁদেরও 'গীতাঞ্জলি' পড়তে হয়েছিল ইংরেজির মাধ্যমে। ফলে 'গীতাঞ্জলি' নামক কাব্যগ্রন্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতটা অসামান্য হতে পারত ১৫৭টি কবিতাই যদি ইংরেজিতে অনূদিত হত—এই প্রশ্ন অবান্তর হবে না। উত্তরের প্রত্যাশা করি না তবু।

বিলেতে আসার সময় যে-বই এর পাণ্ডুলিপির তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব ছিল পুত্র রথীন্দ্রনাথের এবং ঘটনাক্রমে হারিয়ে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে ফিরে পাওয়া সেই পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে উদ্দীপিত হয়ে পড়েন কবি য়েটস এবং রঠেনস্টেইন। প্রমথলাল সেন রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, অজিতকুমারের করা রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়ে দিতে। রবীন্দ্রনাথ সম্মতি দিলেন কবিতাগুলো একটু সংস্কার করে দিতে। রঠেনস্টেইন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভ করেন। তিনি এঁদের পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার অনুবাদ প্রকাশে উৎসাহ প্রকাশ করেন। রঠেনস্টেইন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—'It has been for me a real privilege and joy to have had the advantage of meeting you'...'and you will perhaps remember that I shall be grateful—for any translation of poems and stories which may appear in any time.' রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার অপরভাষায় সমাদর উপলব্ধি করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, 'if possible, I will try it myself when I reach England' কিন্তু অপরের করা অনুবাদ তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিলেতে পৌঁছনোর পর একদল গুণমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথকে Oxford-এর একটি সাম্মানিক ডিগ্রী দেওয়ার ইচ্ছে জানালে, বঙ্গবিভাগের নায়ক যিনি তখন Oxford-এর Chancellor এবং ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল সেই লর্ড কার্জন বেঁকে বসলেন। কিন্তু পথে হারিয়ে যাওয়া সেই পাণ্ডুলিপি ফিরে

পেয়ে রঠেনস্টেইনের হাতে দ্রুত তুলে দেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের রচনা এতটাই মুগ্ধ করেছিল য়েটস-কে যে তিনি ট্রেনপথে, বাসে যেতে যেতে এমন কি রেস্তোরাঁতে সেই অমূল্য পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় নিজেকে গভীরভাবে সমর্পণ করতেন। উত্তরকালে 'গীতাঞ্জলি'র (Song Offerings) ভূমিকাংশে য়েটস লিখেছিলেন, 'These lyrics—which are in the original, my Indians tell me, full of Subtlety of rhythm, of untranslatable delicacies of colour of metrical inventions—display in their thought a world I have dreamed of all my life—long.' মুগ্ধ য়েটস রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দ—ধ্বনিমাধুর্যসহ অনুবাদের অসম্ভাব্যতা খুঁজে পেয়েছিলেন এবং ভারতীয় বন্ধুদের মুখে শুনেছিলেন বর্ণনার সূক্ষ্মতা ও ছন্দের কৃৎকৌশলের কথা।

অনুবাদকর্মে Source হল প্রথম সূত্র, তারপর Target reader-দের গ্রহণযোগ্য ভাষার সন্ধান। 'Song Offerings'-এর ১০৩টি কবিতার source গীতাঞ্জলি সহ আরও কিছু গ্রন্থ এবং Target reader হচ্ছে বাংলাভাষাভাষীসহ অবাঙালিরা। ভাষিক ভিন্নতা, অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অপরত্বের প্রমাণ। অনুবাদ মূল সৃষ্টির পুনরুচ্চারণ নয় এবং অনেক সময় মূল থেকে ঈষৎস্খলিত হতেও পারে। অনুবাদের মধ্যে একটা মৌলিকতা থাকে। অনুবাদ প্রথম রচনার আজ্ঞাবহ নয়। অথচ অনুবাদের প্রবল দায় থাকে মূলের প্রতি সংসক্ত থাকার। Serge Gavronsky বলেছিলেন, অনুবাদে 'the original has been captured, raped and incest performed. Here, once again, the son is father of the man. The original is mutilated beyond recognition; the slave-master dialectic reversed' (1977)। অনুবাদ আসলে একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া এবং একটি সৃষ্টির জনক। আজকের বিশ্বায়নের কালে পরিগ্রহণ যখন স্বতঃসিদ্ধ তখন অনুবাদ মূল রচনার তথা আধিপত্যবাদীর আজ্ঞাবহ নয়। 'Song Offerings' একটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ, অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের দুই মলাটের বেষ্টনী-বদ্ধ একটি সংকলন গ্রন্থ নয়। তাই প্রশ্ন, কোথায় সেই স্বাতন্ত্র্য যা ইংরেজি Song Offerings-কে দিয়েছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং বাংলা 'গীতাঞ্জলি' থেকে করেছে পৃথক?

Song Offerings-এর কবিতার সংখ্যা ১০৩ যার প্রথম কবিতাটি নেওয়া হয়েছে 'গীতিমাল্য' থেকে দ্বিতীয়টি 'গীতাঞ্জলি' থেকে তৃতীয়টিও তাই, চতুর্থটি 'নৈবেদ্য' থেকে, শেষের আগেরটি উৎসর্গ থেকে সর্বশেষ কবিতাটি 'গীতাঞ্জলি' থেকে। যদিও আর সকলের মতই আমি 'কাব্য' কথাটা ব্যবহার করলাম, কিন্তু পরপর তিনখানি কাব্যের নামে আছে 'গীত' শব্দটি। আগে এবং পরেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নামে 'গান'-এর যোগ আছে—সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল এবং শেষের দিকে 'পূরবী'। গীত হওয়াই যে কাব্যের উদ্দেশ্য তাই গীতিকাব্য—গীতিকাব্যের এমন একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাহ'লে 'রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি' বললে তো রবীন্দ্রনাথের সব কাব্যগ্রন্থেরই গীতিধর্ম স্বীকার করে নিতে হয়। অথচ 'গীতাখ্য' তিনখানি কাব্য যেন একটু অন্যধরনের, বেশির ভাগ রচনাই যেন গানে সমর্পিত হওয়ার জন্য। আত্মসমর্পণের এমন কাব্য কি তাঁর সব কাব্যগুলি? রবীন্দ্রনাথ যদি তাই করতেন, তাহলে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখতেন না, 'বাংলা ভাষাতেও এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়—এ কেবলমাত্র আমার নিজের কথা, আমারি প্রয়োজনে লেখা।' কবি—অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ ঠিকই প্রশ্ন তুলেছেন যে, নিজের প্রয়োজনে লেখা হলে তা কি সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়? তারপর লিখেছেন, 'গীতাঞ্জলির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কবির আর গীতিকারের যে দুই সমান্তরাল টান চলছিল, যে ভিন্ন দুই স্রোত চলছিল কবিতার আর গানের, পরেও যা ভিন্ন স্রোতে চলবে আবার, এইখানে এসে যে তা মিলে

গেল একবার, এইটেই একাব্যের মস্ত এক পরিচয়। ব্যাপ্তির চেয়ে গভীরতার চাপ এখানে বড়ো, পরিধির চেয়ে কেন্দ্রের। ‘ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত’ তার এই নিবিড় আয়তন দেখে রঠেনস্টেইনের মতো কারো মনে হতে পারে : ‘অল্প লোকই আছেন, যাঁরা তোমার মতো সহজে থামতে জানেন’। শুধু গান নয়, ‘গীতাঞ্জলি’ সেই সহজে থেমে যাওয়ার কবিতা।’ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সহজে থেমে যাওয়ার কবিতা কি ভাষান্তরিত করা যায়? এতই সহজ? অপরের পক্ষে তো বটেই, স্বয়ং কবিই কি পারেন নিজের কবিতা ভাষান্তরে লিখে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে? ভাষান্তরিত কবিতাটি কি অন্য একটি কবিতা হয়ে যায় না? তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ তো কবিতার চেহারায় হয়নি। গদ্যছন্দে তাঁর এই লেখাই যে পরে তাঁকে গদ্যকবিতা লিখতে উৎসাহিত করেছিল তা তো তাঁর নিজের স্বীকৃতিতে মেলে। রূপরচনার দিক থেকে ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথের সাফল্য ও সামর্থ্যের সীমা দুইই ধরা পড়ে। তাঁর ইংরেজভক্তরাও জানতেন, ইংরেজি ছন্দের কলাকৌশলে রবীন্দ্রনাথের এমন অধিকার ছিল না যাতে ইংরেজি অনুবাদে মূল বাংলা রচনার অন্তর্নিহিত ভাব ও রূপের সঙ্গে বহিরঙ্গের রূপের মেলবন্ধন ঘটাতে পারেন তিনি। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যাঁরা ‘গীতাঞ্জলি’র (Song Offerings) সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি-রসের কবি বলেই জেনেছেন, প্রকৃতি ও প্রেমের সঙ্গে ভক্তির সংগমে যে অনন্যতা ঘটেছিল তাঁর কবিতায়, অনেকক্ষেত্রে তার অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারেননি। ‘গীতাঞ্জলি’র কবির সৌভাগ্য হল ‘নোবেল পুরস্কার’ লাভ; কিন্তু দুর্ভাগ্য এইখানে যে ইংরেজি Song Offerings পড়ে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জেনেছেন তাঁরা ‘ধর্মব্যবসায়ী’ হিসেবে চিনেছেন তাঁকে। অনেকে তাঁর লেখায় খুঁজে পেয়েছেন খ্রিস্টধর্মের প্রভাব। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথা স্মরণ করছি।

> ‘...আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হল, এই জাতীয় ভাব ইংরেজ আমলের পূর্বে এই দেশে ছিল, কবিদের মধ্যে ছিল। অথচ এমনই কপাল যে ঐ অনুবাদ পড়ে য়েটস প্রমুখ কয়েকজন বিদগ্ধ পশ্চিমী পাঠকের মনে হয়েছিলো এ-অনুবাদ না ছাপলেই ভালো করতেন রবীন্দ্রনাথ, কেননা তাঁর কাব্যিক অর্থাৎ ঈষৎ জোলো ভক্তিরস কবীরের খাঁটি গাঢ় ভক্তিরসের তুলনায় পানসে ঠেকে। এঁরা লক্ষ করলেন না যে, কবীর শুধু খাঁটি ভক্ত নন, মূলত ভক্তই, কবিতা তাঁর পক্ষে গৌণকর্ম, কবি না হলেও তাঁর ভক্তিরস বিন্দুমাত্র খণ্ডিত হত না। অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ খাঁটি কবি এবং মূলত কবিই, ভক্তি তাঁর কাব্যসৃষ্টির উপাদান এবং একমাত্র উপাদান নয়, ভক্ত না হলেও তিনি উঁচুদরের কবি হতেন। কিন্তু কবিতায় প্রকাশের সার্থকতা না পেলে তাঁর ভক্তিরস অচিরে শুকিয়ে যেতো। অপরপক্ষে কবীরের দোঁহা বিশুদ্ধ ভক্তিরই প্রকাশ, তাতে প্রেমিক-প্রেমিকার সেই ভাবগত আদান-প্রদান নেই, যা গীতাঞ্জলির ভক্তি-কাব্যকে অন্য একস্তরে নিয়ে গেছে।’

আইয়ুব হয়ত এই জন্যেই বলেছেন, শুদ্ধভক্তির কবিতা (‘আমার মাথা নত করে দাও হে’, ‘একটি নমস্কারে প্রভু’, ‘তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।’ ইত্যাদি) তাঁর মনে সাড়া জাগায় না। অন্য সকলে ‘গীতাঞ্জলি’ পাঠ করেছেন যেমন ভাবে, আইয়ুব হয়ত সেভাবে করেন নি। তাঁর বিচারে ‘গুণ এবং মাত্রা উভয় নিরিখে গীতাঞ্জলির মূল সম্পদ হচ্ছে সেই সব গান যাতে ভক্তি এবং প্রেমের কিংবা ভক্তি ও প্রকৃতি অনুরাগের কিংবা তিনটেরই সংগম ঘটেছে।’ অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ ও আইয়ুব ‘গীতাঞ্জলি’ নামক রবীন্দ্রনাথের বাংলা কাব্যের আলোচনা করেছেন, ‘Song Offerings’-এর নয়।

যে Song Offerings রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসভায় নোবেল বিজয়ীর মুকুট পরিয়ে দিয়েছে তাঁর

প্রথম কবিতাটি হল ‘গীতিমাল্য’-এর ২৩ সংখ্যক কবিতা। কিন্তু আমরা বাঙালি পাঠকেরা তাতে কুণ্ঠিত নই; যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, একথা বলার সময় প্রায় কেউই Song Offerings-এর পৃষ্ঠা উলটে দেখি না। আমাদের কুণ্ঠা জাগে, অন্তত আমার মত অর্বাচীনের, যখন বাংলা কবিতার পাশে তার ইংরেজি তর্জমা বসিয়ে নিই। যখন পড়ি :

আমায় তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।

তখন যে-তারে ঝংকার ওঠে তা কিন্তু ওঠে না যখন পড়ি— ‘Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and filled it ever with fresh life.’ আবার যখন পড়ি, ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে/আঁধার করে আসে,/ আমায় কেন বসিয়ে রাখো/একা ঘরের পাশে’ তখন প্রশ্ন জাগে এই ‘মধ্যম পুরুষ কে? একি অনান্নী কোনো এক নারী, না কি ঈশ্বর? ইংরেজি লেখাটা না পড়লে আর যাকেই হোক, রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যেত না। যাঁর কাছে ‘প্রেম’ নামক abstract ক্ষেত্র বিশেষে concrete হয়ে যায়, তার জন্য অবাঙ্মনসোগোচর কোনো কিছুর অস্তিত্ব বা বিপরীত লিঙ্গের অস্তিত্বের প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয় সৃষ্টি অর্থাৎ চলিত কথায় ‘অনুবাদ’টা যখন পড়ি তখন মনে এমন একটা সুন্দরের ছোঁয়া লাগে যা ব্যাখ্যাতীত : Cloud Heap upon clouds and it darkens. Ah, love, why dost thou let me wait outside at the door all alone? এই কবিতাটি নিঃসন্দেহে কবির কথানুসারে একান্তই তাঁর নিজের। কিন্তু জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ইত্যাদি যখন পড়ি তখন ‘আমি’ একবচনে সীমাবদ্ধ থাকে কি? একজন বিশেষ ভক্তকে ভাবতে আমার কষ্ট হয়। ‘যজ্ঞ’ শব্দটাই তার কারণ কিনা জানি না, যেহেতু যজ্ঞে পুরোহিতই সব নন। ‘যজ্ঞ’ একটা Collective ব্যাপার। ইংরেজি অনুবাদে একবচনের দিকে ঝোঁক এলেও মনে হয়, এটা একজনের কথা নয়, সকলের কথা—একজনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে মাত্র : ‘I have had my invitation to the world’s festival, and thus my life has been blessed’ তবে আমার ভালো লাগেনি এক জায়গায়, প্রথম স্তবকেই। মূল লেখাতে (অর্থাৎ বাংলায়) পড়ছি, ‘নয়ন আমার রূপের পুরে/সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে/শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।’ এর ইংরেজিটা কার ভালো লাগবে জানি না—‘My eyes have seen and my ears have heard’. কী অসাধারণ মূল রচনা। আমি ইংরেজি অনুবাদটাকে যদি আমার বাংলায় ফিরিয়ে আনি তাহলে কী দাঁড়ায়? ‘নয়নে আমি দেখেছি আর শুনেছি মোর কানে’ তখন সহিষ্ণু শ্রোতাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেই। এই অংশে ‘আমি’ ব্যক্তি বিশেষ হলেও হতে পারে এবং ‘তুমি’ একজনই—তিনি ঈশ্বর। তিনি আদিস্রষ্টা যিনি চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। যে কোনো পাঠকই দ্বিতীয় স্রষ্টা তথা ভিন্ন স্রষ্টা। এইভাবে যতজন পাঠক ‘স্রষ্টা’ও ততজনই এবং ‘সৃষ্টি’ও ততগুলিই। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মনে হয় ‘I’ ব্যক্তিবিশেষ—‘I know not from what distant time thou art ever coming nearer to meet me. The sun and stars can never keep thee hidden from me for age.’ ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’র ৬০ সংখ্যক কবিতাটি ‘শিশু’ কাব্য থেকে নেওয়া : ‘জগৎ পারাবারের তীরে/ছেলেরা করে খেলা’। অনবদ্য এই কবিতা। কবির ব্যক্তিজীবনে তাঁর শিশুসন্তান মাতৃহারা হয়েছে। পিতার মধ্যে দৃঢ়মূল

মাতৃত্ব নামক অনুভূতি—abstract idea. ইংরেজি অনুবাদে পড়ছি 'On the seashore of endless worlds children meet'. 'অন্তহীন গগনতল/ মাথার পরে অচঞ্চল/ফেনিল ওই সুনীল জল/নাচিছে সারা বেলা/উঠিছে তটে কী কোলাহল— ছেলেরা করে মেলা।' রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ হল—'The infinite sky is motionless overhead and restless water is boisterous. On the seashore of endless worlds the children meet with shouts and dances.' রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ রাদিচের সসম্ভ্রম অনুবাদে রূপ নিয়েছিল : 'On the shore of the world sea, /Children play, /Endless sky stretching/Above their heads unmoving, /Deep blue water foaming—Dances all day, /Merrily on the shore/ They meet and play'. আমি বলব, এই অনুবাদটাই চমৎকার, রবীন্দ্রনাথেরটা নয়। রাদিচে ভদ্রলোক। তাই পুবের কবিকে নম্র নমস্কার সহ জানিয়েছেন, 'Now for my own translation. I have tried through the use of meter and rhyme to capture the rhythmic and formal qualities of the original. Tagore was a Bengali poet, not an English poet, and he did not have at his command the technical resource metre, rhyme etc.— that he had in Bengali. So he wisely chose to translate his poems and songs into poetic prose. This was a deliberate and carefully chosen method, রাদিচে কবিতাটাকে এতই ভালো বেসেছেন যে অকপটে আবেগবহ ভাষায় জানালেন, 'Tagore wrote great poems, but if I were to point a English poem that demonstrates his greatness as a poet, then I might choose this one.' রাদিচে অবশ্যই জানতেন মূল বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা এটি নয়। এই কবিতা আগেই লেখা 'শিশু' কাব্যের 'শিশু'। কবিতাটা গীতাঞ্জলির মূল সুরের সঙ্গে মিলেছে কিনা রাদিচে তা নিয়ে প্রশ্ন করেননি—এই কারণে নয় যে, প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনে এক। তাঁর হাতে ছিল 'Song Offerings', বাংলা গীতাঞ্জলি নয়, থাকলেও তিনি পড়তে পারতেন বলে আমি মনে করি।

রবীন্দ্রকবিতা অজিতকুমার চক্রবর্তীর আগ্রহে ইংরেজিতে অনূদিত হওয়ার পর থেকে সাগর-পারের রসিকদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনুবাদে হাত দিলেন এবং একের পর এক ইংরেজি ভাষার রচনা তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু তাঁর কবিতার ভাষান্তর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'translations are not always literal— the originals being sometimes abridged and sometimes paraphrased. কখনও কোনো অনুবাদটাকে মনে হয়েছে মূল রচনা থেকে পৃথক একটি রচনা। ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্পর্কে ১৯১৩-র ১৩ মার্চ রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লিখেছিলেন, 'what I try to capture in my English translation is the heart and core of my original Bengali. This is bound to make for a fairly wide deviation. If I were not there to help you out, you may probably find it impossible to identify the original in the translation.' ঐ বছরেরই ১২মে অর্থাৎ দু'মাস পরে কবি স্বীকার করেন, 'the forms and features of the original become difficult in my translations—the way I do them these days. My translations are more a reflection than an exact replica of the original image.' রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা সম্পর্কে যা বলেছেন তার অনেক আগেই পার্সি বিশ শেলি বলেছিলেন, কবির ভাষা তাঁর ভাবেরই সহগামী বলে রসের বিপর্যয় না ঘটিয়ে রূপের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এই ভাষা একান্ত ব্যাকরণ অনুশাসিত নয় বলে ভাষার পরিবর্তনে কবিতার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে না। তাছাড়া যে-রূপকে আশ্রয় করে কোনো ভাববস্তু পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত সেই ভাববস্তুও

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেলি-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে মতৈক্য আমরা দেখেছি। শেলি বলেছেন, 'The plant must spring again from its seed or it will bear no flower'. এই ধ্রুববাক্যটি কি রবীন্দ্রনাথ জানতেন না! জানতেন বলেই বলেছেন—'My translations are more a reflection than an exact replica of the original image.' 'Song Offerings' 'reflection' মাত্র, মূল বাংলা কবিতাগুলির 'exact replica' নয়।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘পদরত্নাবলী’র রত্নপেটিকায় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদাবলীর যে রত্নগুলিকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সাজিয়েছিলেন তাদের অনেকগুলি রত্নকণিকা বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রসাহিত্যকে খচিত করে রেখেছে। ১২৯১ সালে ‘রাজপথের কথা’ থেকে আরম্ভ করে ১৩৪৬ সালে রচিত ‘রবিবার’ গল্প পর্যন্ত—এককথায় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রত্যুষকাল থেকে প্রদোষকাল পর্যন্ত বৈষ্ণবপদাবলীর অনেক অবিস্মরণীয় পংক্তি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত পদরত্নাবলীতে গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব কবি হলেন পাঁচজন—বলরাম দাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতি। এছাড়া এ সময় রায় বসন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণবপদের যেসব উদ্ধৃতি প্রয়োগ লক্ষ করা যায় তার মধ্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই এই কয়েকজন কবির পদস্মৃতি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও রসরচনায় পদাবলী থেকে উল্লেখের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তাকে অনুসরণ করেছিলেন রমেশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ এই রীতির বহুল প্রয়োগ করলেন। অল্পবয়স থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক চর্চার ফলে পদাবলীর কাব্যঝঙ্কার কবির অন্তরে সংস্কার হয়ে উঠেছিল। সেইজন্য কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণে ক্ষণে পদাবলীকে স্মরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক যাই রচনা করুন তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। তাঁর সমস্ত রচনাতেই কবি-পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বৈষ্ণবপদাবলীর আবেদন চিরকালের এবং সেই আবেদন মূলত সাহিত্যিক। বৈষ্ণব কবিতা তাঁর মতে বৈকুণ্ঠের গান নয়। যদি কেউ বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে নিজের অন্তরের ভাষাকে খুঁজে পায় তবে তা সৌন্দর্যের দস্যুতা হলেও অপরাধ নয়। কবিও তাই পদাবলীর ভিতর থেকে আপন বক্তব্যের সমর্থন সন্ধান করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। বৈষ্ণব পদাবলীকে তিনি তাঁর রচনায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে পদাবলীর উদ্ধৃতি কোথাও তাঁর বক্তব্যের সমর্থন, কখনও বা বক্তব্যের উদাহরণ। উপন্যাসে, নাটকে ও গল্পে বৈষ্ণব কবিতার ব্যবহার কখনও অব্যক্তের সঙ্কেতাভাষ, কোথাও চরিত্রের মর্মব্যাখ্যা, কবিতার ক্ষেত্রে ভাবের প্রভাব বা সমরসদ্যোতক পূর্বস্মৃতি।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধৃতির সংখ্যাবৈচিত্র্য খুব বেশি নয়, প্রয়োগ বৈচিত্র্যই বিস্ময়কর। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তার মুষ্টিমেয় কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদের প্রসিদ্ধ অংশ বিশেষ রবীন্দ্রসাহিত্যে নানাভাবে ঘুরে ঘুরে দেখা দিয়েছে। সংখ্যায় তারা সামান্যই। কিন্তু প্রত্যেকবার একই উদ্ধৃতি নব নব বক্তব্যের তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। এর ফলে উদ্ধৃতির অংশটুকু কেবল উদ্ধৃতিমাত্র না হয়ে বিভিন্ন বক্তব্যের সংস্পর্শে এসে নতুন নতুন ব্যাখ্যা হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় কবি। চণ্ডীদাসের পদের অব্যক্ত অর্থগৌরবের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে। চণ্ডীদাসের পদের ব্যবহারও রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বভাবতই বেশি—কারণ চণ্ডীদাসের পদের অর্থ তাৎপর্যের সম্ভাবনা অনেক। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ বা নিবেদনের এক একটি পদের অংশবিশেষ সেই পদের আবেষ্টনী ভেদ করে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। 'কী মোহিনী জান বন্ধু কী মোহিনী জান' পদটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পদরত্নাবলীতে স্থান দিয়েছেন। ১৩০৫ সালে রচিত 'অধ্যাপক' গল্পে নায়কচরিত্রের রোমান্টিক কল্পনা প্রবণতাকে স্পষ্ট করার জন্য রবীন্দ্রনাথ পদটির প্রথম দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন—

> ''কিরণ যদি সহজ সুরে বলিত মহীন্দ্রবাবু, কাল সকাল সকাল
> আসবেন তো? তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—
> অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।"

মূলে উক্তিটি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাধার। মহীন্দ্রবাবু সেই অবোধ নর-নারীদের একজন যিনি বৈষ্ণব কবিতাকে প্রিয়জনের কাছ থেকে নতুন অর্থে পেতে চান। চণ্ডীদাসের আর দুটি বিখ্যাত পদ 'সখী কে বা শুনাইল শ্যাম নাম' এবং 'বঁধূ কি আর বলিব আমি' রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩০৯ সালে রচিত দর্পহরণ গল্পের নায়ক হরিশ্চন্দ্র তাঁর ভাবী বধূ 'নির্ঝরিণী'র নাম শুনেই ব্যাকুল হয়ে চণ্ডীদাসের পদটি স্মরণ করেছেন—

> কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
> আকুল করিল মোর প্রাণ।

এই উদ্ধৃতি প্রয়োগের ফলে নায়কচিত্তের রোমান্টিক ব্যাকুলতাকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হল না—স্বল্পায়াসেই ছোটগল্পের ব্যঞ্জনা রক্ষিত হল। চতুরঙ্গের লীলানন্দ স্বামীর কীর্তন-গানের আসরের গান 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি'—এই গানের গভীর অর্থ শচীশ-দামিনীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও সত্য হয়ে উঠল দামিনী-শ্রীবিলাসের মধ্যে।

কেবল কথাসাহিত্যেই নয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও আপন বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন চণ্ডীদাসের পদপংক্তি উদ্ধৃত করে। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ সামর্থ যেমন বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত হয়েছে তেমনি চণ্ডীদাসের পদপংক্তি আধুনিক প্রয়োগকৃতিত্বে অভাবনীয় মাত্রা লাভ করেছে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ধর্ম এই : যে ভাববেষ্টনীতে তার জন্ম, কবিতা শেষ পর্যন্ত তাকে অতিক্রম করে যায় নিজেরই অসীম তাৎপর্যে, ব্যাপ্ত হয়ে যায় সর্বক্ষেত্রে। নদীর জলের মতো তখন তাকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'একটি গীত' প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের একটি প্রেমের পদকে স্বদেশপ্রেমের নিরিখে নিজের চিন্তার বাহন করে যে পথ দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই পথকে অনুসরণ করলেন সামাজিক প্রবন্ধে। ১৩০৮ সালে সমাজ গ্রন্থের অন্তর্গত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধের আলোচনায় গুরুতর সমাজ সমস্যাকে স্পষ্ট ও তীব্র করে বোঝাতে গিয়ে চণ্ডীদাসের পূর্বোক্ত আক্ষেপানুরাগের পদের দুটি পংক্তি উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় অন্ধ হয়ে এদেশ যখন তার প্রাচীন মূল্যবোধ ও সংস্কার বিসর্জন দিয়ে প্রতীচ্য সভ্যতাকে অনুসরণ করল তখন আশা ছিল এইভাবে বোধহয় শাসক শাসিতের বিভেদ দূর হয়ে মিলন হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বিভেদ অক্ষুণ্ণ রইল তখন একূল ওকূল দুকূল গেল। এটা বোঝাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের দুটি পদ থেকে দুলাইন করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখছেন—

''আমাদের যাহা কিছু ছিল ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম কিন্তু ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জন্মিতেছে। ভাবিতেছি কিসের জন্য—

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।

বাঁশি বাজিয়াছিল মধুর, কিন্তু এখন মনে হইতেছে—

যে ঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও।।

এখন বিলাতী শিক্ষাটাকে ডালে মূলে উপড়াইবার ইচ্ছা হইতেছে।''

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি চণ্ডীদাসেরই, কিন্তু 'কি মোহিনী জান বধূ' শীর্ষক প্রথম পদের নয়। 'মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে' শীর্ষক আক্ষেপানুরাগের আর একটি পদের অংশবিশেষ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে চণ্ডীদাসের প্রেমকবিতার পংক্তিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে আধুনিক সমাজসমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অব্যর্থ প্রয়োগ করেছেন। চণ্ডীদাসের পদের পূর্বোক্ত দুটি চরণ রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ব্যবহার করেছেন ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। সেখানে তার প্রয়োগ আবার পৃথক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত। আমাদের সামাজিক জীবনে ঘরে-বাইরের পৃথক তাৎপর্য দেখিয়ে কবি বলেছেন—

''বাহিরে অর্জন করিতে হইবে ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরের শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে। প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।

এজন্যই কবি কথিত 'স্রোতের সেঁওলির মত ভাসিয়া চলিয়াছি'।''

এখানে দেখা যায় পূর্বোদ্ধৃত চণ্ডীদাসের প্রেমকবিতার পংক্তি অন্য একটি সমাজসমস্যার প্রেক্ষাপটে কবির আধুনিক আত্মসমালোচনার সমর্থন হয়ে উঠেছে।

চণ্ডীদাসের মতো বিদ্যাপতির পদকণাও রবীন্দ্রসাহিত্যে আকীর্ণ হয়ে আছে। এক্ষেত্রেও পদের বৈচিত্র্য খুব বেশি নয়। কিন্তু একই পদের প্রয়োগ বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত প্রচলিত দু-তিনটি প্রিয় পদের অংশবিশেষকেই নানাস্থানে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে কবিবল্লভ বা বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত 'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়' শীর্ষক পদের 'জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ' পদাংশটি। পদকল্পতরু বা রবীন্দ্রনাথের পদরত্নাবলীতে এটি কবিবল্লভের ভণিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের 'আত্মমন্দিরে' পরিচ্ছেদের শীর্ষে এটি যেমন বিদ্যাপতির ভণিতায় উদ্ধৃত আছে রবীন্দ্রনাথও তেমনি বিভিন্ন স্থানে পদটি বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত করে উল্লেখ করেছেন।

১২৯৯ সালে রচিত 'গোড়ায় গলদ' নাটকে চন্দ্রকান্ত তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত কবিস্বভাবের পরিচয় দিয়ে বলেছে যে সংসারের গদ্যময় দাম্পত্যজীবনে প্রেয়সীর মাধ্যমে বিদ্যাপতির ঐ পদটিকে সত্য করে তুলতে আকাঙ্ক্ষা জাগে কিন্তু বাস্তবে হয়ে ওঠে না।

"আমারও মন এক একদিন উড়ু উড়ু করে—এমনকি চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে এমনও ভেবেছি—আহা, এই সময়ে প্রেয়সী যদি চুলটি বেঁধে গাটি ধুয়ে, একখানি বাসন্তী রঙের কাপড় পরে একগাছি বেলফুলের মালা হাতে করে নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয় আর মুখের দিকে চেয়ে বলতে থাকে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।।

প্রেয়সীও আসে, দুচারকথা বলেও থাকে, কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সঙ্গে ঠিকটি মেলে না।"

বাস্তবজগতের সঙ্গে কল্পনার জগতের এই অমিলটাই তো সাহিত্যের তথ্য ও সত্যের অমিল। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি প্রয়োগ করে সেটাই বুঝিয়েছেন। তথ্যের জগতে একজন ডাক্তার ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু তাকে যে ভালবাসে তার কাছে সে এমন রসবস্তুর সত্যতা লাভ করে যার ফলে—

'ডাক্তারকে লক্ষ্য করে তার প্রেমাসক্ত অনায়াসে বলতে পারে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয় জুড়ন ন গেল।'

এই গ্রন্থের আর একটি প্রবন্ধে (সাহিত্যতত্ত্ব) এই একই উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে ভালবাসা ব্যক্তি পুরুষের পরম সম্বন্ধ; তা দিয়ে সহজেই তথ্যের জগৎকে অতিক্রম করে সত্যের জগতে উপনীত হওয়া যায়। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্য সম্মিলন' প্রবন্ধে রসের অতিরিক্ততা লক্ষ লক্ষ যুগের আকাঙ্ক্ষাকে কীভাবে সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় সেকথা বোঝাতেও অনুরূপ উদ্ধৃতি প্রয়োগ করা হয়েছে। 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'সাহিত্যের আধুনিকতা' প্রবন্ধে আধুনিক বিদেশী সাহিত্যকে কবি যে পূর্বোদ্ধৃত পদপ্রশস্তি দিয়ে সমাদর করতে অনিচ্ছুক সেকথা বলতে গিয়ে কবি পুনরায় এই পদ্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিতেই কবি পদটির চরণ পারম্পর্য রক্ষা করেননি। বিদ্যাপতি বা কবিবল্লভ যারই রচনা হোক মূল পদাংশটুকু হল এই—

জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ ন গেল।।
কত মধু যামিনী রভসে গোয়াইলুঁ না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল।।

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ও চতুর্থ চরণটুকু কেবল পরপর গ্রহণ করে সর্বত্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্কলিত পদরত্নাবলীতে এই পদের যে পাঠ নিয়েছেন উদ্ধৃতিদানকালে সেই পাঠের প্রভাব পড়েছে। একমাত্র পঞ্চভূত গ্রন্থের 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে ব্যোমের উক্তিতে এই উদ্ধৃতির পদ পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে। সেখানে 'কচ দেবযানী' (বিদায় অভিশাপ) কবিতায় তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জীবের প্রবাসী আত্মা দেহরূপ প্রেয়সীকে কীভাবে ব্যাকুল করে তুলেছে তা বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে—'তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য আনিয়া দিতেছে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না।' তাই সে বলিতেছে—'জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।' তাহার

কর্ণে যে সঙ্গীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে—

'সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল।'

বিদ্যাপতির আর একটি পদ রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। মাথুর বিরহের বিখ্যাত পদ—'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' পদরত্নাবলীতে এটি আছে। বর্ষাবিরহের কবিতারূপে বিদ্যাপতির এই পদটি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের মতোই রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের নানাস্থানে এই পদের অংশবিশেষ উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

১৩০৮ সালে রচিত 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে বর্ষার সঙ্গে ময়ূরের ডাকের নিবিড় সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে গিয়ে বিদ্যাপতির এই পদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন—'মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী/ফাটি যাওত ছাতিয়া'—এরপর ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার
নিবিড়ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়।"

১৩১৪ সালে রচিত 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে বিদ্যাপতির এই পদটিকে গীতিকাব্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করে বলেছেন—

"যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ—ওই যেমন বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'—সেও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে —যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল অমনি সকলেরই এই অনেকদিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।"

বিদ্যাপতির এই পদটিতে রাধার ব্যক্তিহৃদয়ের বেদনা কতখানি বিশ্বজনীন বেদনা হয়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ১৩১৭ সালে প্রকাশিত শান্তিনিকেতন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রবন্ধে।

"আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই যে বর্ষা, এতো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়,
এ যেন আমার সমস্ত জীবনের বারিধারা।"

১৩২২ সালে প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ বিদ্যাপতির এই পদটির সাহায্যে নিজের মনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিমলার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের দুর্দিনে যে গভীর শূন্যতাকে অনুভব করেছিলেন বিদ্যাপতির এই পদের ভাব ও সুরের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন। 'ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'—এই পদাংশ ধীরে ধীরে বিচিত্র অনুভূতিতে নিখিলেশের চিত্তকে ভরিয়ে দিল। প্রথমে মনে হল বিদ্যাপতির রাধার মতোই তা শূন্যতা। তারপর মনে হয়েছে বিদ্যাপতির রাধার শূন্যতা বিরহের বেদনায়, সেখানে প্রেমের ঐশ্বর্য আছে; কিন্তু তাঁর শূন্যতা যে বিচ্ছেদে প্রেম সেখানে মিথ্যে, বেদনাও অপমানিত। পদ্যাংশটি পুনরায় আবৃত্তি করতে করতে মনে হল একজনের প্রেম মিথ্যে হয়ে গেলেই সমস্ত জীবন মিথ্যে হয়ে যায় না, জীবনের সত্য অনেক বড়।

বিদ্যাপতির আর একটি পদের আরম্ভাংশ রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। অনেক সময় তিনি মূল পদ্যাংশটি উদ্ধৃত না করে গদ্যে রূপান্তরিত করে উপস্থিত করেছেন। কখনও কখনও মূল উদ্ধৃত করেছেন। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সাহিত্যরূপ' নামক প্রবন্ধটিতে তথ্য কী করে কবিতায় সত্য হয়ে ওঠে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেছেন—

> ''দেবালয় থেকে বাহির হয়ে গোধূলির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সুন্দরী চলে গেল এই একটি তথ্যকে কবি ছন্দে বাঁধলেন—
>
> 'যব গোধূলি সময় বেলি
> ধনী মন্দির বাহির ভেলি
> নব জলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্বপসারি গেলি।
>
> তিনলাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম—সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে গেল।''

'সাহিত্যের তাৎপর্য', 'তথ্য ও সত্য' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রবন্ধে যেখানেই তিনি তথ্য ও সত্যের পার্থক্য দেখাতে গেছেন সেখানেই বিদ্যাপতির এই কবিতাটি কবি ব্যবহার করেছেন। পদটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্দির অর্থে দেবালয় ধরেছেন। বিদ্যাপতির সময়ে গৃহ মাত্রকেই মন্দির বলা হত। অবশ্য এতে ব্যাখ্যায় খুব একটি ভ্রান্তি ঘটেনি। বরং দেবালয়ের পটভূমিতে কবিতাটি আরও রহস্যময় সুদূরতা লাভ করেছে।

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাসই যে সবচেয়ে বেশি রোমান্টিক এ সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েছিল। ১২৯১ সালের কার্তিক মাসে নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব কবির গান' শীর্ষক আলোচনার একটি রচনা হল 'জ্ঞানদাসের গান'। 'কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশি' শীর্ষক জ্ঞানদাসের একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে জ্ঞানদাসের পদ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যভাবনাকেই প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানদাসের গান মর্তের সৌন্দর্যপিপাসু মানুষকে সেই অসীম সৌন্দর্যস্বর্গে নিয়ে যায় যেখান থেকে সৌন্দর্যের পূর্ণতম আদর্শ কৃষ্ণের বাঁশীর সুর বিচিত্র নিসর্গ সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে ভেসে এসে মর্ত্যমানবকে অকারণ বিরহ বেদনায় ব্যাকুল করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনের একটি বিশিষ্ট ধারণা এই যে, প্রাকৃত জগতের পরপারে, কোথাও কোথাও সৌন্দর্যের একটা পূর্ণতম আদর্শের জগৎ আছে। সেখানে সশরীরে যাওয়া যায় না, কিন্তু কোনো কোনো মুহূর্তে তার আভাস পাওয়া যায়। আমরা সকলেই সেই পরম সৌন্দর্যের জগৎ থেকে নির্বাসিত। বৈষ্ণব কবিতা—বিশেষত জ্ঞানদাসের গান সেই চিরনির্বাসিত মর্ত্যমানবের সঙ্গে সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যস্বর্গের মিলন ঘটিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের পদের রোমান্টিক প্রেম ও নিসর্গভাবনায় একান্ত মুগ্ধ। জ্ঞানদাসের যে পদটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নাটকে এবং বিভিন্ন আলোচনায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সেটি রাধার স্বপ্নরসোদগারের একটি পদ—'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন/রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।' শ্রাবণ ঘন বর্ষায় রাধার স্বপ্নের মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের রোমান্টিক অনুভূতি সুপ্রযুক্ত শব্দ ও ছন্দের মায়ায় রবীন্দ্রনাথকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিভূত করেছে। 'সোনার তরী' কাব্যের বর্ষাযাপন কবিতায় জ্ঞানদাসের পদটি উদ্ধৃতিসহ উপস্থিত—

> স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে
> শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
সেই গান মনে পড়ে যায়।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে গলিত চীর অঙ্গে
মন সুখে নিদ্রায় মগন—
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।

শেষ জীবনে শ্যামলী কাব্যের 'স্বপ্ন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মনে জ্ঞানদাসের এই একই পদের স্মৃতি তাঁর নিজের কবিতায় ভীড় করেছে—

''রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
স্বপন দেখিনু হেন কালে।
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ এক মেয়ে ছিল
ভালবাসার কুঁড়ি ধরা তার মন।''

বৈষ্ণব কবিতার নায়িকা রাধার পিছনে বৈষ্ণব পদকর্তার কবিমানসীকে অন্বেষণের এই চেষ্টা মানসী-সোনার তরীর রোমান্টিক পর্বের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ করে আসছেন। 'সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব কবিতায়' বৈষ্ণব কবিদের প্রতি কবির ব্যাকুল প্রশ্ন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা হতে পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?

'রজনী শাঙন ঘন' পদটির উদ্ধৃতি রবীন্দ্র সাহিত্যে অন্যত্রও আছে। শেষ বর্ষণ নাটকে নটরাজ রাজাকে আহ্বান করে বলছে—

'মহারাজ এখন একবার ভিতর দিকে তাকিয়ে দেখুন—
রজনী শাঙন, ঘন দেয়া গরজন রিমঝিম শবদে বরিষে।'

'ছন্দ' গ্রন্থে ছন্দের আবেগ কীভাবে কথার অর্থের মধ্যে প্রাণের বেগ সঞ্চারিত করে অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে সেকথা বোঝাতে গিয়ে জ্ঞানদাসের পদটির বিখ্যাত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করে লিখেছেন—

> ''বাদলের রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে বিষয়টা এইমাত্র। কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালের আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল।''

জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের দুটি বিখ্যাত পদ 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' এবং 'রূপের পাথারে আঁখি

ডুবি সে রহিল'। দুটি পদই রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখা দিয়েছে। প্রথম পদটির দ্বিতীয় চরণ—'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমলের 'দেহের মিলন' কবিতায় ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে লিখেছেন—'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে'। 'রূপের পাথারে আখি ডুবিয়া রহিল।/যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।'—এই পদের উদ্ধৃতিসহ ব্যাখ্যা আছে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে। অভিধান নির্দিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করেই যে সত্যের অসীমতা প্রকাশ পায় সে কথা প্রমাণ করে পদটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধেই জ্ঞানদাসের আর একটি পদের উদ্ধৃতি আছে—

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই।।

অঙ্কের তথ্যক্ষেত্রকে প্রেমের রসক্ষেত্র যে প্রাণের মূলে অতিক্রম করে যায় সেকথাই জ্ঞানদাসের পদ্যাংশের সাহায্যে কবি বুঝিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সের রচনাতেও জ্ঞানদাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত 'রবিবার' গল্পে জ্ঞানদাসের নিবেদন পর্যায়ের সুবিখ্যাত পদ 'বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি/রূপসী তোমারি রূপে' পদটিকে অতি সুকৌশলে চমৎকার ব্যবহার করেছেন। সহপাঠিনী বিভা পরীক্ষায় অভীককে ডিঙিয়ে গিয়ে যখন অভীকের অমনোযোগিতার জন্য তাকে অনুযোগ করে বলে, ''তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে'' তখন অন্তরাল থেকে একজন বান্ধবী পরিহাস করে বলে উঠল—

'মরি মরি তোমারি গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমারি রূপে।'

পদাবলীতে যা ছিল নায়িকার নম্র নত আত্মনিবেদনের বাণী তাকে এখানে তীর্যকভাবে ব্যবহার করার ফলে চমৎকার পরিহাসবাক্য হয়ে উঠেছে। এই উদ্ধৃতি শিক্ষিতা আধুনিকা ছাত্রীর মুখে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের পদরত্নাবলী সঙ্কলনে বলরাম দাসের পদ সর্বাধিক, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে বলরামদাসের স্থান অপেক্ষাকৃত অল্প। 'প্রাচীন সাহিত্যের' অন্তর্গত সুবিখ্যাত 'মেঘদূত' প্রবন্ধে মানসলোকে বিচ্ছিন্ন প্রত্যেক মানবের মধ্যবর্তী অতলস্পর্শী বিরহের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাসের পদ (পদরত্নাবলীর ২ নম্বর পদ) ব্যবহার করেছেন। কবি লিখেছেন—

''কিন্তু একথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি।'' তাই বৈষ্ণব কবি বলেন 'তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।' একি হইল! যে আমার মনোরাজ্যের লোক সে বাহিরে আসিল কেন! এখানে তো তোমার স্থান নয়। বলরাম দাস বলিতেছেন : 'তেঁই বলরামের পহু চিত নহে স্থির।'

পদরত্নাবলীতে আছে 'তেঁই বলরামের পহুর চিত নহে থীর'—মিলনের মধ্যে বিরহার্তির প্রেম-বৈচিত্র্যানুভূতিতে বলরামের প্রভু অস্থির চিত্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতিক্ষেত্রে পদকর্তাকেই অস্থিরচিত্ত করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের আর দু-একটি ক্ষেত্রে বলরাম দাসকে ব্যবহার করেছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধে কবিতায় অস্পষ্টতার ব্যঞ্জনাকে বোঝাতে গিয়ে বলরাম দাসের পদের উল্লেখ করেছেন—'আধ চরণে আধ চলনি আধু মধুর হাস।' অপরদিকে 'ছন্দ' গ্রন্থে উল্লেখ

করেছেন বলরাম দাসের পদ থেকে একটি পংক্তি—পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে। পদরত্নাবলীতে এটি ২৭ সংখ্যক পদ।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের (১৮৭৬) অন্তর্গত 'গোবিন্দদাস' সঙ্কলন থেকে। সোনার তরীর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় আছে বর্ষার দিনে রবীন্দ্রনাথের গোবিন্দদাস পাঠের প্রসঙ্গ—

গোবিন্দদাসের পদের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় তার শব্দ ও ছন্দ। গোবিন্দদাসের যে পদটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বারম্বার উদ্ধৃত হয়েছে সেটি হল 'শরদ চন্দ পবন মন্দ' শীর্ষক পদ। পদরত্নাবলীতে এটি ১০১ সংখ্যক পদ। 'ছন্দ' প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনমাত্রার চাল বোঝাতে যেমন এটি উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি ধ্বনিপ্রধান ছন্দে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে দুই মাত্রার রহস্য বিশ্লেষণ করতে গিয়েও এই পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার 'সাহিতের পথে' গ্রন্থের 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে পদটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করে বিষয়ে ভাবে বাক্যে ও ছন্দে কবির সৃষ্টি কেমন করে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যে রসসার্থক হয়ে ওঠে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায় পদরত্নাবলীধৃত প্রচলিত পাঠের ছন্দোশিথিল রূপকে সংশোধিত করে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেছেন—প্রচলিত পাঠ—

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্লমল্লিকা মালতি যূথ
মত্ত মধুকর ভোরনি।

উদ্ধৃত পাঠ—

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে বহল (ভরল) কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথ
মত্ত মধুকর ভোরনি।

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি একজায়গায় (তথ্য ও সত্য) আছে বহল, অন্যত্র (ছন্দ) আছে ভরল। ছন্দের নিখুঁত প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত পাঠের তুলনায় উদ্ধৃতির পাঠ উৎকৃষ্ট। ১২৯১ সালে বা ১৮৮৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'রাজপথের কথা'। পথের আত্মকাহিনি বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি সুকোমল ভাবকে প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাসের মাথুর পর্যায়ের একটি বিখ্যাত পদের থেকে দুটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন। পদরত্নাবলীতে এটি ৮৪ সংখ্যক পদ। পথচারী বালক-বালিকার কোমল চরণের তলায় কঠিন রাজপথে কুসুম কোমল হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে গোবিন্দদাসের পদটি স্মরণ করছে—

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাতা।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়া মঝু গাতা।।

রাধার ব্যাকুলতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে পথের ব্যাকুলতা।

সাধনা পত্রিকায় একসময় রবীন্দ্রনাথ 'নিছনি' 'পহু' ইত্যাদি শব্দ নিয়ে যে বিদগ্ধ শব্দতাত্ত্বিক আলোচনা করেছিলেন সেগুলি শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সেই সব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাসের পদ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রায় বসন্ত বা বসন্তরামের পদ একসময় রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। ১২৮৯ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'বসন্তরায়' শিরোনামে একটি সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। ১৩০৫ সালে লেখা 'অধ্যাপক' গল্পে রোমান্টিক নায়ক মহীন্দ্রের কল্পনা বিলসিত মনে চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে রায় বসন্তের পদাংশ নায়িকা কিরণের উত্তররূপে কল্পিত হয়েছে—

'পরাণ পুতলি তুমি হিয়ে মণিহার,
সরবস ধন মোর বিদিত সংসার।'

সবশেষে লোচন দাসের পদপ্রসঙ্গ দিয়ে আপাতত শেষ করা যাক। ১৩২১ সালে লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পটি। চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি আছে। তার পরিচয় মিলবে ছিন্নপত্রাবলীতে। বাস্তব চরিত্রটিকে আরও বাস্তব রূপ দেবার জন্য লোচন দাসের একটি পদ তার মুখে বসানো হয়েছে—

'অরুণ কিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।'

বোষ্টমী লেখককে সম্বোধন করতে 'গৌর' বলে। এটি লোচনদাসের গৌরনাগর ভাবের পদ। নদীয়া নাগরীর চোখে সোনার গৌরাঙ্গের রূপদর্শন। বোষ্টমীর 'গৌর' আর নদীয়ার 'গোরা' এখানে একাকার।

রবীন্দ্র-নাটকে বৌদ্ধ আখ্যান

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক গল্পরচয়িতা নাট্যস্রষ্টা প্রভৃতি তাঁর বিচিত্রমুখী প্রতিভার গৌণ পরিচয়। সাহিত্যের যে কোনো শাখাতেই তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। তাঁর হীরকোজ্জ্বল প্রতিভার স্পর্শে মানবিক চিন্তন-মননের যে কোনো বিষয় জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। তাঁর মৌলিকতা ও অনন্যতা কোথাও ঢাকা পড়ে না।

রবীন্দ্রমানস বিকাশের ধারায় কবি রবীন্দ্রনাথ কখন যে চুপে চুপে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথে প্রদীপ্ত হয়েছেন তার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বোধ করি বলা যাবে না। তবে আপন সৃষ্টির দাক্ষিণ্যে নাট্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের আসনটি বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে পাকা হয়ে গেছে। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে তিনি প্রায় ৩৬টি বিচিত্র স্বাদের নাটক-নাটিকা রচনা করেছিলেন। এই সকল নাট্যসৃষ্টির কোনোটি কাব্যনাট্য, কোনটি কৌতুক নাট্য, কোনটি সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাট্য, আবার কোনটি রূপকধর্মী বা সংকেতাশ্রয়ী নাট্যরচনা। বলা বাহুল্য বাংলায় কবিতা ও নাট্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, সাহিত্যের আর কোনো শাখা নিয়ে বোধ করি ততখানি নয়। এই সকল নাট্যরচনার মধ্যে অন্তত ৭টি নাটকের উপাদান বৌদ্ধ আখ্যানভাগ থেকে গৃহীত। উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনাগুলি হলো—মালিনী (১৮৯৬) রাজা (১৯১০) অচলায়তন (১৯১২) ফাল্গুনী (১৯১৬) নটীর পূজা (১৯২৬) শ্যামা (১৯৩২) এবং চণ্ডালিকা (১৯৩৩)। এর মধ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে অভিনয়যোগ্য 'রাজা' নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতন' (১৯১৯) এবং 'অচলায়তনে'র লঘু সংস্করণ 'গুরু' (১৯১৮)-কে একই নাটকের রূপান্তররূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারত-অন্বেষার যুগে বৌদ্ধধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ রবীন্দ্র জীবনসাধনায় সুফলপ্রসূ হয়েছিল। একদিকে ত্রিপিটকধৃত বৌদ্ধধর্মের মানবকল্যাণদীপ্ত প্রেম-মৈত্রী-করুণা—অহিংসা, শান্তি ও সুমঙ্গলের আদর্শ যেমন তাঁকে প্রাণিত করেছিল, অন্যদিকে তেমনি উজ্জীবিত করেছিল মহাযানী বৌদ্ধ সাহিত্যের কাব্য নাট্যরসোদ্দীপ্ত সংঘাত জটিল বিচিত্র রম্য আখ্যান। ঐ সকল আখ্যানবস্তুর মধ্যে প্রতিফলিত মানবজীবনের মহত্ত্বের সন্ধান পেয়ে সেগুলির উপর আপন অভিপ্রেত ভাব-ভাবনার রঙ্ মিশিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন প্রাচীন গল্পাশ্রয়ী অথচ আধুনিক যুগভাবনার সঙ্গে অন্বিত অভিনব নাটক-নাটিকাগুলি। এই সকল নাট্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন ভারতের শান্ত-সমাহিত সুষমাকে—ভারতাত্মাকে। ফলে প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারতের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে ওঠার পথ সুগম হয়েছিল। বৌদ্ধ কাহিনির আশ্রয়ে রচিত তাঁর নাটকগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব বোধ করি এখানেই।

একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ মহাযানী বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত জাতক, অবদান প্রভৃতি সাহিত্যশাখাশ্রিত মূল আখ্যানগুলি সম্ভবত পড়েননি। সম্ভবত বলার উদ্দেশ্য,

লেখক নিজে মূল বৌদ্ধ গল্পগুলি পাঠ করেছেন এমন দাবি কোথাও করেননি। (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত 'অবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থখানি) সেক্ষেত্রে উৎসরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্যের ইংরেজি ভাষায় নিবদ্ধ সংক্ষিপ্তসার 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (Cal-1882) নামক গ্রন্থখানি। প্রতিটি নাট্যরচনার শিরোভাগে অথবা ভূমিকায় সেই উৎস নির্দেশিত হয়েছে।

বৌদ্ধ কাহিনির অনুষঙ্গে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'মালিনী' (১৮৯৬)। কাব্যভাষায় নিবদ্ধ এই নাটকের উৎসমূল 'মহাবস্তু-অবদান'-এর উপাখ্যান 'মালিন্যাবস্তু'। মালিন্যাবস্তুর কাহিনিটি সুদীর্ঘ। রাজেন্দ্রলাল সেই সুদীর্ঘ কাহিনিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল ইংরেজিতে 'The Story of Malini' শিরোনামে অনুবাদ করেন। ঐ সংক্ষিপ্ত কাহিনির নির্যাস রবীন্দ্র-চিত্তমুকুরে প্রতিচ্ছবি ফেলেছিল সংগোপনে। তাঁর অধিমানসে সংরক্ষিত মালিনীর সেই আখ্যানবৃত্তের সঙ্গে লণ্ডনপ্রবাসী কবির এক অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত যুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল 'মালিনী' নাটকের কায়ারূপ। কবি লিখেছেন, ''...স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হলো, দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে। ... অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চারণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।'' (সূচনা—'মালিনী')

মনে হয়, মালিনীর পূর্বজ্ঞাত আখ্যান কবির নির্জ্ঞান মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল, তারই অনিবার্য মানসিক প্রক্রিয়ায় তাঁর ঐ অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর হল এই যে, 'মালিন্যাবস্তু'র সুবিস্তৃত অপরিজ্ঞাত ঘটনাবৃত্তের সঙ্গে বাংলা নাটক 'মালিনী'র অদ্ভুত ভাবগত ও ঘটনাগত সাদৃশ্য। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপুষ্ট বারাণসীর মহারাজা কৃকির রুচিরা ধীমতী কন্যা মালিনী কীভাবে ব্রাহ্মণদের উদ্ধত, অশিষ্ট আচরণে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরিত্যাগ করে বিনয় ধর্মের অবতার, প্রেম-মৈত্রী-করুণার আধার ভগবান কাশ্যপ-প্রণীত আর্যধর্ম তথা সত্যধর্মের শরণ নেন এবং রাজা, রাজমহিষী রাজ অমাত্য থেকে রাজপুরীর সকল নাগরিককে আর্যধর্মে দীক্ষিত করেন—তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বিমথিত 'মালিন্যাবস্তু'র নাটকীয় আখ্যান।

বস্তুত ব্রাহ্মণ-শ্রমণ দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় শ্রমণ গৌতমের প্রেমধর্মের জয় ঘোষণা মালিন্যাবস্তুর মূল বিষয়। এই বিষয়ের সঙ্গে সমকালীন 'ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র' কেন্দ্রিত ভারতবর্ষে প্রকৃত আর্যধর্ম—সত্যধর্ম তথা প্রেমধর্মের বিঘোষণ জরুরি হয়ে পড়েছিল। 'মালিনী' নাটিকা রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ সেকথা মনে রেখেছিলেন। সুপ্রিয়-ক্ষেমংকর-মালিনী—ত্রয়ী চরিত্রের আত্মদ্বন্দ্ব ও আত্মোপলব্ধির টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত জয়ী ক্ষমাধর্মের মূর্তিমতী বাণী স্বয়ং মালিনী। ক্ষেমংকরের চারিত্রমহিমা, সুপ্রিয়ের মহান আত্মদান তার নবধর্মের পেয়ালাটিকে পূর্ণ করে তুলেছে সংসার জীবনে পরিব্যাপ্ত ধর্মের পরম উপলব্ধিতে—''যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেম-স্নেহ/যেথায় মানব যেথা মানবের গেহ।'' প্রভৃতি।

বস্তুত 'মালিন্য-বস্তু'র ভাবছায়ায় রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' মৌলিক সৃষ্টিশীলতায় প্রোজ্জ্বল। সুপ্রিয়-ক্ষেমংকর চরিত্র তাঁর গড়া বস্তু। শাস্ত্রধর্মের সঙ্গে সনাতন আর্যধর্মের মাত্রাগত স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দিয়ে মালিনীকে বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের প্রতীক করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বৌদ্ধ কাহিনির অনুষঙ্গে কবির দ্বিতীয় নাটক 'রাজা' (১৯১০, সংক্ষিপ্ত নাট্য সংস্করণ 'অরূপরতন'—১৯১৯) নাটকটির উৎস 'মহাবস্তু অবদান'-এর অন্তর্গত 'কুশজাতক'। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ 'কুশজাতক'-এর আখ্যান 'The Story of Kusa'-এর ভাবছায়া অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটক রচনা করেন। কুশজাতকের বহুধা প্রসারি মূল কাহিনির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না।

বারাণসীর মহারাজা ইক্ষাকু ও মহিষী অলিন্দার কুৎসিত-কুরূপ পুত্র শুদ্ধকুশ বা কুশ ছিলেন পরাক্রমে অদ্বিতীয় এবং অশেষ গুণশালী। মহারাণী অলিন্দার সুকৌশলে মদ্রকরাজদুহিতা সর্বকলাযুতা প্রিয়দর্শিনী সুদর্শনার সঙ্গে বিকৃতদর্শন কুশের বিবাহ হয়। অন্ধকার গর্ভগৃহে বর-বধূ তাঁদের মধুযামিনী যাপন করতেন। সুদর্শনা কুশকে দিনের আলোয় দেখতে চান কিন্তু ধরা পড়ে যাবার ভয়ে নানা অছিলায় কুশ তাঁকে এড়িয়ে যান। অতঃপর বৈমাত্রেয় দেবর রূপবান নকল কুশবেশী কুশদ্রুমকে দেখে স্বামীগর্বে তাঁর মুগ্ধতা, অলিন্দার মিথ্যা ছলনার জাল থেকে তাঁর মুক্তি, তীব্র ঘৃণা ও অন্তর্দাহে জর্জরিতা সুদর্শনার স্বামীগৃহ ত্যাগ ও কাহ্নকুব্জ গমন, প্রতিবেশী রাজাদের সুদর্শনা জয়ের লোভ এবং উদ্দেশ্য সফল না হলে কাহ্নকুব্জ আক্রমণের হুমকি, ভীত-সন্ত্রস্ত মহারাজ কর্তৃক সুদর্শনাকে তিরস্কার এবং সাম্রাজ্য আক্রান্ত হলে তাঁকে সাতটুকরো করে কেটে সাতরাজাকে পাঠাবার পরিকল্পনা ("যদি মে এতেষাং সপ্তানাং কোচি হেঠাৎ উৎপাদয়িষ্যতি ততো সপ্তখণ্ডানি কৃত্বা তেষাং সপ্তানাং রাজ্ঞা মেকমেকং খণ্ডং দাস্যামি।" কুশজাতক, মহাবস্তু অবদান-৪৮৬), সুদর্শনাবিরহে উন্মত্ত অধীর কুশের ছদ্মবেশে কাহ্নকুব্জে গমন এবং অবিশ্বাস্য দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে রাজপরিবারের সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠা, অমিত বিক্রমে শ্বশুরের আক্রান্ত রাজধানী রক্ষা করে বিদ্রোহী সাত রাজাকে বন্দি করে মহারাজের বশ্যতা স্বীকার করানো এবং সুদর্শনার মনোজিৎ হয়ে ওঠা, স্বচ্ছ নদীজলে নিজের কদাকার চেহারা দেখে আত্মদহনদগ্ধ কুশের আত্মহনন-প্রয়াস, ইন্দ্রকর্তৃক 'জ্যোতীরস' মণিপ্রদানের ফলে তাঁর সুদর্শন ও রূপবান হয়ে ওঠা এবং সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা, তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধন শেষে বর-বধূর সুমঙ্গল মিলন—প্রভৃতি একগুচ্ছ জটিল ঘটনার আবর্তে মহারাজা কুশের যশোগাথা ও মহারাণী সুদর্শনার মানস-উত্তরণের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে মূল কাহিনিতে। মূল কাহিনির উপসংহার থেকে জানা যায়, মহামতি বুদ্ধই ছিলেন সেই কুশ, কাহ্নকুব্জরাজ মহেন্দ্রক মহানাম, অলিন্দা মায়া, সুদর্শনা যশোধরা আর বিদ্রোহী সাত রাজা যথাক্রমে মার এবং তার সঙ্গী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ড. রাধাগোবিন্দ বসাক-সম্পাদিত মহাবস্তু অবদানের অন্তর্গত 'কুশজাতক' আখ্যানের সঙ্গে ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনূদিত কুশজাতকের আখ্যানে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

যাই হোক, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ 'The Story of Kusa'-এর মধ্যেই নাট্য রসের নানা উপাদানের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন। সুদর্শনার রূপমোহ, অন্তর্দাহ ও আলোর পিপাসাকে কাজে লাগিয়ে তিনি রচনা করলেন রূপক সাংকেতিক নাটক 'রাজা'। কল্পনার অভিনবত্বে, বিষয়বস্তুর অসাধারণত্বে, রচনার চারুত্বে, অনুভূতির নিবিড়তায়, রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং সাংকেতিক-ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা প্রয়োগের চাতুর্যে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। বস্তুত 'রাজা' নাটক কবির একটি বিশেষ ভাব-তত্ত্ব বা আদর্শপ্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। কবি নিজে এই নাটককে বলেছিলেন, 'Inner drama of the Soul'। ভক্ত ও ভগবানের স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং প্রেমের জগতে তাদের মিলন—এই মূল ভাবটি অভিব্যক্ত হয়েছে রাজা নাটকে। সাংকেতিক নাটক বলেই

এতে তিনি কতকগুলি প্রতীকধর্মী শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাজা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান, রাণী সুদর্শনা বদ্ধজীব (জীবাত্মা)। ভগবৎ-সাধনা—প্রেমের সাধনা। বিভিন্ন চরিত্রাশ্রয়ে সেই প্রেম-সাধনার বিভিন্ন ভাব ও রসের পর্যায়গুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাজার সঙ্গে সুদর্শনার সম্পর্ক বর-বধূর, সুরঙ্গমার দাসীর, ঠাকুরদার বন্ধুর। রাজাকে সুদর্শনা পেয়েছেন দাম্পত্য প্রেমে (অর্থাৎ মধুরভাবে), সুরঙ্গমা দাস্যভাবে এবং ঠাকুরদা রস ও আনন্দের পথে বন্ধুভাবে। কাঞ্চীরাজ নাস্তিকতার প্রতিমূর্তি। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, উত্থান-পতনে সুদর্শনা, সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, কাঞ্চীরাজ—সবাই শেষ পর্যন্ত রাজার (ভগবানের) পায়ে আত্মনিবেদন করেছেন।

পরবর্তীকালে 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতন'-এর ভূমিকায় নাট্যবিষয়ের তাৎপর্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে—''সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন-জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। ... তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দ রসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ আখ্যানধর্মী তৃতীয় নাটক (নাটিকা) 'অচলায়তন' (১৯১২)। নাটকটির কাহিনীসূত্র 'দিব্যাবদান মালা'র অন্তর্গত পঞ্চকের আখ্যান (The Story of Panchaka)। অচলায়তনের পরবর্তী সংক্ষিপ্ত নাট্যসংস্করণ গুরু (১৯১৮)। পঞ্চকের কাহিনি সংক্ষেপে এইরূপ—এক ব্রাহ্মণের অনেকগুলি সন্তান পরপর ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়। পরে অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণ-শ্রমণদের আশীর্বাদে একটি সন্তান বেঁচে যায়। তার নাম পঞ্চক। অতঃপর আরও একটি সন্তান রক্ষা পায়। তার নাম মহাপঞ্চক। বড়ো হয়ে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক উভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কালক্রমে মহাপঞ্চক একজন মহাজ্ঞানী হয়ে অর্হত্ব অর্জন করে, আর পঞ্চক মহামূর্খই থেকে যায়। সেজন্য মহাপঞ্চক তাকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিতাড়িত পঞ্চক দুঃখে রাস্তার পাশে বসে কাঁদতে থাকে। ভগবান বুদ্ধ তাকে সেই অবস্থায় দেখে বিহারে নিয়ে আসেন। একজন ভিক্ষুর উপর পঞ্চকের ভার অর্পিত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই সে অর্হত্ব লাভ করে। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই নাকি বর্তমান জন্মে তার পক্ষে অর্হত্ব লাভ সম্ভব হয়েছিল।

দিব্যাবদান-কাহিনির এই ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'অচলায়তন'। চরিত্রের নামগুলি ছাড়া অচলায়তনের বক্তব্যের সঙ্গে পঞ্চকের কাহিনির আর কোনো যোগ নেই। অচলায়তন নাটকে তিনি অন্ধসংস্কার ও জরাজীর্ণ আচারসর্বস্ব ধর্মকে (তাঁর ভাষায় ধর্মতন্ত্রকে) বিদ্রূপ করেছেন এবং সংস্কারমুক্ত মানবধর্মের (সত্যধর্মের) জয়গান করেছেন। নাটকের মহাপঞ্চক জীর্ণ, স্থিতিশীল অন্ধ সামাজিক আচার নিষ্ঠার আর পঞ্চক মুক্তিপিপাসু মানবাত্মার প্রতীক। আবার মহাপঞ্চক জ্ঞান, শোনপাংশুগণ কর্ম এবং দর্ভকগণ ভক্তিমার্গের পথিক।

আর্যগুরু প্রতিষ্ঠিত এবং আচার্য অদীনপুণ্য লালিত মহান বিদ্যামন্দির কালক্রমে অন্ধসংস্কারবদ্ধ অচলায়তনে পরিণত হয়। নিয়মের দাসত্ব আর প্রাণহীন অভ্যাসে সেখানকার মানুষগুলোও কেমন

মানবিক বোধ-বুদ্ধিহীন যন্ত্রে পরিণত হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম পঞ্চক। সে নিয়মের দাসত্ব করে না, মন্ত্র-তন্ত্র আবৃত্তি করে না, আচার-বিচারের ধার ধারে না। অচলায়তনের বদ্ধ কারাগার থেকে মুক্তির জন্য তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। সুযোগ পেলেই সে অচলায়তনের বাইরে গিয়ে অচ্ছুৎ দর্ভক ও শোনপাংশুদের দলে মেশে। ওদের মাঝখানেই সে যেন মুক্তির স্পর্শ পায়—''এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে, আমার সমস্ত শরীরটা গুণগুণ করে বেড়াচ্ছে।'' অচলায়তনের বাইরে মুক্ত-আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন একমাত্র দাদাঠাকুর। দাদাঠাকুর আনন্দের দূত।

এদিকে মহাপঞ্চকের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও আচার-নিষ্ঠায় অচলায়তন যখন পাপে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, পঞ্চকের আলোর পিপাসাও (মুক্তির পিপাসা) হয়েছে তীব্রতর—সেই চরম মুহূর্তে যোদ্ধৃবেশে গুরু এসে অচলায়তনের সংস্কারদুর্গ চূর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিলেন। তারপর গুরু পঞ্চকের উপর ভার দিলেন নতুন আয়তন গড়ে তোলার যা কোনো দিন অচল হবে না, যা মহাপঞ্চক (জ্ঞান), শোনপাংশু (কর্ম) ও দর্ভকদের (ভক্তি) নিয়ে পূর্ণ হবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে 'অচলায়তন' হলো বিদ্যায়তনকেন্দ্রিত রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্ন যে পীঠস্থানে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে একটি সজীব-সচল মহামিলন মন্দির গড়ে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

বৌদ্ধ ভাবনার অনুষঙ্গে কবির লেখা চতুর্থ নাটক 'ফাল্গুনী' (১৯১৬)। 'শারদোৎসব' (১৯০৮) নাটকে যেমন গান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, 'ফাল্গুনী'-তেও তেমনি। এই গীতিনাট্যে গান দিয়ে প্রতিটি দৃশ্যের সূচনা। গদ্যাংশ গীতিরসসিক্ত এবং রূপকাশ্রিত। পালি মখাদেব জাতকের ক্ষীণ কথাবস্তু অবলম্বনে নাটকটি রচিত। মিথিলার নরপতি মখাদেবের কেশপ্রসাধক কল্পক মহারাজের কেশরাজির মধ্যে দুইগাছি পাকা চুল আবিষ্কার করলে মৃত্যুভয়ভীত মহারাজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন। এই ঘটনাটিকেই জীবন-মৃত্যু রহস্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' রচনা করলেন। মানুষের জীবনধারা যে জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে নবজীবনের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে প্রাগ্রসর—এই সত্যকে তুলে ধরেছেন কবি। 'কান্না-হাসির দোলদোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা' গানটি এই ভাবনারই দ্যোতক। ''মানব জীবনের আরম্ভ জন্মে নয়, অবসানও মৃত্যুতে নয়। জীবন-মৃত্যু দুই তোরণের ভিতর দিয়া জীবনের প্রবহমান পথ প্রসারিত—ইহাই ফাল্গুনীর বাণী।'' এই মর্মবাণীটি কলকাতায় 'ফাল্গুনীর' অভিনয় উপলক্ষে একটি পত্রে সাজোজ্জ্বল করে তুলেছিলেন—''ফাল্গুনীর' ভিতরের কথাটি অতি সরল। সে হচ্ছে এই যে জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়। পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক। ওর সামনের দিকটা যৌবন। ... ফাল্গুনীতে গীতিনাট্যাংশটুকু হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে নানা ঋতুর তোরণদ্বার দিয়ে একই পুরাতনের নবীন হওয়ার লীলা আর তারই সঙ্গে যে নাট্যটুকু আছে তার মধ্যে মানুষের যৌবন জরার অনুসরণ করতে গিয়ে কেমন করে মৃত্যুগুহার ভিতর দিয়ে নবজীবনে উত্তীর্ণ হয় সেই বর্ণনা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে লীলা শীতবসন্তে মানব প্রকৃতিতে সেই লীলা জরাযৌবনে, জন্মমৃত্যুতে। এই কথাকেই গীতে এবং নাট্যে ফাল্গুনীতে প্রকাশ করা হয়েছে।''

রবীন্দ্রনাথ 'পূজারিণী' কবিতার নাট্যরূপ 'নটীর পূজা' রচনা করেন ১৯২৬ সালে। বৌদ্ধ কাহিনীর মূল ঘটনাবৃত্ত 'অবদানশতক' থেকে গৃহীত। বুদ্ধোপাসক বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের সূচনা করে যে হিংসানল প্রজ্জ্বলিত করেছিল তার লেলিহান শিখা কেমনভাবে রাজান্তঃপুরচারিণী প্রেমধর্মের অনুরাগিনী সুগতোপাসিকা শ্রীমতীকে

গ্রাস করেছিল তারই নাটকীয় রোমহর্ষক বর্ণনা আছে অবদান শতকের 'শ্রীমতীতি' আখ্যানে। এই আখ্যানটিকে রবীন্দ্রনাথ আদর্শের জন্য মহান আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে অহিংসা ও প্রেমধর্মের জয় ঘোষণা করেছেন। কেবল পাঠ্য নাটিকা (Reading Drama) রূপেই নয়, সংবেদনশীল, মর্মস্পর্শী করুণরসসিক্ত নাটিকা হিসেবেও 'পূজারিণীর' আবেদন অসামান্য—

"সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।"

রাজেন্দ্রলালের সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ "The Story of Srimati" কী অসামান্য কল্পনা ও অনুভূতির নিবিড়তায় রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় সৃষ্টি 'পূজারিণী' থেকে 'নটীর পূজায়' উত্তীর্ণ হয়েছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

'মহাবস্তু অবদান'-এর 'শ্যামাজাতক' (রাজেন্দ্রলালের অনুবাদে 'The Jataka of Syama') অনুসরণে রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'পরিশোধ' (কথা, ১৮৯৯)। শ্যামাজাতকে পূর্বজন্মের স্মৃতিচারণাসূত্রে ভগবান বুদ্ধ কেন তাঁর বিশ্বস্ত মহিষী যশোধরাকে ত্যাগ করেছিলেন তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্যামা-বজ্রসেন কাহিনির উল্লেখ করেন। ভগবান বুদ্ধই একজন্মে ছিলেন বজ্রসেন আর শ্যামা যশোধরা।

বারাণসীর গণিকা প্রধানা সুন্দরী শ্যামা কীভাবে অশ্বব্যবসায়ী কিন্তু বর্তমানে চুরির দায়ে অভিযুক্ত প্রিয়দর্শন যুবক বজ্রসেনের রূপে মুগ্ধ হন এবং কামনার দহনে পুড়ে পুড়ে শেষ পর্যন্ত বিরহদীর্ণ জীবনযাপনে বাধ্য হন তার চমকপ্রদ নাটকীয় আখ্যান রয়েছে শ্যামা জাতকে। 'পরিশোধ' কবিতা রচনাকালে কবিতাটির মধ্যে Lyric-এর আধিক্য সত্ত্বেও নাট্যগুণের সমাবেশ লক্ষ করে কবি তার নাট্যরূপ 'শ্যামা' রচনা করেন ১৯৩৯ সালে।

শ্যামা-বজ্রসেন-উত্তীয় (শ্যামার পূর্বপ্রণয়ী) কেন্দ্রিক ইতিবৃত্তকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন তাতে বৌদ্ধ আখ্যানের মূল Spirit-টি অক্ষুণ্ণ রেখেও শিল্পের দায় কেমন করে প্রায় মৌলিক সৃজনধর্মে প্রোজ্জ্বল এক রসসৃষ্টি গড়ে তুলতে পারে তার পরিচয় মেলে। মূল কাহিনীর কামনাময়ী শ্যামার রূপাসক্তি প্রেমিক বজ্রসেনের নিষ্ঠুর প্রত্যাখানে বারংবার বিধ্বস্ত হয়েছে এবং কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্বে পরিণামে প্রেমেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। প্রকৃত প্রেম কেবল আত্মগ্রহণেই তৃপ্ত নয়, ত্যাগেও দীপ্ত। রূপজীবিনী শ্যামার ত্যাগোদ্দীপ্ত প্রেমিকা শ্যামায় উত্তরণের স্তরগুলি অত্যন্ত নাটকীয় এবং সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক।

বৌদ্ধ আখ্যান-আশ্রিত আর একটি নৃত্যনাট্য, বোধকরি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সেরা নৃত্যনাট্য, 'চণ্ডালিকা' (নাটিকা-১৯৩৩, নৃত্যনাট্য-১৯৩৮)। 'দিব্যাবদানমালা'র অন্তর্গত 'শার্দূলকর্ণাবদান'-এর কাহিনি অবলম্বন করে এই নাটিকাটি রচিত। মূল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নাট্যকার নিজেই উল্লেখ করেছেন নাটিকার ভূমিকায় নাট্যপরিচয় অংশে। গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। ভগবান বুদ্ধ তখন গৃহী-শিষ্য অনাথপিণ্ডদের উদ্যানবাটিকায় বিশ্রামরত। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে

আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার যাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই যাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালিনীর বশীকরণ বিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ইংরেজি অনুবাদকে কত সহজে উজ্জীবন্ত এক চমৎকার গল্পের অবয়ব দিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'শার্দূলকর্ণাবদান'-এর মূল কাহিনির যে বিস্তার-বৈচিত্র্য রাজেন্দ্রলাল ত্যাগ করেছিলেন, কল্পনা, অনুভব ও উদ্ভাবনীশক্তির জোরে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই সেই মাত্রা স্পর্শ করেছেন যদিও ত্রিশঙ্কু-পুষ্করসারি প্রকৃতির আখ্যান সেখানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে।

অন্যান্য নাটক-নাটিকার মতোই 'চণ্ডালিকা' রবীন্দ্র ভাবাদর্শ প্রচারের বাহন হয়ে উঠেছে। অস্পৃশ্যতা, জাত-পাতের বিচার, ছুঁৎমার্গ, আচারসর্বস্বতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিগুলি যে শাশ্বত মানবধর্ম বিকাশের অন্তরায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য লেখায় বার বার তা বলেছেন। নাটক গণ-সংযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলেই বোধ করি তিনি 'চণ্ডালিকা'য় গণশিক্ষার জন্যই গণব্যাধি নিরাময়ের একটা সুযোগ করে নিয়েছেন। প্রকৃত মানবপ্রেমী ধার্মিকের যে জাতি বিচার, ছোঁয়াছুঁয়ির গোঁড়ামি, উচ্চ-নীচ, ছোটো-বড়ো প্রভৃতি ভেদবুদ্ধি থাকে না—সর্বত্যাগী মহান সন্ন্যাসী (শ্রমণ) আনন্দের চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির কাছে জল প্রার্থনায় সে সত্য সপ্রমাণ হয়েছে। আনন্দের প্রার্থনা—'জল দাও আমায় জল দাও। আমি যে পিপাসিত/আমায় জল দাও।'—তৃষ্ণার্তকে জলদান মানবিক সেবাধর্ম। এতে জাতিগত অবস্থানের প্রশ্ন ওঠে কি করে? আনন্দের শেষ কথা—''যেই মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা/সেই বারি তীর্থবারি/যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে।''—যুক্তি ও আদর্শের কি আশ্চর্য বেণীবন্ধন এই বাণীতে! মূল কাহিনিতে অবশ্য এ জাতীয় অনুভবের কথা প্রকাশ্যে নেই, তবে ব্যঞ্জনায় অবশ্যই আছে। না হলে মহাতাপস আনন্দ দেশাচার লঙ্ঘন করে অন্তজকন্যা প্রকৃতির কাছে জল চাইবেন কেন?

চণ্ডালিকাকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের যুক্তিবাদিনী, স্বাধিকারসচেতনা নারীর প্রতীক করে তুলেছেন। সমাজের অবহেলিত—দলিত মনুষ্যত্বের মর্মকথা তার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। মূল কাহিনির প্রকৃতির তীব্র ভোগ-লালসার উষ্ণতা 'চণ্ডালিকায়' আনন্দের প্রশান্ত ক্ষমাগুণে শ্যামার মতোই পবিত্র-নির্মল প্রেমে পরিণত হয়েছে। ফলত নাটিকাটিতে বৌদ্ধ ধর্মানুগ প্রেম ও করুণার আদর্শই হয়েছে জয়যুক্ত।

বস্তুত ভাবের সৌকর্য্যে, ভাষার চারুত্বে, নৃত্য ও কাব্যগুণে এবং সর্বোপরি নাটকীয়তায় 'চণ্ডালিকা' রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সৃষ্টি—Masterpiece।

রাজায় রাজায় : শেক্‌সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের রাজ-ভাবনা

দীপেন্দু চক্রবর্তী

শেক্‌সপীয়র ছিলেন রাজসভার কবি; রাজতন্ত্রে পালিত হওয়ায় তাঁর বিশেষ দায়বদ্ধতা ছিল রানি এলিজাবেথ ও রাজা জেমসের প্রতি। রবীন্দ্রনাথের সেরকম দায়বদ্ধতা ছিল না, যদিও তাঁর দেশেও এক রাজা ছিলেন—সাগরপারের ইংরেজ রাজা। সেই রাজা তাঁকে স্যার উপধি দিয়েছিলেন, হয়তো এই আশায় যে তিনি রাজকবির প্রত্যাশিত আনুগত্য দেখিয়ে যাবেন। অথচ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর স্যার রবীন্দ্রনাথ রাজদত্ত উপাধিটিই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যে-রাজা প্রজাপীড়নে প্রসন্ন হন তিনি, রবীন্দ্রনাথের মতে, আর যাই হোক রাজা নামের যোগ্য নন। প্রকৃত রাজা তাঁর প্রজাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সার্থকনামা হয়ে ওঠেন। একের পর এক নাটকে রবীন্দ্রনাথ এক আদর্শায়িত রাজার মূর্তি গড়েছেন। সত্যিকারের কোনো ঐতিহাসিক রাজা বা কোনা ঐতিহাসিক সময়ের রাজবংশের গৌরবগাথা তিনি রচনা করেননি, যেমন করেছিলেন শেক্‌সপীয়র তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে। সেখানে তিনি টিউডর মতাদর্শের প্রভাবে রাজতন্ত্রকে এক দৈবলীলা হিসেবে দেখেছেন; রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ, তাই রাজতন্ত্রে বিদ্রোহী বা পরম্পরা ভঙ্গকারীর যথার্থ শাস্তি দেখিয়েছেন যত্নসহকারে। শেক্‌সপীয়রের কাছে পঞ্চম হেনরি সফল রাজা, যেহেতু তিনি জানেন রাষ্ট্রের ঐক্য কীভাবে রক্ষা করতে হয়, যার জন্য এককালের সাথী ফলস্টাফকেও তিনি সর্বসমক্ষে পরিত্যাগ করেন। আধুনিক অর্থে যাকে রাজনীতি বলে তার সঙ্গে রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ব্যবস্থাপনা মিশিয়ে শেকসপীয়র যে-রাজার ছবি এঁকেছেন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাজার কোনো মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের আমলে ভারতবর্ষে বহু দেশীয় রাজা ছিলেন; ত্রিপুরার মহারাজার সঙ্গে তাঁর সখ্যতা সুবিদিত। কিন্তু তিনি নাটক লেখার সময় রাজতন্ত্রের জটিল বাস্তবতার দিকে নজর না দিয়ে বার বার রাজার আদর্শরূপটির সংকেত ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলত তাঁর নাটক হয়ে উঠেছে রূপকধর্মী—রাজধর্মের একটি ইউটোপিয়ান ধারণার চারপাশে আবর্তিত হয় তাঁর নাট্যচেতনা। রাজধর্মে আত্মমগ্নতার স্থান নেই (রাজা ও রাণী); রাজা অদৃশ্য অথচ সর্বত্র বিরাজমান, জাগতিক অর্থে অসুন্দর অথচ অলৌকিক সৌন্দর্যের আধার (রাজা); প্রজা-বিচ্ছিন্ন রাজার অস্তিত্ব খাঁচায় বন্দি প্রাণীর মতো, তাঁর মুক্তি সম্ভব এই খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে জনতার সঙ্গে একাত্ম হবার আকাঙ্ক্ষায় (রক্তকরবী)।

শেক্‌সপীয়র তাঁর ‘কিং লিয়র’ নাটকে রাজা লিয়রকে ঘটনাচক্রে নিঃস্ব মানুষের মুখোমুখি করে দিয়ে তাঁকে বুঝতে দিয়েছিলেন আদিম মানবিকতাই আসল সত্য, রাজ ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা অর্থহীন। ‘কিং লিয়র’ নাটকের এই বিশেষ উপলব্ধিই যেন রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে নানান রূপ নিয়ে উপস্থিত। আধুনিক ইংরেজ নাট্যকার এডওয়ার্ড বণ্ড তাঁর ‘লিয়র’ নাটকে শেক্‌সপীয়রের নাটকটিকে ভেঙ্গেচুরে যে চেহারা দিয়েছেন তা যেন রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবীর’ ভাবাদর্শে তৈরি। সেখানে লিয়র

নিজেকে খাঁচায় বন্দি জন্তু হিসেবে দেখে শিউরে ওঠেন, এবং পরিশেষে নিজের রাজকীয় ক্ষমতার স্বার্থে রাজ্য জুড়ে যে-দেয়াল তিনি তৈরি করেছিলেন তা-ই ভাঙ্গতে গিয়ে তিনি খুন হন ক্ষমতাশীল মানুষের হাতে।

লক্ষণীয় যে শেক্সপীয়র ও বণ্ড দুজনেই রাজার মৃত্যু দেখিয়েছেন; রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজা ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে তাঁর মৃত্যুহীন মহিমাই প্রাধান্য পায়। এ রাজার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনার সাদৃশ্য প্রায়শই ধরা পড়ে। 'ডাকঘর' নাটকে রাজা তো এমনই এক ঈশ্বর যিনি মরণের পথ ধরে মহাজীবনের সংকেত পাঠান। 'বিসর্জন' নাটকে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই শেক্সপীয়রের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন; প্রতীকী ভাবমূর্তি গড়ে রাজমহিমার কোনো মেটাফিজিকাল তত্ত্ব রচনা করেননি। এ নাটকের ঐতিহাসিকতা একটি স্মরণীয় ঘটনা; কিন্তু ধর্ম ও রাজনীতির যে সংঘাত আমরা টি.এস. এলিয়টের 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রালে' দেখতে পাই এখানে তার বৈপরীত্য লক্ষণীয়। রাবীন্দ্রিক রাজার নীতি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পরাজয় ঘটিয়ে জনকল্যাণের বিজয় ঘোষণা করে। শেক্সপীয়র রাজপ্রাসাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তার পেছনে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তববাদী চেতনা। রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট ছিল বাস্তবের আড়ালে যে সত্য তার উন্মোচন। তাই ইতিহাসের রাজাকে ছেড়ে তিনি 'রাজা' এই ধারণাটির নিজস্ব এক দর্শন রচনা করেছেন। তাঁর নাটকের রাজা শেক্সপীয়রের রাজাদের চেয়ে নাট্যরসের দিক থেকে কম আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু মানবকল্যাণের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের রাজ-ভাবনার গুরুত্ব অনেক বেশি। টলস্টয় শেক্সপীয়রকে খারিজ করেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের রাজ-বিষয়ক নাটক পড়লে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাতেন।

উনিশ শতকের পত্রপত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ

স্বপন বসু

বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র দুয়েরই কুণ্ঠিত আবির্ভাব ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। খুব অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকা প্রকাশের গুরুত্ব শিক্ষিতবাঙালি সমাজ বুঝতে পারেন। ফলে নানাধরনের পত্রিকা প্রকাশে তাঁরা এগিয়ে আসেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পত্রিকা প্রকাশের ঝোঁক এতই বেড়ে যায় যে, একালের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' ১৮৪০-এই বলতে বাধ্য হয়, কলকাতা শুধু প্রাসাদনগরীই নয়, পত্রিকানগরীও বটে।

ঠিক কত বাংলা পত্রিকা উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল বলা মুশকিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র' গ্রন্থের দু-খণ্ডে ১০৪৬টি পত্রিকার কথা বলেছেন। পরবর্তী অনুসন্ধানে আরও শতাধিক পত্রপত্রিকার খোঁজ মিলেছে। সব মিলিয়ে উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার সংখ্যাটা বারোশোর কম নয়।

কত ধরনের পত্রিকা যে উনিশ শতকে বেরিয়েছে তার ঠিক নেই। সংবাদপত্র তো ছিলই। এগুলি ছাড়া অনেকগুলি সাহিত্য পত্রিকার (কিছু নামি কিছু অনামি) আবির্ভাব ঘটেছে উনিশ শতকে। ধর্মীয় বাদানুবাদে মুখর উনিশ শতকে যে প্রচুর পরিমাণে ধর্মবিষয়ক পত্রিকা বেরোবে—এটা তো খুবই স্বাভাবিক। তাই উনিশ শতকে খ্রিস্টানরা যেমন নিজেদের কথা প্রচার করবার জন্য একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, তেমনি এ ব্যাপারে ব্রাহ্ম বা হিন্দুরাও পিছিয়ে থাকেননি। এইকালে বাঙালি মেয়েদের কথা বিশেষভাবে বলার জন্য প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি পত্রিকা। মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়ার কথা বলার মতো পত্রিকার অভাবও এযুগে হয়নি। উনিশ শতকে বাঙালিসমাজের ব্যাপক ও বহুমুখী পরিবর্তনকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করার মনোভাব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'বসন্তক', 'হরবোলা ভাঁড়', 'হুতোম', 'গোপালভাঁড়', 'নদেরচাঁদ', 'রসিকরাজ'-এর মতো রঙ্গব্যঙ্গের কাগজ। বিজ্ঞানের চর্চা বা বাঙালির মনকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার লক্ষ্য নিয়েও বেরিয়েছে বেশ কয়েকটি পত্রিকা। কখনও বাঙালিকে স্বাস্থ্যসচেতন, কখনও আবার রাজনীতিমনস্ক করে তোলার জন্যও পত্রিকা বেরিয়েছে। শিশু-কিশোরদের জন্য পত্রিকা বেরিয়েছে, বেরিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের জন্যও। শিক্ষাসংক্রান্ত কাগজ যেমন বেরিয়েছে, তেমনই বেরিয়েছে খেলাধূলার কাগজও। সামাজিক কোনও কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করার লক্ষ্য নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছে কিছু পত্রিকার। সুরাপানের কুফল বোঝানোর জন্য বেরিয়েছে 'মদ না গরল?' বা 'বিষবৈরী'র মতো পত্রিকা, আবার বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বেরিয়েছে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ'-এর মতো পত্রিকা।

২

বাংলা পত্রিকা প্রকাশনা যখন অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে, সেই সময়কালেই রবীন্দ্রনাথের

আবির্ভাব। যে কালে তিনি ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে উঠছেন, সেই সময়টাকে বাংলা সাময়িকপত্রের স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। নিতান্ত শৈশবকালেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন পত্রপত্রিকার নিবিষ্ট পাঠক। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ'-এর কাহিনি পরিজনদের পড়ে শোনানোর কথা বা 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের পৌল বর্জিনীর উপাখ্যান পড়তে পড়তে নির্জন দুপুরে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠার কথা তো তিনি নিজেই বলে গেছেন।

উনিশ শতকের বাংলা পত্রপত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি—

ক. পত্র পত্রিকার লেখক হিসাবে

খ. পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে

গ. পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয় হিসাবে।

উনিশ শতদের পত্রপত্রিকাগুলিতে ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্ররচনার প্রথমদিকের অজস্র নমুনা। শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ২৫.২.১৮৭৫-এ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি কবিতা। এরপর 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', 'বান্ধব', 'ভারতী', 'প্রচার', 'বালক', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'হিতবাদী'-র মতো পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে রবীন্দ্রনাথের একের পর এক লেখা। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনি কী-না লিখেছেন তিনি। এইসব রচনার সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনাকালে বারবার তাই এইসব পত্রিকার নাম এসে পড়ে। উনিশ শতকের আরও যেসব কাগজে তিনি লিখেছিলেন, তার একটি হচ্ছে 'উৎসাহ'। রাজশাহি থেকে প্রকাশিত এই সাহিত্য পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশের গৌরব দাবি করতে পারে।

উনিশ শতকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লেখা নিয়ে রীতিমতো বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহন সম্পর্কে তাঁর লেখাটির কথাই ধরা যাক। দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাহ' পত্রিকায় এই লেখাটির তীব্র সমালোচনা করেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায়। রবীন্দ্রনাথ-মহেন্দ্রনাথের এই বিতর্কে 'পাক্ষিক সমালোচক' নামে একটি পত্রিকা জড়িয়ে পড়ে। ১২৯১-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত একটি লেখায় পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে সমর্থন করে। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত উনিশ শতকে অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসেন 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকমণ্ডলীও।

শুধু লেখক রূপেই নয়, উনিশ শতকের একাধিক পত্রিকার সম্পাদকরূপেও আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই। ১৮৯১-এ প্রকাশিত 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের দেখাশোনার কাজটা কিছুদিন তিনি করেন। এই কালেই ঠাকুরবাড়ির আঙিনা থেকে প্রকাশিত হয় 'সাধনা'। জন্মলগ্ন থেকেই পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের অজস্র লেখায় পুষ্ট। বছর তিনেক চালানোর পর সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন। ফলে চতুর্থ বর্ষের 'সাধনা' সম্পাদনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের ওপরেই এসে পড়ে। বেশিদিন এই দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়নি। ১৩০২-এর ১৫ ভাদ্র 'সাধনা'-র শেষ সংখ্যাটি ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক-এই তিনমাসের সম্মিলিত সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। 'সাধনা' বন্ধ হয়ে যাবার বছর আড়াই

পরে কিছুদিনের জন্য ১৩০৫ বঙ্গাব্দ ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি বহন করেন। ‘সাধনা’ চার বছর চলে বন্ধ হয়ে গেলেও, ভারতী চলেছিল দীর্ঘদিন। তবু রবীন্দ্রনাথ কেন এক বছরের বেশি ‘ভারতী’ সম্পাদনার দায় বহন করলেন না—সে সম্পর্কে সমকালীন একটি পত্রিকার মতামত একনজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে :

‘ভারতী-ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৫—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বৎসর এই পত্রিকার ভার বহন করিয়া আবার পূর্ব্বতন সম্পাদিকাদিগেরই উপর ইহা ন্যস্ত করিতেছেন। কারণ একা সব কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না। আশা করি, সম্পাদিকাগণ আবার পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলেখকদিগের সাহায্য স্থির রাখিতে পারিবেন। সম্পাদকের কার্য্যত্যাগের সহিত মতবাদের একটু পরিবর্তন আশা করা যায়।’ (এডুকেশন গেজেট, ১২.৯.১৮৯৯) বোঝাই যাচ্ছে, সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সবাইকে অন্তত খুশি করতে পারেনি।

শুধু লেখক বা সম্পাদক হিসাবেই নয়। অন্যভাবেও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ উনিশ শতকের পত্রিকাগুলিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বই পত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে ‘বান্ধব’, ‘এডুকেশন গেজেট’, ‘সাধারণী’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘সাহিত্য’ ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায়। কখনও তাঁর কবিতাপাঠের, কখনও তাঁর বক্তৃতার, কখনও আবার তাঁর সুকণ্ঠের প্রশংসা উনিশ শতকের পত্রপত্রিকার পাতা ওলটালেই মেলে। এই শতকের পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা কবিতা আমাদের চোখে পড়েছে। ১৮৯৯-এর আগস্ট মাসে ‘প্রয়াস’ নামক একটি পত্রিকায় চঞ্চলাবালা দাসীর ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-বিরোধিতাও শুরু হয় এইকালে। রবীন্দ্র-রচনাকে উনিশ শতকের সমালোচকরা কী দৃষ্টিতে দেখতেন তার একটু নমুনা দেখা যাক।

‘রবীন্দ্রনাথ একজন সুকবি বটে কিন্তু শেলির ন্যায় তাঁহার একটি মহৎ দোষ আছে—অপরিস্ফুটতা।’ (প্রয়াস, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯) দোষ-গুণ যাই থাক, রবীন্দ্রনাথ নামক মানুষটি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য যে উপেক্ষার বস্তু নয়—এটা উনিশ শতকের পত্রপত্রিকাগুলি যে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল—সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

ছেলেভুলানো ছড়া, শিশুমন ও বর্তমান প্রজন্ম

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩০১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন ও কার্তিক মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া' ও 'মেয়েলি ছড়া' নামে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তারপর একশো বছর আমরা পার হয়ে এসেছি। রবীন্দ্রানুরাগী সংখ্যাতীত পাঠক এই প্রবন্ধ দুটি পড়েছেন। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় প্রবন্ধ দুটি পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট থাকায়, ধরে নিতে পারি, ছাত্রছাত্রীরা পড়ে থাকে। স্বভাবতই মনে হতে পারে, এই বহু পঠিত এবং বহু আলোচিত বিষয় নিয়ে নতুন করে আর কি-ই বা বলার থাকতে পারে? কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছড়া সাহিত্যের প্রতি চলমান প্রজন্মের যে অনীহা তা বাঙালির পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে এক অবাঞ্ছিত শূন্যতার সৃষ্টি করতে পারে। তার অশুভ সূচনা বর্তমান প্রজন্মেই দেখা যাচ্ছে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার কথাই দেখা যাক। জোড়াসাঁকোর সম্পন্ন পরিবেশে শিশু রবীন্দ্রনাথের সময় কাটত 'ভৃত্যরাজতন্ত্রে'র মধ্যে। বিশাল মহলগুলিতে তাঁর বন্দি জীবন। তার মধ্যেও তিনি খুঁজতেন নিসর্গ জগৎ। শিশুকে ছড়া শোনাবেন কে? জননী সারদা দেবী ও ভ্রাতৃবধূরা প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত? তার ওপর বাড়িতে সবসময়ই ধ্রুপদী আবহাওয়া। বড়দাদা 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মতো রূপক কাব্য লিখছেন, গান শেখাচ্ছেন শ্রীকণ্ঠ সিংহের মতো ওস্তাদ, আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছোটদের উপাসনা-মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মসংগীত শেখাচ্ছেন। ব্যতিক্রম বাড়ির পুরোনো কাজের মহিলারা। তাদের কাছেই শুনতেন রূপকথার গল্প। ধরে নেওয়া যায় দু-একটি ছড়াও হয়তো তাদের মুখে শুনেছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনও পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখা, ইংরেজি, ভূগোল, বাংলা, গণিত, ইতিহাস শিক্ষকদের কাছে রুটিনমাফিক পড়াশুনো করা, ড্রয়িং মাস্টারের কাছে ছবি আঁকা, প্রতি রবিবার বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে নিয়মমাফিক বসা। এ ছাড়াও আছে জিমনাস্টিকস্ শিক্ষা এবং আরও কত কি! কাজেই যাঁরা বিশ শতকের শেষে পৌঁছে বলেন এখনকার ছেলে-মেয়েদের উপর পড়াশুনোর এত চাপ যে তারা রূপকথা-উপকথা ছড়ার জগতে প্রবেশ করার মতো সময় পায় না, তাঁদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া যায় না। একথা কিছুটা ঠিক যে আজ থেকে বিশ তিরিশ বছর আগে সিলেবাস যেমন ছিল, এখন তার বোঝা কিছু বেড়েছে। কিন্তু শৈশব থেকেই তো সে চাপ আসে না। আর ছড়া-রূপকথা-উপকথার সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়ের সঠিক সময়ই তো শৈশবকাল। উত্তরকালে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে কবির গণ্ডীবদ্ধ জীবনের ফাঁকফোকরে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র মতো বিদ্যাসাগরী রচনাতেও ছড়ার দোলা আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা যায়।

বর্তমানে শিশুর দু-বছর চার পাঁচ মাস বয়সেই নার্সারি স্কুলে পাঠাবার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। সে শৈশবে কিছু ইংরেজি ছড়া শিখছে, তাও মন্দের ভালো। আসলে যে বয়সে পিতা-মাতার কোলে বসে তার ছড়া শুনে মুগ্ধ হওয়ার কাল সে সময়ে তার পিঠে উঠছে ব্যাগ, হাতে জলের বোতল।

এখনও হয়তো পল্লীগ্রামে এই বিষয়টি দাপটের সঙ্গে পুরোপুরি হাজির হয়নি, কিন্তু শুরু যে হয়েছে, সেটাই দুশ্চিন্তার বিষয়। আর নাগরিক জীবনের তো কথাই নেই। চারদিকে আধুনিক গণমাধ্যমের লোভনীয় হাতছানি। বাল্য-কৈশোরে মন যখন প্রাকৃত জগৎ থেকে নানা জ্ঞান সঞ্চয় করতে উন্মুখ, তখন ঘরে ঘরে টিভি-র কেবল চ্যানেলের বিসদৃশ হাতছানি। এই ভয়াবহ অথচ কৌতূহল সঞ্চারী আকর্ষণ থেকে কতজন শিশু-কিশোরকে দূরে রাখা সম্ভব হচ্ছে, তা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা নিশ্চয়ই গবেষণা করছেন এবং চিন্তিতও হয়ে উঠছেন। কিন্তু আজকের দিনে বিরাট সংখ্যক পিতা-মাতা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁরা যদি সতর্ক হন, তাহলে চিরন্তন সহজ সরল শিশুদের আবার সুস্থ সাংস্কৃতিক পাকাপোক্ত বুনিয়াদের ওপর দাঁড় করাতে পারেন। এজন্য তাঁরা যেন শিশুদের ছড়ার জগতে পৌঁছে দেন। রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান মন্তব্য এখনকার যুবক-যুবতীর অবশ্যই জানা উচিত যাঁরা সদ্য পিতামাতা হয়েছেন অথবা আগামীতে হবেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

> ‘ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নতুন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশু মূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় এবং মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।’

অর্থাৎ শিশুমনে কৌতূহলের শেষ যে নেই তার কারণ তার সামনে অনন্ত প্রাকৃত সৌন্দর্যের সম্ভার। একজন পরিণত মানুষের চেয়ে শিশুর কাছে তা আরও বর্ণময়। তেমনি যা কিছু অসংলগ্ন, যা কিছু অবিশ্বাস্য, যা কিছু অসম্ভব—সব দেশের সব কালের শিশুদেরই তা টানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালে, শিশুর মতো মন নিয়েই ছড়াগুলির সেই শিশুচিত্ত আকর্ষণকারী কারণগুলির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এই বিশ শতকের শেষেও যদি আমরা যে কোনও শিশুকে শোনাই—

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবে শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে।।
কাজি ফুল কুড়োতে পেয়ে গেলাম মালা।
হাত ঝুম্‌ঝুম্ পা কুম্‌কুম্ সীতা-রামের খেলা।।

এই চারটে চরণেই বারবার দৃশ্য পাল্টেছে, দেখতে পাই ছড়াটি কোন শতকে জন্ম নিয়েছে আমরা জানি না, কেননা মৌখিক সাহিত্যরূপেই তার জন্ম। ছড়াটি কে লিখেছেন, তাও চির রহস্যাবৃত থেকে যাবে। কিন্তু সতেরো-আঠারো বা উনিশ শতকের আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখ থেকে নানা প্রজন্মের শিশুরা একই রকম মন নিয়ে সে ছড়ার বারবার দৃশ্য পরিবর্তনের মজা অনুভব করেছে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। কলকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে। একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুমা-মা-কাকিমাদের মুখে আশৈশব কত ছড়া শুনেছি। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি, এক. অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মহিলারা কত ছড়াই না জানতেন! দুই. ছড়া-সাহিত্যের উপর পুরুষদের তুলনায় নারীদের আধিপত্যই ছিল বেশি। সর্বোপরি, বৃহৎ পরিবারে শিশুদের মধ্যে অবিরাম কলহের সময় হঠাৎ একটি ছড়া যে মুহূর্তে কোনও

মহিলা বললেন, মুহূর্ত মধ্যে সব কলহের অবসান হয়ে শিশুরা এক জায়গায় পাশাপাশি জড়ো হয়ে আরও ছড়া, আরও রূপকথার দাবি জানাতে লাগলো। তাদের কলরবমুখরিত জোটবদ্ধ চাহিদার কাছে হার মানতেন অভিভাবকরা। কিন্তু আজ কোথায় সেই একান্নবর্তী পরিবারের মাধুর্য? এখনকার গ্রামীণ পরিবেশেও যৌথ পরিবার ভেঙে ছোট ছোট পরিবার হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনের নৈকট্যও ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। মেয়েলি ছড়ার প্রবহমান সেই রূপ আজ আর নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিশুমন বিকাশের জন্য ছড়ার ব্যবহার।

এর প্রধান কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ চিরত্বগুণের কথা বলেছেন। চিরশিশুর সঙ্গে ছড়ার চিরত্বের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। পরিণত বয়সে, সংসার যাত্রার নিরন্তর সমস্যায়, মন যেমন অসতর্ক, অস্থির এবং বেদনার্ত হয়ে থাকে; শৈশবের মনের অন্দরমহলে তার স্থান নেই। তখন কেবলই উদ্দেশ্যহীন অবিমিশ্র মনের গতি। ধনী দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সব শিশুর ক্ষেত্রেই তা সত্য। ছড়াগুলি তখন মেঘের মতো শিশুর মনের আকাশে সঞ্চরমান হয়। মেঘের রূপ যেমন প্রতি মুহূর্তে বদলাতে থাকে, ছড়াগুলিরও তেমনি নিত্য বদল হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত একটি ছড়া দেখা যাক্—

এ পারেতে বেনা ও পারেতে বেনা।
মাছ ধরেছি চুনোচানা।
হাঁড়ির ভিতর ধনে।
গৌরী বেটি কনে।
নোকে বেটা বর।
টাঁকশালেতে চাকরি করে ঘুঘুডাঙায় ঘর।।
ঘুঘুডাঙায় ঘুঘু মরে চালভাজা খেয়ে।
ঘুঘুর মরণ দেখতে যাব এয়োশাঁখা পরে।।
শাঁখাটি ভাঙল।
ঘুঘুটি মল।

এটি একটি অপ্রচলিত ছড়া। এখানে একটি নদীর প্রসঙ্গ আছে। চুনো মাছ ধরার কথা আছে। শিশুর পরিচিত জগতের ছবি। কিন্তু হঠাৎ হাঁড়ির ভিতর 'ধনে'র প্রসঙ্গ এল কী করে? এই চরণটির অর্থ বোধগম্য হওয়ার আগেই শিশু পরের চরণ শুনে ফেলেছে। কিন্তু এই 'গৌরী' বেটি কে? সে কি হিমালয়-মেনকার সন্তান। তাই যদি হয় তাহলে তার স্বামী তো শিবঠাকুর হওয়ার কথা ছিল। 'নোকে বেটা' হয় কী করে? শিশু জানেই না 'টাঁকশাল' কাকে বলে, যেখানে নোকে বেটা চাকরি করে। 'এয়োশাঁখা' পরে কোন্ রমণী ঘুঘুর মরণ দেখতে গেল আর তার শাঁখাই বা ভাঙল কেন? হয়তো এই ছড়ার মধ্যে ছড়াকারের সমকালীন সমাজের কোনও কোনও জটিল সমস্যার কথা আছে, কিন্তু শিশুর কাছে তার কোনও মূল্য নেই। এই ছড়ার শ্বাসাঘাত তাকে মুগ্ধ করে এটাই যথেষ্ট। মাছ, হাঁড়ি, চুনোচানা, চালভাজা, ঘুঘুপাখি তার চেনা বিষয়। তাই তিনি ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চমৎকার তাঁর সেই বিশ্লেষণ—'উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে'।

সঠিক মন্তব্য। এর মধ্যেও তিনি কিন্তু শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠ খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ ছড়াগুলি শিশুহৃদয়কে উর্বর করে তুলতে সাহায্য করে। অথচ শিশুবিজ্ঞানের কোনও সূত্র এক্ষেত্রে ছড়াকারদের মনেই ছিল না—

খোকা যাবে নায়ে, রোদ লাগিবে গায়ে,
লক্ষ টাকার মলমলে থান সোনার চাদর গায়ে।
তাতে জাল গোলাপের ফুল
যত বাঙালের মেয়ে দেখে ব্যাকুল।
সয়দাবাদের ময়দা, কাশিমবাজারের ঘি
একটু বিলম্ব করো খোকাকে লুচি ভেজে দি।।

শিশুকে ঘিরে জননীর যত রাজ্যের স্বপ্ন। ছড়ার তালে তালে তাকে নিয়ে খেলা। এই খেলায় পিতাকেও শিশু সঙ্গী হিসেবে পায়। অতি উৎকট সাহেবিয়ানা যে পরিবারে আছে সেখানে অবশ্য এখন পিতা-মাতা-সন্তানের মধ্যে এই খেলা নিষেধের পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিশুমনের চাহিদা থাকলেও অভিভাবকরা, যাঁরা কৃত্রিম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, ক্রীড়া বিষয়ক ছড়ার জগৎ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। কিন্তু কিছু ছড়া এখনও হয়তো সাধারণ পরিবারগুলি থেকে হারিয়ে যায়নি।

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চাম কাটে মজুমদার
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।
হিঙুল করে কড়মড়।
দাদা দিলে জগন্নাথ।।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি।
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি।।
চাল কাঁড়তে হল বেলা।
ভাত খাওসে দুপুর বেলা।
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি।।
কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতোরের মাথা।।

কিংবা

ঘুঘু মোতি সই।
পুত কই।।
হাটে গেছে।
হাট কই।
পুড়ে গেছে।।

ছাই কই।
গোয়ালে আছে।
সোনা-কুড়ে পড়বি।
না ছাই-কুড়ে পড়বি।।

এইভাবে জননী ও শিশুর খেলা চলে। বহুকাল বাহিত এইসব ছড়া অনেক উদ্ভটত্ব প্রকাশ করে বলেই তার প্রতি আকর্ষণ। এখানে ধ্বনি এবং তাল-ই শিশুর মনকে মুগ্ধ করে। যেমন তার মনে ছড়ার ছবি এক বিচিত্র আবেশ ছড়ায়। সে ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে থাকলেও তার দৃষ্টি থেকে সেই ছবি কোনদিনই হারিয়ে যায় না। এই পঞ্চাশোর্ধ বয়সেও আমার মন থেকে অন্তত সেই শৈশবের শোনা ছড়ার ছবিগুলি হারিয়ে যায়নি। একটি দুটি ছড়ার অংশ উদ্ধারের প্রলোভন সংযত করতে পারছি না—

জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে তোমার মাথার সিঁদুর।।

যতই আধুনিক যুগ প্রসারিত হোক, রক্তিম ফুলের, রক্তিম সিঁদুরের কদর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কাছে। একই সুখ-সৌন্দর্যের ছবি রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত নানা ছড়ার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যেমন এই ছবিটি :

চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে।

অথবা—

পরণে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।

প্রসঙ্গান্তরে যাই। এখনকার অনেক তরুণ-তরুণীর জন্ম থেকেই কেটেছে নাগরিক জীবনে। ট্রাম-বাস, নার্সারি স্কুল থেকে কলেজ, টেলিভিশন থেকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত সিনেমা, গড়ের মাঠ-ভিক্টোরিয়ায়। তারা বাংলার পল্লীগ্রামের দিন রাত, কুঁড়েঘর, বহুশরিকের পুকুরঘাট, সবজি বাগান, পায়ে চলার পথ, বাগদিপাড়া, কুমোরপাড়া, এসব কিছুই নিয়ত দেখেনি। 'মেয়েদের নাই'তে বসা, পুতুলের বিয়ে, 'টিয়ের মার বিয়ে', ভেসে ওঠা কাতলা মাছ, চালকড়াই, 'তালগাছেতে হুতুমথুখো', নলের বাঁশি— এসব অপূর্ব দৃশ্য ঘটনা বা বস্তু দেখেনি। যদি নাগরিক জীবনে বসেই বাংলার ছড়াগুলির সঙ্গে তারা পরিচিত হত, তাহলেও এই কমিক্স-এর ভয়ঙ্করতার জালে জড়িয়ে পড়তো না। কিন্তু তাদের মনে সেই আগ্রহ অতি শৈশবে ক'জন রোপণ করতে পেরেছেন? ফলে এই প্রজন্মের পর যারা আগামীতে সন্তান-সন্ততি হবে তারা ছড়া-অজ্ঞ অভিভাবকদের কাছ থেকে বাংলা ছড়ার রস ও ধ্বনি শোনার মাধুর্য হারাবেই। তারা জানবেই না, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি/খোকা নাচে কোনখানে/খোকা যাবে নায়ে/পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো সে/পুঁটু নাচে কোনখানে/ কে মেরেছে কে ধরেছে সোনার গতরে/আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে/হাতের নাচন পায়ের নাচন বাটা মুখের নাচন/ ডালিম গাছে পরভু নাচে/বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে/পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে/দোল দোল দুলুনি/আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে/ও পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম/জাদু, এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ/উলু উলু মাদারের ফুল/হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি/নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে, কিংবা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান—এই সব ছড়ার মধেও শিশুর তাৎক্ষণিক স্বপ্নবিলাস এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতার পথনির্দেশ কতখানি রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ একশো বছর আগেই এই বিপদের গন্ধ পেয়ে শিশুদের উপযোগী ছড়া সংগ্রহে

নেমেছিলেন। তিনি নিজেও ছড়ার ছন্দ অনুসরণে কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন। শিশুর শ্রুতিসুখকর ছন্দ হল ছড়ার ছন্দ। তাই 'শিশু' এবং 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে তিনি বাংলা ছড়ার মতোই চারমাত্রার বলপ্রধান পর্ব ব্যবহার করেছেন। সহজ ভাষা, সরল ছন্দ শিশুর মুখে শুনতে ভাল লাগে। সর্বোপরি এই সারল্যের মধ্যে একটি অলৌকিকতার ছায়া থাকে। তাই লৌকিক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা, পাত্রপাত্রীদের নিয়ে শিশুদের জন্য এইসব নতুন ছড়া কবিতা তিনি লিখলেন। ছেলেবেলায় পড়া সেই সব ছড়া কবিতা আজও আমার মনে তেমনই ধ্বনি, তেমনই রস সঞ্চারিত করে। যেমন—

(এক) তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়—
কোথা পাবে পাখা সে?

(দুই) যত ঘন্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নাই বা গেলেম : কেউ যদি বায় মচ্ছ
আমি বলব, 'দশটা বাজাই বন্ধ'।
তাধিন তাধিন তাধিন।

(তিন) যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্খনি হই
ইছামতী নদী

(চার) আমার মা না হয়ে তুমি
আর-কারো মা হতে
ভাবছ তোমায় চিনতেম না
যেতেম না ঐ কোলে?

রবীন্দ্রনাথের এইসব ছড়া কবিতাই বা ক'জন শিশু একালে পড়ে বা শোনে। আমার জানা বেশ কিছু পরিবার আছে যাঁদের বাড়িতে রবীন্দ্র-রচনাবলী কেবল শো-কেসেই শোভা পায়। শিশুদের ছুঁতে মানা। হায়, তার চিত্তের কত রসদই না রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কিংবা 'শিশু ভোলানাথ' গ্রন্থের পাতায় ছড়িয়ে আছে। আমার তো মনে হয় একালে যেসব কিশোর-যুবক অকারণ আত্মহত্যা করে, নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে তারা কখনও রূপকথা-ছড়া শোনেনি। পপ সঙ্গীত, টিভি সিরিয়াল, কমিক্স ম্যাগাজিন শৈশব থেকে তাদের সুকুমার শিশুচিত্তকে ধ্বংস করে দেয়। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, এই সময়কালে।

২৮ মার্চ ১৯৩৯। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর দু-বছর আগে 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যে একটি কবিতা

লিখলেন। তখন তাঁর বয়স ঠিক আটাত্তর বছর। এর চার দশকেরও আগে একটি ছড়া সংগ্রহ করে তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ছেপেছিলেন। ছড়াটি হল—

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে,
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে।
ডাকাত আলো মা,
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে।
দেখতে দিলে না,
আগে যদি জানতাম
ডুলি ধরে কানতাম।।

প্রায় তেতাল্লিশ বছর পরেও বৃদ্ধ কবি সেই ছড়াটি মনে রেখে একটি কবিতা লিখলেন, যার এক জায়গায় আছে—

ওই যে অন্ধ কুলুবুড়ির কান্না শুনি—
ক'দিন হল জানিনে কোন্ গোঁয়ার খুনি
সম্বল তার নাৎনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্‌দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার চলে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাঁটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।।

বেশ মনে পড়ে আমার শৈশবকালে দেব সাহিত্য কুটীরের একটি শারদীয় প্রকাশনা প্রতি বছর বার হত। আমরা, একান্নবর্তী পরিবারের সকলেই সেই বইটির জন্য অপেক্ষা করতাম। প্রতি বছরই বেশ কয়েকটি গল্প থাকত যাতে আমরা দারিদ্র্য লাঞ্ছিত সংসার মা-বাবা-ভাইবোনের তীব্র বেদনার কথা পড়ে, আক্ষরিক অর্থেই, কাঁদতাম। তার আগেই ঠাকুরমার মুখে শোনা একটি ছড়া মনে গেঁথে বসেছিল—

আলোর মায় বাড়া ভানে আলো খায় খুদ,
গাছের আগায় মোরগ ডাকে কুক-কুরো-কুক।

অন্যের বাড়িতে যে জননী প্রচুর চালের 'বাড়া ভানে' তাকেই দেখি নিজ কন্যা 'আলো'কে সামান্য খুদ খাওয়াতে। ওই মেয়েটির, মেয়েটির মায়ের দুঃখ আরও মর্মান্তিক হয়েছে যখন বাইরের প্রকৃতির বুকে মোরগের ডাক-এর আনন্দময়তা ছড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে যে কোনও সন্তান ও তার মাতা-পিতার যে কোনও সমস্যাধর্মী গল্প উপন্যাস পড়লেই, রবীন্দ্রনাথের মতোই, আমারও

স্মৃতিতে ভেসে ওঠে আলোর মায়ের অসহায়তামূলক ওই ছড়াটি। তাই আমার বিশ্বাস, সঠিকভাবে ব্যাকরণ পড়লে যেমন নির্ভুল বাক্য লেখা যায়, তেমনই বাংলার ছড়াগুলি যতদূর সম্ভব স্মৃতিপটে রাখলে জীবনের বিভিন্ন ঘটনা পরিবেশে প্রকৃত পথ দেখাতে পারে।

আমি রবীন্দ্রনাথের ছড়া-বিষয়ক রচনার অ্যাকাডেমিক মূল্য বিচার করতে বসিনি, আমি চেয়েছি আজ বিশ্বব্যাপী চরম সংকটের মুখ থেকে শিশুদের রক্ষা করতে, শৈশব থেকেই পত্র-পত্রিকার চটকদার অশ্লীল ছবি; সিনেমার, তা সে বড় পর্দারই হোক বা ছোট পর্দারই হোক, উৎকট আধুনিকতা থেকে শিশুকে দূরে রাখতে। বৃহৎ সংখ্যক ছড়া-উদাসীন অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ছড়ার প্রতি আকৃষ্ট করতেই আমার এই রবীন্দ্রনাথ-আনুগত্য। এখনকার তরুণ-তরুণীদের, পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থেই, বাংলা ছড়া অনুশীলন করতে হবে।

জীবনস্মৃতি : কেবলি ছবি শুধু পটে-লিখা?

পিনাকেশ সরকার

আমরা সকলেই জানি—গদ্যরচনার নানা শাখায় কলম চালালেও ডায়েরি বা আত্মকথা রচনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বরাবরই একধরনের কুণ্ঠাবোধ ছিল। ফলে নানাসময়ে তাঁর কাছে আত্মজীবনী রচনার প্রস্তাব এলেও বারবার তিনি প্রত্যাখান করেছেন সেই অনুরোধ। এসব সত্ত্বেও যখন ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় (শ্রাবণ/১৩০২) 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হল (লেখকের নাম অনুল্লিখিত), স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার কিছু কিছু ভুলত্রুটি নির্দেশ করে পত্রিকা সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিটি উল্লিখিত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (ভাদ্র/১৩০২) 'রবিবাবুর পত্র' নামে ছাপা হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কে লেখা কিছু কিছু ভুল তথ্য সংশোধন করে পাঠান। সম্ভবত সেখানেই প্রথম তিনি নিজের জীবনের দু-চারটি ঘটনার কথা জনসমক্ষে ব্যক্ত করেন। কিন্তু সেই চিঠির সূচনায় এবিষয়ে তাঁর বিরক্তি অব্যক্ত থাকেনি। তিনি লিখেছেন—

> ''আধুনিক কালের শাস্ত্র-অনুসারে পিণ্ডদানের পরিবর্তে জীবনবৃত্তান্ত রচনা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের প্রীতিভাজনের জীবদ্দশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগেভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন সজীব সশরীরে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সৎকার গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ হয়। প্রেতলোকের প্রাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ এখনো আমার জীবন আমার হস্তেই আছে; আশা করি, আরও কিছুকাল থাকিবে, যখনই ইহার অধিকার ত্যাগ করিব তখন সেই পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া যাঁহার ধর্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। আপনারা যখন আমার বাল্য বিবরণ লিখিতেন বলিয়া আমাকে শাসন করিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই এবং নিশ্চিত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিকপত্রে প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি।''

এরপর কবি সংক্ষেপে তাঁর জীবনঘটনার বিবরণে উল্লিখিত সামান্য কয়েকটি ভুল তথ্যের সংশোধন করে দিয়েছেন। এখানে দুটি বিষয় অবধানযোগ্য। এক, কোনো লেখকের জীবনচরিত রচনার (অন্তত তাঁর জীবৎকালে) তাঁর অনাগ্রহ। দুই, জীবনকথাকে তিনি 'প্রবন্ধ' হিসাবেই বিবেচনা করছেন। আপাতত প্রথমোক্ত বিষয়ের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করছি।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই বিশ্বাস করে এসেছেন—আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে একজন কবি বা শিল্পীর তফাৎ এইখানে যে বহির্জীবনের নানা তথ্য দিয়ে সাধারণ একজন সামাজিক মানুষকে যেভাবে বোঝা যায় বা তার মূল্যায়ন করা যায়, কবি বা শিল্পীর ক্ষেত্রে তা অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না। কারণ শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার বাইরের জীবনের ঘটনা বা তথ্য অনেকক্ষেত্রেই তেমন

কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না, যতটা সক্রিয় ভূমিকা নেয় তার রহস্যময় অন্তর্জীবন। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ/১৩০৮) 'কবিচরিত' কবিতায় (পরে 'উৎসর্গ' কাব্য-গ্রন্থে সংকলিত ২১ সংখ্যক কবিতা) একথাটাই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর আবেগকম্পিত ভাষায়—

যে আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

কবি লর্ড টেনিসনের পুত্র হ্যালাম টেনিসন-বিরচিত দুখণ্ডের পিতৃস্মৃতি Alfred Lord Tennyson : A Memoir (১৮৯৭) শীর্ষক বইটি পাঠ করে হতাশ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।"

পরে আরো লিখলেন :

"...কবির জীবন মানুষের কী কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কী আছে? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙাইয়া রাখিলে ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। জীবনচরিত মহাপুরুষের এবং কাব্য মহাকবির।"

একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'বারোয়ারি-মঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন/চৈত্র ১৩০৮)। ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরেই লিখেছেন :

"যে নাচে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে তাহার জীবনচরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু একটা পারে তাহারই জীবনচরিত। কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রায় আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁদেরই জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই—তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন?"

সৃজনশীল কবি-শিল্পীদের আলাদা কোনো জীবনী বা আত্মজীবনীর প্রয়োজন নেই, তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমেই তাঁদের জীবন-পরিচয় ফুটে ওঠে—এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। ফলে নিজের জীবনকথা লেখার কোনো আগ্রহ তিনি অনুভব করেননি অনেকদিন পর্যন্ত। তাই ১৩১১ বঙ্গাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য যখন রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত একটি জীবনকাহিনী প্রার্থনা করেন, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানান—

> ''...আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোনো লাভ দেখি না। সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

উল্লিখিত রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাতথ্য সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তাঁর কবিজীবনের নেপথ্যদর্শনের অভিজ্ঞতাকেই তুলে ধরেছেন। এর ছ বছর বাদে (২৮ ভাদ্র/১৩১৭) The Bengalee পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা চিঠিতেও কবি নিতান্ত দায়সারাভাবেই তাঁর ব্যক্তিজীবনের কিছু ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সেই চিঠি পড়লেই বোঝা যায় নিজের জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনায় কবির একান্ত অনিচ্ছার কথা। লিখেছেন এমন কথা— ''আমার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছুই নাই এবং আমার জীবনচরিত্র লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য নহে।" লিখেছেন—''সন তারিখের কোনো ধার ধারি না।" এমনকি সেখানে নিজের স্ত্রীর মৃত্যুবছরটিও (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) ভুল জানিয়েছেন (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। সহ-সম্পাদক পত্রিকায় ছাপার জন্য কবির একখানি ছবি চেয়েছিলেন। চিঠির শুরুতেই সে আবেদন খারিজ করে কবি জানিয়েছিলেন— ''আমার কাছে আমার ছবি একখানিও নাই। অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে।" বোঝা যায় এধরনের অনুরোধে বিরক্তই হতেন তিনি।

তবু সেই রবীন্দ্রনাথই কিছুদিনের মধ্যেই মত পরিবর্তন করলেন প্রিয় ভক্ত অনুরাগীদের অনুরোধে। হাত দিলেন নিজের অতীত জীবনের বৃত্তান্ত-বর্ণনায়। অনেক সংকোচ তখনও ছিল অবশ্যই। ততদিনে অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আষাঢ়-শ্রাবণ/১৩১৮) প্রকাশিত হয়েছে। কবির কৌতূহল ছিল—অজিতকুমারের প্রবন্ধটি পাঠ করে পাঠক সাধারণের মনে হয়তো তাঁর জীবনকথা জানার আগ্রহ কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—''...অজিতের প্রবন্ধ শেষ হয়ে গেলে এটা আরম্ভ হলেই ভালো হয়। লোকের তখন জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য একটু বাড়তে পারে।" (১৩ জ্যৈষ্ঠ/১৩১৮) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও একই দিনে কবি জানাচ্ছেন—''অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন—তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে।" বোঝা যাচ্ছে, কবি যাচাই করে নিতে চাইছিলেন সাধারণ পাঠক তাঁর জীবনকথা শুনতে বাস্তবিকই কতটা আগ্রহী। কারণ বারবারই তিনি বলেছেন—কবির আলাদা কোনো জীবনকথা নিষ্প্রয়োজন, কবিতাতেই তাঁর জীবনের প্রকৃত প্রকাশ ঘটে। তাছাড়া আর একটা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অতি সতর্ক ছিলেন। লেখার ভিতরে যদি কোনো অহমিকা প্রকাশ পায় (বেশির ভাগ আত্মজীবনীতেই যা ঘটতে দেখা যায়) তাহলে লেখকের পক্ষে সেটা অমার্জনীয় অপরাধ। এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাবধানী হয়েও নিঃসংশয় হতে পারেননি 'জীবনস্মৃতি' ছাপতে দেবার আগে। চারুচন্দ্রকে লিখেছেন—''পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগল্‌ভ হবার অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও সাদা চুল ও শ্বেত শ্মশ্রুতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুলতে পারে না।" (৬ জ্যৈষ্ঠ/১৩১৮) সম্পাদক রামানন্দকেও সরাসরি জানিয়েছেন—

> ‘‘যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভালো করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া দেখিবেন—যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্মমভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যে-সব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বলিয়া বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে।’’

আসলে রবীন্দ্রনাথের সর্বদাই মনে হয়াছে—তাঁর এই ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী ঘনিষ্ঠ ও অনুরাগীমহলে সানন্দ স্বীকৃতি পেলেও যদি তা বৃহত্তর পাঠক সাধারণের কাছে তত আকর্ষণীয় বোধ না হয়, তাহলে গোটা রচনার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে। মনে রাখতে হবে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ তাঁর একদা প্রিয় সাহিত্যিকদেরই কেউ কেউ ইতিমধ্যেই তাঁর জীবনদেবতা-সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁকে কবি হিসেবে অহংকারী সাব্যস্ত করেছেন। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছেন অজিতকুমার-সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো কবির ভক্তজনেরা; এবং সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথ এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে রীতিমতো বিব্রত। এসব কারণে আরোই তিনি ইতস্তত করছেন ‘জীবনস্মৃতি’ ছাপতে।

তবু শেষ পর্যন্ত বারবার ঘষামাজা করে অবান্তর তথ্যপুঞ্জ বিদায় করে ‘জীবনস্মৃতি’কে তিনি যে রূপ দিলেন, তাতে সেটি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের আত্মকথনমাত্র হয়ে রইল না, হয়ে উঠল একটি বিশেষ সময়ের শিল্প-সাহিত্যগত পরিমণ্ডলের ছবি, সর্বোপরি একটি সুখপাঠ্য সাহিত্যসৃষ্টি। সে বিষয়ে নিজে নিশ্চিত হয়ে তবেই রবীন্দ্রনাথ এটি পত্রিকায় ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন—

> ‘‘জিনিসটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গল্প যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্য আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি—আমার তো বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে...’’ (জ্যৈষ্ঠ/১৩১৮)

> ‘‘...খুব মনোযোগ করে দেখলুম, এ-রচনাটা সাহিত্যে চলবার মতো হয়েছে—নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না।’’

একথা অনস্বীকার্য যে ‘জীবনস্মৃতি’ আর একটি তথাকথিত ‘আত্মজীবনী’ বা ‘স্বরচিত জীবনবৃত্তান্ত’ হয়ে ওঠেনি। গোটা বইটির কোথাও সাল তারিখের উল্লেখমাত্র নেই, নেই ইতিহাসগ্রন্থ সুলভ কালানুক্রমিকতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের সূচনাতেই দাবি করেছেন—

> ‘‘...জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে; সুতরাং পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।’’

বারেবারেই রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’-র এই সূচনায় ছবির প্রসঙ্গ এনেছেন, ‘ছবির ঘরে খবর’ নেবার কথা বলেছেন, ‘ছবি দেখার নেশা’ যে তাঁকে পেয়ে বসেছিল সে কথা উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিকই ‘জীবনস্মৃতি’ যে একটি অসামান্য স্মৃতিচিত্র বা Memoir তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অথচ রবীন্দ্রনাথই কোথাও কোথাও বইটিকে ‘প্রবন্ধ’ বলেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন—‘‘...অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত।’’ কিংবা—‘‘যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভালো করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া দেখিবেন....’’।

আবার কখনো একে বলছেন 'কবিজীবনী' (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানিয়েছেন—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ''আমার কবিজীবনীটা পড়িতে দিও। সে তো সম্পাদক শ্রেণীর নহে সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল, অতএব সে ওটা পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি।'' (২৫ জ্যৈষ্ঠ/১৩১৮) কখনো-বা একে শুধুই 'রচনা' আখ্যা দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর যে একাদশ খণ্ডটি 'প্রবন্ধ' চিহ্নিত (অগস্ট ১৯৮৯) সেখানে 'ছেলেবেলা', 'আত্মপরিচয়', 'চারিত্রপূজা' এবং 'ছিন্নপত্র' বইগুলির সঙ্গে স্থান হয়েছে 'জীবনস্মৃতি'-র।

তবে সংশয়াতীতভাবে বলা যেতে পারে—'জীবনস্মৃতি' বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ 'স্মৃতিচিত্র, অপ্রতিম এক গদ্যরচনা। যে চিত্রগুণের কথা এ প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে, তার নানা পরিচয় ছড়িয়ে আছে এর সর্বাঙ্গে। গদ্য যেখানে অনায়াসেই কবিতার হাত ধরে, তেমন বহু নিদর্শন ধরা পড়বে যে কোনো মনোযোগী পাঠকের চোখে। প্রথমেই দেখা যাক নিসর্গপটের ছবি :

ক) ''প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ারভাঁটার আসাযাওয়া, সেই কত রকম রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন।'' (বাহিরে যাত্রা)

খ) ''কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। (গঙ্গাতীর)

গ) ''যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে, পথের কোনো বাঁকে, পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত।'' (হিমালয় যাত্রা)

ঘ) ''এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত, এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়েছে—সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা।'' (কারোয়ার)

কবির পর্যবেক্ষণশীল মন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে পাঠকের মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে 'জীবনস্মৃতি'-র নানা ব্যক্তি ও ঘটনার বর্ণনায়। শৈশবে ঘরবন্দি বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর জানলা দিয়ে যে পুকুরটাকে দেখতে পেতেন, তাকেও তিনি 'একখানা ছবির বহির মতো' নিরন্তর দেখে দেখে উপভোগ করতেন সেই পুকুরপাড়ের দৃশ্যাবলী। বিভিন্ন মানুষের স্নানের ছবির যে বিশদ বর্ণনা কবির কলমে ফুটে উঠেছে, তাতে স্নানার্থী সেই মানুষজনের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে :

> ''কেহ বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলি ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত, কেহ বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহ বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ বা ব্যস্ত, কোনো মতে স্নান সারিয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো-বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই—ধীরে সুস্থে স্নান করিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিদীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা।'' (ঘর ও বাহির)

শেষ বাক্যটিতে স্নানার্থী মানুষটির ব্যস্ততাহীন মেজাজটাকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে লেখক বাক্যটিকেও করে তুলেছেন অসমাপিকা ক্রিয়াপদের মালা গেঁথে গেঁথে দীর্ঘ বিলম্বিত মৌতাতমন্থর।

রবীন্দ্রনাথের সহজাত রসবোধের অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়া আছে 'জীবনস্মৃতি'র বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনার বর্ণনায়। পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহের চেহারা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যখন বলেন—

> ''বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো—অম্লরসের আভাসমাত্রবর্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁর সমস্ত হাতমুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফারসি-পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার এবং কণ্ঠে আর গানের বিশ্রাম ছিল না।''

তখন ভিতর-বাহিরসমেত গোটা মানুষটির ছবি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ঈশ্বর নামে যে পরিচারকটি কবির ছোটবেলায় তাঁর দেখাশোনা করত, তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি লিখেছেন :

> ''সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে তাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসদ্ভাব ছিল। এইজন্য এই মৃৎপিণ্ড মেদিনীর মলিনতার সঙ্গে সর্বদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। ... চলিবার সময় তাহার দক্ষিণ হস্তটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত যে বেশ বোঝা যাইত, তাহার ডান হাতটা তাহার শরীরের কাপড়চোপড়গুলাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেছে না।''

নিকট আত্মীয়জনের মধ্যে তাঁর সমবয়সী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ যখন স্কুলের কোনো শিক্ষকের জন্য দেবেন্দ্রনাথের কাছে কিশোরীমোহন মিত্রের লেখা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরেজি জীবনীগ্রন্থটি চাইতে গিয়ে 'সাধু গৌড়ীয় ভাষায় অনিন্দনীয় রীতিতে বাক্যবিন্যাস' করল যে, ''পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলা ভাষা অগ্রসর হইতে হইতে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।'' পরিণামে তাঁদের বাংলা পড়া সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল, গৃহশিক্ষক নীলকমল পণ্ডিতের চাকরি গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

> ''যে-মেঘনাদবধের প্রত্যেক অক্ষরটিই আমাদের কাছে অমিত্র ছিল সে আজ এতই নিরীহভাবে টেবিলের উপর চিত হইয়া পড়িয়া রহিল যে, তাহাকে আজ মিত্র বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব ছিল না।''

বাবার সঙ্গে বোলপুর যাবার সময় এই সত্যপ্রসাদই কবিকে বুঝিয়েছিল ''বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ংকর সংকট, পা ফসকাইয়া গেলে আর রক্ষা নাই। তারপর গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না।''

সত্যপ্রসাদ তাঁকে আরও এক অভিনব অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল। বলেছিল—''... পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ এই ছিল যে, কুঠিবাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনো প্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্র বৃষ্টি কিছুই লাগে না।'' কবির মন্তব্য—''এই অদ্ভুত রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন না যে, আজ পর্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।''

এক প্রসন্ন স্নিগ্ধ কৌতুকবোধে ভরে আছে 'জীবনস্মৃতি'-র পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। পিতা দেবেন্দ্রনাথ, দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বা গুণেন্দ্রনাথ, খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যে, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী বা দাদার বন্ধু কবি অক্ষয় চৌধুরী থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক গোবিন্দবাবু বা বাড়ির ইংরেজি শিক্ষক অঘোরবাবু, হিন্দুমেলার অন্যতম সংগঠক 'ন্যাশনালিস্ট' নবগোপাল মিত্র, মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিনটেন্ডেন্ট ব্রজনাথ দে, সহপাঠী ম্যাজিশিয়ান বন্ধু হরিশ্চন্দ্র হালদার কিংবা সেন্ট জেভিয়ার্সের নীরু তথা নীরদ—চরিত্রের মিছিল দেখতে পাই এখানে। কিন্তু প্রত্যেকে ফুটে উঠেছে তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। কারও বিষয়ে হয়তো বিশদ করে বলা হয়েছে, আবার কারও কারও ছবি ফুটে উঠেছে স্কেচ-এর মতো বিরল রেখার টানে। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছে প্রমূর্ত, রীতিমতো জলজ্যান্ত। অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রর পিতা গুণেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কবি লিখছেন :

> ''তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁর দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে মাছ ধরিবার সভায়, তিনি মূর্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীরমনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত।''

অক্ষয় চৌধুরী সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ :

> ''বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে-গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন একেবারে মরিয়া হইয়া গাইয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনো প্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, তাহাকে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইঁহার বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না।''

আবার কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর যে ছবি তিনি এঁকেছেন। তাতেও মানুষটি এককথায় হয়ে উঠেছেন অবিস্মরণীয় :

> ''তাহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয় তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি।''

'জীবনস্মৃতি' প্রকাশের সময় কবির বয়স পঞ্চাশোত্তীর্ণ। অথচ 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কালে রবীন্দ্রনাথ যখন সদ্য পঁচিশ বছর পেরিয়েছেন সেখানেই এই স্মৃতিকথার সমাপ্তি। কবির যুক্তি—এর পরবর্তী জীবনঘটনাকে আর ছবির মতো করে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। তাঁর নিজের ভাষায় :

> ''এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো হালকা করিয়া দেখা আর চলে না।''

সোজা কথায় এতদিন পর্যন্ত যাপিত জীবনের যে স্মৃতিগুলি কবি সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করে এসেছেন, জীবনের পরবর্তী অর্ধে তাকে আর সেভাবে সেই ফ্রেমের মধ্যে ধরা সম্ভব নয় বলেই কবি মনে করেছেন। জীবননিরীক্ষার ক্ষেত্রেও একটা দূরত্ব কাম্য, নইলে তাকে ভুল বোঝার বা বোঝানোর আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া 'জীবনস্মৃতি' মূলত কবির শিল্পীজীবনের বিকাশের ধারাকেই অনুসরণ করে রচিত। 'কড়ি ও কোমল'-এর পরবর্তী কাব্য 'মানসী' তাঁর প্রথম পরিণত কাব্য। 'মানসী' থেকে শুরু হয়ে গেল তাঁর মৌলিক এবং বিচিত্রমুখী সাহিত্যসাধনা। জীবনঘটনার ক্ষেত্রেও জোড়াসাঁকো-পর্ব পার হয়ে পদ্মা-পর্ব অতিক্রম করে কবি ততদিনে প্রবেশ করেছেন শান্তিনিকেতন-পর্বে। এ শুধু ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন নয়, বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কবির ব্যক্তিজীবন এবং কর্মজীবনেও লেগেছে সুখদুঃখের নানা নতুনতর জোয়ারভাঁটা। 'জীবনস্মৃতি'-র বিন্যাস ও রীতিতে সেই স্মৃতিবর্ণনা আদৌ সম্ভব ছিল না। সেজন্যই কবি 'কড়ি ও কোমল' পর্বেই তাঁর স্মৃতিকথা সাঙ্গ করেছেন। একথা ঠিক 'জীবনস্মৃতি'তে সবক্ষেত্রে ইতিহাসের তথ্যপ্রমাণ রক্ষিত হয়নি, যেহেতু স্মৃতির উপরেই নির্ভর করেছেন লেখক। তিনি নিজেও সেই বস্তুনিষ্ঠা (objectivity) দাবি করেননি। কিন্তু আবার একথাও সত্য, নিজের 'লেখকজীবনের বিকাশের ধারা'কে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যেই এই স্মৃতিকথা রচিত হয়েছে। আর তা হয়ে উঠেছে জীবনরসে স্পন্দিত। জীবনের নানা সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না কৌতুক ও বেদনা এক অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে চিত্রিত হয়েছে অনবদ্য গদ্যভাষায়, যে গদ্য ব্যাকরণগত বিচারে সাধুরীতির হয়েও প্রায় মৌখিক গদ্যের কাছাকাছি। যেমন 'গল্পগুচ্ছ' বা 'গোরা'-'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের গদ্য। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতো রবীন্দ্রবিরোধী শিবিরের সম্পাদককেও তাই স্বীকার করতে হয়েছে—''কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' উপন্যাসের মতো মনোরম।'' ('সাহিত্য, বৈশাখ/১৩১৯)।

রবীন্দ্রনাথ নিজে রচনাটিকে বারবার নানাপ্রসঙ্গে 'স্মৃতির ছবি' বলে উল্লেখ করলেও অন্তত একবার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে 'প্রবন্ধ' বলেছেন। লিখেছেন—''যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভালো করিয়া পড়িয়া দেখিবেন...'' ইত্যাদি। প্রশ্ন হল, 'জীবনস্মৃতি' কি আদ্যোপান্ত চিত্রধর্মী? না কি, এর কোথাও কোথাও প্রবন্ধলেখকের Critical বিশ্লেষণধর্মী মনের প্রকাশ ঘটেছে। আমাদের বিবেচনায় বইটির কোথাও কোথাও চিত্রধর্মিতার বদলে লেখকের সমালোচনাত্মক মনের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন—'ভারতী' অধ্যায়ে, 'ভগ্নহৃদয়' এবং 'বিলাতি সংগীত' অধ্যায়দুটিতে, 'গান

সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে। প্রথমোক্ত দুটি অধ্যায়ে কবির আত্মসমালোচনা বেশ জোরালো হয়ে ফুটেছে। 'ভারতী' অধ্যায়ের শেষদিকে কবি লিখেছিলেন—"...ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার অযোগ্য কালীর কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা"। অবশ্য তার পরেই মন্তব্য করেছেন—"সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে। কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে। তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।" 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ের অনেকখানি জুড়ে আছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিক্ষিত বাঙালির সাহিত্যরুচি সম্পর্কে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি। আবেগাতিশয্য কীভাবে সেসময়ের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত সাহিত্যপাঠকের মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল তার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজি সাহিত্যের রেনেসাঁস যুগের স্বভাবপ্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন :

> "যুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁশের যুগ আসিয়াছিল। শেক্সপীয়রের সমসাময়িক কালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। এ সাহিত্য ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না—মানুষ আপনার হৃদয়প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এই জন্যই এই সাহিত্যে প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা প্রাচুর্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। যুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।"

এর পরবর্তী অংশেও বিবিধ উদাহরণের সহায়তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, সেখানে স্মৃতিচিত্রের সৌন্দর্য বড় হয়ে ওঠেনি, প্রাধান্য পেয়েছে লেখকের যুগসত্তা-অনুপ্রেরিত সাহিত্যনিরীক্ষার ও শিল্পরুচির অভিজ্ঞান। আবার 'বিলাতি সংগীত' অধ্যায়ে যুরোপীয় সংগীত ও ভারতীয় সংগীতের যে তুলনামূলক পর্যালোচনা তিনি করেছেন সেটিও কবির তীক্ষ্ণ মননশীল উপলব্ধির ফল :

> "যুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন; ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। যুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া যুরোপে গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে। তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য; কে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে। কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনোপ্রকার সুব্যবস্থা নাই।
>
> যুরোপের সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, একথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে যুরোপের গান আমার হৃদয়কে

একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোকছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক; আর একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখার অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস।”

এই অংশটি পড়লে পাঠকের মনে হতেই পারে ভারতীয় সংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীতের স্বরূপ প্রকৃতি নিয়ে একটি মনোজ্ঞ তুলনামূলক পর্যালোচনা যেন প্রবন্ধের আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে।

আসলে রবীন্দ্র প্রতিভার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হল—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে বিশ্বগত ও সর্বজনীন করে তোলা। কারণ তিনি চিরকালই মনে করেছেন—সাহিত্যে এই সর্বজনীনতার স্পর্শটুকু আবশ্যিক। তাই ‘জীবনস্মৃতি’-তেও তিনি যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে নিজের জীবনঘটনাকে নিরীক্ষণ করেছেন, বর্ণনা করেছেন দূর থেকে দেখা ছবির মতো করেই। সেক্ষেত্রে কখনো কখনো হয়তো প্রাবন্ধিকের Critical ভঙ্গি এসে গেছে, কিন্তু তার সামগ্রিক রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়নি মোটেই। সেদিক থেকে ‘জীবনস্মৃতি’ অনন্য।

রবীন্দ্র-নাট্যে প্রতিবাদ : *অচলায়তন*

মানস মজুমদার

স্বরূপত 'অচলায়তন' (১৩১৮) প্রতিবাদের নাটক। প্রতিবাদ সংস্কারান্ধ আচারমূঢ় সমাজের বিরুদ্ধে। যে সমাজ নিশ্চল গতিহীন জরাগ্রস্ত সে সমাজ রবীন্দ্রনাথের চোখে মৃত। তার প্রতি তাঁর সমর্থন নেই। তিনি যে সমাজের বিনাশ চেয়েছেন। সুস্থ গতিশীল সমাজের পক্ষে তিনি। 'অচলায়তন' নাটকে রূপকের আবরণে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সমাজভাবনারই বহিঃপ্রকাশ।

অচলায়তন নামক প্রতিষ্ঠানটি পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ। বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। অচলায়তনের বাসিন্দারা অত্যন্ত সতর্কভাবে বাইরের প্রভাবকে এড়িয়ে চলে। তারা প্রতিনিয়ত মেনে চলে নানা রকমের বিধিনিষেধের গণ্ডি। শাস্ত্র-পুঁথি তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। অহোরাত্র সেখানে মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়।

তাদের ধারণা, 'পৃথিবীটা ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি।' অচলায়তনের উত্তরদিকে একজটা দেবীর অধিষ্ঠান। সেদিকের হাওয়া যাতে অচলায়তনে না ঢোকে তার জন্য অচলায়তনবাসীরা অত্যন্ত সচেষ্ট। সে হাওয়ার প্রভাব নাকি ভীষণ ক্ষতিকর। তারা যাদুবিশ্বাসী। মন্ত্রশাসিত জীবন তাদের। মন্ত্র নানা ধরনের। মৃত্যুভয় রোধের মন্ত্র হল 'অমিতায়ুর্ধারিণী'। শত্রুভীতি থেকে রক্ষা করে 'মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী' মন্ত্র। গৃহভয় থেকে উদ্ভূত 'গৃহমাতৃকা' মন্ত্র। 'অভয়ঙ্করী' মন্ত্র বাইরের ভয় থেকে রক্ষা করে। 'মহাময়ূরী' মন্ত্র সর্পভীতি দূর করে। বজ্রভয়ের জন্যে রয়েছে 'বজ্রগান্ধারী'। ভূতের ভয়ের জন্য 'চণ্ড ভট্টারিকা'। চোর-ভয়ের জন্যে 'হরাহরহৃদয়া'। 'বজ্রবিদারণ' মন্ত্র প্রতিদিন 'সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে ঊনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়'। তাদের মন্ত্র-তালিকায় রয়েছে আরও অনেক মন্ত্র। যেমন : ধ্বজাগ্র কেয়ূরী, চক্রেশ, মরীচি, মহামরীচি, পর্ণশবরী, শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চু পরীক্ষা, ছাগলোম শোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন, কেয়ূরী, মহাশীতবতী, উষ্ণীষ বিজয় ইত্যাদি। যে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ তাদের কাছে আবশ্য মান্য সেগুলি হল : কুলদত্তের 'ক্রিয়াসংগ্রহ', ভরদ্বাজ মিশ্রের 'প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি', ভগবান জ্বলনান্তকৃত 'আধিকর্মিক বর্ষায়ণ'। এ ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের তালিকায় আছে 'ক্রিয়াকল্পতরু', 'আর্যঅষ্টোত্তরশত', 'দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা' প্রভৃতি।

আচমনবিধি আছে আটান্ন প্রকার। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকমের। পালিত হয় নানা ধরনের ব্রত। যেমন : বজ্রশুদ্ধি, মহাতামস, লোকেশ্বর ইত্যাদি। মহাতামসব্রত একটানা ছ-মাস করে যেতে হয়। ব্রত-উদ্‌যাপনকারী এ সময় আলোকের এক রশ্মিমাত্র দেখতে পাবে না।

অচলায়তনের বাসিন্দারা বহু বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কারের অধীন। তাদের বিশ্বাস, উত্তর দিকের জানলা খুললে মাতৃহত্যার পাপ হয়। পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে কাকিনী সরোবরের নৈঋত কোণ থেকে ঢোঁড়াসাপের খোলস সংগ্রহ করে সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে

বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করলে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়ার ঘ্রাণ নেন। তাতে অশেষ পুণ্য হয়। শুক্রবারের প্রথম প্রহরে কারও গায়ের ওপর হাই তুললে তার আয়ু ক্ষয় হয়। দীপকেতন পূজোয় ডুমুরতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পঞ্চগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হয়। তারপরে সেই মাটিতে ছোট ছোট মন্দির গড়ে তার ওপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হয়। এমন হাজারটা গড়ে সূর্যাস্তের পরে জলগ্রহণ করতে হয়। তাতে প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যায়।

তাদের জীবনে দেবদেবীদের প্রভাবও কম নয়। উত্তর দিকটা একজটা দেবীর। একজটা দেবীকে তারা ভয় পায়। কালঝন্টি দেবী নরবলিতে তুষ্ট হয়। মহাভৈরব অচলায়তনের প্রাচীর রক্ষাকারী দেবতা।

নানা রকমের মন্ত্রলেখা তাগা-তাবিজ তাদের হাতে বাঁধা। তাগা-তাবিজে তাদের অগাধ বিশ্বাস। অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে জলস্পর্শ নিষিদ্ধ।

তারা কাঁকুড়ের চাষ করে না। তাদের ধারণা, তাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খেসারি ডালের চাষও নিষিদ্ধ। কারণ, একবার কোন যুগে একটা খেসারি ডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের ওপরে উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টি সহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল। কাঁকুড় আর খেসারি ডালের চাষে তাই ট্যাবু আছে।

অচলায়তনের বাইরে থাকে শোনপাংশুরা। অচলায়তনের এক প্রান্তে দর্ভকদের বাস। অচলায়তনের বাসিন্দাদের কাছে তারা সকলেই অস্পৃশ্য অশুচি।

অচলায়তন নিছকই কি কাল্পনিক একটি প্রতিষ্ঠান? না বোধহয়। অচলায়তনের রূপকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশ ও সমাজকেই আঘাত করেছেন। আঘাত মানসিক জড়তা চিন্তার দীনতা ও সংস্কারান্ধতার বিরুদ্ধে। প্রতিবাদী তিনি। প্রতিবাদ এসবেরই বিরুদ্ধে। মুক্তবুদ্ধি ও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনই তাঁর কাম্য।

নাটকে দুটি পক্ষ। প্রথম পক্ষে আছে মহাপঞ্চক ও উপাধ্যায়ের দলটি। তারা সংস্কারমূঢ়, রক্ষণশীল। সমস্ত রকমের পরিবর্তনের বিরোধী। অপর পক্ষে স্বয়ং গুরু, আচার্য আর পঞ্চক। রবীন্দ্র-ভাবনার প্রতিনিধি। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনাদর্শের অনুসারী। নাটকের মূল দ্বন্দ্ব এ দুটি পক্ষকে ঘিরে আবর্তিত। বলা বাহুল্য, এ দ্বন্দ্ব আইডিয়া নির্ভর।

মহাপঞ্চক ও উপাধ্যায় সনাতন প্রথা ও আচারের বশীভূত। বালক সুভদ্র অচলায়তনের উত্তর দিকের জানালা খুললে ক্ষমাশীল স্নেহপ্রবণ আচার্য যখন তাকে অভয় দিয়ে বলেন: 'বৎস, তুমি কোনো পাপ করনি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই'। তখন মহাপঞ্চকের কণ্ঠে আক্ষেপোক্তি ধ্বনিত হয় : 'আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।' আচার্যের সঙ্গে বিরোধ বাধে তার : 'উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতনধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল। এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।' উপাধ্যায়ও মহাপঞ্চকের সমর্থক : 'এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান।' আচার্যের ভূমিকা প্রতিবাদীর ভূমিকা। অসহায় সুভদ্রের পক্ষে তিনি। মহাপঞ্চক ও উপাধ্যায়ের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ দেখা দেয় তাঁর। তিনি তাঁর আদর্শে অবিচলিত

থাকেন। মহাপঞ্চকের চক্রান্তে তাঁকে দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত হতে হয়। কিন্তু মহাপঞ্চকের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না তিনি। অচলায়তনের স্থবিরতাকে সমর্থন করেন না।

উপাচার্যের ভূমিকাটি ভিন্ন ধরনের। প্রথমদিকে তিনি মহাপঞ্চক ও উপাধ্যায়ের মতের অনুবর্তী হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি আচার্যের পক্ষ নেন : 'আমাকে দাঁড়াতে হবে আচার্যদেবের পাশে। আমরা একসঙ্গে এসেছিলুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসঙ্গেই বাহির হয়ে যাব।' মহাপঞ্চক তাঁকে আচার্যপদের প্রলোভন দেখালেও তিনি বশীভূত হন না। বলেন : 'মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ কথা বলবার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তর দিকের জানলা খোলার চেয়ে কম পাপ।' সন্দেহ নেই, তিনিও প্রতিবাদীর দলে যোগ দেন।

পঞ্চক অচলায়তনে মূর্তিমান বিদ্রোহ। মন্ত্রতন্ত্র আচার-আচমন সূত্রবৃত্তিতে তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। যাদের আস্থা আছে তাদের সঙ্গে তার তর্ক বাধে। বালক সুভদ্র অচলায়তনের জানালা খুলে ভীত শঙ্কিত হলে পঞ্চক তাকে সাহস দেয়। সে যাতে শাস্তি না পায় তার জন্য সচেষ্ট হয়। মহামযূরী দেবীকে পঞ্চক ভয় পায় না। মহামযূরী দেবীর পুজোর দিন 'কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে' আঠারো বার ফুঁ দেয়। সে পরীক্ষা করে দেখতে চায় এজন্যে সত্যি সত্যি কোনও সাপ তাকে কামড়ায় কিনা। কেননা, এমনটাই সে শুনেছিল। ধারণাটা যে মিথ্যে তা সে হাতেনাতে প্রমাণ করে দেয়। শুক্রবার প্রথম প্রহরে কেউ কারও গায়ের ওপর হাই তুললে যার গায়ের ওপর হাই তোলা হয় তার আয়ুক্ষয় হয় শুনে উপস্থিত সমস্ত ছেলেকে পঞ্চক তার গায়ের ওপর হাই তুলতে বলে। পঞ্চক দুঃসাহসী। বিশ্বাস-সংস্কারের সত্যতাটুকু সে এভাবেই যাচাই করে নিতে চায়। পঞ্চক অচলায়তনের রীতি-নিয়মের ধার ধারে না। উপাচার্য তাই তার সম্বন্ধে বলেন : 'এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল। শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন-একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছুতেই দমন করা গেল না।' এই অনিয়ম প্রতিবাদ প্রবণতারই নামান্তর মাত্র। পঞ্চক প্রাণের প্রতিভূ। অন্যেরা যেখানে মন্ত্র ও আচারের দাসত্ব করে, পঞ্চক সেখানে আপন ইচ্ছা-শক্তির জয় ঘোষণা করে। পঞ্চককে লক্ষ করে আচার্যকে তাই বলতে শোনা যায় : 'তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য।' তাই সব নয়। শোনপাংশু ও দর্ভকদের অস্পৃশ্য বলে যে ঘৃণা করে না। স্বচ্ছন্দে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। এক্ষেত্রেও সে প্রতিবাদী। অচলায়তনের অনুশাসনকে সে গ্রাহ্য করে না।

পঞ্চকের কোনও কোনও গানে তার প্রতিবাদপ্রবণ মানসিকতার পরিচয় পাই। অচলায়তনের সংকীর্ণ গণ্ডীতে তার মন হাঁপিয়ে ওঠে ('আমার মন যে কাঁদে আপন-মনে, কেউ তা মানে না')। বন্ধন-অসহিষ্ণু সে ('দূরে কোথায় দূরে দূরে। মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে' অথবা 'আমার বাঁধন দাও গো টুটে')। তার বিদ্রোহ-বাসনা গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায় :

> হারে রে রে রে রে
> আমায় রাখবে ধরে কে রে।
> দাবানলের নাচন যেমন
> সকল কানন ঘেরে।

বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে।

দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে শোনপাংশুর দল অচলায়তন ধ্বংসে প্রবৃত্ত জেনে সে তাদের সহযোগী হতে চায়, যুদ্ধের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে :

আমার অস্ত্র হল গড়া,
আমার বর্ম হল পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবন বেগে
করবে ভুবন জয়।

অচলায়তনের যিনি গুরু, শোনপাংশুদের কাছে তাঁর পরিচয় দাদাঠাকুর রূপে, আবার দর্ভকদের গোঁসাই তিনি। যিনি জীবনবিমুখ শাস্ত্রাচারের বিরোধী। শুষ্ক পুঁথিপাঠে তাঁর প্রবল অনাস্থা। জ্ঞান-প্রেম-কর্ম ও আনন্দের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে চান তিনি। একদা বিদ্যাচর্চার যে প্রতিষ্ঠানটি স্বয়ং গড়ে তুলেছিলেন, আদর্শ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তিনি। শোনপাংশুদের নিয়ে তার পাথরের প্রাচীর ধ্বংসে প্রবৃত্ত হন। আচার্যকে বলেন : 'যে-চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল, নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তাঁর থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি এসেছি।' স্থূল আচার-আচরণ প্রথার দাসত্ব ঘোচাতে চান তিনি। পঞ্চকের উদ্দেশ্যে বলেন : 'নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।' বিশ্ববিস্মৃত অচলায়তনবাসীদের বিশ্ব-সচেতন করে তোলেন। চিত্তের সংকীর্ণতা ও মানসিক জড়তাকে আঘাত করেন। অচলায়তনের যুদ্ধের ঝোড়ো হাওয়া বইয়ে দেন। মোহগ্রস্ত মহাপঞ্চকের দল সম্বিৎ ফিরে পায়। অচলায়তনে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

গুরু প্রতিবাদপ্রবণ। গুরু বিদ্রোহী। তাঁর বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য হল, প্রয়োজনে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সংঘর্ষ-সংঘাতের পথ বেছে নেন। অচলায়তনের সংকীর্ণতার প্রাচীর ধূলিসাৎ করেন। শুধু তাই নয়। দ্বিগুণ উৎসাহে অচলায়তনকে নতুন করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। সে কাজে মহাপঞ্চক আর পঞ্চকের যেমন ডাক পড়ে, তেমনি শোনপাংশুদেরও সঙ্গে নেন। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখেন না। শোনপাংশুদের কর্ম-ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চান তিনি।

গুরু সক্রিয় প্রতিবাদী। তিনি শুধু ভাঙেন না, গড়েনও। জরাজীর্ণ পুরাতনের বিনাশ সাধনেই তাঁর উদ্যম শেষ হয় না, নতুনকে আবাহন জানান। 'স্থবিরতা' তাঁকে গ্রাস করতে পারে না, তিনি গতিশীল, জীবন-রসের রসিক।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধের (১৩১৫) একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন : 'গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই, তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।'[১] (রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৯৮১) পরবর্তী 'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ

ভাঙনের আঘাতের পাশাপাশি সৃজনীশক্তির মাহাত্ম্যও প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'অচলায়তন'-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকারের মন্তব্য-বিশেষও স্মরণযোগ্য। তাঁর প্রশ্ন : "...অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন। গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন কি তিনি বলেন নাই 'না, তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে?' গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।..."[২] এখানেই গুরুর বিশেষত্ব। তাঁর প্রতিবাদ নতুন সৃষ্টির মহিমামণ্ডিত।

'অচলায়তন'-এর আলোচনাসূত্রে সমসাময়িক অন্যান্য রচনার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তাতে রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় আরও স্পষ্ট হবে। 'গীতাঞ্জলি'র (১৩১৭) একটি গানে শুনি : 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার/সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'[৩] একথা তো গুরুরও। তাই তো বিশ্ববিস্মৃত অচলায়তনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন/সেইখানে যে চরন তোমার রাজে/সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।'[৪] অথবা 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,/অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সামান। মানুষের অধিকারে/বঞ্চিত করেছ যারে/সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান/অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'[৫] গানে যে দীনাতিদীন অথবা অপমানিতদের উল্লেখ করে জাত্যভিমানী স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান রবীন্দ্রনাথ, তিনিই কি 'অচলায়তন' নাটকে শোনপাংশু ও দর্ভকদের উপস্থিতি ঘটিয়ে আমাদের সংস্কারান্ধতাকে আঘাত করেন না? 'গীতাঞ্জলি'-তে যে ক্ষোভ গানের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশিত, নাটকে তাই বিস্তৃততর। প্রতিবাদ আরও সোচ্চার।

'বলাকা'-র (১৩২৩) 'সবুজের অভিযান' কবিতায় (১৩২১)[৬] রবীন্দ্রনাথ যে নবীনের জয়গান গাইলেন তার সঙ্গে 'অচলায়তন' নাটকের প্রতিবাদী মানসিকতার যোগটুকু লক্ষণীয়। আলোচ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ চিরযৌবনের প্রশস্তি কীর্তন করলেন :

> ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
> ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
> আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

'অচলায়তন'-এর পঞ্চক এই সবুজ অবুঝের দলের প্রতিনিধি। স্থবিরতাকে প্রবীণকে আঘাত করলেন রবীন্দ্রনাথ :

> খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
> আর তো কিছুই নড়ে না রে
> ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
> ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
> চক্ষু-কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
> ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা,
> অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।

রবীন্দ্রনাথ ওই স্থিতিবাদী জরাগ্রস্ত প্রবীণের সমর্থক নন। তিনি প্রাণধর্মের প্রতিভূ যৌবনের পক্ষে। যৌবন দুঃসাহসী, বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে সে বদ্ধ থাকতে চায় না। খাঁচা সেই গণ্ডীর প্রতীক। খাঁচার

আশ্রয়টি নিরাপদ হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের যোগ নেই। খাঁচার পরিসর সংকীর্ণ। তা প্রাণের স্বাভাবিক গতি ও বিকাশকে রুদ্ধ করে। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে বিনষ্ট করে। লক্ষণীয় অচলায়তন নামক প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চকের কাছে খাঁচারূপে প্রতিভাত হয়েছে। স্মরণযোগ্য দাদাঠাকুরের প্রতি পঞ্চকের উক্তি : 'খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সবচেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুর্‌দুর্‌ করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে।'

তুলনীয় : ''চলিতে গেলেই দেখি, সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে বলিতে হয় 'খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল' নয় বলিতে হয়—ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে, কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টিপাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন, অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা-ঝাপটা সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়; আর সবচেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।''[৭]

'অচলায়তন' নাটকে মহাপঞ্চকের দল অচলায়তনকে খাঁচায় পরিণত করেছে। শাস্ত্রগ্রন্থের দোহাই দিয়ে নানা বিধি-নিষেধ তৈরি করেছে। অচলায়তন-বাসীদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিহত করেছে। কর্মশক্তি হয়েছে ব্যাহত। গুরু ওই খাঁচাটিকে ভাঙতে চেয়েছেন। কাজটি সহজ হয়নি। বহুদিনের অভ্যাসের বিরোধিতা করতে হয়েছে। মহাপঞ্চকের দল বাধা দিয়েছে। গুরুকে সংঘর্ষের পথে যেতে হয়েছে। পঞ্চকেরও বিদ্রোহ এই খাঁচার বিরুদ্ধে। সে তাই প্রথম থেকেই গুরুর অনুগামী হয়েছে। আচার্যও খাঁচার অসারতা অনুভব করেছেন। গুরুর সংস্কার-কর্মের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

চিরযুবা চিরজীবীদের সম্বোধন করে 'সবুজের অভিযান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।'

আর 'বিবেচনা' ও 'অবিবেচনা' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'মানা, মানা, মানা—শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই, যুক্তি নাই, তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরন্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এই প্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে ওঠবোস্‌ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে।' অচলায়তনবাসীদের জীবনেও 'মানা'-র অন্ত নেই। সুভদ্রের মতো বালকেরা এই 'মানা'-র পীড়নে পিষ্ট। অভ্যস্তও। অচলায়তন এক বিচিত্র 'মানা'-র জগৎ। পদে পদে নানানতর বিধি-নিষেধ ও সংস্কারের সম্মুখীন হতে হয় এখানকার মানুষজনকে। এদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে হরেক রকমের মন্ত্র। যুক্তিশাসিত নয় তাদের জীবন। বরং অনুশাসন-

নির্ভর। পঞ্চক এ সমস্ত নিষেধমানা আগ্রাহ্য করেছে। এ সবের বিরোধিতা করেছে, যুক্তি-বিচারের অনুগামী হয়েছে। প্রতিবাদীর ভূমিকা নিয়েছে। অচলায়তনের অজস্র পুতুলের একজন হয়ে ওঠেনি। পঞ্চকের বিরোধিতা অচলায়তনের ভিতর থেকে। অন্যদিকে গুরু অচলায়তনের বাইরে থেকে অচলায়তনের ওপর আঘাত হেনেছেন। জীবনের সহজ স্বাভাবিক ধারাটির সঙ্গে অচলায়তন-বাসীদের যোগ ঘটাতে চেয়েছেন। নাট্যকার পাশাপাশি শোনপাংশু ও দর্ভকদের জীবনধারার অবতারণা করে অচলায়তনবাসীদের পুতুল-স্বভাবটি কৌশলে উদ্ঘাটন করেছেন। স্মরণযোগ্য 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (১২৯৯) বা তার নাট্যরূপ 'তাসের দেশ'-এ (১৩৪০) তাসের দেশের অধিবাসীদের পুতুল-জীবনকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানিয়েছেন। এ জীবন তাঁর কাম্য ছিল না। 'অচলায়তন'-এর পঞ্চকও পুতুল-জীবন মেনে নেয়নি। সে বিদ্রোহ করেছে। গুরুও এ জীবনের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। এও তো প্রতিবাদ।

'সবুজের অভিযান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আহ্বান : 'আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে'। পঞ্চক বাঁধা-পথকে অমান্য করেছে। এজন্যে তাকে কম উপহাস সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু তার প্রতিবাদের স্পৃহা তাতে লুপ্ত হয়নি। বাঁধা-পথ অপছন্দ বলেই গুরু শোনপাংশুদের মাঝখানটিতে দাদাঠাকুরের জীবন বেছে নেন; দর্ভকপল্লীতে গোঁসাই সাজেন। বাঁধা-পথের বাইরে যে জীবন, সে জীবনের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ। উভয়েই প্রতিবাদী। প্রতিবাদ অচলায়তনের বিরুদ্ধে। আর সে প্রতিবাদ সফল।

উল্লেখপঞ্জি

১। রাজা প্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৯৮১

২। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৮, পৃ. ৫০৬

৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, ৯৪ সংখ্যক, পৃ. ২৭৪

৪। ঐ, ১০৭ সংখ্যক, পৃ. ২৮২

৫। ঐ, ১০৮ সংখ্যক, পৃ. ২৮৩

৬। ১ সংখ্যক কবিতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮

৭। বিবেচনা ও অবিবেচনা, কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ২১৮ (স্মরণযোগ্য, 'সবুজের অভিযান' কবিতা এবং 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ ১৩২১ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দুটি রচনাই প্রতিবাদধর্মী)

বাংলা বানান-বিধি, দেবপ্রসাদ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ

তুষারকান্তি মহাপাত্র

বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা দূর করে বানানে একটি সমতা আনতে কমিটি গঠন করে (১৯৩৫) তার সুপারিশ মতো কিছু বানান বিধি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিল (মে ১৯৩৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দু-আনা দামের মোট এগারো পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি যে শিক্ষিত সমাজে এত আলোড়ন তুলতে পারে তা বোধহয় আগে অনুমান করতে পারেননি বানান-সংস্কার সমিতির সদস্যেরা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সমালোচনার ঝড় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়কেই বিব্রত করেনি। পঁচাত্তর-উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথকেও তার জন্যে বেশ কিছুটা দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছিল এবং রবীন্দ্র-জীবনে এটাই বোধহয় ছিল সমালোচনার শেষ বড় আঘাত।

পুস্তিকাটির ভূমিকায় তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ জানিয়েছিলেন, 'কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলাভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন।' স্বভাবতই তাঁর অনুরোধ অনুসারেই এই কমিটি গঠন ও নিয়ম-সংকলন। এই বানান সংস্কার সমিতির সম্পাদক ছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদ ও বিশ্বভারতীর কর্মসচিব চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন তাঁর স্নেহধন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। ফলে শুধু কমিটি গঠন নয়, বানান-বিধি নির্ধারণেও রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা অন্তত অংশত কার্যকর ছিল। সমিতির সদস্যরা তাঁর মতামত জানতে যেতেন এমন প্রমাণ আছে। তাছাড়াও নিজের প্রকাশিত রচনায় বানান-সাম্য বজায় রাখতে ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে দিয়ে যে বানানের নিয়ম সংকলন করান প্রশান্তচন্দ্রের অনুরোধে তা রচনা করেছেন সুনীতিকুমার। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের উক্তি অনুসারে এই 'স্টাইল সিট' বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-বিধি রচনায় প্রাথমিক খসড়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

তবু 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচনার লক্ষ্য ছিল মূলত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই সমালোচনায় বিপর্যস্ত বানান-সংস্কার সমিতি বিপক্ষকে নিরস্ত করতে দুটি পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। চারমাসের ব্যবধানে প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ (অক্টোবর ১৯৩৬) কিছু বানানবিধির রদ-বদল ঘটানো হয়েছিল এবং পুস্তিকার প্রথমেই ব্লক করে এই কথাটি ছাপা হয়েছিল :

> 'বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।'

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের নীচে স্বাক্ষরকারী দুজন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) এবং শরৎচন্দ্র (১লা আশ্বিন ১৩৪৩)।

এতে কিন্তু সমালোচনা থামল না। বরং বেড়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লাভ হল এই যে রবীন্দ্রনাথকেও এই বিতর্কে জড়ানো হল।

বানান-'বিধির বিধান' মানতে যাঁরা আপত্তি করেছিলেন তাঁদেরও অনেকে স্বীকার করতেন যে তৎকালীন বাংলা বানানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে (বিশেষ চলিত ভাষার লেখ্য রূপে) বিশৃঙ্খলা আছে এবং নিয়মের শাসনে সে অরাজকতা সম্পূর্ণ দূর না করা গেলেও অন্তত সংযত করা বাঞ্ছনীয়। তবু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-বিধির সমালোচনায় তাঁরা মুখর হয়ে উঠেছিলেন এর প্রধান কারণ তাঁদের মতে সমিতি অধিকারের বাইরে সংস্কার করতে গিয়ে যে-বানানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা নেই সেখানে বিশৃঙ্খলা ডেকে এনেছেন এবং বানানের প্রচলিত রূপের যথোচিত মর্যাদা দেননি। অন্যপক্ষে সংস্কার যেখানে প্রয়োজন সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ 'চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট' করার উদ্যোগ নিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেছিলেন। সমিতিও স্বীকার করেছেন 'সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অবিধেয়'। অথচ 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার প্রথম (মে ১৯৩৬) ও দ্বিতীয় সংস্কারণের (অক্টোবর ১৯৩৬) যথাক্রমে মোট ২৪টি ও ২৩টি নিয়মের চারটি (১-৪) নিয়ম ছিল তৎসম শব্দ সম্পর্কে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের যথাক্রমে দশটি (৫-১৪), ন'টি (৫-১৩) ও দশটি (৩-১২) নিয়ম ছিল তদ্ভব ও দেশজ শব্দের বানান সম্পর্কিত এবং দশটি (১৫-২৪), দশটি (১৪-২৩) ও দশটি (১৩-২২) নিয়ম ছিল বিদেশাগত শব্দের বানান বিষয়ে।

তৎসম শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অনেকেই পছন্দ করেননি এবং তাঁরা তদ্ভব ইত্যাদি অন্যবিধ শব্দের বানান সম্পর্কে নিয়মের ধরনে আপত্তি তুলেছেন। কার্যত সমগ্র বানান-বিধিই তাঁদের সমালোচনা ও বিদ্রুপের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৎসম শব্দের বানানে হস্তক্ষেপের জন্যে সমিতিকে অপরাধী করা হলেও আসলে তার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। কারণ, 'সমিতিকে ভার দেওয়া হয়—যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান-সংস্কার করা' (ভূমিকা, শ্যামাপ্রসাদ)। সংস্কৃত ব্যাকরণের 'বাধা' না থাকায় সমিতি তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে ও নীতি-নির্ধারণ করতেই পারেন।

সে যাই হোক, 'বাংলা বানানের নিয়ম'-এর প্রথম সংস্করণের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানো হলেও সমালোচনার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয়নি। কঠোর সমালোচকদের মধ্যে একমাত্র 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানিয়েছিলেন যে 'বাংলা বানানের নিয়ম, তৃতীয় সংস্করণে যে খসড়া দাঁড়াইয়াছে [তখনও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি] তাহাতে আমরা মোটামুটি সম্মত আছি।'

বানান-সমিতির বিধানে যাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুদীর্ঘ পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমে—তাঁদের অগ্রণী হয়ে ওঠেন অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ। 'বাংলা বানানের নিয়মে'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগেই রাঁচি ও চন্দননগরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে নিয়মগুলির বিরূপ সমালোচনা করে তিনি এ-বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। তারপর তিনি রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি চিঠি লিখে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কবি তখন আলমোড়ায়। তিনি কবির অনুমতি নিয়ে তাঁর চিঠি ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর পত্রিকায় প্রকাশ করে নিয়মের প্রতিবাদী মহলের সাধুবাদ ও সহযোগিতা লাভ করেন। বানান ও নিয়ম সম্পর্কে তাঁর মতামত, তাঁর মতের সমর্থক বিশিষ্টজনের অভিমত, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়

আলোচনা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিঠির আদান-প্রদান সংকলিত হয়েছে তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান' গ্রন্থে।

এ বইয়ের মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে ভাষাকে 'সুনির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত' করতে হলে সুপ্রতিষ্ঠিত শব্দের বানান পরিবর্তন উচিত নয় :

> 'ভাষার রূপকে সুস্থির (stabilize) করিবার মূলমন্ত্রই এই যে সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ বা বানানকে মানিয়া লইতে হইবে, ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যদি ব্যাকরণদুষ্টও হয়, তবে ইহাকে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।' (পৃ. ৪-৫)

ভাষার সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'ভাষার রূপ সম্বন্ধে বহুল প্রয়োগ (usage) এবং প্রাচীনতা (antiquity)-ই বড় এবং সেরা প্রমাণ।' এইসঙ্গে তিনি এ-ও স্বীকার করেছেন যে—

১। 'সরলতা বা বিশুদ্ধি অপেক্ষা একরূপত্ব (uniformity) ভাষায় বেশী আবশ্যক।' (পৃ. ৪)

২। 'মোটের উপর একথা ঠিক যে ভাষার রূপের ও ধ্বনির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।'

তাঁর এই সমস্ত কথাগুলিই সঠিক এবং যুক্তিসহ সন্দেহ নেই। কিন্তু 'ভাষার সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ-এর' সঙ্গে 'একরূপত্ব' চাইতে গেলে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে কি বিভ্রাট দেখা দেয় তার ভূরিপরিমাণ নিদর্শন পেয়েই যে বানান সংস্কার সমিতিকে তৎসম শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করতে হয় এই সত্যটা তিনি উপলব্ধি করেও উপেক্ষা করেছেন। তাঁর পূর্বোক্ত বইয়েরই 'আলোচনা' অংশে আছে (১নং নিয়ম প্রসঙ্গে) : 'র্চ্চ, র্চ্ছ, র্জ্জ, র্ত্ত, র্দ্দ, র্দ্ধ, র্ব্ব, র্ম্ম, র্য্য—নয়টি [বাংলা বানানে রক্ষিত;] আর তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণে দ্বিত্ব ক্বচিৎ লক্ষিত হয়; যথা র্ক্ক, র্ত্ত, র্ল্ল, অন্যান্য ব্যঞ্জন বর্ণে মোটেই দ্বিত্ব প্রয়োগ লক্ষিত হয় না।' (পৃ. ১১)

> 'বাঙ্গালাতে অজস্র যুক্ত বর্ণ আছে, তিন বর্ণের যুক্তবর্ণের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে; যেমন সন্ধ্যা, বস্ত্র ... উজ্জ্বল ইত্যাদি।'

এই তথ্য দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে সমস্ত যুক্ত বর্ণকে সরল না করে মাত্র ন'টিকে ত্র্যক্ষর থেকে 'দ্ব্যক্ষর যুক্ত বর্ণে পরিণত করিলেই বিশেষ কি যে সরলতা সম্পাদিত হইবে তাহা বুঝা যায় না।' (পৃ. ১২)

২নং নিয়ম প্রসঙ্গে তাঁর আশঙ্কা এর ফলে 'অংগ' 'অংক' ইত্যাদি অশুদ্ধ বানানও চালু হতে পারে।

৩নং নিয়মের আলোচনায় তিনি স্বীকারই করেছেন যে প্রচলিত বানানে বিশেষ্যপদের অন্ত বিসর্গ বর্জন করে ও অব্যয়ের ক্ষেত্রে বিসর্গ রক্ষা করে তখনই double standard অনুসৃত হত। সেক্ষেত্রে 'একরূপত্ব'-এর চেয়ে প্রচলনকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি double standard অনুসরণের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। ধ্বনির সঙ্গে বানানের সামঞ্জস্য রক্ষা করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

৪নং নিয়ম সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত তৎসম শব্দে হসন্ত রক্ষিত হবে কিন্তু অসংস্কৃত শব্দে তার দরকার নেই কারণ বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ হসন্তবৎ। সুতরাং এখানেও 'একরূপত্বে'র দাবি অস্বীকৃত হল।

অতৎসম শব্দের বানানের ক্ষেত্রেও তাঁর এই মনোভাব দেখা যায়। প্রচলনের পরেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন মূলানুসারী বানানের প্রতি। সেক্ষেত্রে ব্যাকরণকে অস্বীকার করতেও তাঁর আপত্তি

নেই। 'সোণা'<স্বর্ণ এবং 'বানান'<বর্ণন তাঁর পছন্দ। কিন্তু যে ণত্ব-বিধান অনুসারে 'স্বর্ণ' অথবা 'বর্ণন'-এ 'ণ' হয় সেই 'র' বর্ণের অনুপস্থিতির কারণে 'সোণা' অথবা 'বাণান' শব্দ ব্যাকরণসম্মত হয় না। প্রচলন যেমন বানান-বিধি রচনার সহায়ক তেমনি তার পরিপন্থীও বটে; কারণ প্রচলিত বানানে বিশৃঙ্খলাই বানান-বিধির প্রয়োজনীয়তাকে ত্বরান্বিত করে।

রবীন্দ্রনাথকে দেবপ্রসাদ ঘোষ চিঠি দিয়েছিলেন (১) ৮ জুন ১৯৩৭ (২) ২২ জুন ১৯৩৭ (৩) ১৯ জুলাই ১৯৩৭ (৪) ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৪ (৫) ২ ভাদ্র ১৩৪৪ (৬) ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। চতুর্থ চিঠি থেকেই বানান নিয়ে বিতর্ক 'অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ... কারণ বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে ঘোষণা হইয়া গিয়াছে যে, প্রচলিত বানান চলিবে পাঠ্যপুস্তকে; এবং কমিটির পুস্তিকাতেও মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, উহাদের প্রস্তাবিত বানান অবলম্বন করিবার জন্য কোন প্রকার পীড়াপীড়ি করা হইবে না।' (পৃ. ১৭৪)

রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদ ঘোষের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন (১) ১২ জুন ১৯৩৭ (২) ২৯ জুন ১৯৩৭ (৩) ২১ শ্রাবণ ১৩৪৪ (৪) ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। তৃতীয় চিঠি থেকেই বানান নিয়ে বিতর্কে যোগ দিতে একাধিক ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। দেবপ্রসাদবাবুর চিঠির উত্তর দেওয়ার আগেই অবশ্য বানান-সংস্কার সমিতির সুপারিশ সম্পর্কে 'বাংলা বানান' নামে রবীন্দ্রনাথের দুটি ছোট প্রবন্ধ (কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা ১৩৪৩) 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেবপ্রসাদবাবু যে প্রবন্ধ দুটি পড়েছিলেন প্রথম চিঠিতেই তা কবিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

পৌষে প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন,

১. 'ধ্বনিসঙ্গত বানান এক আছে সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায়। আর কোন ভাষায় আছে কিম্বা ছিল কিনা জানিনে। ইংরেজি ভাষায় যে নেই অনেক দুঃখে তার আমরা পরিচয় পেয়েছি।'

২. 'উচ্চারণের বৈষম্য সত্ত্বেও শব্দের পুরাতত্ত্বঘটিত প্রমাণ রক্ষা করা বানানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এমন কথা অনেকে বলেন। আধুনিক ক্ষাত্রবংশীয়রা ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করেছে তবু দেহাবরণে ক্ষাত্রইতিহাস রক্ষার জন্যে বর্ম পরে বেড়ানো তাঁদের কর্তব্য এ উপদেশ নিশ্চয়ই পালনীয় নয়।'

৩. 'কৃত্রিম বানান একবার চলে গেলে তার পরে আচারের দোহাই অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে।'

৪. [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার-বিধি স্থির করার পর] 'ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনায় ব্যাপারটাকে অনিশ্চিত করে রাখা অনাবশ্যক।'

দেবপ্রসাদবাবুর চিঠির উত্তরে প্রথম পত্রে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এ-কথাগুলিই জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও বিস্তারিত কিছু অভিমত প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে উল্লেখনীয় :

১. 'আইন বানাবার অধিকার তাঁদেরই আছে আইন মানাবার ক্ষমতা আছে যাঁদের হাতে।' সেই জন্যেই কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বানান-সংস্কারে উদ্যোগী হতে বলেন।

২. 'সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির এক নূতন কীর্তি। একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া।' বাংলা ভাষা ও বাংলা বানানকে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেই দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

৩. 'ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কর্তব্য তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা।' তৎসম শব্দের বানানে প্রচলন অপেক্ষা সরলতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেবপ্রসাদবাবুর বিপরীত মতই পোষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ধীরে ধীরে কালের ও ব্যবহারের সহজ গতিতে ভাষার যেরকম বিবর্ত্তন স্বাভাবিক তাহাই হইতে থাকুক'।

দেবপ্রসাদবাবুর (২৩ শ্রাবণ ১৩৪৪-এর চিঠি) এই চ্যালেঞ্জে অবশ্য পরিণামে রবীন্দ্রনাথেরই বক্তব্য সপ্রমাণিত হয়েছে।

বানানে অরাজকতার প্রশ্নে সাধারণত ইউরোপীয় ভাষার বানানে বিশৃঙ্খলার যুক্তি দেখানো হয়। দেবপ্রসাদবাবুও তা দেখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে জানান ইউরোপীয় ভাষার বানানে অরাজকতা দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত বলে সেখানে 'কালে কালে যে সকল অসঙ্গতি ঘটেছে হঠাৎ তার সংশোধন দুঃসাধ্য। প্রাকৃত বাংলা ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাশপোর্ট পেয়েছে। এখন ওর বানান নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তো।' সাধু বাংলার বানানও সুদীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠিত এ মত তিনি মানতে চাননি এবং দেবপ্রসাদবাবু বহু উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের ধারণাই সঠিক। উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকায় 'বিষয়ি', 'ব্যবসায়ি', 'সংপ্রতি', 'সম্প্রতি' ইত্যাদি বানান তো চলতই। তাছাড়া রামমোহন যেখানে লিখেছেন :

প্রাণি, অপ্রাণি, জ্ঞানি, মানি, গোস্বামি, বিবেকি, স্বামী, সর্ব্বব্যাপি। বিদ্যাসাগর ঝুঁকেছেন দীর্ঘস্বর ব্যবহারের প্রবণতার দিকে :

আশ্রমবাসী, তপস্বী, তপোবনবাসীরা (শকুন্তলা, ১ম সংস্করণ ১৮৫৪; সম্ভবত প্রচলন অনুযায়ী আশ্রমবাসি তপস্বি বানান ছাপা হয়। তাই অশুদ্ধি সংশোধনে বানান পরিবর্তন করা হয়েছে।

গুণগ্রাহী, দড়ী, থলী, দরজী, দাড়ী (ভ্রান্তিবিলাস ২য় সংস্করণ ১৮৭৫)

অন্যপক্ষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণ (১২৮৯, ১৮৮২) দু'ধরনের বানানই দেখা যায় :

গৃহবাসীরা, গ্রামবাসিগণ, পক্ষী, মঠবাসীদিগের সন্ন্যাসিবেশ চটী, মাটী, লাঠী, দাড়ি, ভণ্ডামী, ডাকতী, তলপী, খাঁটী, কন্যাটী।

আমাদের সনাতন প্রথার মতো বানানকেও সনাতন ভেবে নেওয়ার প্রবণতায় সত্য অনেক সময় চাপা পড়ে বিভ্রাট ঘটায় দেবপ্রসাদবাবুর সিদ্ধান্ত থেকে এমন ধারণাই হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম মেনে নেওয়ার অঙ্গিকার করেও রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধেই কিছু অসঙ্গতির প্রশ্ন তুলেছেন। ক্রিয়াপদের বানান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কার্তিকে প্রকাশিত প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য :

'আমরা যাকে সাধুভাষা বলে থাকি বিশ্ববিদ্যালয় বোধ করি তার প্রচলিত বানানের রীতিতে অত্যন্ত বেশি হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নন।'

এ ধরনের মনোভাব জানালেও এই জাতীয় সমালোচনার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ২৯ জুন ১৯৩৭-এর চিঠিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার মেনে নিয়েও যে তিনি 'মাঝে মাঝে প্রতিবাদ' করেন

সে শুধু 'বিচারকদের সহায়তা করবার জন্যেই, বিদ্রোহ করবার জন্যে নয়। এখনো সংস্কার কাজের গাঁথুনি কাঁচা রয়েচে, এখনো পরিবর্তন চলবে, কিন্তু পরিবর্তন তাঁরাই করবেন, আমি করব না।'

এই শেষ কথাটা তিনি অবশ্য পালন করেননি। বিশ্ববিদ্যালয় বানান-বিধির আর পরিবর্তন ঘটাননি কিন্তু 'প্রাকৃত বাংলা'র বানানে রবীন্দ্রনাথ চলেছিলেন নিজের মতে, আপন পথে। বর্তমানে বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলার অন্তত কিছু অংশের জন্যে তিনিই দায়ী। এটা সঠিক পথে যাওয়ার লক্ষণ কিনা আজও আর মীমাংসা হয়নি।

১৯৩৭-এর বিতর্কের কাল থেকে বর্তমানের কালগত ব্যবধান কম নয়। তবু যদি প্রাসঙ্গিকতার কথা বিবেচনা করা যায় তবে দেখা যাবে এই বিতর্ক-বিষয় কালের গুণে তামাদি হয়ে যায়নি। আজও বাংলা বানানে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা আছে যার জন্যে বানান-বিধির প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকে স্বীকার করেন। আবার এমন অনেকেও আছেন যাঁরা সে প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও যে-কোন প্রস্তাবের মধ্যেই খুঁজে পান নানা ফাঁক-ফোকর, অসঙ্গতি। একদলের মত যদি রবীন্দ্র মতানুযায়ী হয় অন্যদলের যুক্তি চলে দেবপ্রসাদবাবুর ধারণা ও পন্থা অনুযায়ী। 'বানান বানাবার ক্ষমতা' যখন নেই 'নিয়ম বানাবার' চেষ্টা অর্ধপথেই স্তিমিত হয়ে যায়। শিক্ষা সম্বন্ধে দেবপ্রসাদবাবুর কিছু প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন 'মত পরিবর্তনের' আগে চাই 'মনঃ প্রকৃতির পরিবর্তন'। সত্যিই যদি তা ঘটে তাহলে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান-বিধি এবং দেবপ্রসাদ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ভবিষ্যৎ বানান-সংস্কারে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর

বরুণকুমার চক্রবর্তী

জীবনস্মৃতিতেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সাক্ষাৎকারের উপলক্ষ্যটি ছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথ কৃত শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদ শোনানো। অর্থাৎ শ্রোতারূপে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মোলাকাৎ। 'ঘরের পড়া' শীর্ষক অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তিনি (রামসর্বস্ব পণ্ডিত) একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়াছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল; তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহসবৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই; অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।'

এই বিবরণ মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রোতা রূপে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বকে পেয়ে যে যার পর নাই পুলকিত হয়েছিলেন, সেই মনোভাব গোপন রাখেননি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে 'কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম, তৎপূর্বে 'বোধকরি' যুক্ত করে একটা অনিশ্চয়তার সুর যুক্ত করেছেন অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে স্মরণ করতে পারেননি যে তিনি উৎসাহিত হয়ে ফিরেছিলেন কিনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রোতারূপে প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত হয়নি, যদিও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত পরামর্শ বা উপদেশের কথা তিনি স্মরণে রেখেছেন এবং সেই পরামর্শের উল্লেখও করেছেন। হয়ত বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মত নির্দিষ্ট ভাবে কোনো পরামর্শ দেননি, কেবল শ্রোতা রূপে তাঁর প্রসন্নতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং এভাবেই কিশোর কবিকে উৎসাহিত করে থাকবেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিচারে গুটি কয়েক যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় এবং ভক্তিভাজন রূপে তাঁর তালিকাভুক্ত ছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগর-চরিত' নামে সুদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে সেই প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথও একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন, এটি 'চারিত্রপূজা' (১৩১৪) গ্রন্থে বিদ্যাসাগর-চরিত প্রবন্ধটির পর সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে '২' সংখ্যায় চিহ্নিত করে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রচিত ৩ সংখ্যক প্রবন্ধটি লিখলেন 'বিদ্যাসাগর' শিরোনামে, যেটি সম্পূরণ প্রবন্ধ '৩' বলে চারিত্রপূজা গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষে রবীন্দ্রনাথ সীমিত পরিসরে রচনা করলেন 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি'। এর কিছু পূর্বে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৪ ভাদ্র 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' শিরোনামে একটি চতুর্দশপদী রচনা করেছিলেন মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির রচনা উপলক্ষ্যে। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে তিনি যে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন তারই প্রমাণ তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনা এবং সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর স্মরণানুষ্ঠানে তাঁর যোগদান। নিরবচ্ছিন্নভাবে।

'চারিত্রপূজা' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটিই বিদ্যাসাগরকেন্দ্রিক, শুধু তাই নয় এটিই গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলির মধ্যে দীর্ঘতম। তবে সেই সঙ্গে এ তথ্যটিও উল্লেখ্য যে 'ভারত পথিক রামমোহন রায়' নামে যেমন রামমোহনকে নিয়ে একটি পুস্তিকা তিনি রচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তেমনি একটি গোটা বই লেখেননি। তা না লিখুন, তার মানে কিন্তু এই নয় যে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বোধ কিছু কম ছিল। এবার আমরা চারিত্রপূজার অন্তর্গত বিদ্যাসাগর চরিত (১-৩) আলোচনায় প্রয়াস পাব এবং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত মূল্যায়নের পরিচয় গ্রহণ করব।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে 'বিদ্যাসাগর চরিত' বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা। বিদ্যাসাগরের সমস্ত দিক এই প্রবন্ধে যথোচিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিদ্যাসাগরের 'অযোগ্য ভক্ত' বলে অভিহিত করেছেন। এর মাধ্যমে একদিকে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যে কী সুগভীর ছিল তার যেমন প্রমাণ মেলে, অন্যদিকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অতুলনীয় বিনয়। এই প্রবন্ধটি নানা কারণেই সবিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে প্রবন্ধটি রচিত। নিছক ভাবাবেগ তাড়িত মূল্যায়ন নয়, প্রতিটি বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের সুযুক্তি প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনায় বিশেষ ভাবে সহায়তা নিয়েছেন বিদ্যাসাগরের স্বরচিত বিদ্যাসাগর চরিত এবং বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর—জীবনচরিতের। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই দুটি সূত্রকেই বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করেছেন, দুটি সূত্র থেকেই সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধার করে দিয়েছেন নিজ বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণে। প্রবন্ধটির আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বিদ্যাসাগরের অনন্যতার উৎস সন্ধান। এক্ষেত্রে বোধকরি তিনি স্বয়ং বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে থাকবেন। বিদ্যাসাগর তাঁর রচিত জীবন চরিতে প্রকৃত পক্ষে নিজের কথা কিছু বলেননি, সবিস্তারে পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ, পিতৃদেব ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পরমারাধ্য মাতৃদেবী ভগবতী দেবীর বিস্তারিত পরিচয় দান করেই আকস্মিক ভাবে ইতি টেনেছেন। আপাতভাবে মনে হবে জীবন চরিতটি তাই অসমাপ্ত। আসলে প্রচারবিমুখ বিদ্যাসাগর প্রকারান্তরে নিজের কথা তাঁর পিতামহ, পিতৃদেব, জননীর মাধ্যমেই উপস্থাপিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত মানেই ত এই তিনজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর যোগফল। তাই নিজের কথা বলে আর পুনরাবৃত্তি দোষে আত্মচরিতকে দুষ্ট করতে চাননি তিনি। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করেছেন সম্যকভাবে তাই বিদ্যাসাগর চরিত আলোচনা কালে তিনি যথোচিত ভাবে আলোকপাত করেছেন রামজয় তর্কভূষণ, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবতী দেবী সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, 'ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।' বিশেষত পিতামহ ও মাতৃদেবীর প্রভাবকেই সমধিক বলে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গতভাবেই চিহ্নিত করেছেন। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের চরিত্র বর্ণনা ইচ্ছাকৃতভাবে সবিস্তারে করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন :

'...এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল

> যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।'

প্রখর আত্মমর্যাদা বোধ, তেজস্বিতা, অটল জেদ এই সব গুণই বিদ্যাসাগর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন রামজয় তর্কভূষণের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ রামজয় তর্কভূষণের পর বিদ্যাসাগরের পিতৃদেব ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ এনেছেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিসরে। কেন? কারণ বিদ্যাসাগরের চরিত্র গঠনে তুলনামূলকভাবে তাঁর পিতৃদেবের প্রভাব ছিল সীমিত—সংগ্রামী মানসিকতা, চরম কৃচ্ছ্রসাধন এবং দায়িত্বপালনে নিষ্ঠা এগুণ গুলি বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন ঠাকুর দাসের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ভগবতীদেবীর কথা সবিস্তারে বলেছেন, তাঁকে তুলনা করেছেন চৈতন্যজননী শচীমাতার সঙ্গে। মন্তব্য করেছেন :

> 'বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালোরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে।'

ভগবতী দেবী ছিলেন দয়াময়ী রমণী। তাঁর দয়া ছিল অকুণ্ঠিত। ভগবতী দেবীর নিয়মিত কার্য ছিল রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, শোকাতুরের দুঃখে শোকপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ অতি সঙ্গতভাবেই ভগবতীদেবীর দয়ার মধ্যে অসাধারণত্ব লক্ষ্য করেছেন। কী সে অসাধারণত্ব? তাঁর দয়া কোনো প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারে আবদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়ার সঙ্গে ভগবতী দেবীর দয়ার আরও পার্থক্য ছিল। সাধারণ লোকের দয়া 'দিয়াশলাই-শলাকার মতো বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলে ওঠে, কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত।' রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, 'মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা' গ্রামীণ এই মহিলা উপলব্ধি করেছিলেন কী রূপে? কেমন করে তিনি প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ এমন অনায়াসে বর্জন করতে সক্ষম হলেন? রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্‌ঘাটিত ছিল, বিদ্যাসাগর যে সংস্কারমুক্ত মানবিক মূল্যবোধের প্রতিভূরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল দেবী সদৃশা ভগবতী দেবীর সৌজন্যেই—

> 'অভিমন্যু জননী-জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।'

আপাতভাবে মনে হতে পারে বিদ্যাসাগর চরিত্র আলোচনায় তাঁর পিতামহ, পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ কী ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইলেন; না, তিনি যে বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবনের হদিশ দিতে সচেষ্ট তা কখনই সম্ভব হত না বিদ্যাসাগরের পূর্ব পুরুষদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ব্যতিরেকে। রবীন্দ্রনাথের এই দূরদৃষ্টির প্রশংসাই করতে হয়।

এবারে আসি সরাসরি বিদ্যাসাগরের আলোচনায়। আক্ষরিক অর্থেই বিদ্যাসাগরের চরিত্রটি ছিল Multi-dimensional, রবীন্দ্রনাথ একে একে এই অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটির প্রতিটি ডাইমেনসনেরই পরিচয় দিয়েছেন বিশ্লেষণাত্মক রীতির অনুসরণে।

বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন তাঁর বঙ্গভাষায় অবদান নিয়ে। 'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা', শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।' বস্তুত নিমজ্জমান দশা থেকে বাংলা গদ্যকে কঠিন গ্রানিট স্তরে স্থাপনের কৃতিত্ব

রামমোহনের, কিন্তু আর যাইহোক রামমোহনকে গদ্যশিল্পীর তকমা দেওয়া চলে না, সে তকমার যোগ্য দাবিদার বিদ্যাসাগর। বিস্তারিতভাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন তেমন করে কতকগুলি বক্তব্যকে উপস্থাপন করলেই কর্তব্য সমাপন হয় না, পরিবেশন নৈপুণ্যেরও প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর সেই নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।' কাজটা যে সহজসাধ্য ছিল না বরং অতিশয় দুরূহ, আর একার্যে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল বিদ্যাসাগরের মত একজনের রবীন্দ্রনাথ তা বোঝাতে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন বাংলা গদ্য শৈলী সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার—

> 'অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃ স্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।'

পদ্যের মত গদ্যেরও যে একটা ছন্দ আছে বিদ্যাসাগর সেটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অর্থানুযায়ী কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি বিরাম চিহ্নের ব্যবহারও প্রথম করেন বিদ্যাসাগর। অবশ্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কিছু উল্লেখ করেননি।

এখন প্রশ্ন হল বিদ্যাসাগর চরিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা চর্চায় বিদ্যাসাগরের ভূমিকার প্রসঙ্গ আনিলেন কেন? আনলেন একাধিক কারণে। প্রতিভার বহুমুখিনতার অভিশপ্ত দিক তা হল বিশেষ একটি দিককে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্য দিকগুলিকে অবহেলিত রাখা। বিদ্যাসাগর খ্যাতকীর্তি সমাজ সংস্কারক কিন্তু তিনি একজন অসাধারণ গদ্য শিল্পীও। দুঃখের বিষয় সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে যদি বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারকের পরিচিতি অর্জন নাও করতেন, তথাপি গদ্য শিল্পীরূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর একটি অবিস্মরণীয় স্থান থেকেই যেত। রবীন্দ্রনাথ তাই সর্বাগ্রে বিদ্যাসাগরের সেই স্বল্প পরিচিত ভূমিকার কথা পেড়েছেন। দ্বিতীয় কারণটি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক ভাবে মনে করতেন বাংলা সাহিত্যে যদি তাঁর কোনো অবদান থেকে থাকে তবে তা সম্ভব হয়েছে যাঁর জন্য তিনি আর কেউ নন বিদ্যাসাগর। তাই ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই গদ্য শিল্পী বিদ্যাসাগরের আলোচনার সর্বপ্রথম সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ সোচ্চারকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

> এখন তাহার দ্বারা (বাংলা গদ্য) অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রচিত চতুর্দশপদীতেও বিদ্যাসাগরের বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তকারী ভূমিকা পালনের বিষয়টিকে উপজীব্য করেছেন :

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে, অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ্র অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যূষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বাসিল বিস্মিত গগনে।

রবীন্দ্রনাথ আতিথ্য নিয়েছেন বিদ্যাসাগরের, বললেন—

ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—বিদ্যাসাগর যে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ মাত্র নেই। কিন্তু আমরা যে তাঁকে নিয়মিত স্মরণ করি, তাঁর জন্য গৌরবান্বিত বোধ করি তার কারণ কী শুধু তাঁর প্রতিভা? রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন—

> প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। ... বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

কেন? এ প্রশ্নের জবাবও তিনি দিলেন এই বলে—

> 'প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। ... প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। ... চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা...।'

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিস্ময়কে গোপন রাখতে পারেননি। বঙ্গ সমাজে তাঁর পুণ্য অবির্ভাব রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছে—

> 'বিদ্যাসাগর এই অপুতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গ সমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই একজনের নাম মনে পড়ে...।'

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন রামমোহনের নাম। যদিও রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপায় ভূষিত করেছেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের তুলনায় রামমোহনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় সে বিষয়ে নিরুত্তর থেকেছেন কেবল এই দুই মনীষীর সাযুজ্যের ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করেছেন—

> 'তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায় আচার ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না, স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা

সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয় সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।'

বাঙালি সমাজে এঁরা নিতান্তই বেমানান। এঁদের সঙ্গে গড় বাঙালির এতখানি পার্থক্য যে এঁদের বাঙালি বলে স্বীকার করলে যেন আমরা আর বাঙালি পদবাচ্য থাকি না, বিপরীতক্রমে আমরা যদি বাঙালি হই তবে রামমোহন বিদ্যাসাগরকে যেন বাঙালি বলে দাবি করা অসমীচীন হয়ে পড়ে। তাইত রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়—

'বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙ্গালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুইএকজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।'

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যে দিকগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম, তীব্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী সাফল্য। সংগ্রাম বিমুখ, অল্পে ভেঙে পড়া বাঙালির প্রেক্ষিতে এ এক অভাবনীয় ঘটনা।

'তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনো প্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায় বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।'

'বিদ্যাসাগরে'র মত ঈশ্বরচন্দ্র অপর যে পরিচিত বিশেষণে পরিচিত তা হল 'দয়ার সাগর'। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়া বাঙালি সুলভ ছিল না, এ দয়ার বিশেষত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নয়, 'প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম'। বিদ্যাসাগর প্রদর্শিত দয়ায় বাঙালিজন সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়নি, তাঁর দয়ায় প্রবৃত্তির উত্তেজনা মাত্র প্রতিফলিত হত না, সে দয়াধর্মে 'সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ' করত। পরের উপকারে তিনি নিজের সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করতেন। এর মধ্য দিয়েও তাঁর আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পেত। বস্তুত বিদ্যাসাগরের কারুণ্যের মধ্যে পৌরুষের লক্ষণ প্রকাশ পেত। তাঁর দয়ার সঙ্গে বীর্যের সমন্বয় ঘটে ছিল। দয়ার অনুরোধে তাঁকে বহু বড় মাপের স্বার্থত্যাগ করতে দেখা গেছে অথচ তিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্যও তিল মাত্র অবনত হতে দেননি।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের যে বিশেষ স্নেহ ও ভক্তি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেও রবীন্দ্রনাথ সমহৎ পৌরুষের লক্ষণের অবস্থিতি লক্ষ করেছেন। নারী জাতির প্রতি তিনি করুণাপ্রদর্শন করা থেকে বিরত থেকেছেন।

বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার সূচনা ও বিস্তারেও বিদ্যাসাগরের ছিল অতুলনীয় ভূমিকা। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করে তাকে তিনি রাজবিধিসম্মত করে তবে বিরত হয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের কাজ ছাড়ার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি রূপে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কীর্তিত হয়েছে তাঁর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা। দ্বিবিধ কারণে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনার গুরুত্ব। প্রথমত, 'বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম'। দ্বিতীয়ত, এরই মাধ্যমে 'আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।' এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য—

> 'যিনি লোকাচার রক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে যুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরাজি বিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।'

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন, তা হল এই মনীষীর অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব। বাঙালির জাতিগত সীমাবদ্ধতার উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের অনন্যতা জরিপ করেছেন—

> 'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।'

এই প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের মূর্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ আত্মপ্রকাশ। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন 'কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের' বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।'

'বিদ্যাসাগর-চরিত' নিছক ভাবালুতা তাড়িত ব্যক্তিপূজা মাত্র নয়, অলোক সামান্য এক চরিত্রের যুক্তিনিষ্ঠ ও মনন সমৃদ্ধ মূল্যায়ন। 'চারিত্রপূজা'র শ্রেষ্ঠ সংযোজন এটি এবং মনীষীচরিত ব্যাখ্যানে এটি নিঃসন্দেহে একটি আদর্শস্থানীয় নিদর্শন।

রবীন্দ্র-কবিতার অনুবাদ ও ব্যাকরণের বাধা

সুমিতা চক্রবর্তী

অনুবাদের প্রয়োজন, পদ্ধতি, বৈচিত্র্য ও সমস্যা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে অনেকদিন ধরে। তার পুনরুক্তি অথবা পুনর্বিশ্লেষণ কিছুই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল অনুবাদের একটি বিশেষ ধরনের সমস্যার উল্লেখ করতে চাই। সমস্যাটির উদ্ভব ব্যাকরণের নিয়ম থেকে। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদে ভাষার সেই ব্যাকরণ-বিধি কী ধরনের জিজ্ঞাসা ও সমস্যা জাগাতে পারে—তা-ই আমাদের আলোচ্য।

অনুবাদ-সংক্রান্ত একটি বিশিষ্ট সমস্যা হল ভাষার ব্যাকরণ। কবিতা এবং কথাসাহিত্য উভয়তই সমস্যাটি আছে। কিন্তু কবিতায় তা তুলনামূলকভাবে বেশি প্রকটিত। তার কারণ একটু পরেই স্পষ্ট হবে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণে ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের লিঙ্গভেদ নেই। বিশেষণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। আমরা 'সুন্দরী মেয়ে' বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করলেও ভালো, দুষ্টু, চালাক, রুগ্ন ইত্যাদি বিশেষণ ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে ব্যবহার করি। আজকাল 'সুন্দর মেয়ে', 'বিদ্বান মহিলা'—ইত্যাদি প্রয়োগও বাংলা ভাষায় যথেষ্টই প্রচল। ইংরেজি ভাষায় ক্রিয়াপদে ও বিশেষণে লিঙ্গভেদ না থাকলেও সর্বনামের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের একবচনে তা আছে। হি (He) এবং শি (She) পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাবেই পৃথক। কিন্তু হিন্দি ভাষায় ক্রিয়াপদে অতি সুস্পষ্ট লিঙ্গভেদ আছে। বিশেষণেও লিঙ্গভেদ চলিত আছে যথেষ্ট। হিন্দির মতো গুজরাতি এবং আরও কোনো কোনো উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় ভাষায় আছে ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণের লিঙ্গভেদ।

এবার দেখা যাক অনুবাদক যদি একটি কবিতার সম্পূর্ণ ভাবানুসারী এবং যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করতেও চান তাহলেও তাঁর কী সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক কবিতা আছে যেখানে কবিরা প্রধানত ব্যবহার করেন দুটি মাত্র সর্বনাম—'আমি' এবং 'তুমি'। লিরিক কবিতায় এ ব্যাপারটা খুব বেশি দেখা যায় কারণ লিরিক-এর প্রকৃতিই হল ব্যক্তিগত। এই 'আমি' এবং 'তুমি'-কে অনুবাদ করবার সময় অনুবাদক সর্বনামের আড়ালে থাকা ব্যক্তিস্বরূপটিকে নারী অথবা পুরুষ—কীভাবে দেখবেন? যদি বলা যায়—নির্দিষ্টভাবে নারী বা পুরুষের পরিবর্তে এক প্রাণময় সত্তা বলে এই সর্বনামকে ভাবলে ক্ষতি কী? ক্ষতি কিছু নেই, কিন্তু একটু সমস্যা আছে। হিন্দি ভাষার অনুবাদক-কে ক্রিয়াপদে লিঙ্গভেদ রাখতেই হবে। যদি তিনি 'আমি' এবং 'তুমি' সর্বনামের অন্তরালবর্তী ব্যক্তি-স্বরূপটিকে দৃশ্যমান রূপে না দেখেন তাহলে ক্রিয়াপদের লিঙ্গ তিনি কী ভাবে স্থির করবেন? যদি কোনো চিত্রকর একটি লিরিক থেকে একটি ছবি আঁকতে চান তাহলে তাঁরও প্রয়োজন হতে পারে 'আমি' এবং 'তুমি'র অন্তরালবর্তী শরীরী অবয়ব।

যখন কবিতার প্রাসঙ্গিকতায় সর্বনামের দ্বারা সংকেতিত ব্যক্তিটির অবয়ব বোধগম্য এবং

অনুভব-গম্য থাকে তখন অনুবাদক আসতে পারেন একটি সিদ্ধান্তে। কাহিনিমূলক কবিতায় থাকে গল্প-আভাস এবং চরিত্র। সেই চরিত্রের রূপমূর্তি নির্দেশিত হয় 'আমি' সর্বনামে। যেমন 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্য-কবিতায় দুর্যোধনের উক্তি—

''আমি চাহি ভয়, সেই মোর রাজপ্রাপ্য
আমি চাহি জয়, দর্পিতের দর্প নাশি''

এখানে অনুবাদ করবার সময় অনুবাদক ক্রিয়াপদে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করবেন কারণ বক্তা দুর্যোধন পুরুষ।

একটি কবিতায় ভাষা দিয়ে যে ছবিটি আঁকা হয় সেখানেও অনেক সময় চরিত্রের রূপরেখা ভেসে ওঠে। যেমন 'শুভক্ষণ' কবিতায় যে বলেছিল—''ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে''—সেই বাক্যের 'আমি' যে নারী তা কবিতাটির অন্যত্র বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সে বলেছে—''কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ'', এবং সে আরও বলেছে—''ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে/নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে।'' এখানে এই 'আমি'-কে নারী স্বরূপে অনুবাদক বিনা সমস্যায় প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

সমস্যাটি সর্বাধিক জটিল হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ লিরিকের ক্ষেত্রে। 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী/আমি অবাক হয়ে শুনি।'' এখানে 'তুমি' সর্বনামের আড়ালে নারী আছেন অথবা পুরুষ—যেমন অভিরুচি বা পক্ষপাত—তেমনই ধরে নিতে পারেন পাঠক। সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'আমি' সর্বনামে গানটির শ্রোতা বা পাঠক বসাতে পারেন নিজেকে। সেখানেও সেই ব্যক্তি হতে পারেন নারী অথবা পুরুষ। কেউ কেউ আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব অনুসারে গানের রচয়িতা হিসেবে 'আমি' ব্যক্তিটির আড়ালে একজন পুরুষকেই সর্বদা অনুভব করবেন। যদিও শিল্প-অবয়বের 'আমি' যে সর্বদাই শিল্পী-ব্যক্তিত্বের 'আমি' হবেনই—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

অনেকে বলতে পারেন, এই লিঙ্গভেদ জেনে নেওয়া কি খুবই জরুরি? গুণী এবং গুণগ্রাহী তাঁরা নারী অথবা পুরুষ—যা-ই হোন তাতে কী-ই বা আসে যায়। ঠিকই, এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে খুব বেশি আসে যায় না কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্টই আসে যায়—তা আমরা পরে দেখব।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতার অন্যান্য বর্ণনার সাপেক্ষে 'আমি' এবং 'তুমি'-র নারী-পুরুষ পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন কবিতাটি যদি কাহিনিমূলক কবিতা হয়, পুরো কাহিনি না থাকলেও যদি কবিতাটিতে রচিত হয় কোনো কাহিনি-আভাস—তাহালে যে-চারিত্রের বয়ানে কবিতাটি রচিত সেই চরিত্রের রূপমূর্তি পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায় 'আমি' উচ্চারণ করবার মুহূর্তেই। যেমন 'কথা ও কাহিনী'-র অধিকাংশ কবিতা। 'নকলগড়' কবিতায় রানার ভৃত্য কুম্ভ যখন বলে—''নকল বুঁদি রাখব আমি হারাবংশী বীর।'' এখানে আমি মানে কুম্ভ—তা নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এমন উদাহরণ অনেক আছে। এই প্রসঙ্গ প্রলম্বিত করছি না।

অনেক সময়ে কবিতায় শব্দ দিয়ে আঁকা হয় একটি ছবি। সেই ছবির বর্ণনা-সূত্রেই চরিত্রের যে-রূপরেখা ফুটে ওঠে সেখানে লিঙ্গভেদ থাকে যথেষ্টই স্পষ্ট। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'শুভক্ষণ' কবিতায় কথক চরিত্রটির বিষয়ে আগে বলা হয়েছে।

আবার অনেকসময় কবির লেখায় 'আমি' অনেক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে 'আমি'

'আমরা'-র ব্যঞ্জনা দেয়। সেই 'আমি'-তে বোঝায় সর্বজন। সেখানে লুপ্ত হয়ে যায় নারী ও পুরুষের পার্থক্য। দেশপ্রেমের গানে এই 'আমি'র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' 'আমি' অর্থে এখানে সমগ্র বাঙালি জাতি। অনেক ভক্তিগীতিতেও 'আমি' অর্থে ভক্তবর্গ বোঝায়।

পূর্বোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে কবিতার ভাষায় উচ্চারিত 'আমি'-র ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের রূপ মোটের উপর বোঝা গেল। কিন্তু কবিতায়, বিশেষ করে লিরিক কবিতায়, যেখানে কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের উপলব্ধিই প্রধান অবলম্বন সেখানে যখন 'আমি' সর্বনামের প্রয়োগ ঘটে তখন সেই সর্বনামের অন্তরালবর্তী কোনো অবয়ব আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না। আগে বলেছি, সর্বক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও হয় না। সেই 'আমি' কবি-সত্তার নির্দেশক। এবং কবি অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায়—'সত্তার স্বরূপ বর্ণ নেই।'

এই যুক্তি আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তার পরেও বলব অনেক কবিতাতেই প্রযুক্ত সর্বনামের আড়ালে ব্যক্তি-মূর্তিটি নারী অথবা পুরুষ তা নির্ণয় করে নেবার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। এই নির্ণয়ের সঙ্গে কবিতার তাৎপর্য, কবিতার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তার ফলে কবিতার আকাশে দেখা দিতে পারে অন্য আলোর উদ্ভাস।

বাংলা ভাষার কবিতার ক্ষেত্রে ভাষার সর্বনামে এবং ক্রিয়াতে লিঙ্গভেদ না থাকায় 'আমি' এবং 'তুমি' চিহ্নিত ব্যক্তিরা নারী অথবা পুরুষ—তা যে অনেক সময় বোঝা যায় না, মাঝে মাঝে সমস্যা ঘটালেও, তার একটা সুবিধেও আছে। সুবিধেটা এই যে, কবিতার পাঠক বা শ্রোতা এখানে নিজের কল্পনাকে প্রসারিত করবার একটি অবকাশ পেয়ে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত হওয়া যেতে পারে কিন্তু বিরোধ বাধবে না। অন্য অনেক ভারতীয় ভাষায় কিন্তু ব্যাকরণের গঠনটাই এমন যে, সেখানে সর্বনাম, ক্রিয়া ও বিশেষণের লিঙ্গভেদ সুস্পষ্ট। যেমন হিন্দি এবং গুজরাতি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি এই দুইভাষার অনুবাদকেরা অনুবাদ করতে যান তাহলে অনুবাদক কিন্তু কবির 'আমি'-কে লিঙ্গবিহীন অন্তরসত্তা বলে পার পাবেন না। তাঁকে ঠিক করে নিতেই হবে কবিতার 'আমি' ও 'তুমি'-র মধ্যে কে পুরুষ আর কে নারী। চিত্রশিল্পীরও আছে এই একই সমস্যা। কবিতা থেকে যদি ছবি আঁকতে হয়, সেই ছবিতে থাকে যদি ব্যক্তিরূপের কোনো আভাস তাহলে নারী অথবা পুরুষ এটা ঠিক করে নিতেই হবে তাঁকে। অনেক অনুবাদকেরও সমস্যাটি একই। সেটা যে সত্যি একটা সমস্যা তা কয়েকটি উদাহরণ আলোচনা করলেই বোঝা যায়। উদাহরণের জন্য আমরা ব্যবহার করেছি রবীন্দ্র কবিতার কিছু হিন্দি অনুবাদ এবং অনুবাদের দৃষ্টান্তগুলি গ্রহণ করেছি তিনটি সংকলন-গ্রন্থ থেকে। প্রথমে সেই সংকলনগুলির পরিচয় দেওয়া হল। তিনটি সংকলনই প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য অকাদেমি থেকে।

১। প্রথম সংকলনটির নাম 'একোত্তরশতী'। প্রকাশ ১৯৫৮। তখনও রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ আসেনি। ভূমিকা লিখেছেন হুমায়ুন কবির। বেশ যত্নসম্পাদিত সংস্করণ। তবে সম্পাদকের নাম নেই। দেবনাগরি হরফে বাংলা কবিতাগুলিও দেওয়া আছে। প্রতিটি কবিতার নীচে দেওয়া আছে অনেক শব্দের অর্থ। অর্থ সম্পর্কিত এই টীকা প্রস্তুত করেছেন বিশ্বভারতীর হিন্দি ভবনের তৎকালীন অধ্যাপক শ্রীরামপূজন তিওয়ারি। কিন্তু কবিতাগুলির অনুবাদক কে বা কারা—তার কোনো হদিশ নেই সংকলনটিতে।

২। দ্বিতীয় সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭-তে; দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৯৮২-তে; পুনর্মুদ্রণ

হয় ১৯৯২-এ। এটির নাম 'রবীন্দ্রনাথ কী কবিতা'। সম্পাদক রূপে কারও নাম নেই। এখানেও সংযোজিত হয়েছে হুমায়ুন কবির লিখিত পূর্বোক্ত ভূমিকাটি। লেখার নীচে তারিখ দেওয়া আছে ২২ এপ্রিল ১৯৫৭। এই সংকলনটিতে প্রদত্ত আছে অনুবাদকদের নাম এবং নির্দেশিত আছে কোন কবিতা কে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদকদের নামগুলি হল—হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী, রামধারী সিংহ দিনকর, হংসকুমার তিওয়ারি এবং ভবানীপ্রসাদ মিশ্র। যোগ্য ব্যক্তিরাই অনুবাদ করেছিলেন তাতে সংশয় নেই।

৩। সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত তৃতীয় সংকলনটির নাম 'রবীন্দ্ররচনা সঞ্চয়ন', প্রকাশ ১৯৮৭-তে, রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে। সংকলক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংকলনেও প্রদত্ত নেই অনুবাদকদের নাম। ইংরেজিতে লেখা আছে 'Translated in Hindi by several writers'।

আমরা এখন দেখব কয়েকটি হিন্দি অনুবাদের নমুনা। আমাদের বলবার বিষয়টি তাতে বোঝানো যাবে।

রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতা। ''আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম গ্রামের পথে পথে/তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে।'' এই কবিতাটি চিরকালই এই ভেবে পড়ে এসেছি—ভিক্ষুক ও রথ-আসীন রাজা দুজনেই পুরুষ। কিন্তু হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এই কবিতার প্রথম পঙক্তির অনুবাদ করেছেন—''ম্যয় গাঁও মে গলী গলী ভীখ মাংগতি ফিরতি থী''। এই কবিতার 'আমি' অনুবাদকের চোখে 'ভিক্ষুক' নয়, 'ভিখারিনি' হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী যখন রবীন্দ্রনাথের 'দান' কবিতা অনুবাদ করেছেন—ব্যাপারটা হয়েছে অন্যরকম। কবিতা-পঙক্তি—

''হে প্রিয় আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান।''

কবিতার কথক 'আমি' উদ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বকে 'প্রিয়' বলে সম্বোধন করা সত্ত্বেও সেই 'আমি' অনুবাদকের কাছে পুরুষের মূর্তি—

''ম্যয় জো দে সক্‌তা হুঁ ওয়হ্ অত্যন্ত
মামুলী দান হোগা
ভলে হী ওয়হ্ ফুল হো, ভলে হী ওয়হ্
গান হো।''

বিষয়টি এরকম দাঁড়াচ্ছে—রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'আমি'কে অনেক ক্ষেত্রেই নারী অথবা পুরুষ—যেমন খুশি ভেবে নিতে পারেন পাঠক। তাতে কিছু আসে যায় না এমন নয়। অনেকটাই এসে যায়। আপনা থেকেই গড়ে ওঠে কবিতার বিনির্মাণ।

''ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন,
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।''

এই কবিতার 'আমি'-কে পুরুষ রূপেই দেখবেন অধিকাংশ পাঠক। অশ্বারোহীর পায়ের তলায় অন্তহীন মরুভূমি—এই দৃশ্যে পুরুষকেই বেশ স্বাভাবিক দেখায়। অনুবাদকও নিশ্চিন্তে অনুবাদ করবেন—'অগর ম্যয় হোতা' কিন্তু মানব স্বভাব অনেকটাই সমাজের নির্মাণ। সামাজিক অবস্থানের সূচক। নারী যখন সাঁতরে পার হয়ে যাচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল, উঠে যাচ্ছে হিমালয়ের শীর্ষে; চলে যাচ্ছে আন্টার্কটিকায়; এবং তার পরেও চাঁদে ও মঙ্গলে—তখন ওই উক্তি স্বচ্ছন্দেই হতে পারে নারীরও। নারী হতেই পারেন সেই সুদূরের পিয়াসি।

কিছুদিন আগে সংবাদ পড়েছিলাম—পশ্চিম এশিয়ার কোলে একটি রাষ্ট্রে এক মহিলার বোরখা-র নীচে পায়ের পাতা দেখা গিয়েছিল, অনাবৃত ছিল পায়ের একটুখানি অংশ। সে জন্য তাঁকে মারা হয়েছিল চাবুক। তখন মনে হয়েছিল, চাবুক খেতে খেতে সেই মহিলার মনের মধ্যে নিজের নারী-জীবনকে ধিক্কার দিয়ে জেগে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের ওই পঙ্‌ক্তি—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন', যদি ওই কবিতাটির চলচ্চিত্ররূপ কেউ কখনও দেন তাহলে নারী রূপেও দেখাতে পারেন কবিতার কেন্দ্র-চরিত্রটিকে; সেখানে ব্যবহার করতে পারেন রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি।

উল্লিখিত তিনটি অনুবাদ সংকলন থেকে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কবিতা 'আবির্ভাব'—

"দূরে একদিন দেখেছিনু তব কনকাঞ্চল আবরণ
নব চম্পক আভরণ
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘন নীল গুণ্ঠন তব
চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ,
কোথা চম্পক আভরণ?"

"এক দিন ম্যাঁয় নে তুম্‌হারা স্বর্ণাঞ্চল আবরণ
নব-চম্পক কী-সী ছবি কা আভরণ **দেখাথা**
জব তুম পাস আয়ে, তো ম্যাঁয় নে দেখা
তুম্‌হারা অত্যন্ত সঘন নীল অভিনব অবগুণ্ঠন
দেখা তুম্‌হারে চরণ চঞ্চল চপলা কী
চকিত করনেওয়ালী চমক কে সাথ
বিচরণ কর রহে থে
তব কাঁহা থা তুম্‌হারা চম্পক আভরণ?" (হংসকুমার তিওয়ারি)

এই কবিতার অনুবাদে 'আমি' এবং 'তুমি' দুজনেই হয়েছে পুরুষ।

আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত যথেচ্ছ তুলে আনি।

১। "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লাভিব মুক্তির স্বাদ।"

"ম্যাঁয় অসংখ্য বন্ধনো মেঁ
মহা আনন্দময় মুক্তি কা স্বাদ **লুঙ্গা**।" (ভবানীপ্রসাদ মিশ্র)

২। ''যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই, তাহা চাই না।''

''জো **চাহতা** হুঁ, ভুল সে **চাহতা** হুঁ
অওর জো পাতা হুঁ, উসে **চাহতা** নহী।'' (হংসকুমার তিওয়ারি)

৩। ''মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।''

''সুন্দর সনসার মে ম্যঁয় মরনা নাহি **চাহতা**
মনুষ্য কে বীচমে ম্যঁয় বাচনা **চাহতা** হুঁ।''

'ক্ষণিকা' সংকলনের 'বিরহ' কবিতাটির অনুবাদ রাখছি সব শেষে—

৪। ''ম্যঁয় গৃহকার্য সমাপ্ত কর **চুকী থী**
অওর অকেলী থী কক্ষ মেঁ
বাতায়ন পর **অকেলী বৈঠী** থী
জব তুম গয়ে, তব দোপহরী থী।''

এই অংশের বাংলা ছিল—''দিনের কর্ম সাঙ্গ করে/ছিলেম তখন একলা ঘরে/আপন মনে বসেছিলেম/বাতায়নের পর।''

লক্ষ করি, বাংলা কবিতায় 'আমি' এবং 'তুমি' বললে নারী অথবা পুরুষ যেখানে বোঝা যাচ্ছে না, বাংলা কবিতার পাঠক সেখানে যেমন খুশি ধরে নিতে পারেন। কিন্তু হিন্দি অনুবাদককে নারী অথবা পুরুষ তা নির্দিষ্ট ভাবে ধরে নিতেই হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রথম তিনটি দৃষ্টান্তে অনুবাদক 'আমি'-কে পুরুষ ধরে নিয়েছেন; শেষ উদাহরণটিতে 'আমি'-কে করেছেন নারী।

প্রসঙ্গত জানাই, এই তিনটি হিন্দি অনুবাদ-সংকলনের সব কটি কবিতাই পড়েছি। দেখেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদক 'আমি'কে ধরে নিয়েছেন পুরুষ বলে। কিন্তু যে কয়েকটি ক্ষেত্রে 'আমি' সর্বনামের ক্রিয়ায় সূচিত হয়েছে ভিক্ষা, বিরহ এবং অনুসরণ—সে-সব ক্ষেত্রে কর্তৃবাচ্যকে ধরে নেওয়া হয়েছে নারী বলে।

'এই করেছ ভালো নিঠুর হে'-তে 'আমি' হিন্দি অনুবাদে হয়েছে পুরুষ; কিন্তু 'প্রণামি তোমারে চলিব নাথ সংসার পথে' কবিতায় 'আমি' এসেছে নারীর রূপে। সংস্কৃত সাহিত্যে যদিও বিরহী পুরুষের অভাব নেই। আছে বিরহী যক্ষ, পুরূরবা, 'কাদম্বরী'-র চন্দ্রাপীড়; আছে 'অজবিলাপ' কাব্য—তবু পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে বিরহী পুরুষের চরিত্র খুবই দুর্লভ। পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজ নারীকেই প্রিয়-বিরহে বিরহিনী দেখতে চায়; প্রিয়া-বিরহে বিরহী পুরুষ দেখতে চায় না। আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া গেল।

''আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।''

''রূপসাগর মেঁ ম্যয় অরূপ, আনমোল মোতী
পানে কে লিয়ে গোতা **লাগাতা** হুঁ
বস, অব ম্যয় আপনী জীর্ণ নৌকা কো ঘাট ঘাট নহীঁ লে **জাউঙ্গা**।''

''আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে''

''তেরে পাস পঁহুচনেওয়ালে যাত্রিয়োঁ মেঁ
ম্যয় অন্তিম **রহুঙ্গা**''

''চলেছিলেম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলে অর্ঘ্য''

''পূজা ঘরমে ফুলেল অর্ঘ সজাকর **চলা থা**''

''বরণীয় তাঁরা স্মরণীয় তাঁরা তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে।''

''বরণীয় হ্যায় ওয়ে স্মরণীয় হ্যায় ওয়ে
তো ভি আজ দুর্দিনকে সময় উন্হে নিরর্থক
নমস্কার কে সাথ বাহর কো দ্বার সে হি
লওটা **রহা হুঁ**।''

'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতাগুলিতে 'আমি' এবং 'তুমি' সর্বনামের বহুল ব্যাপ্তি। তা সত্ত্বেও অনুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের তেমন সমস্যা হয়নি। কারণ ইংরেজি ভাষাতেও ব্যাকরণের নিয়মে 'আমি' এবং 'তুমি'—'আই' এবং 'ইউ' উভলিঙ্গ। হিন্দি ভাষার অনুবাদকের সমস্যা হয়, আবার হয়ও না। কারণ, সেখানে অনুবাদক দুটি সর্বনামকেই পুরুষবাচক ধরে নিয়েছেন। ঈশ্বর এবং ভক্ত দু-জনেই সেখানে পুরুষ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সামনে একটি জিজ্ঞাসা ছিল। 'গীতাঞ্জলি'তে কোথাও কোথাও প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে ঈশ্বরকে তিনি এইভাবে প্রথম পুরুষের সর্বনামে নির্দেশ করেছেন। ইংরেজি ব্যাকরণে প্রথম পুরুষের সর্বনামে লিঙ্গভেদ আছে। সেক্ষেত্রে কী করেছেন রবীন্দ্রনাথ? আমরা যা ভাবছি তাই। বিশ্ব-সভ্যতার সুপ্রাচীন পরম্পরা এই যে—ঈশ্বর যদি নিরাকাররূপে কল্পিত হন তাহলেও তিনি পুরুষ। ব্রাহ্মধর্মে নিরাকার ঈশ্বর পিতারূপে সম্বোধিত হয়েছেন সর্বত্র।

যে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বরের বিকল্পরূপে প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করতে হয়েছে সেখানে অবধারিতভাবে সেই সর্বনাম পুংলিঙ্গবাচক। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১। ''বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে,
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা;''

"In this playhouse of infinite forms I have had my play and here have I caught sight of **him** that eludes all forms. All my living body and limbs have thrilled with **his** touch who is beyond touch—"

২। ''কে গো অন্তরতর সে—

আমার চেতনা আমার বেদনা,
তারি সুগভীর পরশে।”

It is **he** the innermost one, who wakens
up my consciousness with **his** help hidden
touches.”

‘গীতাঞ্জলি’র উদাহরণে অবশ্য সমস্যাটি ‘আমি’-র নয়, ‘তুমি’র। তবু একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয় বলে দৃষ্টান্ত দুটি দিলাম। আমাদের বলবার কথাটি এই মূলপাঠের, অর্থাৎ সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ-এর ব্যাকরণে যেখানে সর্বনাম, ক্রিয়া এবং বিশেষণ পদে লিঙ্গ নির্দিষ্ট নেই সেখানে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ-এর অনুবাদক যদি লিঙ্গ স্থির করে নিতে বাধ্য হন তাহলে তাঁর মনে সেই লিঙ্গভেদ সূচিত হয় নিজের অভ্যস্ত সামাজিক প্রত্যাশা এবং অনুশাসন অনুসারে।

এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ‘আমি’কে পুরুষরূপে দেখা হয়েছে এমন দুটি উদাহরণ দেব। দুটি উদাহরণেই বৈচিত্র্য আছে। প্রথম উদাহরণ হল সুপরিচিত কবিতা ‘জীবনদেবতা’। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেই পরিচিত। এই কবিতার কথক ‘আমি’ জীবনদেবতাকে সম্বোধন করেছেন প্রেমের ভাষায়। বিশ্ব-সংস্কৃতিতে এটি খুবই প্রচলিত পরম্পরা। আরাধ্য দেবতাকে প্রেমাস্পদরূপে গ্রহণ করেন সাধক। প্রথাগত দেবতা না হলেও রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা জীবনের দিক-নির্দেশকরূপেই অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা কিছু আছিল মোর
....
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন
মদিরাবিহীন মম চুম্বন
জীবনকুঞ্জে অভিসার নিশা আজি কি হয়েছে ভোর।”

এই কবিতার অনুবাদক ভবানীপ্রসাদ মিশ্র এই অংশের যথাযথ অনুবাদই করেছেন—

“ক্যা বাহুবন্ধন শিথিল পড় গয়া হ্যায়?
....
ক্যা মেরা চুম্বন হো গয়া মদিরাবিহীন?
ক্যা জীবনকুঞ্জঁমে অভিসার রাত্রিকা হো গয়া বিহান?”

এই কবিতার ভাষা থেকে আমাদের স্বভাবতই মনে হয় ‘আমি’ সর্বনামের আড়ালের ব্যক্তিটি এখানে নারীর অবয়বে উপস্থাপিত। অন্তত একজন পুরুষ, অপরজন নারী। সম্পর্কের অভিব্যক্তিতে যেখানে চুম্বন, আলিঙ্গন (বাহুবন্ধ) অভিসার ইত্যাদি প্রসঙ্গ আসে সেখানে তেমনই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভবানীপ্রসাদ মিশ্রের অনুবাদে এই কবিতায় ‘আমি’ এবং ‘তুমি’ দুটি সর্বনামেই পুরুষ বোঝানো হয়েছে। জীবনদেবতা ও তাঁর অনুরাগী সেবক—দুজনেই পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় সেবককে সেবিকা রূপেই দেখেছেন বলে আমাদের মনে হয়। “তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া/ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া/সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া এনেছি অশ্রুবারি।” কবিতাটির শেষ পঙক্তি “নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে”। ‘প্রাণেশ’ সম্বোধন নারীর পক্ষে পুরুষকে করাই

স্বাভাবিক। তবু ভবানীপ্রসাদ মিশ্র এ-কবিতায় দুটি চরিত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন পুরুষরূপে। ‘‘হে কবি তোমার রচিত রাগিনী আমি কি গাহিতে পারি?’’ অনুবাদে হয়েছে—‘‘হে কবি ক্যা ম্যয়, তুম্‌হারি রচি হুই রাগিনী গা **সক্‌তা** হুঁ?

পরের উদাহরণটি খুবই কৌতূহল-উদ্দীপক। ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) উপন্যাসের শেষে একটি কবিতা আছে, আমরা সকলেই জানি—সে-কবিতা লাবণ্যর লেখা চিঠি। কাজেই উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতায় নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, এই কবিতার কথক ‘আমি’ লাবণ্য অর্থাৎ নারী। কিন্তু এই কবিতার অনুবাদক (তাঁর নাম প্রকাশিত নেই) সেই ‘আমি’-কে পুরুষ রূপে অনুভব করেছেন। ‘‘শূন্যেরে করিব পূর্ণ/এই ব্রত বহিব সদাই’’—এই পঙক্তির অনুবাদ—‘‘শূন্য কো পূর্ণ **করুঙ্গা**/ইয়হ্ ব্রত সদা ধারণ **করুঙ্গা**’’। এর একটা ব্যাখ্যা অবশ্য হতে পারে যে, অনুবাদক ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসটি পড়েননি; স্বতন্ত্রভাবে পড়েছেন কেবল কবিতাটি। এবং সে কবিতার দৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী বাণী—‘‘মোর লাগি করিও না শোক/আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক’’—অনুবাদকের কাছে নারীর উচ্চারণ বলে মনে হয়নি।

শেষ দৃষ্টান্তে যাব এবং শেষ করব আমার কথা। বহুল পঠিত কবিতা ‘সোনার তরী’। কবিতাটিতে আছে দু’জন মানুষ। একজন আসে নৌকা বেয়ে। এ কবিতায় সেই তরী-বাহক প্রথমে ‘সে’ এবং পরে ‘তুমি’ সর্বনামে অভিহিত। আর একজন ব্যক্তি বসে আছে নদীর পাড়ে। তার সঙ্গে আছে ‘রাশি রাশি ভারা ভারা ধান’। ধরে নেওয়া যায় সে একজন কৃষক। সেই ব্যক্তি এই কবিতার ‘আমি’। এই দুজনের মধ্যে কে নারী আর কে পুরুষ তার কোনো নির্দেশিকা বাংলা কবিতাটিতে নেই। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে লিঙ্গভেদবিহীন। অল্প বয়সে কবিতাটি যখন পড়েছি তখন দুজনকেই ধরে নিয়েছি পুরুষ বলেই। কবিতাটি অনেক দিন থেকেই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল এবং আছে। সেই কারণে কবিতাটির অনেকরকম ব্যাখ্যাও এ-যাবৎ পাওয়া গেছে। একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা হল আধ্যাত্মিক। ‘সোনার তরী’-র মাঝিকে আরাধ্য দেবতা ধরে নিয়ে তাঁকেই সব সমর্পণ করবেন পার্থিব মানুষ। আর একটি ব্যাখ্যা আছে দার্শনিক। সেখানে নৌকার মাঝি মহাকালের উপমা। কালের অমোঘ প্রবাহ মানুষের কীর্তিকে ধারণ করে, ব্যক্তি-মানুষকে নয়। এই ব্যাখ্যাটি বেশ জনপ্রিয়। আবার, এ কবিতার একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও শুনেছি। মাঝি সেখানে জোত্‌দার মহাজন। তুলে নিয়ে যায় কৃষকের ধন। এই ব্যাখ্যায় সমাজতন্ত্রের ঘোষণা। তিনটি ব্যাখ্যাতেই স্বাভাবিক ভাবে এই কবিতার দুটি চরিত্রকেই পুরুষ বলে মনে হয়। কারণ ঈশ্বরের প্রতীক এবং মহাকালের প্রতীক—উভয়কেই পুরুষ-মূর্তিতে কল্পনা করতে আমরা অভ্যস্ত। জোতদার মহাজনও পুরুষ হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও নারী যে হতে পারবে না তার কোনো মানে নেই।

রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু এই কবিতার অনুবাদে নৌকা-চালককে নারীরূপে দেখেছেন—

> “From the shadows of the opposite shore the boat crosses with a woman at the helm/she comes and takes all that I have to the last grain.”

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণেই পরবর্তীকালে উইলিয়াম রাদিচেও তরীবাহককে দেখেছেন নারীরূপেই।

কিন্তু এতো গেল কবিতার ‘তুমি’-র কথা। এ-কবিতার যে ‘আমি’—অর্থাৎ নদীর পাড়ে বসে থাকা মানুষটির লিঙ্গ নির্ধারণ করবার প্রয়োজন হয়নি ইংরেজি অনুবাদে। ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই। উত্তম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদেও নেই।

হিন্দি অনুবাদে এরকম সুবিধে পাওয়ার উপায় নেই। নারী অথবা পুরুষ কিছু একটা করতেই হবে। অনুবাদক ভবানীপ্রসাদ মিশ্র দুই ব্যক্তিকেই পুরুষরূপে দেখেছেন—

গীত গাতে হুয়ে নাও চালাতে হুয়ে
কৌন কিনারে কি তরফ **অ রহা হ্যায়**
দেখকর এইসা লগতা হ্যায়
জৈসে উসে **পহচানতা** হুঁ।

এমন হতেই পারে যে, অনুবাদ করবার সময় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগে, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি ভবানীপ্রসাদের নজরে আসেনি।

আমরা কিন্তু প্রধানত লক্ষ করছি 'সোনার তরী' কবিতার 'আমি' ব্যক্তিটিকে। এই 'আমি' যে পুরুষ—এই নিয়ে কোনো সংশয় ব্যক্ত হতে শোনা যায়নি কোথাও। কিন্তু চোখে পড়েছে একটি ব্যতিক্রম। গুজরাতি কবি ঝবেরচন্দ্ মেঘানী এই কবিতাটির গুজরাতি অনুবাদ করেছেন। গুজরাতি ভাষার প্রতিষ্ঠিত কবি তিনি; রবীন্দ্র-অনুরাগী এবং রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথের করা অনুবাদ তিনি দেখেননি ভাবতে ইচ্ছে করে না। তবে দেখেছেনই যে, তারও প্রমাণ নেই কোনো। এই কবি-অনুবাদকের চোখে 'সোনার তরী'-র নৌকাচালক হল পুরুষ এবং নদীতীরে বসে থাকা মানুষটি, অর্থাৎ এই কবিতার 'আমি' হল নারী।

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা"

গুজরাতি অনুবাদে এই কবিতা হয়েছে—

"গাজে গগনে মেহুলিয়া রে
রাজে বরসাদ্ ঝড়ি,
মারা নানা খেত্ বনেরে
শেরে হুঁ তো একলড়ী"

'একলড়ী' শব্দের অর্থ 'একাকিনী'—পুরুষ নয় নারী। গুজরাতি ভাষায় ক্রিয়ার মতোই বিশেষণেও আছে লিঙ্গভেদ। অতএব ঝবেরচন্দ সচেতনভাবেই এই কবিতায় নদীতীরে বসে থাকা মানুষটিকে নারীরূপে দেখেছেন। এভাবে দেখলে 'সোনার তরী' কবিতার আরও একটি ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। কবিতাটি হয়ে ওঠে বিরহ-বিষাদের অভিব্যক্তি। বিদেশি প্রণয়ী হরণ করে নিল নারীর প্রেম ও যাবতীয় সম্পদ। সোনার ধানের উপমায় নারীর হৃদয় ও যৌবনকেও বোঝাতে পারে। তারপর সে চলে গেল অন্যদেশে, পথের প্রেমিকাকে রেখে গেল পথেই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'আমি' এবং 'তুমি'-র অনুবাদে এভাবেই উঠে আসতে পারে বিভিন্ন অর্থ, একাধিক সংকেত ও ব্যঞ্জনা। 'সোনার তরী' অনুবাদের অনুসরণে আমরা একটি কবিতার অবয়বে আরও তিনটি কবিতা পেয়ে গেলাম।

অনুবাদের আছে এমন বহুতর দিক এবং বিভিন্ন সমস্যা। কিন্তু এইসব সমস্যা আমাদের সত্যিকারের কোনো সংকটে ফেলে দেয় না। এই সব সমস্যা থেকেই কবিতাকে আরও বেশি করে চিনি। একটি কবিতার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একাধিক কবিতা।

রবীন্দ্র-উপলব্ধিতে বিজ্ঞানের অধিকার : *বিশ্বপরিচয়*

জীবেন্দু রায়

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা উনিশ শতকের প্রথম থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবশ্যই তা পাঠ্য বইয়ের প্রয়োজনেই এবং বিশেষ করে ইংরেজরাও এগিয়ে এসেছিলেন। মনীষী লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত এ ব্যাপারে কলম ধরার আগে তাঁরাই ছিলেন প্রধান লেখক। হিন্দু কলেজেও ব্যবস্থা হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার। সাময়িকপত্র যেমন 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), 'জ্ঞানোদয়' (১৮৩১), 'বিজ্ঞানসেবধি' (১৮৩২), 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ' (১৮৩৩), 'বিদ্যাদর্শন'-ও (১৮৪২) বিজ্ঞান আলোচনায় সময়ের পক্ষে মানানসই দায়িত্ব পালন করে। 'বিদ্যাদর্শন'-এর অনেক রচনাই মনে হয় অক্ষয়কুমার দত্তেরই।

বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা অতঃপর থেমে থাকেনি। মান বা পরিমাণ যাইহোক না কেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শেষে জগদানন্দ রায়—সর্বোপরি আচার্য জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রের মতো বিরাট মাপের মনীষী বিজ্ঞানী তো ছিলেনই। সূচনায় ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের মতো লেখকও। সহজ এবং সরস রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আমার এ কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও চিন্তার ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞানমনস্কতা তথা যুক্তির গঠন দেখি তার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে পারিবারিক মানসিকতার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর এই দ্রুত তৈরি হয়ে উঠতে থাকা বিজ্ঞানবোধের কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী পরিবার হয়েও বিজ্ঞানবোধের সঙ্গে কোনো বিরোধের সে অর্থে সুযোগ ছিল না। অন্যভাষায় বলতে পারি, ঠাকুর পরিবার তথা রবীন্দ্রনাথ কেউই নাস্তিকতা এবং বিজ্ঞানবোধকে এক সরলরেখায় নিয়ে আসেননি।

মোট কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকেই রামমোহন, ডিরোজিয়ো এবং ডিরোজিয়ানদের যুক্তিসম্মত চিন্তার যে গোড়াপত্তন হয়ে গিয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা ক্রমেই আরো উন্মুক্ত বিজ্ঞানচিন্তার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। অবশ্যই তা যথার্থ উন্নত আধুনিক মানে পৌঁছাতে ইতিহাসের নিয়মেই সময় নিয়েছে। মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে রাধানাথ শিকদার হয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও আরো পরে মহেন্দ্রলাল সরকার—সেও এক দীর্ঘ পরিক্রমা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রামমোহন বা মহর্ষির ঔপনিষদিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে বিজ্ঞানবোধের কোনো দ্বৈরথে এসে পৌঁছননি। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রসঙ্গ ছেড়েই দিচ্ছি বিজ্ঞানবোধ থেকে মহর্ষিও বিযুক্ত ছিলেন না। ঠাকুর পরিবারে এক সময়ে দ্বারকানাথ শিল্প-বাণিজ্য বা চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি উন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথের কথাও বিশেষভাবে বলতে হয়।

সালতামামি বা প্রসঙ্গপঞ্জির বিষয় বাদই দিচ্ছি, তবু একথা অন্তত ছুঁয়ে যাবার প্রয়োজন আছে

যে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের চেতনা ও সৃষ্টিজগৎ। এবং সেই চেতনা তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্ব থেকেই। নতুন শিক্ষা, নতুন জাগরণ তারই পরিবেশ প্রতিবেশ তৈরি করে তুলেছিল। শুধু বিজ্ঞান বিষয়েই সতেরো বছর বয়স (১২৮৫, বৈশাখ) থেকে তেত্রিশ বছর বয়সের (১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক) সময়সীমায় তিনি অন্তত দশটির মতো লেখা লিখেছিলেন। একই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি এবং নীতিকেও তিনি এই মর্মে প্রকাশ করেন যে এর আগে অমঙ্গল ও মঙ্গলকে শয়তান ও ঈশ্বরকে দুটো আলাদা শ্রেণি ধরা হয়েছিল। এখন অভিব্যক্তিবাদ বা ইভলিউশন থেকে আমাদের মনে এই ধারণা হচ্ছে যে অসত্য থেকে সত্য এবং অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের সৃষ্টি। অভিব্যক্তিবাদে মঙ্গলের ওপর এই বিশ্বাস আমাদের মনে আরো বদ্ধমূল করে দেয়, মনে হয় সৃষ্টির মধ্যে যে মঙ্গলকে দেখছি তা স্রষ্টার ক্ষণিকের কোনো খেয়াল নয়, তা সৃষ্টির 'অবিচ্ছেদ্য অনন্ত নিয়ম।'

সাতাশ বছর বয়সেই নিয়ম-ডিজাইন তত্ত্ব গোচরে অথবা অগোচরে মহর্ষির বিশ্বাস বা প্রকৃতি হয়েই যেন চলে এল। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবোধ নিয়ে ভাবতে গেলে নাস্তিক্য নয়, তা যে এক নিশ্ছিদ্র, তাল-লয় সমন্বিত সুখ-দুঃখের বৃন্দবাদন (সুখের ঈশ্বর দুঃখের স্রষ্টা তো আলাদা কেউ নন, তাই দুঃখের রাতেও যেদিন সমস্ত পৃথিবী তাঁকে বঞ্চনার শোকে বেদনায় উন্মনা করে তুলবে সেদিনও তো এই 'পরম'-এর ছোঁয়াকে সন্দেহ করার কারণ নেই) কবি নিজেই তো সেখানে সংশয়হীন। জীবনের পাত্রে এই দুইকেই তিনি সমান সত্যজ্ঞানে গ্রহণ করবেন। তাঁর 'ধর্ম' এবং 'শান্তিনিকেতন' নামের লেখা অথবা অভিভাষণ তো বহু মানুষেরই জানা পড়া।

শেষ পর্যন্ত অথবা স্বরূপত রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কিন্তু 'মানুষ ধম'। মানুষকে বাদ দিয়ে অতিলৌকিক তিনি কিছু ভাবতে পারবেন না। এক সময়ে অবশ্য ব্যক্তিজীবনে শোকের, স্বজনহারানোর বিচ্ছেদ বেদনায় অন্যভাবে শান্তি বা আশ্রয় যে চেয়েছিলেন এবং তার সবটাই যে অন্তত সে সময়ে নিরর্থক হয়নি একথাও বলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তির পরম পাওয়া মানুষের ধর্মেই। বলাই বাহুল্য যে মানুষের ধর্মের কেন্দ্রে মানুষই রাজ-অধিরাজ। রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বদৃষ্টি সেই দৃষ্টি তথা কল্পনায় মানুষকে তিনি দেশকালের বিরাট পটভূমিতেই দেখেছেন। 'বিশ্বপরিচয়' বইয়ের 'নক্ষত্রলোক' অধ্যায়ের একেবারে শেষেই রয়েছে :

> 'নক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ, পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময়বোধ করি, একথা মানতে হবে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ। বিশ্ব ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান। বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছে ঘেঁসা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে— এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর কোনও লোকে আর কোনও চিত্তকে অধিকার করে আর কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কিনা। কিন্তু এ কথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভুমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।'

আরো সংহত, সংক্ষিপ্ত ভাবকল্পে মানুষ যে তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা নিয়ে অথবা জেনে মেনেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার অবগতির মধ্যে আনবার চেষ্টা করছে, করেছে এর থেকে আর কিছু তো বিস্ময়ের নেই। পদার্থ বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় চমৎকার ভাবে দেখাচ্ছেন যে এই

একই কথা আইনস্টাইনেরও। 'এই বিশ্বটা যে বোধগম্য, এটাই তার চিরন্তন রহস্য' (The eternal mystery of the world is its comprensibility) রবীন্দ্রচেতনায় সেই 'mystery' বা রহস্যের নায়ক মানুষই এবং এক্ষেত্রে সে তার সমস্ত রকম সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেই এই নায়কের ভূমিকায় আবির্ভূত।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এই সূত্রেই উদ্ধৃত করেছেন Carl Sagan-এর 'Cosmos' এর কিছুটা অংশ। আমরা হয়তো আমাদের প্রাপ্য উত্তরটুকু এর থেকে পেয়ে যেতেও পারি : 'The Passage from the chaos of the Big Bang to the Cosmos that we are begining to know is the most awesome transformation of matter and energy that we have been privilegged to glimpse. And until we find more intelligent being elsewhere, we are ourselves the most spectacular of all the transformations—the remote descendants of the Big Bang, dedicated to understanding and further transforming the cosmos from which we spring.' অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী অংশটুকুর সম্পূরণ করেছেন এই মর্মে যে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশিত হয়েছিল 'Cosmos' প্রকাশের চুয়াল্লিশ বছর আগে। মাঝখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রাণতত্ত্বের অনেক কালান্তরী আবিষ্কারই ঘটে গেছে। আমাদের কবির পক্ষে সে কথা বা তথ্য জানার কোনো সুযোগ ছিল না। অথচ কত আগেই তিনি পৌঁছেছেন কত পরের সাদৃশ্যে।

'বিশ্বপরিচয়'-এর 'ভূলোক' অধ্যায়ে কবি এও লিখেছিলেন, 'বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু'। এ অনুভব-উপলব্ধি বা সিদ্ধান্তও তিনি আড়াল করলেন না, যে 'বিশেষ নিয়মে অতি সূক্ষ্ম জীবকোষ' হিসেবে পরমাণুগুলি 'সংহত' হল তা অবশ্যই 'বিশেষ নিয়মে অচিন্তনীয়'। এই সব জীবকোষের প্রত্যেকটি কোষ সম্পূর্ণ এবং আলাদা। তাদের প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছে সেই আশ্চর্য শক্তি যার সাহায্যে বাইরে থেকে খাবার সংগ্রহ করে নিজেকে 'পুষ্ট' করে তো বটেই, যার দরকার নেই তাকে ত্যাগ করতে পারে, নিজেকেও বাড়িয়ে তুলতে পারে বিপুল ভাবে। ক্ষয় আর মৃত্যুর ভেতর দিয়েই প্রবাহিত হয়ে চলে প্রাণের ধারা।

এককোষী যে প্রাণীর কথা আমরা বাল্যকাল থেকে পড়েছি বা জেনেছি, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কবি বলেন এই 'জীবাণুকোষ' 'প্রাণলোকে' একলা হয়েই দেখা দিয়েছিল। যত এরা 'সঙ্ঘবদ্ধ' হয়েছে ততই ঘটেছে 'জীবজগতের উৎকর্ষ' এবং বৈচিত্র্য। কোটি কোটি তারা এক হয়ে যেমন 'নীহারিকা' তেমনি অনেক কোটি জীবকোষ এক হয়েই এক একটি দেহ। 'বংশাবলী'-র মধ্যে দিয়ে এই 'দেহজগৎ'ই প্রবাহ সৃষ্টি করে নতুন নতুন রূপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নক্ষত্র এবং সূর্যলোকের চেয়েও আশ্চর্য এই প্রাণলোক। পৃথিবী যখন অসহ তাপকে শান্ত করে 'অতিক্ষুব্ধ' অবস্থায় এসে পৌঁছেচ্ছে তখনই সৃষ্টি প্রাণ এবং তার 'সহচর' মনের। জগতে এই পরিণতিকেই কবি বলেন 'শ্রেষ্ঠ পরিণতি'। মনে এই বিশ্বাসও তিনি রাখতে চান যে শুধু এই পৃথিবী নয় অন্য কোথাও অন্য কোনো গ্রহেও প্রাণ ও চেতনার প্রকাশ ঘটে থাকতে পারে।

কবির কথা, উপলব্ধি বা প্রত্যয়কে অধ্যায় ধরে অল্প আকারেও সাজিয়ে দেওয়া যায়। তাতে তাঁর নিশ্ছিদ্র বিজ্ঞান মনস্কতার অব্যর্থ পরিচয় যেমন পাওয়া যাবে, একই সঙ্গে যে প্রশ্ন বা সূত্রের উত্তর বিজ্ঞানের এই সর্বব্যাপ্ত 'ফ্রেমিং'-এর মধ্যেও অনির্ণীত থেকে গেছে তাকেও ছুঁয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে পুরোটা জানতে বা বুঝতে গেলে এই ছুঁয়ে যাওয়া বিন্দুগুলোর কথাও একটু ভাবতে হবে।

যেমন : আকাশে আলো চলাচল করে, বিজ্ঞানের প্রশ্ন—সেই চলবার ভঙ্গি কীরকম তাই নিয়ে। উত্তর হল : তার চলা অতি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতো। কিন্তু তা 'কিসের ঢেউ, সে কথা ভেবে পাওয়া যায় না।' এ তথ্যও এল যে তা যেমন ঢেউ, তেমনি 'আলো অসংখ্য জোতিষ্কণা নিয়ে' অতি খুদে ছিটেগুলির মতো তার অবিচ্ছিন্ন, বিরতিহীন 'বর্ষণ'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের প্রশ্ন যোগ করলেন : এই দুটো উল্‌টো খবরের কোনখানে মিলন হল তা ভাবার বাইরে। তার থেকেও আশ্চর্য উল্‌টো কথা হল 'বাইরে যেটা ঘটছে সেটা একটা কিছু ঢেউ আর বর্ষণ', একই সময়ে ভেতরে যা পাচ্ছি তা না এটা, না ওটা'—এটাই আলো, কোনো বিজ্ঞানী বলেননি 'এর মানে কী'। এর সঙ্গে আছে 'তাপের ঢেউ', দেখায় নয়, ছোঁয়ায় তাকে বুঝতে হয়। সৃষ্টিতে তার প্রতাপও প্রকাশ্য। এই সব আলোর তরঙ্গকে যদি একটা নাম-পরিচয়ের মধ্যে বাঁধতে বা আনতে হয়, তবে তাকে 'তেজ' বলা যেতে পারে। এই মহাসৃষ্টির শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে প্রকাশ্যে বা আড়ালে রয়ে গেছে বা আছে এই তেজেরই কম্পন। বাইরে থেকে স্থির বা নিশ্চল মনে হলেও, যে অণু-পরমাণুতে এদের নির্মাণ বা সৃষ্টি তারা সব সময়েই ভেতরে ভেতরে কেঁপে চলেছে। সে কী ঠাণ্ডা, কী গরম সব অবস্থাতেই। আলো মারছে চোখকে, গরম মারছে গা-কে।

এসেছে সূর্যের নানা রঙের কথা। সব রঙ মিলিয়ে যে সাদা হয়েই দেখা দেয়। তবু নানা রঙ কেন? বিজ্ঞানীদের দেওয়া উত্তর কবি বললেন নিজের ভাষায়, নিজের মতো করে। সংক্ষেপে তা হল যে রঙ সূর্য ফেরত দেয় আমাদের চোখে তারই দীপ্যমানতা। সূর্যের কোন রঙ কে বা কী কেন ফিরিয়ে দেয়, সে প্রশ্নের উত্তর নাকি ওদের পরমাণু মহলেই লুকোনো। সে হোক, এই ফেরত দেওয়া না দেওয়াতেই রঙের বর্ণময় বৈচিত্র্য।

বিদ্যুতের প্রসঙ্গে, অতএব এসেছে পজিটিভ-নেগেটিভ-এর কথা। হ্যাঁ আর না-এর হদিশ অথবা যুগলবন্দি। বন্দি নয় আশ্চর্য সৃষ্টিশীল বন্ধন। পরমাণুর কেন্দ্রে যে এই হ্যাঁ-ধর্মী তড়িৎ-প্রবাহ তাই কেন্দ্র থেকে টান দিচ্ছে না-এর কণাগুলোকে। এই টানে নেগেটিভের কণার অবস্থা সার্কাসের ঘোড়ার মতো। তারা ঘুরে চলেছে পজিটিভের চারদিকে। একই টান ভালোবাসায় পৃথিবীর আবর্তন সূর্যকে ঘিরে। ন'কোটি মাইলের দূরত্ব সে এক আশ্বর্য শক্তিতে বজায় রেখে চলেছে অনন্তের মাত্রায়। এই সামঞ্জস্য আর টান পদার্থের ভেতরকার অণুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে টানে কেউ কোথাও এঁটে যায় না, আটকে যায় না, টানের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক হয়ে যায় না। পজিটিভ নেগেটিভে এ এক অলৌকিক প্রায় সন্ধি সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ভালুকওয়ালার' ডুগডুগির তালেই ভালুকের নাচ। কোথাও যদি এই তাল কাটে! ঘাটতি পড়ে টান ভালোবাসায়! তাহলে শরীরের বাইরে এবং ভেতরে এই দেখতে না পাওয়া 'পোষমানা বিভীষিকা দিয়ে' দেখতে না পাওয়া 'ডুগডুগির ছন্দে'ই মহাসৃষ্টি তথা বিশ্বভ্রগুের 'নাচ' আর খেলা। একটু তাল কাটলেই আর রক্ষা নেই। তাল কাটেও না।

কস্‌মিক্‌-রশ্মির ব্যাখ্যায় এল এর উদ্ভাবের রহস্য কোথায় তা অজানা রয়ে গেছে। যা জানা গেছে তা হল : এর প্রভাব সর্বব্যাপী। গোপন উদ্দেশ পাবার জন্য বিজ্ঞানীদের চেষ্টার অন্ত নেই। পরমাণুর নতুন তত্ত্বের সূচনা হওয়ার পর নানা ভাবনা চিন্তার আসা যাওয়া। কোথায় সেই সুনিশ্চিত ধ্রুবত্ব তার ঠিকানা পাওয়াও অসম্ভব হল। নিত্য বা শাশ্বত বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা সেই 'আদিজ্যাতি'—সব কিছুর উপস্থাপনা, কথামুখ সেইখানেই। যে বিশ্বের মধ্যে আমরা আছি

তার যে অশেষ বৈচিত্র্য তারও চালিকা শক্তি এই আদিজ্যোতি-সূর্য থেকে প্রবাহিত আলোর সমুদ্র।

'সৌরজগৎ' অধ্যায়ে আছে : সূর্যের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার অতি সামান্যই যায় গ্রহগুলিতে, অনেকটাই চলে যায় মহাশূন্যে। আর সেই সত্যের সূত্রে এই সিদ্ধান্ত উপলব্ধির মতোই অবধারিত হয়ে আসে যে এত আলোর অতি সামান্যই আমাদের ছুঁয়ে যায়, কিন্তু সূর্যের এই আলোর দূত সূর্যে আর ফিরে আসে না, কোথায় যায়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কাজে লাগে তাও তো জানা নেই।

'নবজাতক' কাব্যের সেই বহুবার পড়া 'কেন' কবিতায় এই কথাই ছিল :

'জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদীতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দির মণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবি নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান করে ফিরে ফিরে নেয় অন্যহাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন।'

শুধু জ্যোতির্লোক নয়, এ প্রশ্ন মানুষের চৈতন্যজগৎকে কেন্দ্র করেও :

'তারপরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্যজগতে
ভেসে চলে সুখ দুঃখ কল্পনাভাবনা কত পথে।'

প্রশ্ন আরো :

'শুধায়েছি, এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোল গর্জন,
ঝটিকার মন্দ্রস্বন,

দিবমনিশার
বেদনাবীণার তারে মিশ্রিত ঝংকার,
পূর্ণ করি ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্য কলরব,
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত
নিয়ত স্পন্দিত করি দ্যুলোকের অন্তহীন রাত'—

কবি এও কল্পনায় ভেবেছিলেন (বা দেখেছিলেন) যে বিশ্বসৃষ্টির এমন একটি মর্ম বা আশ্রয় কেন্দ্র আছে (অন্তরকন্দর-মাঝে), জগতের চারদিক থেকে 'পাখা মেলা ভাষা' সেখানে এসেই বাসা বাঁধে। পুরোনো স্মৃতিকে দীর্ণ করে (অথবা এক কল্পান্তের শেষে নতুন আর এক কল্পের মতো!!) আবার 'সৃষ্টির আরম্ভবীজ' ভরে নেয় 'আপনার পক্ষপুটে ফিরে চলা যত প্রতিধ্বনি'। একই ভাবে এ অনুভবও তখন তাঁর কাছে সত্যি হয়েছে :

'বহু যুগ যুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা'

শেষ পর্যন্ত আমার ('মোর') চৈতন্য বা চেতনায় এসে 'সংহত' হয়েছে।

কবিতাটি শেষ হচ্ছে এই ভাবে :

'প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন?
কিন্তু, কেন।'

এর কী উত্তর বিজ্ঞানী দেবেন, দেবেন কিনা, দিলে কী ভাবে দেবেন, দেবার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু তাতে কবি মনীষীর এ প্রশ্ন, বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করেও যে প্রতিরুদ্ধ হয়নি, সে কথাও বলবার।

একালের ভারতীয় সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

বিপ্লব চক্রবর্তী

একালের ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান সুবিদিত। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যেমন এক অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তেমনই উত্তরকালের সাহিত্যে তাঁর বিপুল প্রভাব অনস্বীকার্য। তথাপি প্রশ্ন উঠবে, একালের বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টির ধারা যথার্থই কি রবীন্দ্র প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত? প্রাণের গল্প খোলা রেখেও একালের ভারতীয় সাহিত্যের স্রষ্টারা কীভাবে রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন? গ্রহণে-বর্জনে রবীন্দ্রসাহিত্যের ঋণ কতটা স্বীকার করেন বা করতে পেরেছেন। এ কালের ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কী বা কতটুকু? এইসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে একালের ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলির পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কী বা কতটুকু তার পরিচয় জানার জন্য প্রতিবেশী ভারতীয় সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির স্বরূপ বোঝা প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের সম্পর্ক প্রধানত প্রতিবেশী সাহিত্যের। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। প্রথম দিকে এই সম্পর্ক ছিল প্রধানত নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর এই সম্পর্ক দূরবর্তী প্রতিবেশীদের মধ্যে বিস্তৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার রশ্মিছটা যতই বিশ্বপ্লাবী হয়েছে এই সম্পর্কও ততই দৃঢ়তর হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন একজন বিদেশি পাঠক বা পাঠিকা রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠে যেমনভাবে মুগ্ধ হয়েছেন সেই সময়, রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতীয় পাঠকবর্গের প্রতিক্রিয়া ছিল অন্যরকম।

রবীন্দ্রনাথ যখন আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন তার অনেক পূর্বে মনে মনে তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠিকা হয়ে উঠেছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। পরে ওকাম্পো কবির সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন নিজের দেশে সান ইসিদ্রোয় ও পরে শান্তিনিকেতনে। এই ঘটনার পাশাপাশি যদি মনে রাখি রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় পাঠকদের অন্যতম মুন্সী প্রেমচন্দকে তাহলে পার্থক্যটা নজরে আসে। প্রেমচন্দ রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পটি উর্দুতে তিনিই অনুবাদ করেন। তবে প্রেমচন্দ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাননি। বরং বলা চলে পেতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়ে প্রেমচন্দ গল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং একথা তিনি নিজে স্বীকারও করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে খুব উৎসাহী ছিলেন না।

১৯৩১-৩২ সালে প্রেমচন্দকে একবার শান্তিনিকেতনে আনবার চেষ্টা করেছিলেন জৈনেন্দ্রকুমার। প্রেমচন্দ রাজি হননি। ১৯৩৫ সালে বনারসী দাস চতুর্বেদী প্রেমচন্দকে শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। প্রেমচন্দ তখনও যেতে চাননি কারণ তাঁর পত্নী ''কিতনা অকেলা ঔর অসহায় অনুভব করেগী'' ভেবে তিনি আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। এরপর বনারসী দাস রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং তখন স্থির হয় হিন্দি সমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে (১৪ এপ্রিল, ১৯৩৫)

রবীন্দ্রনাথে প্রেমচন্দকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানাবেন। সব ব্যবস্থা হলেও প্রেমচন্দ যেতে পারেননি। জৈনেন্দ্রকুমার ব্যাখ্যা করেছেন। ''কুতুবমিনার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং অথবা মহাপুরুষ দর্শন কোনটাতেই তার আগ্রহ ছিল না।''

রবীন্দ্ররচনা পাঠে প্রেমচন্দ উদ্দীপ্ত হয়েছেন ঠিকই তবে রবীন্দ্ররচনার সমালোচনাও তিনি করেছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটির হিন্দি অনুবাদ 'কুমুদিনী' প্রকাশিত হলে প্রেমচন্দ মাধুরী পত্রিকায় উপন্যাসটির সমালোচনা করেন। তিনি লিখেছিলেন, ''ন তো কোই পুরী তরহ রোমান্সবাদী হো সকতা হৈ ন তো কোই পুরী তরহ যথার্থবাদী।'' এই বক্তব্য তিনি নিজের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপাঠে তাঁর মনে যে শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল, সেটাই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন। এইজন্য জৈনেন্দ্রকুমারকে তিনি বলেছিলেন ''ঔর জৈনেন্দ্র, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তো আপনি রচনা দ্বারা য়হাঁ ভী হমে প্রাপ্ত হৈ, ক্যা ওয়হাঁ মে উনহে অধিক পাউঙ্গা''? রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠে তাঁর মনও ততটাই ভরা ছিল যে রবীন্দ্র সন্দর্শনে তার অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আশা তিনি করেননি।

'দিদি' গল্পটি তিনি 'বড় বহীন' নামে উর্দুতে অনুবাদ করেন। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা ও পর্যবেক্ষণশক্তির যে পরিচয় রয়েছে তা উপলব্ধি করে প্রেমচন্দ মুগ্ধ হন। শুধু মুগ্ধতাবোধেই তা সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরবর্তীকালে প্রেমচন্দ যখন গল্প লিখেছেন তখন রবীন্দ্রনাথের গল্পপ্রকরণ ও রচনাশৈলীর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিতও কম হননি। প্রেমচন্দ ছন্দনামে রচিত প্রথম গল্পটির নাম 'বড়ে ঘর কী বেটী' (বড় ঘরের মেয়ে)। 'জামানা' পত্রিকায় (ডিসেম্বর, ১৯১০) প্রকাশিত প্রেমচন্দের এই প্রথম গল্পটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' (চৈত্র, ১৩০১) গল্পটির সাদৃশ্য যথেষ্ট। তুলনামূলক আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে।

'দিদি' গল্পটি মাত্র চারটি পরিচ্ছেদে রচিত। গল্পটির শুরুতে দুষ্কৃতি 'স্বামীর মুখে আগুন' দেওয়ার মতো কথা প্রতিবেশিনী তারার মুখে শুনে শশিকলা যথেষ্ট পীড়া অনুভব করে। স্বামী দেবতার মুখে চুরুটের আগুন ছাড়া অন্য কোনো আগুন কামনা করা স্ত্রীজাতির শোভা পায় না এই বিশ্বাস নিয়ে শশী বেশি স্থির থাকতে পারেনি; কারণ গল্পের শেষে তার তথাকথিত স্বামীদেবতা জয়গোপালবাবুর অপকৌশলে গ্রামবাসীরা সংবাদ পায় যে, ''রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।'' একমাত্র প্রতিবেশিনী তারা গর্জন করে এই সংবাদের প্রতিবাদ করতে চাইলেও সকলে 'চুপ্ চুপ্' করে তার মুখ বন্ধ করে দিত।

'বড়ে ঘর কী বেটী' গল্পে প্রেমচন্দ নায়িকার যে পরিণতি দেখান, তা রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পটির মতো নির্মম ও নিষ্করুণ নয়। তবে গল্প দু'টির নির্মাণ প্রক্রিয়া ও উপাদানগত সাদৃশ্য রয়েছে। প্রেমচন্দের গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে যে নারী চরিত্র, সেই আনন্দীও এক দিদি, তবে বৌদিদি। আনন্দীর সঙ্গে সংঘাত বাঁধে তার দেওর লালবিহারীর আর শশিকলার সঙ্গে পরোক্ষভাবে সংঘাত বাঁধে তার দেওর উপেনের। তবে তারই সদালপী মৃদুভাষী স্বামী তারই পিসতুতো ভাই উপেনকে দিয়ে শ্বশুরের বৃদ্ধ বয়সের শিশুসন্তান নীলমণির সম্পত্তি হস্তগত করে। এই সংঘর্ষ ও বিচ্ছেদের ঘটনা প্রেমচন্দের গল্পে নেই, গল্প দুটির পরিণতি এক না হলেও উপাদানগত সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো।

প্রকৃতি বিচারে গল্প দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দুই গল্পকারের প্রতিভার পরিচয় বহন করে। গল্প দুটির পরিণতিও ভিন্ন প্রকৃতির, 'দিদি'-র পরিণতি বিচ্ছেদমূলক ও করুণ 'বড়ে ঘর কী বেটী' মিলনান্তক ও সুখকর পরিণতির গল্প। তথাপি গল্প দুটির আয়তন যথাক্রমে তিন ও চার পরিচ্ছেদে সীমাবদ্ধ।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই গল্প দুটির কেন্দ্রীয় বিষয়। দুই নায়িকাই বড়ঘরের মেয়ে, সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সন্তান। দেওর উপেন রবীন্দ্রনাথের গল্পে এবং আনন্দীর দেওর লালবিহারী প্রেমচন্দের গল্পে সাংসারিক জটিলতার কারণ। রবীন্দ্রনাথের গল্পে ছোটভাই ও অনাথ নীলমণিকে রক্ষার জন্য বড় বোন শশিকলা সর্বস্ব পণ করেও শেষরক্ষা করতে পারে না; প্রেমচন্দের গল্পে অপরাধী ছোটভাই লালবিহারীকে চরম দণ্ড দিতে বড়ভাই শ্রীকণ্ঠ যৌথ পরিবার ভাঙতে গিয়েও পিছিয়ে আসে। একদিকে দাম্পত্য প্রণয় সম্পত্তিলাভের কালগ্রাসে ধূলিলুণ্ঠিত হয়, অন্যদিকে দাম্পত্য-সম্পর্ক বিচ্ছেদ এড়িয়ে চলে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বর্ণনা ভঙ্গির সাদৃশ্য। সমাজ ও সংসারে বাস্তব ঘটনার পর্যবেক্ষণে রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেমচন্দ বেশ কয়েকটি লাগসই মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম এবং পুরুষের দুশ্চেষ্টা’’। ‘দিদি’ গল্পে সেটাই ঘটে। প্রেমচন্দ লেখেন, ‘‘মেয়েরা গালাগালি সহ্য করে, মারধোরও সহ্য করে, কিন্তু বাপের বাড়ি নিয়ে নিন্দে তারা কিছুতেই সইতে পারে না।’’ রবীন্দ্রনাথের গল্পে বাপের বাড়ি হয়েছে সম্পত্তি তথা ভাইয়ের অধিকার রক্ষার জন্য বোনের চ্যালেঞ্জ, প্রেমচন্দের গল্পে তা হয়ে উঠেছে বাপের বাড়ির সম্মান রক্ষার লড়াই।

বাপের বাড়ির অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষার লড়াইয়ে শশী হেরে যায় কিন্তু আনন্দী হারে না, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বামীকে শ্রদ্ধাভক্তি করে শশী ও আনন্দী দুজনেই আবার দুজনেই স্বামীর কাছে স্পষ্টকথা রাখঢাক না রেখে স্পষ্ট করেই বলেছে। স্পষ্টকথা, প্রতিবাদের কথা বলতে তাদের দু'জনেরই কোনো কষ্ট নেই। এই স্পষ্টবাদিতা উপাদানগত বিচারে দুটি নারী চরিত্রকেই একই মর্যাদার আসনে বসায়। আর একটি উপাদানগত সাদৃশ্য হল ‘মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়ার’ প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের গল্পে এ ভাষা ব্যবহার করেছে প্রতিবেশিনী তারা আর প্রেমচন্দের গল্পে এই স্পর্ধিত বাক্য ব্যবহার করেছে নায়িকা স্বয়ং।

প্রেমচন্দ সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘‘কবি ও সাহিত্যিকদের অনুভূতির তীব্রতা যত বেশি, তাঁদের রচনাও তত আকর্ষণীয় ও উচ্চ শ্রেণিভুক্ত। সে সাহিত্য আমাদের সুরুচি জাগ্রত করে না, মানবিক ও আত্মিক তৃপ্তি দেয় না, আমাদের শক্তি ও গতি দেয় না, আমাদের সৌন্দর্যপ্রেম সৃষ্টি করে না এবং আমাদের মধ্যে উৎপন্ন করে না সংকল্প ও কঠোরতাকে জয় করার দৃঢ়তা। সে সাহিত্য আজ প্রয়োজনহীন’’ (প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ)। প্রেমচন্দের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যের সংজ্ঞা হল জীবনের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের গল্প শুধু নয়; প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন সাহিত্য পাঠে প্রেমচন্দের মতো ভারতীয় সাহিত্যকারেরা প্রেরণা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় ও মানবচরিত্র। একালের সাহিত্যে সেই রবীন্দ্রভাবনার অনুরণন শোনা যায়।

প্রেমচন্দ রবীন্দ্রনাথের গল্পপাঠ করে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অনুপ্রেরণা সেই তাঁর প্রতিভার দ্যুতিতে নতুনতর সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেছিল। কবিতার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে ছিল। সমকালীন অনেক কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওড়িয়া কবি মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১২) ভক্ত কবি রূপে পরিচিত। মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং উড়িষ্যাতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেন। তিনি যে সব ভক্তিমূলক গীতিকবিতা রচনা করেন তার একটি বিশিষ্ট সংকলন হল ‘কুসুমাঞ্জলি’ (১৯০৩)।

গীতিকবিতা রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। তবে রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে মধুসূদন রাও যেমন বিশেষ কিছু আলোচনা করেননি, তাঁর সমসাময়িক অন্য দুই প্রধান সাহিত্যস্রষ্টা রূপে ফকীরমোহন সেনাপতি বা রাধানাথ রায়ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। তবে সবুজ গোষ্ঠীর লেখকরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহী শুধু নয়, অনেকে প্রভাবিতও হন।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক প্রমুখ সবুজগোষ্ঠীর ওড়িয়া সাহিত্যিক বৃন্দ ছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী এবং অনুপ্রাণিত। মানবপ্রত্যয় এবং সৌন্দর্যমুখিনতা তাঁরা রবীন্দ্রকাব্যপাঠ করে উপলব্ধি করেন। কালিন্দীচরণ তাঁর দিনপঞ্জীতে রবীন্দ্রগ্রন্থ পাওয়ার ও পড়ার আগ্রহের কথা যেভাবে লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল বৈকুণ্ঠনাথের কাব্যরচনায়। রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক অনুভূতি সৌন্দর্যবোধ ও গীতিধর্মিতা বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের রচনায় কান পাতলে শোনা যায়।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক ভারতীয় লেখকবর্গের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রভাব গভীরভাবে যাঁদের রচনায় অনুভব করা যায় অথচ যাঁরা স্বাতন্ত্র্যদীপ্তিতে উজ্জ্বল এমন কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন মায়াধর মানসিংহ (১৯০৫-১৯৭৩), সচ্চিদানন্দ রাউতরায় (১৯১৬-) উল্লুর পরমেশ্বর (১৮৭৭-১৯৪৯), শঙ্কর কুরুপ, বি. আর. বোরকর প্রমুখ কবিরা।

মায়াধর মানসিং তাঁর ওড়িয়াতে লেখা 'রবীন্দ্রপূজা', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার বিমুগ্ধতার ভাব উজাড় করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সে কথা তিনি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বপ্রেম ও ভারতীয় জীবনভাবনার রূপায়ণ বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন। শুধু বিশ্লেষণ নয়। সমালোচক রূপে ব্যাখ্যা নয়, মায়াধর সীমা অসীমের তত্ত্বভাবনার দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে তাঁর 'প্রেমশস্য' (১৯৩৩), 'ক্রশ' (১৯৫৬) ইত্যাদি কাব্যসংকলনে তার অনুরণন শোনা যায়। অসীমের প্রতি আকুলতার সঙ্গে সীমার বন্ধন এ যুগের আর এক কবি লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্রের (১৮৮৮-১৯৫৩) কবিতাতেও শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল সচ্চিদানন্দ রাউথ রায়ের 'পাথেয়' (১৯৩১) কাব্য সংকলনে। এই কাব্যের সনেটগুলিতে রবীন্দ্রপ্রভাবজাত মিস্টিসিজমের প্রকাশ দেখা যায়। তবে পরবর্তীকালে তিনি রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে জনতার কবি হয়ে ওঠেন। 'পল্লীশ্রী' (১৯৪১), 'পাণ্ডুলিপি' (১৯৪৭), 'স্বগত' (১৯৫৮) প্রভৃতি কাব্য রচনায় তিনি ওড়িয়া কবিতার ধারাকে নতুন পথে চালিত করেন। কলকাতায় ছাত্র জীবন ও পরে কর্মজীবন (কেশোরাম কটনমিলের পদাধিকারী) সূত্রে তাঁর দীর্ঘদিন কাটে। কটকে 'দিগন্ত' পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি নিজের 'জনতার কবি পরিচয়'কে মেলে ধরেন।

উল্লুর পরমেশ্বর মালয়ালম কাব্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার অনুভবকে গুরুনাথন্-এর অনুরূপ কাব্যভাবনায় সৃষ্টি করেন। 'ভক্তিদীপিকা' (১৯৩৩) কাব্যে উল্লুর ভক্তিকে আধ্যাত্মিক প্রেরণার সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন। ভক্তকবির জীবনে গুরুনাথ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতোই চালিকাশক্তি হয়ে দেখা যায়। প্রথম জীবনে সংস্কৃত চম্পূকাব্যের অনুসরণে কাব্য রচনা করেন ও পরে 'কর্ণভূষণম' (১৯২৮), 'পিথলা'র মতো কাহিনিকাব্য রচনা করেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার প্রভাব 'ভক্তিদীপিকা'র মতো কাব্যে দুর্লক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্রপ্রভাবকে আত্মস্থ করেও স্বীয় প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে যাঁরা উজ্জ্বল তাঁরা হিন্দি কবিতার ছায়াবাদী রূপে পরিচিত। মহাদেবী বর্মা (১৯০৭-১৯৮৭), সুমত্রানন্দন পন্থ (১৯০০-১৯৭৭),

নিরালা (১৮৯৯-১৯৬১), মৈথিলীশরণ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৬৪) প্রমুখ কবিদের রচনা পড়লেই বোঝা যায়। এই প্রভাব সম্পর্কে মহাদেবী বর্মা লিখেছেন—

> ''কবীন্দ্র রবীন্দ্র উন বিরল সাহিত্যকারোঁ মেঁ যে জিনকে ব্যক্তিত্ব ঔর সাহিত্য মেঁ অদ্ভুত সাম্য রহতা হৈ। ... অতঃ অয়েসে মহান ব্যক্তিত্ব সে যদি কোই একবারগী হী প্রভাবিত হো যায় তো ইসমে ক্যা আশ্চর্য!''

মহাদেবী বর্মার কবিতায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ও তাঁর সমকালীন কবিরা রবীন্দ্রভাব ও ভাবনার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত। আচার্য হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী যথার্থই বলেছেন, ''রবীন্দ্রনাথকে মহিমাশালী ব্যক্তিত্বনে হিন্দি সাহিত্য কো দবা নহী দিয়া, বলকী উসকে নির্মাতাওঁ কেঁ আত্মগৌরব ঔর আত্মচেতনা কা ভাব জাগত করি দিয়া।'' মহাদেবী বর্মার সাহিত্য সৃষ্টি তার উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে মহাদেবী বর্মা লিখেছিলেন—

''গীত মধুকে, রাগ ঘন কে, যুগ বিরহকে, ক্ষণ মিলনকে,
গা লিয়ে জিসকে সভী স্বর নমিত ভু, উন্নত গগনকে,
সাথ জিসকো ওঁগলিয়োঁ কে সৃজন-পারাবার খেলা
আজ অভিনব লয়বতী উসকী বিদনবেলা।
অমর বেলা।''

সেই অমর বেলায়, সৃষ্টি পারাবারের তীরে সেই মহান শিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিদায় বেলায় কবিতার অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা অর্পণ করেছিলেন। আবার নাগার্জুনের মতো কবি (১৯১১-১৯৯৮)। রবীন্দ্রনাথের কাছে বর প্রার্থনা করেন—

''আশীষ দো মুঝকো
মন মেরা স্থির হো,
লহীঁ লেটু, চিরচলুঁ, কৈসাভী তিমির হো
প্রলোভন মেঁ পড়কর বদলুঁ লহীঁ রূপ
রহু সাথ সবকে। ভোগুঁ সাথ সুখ-দুঃখ।''

রবীন্দ্রনাথের বাণী যে কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রগতিবাদী কবি রূপে নাগার্জুন যখন ডাক দেন—

''শুহ মজদুর-কিসানো কী স্বর কঠিন হঠী,
কবি হে, উনমে অপনা হৃদয় মিলাও।
উনমেঁ মিট্টিকে তনমেঁ হৈ অধিক আঁগ, হৈ অধিক তাপ,
উনমে কবিহে! অপনা বিরহমিলনকে পাপজলাও!''

কবি যেন মজুর-কিসানের জীবনের শরিক হয়ে ওঠেন। তাই বলতে পারেন—

''মৈ দরিদ্র হুঁ, পুস্ত পুস্ত কী যহ দরিদ্রতা
কহৈল কে ছিলকে জৈসী খুদদরী জীভ মে
মেরা লহু চাটলি আঙ্গ
মৈ ন অকেলা।
মুঝে জৈসে তো লাখ লাখ হুঁ, কোটি কোটি হুঁ।''

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে সেইসব কবির জন্য কান পেতে ছিলেন যারা কৃষক মজুরের জীবনের শরিক—

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

নার্গাজুনের মতো প্রগতিবাদী কবিরা রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা নিয়েই মাটির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন, থেকেছেনও।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অন্তরতমের প্রতি যে আহ্বান বারবার শোনা যায়, তা মহাদেবী বর্মার কবিতায় তা প্রায় অনুভবের অনুবাদ হয়ে উঠেছে :

"কৌন তুম মেরে হৃদয় মে?
কৌন মেরী কসক মেঁ নিত
মধুরতা ভরতা অলক্ষিত
কৌন প্যাসে লোচনোঁ মেঁ
কৌন ঘির ঝরতা অপরিচিত?"

এই কবি অবশ্যই মনে এনে দেয় রবীন্দ্রনাথের গীতিমাল্যের সেই বিখ্যাত গান :

"কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।"

আবার রবীন্দ্রনাথ জীবনে সীমার মধ্যে অসীমের স্পর্শ অনুভব করে যখন লিখেছিলেন :

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

এ বাণী মহাদেবীর কবি সত্তাকে এতটাই মুগ্ধ ও বিমোহিত করেছিল যে কবি তারই অনুসরণে যেন লেখেন :

ক্যা পূজন ক্যা অর্চন রে?
উস অসীম কা সুন্দর মন্দির মেরা লঘুতম জীবন রে।
মেরী শ্বাসেঁ করতী রহতীঁ নিত প্রিয়কা অভিনন্দন রে।
পদরজ কো ধোনে ওমড়ে আতে লোচনমেঁ জল-কণরে!

আবার সীমা-অসীমের মিলনের কথা কবি মহাদেবীর কবিতায় কাব্যরূপ পায় এইভাবে :

"জব অসীম সে হো জায়েগা
মেরী লঘু সীমা কা মেল,
দেখগে তুম দেব! অমরতা
খেলেগী মিটনে কা খেল।"

মহাদেবীর কবিতায় এই ভাবেই রবীন্দ্রকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। মহাদেবী সেকথা অস্বীকার করেননি।

মহাদেবী বর্মার মতো সুমিত্রানন্দন পন্তও রবীন্দ্রপ্রতিভার কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"মৈ রবীন্দ্র কী প্রতিভাকে গহরে প্রভাব কৃতজ্ঞতাপূর্বক স্বীকার করতা হু।"

ছায়াবাদী যুগের কবি রূপে সুমিত্রানন্দন কখনও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করেছেন, কখনও আবার রহস্যময়তা ও গীতিমূর্ছনায় ভরিয়ে দেন। যেমন—

"নৌওছাওয়ার স্বর্গ ইসী ভূপর দেবতায়হীঁ মানবশোভন
অবিরাম প্রেম কী বাঁ হোঁ মেঁ হৈমুক্তি য়হী জীবনবন্ধন।"

এই কবিতা পড়লে রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্যসাধনের পরিবর্তে অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির কথা মনে পড়ে :

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

ছায়াবাদী কবিতা নানাভাবে ও ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছে। প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি নিরালার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা সহজেই মনে আসে। প্রেম ও মৃত্যু বিষয়ক নিরালার কবিতাগুলিও রবীন্দ্রনাথকে মনে করায়। মহাদেবী বা নিরালা দু'জনেই ছায়াবাদী কবিদের মুখ্য প্রতিনিধি, তবু দু'জনের কবিতা এক নয়। রবীন্দ্রনাথের থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছেন ভিন্নভাবে।

আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল ছায়াবাদের দুটি প্রধান অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যথা, রহস্যময় আধ্যাত্মিকতা এবং প্রতীকময়তা। শুক্লর মতে প্রথম অর্থে মহাদেবী বর্মা এবং দ্বিতীয়টির অর্থে নিরালা ছায়াবাদী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আধ্যাত্মিকতা এবং প্রতীকব্যবহার দুটোই ছায়াবাদীদের প্রভাবিত করেছিল। মহাদেবী বা নিরালার কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে। নিরালা আবার ছায়াবাদী কবি রূপে ইহলৌকিক মানবিক দুর্বলতাকে স্বীকার করে তাকে গৌরবদান করেছেন—

"হে নশ্বর, য়হ দীন ভাব
কায়রতা, কামপরতা
ব্রহ্ম হো তুমঃ"

নিরালার প্রথম কাব্য সংকলন ('অনামিকা', ১৯২৩) 'পঞ্চবটী প্রসঙ্গ', 'অধিবাস', 'জহী কী কলী' প্রভৃতি কবিতায় অনুরূপ ছায়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে নিরালার কবিতায় প্রগতিবাদেরও ছোঁয়া রয়েছে।

ছায়াবাদী কবিতা হিন্দি সাহিত্যে বা কাব্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগরূপে চিহ্নিত। উনিশ শতকের শেষ দিকে রচিত অনেক ব্রহ্ম সঙ্গীতে এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক রহস্যের ছায়া ছিল। হিন্দিতে তারই প্রভাবে আধ্যাত্মিক রহস্যবাদী কবিতা রচিত হয়। রূপকাত্মক কাব্যভাষা নির্ভর এই কাব্যকে চিত্রভাষাময় কাব্য বলা যায়।

ছায়াবাদের পরে হিন্দিকাব্যে স্বচ্ছন্দতাবাদী মনোভাব স্ফূর্তি পায়। ক্রমে তা প্রগতিবাদী ধারা

পথে বাহিত হয় এই বন্ধনমুক্তির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ সম্বন্ধ ছিল। বস্তুত বিশ শতকের প্রথম থেকেই ছায়াবাদ, স্বচ্ছন্দতাবাদ বা প্রগতিবাদের পথে যারা হেঁটেছেন তাঁরা কমবেশি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ না করে পারেননি।

কৃষক জীবনের বেদনা নিয়ে রচিত কাব্য 'কিষাণ' (১৯১৬) আটটি সর্গে বিন্যস্ত। কবি মৈথিলী শরাণগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৬৪) কৃষকজীবনের আত্মকথামূলক কাব্য রচনায় কৃষকের বাল্যজীবন, বিবাহ, গার্হস্থ্য জীবন থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে দেশভাগ ও প্রত্যাবর্তনের কাব্যরূপ দিয়েছেন। কৃষক জাগরণকে কবি ভাষা দিতে গিয়ে লেখেন—

নহী নহী শিব নহী বনুঙ্গা রুদ্র মৈঃ
জানেঙ্গে সব লোগ নহী হু ক্ষুদ্র মৈঁ।

এইভাবেই কৃষক জীবনের শরিক হতে চেয়েছেন কবি।

মৈথিলীশরণ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী 'সকেতা' কাব্য (১৯৩১) রচনায়। এই কাব্য রচনার লক্ষ্য উর্মিলা চরিত্রলেখ্য রচনা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি পরোক্ষভাবে ঋণী। রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' পড়ে মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী লিখেছিলেন, 'কবিয়োঁ কে উর্মিলা বিষয়ক উদাসীনতা।' এই প্রবন্ধ পড়ে মৈথিলীশরণ 'সাকেত' কাব্য রচনায় অনুপ্রেরণা পান। কাব্যে উপেক্ষিত উর্মিলা এইভাবে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় কাব্যে যথার্থ মর্যাদা পেয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় দলিত সাহিত্য তথা দলিত কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথাও উল্লেখযোগ্য। দলিত ও পতিত ভারতবাসীকে আহ্বান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার' বলে তিনি যে আহ্বান করেছিলেন তা পরবর্তীকালে অনেক ভারতীয় কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। হরিবংশরায় বচ্চন লিখেছিলেন—

"থাকিত, আজা, ব্যথিত আজা
দলিত আজা, পতিত আজা"

এই ডাক পরবর্তীকালে মারাঠি কবিকণ্ঠে তীব্র কঠোর প্রশ্নের রূপ ধরে।

"কিতি দিবস সোসয়চি
হে ঘোর নাকাবন্দী?"

এই বন্দিদশা থেকে মুক্তির মন্ত্র বহুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করে সাবধান করেছিলেন দুর্ভাগা দেশকে—

"শতেক শতাব্দী ধরে নামেশিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান"

এই জন্য কবি রুদ্রবীণাকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন—

"হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও,
বন্ধ নাশিবে তারাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে—"

দুঃসহ ব্যথার অবসান কামনায় কবি যে বিশাল প্রাণের জন্ম প্রত্যক্ষ করেন তা পরবর্তীকালে সাহিত্যে বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে।

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রানুসরণের দৃষ্টান্ত কম নয়। গল্প রচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তুলনীয় হতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' এবং মহাদেবী বর্মার 'চীনা ফেরিওয়ালা'। গল্প দুটির বিষয়বস্তু আলাদা হলেও উপাদান বিচারে সাদৃশ্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গল্পে রয়েছে কাবুলিওয়ালা রহমতের পিতৃহৃদয়ের সর্বকালীন আকুলতা ও সন্তানস্নেহ। প্রায় একই মডেলে রচিত 'চীনা ফেরিওয়ালা' গল্পের মূলে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের সর্বকালীন আকুলতা ও ভ্রাতৃপ্রেম। 'কুছ লেগা মেমসাব' বলে যে চীনে ফিরিওয়ালা এসেছিল তাকে 'মুছে কুছ নেহী চাহিয়ে ভাই' বলে ফিরিয়ে দেওয়া যখন গেল না তখন গল্পের শুরু। কেননা 'হামকো ভায় বোলা হ্যায় তব কুছ জরুল লেগা—জরুল লেগা—হাঁ?'

তারপর 'বহুত আচ্ছা সিল্ক লাতা হ্যায়, সিস্তর, চাই না সিল্ক, ক্রেপ' বাক্যটি বিবশ করে দেয় বক্তার মনকে। এই ভাবে 'ভাই-সিস্তর' সম্পর্কের হার্দিক সূচনা। তারপর থেকেই বোনের কাছে ভাই যখন তখন আসার অধিকার পেয়ে গেল।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পেও রহমত ও মিনির প্রথম সাক্ষাতের সময়ও কাবুলিওয়ালার স্বেচ্ছায় আগমন ও তার কাছ থেকে কিছু না কেনাটা ভাল হয় না এই বিবেচনাপ্রসূত ভদ্রতাবোধের প্রকাশ দেখা যায়। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালার পিতৃহৃদয় কন্দরনিঃসৃত কন্যার জন্য স্নেহ ও ভালবাসার যে চিরন্তন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন মহাদেবীর গল্পেও একইভাবে ভাইয়ের প্রতি বোনের চিরন্তন টান ও স্নেহানুরাগ চিরকালীন হয়ে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের মতো উপন্যাস ও নাটক পরবর্তীকালে ভারতীয় সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। 'চোখের বালি' ও অন্যান্য অনেক উপন্যাসের প্রভাব পড়েছে জৈনেন্দ্রর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনায়। জয়শংকর প্রসাদ, ইলাচন্দ যোশী প্রমুখের গল্পেও তার নিদর্শন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম সার্থক ভারতীয় উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' লেখেন তার কিছুকাল পরে রাজনৈতিক রচনার পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা রাও-এর 'কান্থাপুরা', মুলুকরাজ আনন্দের 'দি সোর্ড অ্যান্ড দি সিকল' (১৯৪২), 'আজাদ্যাপুত্র' (১৯৪৮), 'এন্নিপাডিকল' (১৯৬৬), 'মৃত্যুঞ্জয়' (১৯৬১), 'জুলুম' (১৯৬৬) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি রচিত হয়। আবার 'গোরা' উপন্যাস-রচনাকার রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভারতীয় মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনার পথ প্রশস্ত করেন তা সরস্বতী চন্দ্র (১৮৮৭-১৯০১) উপন্যাসে খণ্ডে খণ্ডে বিকশিত কাহিনীর মডেলকে অনেকটা সুসংহত ও নতুন শিল্পরূপের আধার করে তুলেছেন। পরবর্তীকালে রচিত শিবনাথ সত্যনারায়ণের 'ভেই পডগলু' বা সি. রাধাকৃষ্ণণের 'স্পন্দমপিনিকলে নন্দি' (১৯৮৬)-র মতো ভারতভাবনায় আলোকিত মহাকাব্যিক উপন্যাস পথ দেখায়। আবার রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র অনুপ্রেরণায় লেখা উদয়শংকর ভট্টের 'মৎস্যগন্ধা' গীতিনাট্য বা রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকের আদর্শে লেখা জয়শঙ্কর প্রসাদের 'কামলা' বা সুমিত্রানন্দন পন্থের 'জ্যোৎস্না' নাটকগুলির কথা স্মরণ করা চলে। ভারতীয় সাহিত্যের একাল রবীন্দ্রভাবনার দ্বারা বারংবার আলোকিত হয়ে উঠেছে।

'কোনখানে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান?' বলে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর কবিতায় তার উত্তরও যথাস্থানে দিয়েছেন। এই স্থানটিও চিত্তবীণার আসরে সুরে সুরে রঞ্জিত। একালের ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের গান বহু ভাবে ও ভাষায় নিত্য অনুপ্রেরণার সঙ্গী হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে' গানটি তাঁর বহু ভারতীয় উপন্যাসে ব্যবহৃত। পরোক্ষভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবেও যে অনেক ভারতীয় উপন্যাসের চরিত্র রবীন্দ্রনাথের গান শুনে ও গেয়ে নিজেদের জীবনতীর্থ ও পথসন্ধান করে তার উদাহরণ রয়েছে নিরালার 'চোটী কা পকড়' ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'জুলুস' প্রভৃতি অনেক উপন্যাসে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান'-কে রবীন্দ্রনাথের গান বলে নির্দেশ করে ছিলেন ভারতীয় সাহিত্যে তাই বান ডেকেছে একালের কবি-সাহিতিকদের রচনায়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ভাল মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে' সেই সত্যকে চেনা যায় একালের ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই অনুপ্রেরণার আলোয়।

রবীন্দ্রনাথ : স্বপ্নছবি অর্থাৎ ইমেজারি

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

মহাকবির মধ্যে এক সতত সঞ্চরমাণ অথচ সদ্যঃপাতী হৃদয় থাকে—পদ্মপত্রে জমে থাকা শিশির-বিন্দুর মতো। জগৎ, জীবন, ঊষার আলো তার গায়ে চিত্তির এঁকে দেয়। তারপর সেই বিচিত্রিত শিশির-বিন্দুতে কবে কোথায় 'বাজল কখন তোমার কাঁকন-কিঙ্কিনীতে/কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।' কবি-কল্পনার এই বিস্ফুরণ যখন হাজার গীতি তৈরি করে, তার মধ্যে শত শত 'প্যাটার্ন' থাকে—তা কখনও তৈরি হয় শব্দের প্রসন্নতায়, কখনও অলংকারে, কখনও ব্যঞ্জনায় আবার কখনও রসের মুর্ছনায়, এমনকি রসাভাসেও। মহাকবির কাব্য-কবিতা এমনই যে, সেটাকে কখনও কোনো এক বিশেষ রসতাত্ত্বিকতায় ধরে ফেলা যায় না। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের একটা পূর্ণ পরিচ্ছেদের মধ্যে এমন এক-একখানা শব্দও আমি পেয়েছি—একটা, মাত্র একটা শব্দও সেই সামগ্রীর মধ্যে আমাকে এমনভাবে প্রকম্পিত করেছে যে, তখন আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। তার জন্য অবশ্য সহৃদয়ের হৃদয়ানুবন্ধও তেমন হওয়া দরকার, তেমনই উদার বিশদীভূত হওয়া দরকার, সেই মনোমুকুর, যেখানে সেই মায়া-কবির হৃদয়ের ছায়া পড়ে।

সত্যি বলতে কী, কবিতার মধ্যে ধ্বনি-ব্যঞ্জনার যে সরসতা, তাতে যে মায়া তৈরি হয়, সেটাকে তবু কষ্টেসৃষ্টে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সেই ব্যঞ্জনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এক মায়া তৈরি করে, সেটাকে রসতত্ত্বের তাত্ত্বিকতায় ব্যাখ্যা করাও খুব কঠিন। এতটাই সেটা অনুভববেদ্য যে, ভীষণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও সেটা ভীষণভাবেই অতীন্দ্রিয় এবং অনির্বচনীয়। যে ভদ্রলোক বলেছিলেন—কবি, প্রেমিক এবং পাগলের মানসিক অবস্থানটা একই রকম হয়, তার সঙ্গে আর একটা শব্দ লাগানো উচিত ছিল—সেটা হল সহৃদয়, সমান-হৃদয়। সেও কম পাগল নয়। এটা কি কোনো প্রেমিক লিখেছিলেন, না কবি—কেননা প্রেমিক অনুভব করে, কিন্তু তার বর্ণনার শক্তি নেই বলে সে কবি নীরব—কিন্তু এটা কী প্রেমিক লিখেছিলেন, না কবি—

সখীর সহিত জলেতে যাইতে সে-কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ছলছল তাহে কি পরাণ রয়।।

তার মানে, এমন একটা 'সিচুয়েশন' যেখানে প্রেমিকও জীবন দিতে চায়, আর জীবন দিতে চায় সেই সহৃদয়, যে এই অপূর্ব নির্মাণ-নৈপুণ্যে পাগল হতে চায়। এই কবিতা-খণ্ডের মধ্যে কিন্তু কোনো অলংকার নেই, এমন কোনো বিশেষ রীতি-গুণও নেই যা রসতত্ত্বের নিরিখে ব্যাখ্যা করা। এটা ঠিক যে, কাব্যপ্রাণিতার প্রধানতম বস্তু ব্যঞ্জনাই এখানে সব, কিন্তু তার চেয়েও বেশি, এই ব্যঞ্জনার মধ্যে আছে কবির মায়া-শব্দের আচ্ছন্নতা। একে আমি বাংলায় রূপকল্প বলব, নাকি প্রতিমাকল্প বলব, নাকি সরাসরি মায়াকল্প বলব, আমি বুঝে পাই না, কেননা ইংরেজিতে যেটাকে 'ইমেজারি' বলি, তার কোনো বাংলা হয় না। এটা এমন এক শব্দার্থকল্প যার মূল প্রোথিত আছে শুধু শব্দার্থ-বিন্যাস এবং

বিপর্যাসের মধ্যেই—যা কখনও একটা রূপক, একটা উপমা, এমনকি একটা বিশেষণও হতে পারে। কখনও তা প্রকাশিত হতে পারে একটা সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ ব্যাপ্ত করে—হয়তো সেটা কোনো স্বাভাবিক বর্ণনা, কখনও বা তা বর্ণনাতীত ব্যঞ্জনা—কিন্তু সেটা এমনই এক গভীর মায়াময় কলাবস্তু, যার আবেদন সহৃদয়ের চিন-চিন-করা সেই মনের কাছে—যেখানে আয়নায় মুখ দেখলে মুখের শোভা যতখানি দেখি, তার চেয়ে মুখের সত্যগুলিও চরম ইন্দ্রিয়-সুখে অনুভব করতে পারি। সত্যি বলতে কী, কবিতার ব্যাপারে আপনি যতই শুদ্ধিবাদী শিক্ষক হন না কেন, সহৃদয়ের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি মথিত করেই ইন্দ্রিয়াতীতে পৌঁছনোর ব্যাপারটা কবিই সবচেয়ে বেশি বোঝেন। তাই তাঁর শব্দ- প্রয়োগের সহজাত নিপুণতা এমনভাবেই চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাকে আঘাত করে যাতে ইন্দ্রিয়গুলি আক্রান্ত হবার আগেই মথিত হয় এবং তাতে কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরী আমাদের মনের মাঝে এসে পড়ে। মথিত, মন্থিত ইন্দ্রিয়গুলি যুক্ত হয়ে যায় আমাদের মনো-বুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের অন্তঃকরণ এবং সংস্কারের সঙ্গে।

এই মায়াকল্পটাকে এক ডাকে ‘মেটাফর’ বলাটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, অথচ সেই মায়াকল্প একটা ‘মেটাফর’ ব্যবহার করেও তৈরি হতে পারে। এমনকি এটাও হয়তো ঠিক যে, মায়াকল্পের মূলটা হয়তো ‘মেটাফর’-এর মধ্যেই নিহিত ছিল। আর কে না জানে যে, ‘মেটাফর’ নিয়ে এককালে মাতামাতি হয়েছে। এমনকি অ্যারিস্টটলের মতো বিশালবুদ্ধি মানুষও একসময় বলেছিলেন যে, ‘মেটাফর’ই হচ্ছে একমাত্র উপায় যেটাকে বাইরে থেকে পরিশীলন করে তৈরি করা যায় না, কিংবা এটা কেউ শিখিয়ে দিতে পারে না। ফলত কে কতটা বড়ো কবি, তার প্রমাণ হবে কে কতটা ভালো ‘মেটাফর’ ব্যবহার করতে পারেন তার ওপরে। কবির প্রতিভা ধরা পড়ে ‘মেটাফর’-এর সুনিপুণ প্রয়োগের মাধ্যমেই—This alone cannot be imparted by another; it is the mark of genius।

অ্যারিস্টটলকে দোষ দিই না, তিনি অনেক প্রাচীন কালের মানুষ, হয়তো মায়াকল্পের বোধ তাঁর হৃদয়ে থাকলেও মাথায় ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল—‘ইমেজ’—শব্দটা ভাবনা খণ্ডে এনেও ড্রাইডেন-এর মতো কবি-সমালোচক বোঝালেন বটে যে, ‘ইমেজ’-এর মাধ্যমেই কবিতার চরম অনুভব তৈরি হয়, কিন্তু ‘ইমেজ’ বলতে আমাদের কবিতার এই মায়াকল্প ব্যাপারটা তিনিও যে খুব ভালো বোঝাতে পারলেন তা নয়। খুব সাধারণীকরণের মাধ্যমে বললে বরঞ্চ এটাই বলা ভালো যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ‘ইমেজারি’ বলতে কাব্যের অলংকরণ কিংবা কাব্যশোভা ছাড়া আর কিছু বুঝতেন বলে পণ্ডিতেরাও আবিষ্কার করতে পারেননি। সেই কাব্যশোভা যদি আমাদের রসশাস্ত্রের ভাষায়—কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে—অলংকার বলি, তবে ড্রাইডেন-এর ‘ইমেজ’- এর ভাবনাও ওঁদের সমালোচকের ভাষায় like cherries tastefully arranged on a cake. ‘ইমেজারি’ কিন্তু এই সব কিছুর থেকে সর্বতোভিন্ন এক ধূসর অবভাস যা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে, তারপর ‘আকুল করিল মন-প্রাণ’। আগেই বলেছি, সে একটামাত্র শব্দ হতে পারে, রূপক হতে পারে, উপমা হতে পারে, এমনকি একটা ছোট্ট বর্ণনাও হতে পারে—যেখানে চক্ষু মুদে আসতে পারে আবেশে, আবার রক্তিম হয়ে উঠতে পারে কর্ণমূল। বস্তুত একটা বর্ণনার মধ্যে যখন ‘ইমেজারি’ বা মায়াকল্প আসে, তখন সেটা আর একটা সামান্য ‘ডিসক্রিপ্শন’ থাকে না, মুহূর্তে সেটা একটা ‘একস্প্রেশন’ হয়ে ওঠে, ব্যক্তি-সহৃদয় সেখানে প্রথমে আক্রান্ত হয়, তারপর সেই আক্রান্তি অনন্তের হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশের আবেদন তো ছিল মাত্র দৃষ্টির কাছে, কিন্তু তারপর সে মায়াকল্প কোথায় ভাসায়ে নেয়—

মেঘেতে দিন জড়ায়ে আছে, মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে, কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘচ্ছায়া মেলিয়া ঘাটে ঘাটে।

মেঘ-বৃষ্টিকে এমনিতেই কোনোদিন জড় পদার্থ মনে হয়নি আমার, কিন্তু এ কেমন মেঘকল্প যা এক অচেতন-প্রসূত সমাসোক্তিকে অতিক্রম করে হৃদয়-গভীরে ঘনিয়ে আনে এক আবিল পরিবেশ যেখানে দ্রষ্টা আলস্যে দিন জড়ানো মেঘের চরণ-বিচরণ সর্বব্যাপ্ত অনুভূতিতে দেখতে পায়। কবিতা এখানে সামান্য এক অলংকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, কবিতা এখানে পঞ্চভূতের উপাদানের মধ্যে প্রবেশ করে, সেখানে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে ইন্দ্রিয়গ্রাম জারিত হয়ে ওঠে। এই সর্বগ্রাসী বাতুলতায় একটা গোটা কাব্যের প্রস্তাবনা তৈরি হয়ে যায়। এক বিরাট মধুর জীবনাখ্যান—যা অন্তহীন রোমাঞ্চ ধারণ করে থাকে একটি চতুষ্পদী শ্লোকের মধ্যে—কবি নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেন—এই দিনটা অন্য দিনের থেকে একেবারেই আলাদা, কেননা আজ ঘন মেঘে মেদুর অম্বর— মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

বস্তুত কবির মধ্যে যে 'আমি'-টা থাকে, সে আমাদের সাধারণের আমি নয়, সে আমি এক 'fictional dramatic'I", সে প্রত্নগর্ভ থেকে এক বিরাট আখ্যান তুলে নিয়ে এসে সগর্বে ঘোষণা করে—আজ আকাশ ঘন মেঘে মেদুর, দিগন্ত বিস্তৃত তমাল-বৃক্ষগুলির বিশাল বিস্তৃত ছায়াতে সমস্ত বনভূমি আজ ঘন-ঘনতর শ্যামল হয়ে উঠেছে—মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। দুটি পৃথক প্রাকৃতিক সত্তা ঘন মেঘে মেদুর অম্বর, আর দিগন্তের তমাল-বিপিন—দুই পৃথক প্রাকৃতিক সত্তা একাকার হয়ে ওঠে এক সাধারণ বর্ণমালায়—শ্যাম-সব কালো হয়ে উঠেছে—আকাশ এবং মর্ত্যভূমি-অধিজাগতিক মেঘচ্ছায়া যখন জাগতিক তমালবনের পত্রচ্ছায়ার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, সেই শ্যামা ব্রজভূমির মধ্যে তখন শ্যামল-কিশোরকে দেখতে পাই। প্রেমনত নয়নের দীর্ঘচ্ছায়া নামে তমালবনে—আমাদের বিনোদিনী রাইকিশোরী শ্যামল কিশোরকে নন্দগাঁও থেকে ডেকে এনেছেন নিজভূমে বর্ষাণায়—দুষ্টু গোরুর দুধ দুইবার জন্য। এরই মধ্যে কৃষ্ণের পালকপিতা নন্দবাবা কোনো কাজে এসেছেন এই বর্ষাণা-গ্রামে—কৈশোরগন্ধী এই দুই যুবক-যুবতীকে বাৎসল্যের তাড়নায় এবং গ্রাম্য পরিচয়ের অকৃত্রিমতায় তিনি অবিশ্বাসও করেন না। কিন্তু তাঁর ভাবনায় এখনও দুগ্ধমুখ কিশোর বালকটির জন্য তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত নেই, কেননা আকাশ ভরে উঠেছে ঘনমেঘে, দিগন্তের তমালবিপিনে অন্ধকার—মেঘৈ-র্মেদুরম্ অম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

খুব খারাপভাবে তিরস্কার না করলেও তিনি বিনোদিনী রাইকিশোরীকেই দায়ী করে বলেছেন—তুমি যখন ওকে সাধ করে ডেকে এনেছ এখানে, তখন তুমিই আমার বাচ্চা ছেলেটিকে পৌঁছে দাও নিজের জায়গায়, কেননা রাত হয়ে আসছে এবং তার মধ্যে এই ঘন মেঘে আকাশ ছাওয়া, তমালের অন্ধকার। রাইকিশোরী আদেশ মেনে বেরোলেন নন্দবাবার বাচ্চাছেলের হাত ধরে। তারপর কী খেলা হল শুরু, বনভূমির মর্মর পত্রমোচনের পথ বেয়ে যেতে যেতে যেখানেই ছায়াময় অন্তরাল, সেখানেই 'নবজলধরে যেন বিজুরি খেলায়।' কিন্তু এই বড়ো একটা আখ্যান উৎসভূমিতে কিন্তু সেই মায়াকল্প—মেঘৈ-র্মেদুরম্ অম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামাঃ—সেই মায়াকল্প পরম্পরাবাহিত হয়ে নেমে

আসে বাল্মীকির আদিকাব্য থেকে সজল নীল মেঘ সেখানে আরো এক অন্য নীলের গায়ে ঢলে পড়ে, মেঘের মধ্যে মেঘ ঢুকে পড়ে মনোহরণ ছন্দে, পাহাড়ের মধ্যে যেন ঢুকে পড়েছে বদ্ধমূল পাহাড়—

নীলেষু নীলা নববারিপূর্ণা
মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভান্তি সক্তা।
দবাগ্নিদগ্ধেষু দবাগ্নিদগ্ধা
শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূলাঃ।।

শব্দের জাদুকরিতে সর্বব্যাপ্ত বর্ষার অন্ধকার যে মায়াকল্প তৈরি করে বাল্মীকিতে সেটা একটার পর একটা চিত্র তৈরি করে, শব্দচ্ছবি সেখানে একটা বর্ণনাত্মক মায়াকল্প তৈরি করে, সেটাকে 'ডিস্‌ক্রিপটিভ্ ইমেজারি' ছাড়া কী বলা যায়! কবিতার এই মায়াকল্প, যেখানে বর্ণনা নিজেই মায়াময় হয়ে ওঠে, কিন্তু বর্ণনাত্মক এই মায়াকল্প কখনওই প্রথম থেকেই ধাক্কা দেয় না, তার একটা উদয় আছে, 'প্রগ্রেশন' আছে যা আস্তে আস্তে সহৃদয়কে গ্রাস করে, মথিত করে, তারপরে এক উষসী প্রসন্নতার মধ্যে সমাহিত করে Leaving him in a luxury of twilight. কীটস্-এর Hyperion এ যেন ক্রৌঞ্চবিরহী কবির সেই নীলাভাস—নীলেষু নীলা নববারিপূর্ণা/মেঘেষু মেঘা প্রতিভান্তি সক্তা। কীটস্-এ বুড়ো শনির মধ্যে কিন্তু হাওয়া থমকে গেছে—

Sat grey-haired Saturn quite as a stone,
Still as the Silence round about his lair,
Forest on forest hung about his head
Like cloud on cloud. No stir of air.

মায়াকল্পে এই রিক্ততার মাহাত্ম্য সর্বর্তু-মোহন ভারতবর্ষে তেমন করে আবেদন করে না, কিন্তু তবু নৈঃশব্দ্যের মতো স্থির এই বার্ধক্য, পার্বত্য উপত্যকার দুঃখ-দীর্ণ স্তব্ধতা, এগুলি দিয়ে এক বৃদ্ধ ঈগলের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন নিরস্ত হয়। আমাদের দেশে বৃদ্ধ বর্ণনার এই প্রয়াস ছেড়ে পুরাতন প্রস্তাবে মেঘের কাছে পৌঁছতে চাই আবার। বস্তুত ডিসক্রিপটিভ্ ইমেজারি যদি বর্ণনাত্মক না হয়ে সূক্ষ্মভাবে বিদ্ধ করে, তবে একটা উৎপ্রেক্ষাও কী ভীষণ মায়াময় হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তেমন একটা উৎপ্রেক্ষিত মায়ার জন্য কতক্ষণ ধরে এক কবি অলংকারের বকুল বিছোতে বিছোতে চলেন পথে। মৃচ্ছকটিক নাটকে সেদিন এক সময় সেই দুর্লভ দেখা হবে ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সঙ্গে সেই গণিকা নায়িকা বসন্তসেনার। সেই সময় আকালিক দুর্দিন ঘনিয়ে এল। সেই অকাল দুর্দিনের বর্ণনায় দুটি ভিন্ন মানুষকে পরিস্থিতিগত ভিন্নতায় কেমন লাগছে। চারুদত্ত বলেছেন—

আলোকিতং গৃহশিখণ্ডিভিরুৎকলাপৈঃ
হংসৈর্যিযাসুভিরপাকৃতমুন্মনস্কৈঃ।

এই আকালিক দুর্দিন দুই পৃথক পক্ষীর কাছে দুরকম। গৃহপালিত ময়ূর আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে তার কলাপ বিস্তার করেছে পরম আনন্দে তাই সে 'উৎকলাপ', কিন্তু মানস সরোবরে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হংসের মনে দুর্দিনের শঙ্কা আছে, তাকে যেতে হবেই এমন দুর্দিনেও, তাই সে 'উন্মনস্ক'। লক্ষণীয়, 'উৎকলাপ' এবং 'উন্মনস্ক'—এই দুটি শব্দেই 'উৎ' উপসর্গের প্রয়োগ। আরো লক্ষণীয়, চারুদত্ত ঘরে আছেন, তাঁর মনে আনন্দের উৎকণ্ঠা-বসন্তসেনা আজ এই মেঘে ভরা দুরন্ত দুর্দিনে আসবেন তাঁর কাছে, সাধারণ্যে এটা দুর্দিন হলেও ময়ূরের কাছে মেঘালোকনের আনন্দ, সে

উৎকলাপ, চারুদত্তের হৃদয় নাচে। কিন্তু বসন্তসেনাকে এই দুর্দিন পেরিয়ে আসতে হবে, তাঁকে দুর্দিনের বাধা পেরিয়ে যেতেই হবে মানস-সরোবরে, রাজহংসীর মানসে ফেরার সময়-কাল নির্ধারিত, তাকে যেতেই হবে, ঠিক যেমন অভিসারিণী বসন্তসেনা যাবেন চারুদত্তের কাছে। বসন্তসেনা ‘উন্মনস্কা’। তাঁর মন উৎকণ্ঠিত এলোমেলো হয়ে আছে।

আমার খুব খারাপ লাগছে এইভাবে ব্যবচ্ছেদ করে কবিতা বোঝাতে। কিন্তু সেই গভীর সমালোচক বলেছিলেন—মহাকবির অব্যর্থ শব্দরাজির কথা, যেখানে দুই নায়ক-নায়িকার নামোচ্চারণ হয় না, অথচ এক bird-imagery সমস্ত পরিবেশটাকে অভিসারের উৎকণ্ঠায় সমাহিত করে। খেয়াল করে দেখুন, অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গান্ধর্ব মিলন ঘটছে তৃতীয় অঙ্কে। দুই সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা জানেন শুধু। তাঁরা প্রায় পাহারা দিচ্ছেন নায়ক-নায়িকাকে। অদূরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রজনীর অন্ধকার নেমে আসবে এখুনি। আশ্রমের সবচেয়ে বৃদ্ধা মহিলাটি শকুন্তলার শরীর-খারাপের কথা শুনেছিলেন। তিনি হন্তদন্ত হয়ে শকুন্তলার খবর নিতে আসছেন সন্ধ্যা-স্বস্ত্যয়নের শান্তিজল নিয়ে। ঠিক এইরকম একটা পরিস্থিতিতে শকুন্তলার সখীরা বলে উঠল—চক্রবাক-বধ।

চিরকালের কবি-ভাবিত এক বিশ্বস্ত শাকুন সংস্কারকে কালিদাস কীভাবে ব্যবহার করেছেন। কবি-সংস্কার নাকি এইরকম যে, চক্রবাক এবং চক্রবাকী নাকি কখনও বিযুক্ত থাকে না দিনের বেলায়। কিন্তু সন্ধ্যা-রজনী নামতেই তারা একে অপরের কাছ থেকে সাংস্কারিক ভাবেই বিযুক্ত হয় এবং নদীর অপর পার থেকে সারা রাত তারা ডেকে চলে পরস্পরের উদ্দেশে। মিলনান্তকারিণী রজনী এই যুগল-পক্ষীর কাছে বিয়োগের বার্তা বয়ে আনে। এতগুলি কথা মহাকবির লেখনীতে শুধু বহুল স্মৃতি বিজড়িত একটি পঙ্‌ক্তি—আমার চক্রবাকবধূ হে! এবার বিদায় জানাও সহচরকে, কেননা রাত হয়ে আসছে—রঅণী উষট্টিয়ায়িং। এখানে কবি অবশ্য কৌতুকাবেশে ছিলেন, যার জন্য হন্তদন্ত হয়ে খবর নিতে আসা আর্যা গৌতমীকে মিলন বিঘ্নকারিণী রজনীরূপে কল্পনা করাটা কবিচাতুরী তৈরি করে বটে, এমনকি চক্রবাক এবং চক্রবাকীর ব্যবহারও এখানে সেই অর্থে কৌতুকপ্রদ হয়ে উঠলেও কাব্যব্যবহারের মধ্যে এই শাকুন-কল্প কিংবা পুষ্প-কল্প কিংবা পশুকল্প একটা মোহন ভাবকল্প তৈরি করতে পারে।

এখানে বৃদ্ধা গৌতমী হন্তদন্ত হয়ে আসছেন এবং যদি কোনোভাবে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিবাহ-পূর্ব মিলনের কথা জেনে যান, সেইজন্য না হয় নায়ক-নায়িকার ওপর চক্রবাক-চক্রবাকীর এই আরোপটুকু যতখানি না কবিকল্প কিংবা রূপকল্পের ব্যবহার, তার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে অতিশয়োক্তি অলংকার। উপমান এখানে উপমেয়ের ওপর এতটাই চেপে বসে যে, ক্ষণিকের জন্য যেন দুষ্মন্ত-শকুন্তলা লুপ্ত হয়ে যান, কিন্তু সেই অবলুপ্তির মধ্যেও রজনী অন্ধকার যখন মিলন-বিঘ্নের প্রতীকতায় কাজ করতে থাকে ঠিক তখনই চক্রবাকবধূর উদ্দেশে এই সম্বোধন—আর নয়, রাত হয়ে গেছে চক্রবাকবধূ—এই সম্বোধন কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই চক্রবাক আর চক্রবাকী নামের পক্ষী-যুগলকে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের রূপকল্পের মধ্যে এনে ফেলে। কিন্তু তা হলেও চক্রবাক-চক্রবাকী খানিক যেন ব্যবহৃত হওয়ার দোষে অভিযুক্ত হয়।

অথচ সেই শাশ্বত প্রেমের রূপকল্প কেমন করে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার ভাস। তিনি কালিদাসেরও আগের নাট্যকার, অন্তত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি নাটকের বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছিলেন বহুজল্পিত উদয়ন-বাসবদত্তার প্রেমকাহিনি। সেই নাটকে বাসবদত্তা বেঁচে

থাকা সত্ত্বেও তাঁর আগুনে পুড়ে মরার প্রবাদ রটেছে। তাতে রাজা উদয়নের কী করুণ অবস্থা হয়েছে, যতবার তিনি—হা বাসবদত্তা! হা অবন্তীরাজপুত্রী! বলে বিলাপ করছেন সেই বর্ণনা এক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ব্রহ্মচারীর মুখে শোনা যাচ্ছে এবং সে ছদ্মবেশিনী বাসদত্তার সামনেই এই বর্ণনা দিচ্ছিল। সব বর্ণনার শেষে সেই ব্রহ্মচারী, সংযমে-নিয়মে যার প্রেম বোঝার কথাই নয়, সেও উদয়ন আর বাসদত্তার কথা স্মরণ করে বলছে—এখন সে সব চক্রবাক আর নেই, যারা স্ত্রীর সঙ্গে বিযুক্ত হবার পর এইরকম করে বিলাপ করে নৈবেদানীং আদৃশাশ্চক্রবাকাঃ/নৈবাপ্যন্যে স্ত্রী বিশেষৈ-র্বিযুক্তাঃ। আমার তো মনে হয়, এই একটা পঙ্‌ক্তি—সেই সব চক্রবাক আর নেই—এই বিশাল এক অন্তহীন নৈরাশ্যের মধ্যে শুধু এই 'চক্রবাক'—শব্দটি এমন অন্তহীন অবরতিহীন প্রেমের দ্যোতক হয়ে ওঠে যে, সেটাকে ইমেজারি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

চক্রবাক-চক্রবাকীর নিরন্তর ডাক, বিরতিহীন পরম্পরাহ্বান-কর্ণেন্দ্রিয়ের কাছে যে সম্ভোগ-বিরহের আবেদন তৈরি করে, তেমনটিই তেমন করে না হলেও হংস-বলাকার বিরামহীন ক্রেংকার-ধ্বনি মহাকবির কাছে সব সময়েই বিরক্তিকর নয়, বরঞ্চ তা তাঁর কানের কাছে অন্যতর আবেদন রাখে বলেই নির্জন অপরাহ্ণে ঘুঘুর ডাক মহাকবির কাছে আনমনা এক অলস বিরহের প্রতিমাকল্প। ইংরেজ কবি Clare সারসের ক্রেংকার-ধ্বনিকে দীর্ঘযাত্রার বিষণ্ণতা কাটানোর প্রতীকী বুদ্ধিতে গ্রহণ করেছেন—

Cranking their jarring melancholy cry
Through the long journey of the churless sky.

আমাদের মহাকবিকে দেখুন, তিনি তো কোনো কিছুর মধ্যে passive দেখতে পান না। মেঘদূতের কবি দেখেছেন-আকাশে মেঘের যাত্রাপথে তার সাথী হবে রাজহংসের দল মেঘ যক্ষবধূকে খবর দিতে যাবে চিত্রকূট পাহাড় থেকে সুদূর অলকায়, আর হংস-দল তখুনি ভাবে—তারা একই সঙ্গে যাত্রা করবে তাদের নিজকুলের রাজধানী মানস সরোবরে। সুদূর যাত্রাপথে তাদের পাথেয় খাদ্য মৃণালতন্তু মুখে নিয়ে কৈলাস পর্যন্ত যাবে—আ কৈলাসাদ্ বিসকিশলয়চ্ছেদ-পাথেয়বন্তঃ।

আসলে রাজহংস, কিংবা বলাকা বকপঙ্‌ক্তির মতো পাখিগুলির পৃথকভাবে কোনো গুরুত্বই নেই, তারা কিন্তু একটি ঋতুর রূপকল্প তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে। খেয়াল করে দেখুন আমাদের কবির ভাবনায়—চাতকপাখি নাকি অন্য জল মুখে দেয় না, আবার কবিপ্রসিদ্ধিতে চকোর-পাখিও নাকি চাঁদচুয়ানো জ্যোৎস্না খেয়ে বাঁচে। ফলে বর্ষার জন্য পক্ষী-কল্প তৈরি করে চাতক, কিংবা বলাকা, আর প্রেমের রূপকল্পের জন্য চন্দ্রিকাপায়ী চকোর। কালিদাসের মেঘ উড়বে আকাশে, তিনি চাতক পাখিকে বলেছেন মেঘের আত্মীয়, মেঘের সগন্ধ। যাত্রাশুরুর সময়েই বাঁদিক থেকে ডেকে উঠল বলেই সেটা যাত্রামঙ্গলের স্বস্তিবাচন বলে চিহ্নিত করেছেন কালিদাস— বামশ্চয়াং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ। পাখির ডাককে যাত্রাশুরুর মঙ্গলধ্বনি হিসেবে ব্যবহার করাটা প্রতিমাকল্পের মধ্যে পড়ে এবং সেই কারণেই হয়তো শকুন্তলার পতিগৃহ-যাত্রাকালেও মহর্ষি কণ্ব যখন তপোবনের তরুলতার কাছে শকুন্তলার বিদায়-অনুমতি চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠল কোকিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কণ্বমুনি বলে উঠলেন—এই তপোবনের আত্মীয়দের কাছে শকুন্তলা যাবার অনুমতি পেয়ে গেছে, আর কোনো চিন্তা নেই—অনুমতগমনা শকুন্তলা/তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।

'ইমেজারি' হিসেবে চকোর-এর ব্যবহার আরো মধুর। গভীর প্রেমের সঙ্গে শারীরিক সংশ্লেষ তো আছেই তার সঙ্গে জুড়ে যায় ঐকান্তিকতা, একমুখাপেক্ষিতা, অনন্য নিষ্ঠা। চাতকের ক্ষেত্রে

একটা অভিমান-অহংকারের অযাচক-বৃত্তি যেমন 'ইমেজারি'-র মধ্যে মিশে যায়, চকোরের ক্ষেত্রে সেটা এক নিষ্ঠার পরম ধাম। চাতকের সম্বন্ধে কবিপ্রসিদ্ধি এই যে, গলা শুকিয়ে মরে যাবে তবু সে মজে-যাওয়া পুকুরের জলও খাবে না, হ্রদ-নদীর জলও ছোঁবে না। জলের জন্য যদি সে প্রার্থনাও করে, তবে সে মেঘবাহন ইন্দ্রের কাছে যাচনা করে মাথা উঁচু করে, কিন্তু অধমের কাছে সে প্রার্থনা করবে না—নান্যং বাঞ্ছতি নোপসর্পতি ন চ প্রস্তৌতি ন ধ্যায়তি। কিন্তু চকোর যেহেতু চাঁদের জ্যোৎস্না পান করে বাঁচে, তাই চকোর-এর কাব্য-ব্যবহার অদ্ভুত মধুরতায় লিখিত হয়।

চাঁদের জ্যোৎস্না পান করা তো সোজা কথা নয়, তার জন্য এমন কোনো বিলক্ষণ নিপুণতা লাগে, তা অন্য কোনো পক্ষীর নেই। সেই নিপুণতার দিকে তাকিয়েই এক কবি অবন্তীদেশের রমণীদের রতিনৈপুণ্যের মাধুর্য বর্ণনা করেছেন। কবি লিখেছেন—চাঁদ-চুয়ানো চন্দ্রিকা পান করার ব্যাপারে একমাত্র চকোরীরাই নিপুণ এবং চতুর, আর কেউ তা পারে না—চকোর্য্যেব চতুরা চন্দ্রিকাপান-কর্মণি। ঠিক তেমনই সুরতকেলির নর্মভাবনায় অবন্তীর রমণীরা ছাড়া আর কেউই তেমন নিপুণ-চতুর নয়। এই যে চকোরীর মতো এক পক্ষিণীকে কৌমুদী পানের নিপুণতায় প্রয়োগ করা হল সেটা কিন্তু যতখানি চকোরীর প্রতি মুগ্ধতা, তার চেয়ে অনেক বেশি মুগ্ধতার বিষয় কিন্তু অবন্তীর যুবতীদের রতিনৈপুণ্য। কিন্তু সেটা প্রকট করে বলতে গেলে যৌনতার অভিসন্ধি প্রকট হয়ে ওঠে বলেই চন্দ্রিকাপায়ী চকোরীর প্রতিমাকল্প ব্যবহার করেছেন কবি। এই কবিতায় আরো বেশি লক্ষণীয়, কবিপ্রসিদ্ধিতে চকোরীর চন্দ্রিলা জ্যোৎস্না পান করার চেয়েও সেই পানের কৌশল নিপুণতার ওপরে কবির আসয় যেন বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ চকোর-চকোরীর কবিপ্রসিদ্ধি থেকে কিঞ্চিৎ সরে এসে কবি এই পক্ষিণীকে রমণীয় যৌনতার প্রসঙ্গে ব্যবহার করছেন। এখানে আরো 'ইট্রিগিং' হল—চকোর—শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করার ফলে 'উইমেন সেক্সুয়ালিটি'-র মধ্যে চাঁদের জ্যোৎস্নার স্পর্শ লাগে যেন। স্ত্রীলোকের রতিনৈপুণ্য এখানে চন্দ্রিকাপানের অলৌকিক মাধুর্যের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। বিশেষত পান শব্দটা এক মুহূর্তে যৌনতাকে রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় করে তোলে।

'ইমেজারি' হিসেবে তির্যক প্রাণীর ব্যবহার বহুলভাবে আছে সংস্কৃত সাহিত্যে। তার মধ্যে ভ্রমর অথবা মধুকরের ব্যবহার বোধহয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আমাদের সাহিত্যে। তুলনামূলকভাবে ইংরেজি সাহিত্যে অন্য প্রাণীরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে bull imagery, wolf imagery, কিংবা fox imagery পুরুষদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, সে রকম সংস্কৃত সাহিত্যে ভূরি ভূরি আছে। অতি প্রাচীনকালে যখন কাব্য কিংবা অলংকার ভালো করে দানাই বাঁধেনি, সেই সময়ে ঋগ্‌বেদের মধ্যে বহুবীর্যবর্ষী বৃষভ বা ষাঁড়ের সঙ্গে পুরুষের কথা উপমা হিসেবে এসে গেছে। লোপামুদ্রা নিজের জীবনে যৌনতার অভিসন্ধিৎসাতেই কিন্তু এটা বলতে পেরেছিলেন যে, আমার না হয় বহু শারদ প্রভাত জরিমা এনে দিয়েছে শরীরে, কিন্তু সময় এবং রোমাঞ্চ যেখানে এখনো দাম্পত্যের মধ্যে আছে, সেখানে 'বৃষভ' যেন তার পত্নীর কাছে যায়—সমূনুপত্নীর্বৃষভো জগম্যুঃ—এই শব্দ সেইকালেই ইমেজারির ক্ষমতা বুঝিয়ে দিয়েছে। পূর্ব প্রেমের উদাহরণে রুক্মিণী কৃষ্ণকে ভালোবাসেন অথচ চেদিরাজ শিশুপাল অক্ষম ঈর্ষায় কৌশলে রুক্মিণীকে অধিকার করতে চান—এই অবস্থায় রুক্মিণী চিঠি দিয়ে কৃষ্ণকে জানাচ্ছেন—এমন যেন না হয় যে, শিশুপাল কোথা থেকে এসে আমাকে টেনে নিয়ে যায়, এমন যেন না হয় যে, পশুপতি সিংহের খাদ্যভাগ শেয়ালে টেনে নিয়ে গেল—মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্/গোমায়ুবন্মৃগপতে-র্বলিমম্বুজাক্ষ।

তির্যক প্রাণীর ব্যবহারে যে প্রতিমাকল্প তৈরি হয়—সে ষাঁড়, সিংহ, বাঘই হোক, আর হরিণী, চকোরী কিংবা ময়ূরীই হোক, আমার ভীষণ ভালো-লাগা প্রতিমাকল্পগুলির মধ্যে মধুকরী কল্পনাগুলিই বোধহয় সবচেয়ে মোহময়। তার সঙ্গে ফুলের ব্যবহার আরও যেন চমক তৈরি করে। আরও একটা দেখার জিনিস কবি-ব্যবহার। আমাদের কবিরা ইমেজারি তৈরি করার সময় পুংলিঙ্গে পদ্ম-কথাটা যত ব্যবহার করেছেন, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি তাঁদের মনঃপূত স্ত্রীলিঙ্গে পদ্মের ব্যবহার—অর্থাৎ 'ইমেজারি'র জায়গায় স্ত্রীলিঙ্গে পদ্মিনী অনেক বেশি মোহ তৈরি করে পুংপদ্ম তেমনটা করতে পারেই না। বাস্তবে পদ্ম প্রস্ফুটিত হলে সেটা পদ্ম না পদ্মিনী তা আমার বোঝার কম্মো নয়, কিন্তু আমাদের কবি প্রসিদ্ধিতে পদ্মিনী রীতিমতো নায়িকা। পদ্ম যেহেতু সূর্য ওঠার পরে ফোটে—সেই স্বাভাবিকতা মাথায় রেখেই পদ্মকে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করে পদ্মিনীকে কবিরা সাজিয়ে দিয়েছেন বাসকসজ্জা। একইভাবে রাতে ফোটা কুমুদিনী (শাপলা) হয়ে উঠেছে ওষধিপতি চন্দ্রের নায়িকা। দুজনের ক্ষেত্রেই এটা একটা বড়ো 'ট্রেইট' তারা সারা রাত বা সারা দিনের অপেক্ষার পর তাদের নায়ককে দেখতে পায় এবং তখন সে অবগুণ্ঠন মোচন করে প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য চিরায়মান নায়কের যে অপেক্ষা সেইখানেই 'ইমেজারি' তৈরি হয়।

পদ্মিনীকে নিয়ে শুধু সংস্কৃতে কবিদেরই কল্পসিদ্ধি হয়নি, আমার তো মনে হয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যথেষ্ট আপ্লুত ছিলেন পদ্মিনীর অপেক্ষমানা প্রতিমায়। নিজের ব্যাপারে সেখানে সচেতনতাও কাজ করেছে কত। তাঁর নাম তো রবীন্দ্রনাথ, তিনি রবি। পদ্মিনীকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর কাজ, সূর্য নায়কের দায়। মুম্বই নিবাসিনী আনা তরখর-এর কাছে বুঝি ইংরেজির পাঠ নিতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দিনে দিনে সেই প্রবাসে নান্দনিকতাও তৈরি হল বোধ হয়। আনা-র নাম দিলেন নলিনী অর্থাৎ পদ্মিনী। কত কাল পরে সেই স্মরণিকায় তৈরি হল কবিতা এবং গান। কিন্তু আর্থী ব্যঞ্জনায় প্রতিমাকল্প তৈরি হয়—

শুন নলিনী খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কী!
দেখ তোমার দুয়ার' পরে—
সখী, এসেছে তোমারই রবি।

শুধু নলিনীই নন, সূর্যাংশুভিন্না পদ্মিনীর কবিকল্প কতটা তাঁর নাম জুড়ে ছিল যে, আপন সহধর্মিণীর প্রাচীন নামটি পালটে দিয়ে কবি তাঁর নাম রাখেন মৃণালিনী। অর্থাৎ সেই পদ্মিনী এবং অবশ্যই সেই রবি। পুষ্প-নায়িকা হিসেবে স্বভাব মৃদু এবং কোমল হওয়া সত্ত্বেও পদ্মিনীর অবলম্বন হিসেবে সূর্য নায়কটি যে কতখানি নির্ভরযোগ্য তা জুঁই ফুলের মতো অনাথা রমণীর ভাগ্য দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ পদ্মিনীর কবিকল্পটাকে আরও যেন মজবুত করে দিয়েছেন ভগ্নহৃদয় কবিতায়—সেখানে শব্দটা কিন্তু মৃণালিনী :

ওগো উষার বাতাস!
শ্রান্ত মাথা পড়ে নুয়ে—চাহিয়া রয়েছে ভুঁয়ে
মর'-মর' একটি জুঁই ফুল!
কাছেতে এস' না স'রে—একখানি পড়িবে ঝ'রে
সুকুমার একটি জুঁই ফুল!

ও ফুল গোলাপ নয় সুষমাসুরভিময়,
নহে চাঁপা, নহে গো বকুল!
ও নহে গো মৃণালিনী তপনের আদরিণী,
ও শুধু একটি জুঁই ফুল!

আমি সংস্কৃত ভাষায় পদ্মিনী আর কুমুদিনী—দুই নায়িকার ঈর্ষাসূয়া দেখিয়ে কবিকল্পের সিদ্ধি দেখাতে চাইছি, এখানে 'ইমেজারি'র বিষয়টা পদ্মিনী এবং কুমুদিনীই বটে, কিন্তু নায়ক এখানে সূর্য চন্দ্র নয়, এখানে নায়ক মধুকর—যার অভ্যাস ভালো নয়, সে 'অভিনব-মধু-লোলুপ'। নতুন নতুন পুষ্পনায়িকার কানে মিলন-সংকেত পাঠানো তার কু-স্বভাব। এখানে কবিতার বস্তু-পরিচয়ে কোনো বড়ো ঘটনা নেই—একটাই ঘটনা এখানে—সকালে প্রভাত-সমীরণে ডাঁটা-সহ একটি পদ্মফুলের ওপর বসার চেষ্টা করছে। কিন্তু হাওয়ার দোলায় এদিক-ওদিক করছে বলে সেই পদ্মের ওপর সে বসতে পারছে না। এখানে কবি সেই পদ্মফুলের মধ্যে খণ্ডিতা নায়িকার মূর্তিকল্প তৈরি করেছেন। খণ্ডিতা হচ্ছে সে, যে বহুকাল নায়কের জন্য অপেক্ষা করে অভিমানিনী হয়ে উঠেছে, এই মুহূর্তে যে তার অভীষ্ট নায়ককে সন্দেহ করছে সারা রাত অন্য কোনো রমণীর আসঙ্গ-লিপ্সার দোষে—যে দোষের প্রমাণও পেয়ে গেছে সে—কবিকল্প আরম্ভ হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে।

কবি প্রথমেই বস্তু-পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন—প্রভাতবায়ে চলমানা কম্পিতা পদ্মিনী। সে লক্ষ করেছে মধুকর-নায়কের গায়ে লেগে আছে কুমুদিনী-নায়িকার পুষ্পরাগ-রেণু—কুমুদবতীরেণু-পিশঙ্গ-বিগ্রহম্। এই অবিশ্বস্ত আচরণ দেখে ঈর্ষা-অসূয়ায় পদ্মিনী কিছুতেই আর মধুকরকে নিজের কাছে ঘেঁষতে দিল না, নিজেকে সে সরিয়ে নিল মধুকরের চুম্বনোদ্যত মুখখানি থেকে—তার রাগ হয়েছে খণ্ডিতা নায়িকার মতো, আর সত্যিই তো কোন্ অভিমানিনী রমণী অন্য রমণীর সঙ্গ-করে-আসা প্রেমিককে সহ্য করতে পারে—নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী/ন মানিনী সংসহতে' ন্যসঙ্গমম্।

ঈর্ষাসূয়ায় জর্জরিত হওয়ার জন্য এখানে মধুকরের আবতারণা ঘটেছে বটে, কিন্তু পদ্মিনীর চেয়েও হাজার গুণ বেশি মধুকর যে কী পরিমাণ 'ইমেজারি'-র জন্ম দিয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য এবং বাংলাতেও তা এখানে উল্লেখ করছি না। 'ইমেজারি'-র মাধ্যমে মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে যে আবেদন তৈরি হয়, তার সঙ্গে কবির হৃদয়, আকুতি, sensuousness এবং নান্দনিক অনুভূতি না মিশলে অনন্য কবিকল্প তৈরি হয় না। সাধারণ ইমেজারির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি যেখানে কণ্ডুয়িত হয় শুধু, সেই কণ্ডূয়ন সব সময়েই যৌনতার নয়। স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাছে কবিতার যে নিবেদন, তাও তো সবসময়ের যুবতীর স্তন-জঘনের স্পর্শে বিশ্রান্ত হয় না। Ben Johnson স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে তাঁর অনুভূতির কথা জানাচ্ছেন—

Have you felt the wool of beaver
Or swan's down ever

এমন কবিতায় একটি হাঁসের গলার অনেক নীচে পেটের জায়গাটায় যে feel, এটা এতই বিলক্ষণ এক স্পর্শ যেটা মেষলোমের স্পর্শের থেকেও অন্যতর এক অনুভূতি, সেটা একরকম ইমেজারি তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু 'ইমেজ'-টা এখানে বড়ো বেশি অভিধা-বৃত্তিতে ধরা পড়ে, এখানে যেন সুন্দরীর নাক, চোখ, মুখটাই প্রধান হয়ে ওঠে, প্রতীয়মান লাবণ্যের মতো একটা কিছু—যার জন্য উত্তমোত্তম কবিতার হাহাকার চিরকাল, সেই ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণ্য নেই এখানে। 'ইমেজারি'-তে ইন্দ্রিয়াভিগম্য বস্তুর মধ্যেও চরম ব্যঞ্জনা না থাকলে কবিকল্প সার্থক হয় না, অথচ 'ইমেজারি'তে

সেই ব্যঞ্জনা শুধুমাত্র শব্দার্থের অন্যথাভিধান নয়, বরঞ্চ শব্দগত বস্তুর, ব্যক্তির, প্রাণীর, এমনকি জড় স্থানসাহায্যের চারিত্রিক বা ব্যবহারিক প্রতীয়মানতা। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে একটি ঘুঘু-পাখিকে ব্যবহার করেছেন একটা মন্থর অপরাহ্নের প্রতীয়মানতায়, কিংবা জীবনানন্দ আরও তীব্রভাবে পেঁচা, ইঁদুর, শঙ্খচিল, সেই প্রতীয়মানতা 'ইমেজারি'-কে ইন্দ্রিয়াভিগম্য করে তোলে। Auden-এর কবিতায়—

O dear white children, casual as birds,
Playing amid the ruined languages.

সমালোচক সহৃদয় লিখছেন এখানে—Innocence is not the immediate that 'white' suggests to me there, in spite of its association with 'children'. My mind, transferring the epithet, has already received an image of white doves, pecking about the foot of broken columns white in sunlight, which is the picture I compose from the second line. The general emotional tone I feel in the image is one of distance, separation, and a certain nostalgic melancholy.

দুই

আমার মনে আছে, আমি যখন চাকরির জন্য এক গ্রাম-শহরে গিয়ে উঠেছিলাম, সেখানে প্রায় এক পোড়ো বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন এক ভদ্রলোক, তিনি বাড়ির মালিক, দূরে থাকতেন, কিন্তু পরম সহৃদয়তায় যে বাড়িটায় থাকতে দিয়েছিলেন, তার একখানা মাত্র ঘর। ঘরখানি এতই বিশাল যে, সেখানে এখনকার ফ্ল্যাটবাড়ির চারখানা ঘর অনায়াসে ধরে যাবে। আমি ঘরের এক পাশে থাকতাম, বর্ষাকালে সে বাড়ির অন্য পাশে বেশ গলগলিয়ে জল পড়ত। কিছু দিন থাকতে থাকতে এই ভগ্নপ্রায় বাড়িখানিই আমার বেশ ভাল লেগে গেল। সে বাড়ির বাইরে এক বিরাট উঠোন, ভাঙা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এখানে আমার ভাল লাগতে লাগল সেই সব ক্লান্ত দুপুরগুলি, যখন অদ্ভুত এক মেদুরতা তৈরি হত। আমার সেই আলো-আঁধারী বৃহৎ প্রকোষ্ঠের প্রান্তে বিরাট কড়ি-বরগার কুলুঙ্গীতে কতগুলি পায়রা এমন অদ্ভুত ধ্বনি করত যাতে মেঘদূতের সেই সেই লাইনটা মনে পড়বেই—নীড়ারম্ভে গৃহবলিভুজাম্ আকুলগ্রামচৈত্যাঃ।

নির্জন দুপুরে না হলেও একটা মেঘদূতের স্মরণিকার মতো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই কবুতরের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁকে লিখতে হয়েছে অবশ্য তাঁরই মতো করে—পথতরু শাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা/বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে/বনস্পতি। এখানে তবু এটা কোনো স্বপ্নছবি হয়ে ওঠে না, যেহেতু এখানে অনুবাদের চেষ্টা ছিল কিছু। কিন্তু যেখানে নির্জন দুপুরের তৈলচিত্র, ক্লান্ত জাগরিত-প্রায় কর্ণেন্দ্রিয়ের কাছে ঘুঘু-পাখির ঘু-ঘু-ঘু, সেখানে রবীন্দ্রনাথের এক শব্দ-ব্যবহার ক্ষুদ্র এক ঘুঘু পাখিকেও 'ইমেজারির' কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সত্যি বলতে কী, ঘুঘুর ডাকের মধ্যে অদ্ভুত একটা 'হ্যাকনিইড রিপিটিশন' আছে; আছে নির্জনতার মধ্যে একাকিত্বের যাপন-যন্ত্রণা, আছে নৈরাশ্য অথবা মন্থরতার অলস মন্ত্রণা। মনের এই 'অলস দিন বিরস কাজ'-কে প্রকাশ করার জন্য মায়াময় এই ঘুঘুর ডাককে অদ্ভুত এক মায়াকল্পে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আপনাদের মনে থাকার কথা, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কালে কবির মধ্যে সেই সময় 'হয়ে ওঠা'র শব্দ যন্ত্রণা স্ফুটনোন্মুখ রুদ্ধ বাষ্পযন্ত্রের আকুলতা তৈরি করছে—অথচ তাঁর সেই শব্দার্থের মধ্যে বিচিত্রের মাধুরী স্পর্শ করছে না—

কেবলি মাথার ’পরে করিতেছে সমস্বরে
বাতাসে শুকানো পাতা মরমর মরমর—
বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান।
পারি নে শুনিতে আর একই গান একই গান।

এই বাষ্পরুদ্ধ কল্পনা বোঝানোর জন্য এই কবিতার শেষে একই ভাবে একই স্বরে ডাকতে থাকা ঘুঘু পাখি প্রতীকী হয়ে ওঠে প্রতিমাকল্পের মতো—

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
ঘুঘু এক বসে বসে গায় একস্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়।
বলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায়-হায়।
হৃদয় রে, আর কিছু শিখিলি নে তুই,
শুধু ওই গান!
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান!

অথচ কবি যখন সম্পূর্ণ তাঁর কবিতার আকাশের মধ্যে সহজ বিচরণ করছেন, তখনও সেই একই ঘুঘুর একতান কলধ্বনি অদ্ভুত এক মন্থরতার সূচনায় মেদুর এক প্রতিচ্ছায়া তৈরি করে। তখন কবিতা প্রসবের জন্য অন্তর-দিগ্ধ যন্ত্রণা ছিল না কবির, ফলত ঘুঘু পাখির একস্বর সুর সঠিক এক ‘ইমেজারি’র জন্ম দিয়েছে মন্থর, মেদুর, নিরাশ এক অবসন্ন একাকিত্বের মধ্যে—হালকা সাদা মেঘের নিচে পুরানো সেই ঘাসে/একটা দিনের পরিচিত আমবাগানের পাশে/মাঠের ধারে, অনভ্যাসের সেবার কাজে খেটে/কেমন করে কয়টা প্রহর কোথায় গেল কেটে/সমস্ত দিন ডাকল ঘুঘু দুটি।

আমরা বলবো—এই কবিতাতেও ‘ঘুঘু’ কিন্তু গহন সেই মায়া-কল্পের সর্বতোবিসারিণী ব্যাপ্তির মধ্যে ধরা পড়ে না। শুধুমাত্র ঘুঘুপাখির ক্লান্তস্বর ডাকে যে মায়া-পরিবেশ তৈরি হয়, তার প্রমাণ আসে ‘অসম্ভব’ ছবিতে—

অদূরে মাদার-শাখে ঘুঘু দেয় ডাক।
আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাষায়
অফুরাণ নৈরাশায়
উছলিতে থাকে একতানে
আন-মননীর কানে কানে।
আতপ্ত হতেছে দিন, শিশির শুকায়ে গেছে ঘাসে,
অজানা ফুলের গুচ্ছ উচ্চ শাখে দুলিছে বাতাসে।
ঢালু তটে তরুচ্ছায়াতলে
ঝিলিমিলি শিহরন ঝরনার জলে।

এখানে 'অফুরান নৈরাশ্য', 'একতান' এবং 'আনমন কানে কানে'—এই সমস্ত শব্দগুলির সঙ্গে 'ঘুঘু'-র মতো এক ক্ষুদ্র পাখি কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যে এমনই এক আচ্ছন্ন মেদুরতা তৈরি করে দেয় যে, আমরা 'ইমেজারি'র স্বাদ পাই এখানে। অথবা এর চেয়েও বেশি মেদুর-মন্থর হয়ে ওঠে নির্জনতা 'ক্ষণিকা'র 'বিরহ'-এ—

চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা গন্ধ নিয়ে
আসতেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।
দুটি ঘুঘু সারাটা দিন
ডাকতেছিল শ্রান্তিবিহীন,
একটি ভ্রমর ফিরতে ছিল
কেবল গুণ্‌গুণিয়ে
চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা বার্তা নিয়ে।
তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।
ঝাউশাখাতে উঠতেছিল
শব্দ অবিশ্রাম।
আমি শুধু একলা প্রাণে
অতি সুদূর বাঁশির তানে
গেঁথেছিলেম আকাশ ভরে
একটি কাহার নাম।
তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।

আমি যে শুধু 'ঘুঘু' নিয়েই বিশালবুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের মায়াকল্পবোধ বোঝানোর চেষ্টা করছি, সেটা ভাবা এক বিড়ম্বনা। রবীন্দ্রনাথের মতো এমন মায়াবি কবি এবং মায়াকল্পের এমন সাংঘাতিক তাঁর বোধ যে, 'ইমেজারি' ব্যাপারটা সার্বিকভাবে তাঁর কবিতা থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া যায়। 'ইমেজারি'র ভাবনা করতে গিয়ে দেখেছি—'ইমেজারি' একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়-তর্পণের একটা দিক খোলা রাখে, তেমনই খোলা রাখে হৃদয় যেখানে এক-একটা শব্দ প্রতীকীও হয়ে ওঠে কখনো কখনো। একই সঙ্গে এখানে কবির মানস-আধারে ভেসে আসে 'মিথ'—হয়তো একটা শব্দের মধ্যে, যেখানে সমাজের কিংবা সমাজ-ব্যবহারের পূর্ব-মন্ত্রণা মিশে আছে পুরাতন কালে ঘটে-যাওয়া ঘটনার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যখনই ঝড়-এর কবিতা লিখেছেন, তখনই অবধারিতভাবে সেখানে সৃষ্টিসংহারকারী রুদ্র-দেবতার অনুষঙ্গ এসেছে, এসেছে বজ্রের ধ্বনি ইন্দ্রলোক থেকে, অথবা 'সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে/ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়,/বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন লাগা হাতিশালা থেকে/গাঁ-গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক/শুঁড় আছড়িয়ে!

কিন্তু রুদ্র, প্রলয়, বজ্র-বিদ্যুতের সমস্ত মিথিক্যাল হানাহানি এবং অনন্ত ধ্বংসের পরেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঝড়কে সব সময় নবীন সৃষ্টির এক শান্ত সমারোহ হিসেবে দেখেছেন। চিত্রাঙ্গদায়—ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে, আমার শুকনো পাতার ডালে—এই গানে কিংবা কবিতায় মরণের 'অন্তরাল' থেকে পরান জেগে ওঠে, 'রুদ্র নাচের তালে'-র মধ্যেই এখানে 'আসন' পাতা আরম্ভ হয়, 'নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের পরে'। এই 'ইমেজারি' চক্ষু-কর্ণের বিপ্রতীপ রসায়ন তৈরি করার পর হৃদয়ের কাছে আবেদন তৈরি করে। হয়তো বা এই কারণেই রবীন্দ্রনাথে ঝড়ের রাতে অদ্ভুত সেই অভিসার তৈরি হয়, যা অন্য কোনো কবির চিদাকাশে প্রতিভাত হয় না। 'ঝড়ের দিনে' অভিসারিকার সেই রমণী মূর্তি ইন্দ্রিয়ের চরম ভোগ তৈরি করে ভালবাসার চরম আত্মনিবেদনের মধ্যে, অন্যদিকে তৈরি করে সেই অনির্বচনীয় মায়াকল্প—ঝড়-বিদ্যুৎ-হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেফালিমালায় সন্নদ্ধ বেণী খসে পড়ছে অভিসারিণী রমণীর; বিশেষত মেঘের গুরুগুরু শব্দের সঙ্গে 'নৃত্য মাঝে কেঁপে ওঠে উরু'—এই অলৌকিক প্রস্তুতি সেই শ্রেষ্ঠতম মানুষটির আসঙ্গ-লিপ্সা কবিতার মায়াকল্পটিকে নিঃসীম নির্বিশেষের মধ্যে বিশ্রান্ত করে—

যাবে যদি, মনে ছিল না কি,
আমারে নিলে না কেন ডাকি?
আমি তো পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী—
আমারে নিলে না কেন ডাকি?
বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে,
উত্তরী উড়িত মম উন্মুখ পাখার সম...
মিশে যেত আকাশে পাতালে
বিদ্যুতের চমকানি-কালে।

রবীন্দ্রনাথের মায়াকল্প বুঝি চরমে ওঠে কর্ণেন্দ্রিয়ের অবস্থানে। তাঁর কথা, তাঁর গানের সুরে পঞ্চম লেগেছে চিরকাল, ফলত তাঁর কর্ণজপ্য মায়াকল্প একদিকে যেমন মোহন হয়ে ওঠে, তেমনই সেটা প্রতীকীও হয়ে ওঠে একই সঙ্গে। তার মধ্যে আমি যেহেতু বৈষ্ণব বাড়ির জাতক, তাই ছোটবেলা থেকে সেই মুখ—বংশীগানামৃত ধাম/লাবণ্যামৃত জন্মস্থান—সেই মুখে বাঁশীর এক অদ্ভুত স্বপ্নচ্ছবি আমার হৃদয় আলোড়িত করে। সে ছবি তবুও বৈষ্ণবীয় আকুলতায় খানিক স্থূল, হয়তো বা বাঁশীর চাইতে বংশীধারী কৃষ্ণের মধুরতা বেশি ধরা পড়ে, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যেও যদি কেউ নতুন দার্শনিক দৃষ্টিতে অথবা কাব্যায়নী দার্শনিকতায় বাঁশির বিচার করেন তাহলে দেখবেন—বাঁশি প্রায় কৃষ্ণকে প্রতিপূরণ করে ফেলে। রবীন্দ্রনাথে দেখবেন—বাঁশির কথায় কৃষ্ণের কথা আসে না কখনো, কিন্তু কৃষ্ণের ব্যবহারিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্ত অবচেতনটুকু বাঁশির সংস্কারের মধ্যে যেন অবগুণ্ঠিত হয়ে আছে মায়ার মতো, প্রতিভাসের মতো।

আমার মনে আছে, আমার এক দিদি ছিলেন, কমলিনী দিদি। তাঁর ঠাকুরের সিংহাসনে কৃষ্ণের কোনো মূর্তি ছিল না। ছিল একখানি বাঁশি। তিনি বিয়েথা করেননি, বিধবা নন, ঈষৎ প্রৌঢ়া, সুন্দরী যুবতীর মতো প্রৌঢ়া। কৃষ্ণের মন্ত্রে তাঁর ঠাকুরের সিংহাসনে বংশীর পূজা হত। তাঁকে দেখেই বুঝেছিলাম বাঁশি মানে এক মায়াকল্প, বাঁশি এক 'ইমেজারি'। কমলিনী-দিদির বাঁশি মানে এক

অন্বেষণ। বাঁশি মানে সেই সুদূরের সুর, যা অনুক্ষণ পাগল করে আমাদের। অথবা বাঁশি মানে সেই অলৌকিক সুদূর, যার অপেক্ষায় এক অলৌকিক বিরহ-বিলাসে সুখের মতো এক ব্যথা অনুভব করি অহরহ। অথবা বাঁশি মানে সেই মধুর অতিক্রম, যেখানে সমস্ত নিয়ম ভেঙে পড়ে কেজো লোকের মর্মে শেল বিঁধিয়ে দিয়ে। কমলিনী দিদি বলেছিলেন—সেদিন শারদী পূর্ণিমার রাত্রি ছিল। আকাশ-ভরা চাঁদ চুয়ানো জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন কৃষ্ণ। সেই কোন হেমন্ত কালে তিনি কথা দিয়েছিলেন গোপিনী সখীদের—তোমাদের সঙ্গে মিলন হবে আমার। তোমরা অপেক্ষা কোরো প্রতিদিন। সেই সব নিশিদিন চলতে চলতে আজ সেই শারদী রাত্রি এসেছে। গগনের চাঁদ সারা দিনের প্রতীক্ষায় থাকা পূর্বদিক্‌বধূর গাল ছুঁয়ে দিল তার কিরণকরের স্পর্শে। দিকবধূর গালে লজ্জার লালিমাতে মেটে-লাল হয়ে উঠল পূর্বাকাশ—তদ্দুডুরাজঃ ককুভ-করৈর্মুখং/প্রাচী আবিলিম্পন্ অরুণেন শন্তমৈঃ। এমন মধুরতা দেখে কৃষ্ণ আর সইতে পারলেন না। তিনি বাঁশি বাজিয়ে দিলেন অশেষ ব্রজযুবতীদের উদ্দেশে, জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।

আর যেই না সেই বাঁশির সুর হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে এল বৃন্দাবনের কুলযুবতীদের কানে—তখন রাত্রি আঁধার হচ্ছে কেবল, তখন এই বাঁশি শোনার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল—যে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় সমস্ত কাজ রেখে দৌড়োতে আরম্ভ করল সেই বাঁশির সুর লক্ষ্য করে—যে বাঁশি বাজল বনমাঝে কি মনোমাঝে। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া, একজন আর একজনকে খেয়াল করল না যে, অন্যজন কী করছে। এ যেন একান্ত ব্যক্তিগত এক সুরের আহ্বান, যাতে মনে হয় এ সংকেত শুধু আমারই জন্য, অথচ আমারই মতো অন্য আর একজনও সেই সুর-সংকেত শুনতে পায়, কেননা সে আমারই মতো আর একজন, কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশি শুনলে এই অন্য আর একজনকে খেয়াল থাকে না—সমস্ত আমিগুলো একসঙ্গে দৌড়োয়, সেই গতিতে দুলতে থাকে শুধু কানের দুল—আসঙ্গ সাক্ষীর মতো, বাঁশি শোনার পর অখিল যুবতীকুলের গতির শীঘ্রতা পরিমাপ করে যেন—আজগ্মুরন্যোন্য মলক্ষিতোদ্যমাঃ/স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।

কমলিনী-দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম—এমন হয় কেন? এ কেমন পাগলপানা স্বভাব তৈরি হয় বাঁশির সুরে যেখানে এতগুলি যুবতী মেয়ে, তারা যে যে কাজ করছিল, সব ফেলে দৌড়োল—কেউ এক চোখে কাজল পরে, কেউ পায়ের নূপুর গলায় পরে, কারও ‘খসল বসন রসন চেলী/গলিত বেণী লোলনী। এ কেমন করে হয়? কমলিনী দিদি গল্প শুনিয়ে বলেছিলেন—এটা আমার গুরুর মুখে শোনা কথা। সেই আমার হাতে গিরিধারীর বাঁশি দিয়ে তিনি বলেছিলেন—বাঁশি হল সেই সুরের বড়শি, একবার সুরের সুতোয় তোর গলায় এসে বিঁধল, তো তুই যতই জলের মধ্যে ঘোরাফেরা কর, তোকে যেতে হবে তাঁর কাছেই। আমি এই আমার বাপের সংসারে আছি, তবু ধন্যি বাপ আমার। তিনি আমাকে হাতাখুন্তি আর সন্তান জন্ম দেওয়ার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন, আমাকে শুনতে দিয়েছেন বাঁশির সুর। আমার বাবাজিমশায় বাঁশির জন্মকাহিনি শুনিয়েছিলেন একদিন— বলেছিলেন—যেদিন এই দেহ হবে বাঁশির মতো, সেদিন সেই সুরের গুরু সুর সাধবেন এই বাঁশিতে।

কথাটা ভাল করে বুঝলাম না বলে কমলিনী বললেন—কৃষ্ণ ব্রজভূমির নায়ক, শতপুষ্পের কুঞ্জবনে তাঁর চলাফেরা, বৃন্দাতুলসি তাঁর সখী, গলায় বনফুলের মালা, এমন মানুষের কাছে প্রকৃতি হল সব চাইতে ভালবাসার জিনিস। কৃষ্ণ প্রতিদিন বনভূমিতে আসেন, প্রতিটি গাছের কাছে যান, তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনেন, তাদের পরিচর্যা করেন। আর গাছেরাও তাঁকে ভীষণ ভালবাসে। গভীর পারস্পরিকতায় প্রতিদিন তাদের কুশল বিনিময় হয়। কিন্তু এই গভীর আন্তরিকতার মধ্যেই

একদিন সেই বিপর্যয় ঘটে গেল। কৃষ্ণ সেদিনে বনভূমিতে প্রবেশ করে কাউকে ভালবাসা জানালেন না, কোনো পত্র-পুষ্পে অংকন করলেন না তাঁর করাঙ্গুলির স্পর্শ। তিনি এসে উপস্থিত হলেন বংশমণ্ডপে বাঁশবনের ছায়ায় এবং তাকিয়ে রইলেন একটি বাঁশ গাছের দিকে। বাঁশ গাছ বলল—হ্যাঁগো, এমন করে তাকিয়ে আছো কেন আমার পানে? কৃষ্ণ বললেন দুঃখ-স্বরে—একটা জিনিস চাই তোমার কাছে, কিন্তু বড়ো কষ্টের সেই চাওয়া। বাঁশ বলল—বলো কী চাই তোমার, তোমাকে অদেয় নেই কিছু। কৃষ্ণ বললেন—আমি তোমার প্রাণ চাই। তোমাকে কাটতে হবে আমায়। বাঁশ খানিক ক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—তোমার কাছে সব সমর্পণ করে বসে আছি আমরা। এ দেহ কাটবে কী রাখবে, সব তোমার ইচ্ছে।

কৃষ্ণ সেই বাঁশ গাছ কেটে খণ্ড খণ্ড করলেন। তারপর উপযুক্ত বংশখণ্ডটি নিয়ে তাতে ফুটো করতে আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণ এক একটি ফুটো করেন আর বাঁশি যন্ত্রণায় কাঁদতে থাকে। অবশেষে তৈরি হল বাঁশি, কৃষ্ণ ফুঁ দিলেন বাঁশিতে—তাতে থেমে গেল ব্রজভূমিতে গোরুর বিচরণ, ময়ূরের নৃত্য, পক্ষীকুলের কলকাকলি। ব্রজগোপীরা বললেন—মুখরিত এই বংশীধ্বনি শুনে মৃগ-পক্ষীদের মধ্যেই এমন আকুল অবস্থা, সেখানে আমরা ঘরে থাকি কী করে—কা স্ত্র্যঙ্গ তে কল-পদায়াত-বেণুগীতম্। আর সেই বাঁশ যে, নিজের জীবন দিয়ে বাঁশির জীবন পেয়েছিল, সে অঝোরে কাঁদছিল এই ভেবে যে, কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণ বাঁশি ছাড়া এক মুহূর্তও থাকেন না। কৃষ্ণ বংশদণ্ডের জীবন নিয়ে বংশখণ্ডকে আপন জীবনে সর্বক্ষণের জন্য স্থান দিয়েছেন। এর জন্য একদিন কৃষ্ণের প্রিয়তমা সখীরাও ঈর্ষালু হয়ে উঠলেন বাঁশির ওপর, সর্বক্ষণ কৃষ্ণের হাতে থাকা বাঁশির ওপর মুখরিত-মোহন-বংশ।

একদিন গোপিনীরা জিজ্ঞাসা করলেন বাঁশিকে—কী সেই রহস্যটা বলো তো। আমরাও তো সারা জীবনের তপস্যায় তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী হতে পারলাম না, অথচ তোমার এত সৌভাগ্য হয় কী করে? বাঁশি বলল—আমাকে তাঁর পছন্দ হওয়ার কারণ শোন—আমার ভিতরটা পুরো ফাঁপা, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই, চাওয়া পাওয়া নেই, আমি একেবারে জীবন-মুক্ত। তিনি যেমন চলান তেমনি চলি, যেমন বলান তেমনি বলি, আমি সব সমর্পণ করেছি তাঁর কাছে—'আমার লাজ ভয়, আমার মান-অপমান সুখ-দুখ-ভাবনা।' ভেতরটা এমন নির্গুণ হলেই তবেই তিনি সর্বাংশে গ্রহণ করেন। গোপীকুল বুঝি শিক্ষা নিলেন বাঁশির কাছে—লজ্জা-ভয়, আর্যজনের সমস্ত বিহিত পথ ত্যাগ করে তাঁরা যে এমন কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন—সেটা শুধুই বাঁশির শব্দ শুনে।

কমলিনী-দিদির বংশীকাহিনিটা ভালই লাগল, অন্তত সেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল আরো। বাঁশির প্রতীকটুকু কমলিনীদিদি কৃষ্ণের একাত্মতায় ধরেছেন বলেই তাঁর সিংহাসনে সোনার বাঁশিখানি কৃষ্ণ হয়েই বসে আছে। আমি ভাবি, প্রতীক তো শুধু এখানেই নয়, আমার মহাকবিও তো বাঁশিকে ব্যবহার করেছেন কালের রাখালের হাতে দিয়ে। আমি যেদিন এই গানখানা শুনেছিলুম—সেই যে মধ্যদিনে যখন পাখিরা গান বন্ধ করে দেয়, তখন কালের রাখাল যে বেণু বাজায়, সে গান শোনে রুদ্র-প্রান্তর-প্রান্তরের কোণে বসে—এ গান শুনে এক অলৌকিক ভয় যেন আবিষ্ট করে মন; তবু এই ভয়ের মধ্যেও—হে রাখাল! বেণু তব বাজাও একাকী—সেই রাখালের কথা শুনি যেন অমনই আমাদের কৃষ্ণাবেশ ঘটে, কেননা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে রাখাল ভাবাই যায় না কখনো। তাঁকেই শুধু ভাবা যায় যেন কেউ যেখানে নেই, সেখানেও তাঁর বাঁশির আবেদন ভেসে আসে তাঁর কাছে যাবার জন্য। কিন্তু এর চাইতেও বেশি অবাক হয়েছিলুম কালের রাখালকে পৃথিবীর অনন্ত উপরে

সেই চিদাকাশের মাঝে ধেনু চরাতে দেখে। সেখানে সেই কোন সুদূরে জগৎসৃষ্টির আদিকেন্দ্রে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা আর অফুরান নক্ষত্রের ধেনু চরে বেড়াচ্ছে সেই বাঁশীর সুরে—তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন—আর দিগন্তে উচ্চকিত গ্রহ-তারা- নক্ষত্রের দল মহাজাগতিক শৃঙ্খলায় চরে বেড়াচ্ছে—উপনিষদের ঋষি মঙ্গল উচ্চারণ করছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। আমার কবি লিখলেন—

এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্য তারা দলে দলে—
কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগনতলে।

আবারও মনে হল সেই কমলিনী দিদির কথাই—ওই বাঁশিই আমার ঠাকুর। সেই কোন সুদূরে বসে আমার শ্যামল কিশোর বাঁশি বাজাচ্ছেন, আর আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি পাগলের মতো—সুদূর বিপুল সুদূর। তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। আমি বলেছিলাম—জানো তো দিদি, তুমি তো বাঁশি নিয়ে এক ‘রোমান্টিক’ জগৎ তৈরি করে ফেলেছো। তাতে আমিও ভাবি—বাঁশির একটা নিজস্ব জগৎ আছে সত্যি, যেখানে কেজো জগতের সমস্ত বাস্তব, সমস্ত শৃঙ্খলা যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। সে বাঁশি যে শুনতে পায় সে এক বিশৃঙ্খল মধুরতার টানে গা ভাসিয়ে দেয় এই পৃথিবীতে। তার সাথের সাথী হয় উদাসী হাওয়া, নদীর জল আর বিকীর্ণ পৃথিবীর প্রান্তর। তাকে যদি কাজের জগতে ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে শঙ্খের নিনাদ না হলে চলে না। আমার কবি লিখে গেছেন—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে।

কবিতা শুনে কমলিনীর মুখ ভার হল একটু। তারপর খানিক ভেবে বলল—তোমার যিনি কবি, সে তো আমারও কবি। তবে কিনা আমার কবির স্বভাবের মধ্যে বাঁশিটাই সব, অন্যের জন্য তাঁকে শঙ্খ বাজাতে হয়, অন্যের জন্য তিনি বজ্রের মধ্যে বাঁশি রাখেন, পৃথিবীর হাজার অন্যতর কাজের প্রয়োজন আছে বলেই বাঁশিতে অন্য তান তুলতে হয়। কিন্তু সে আমার কবির স্বাভাবিক জগৎ নয়। তিনি নিজে সেই ছন্নছাড়া পাগলের দলে আছেন বলেই বাঁশি ছেড়ে শঙ্খ বাজাতে গেলে তাঁকে হাহাকার করতে হয়। তা নইলে ওই একই কবিতার মধ্যে তিনি লিখতেন না—

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।

কবির ইচ্ছে কিন্তু এই বাঁশিতেই তিনি সেই সুরধ্বনি জাগিয়ে তুলতে চান যাতে গীতশূন্য অবসাদ—পুর জাগ্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সুর বাঁশিতে তৈরি হলেও বাঁশির মধ্যে যেহেতু উদাসীন এক

ছন্নছাড়া পাগলপারা ব্যাপার আছে তাই বাঁশি দিয়ে শঙ্খনাদ হয় না, কবিও তা পারেন না। আমার কবির হাহাকার আছে এখানে। বলেছেন তো—

সে বাঁশীতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আমার সঙ্গীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে দুঃখ যদি পায় তার ভাষা...

দেখেছো তো ভাই 'যদি'—কমলিনী দিদি বললেন—'যদি'। আমি জানি বাঁশি দিয়ে বিপ্লব-বিদ্রোহ হয় না। বাঁশির মধ্যে মোহিনী আছে গো, মোহিনী আছে, সে আকর্ষণ করে, পাগল করে, ঘরছাড়া করে—আমার ঠাকুরের মতো—কমলিনী দিদি চৈতন্যচরিতামৃতের কবির সুরে গান ধরলেন—

নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহধর্ম্মকরায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম, লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে।।
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদাস্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বোলয় আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে।।

আমার সামনে কমলিনীদিদির এই গান গাইতে এতটুকু লজ্জা হল না। বুঝলাম বাঁশিতে মজে আছেন কমলিনী। এ হল বাঁশির সেই মায়াকল্প যেখানে রবীন্দ্রনাথ আর বৈষ্ণব কবি একাকার হয়ে যান, একাকার হয়ে যান অন্যথায় কর্মহীন মানুষ, আমার কমলিনীদিদি।

তিন

আমাদের সংস্কৃত-বাংলা সাহিত্যের কবি-কল্প এতই গভীর, এতই সেটা অগাধ যে, সেখানে সাপও আছে, শকুনও আছে, তবে আমাদের নজরটা হরিণী, চাতকিনী, চকোরীর ওপর বেশি। শেকস্পিয়র তাঁর King Lear-এ গনেরিল-এর অপব্যবহার স্মরণ করে এই শব্দ বসিয়েছেন detested kite অথবা How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. অবশ্য এই সব ইমেজারি-র ক্ষেত্রে disease, cancer, fire এগুলিও তাঁর নাটকীয় ভাবনার সিদ্ধি ঘটিয়েছে। কিন্তু কালিদাসে দেখুন হরিণ কিংবা হরিণ-শিশুর ব্যবহার। কালিদাসে মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্ত হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে তপোবন-ভূমিতে এসে পৌঁছেছেন। আশ্রম বালক পড়ুয়া বৈখানস ঋষিরা দাঁড়িয়ে পড়েছেন দুষ্যন্ত এবং বনভূমির মৃগের মাঝখানে। তারা বলেছেন—মহারাজ! এটি এই আশ্রমের মৃগ, আপনি মারতে পারেন না একে। শরসম্বরণ করুন এই মুহূর্তে—আশ্রম-মৃগো'য়ং ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ। এক মুহূর্তে এই হরিণ 'ইমেজারি'র বিষয় হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞ গবেষকরা দেখিয়েছেন—কোনোদিন তেমন নায়ক পুরুষের মুখ দেখেননি, এমন তপোবনবাসিনী শকুন্তলাও কিন্তু এখানে রাজোচিত মৃগয়ার বিষয় হয়ে ওঠেন। নগর-জীবনে সর্বথা অনভিজ্ঞ

শকুন্তলা এক নিরীহ হরিণীর কবিকল্পে চিহ্নিত থাকেন এবং 'চতুর-গম্ভীর' রাজা পর্যন্ত শকুন্তলার সখিদের জিজ্ঞাসা করে বসেন—আচার, ব্যবহার এবং দৃষ্টিপাতে যিনি প্রায় হরিণীদের মতোই, সেই তোমাদের এই প্রিয়সখী শকুন্তলা কী এই তপোবনের হরিণীদের সঙ্গেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন, নাকি অন্য কোনো জীবনবৃত্তি গ্রহণ করবেন—আহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ।

হরিণীদের সঙ্গে বাস করার এই বন্য বৃত্তি, অথচ হরিণী বলেই সেটা এত নিরীহ, ভয়ের জায়গাতেও এত ঋজুভাবেই নির্ভয়, শকুন্তলা নাগরিকবৃত্তিসম্পন্ন রাজাকে চিনতে পারলেন না, কিন্তু মন দিলেন এবং ভালোবাসায় মরলেন—হরিণী এখানেই কবিকল্পের জায়গা নিয়ে নেন। পঞ্চম অঙ্কে দুষ্যন্তের প্রত্যাখ্যান লাভ করে শকুন্তলা যখন তাঁর অঞ্চলপ্রান্তধরা হরিণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন নাগরক দুষ্যন্তকে, তখন দুষ্যন্ত তির্যকভাবে তাঁকে বলছেন—এটা কি কোনো স্মারক বস্তু হল—হরিণ এবং তুমি দুজনেই আরণ্যক পশুর মতো, কোনো তফাত নেই—দ্বাবপি যুবাম্ আরণ্যকৌ। তবে হরিণের এই প্রসঙ্গে 'ইমেজারি' যে কত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে পারে, তা ধরা পড়ে জীবনানন্দের কবিতায়। এমনিতেই তাঁর কবিতায় হাঁস, পেঁচা, ইঁদুর, ঘুঘু, পায়রা—এই সব ছোটোখাটো প্রাত্যহিক পরিচিত জীব পর্যন্ত অন্য মায়া-কল্প তৈরি করে—সেখানে কাব্যিক একটা সিচুয়েশন-ই শুধু তৈরি হয় না, সেখানে উপনিবদ্ধ হয় জীবনের খণ্ড খণ্ড সুখ, দুঃখ, লোভ—অথবা নিতান্ত নিবিড়, মেদুর এক অনুভূতি থেকে অতি-বিপ্রতীপে কঠিন হৃদয়বিহীন এক অসভ্যতা, যা তথাকথিত সভ্যতার অন্তরাল থেকে ধাক্কা দেয় আমাদের—যেমন এই এক ভোর—

আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ
একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো—

আবার রূপান্তরে সেই ভোর কত কষ্টকর হয়ে ওঠে হরিণের কবিকল্পে—

সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগিনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে
অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।
(ভোরের আলো, শীতল ঢেউয়ে হরিণীর স্নান—একটা অদ্ভুত শব্দ)
নদীর জল মচকা ফুলের মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃশব্দ নিরপরাধ ঘুম।

এই কবিতার আরম্ভে দর্শনেন্দ্রিয়ের যে মহাভোগ তৈরি হয়েছিল, তা কী ভয়ংকর রূপ নেয়। শিশিরভেজা পুরানো গল্পের অন্তরালে কী সাংঘাতিক হিংস্রতা ফুটে ওঠে নিরীহ হরিণের বেঁচে থাকার জন্য চংক্রম্যমান না বোঝার ওপর, সরলতার ওপর—একটা নিঃশব্দ নাগরিক হনন।

এইরকম এক হননের ঘটনা প্রেমের ক্ষেত্রেও হয় এবং সেখানে পূর্ব-সংকল্পিত কতগুলি শব্দ যেগুলি পুরাতন, পুরানো 'মিথ' ভেঙে 'ইমেজারি' তৈরি করে—'মিথ' সেখানে প্রেমের আবেশ তৈরি করে দেয় এবং যে-আবেশ ভেঙেও দেয় মিথ—Cyril connoly সেই কবিকল্পকে বলেছেন—the nostalgia for the past, the absent—that pale, interesting, invalid of emotions. কিন্তু সেই মিথ'কে ধরে যে 'ইমেজারি' তৈরি হয়, সেটা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মনকে একত্রে জাগিয়ে তোলে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা—

রাধিকা চাঁদের আবেশ ঝরিছে সবুজ কুঞ্জবনে
মুছে দিলে হায় পিঙ্গলিমায় অমোঘ বজ্রপাণি।
সুঠাম সুশ্রী মেদসুকোমল প্রিয়ারে বক্ষে ধরি
গলিতেছিলাম অর্থবিহীন সুমধুর কাকলিতে,
নাগরিকা মোর করুণ কোমল—মোদের লক্ষ্য করি
দধীচি-অস্থি হানিলে কঠোর কঠিন বজ্রপাণি।

রবীন্দ্রনাথ 'দূরে বহুদূরে/স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' যে প্রিয়াকে দেখতে পেয়েছেন, তিনি মূলত কালিদাসের কোনো প্রিয়া হবেন। যদি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কালিদাসের পূর্ণ অবতার ভেবে থাকেন—কবিরা আত্মচেতনায় এমন ভাবেন বই কী—আর রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবতেই পারেন, তাঁর লোকোত্তর যোগ্যতা কালিদাসের থেকেও শতগুণ বেশি, কিন্তু তেমন হলেও উজ্জয়িনীর কবিপ্রিয়াই কিন্তু কবিতার রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথের পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীনার নাম দিয়েছেন মালবিকা—তিনি কিন্তু কালিদাসী নায়িকা। স্বপ্নলোকে তাঁর সঙ্গে মিলন হয়েছে আধুনিক কবির কিন্তু মিলনের পর থেকেই কালিদাসের যক্ষপ্রিয়ার অনুষঙ্গগুলি রূপান্তরিত হয়ে যায় মালবিকার মধ্যে। কবি যখন স্বপ্নালোকে প্রিয়ার ভবনে পৌঁছেছেন, সেই সময়ে 'মহাকাল মন্দিরের মাঝে/ তখন গম্ভীর মন্ত্রে সন্ধ্যারতি বাজে।'

কিন্তু কবির সঙ্গে কবির কবিতার মতো এই পূর্বপ্রিয়ার যখন মিলন ঘটেছে, তখন 'রজনীর অন্ধকার/উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।' শুধু তাই নয়, শিপ্রানদীর তীরে সেই দিনে এমন যে ভয়ংকর বাতাস ছিল, কালিদাস তা জানতেন না, কিন্তু কবির নিভৃত মিলনে যে বাতাস উজ্জয়িনীর সমস্ত প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে, যে মেঘ তার আমন্দ্র গর্জনে মহাকালের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঢাক বাজাচ্ছিল, সে মন্দিরের সন্ধ্যারতিও থেমে গেল। এই যে কালিদাসের কাল নিয়ে আমার কবির খেলা, নিজেকে এক প্রান্তকালের মধ্যে অভিনিবিষ্ট করে নিজেকে কালোচিত মহিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা, এও কিন্তু এক স্বপ্নছবি—রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে 'ইমেজারি'-কে স্বপ্নছবি বলেছেন।

এই স্বপ্নছবি 'ইমেজারি' কখনও বিষাদসিন্ধুর মাঝখান থেকে উঠে আসে সহৃদয়ের মনে, কখনও বা সেটা nostalgic ecstacy ও বটে। সেই বিষাদের তীব্রতা কত তীব্র হতে পারে, যে আমরা যেন তা আঘ্রাণ করতে পারি Eliot-এর কবিতায়—

Smells of chestnuts in the streets
And female smells in shuttered rooms...

এখন কবিকল্পের কথা, যেখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাছে শব্দার্থের চরম একটা রহস্য ঘনিয়ে দেয় এমন একটা কবিকল্প আমাদের মুহ্যমান করে যেন; এবং ঠিক একই রকম মুহ্যমান হই যখন জগন্নাথ

কবি লেখেন ecstacy-তে সেই মেঘ-কাদম্বিনী আমার বুদ্ধিকে চুম্বন করুক—মদীয় মতিচুম্বিনী ভবতু কাপি কাদম্বিনী। এ কেমন কাদম্বিনী? কেমন মেঘ? শতেক বিদ্যুৎ যে মেঘটাকে সুন্দরীর গায়ের সোনা রঙের মতো জড়িয়ে রয়েছে, আর যে মেঘটা নাকি যমুনা নদীর তীরভূমির গাছগুলোতে আটকে থাকে, সেই মেঘ আমার বুদ্ধিকে ছুঁয়ে দিক একটু। জগন্নাথ কবি রসশাস্ত্রের গ্রন্থ লিখতে গিয়ে আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণে স্তুতি করার সময় মেঘের স্বরূপে কৃষ্ণকে যেভাবে এক স্বপ্নচ্ছবিতে পরিণত করলেন—এই কবিকল্প 'ইমেজারি'-কে স্বপ্নদার্শনিকতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। একই সঙ্গে বলব গোপী-সনাথ রামরসিক কৃষ্ণের মিথটাকে শুধু বিদ্যুৎ বিজড়িত মেঘের খেলার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে সেই চিরায়ত দূরস্থিত মিলন-মধুরতাকে জাগ্রত করে তোলা হল যেন।

আগেই অবশ্য বলেছি—সেই অবন্তীদেশে বাসবদত্তা-উদয়নের কথায় বলেছি যে, রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে পুরাতন দূরস্থিত শব্দ এক অদ্ভুত আমেজ তৈরি করে, যেটাকে nostalgia for the past বলেও বোঝানো চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখানে একটা অদ্ভুত বিশিষ্টতা আছে সেটা আধুনিক একটা situation-কে পুরাতন এক বিখ্যাত নগর-নগরীর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। সব সময় সেই নগর-নগরীর খ্যাতি যে প্রেম রোমাঞ্চের শিহরন আত্মসাৎ করে বসে আছে তা নয়, কিন্তু সুদূর অতীতের একটি রাজপুরুষের নাম, কিংবা স্থান-নামই সেখানে 'ইমেজারি'র মায়া এবং অভিমুখ তৈরি করে। জীবনানন্দের সুরঞ্জনা কোনো 'তারা ভরা রাতের বাতাসে/ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে কোথায়, কোন অবস্থায়, কোন্ পশ্চাৎপদক্ষেপে পথ হেঁটেছিল, সেটা বড়ো কথা নয়, কিন্তু ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের নাম শোনামাত্রেই তাঁর ঐতিহাসিক ধর্মযাত্রার সঙ্গে সুরঞ্জনার যোগাযোগ ঘটে যাওয়াটা আমাদের সকলকে এক বহ্বতীত স্মৃতি রোমাঞ্চের মধ্যে অবস্থিত করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, শিপ্রা। নামগুলির মধ্যে একটা শোভাসম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সমস্ত যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে। তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তিতে যেন জীর্ণতা ঘটিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি—সেই সব নদী-গিরি-নগরীর জীর্য্যমান ক্ষীয়মাণ অপভ্রংশের মধ্যে মহাকবি যখন নিজেকে কিংবা সুরঞ্জনাকে বসিয়ে দেন, সেই মুহূর্তেই কখনও বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ যেমন মায়াকল্প তৈরি করে, তেমনই উজ্জয়িনীর প্রত্নগর্ভ থেকে 'পূর্বজনমের' প্রিয়ার মুখখানিও চোখের সামনে ধূসরী মায়ায় জাগ্রত হয়। এই মায়াজগৎটাই কবিকল্পের পরম ধাম। কবি লিখেছেন—মনে হয়, এই রেবা, শিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে, অবন্তী, বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকত, তবে এখনকার চারিদিকের কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।

বস্তুত ইমেজারি এই পরিত্রাণটুকু তৈরি করে দেয়। এই পরিত্রাণ লাভ করা যায় শব্দার্থের অন্তর্গত মায়া-অন্বেষণের মধ্য দিয়ে। 'অরণ্যের অন্ধকার ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে'—এখানে অচেতনের চৈতন্য প্রামাণ্যে একটা সমাসোক্তি অলংকার হল—এটা একেবারেই গুরুত্বহীন। তার চেয়ে অনেক বেশি হৃদয়বাহী হল সেই সিচুয়েশন, সেই বিষণ্ণতা—'অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আমি ডুবে আছি একা'। একটা ঘুঘু ডাকা অপরাহ্ন বুঝতে গেলে সেই ঘুঘু-স্বরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মন্থরতা, আলস্য, নৈরাশ্য আর আনমনা ভাবটুকু যদি তেমন সংবেদনশীলতায় বুঝি, তবে কবির সেই স্বপ্নছবি অনুধাবন করা যায়—

অদূরে মাদার-শাখে ঘুঘু দেয় ডাক।
আমার মর্মের ছন্দপাখির ভাষায়
অফুরান নৈরাশায়
উছলিতে থাকে একতানে
আন-মননীর কানে কানে।
আতপ্ত হতেছে দিন, শিশির শুকায়ে গেছে ঘাসে,
অজানা ফুলের গুচ্ছ উচ্চ শাখে দুলিছে বাতাসে।
ঢালু তটে তরুচ্ছায়াতলে
ঝিলিমিলি শিহরন ঝরনার জলে।
চূর্ণ কেশে নিত্য চঞ্চলতা,
দুর্বাধ্য পড়িছে চোখে, অধ্যয়নরতা
সরায়ে দিতেছে বারংবার
বাহুক্ষেপে। ধৈর্য মোর রহিল না আর;
চকিতে সম্মুখে আসি শুধালাম,
"তুমি কি শোন নি মোর নাম।"
মুখে তার সে কি অসন্তোষ,
সে কি লজ্জা, সে কি রোষ,
সে কি সমুদ্ধত অহংকার।
উত্তর শোনার
অপেক্ষা না করি আমি দ্রুত গেনু চলি।
ঘুঘুর কাকলি
ঘন পল্লবের মাঝে আশ্বিনের রৌদ্র ও ছায়ারে
ব্যাথিত করিছে চির নিরুত্তর ব্যর্থতার ভারে।

আবার এই নৈরাশ্য, pale, invalid, absent বহু অতীতের এক জনপদ-ভ্রান্তি অথবা প্রথম—সভ্যতাবাহী এক ঐতিহাসিক জনপদও ফিরিয়ে দিতে পারে সুধীন দত্তের কবিতায় :

পুনর্মিলনের আশা সে কেবল প্রেমার্ত কল্পনা
সপ্তসিন্ধুপর পারে, অদর্শনে আমার বসতি;
দুর্বল বুভুক্ষু দেহ; প্রতিশ্রুতি দয়ার্দ্র বঞ্চনা
বসন্ত বার্ষিক পান্থ; ফাল্গুনী সুলভ হেথা সখী।

সকলের শেষ কথা 'ইমেজারি'র ব্যাপারে এই আকুতি, yearning-টা বড়ো বেশি জরুরি। সে এমনই এক তীব্র অনুভূতির জগৎ, যেখানে ব্যবহৃত শব্দখানি উচ্চারিত হয়েই অন্তরিত হয়, অথচ সেই শব্দ মন্দ মন্দ তার বিমূর্তি বিছিয়ে দেয় হৃদয়-আকাশজুড়ে, আমাদের জন্ম-জন্মান্তর থেকে সঞ্চিত বাসনালোক জেগে ওঠে সেই মায়াশব্দের দোলায়। রবীন্দ্রনাথ বুঝি সেই অস্পষ্ট শব্দের ব্যাপ্তিটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন এই কবিতায়—

যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে হয়ে-যাওয়া-গন্ধ,
কথা হারিয়ে-যাওয়া গান
তাপহারা স্মৃতি বিস্মৃতির ধূপছায়া
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটা পরা অভিমানিনী।

ঠিক এটাকেই 'ইমেজারি' বলে। আমি এতক্ষণ 'ইমেজারি'-র পর্যায় শব্দ বোঝাতে প্রতিমাকল্প, মায়াকল্প, কবিকল্প, প্রতিভাসকল্প ইত্যাদি যত অপশব্দ প্রয়োগ করেছি সেগুলি সব দূর করে দিয়ে আমার কবির এই শব্দখানি পরিচিত করে দিতে চাই—'ইমেজারি' মানে স্বপ্নছবি।

উপনিবেশের কলকাতা : চিঠিপত্রের বয়ানে নাগরিকতা-বিমুখ-রবীন্দ্রনাথ

ছন্দা রায়

''কলকাতা আমার জন্মস্থান কিন্তু আমার আবাস্য নয়।''[১] নব্য নাগরিক ভূমির বাসযোগ্যতাকে এমন রূঢ় ভাষাতেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন উপনিবেশ শহরের জাতক রবীন্দ্রনাথ। উদ্ধৃতিটি হেমন্তবালা দেবীর কন্যা বাসন্তী দেবীকে প্রেরিত একটি চিঠির অংশ। ১৯৩৯ সালে লেখা। চিঠির বক্তব্যটিকে কবির অন্তিম বয়সের আকস্মিক প্রতিক্রিয়া ভাবলে ভুল হবে। যৌবনপর্ব থেকেই পরিপার্শ্বের জটিল অভিঘাত কলকাতা সম্পর্কে কবির মনকে বিরূপ করে তুলেছিল। শহরের প্রসঙ্গমাত্রেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর অনীহা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল স্বজন, বন্ধু ও নানা অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মানুষের কাছে প্রেরিত পত্রাবলীতে।

যে-শহরের বুকে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য বেড়ে ওঠা, যেখানে তাঁর প্রতিভার প্রথম লালন, যার মাটিতে দাঁড়িয়ে নতুন কালের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা, সেই শহরের প্রতি কবির মমত্বই তো প্রত্যাশিত ছিল। কলকাতার নগরায়নের আদি বৃত্তান্ত খুঁজলে ভাগ্যান্বেষীদের নতুন বসতেই মিলবে তাঁর পূর্বপুরুষদের ঠিকানা। আধুনিক নাগরিক বাঙালি-সংস্কৃতির উজ্জ্বল দীপাধার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার তাঁর কুল-পরিচিতির গৌরবফলক। অথচ শিরায় শিরায় জড়ানো শহরটির সঙ্গে কবির শিকড়ের টান ক্রমেই যেন আলগা হয়ে গিয়েছিল। জমিদারি তদারকির সূত্রে গ্রামবাংলার সঙ্গে সংস্রব এবং সেখানে নিজের কর্মক্ষেত্র বিস্তারের পরেই ব্যবধানটা প্রকট হয়েছিল। চিঠিপত্রে কলকাতার কথা এলে কবির কলমে অপ্রেমের ভাষাই বেশি ফুটেছে।

আসলে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক অভিরুচির কথা মনে রাখলে কলকাতার সঙ্গে তাঁর আন্তর বন্ধন শিথিল হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ কবির স্বপ্নভুবনে ছিল নাগরিক জীবনের ভিন্ন এক ছবি। তাঁর অতীতচারী কল্পনা কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর ভাবভূমিতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় যে-সৌন্দর্যলোক আবিষ্কার করেছিল, সেখানে মেঘের যাত্রাপথে দৃশ্যমান পল্লীশ্রীর পাশে নগরের রূপও বড় রমণীয়। নগর নয়, অঙ্গনা নামের অনুষঙ্গে তারা নগরী। অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী! সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী আবার গরিমামণ্ডিত রাজধানী। কিন্তু তার কর্মব্যস্ত জনারণ্যে প্রবহমান জীবন মন্দাক্রান্তা ছন্দ হারায় নি। সেই জীবনের আবেশে মগ্নমদির কবি ঘ্রাণের মধ্যে পেয়েছেন হর্ম্যবাসিনী পুরাঙ্গনাদের চর্চিত কেশের সৌরভ। অনুভব করেছেন নৈশ নগরীর সুসুপ্তি। নির্জন অন্ধকারে দেখেছেন কম্প্রবক্ষ অভিসারিণীর পথ চলা। স্বপ্নোত্তর জাগ্রত চৈতন্যের আকস্মিক রূঢ়তায় কবির মনোগহনে জেগেছে ব্যাকুল আর্তি, সেদিনের সেই প্রশান্ত লোকে ''প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।''[২]

অবাঞ্ছিত আবহই রোমান্টিক মনে জাগিয়েছে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পবাসনার সেকালের বিপরীতে বাস্তব দৃষ্টিগ্রাহ্য যে-একালকে দাঁড় করিয়েছেন, একটু বিশেষিত পরিসরে

দেখলে তার ‘ইতর কলকাকলি’তে তদানীন্তন ঔপনিবেশিক রাজধানী-শহর কলকাতার কথা মনে পড়া বোধহয় অস্বাভাবিক নয়। নিছক আনুপ্রাসিক মিলকে আমরা অনুমানের ভিত্তি করিনি। কবির ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশকাল (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১২৯৮) মনে রেখে বছরখানেক আগে লেখা (২২ আগস্ট ১৮৯০) তাঁর দ্বিতীয়বার য়ুরোপ যাত্রালগ্নের ডায়ারির সূচনাংশ লক্ষ করলে কবির কলকাতা বন্দর ছাড়ার অভিজ্ঞতাসূত্রে কালিদাসের কাব্যপ্রসঙ্গ দৃষ্টি এড়ায় না। কবির জাহাজ এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের অভিমুখে। দূরে সরে যাওয়া তটরেখার দিকে তাকিয়ে চিত্তে ঘনীভূত হচ্ছে স্বদেশের সঙ্গে বিচ্ছেদের ছায়া। কিন্তু সময়ের ধর্মেই তা প্রিয়বিরহবিধূর যক্ষের বেদনার সঙ্গে সমানুভূতিতে মিলতে পারছে না। কবি লিখছেন : ‘‘কালিদাসের সময় যখন রেলগাড়ি ইস্টিমার পোস্ট আপিস ছিল না, তখনই খাঁটি বিরহ ছিল; কিন্তু স্তূপাকার তুলো যেমন করে কলে চেপে একটি পরিমিত গাঁটে পরিণত হয়, সভ্যতার চাপে আমাদের সমস্তই তেমনি সংক্ষিপ্ত নিবিড় হয়ে আসছে।’’[৩]

বোঝা যায়, কবির চেতনায় অবিরাম ঘোরাফেরা করছে সেকাল আর একালের বিভেদবোধ। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার ইতিবাচক সমৃদ্ধির সমর্থক হলেও রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রদানবের আগ্রাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কলকাতা বন্দরের হতশ্রী নদীতট তাঁর নান্দনিক দৃষ্টিকে আহত করেছিল। ‘মেঘদূত’ কাব্যের নবভাষ্য রচনায় সেই যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছিল সৌন্দর্যস্বর্গচ্যুত কালিমাপীড়িত কালের বিলাপে। বিস্ময়করভাবে আমরা এর বিপরীত স্বর শুনি কবি বিহারীলালের ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যের ৫ম সর্গে। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সন্ধানে নিসর্গপরিক্রমাকারী কবি অকস্মাৎ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে এসে প্রীতকণ্ঠে বলছেন : ‘‘তোমারি পুলিনে হাসে/সুদূর সে কলিকাতা আনন্দনগরী।’’[৪] হয়তো চকিত সন্দর্শন বলেই বিহারীলালের দৃষ্টি বাস্তবের দ্বারা ক্লিন্ন হয়নি। রবীন্দ্রকল্পনায় এমন তৃপ্তির অবকাশ ঘটেনি। উজ্জয়িনী যদি তাঁর চোখে স্বপ্ন এনে থাকে, কলকাতা তাঁকে দিয়েছে দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা উপশমের পথ ছিল না, যেহেতু ভারতবর্ষীয় অমল অতীতের সঙ্গে ঔপনিবেশিক বর্তমানের সেতুবন্ধন অসাধ্য ছিল।

শৃঙ্খলিত বর্তমানের মধ্যে কলকাতাকে কীভাবে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আমরা দেখব তাঁর চিঠিপত্রের বয়ানে। অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়েছিল, উপনিবেশ শহরটির কোনো নিখাদ চরিত্র তৈরি হয়নি। না আছে তার দেশীয় ঐতিহ্যসমৃদ্ধ নগরীর উত্তরাধিকার, না তার পূর্ণতা এসেছে প্রতীচ্য আধুনিকতার সৌভাগ্যের দানে। দেশের বাইরে পা বাড়ালে দ্বিতীয় সংকটটি কবির কাছে আরও প্রবলভাবে প্রতিভাত হত। পত্র মারফত তাঁর কিছু ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপ ভ্রমণকালে সেখানকার রাজধানী বাটাভিয়ায় পৌঁছে শুরুতে কবির মনে হয়েছিল, একালে পৃথিবীর কোনো শহরেরই নিজস্ব দৈশিক সত্তা নেই। সকলেরই আড়াল করা মুখের উপর একই ধাঁচের মুখোশ আঁটা। কিন্তু এই সরল সমীকরণ কলকাতার ক্ষেত্রে খাটেনি। তুলনামূলক সমীক্ষণের কথা তিনি জানাচ্ছেন বোদ্ধা পুত্রবধূকে : ‘‘কলকাতা আর বাটাভিয়া উভয়েই এক আধুনিক কালের কন্যা। কেবল জামাতারা স্বতন্ত্র, তাই আদরযত্নে অনেক তফাত। শ্রীমতী বাটাভিয়ার সীঁথি থেকে চরণচক্র পর্যন্ত গয়নার অভাব নেই। তার উপরে সাবান দিয়ে গা মাজা ও অঙ্গলেপ দিয়ে ঔজ্জ্বল্য সাধন চলছেই। কলকাতার হাতে নোয়া আছে কিন্তু বাজুবন্দ দেখি নে। তারপরে যে জলে তার স্নান, সে জলও যেমন, আর যে গামছায় গা মোছা, তারও সেই দশা।’’[৫] দুই জামাতা বলতে কবি বোঝাচ্ছেন তদনীন্তন দুই উপনিবেশপ্রভু ওলন্দাজ আর ইংরেজকে। ইংরেজের কর্তৃত্বে কলকাতা

সুখে ছিল না। হাতের নোয়ায় তার গোত্রান্তরের চিহ্ন। কিন্তু সৌখিন আভরণহীন অঙ্গে অনাদরের লাঞ্ছনা বহন করে নতুন কালের কোনো বিলাসগর্বিত নগরীর পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা ছিল না তার। শহরের সেই দীন মূর্তির কথা বলতে গিয়ে কবি ভুলতে পারেননি উত্তর কলকাতায় নিজের বসতি-অঞ্চলটিকে : ‘‘আমরা চিৎপুর বিভাগের পুরবাসী বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এসেছি।’’[৬] শুক্লপক্ষের উদ্ভাস অবশ্য পেয়েছিল কলকাতার সাহেবটোলা। তাতে দেশি টোলার অন্ধকার ঘোচেনি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই টানা কয়েক দশক ধরে দেশীয় পত্রপত্রিকার পাতায় শহরের বিভিন্ন এলাকার, বিশেষত উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের দুরবস্থা নিয়ে কম অভিযোগ ওঠেনি, ব্যঙ্গে ভরে উঠেছে নকশার পাতা। কিন্তু কবির উল্লিখিত পত্রের লিখনকাল (১৯২৭) প্রমাণ দেয়, কোম্পানি আমল পেরিয়ে পার্লামেন্টারি ব্রিটিশ শাসনের প্রায় সত্তর বছর কেটে যাওয়ার পরেও গোড়াপত্তন থেকে অপরিকল্পিত কলকাতা তখনও প্রাপ্তবয়স্কের অঙ্গশোভায় বঞ্চিত।

অথচ কর্মসংস্থান ও বিদেশি পণ্যের প্রলোভনে আপাত স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় মানুষের ভিড় জমেছিল কলকাতায়। বণিকের কূটনীতিতে দেশীয় সামন্তমূল কৃষিব্যবস্থায় ধ্বস নামায় নগরমুখী প্রবণতা ক্রমেই বেড়েছিল। অথচ সেই নগরের কাছে কতটুকু আমাদের প্রাপ্তি? প্রাবন্ধিক সমীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত জানিয়েছেন তাঁর ক্ষোভ, শহরে ‘‘মানুষ নিজের আবশ্যককে চায়, পরস্পরকে চায় না।’’[৭] যে-সামাজিকতা লোকালয়ের প্রাণ, তা শহরে জমাট বাঁধে না। বরং শহর আর গ্রামের মধ্যে তৈরি হয় অলঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ : ‘‘অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ সেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে।’’[৮] য়ুরোপ থেকে আসা এই ‘রিপুবাহিনী ভেদশক্তি’র দুর্মতি কবির কাছে ধরা পড়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, মাতৃভূমির যথার্থ সংজ্ঞা গ্রামে লাভ করা যায়, শহরে নয়। গ্রামেই লক্ষ্মী আসন পাতেন। শহর হল কুবেরের যক্ষপুরী। বস্তুত ‘‘বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূরবিস্তৃত।’’[৯] এই বোধের ফলে কলকাতার সঙ্গে কবি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারেননি। উপনিবেশিত চেতনায় কবি পরত্ব আর আত্মত্বের তাৎপর্য পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন নগর আর না-নগরের বিরোধী যুগ্মকে।

প্রবন্ধের দীর্ঘ পরিসরে কবির চিন্তা ও যুক্তির যে পারম্পর্য তৈরি হয়েছিল, চিঠির আকস্মিক বা কোনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তার অবকাশ মেলেনি। অথচ বিশেষভাবে কলকাতার কথা বলার জন্যই কলম না ধরলেও প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে কবির নগরবিমুখতা চিঠির প্রাপকদের কাছে গোপন থাকেনি। বস্তুত গোপন রাখার চেষ্টাও কবি করেননি। পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার পর গ্রামে দীর্ঘ বসবাসের কালে নাগরিক বিলাস বঞ্চিত হয়ে কবির ক্ষোভ ছিল না। প্রকৃতির সান্নিধ্য নিজে উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জনদের তিনি বারবার আহ্বান জানিয়েছেন সেই মুক্ত পরিবেশে। কবির চিঠিপত্রে তার সাক্ষ্য সুলভ। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ পরিবারে ব্যয়বাহুল্য নিয়ে তর্কবিতর্ক ও অবনিবনা বাড়তে থাকলে কবি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের শিলাইদহে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। মৃণালিনী দেবীকে তিনি লেখেন : ‘‘সেইজন্যই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি...।’’[১০] (শিলাইদহ, ১৮৯৮) কলকাতার পরিবেশে লাভক্ষতি, আত্মপরকে ভোলার যো নেই। তাই কবির

নিজের মতো নির্জনবিলাস সকলের ধাতে সইবে না জেনেও এ বিষয়ে তাঁর সমঝোতা না করার মনোভাবই ব্যক্ত হচ্ছে পরবর্তী চিঠিতে : ‘‘কলকাতার জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মতো শূন্যস্থানের মধ্যে এসে প্রথম কিছুদিন নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে না...। কিন্তু কি করি বল, কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে। .... কাজেই তোমাদের এই নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করতেই হবে।’’[১১] (শিলাইদহ, ১৯০১)

রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর মন প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন আবহাওয়ায় বরাবরই অসহায় বোধ করত। বাল্য ও কৈশোরে ঠাকুরবাড়িতে যে সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা ও অভিভাবকীয় পৃষ্ঠপোষকতা তিনি পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তার সবটাই দুর্লভ হয়েছে। স্বজন, পোষ্য আর আশ্রিতের ভিড়ে অশান্ত হয়েছে গৃহপরিবেশ। কলকাতায় নিয়মিত বাস কবির পক্ষে তখন অসহনীয়। এক সময় পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন— ‘‘মোটের উপর জোড়াসাঁকোয় আমি মনের মধ্যে বড়ই একটা অস্বাস্থ্য অনুভব করি...।’’[১২] (শিলাইদহ, ১৯১৬) মনকে গ্লানিমুক্ত করার মতো প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতার অবকাশটুকুও তখন জোড়াসাঁকোয় ছিল না। বিকর্ষণ এতই প্রবল হয়েছিল কবির যে পরবর্তীকালে তিনি অনায়াসে পুত্রকে লিখতে পেরেছিলেন : ‘‘আমাদের কলকাতার বাড়ি বিক্রী করা যদি সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য না হয় তাহলে বেচে ফেলতে দোষ কি?’’[১৩] (ফিলাডেলফিয়া, ১৯৩০) গূঢ়তর পারিবারিক সংকটের কথা উহ্য রেখেও বলা যায়, উপনিবেশ শহর তার রূঢ় কাঠিন্যে কবির মন থেকে ভিটেমাটির টানটাও যেন নির্মূল করে দিয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় আবাসভূমি পল্লীর সঙ্গে হৃদয় জুড়ে যাওয়ার পর কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কের ফাটলটা আর জোড়া লাগেনি।

ঊষর নাগরিকতায় নির্জীব মনকে গ্রামীণ সজীবতার আতিথ্য দিতে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের অভাব ছিল না। উদ্দিষ্ট পক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের রকম অনুসারে চিঠিতে আহ্বানের ভঙ্গি শুধু বদলেছিল। শিলাইদহের প্রকৃতি-সৌন্দর্যে আত্মতৃপ্ত কবি বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে সম্ভোগের অংশীদার না করতে পেরে অনুযোগ জানাচ্ছেন : ‘‘কলকাতায় তোমরা গরমে হাঁসফাঁস করেছিলে আমরা তখন নবধান্যাঙ্কুর শ্যামল উন্মুক্ত মাঠের উদার বাতাসে উত্তরীয় হিল্লোলিত করে পল্লিপথে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিলুম। তোমারও সে সুখ ভোগে কোনো বাধা ছিল না—আমন্ত্রণও ছিল—নিজ দোষে কষ্ট পাচ্ছ...।’’[১৪] (শিলাইদহ, ১৯০০) পুত্রের উদ্দেশে পিতা রবীন্দ্রনাথের আহ্বান সস্নেহ উপদেশের : ‘‘একবার তোরা এখানে এলে ভাল করতিস্। কলকাতার মধ্যে নিয়ত ডুব মেরে থাকা ত স্বাস্থ্যকর নয়।’’[১৫] (শিলাইদহ, ১৯১৬) পুরোদস্তুর নাগরিক প্রথম চৌধুরীকেও কবি সম-সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন হিতৈষণার বোধ থেকেই : ‘‘তোমরা দীর্ঘকাল কলকাতার আবেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে আছ এইজন্যেই বদ্ধ হাওয়ার বিষে তোমাদের মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে।’’[১৬] (শান্তিনিকেতন, ১৩৪২) লক্ষ করার বিষয় হল, চিঠির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা ভিন্ন, বার্তা পাঠাবার সময় ভিন্ন, কিন্তু কলকাতার পরিবেশ সম্পর্কে কবির প্রতিপাদ্য অভিন্ন।

অথচ এমন বিরূপতার হদিশ মেলে না রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের ভাবনায়। তার একটি প্রধান কারণ কলকাতার বুক থেকে পাড়াগাঁয়ের ছায়াটা তখনও সরে যায়নি। ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণেই প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য পাতাবার সুযোগ পেয়েছিলেন কবি। শাণবাঁধানো পুকুর, তটবর্তী চীনে বট, পাঁচিলের ধারে নারকেল গাছের সারি, তাতেই মজেছিল জন্ম-রোমান্টিকের মন। গাছের ফাঁকে চোখে পড়ত সিঙ্গিরবাগান পল্লীর জলাশয়। ‘পল্লী’ শব্দটা কলকাতার নানা অঞ্চলের মধ্যে প্রাক্-ইতিহাসের চিহ্ন রেখেছিল। ইটকাঠের ইমারতি শহরের বুকেও বালকের ভাবুক কল্পনায় উঁচু উঁচু দালানের ছাদগুলো

তরুচূড়ার সঙ্গে মিশে দিগন্ত-নীলিমায় উধাও হয়ে যেত। সদর স্ট্রীটের প্রান্তে ফ্রি-স্কুলের বাগানের বৃক্ষান্তরাল থেকে দেখা নবোদিত সূর্যের আলোতেই তো কবিকিশোরের গুহাহিত প্রাণের ঘুম ভেঙেছিল।

আসলে কবির অভিজ্ঞতার পরিধি তখন সীমাবদ্ধ। জলাজঙ্গলময় গ্রাম থেকে গড়ে ওঠা কলকাতার নগরায়নের মন্থর গতি নিয়ে অনুযোগ করার মতো বিবেচনাবুদ্ধি তৈরি হয়নি। কাঁচা বয়সের বিস্ময় আর কৌতূহলে ধরা কলকাতাকে কবি পরম যত্নে তুলে এনেছিলেন প্রৌঢ় কলমের স্মৃতিকথায়। ছেলেবেলার সেই শহরে চিৎপুরের রাস্তায় ডুগডুগি বাজত, ভরদুপুরে শোনা যেত ফেরিওয়ালার হাঁক। পথের ধুলো উড়িয়ে ছুটে যেত শ্যাকড়া গাড়ি। বাবুরা আপিস যেত পালকি বা ভাগের গাড়িতে। মেয়েদের যাতায়াত অবশ্য ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরা অন্ধকারে। দিনের আলো নিভে গেলেই কর্মব্যস্ত শহর নীরব। মাঝে মাঝে শোনা যেত সৌখিন বাবুদের হাওয়া খাইয়ে ফেরা সহিসদের হাঁক। সেকালে না ছিল ট্রাম-বাস, না মোটরগাড়ি, না বিজলি বাতি, না কলের জল। আধুনিক শহুরেপনার এই ঘাটতি নিয়ে কবির বিশেষ আক্ষেপ ছিল না।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলেও কবি দেখেছিলেন মেয়েদের পাড়াগেঁয়ে মেজাজের গল্পের আসর। বাইরের মহলে দূর থেকে চোখে পড়ত আলোর রোশনাই, অতিথিদের নিয়ে জমজমাট জলসাঘর। গৃহপ্রাঙ্গণে যাত্রার আসরের অভিজ্ঞতাও হয়েছিল কবির। সে যাত্রার সাজসরঞ্জাম থেকে শুরু করে কথা-কাহিনি-সুর-অভিনয় সবই 'বাংলাদেশের মাঠঘাটের পয়দা করা'। পুরনো সামন্তকালটা তখনও শহরের শরীর আঁকড়ে পড়ে ছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক এই ধাঁচটাই পরিণত বয়সী কবির স্মৃতিকে আরাম দিয়েছিল।

অবশ্য কৈশোর পেরোবার আগেই ঘরে বাইরে কলকাতার নাগরিক জীবনের পরিবর্তনের লক্ষণগুলিকে কবি চিনতে শিখেছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে আমোদের মজলিশি আসরের বদলে শুরু হয়েছিল মঞ্চনাটকের পালা। পরিশীলিত পারিবারিক আবহে গড়ে উঠেছিল বিদ্বজ্জনসভা। জাগছিল স্বাদেশিকতার উন্মাদনা। অন্তঃপুরেও অবরোধ ভাঙছিল। মেয়েদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ এসেছিল। সহধর্মিণীরা কেউ কেউ প্রকাশ্যে স্বামীদের সহচারিণী হয়েছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ বেড়েছিল। এগুলি প্রগতির লক্ষণ তো বটেই।

কিন্তু নিজের চেনা গণ্ডির মধ্যে অগ্রসরমান শহরের প্রতিবন্ধী রূপটিও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সামলাতে বসতি বিস্তারের প্রয়োজনে নির্মূল হয়েছিল বৃক্ষ। ভরাট হয়েছিল পুকুর। ঠাকুরবাড়ির গৃহসংস্কার ও সম্প্রসারণেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরদেশি সরকারের ঔদাসীন্য এবং দেশীয়দের সচেতনতার অভাবে নির্বাসিত প্রকৃতির পুনর্বাসনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ছিল। ছেলেবেলার স্মরণসুখের কালকে পিছনে ফেলে প্রাপ্তবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ নতুন কালের কলকাতায় নতুন করে মোহিত হওয়ার মতো শহুরে পরিবেশ পাননি। বরং অভিজ্ঞতা যত পরিণত হল, পরবিলসিততনু নগরের কৃত্রিম জৌলুস কবিকে উত্তরোত্তর বীতশ্রদ্ধ করল। গ্রামের রক্ত শোষণ করার বণিকবৃত্তি প্রতিহত করা কঠিন জেনেও নিজের আয়ত্তগম্য পরিসরে তিনি দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পল্লীর স্বাস্থ্যোদ্ধারে ব্রতী হলেন। পল্লীসংসর্গে নিজেও পেলেন প্রাণের নিরাময়। শহরমুখো হওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেল। সেই অনীহাই বারবার ধরা পড়েছে তাঁর পত্রোক্তিতে।

পশ্চিম থেকে আমদানি করা সভ্যতার পালিশে কলকাতা কেমন ঠেকেছিল কবির চোখে? ভাইঝি ইন্দিরাকে নিজের ভাবনার ভাগ দিচ্ছেন কবি : ''কলকাতাটা বড়ো ভদ্র এবং বড়ো ভারী,

গবর্মেন্টের আপিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে আসছে।"[১৭] বাণিজ্যশহরে আবশ্যিকের ভার-ঠেলা বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের পক্ষে নিজেকে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব। অথচ 'নিত্যনিয়মিত দম-দেওয়া' এই কলের কলকাতার সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদেই সম্বন্ধ ছিন্ন করা কঠিন ছিল। নেশা যাঁর আশমানদারি তাঁকেও জড়াতে হত পারিবারিক বিষয় সম্পত্তির কাজে। বন্ধুবর প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠি[১৮] থেকে জানা যায়, আর্থিক অনটন মেটাতে কুষ্টিয়ায় নদীর ধারে গোলাপের খেত করে কলকাতার বাজারে ফুল সরবরাহ করার মতো ছোটখাট ব্যবসায়িক পরিকল্পনাও তাঁকে মাথায় আনতে হয়েছে, যদিও পরিস্থিতি তলিয়ে বুঝে নিজেই তিনি নিবৃত্ত হন। বয়স যত বেড়েছে, চিকিৎসকদের কাছে পরামর্শ ও ব্যাধির দাওয়াই নিতে কবিকে বারবার আসতে হত তাঁর অপছন্দের শহরে। কবির পরম সুহৃদ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা চিঠিগুলি[১৯] সাক্ষ্য দেয়, গ্রামের নিঃসম্বল মানুষদের দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের জন্য তাঁর কাছে কবি সুপারিশ করে পাঠাতেন। পিছিয়ে পড়া গ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে বলে এগিয়ে চলা শহরকে উপেক্ষা করার মূঢ়তা কবির ছিল না।

দেশবিদেশ ভ্রমণ উপলক্ষে জলপথে অথবা স্থলপথে যাতায়াতকালে কলকাতার মাটি কবিকে ছুঁতেই হত। বন্দর কলকাতার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে কবির হতাশার কথা আমরা আগেই বলেছি। হাওড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রান্তিক রেলস্টেশনের ছবিও কবির সুখস্মৃতি বহন করেনি। আদরিণী রাণুকে লেখা চিঠিতে তাঁর একটি বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতার ধারাবিবরণী মনে রাখবার মতো। সে সময় হাওড়া থেকে গঙ্গা পার হওয়ার অবলম্বন ছিল পন্টুন ব্রিজ। জোয়ারের সময় জাহাজের পথ করার জন্য তা খুলে দেওয়া হত। একদিন শান্তিনিকেতন থেকে রাত এগারোটায় হাওড়ায় এসে কবি দেখলেন, ব্রিজটি তোলা। অগত্যা ডিঙি নৌকোই ভরসা। মাঝি তাঁকে আড়কোলা করে নৌকোর কাছে পৌঁছবার আগেই কবিকে শুদ্ধ আছাড় খেয়ে পড়ল কাদার মধ্যে। তারপর জলে মাটিতে লুটোপুটি। কবি অবশ্য গোটা ঘটনাটাই কৌতুকের মোড়কে পরিবেশন করলেন। বোঝাতে চাইলেন, দুর্বিপাকটা তাঁরই কৃতকর্মের ফল : ''গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথরাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছন গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছা করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্মজননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন।"[২০] (কলকাতা, ১৯১৯) কবির পরিহাসের আপাত নিরীহ স্বর কিন্তু আসলে যাত্রীসাধারণের সুখসুবিধা সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অবহেলার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিবিধানের উপায় না পেয়ে পরিস্থিতির সামনে ভুক্তভোগীদের অসহায়ভাবে হার মানতে হত। অধীনস্থের নাগরিকতা এমনই ন্যুব্জ ছিল।

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মধ্যে পাওয়া খণ্ডিত এক আধুনিকতা। তবু তাকেই আত্মস্থ করে নব্য বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটেছিল যে-কলকাতায়, তার সঙ্গে কবির সংযোগ প্রায়শ বাধ্যতামূলক বলেই পীড়াদায়ক ছিল। শান্তিনিকেতনে গড়ে তোলা নাটকের দল, গানের দল নিয়ে কবি হাজির হতেন শহরে—কখনও ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থাবিশেষের অনুরোধে, কখনও নিজের আরব্ধ কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থসংগ্রহের গরজে। ব্যাপারটা যে দাঁড়াত দায়ে পড়ে দারগ্রহের মতো, তা নিয়ে কবির বিক্ষোভ গোপন থাকত না প্রাসঙ্গিক সংবাদবাহী চিঠিতে। আর সেখানেও কলকাতা দাঁড়াত অপরাধীর কাঠগড়ায়। কবির অধৈর্য স্বরের নমুনা দিই জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি থেকে : ''সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীত সমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া

এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি।”[২১] (কলকাতা, ১৯০০) কলকাতায় পেশাদারি নাটকের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে প্রেক্ষাগৃহ অকুলান হলে কিছুটা রাগত স্বরেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে কবি চিঠিতে[২২] জানিয়ে দেন, বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে তিনি ভাঙা শরীরেও শহরে আসতে প্রস্তুত, যদি উদ্যোক্তারা স্টেজের ব্যবস্থা ও দর্শক সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাইরের সংকটের চেয়েও বড় ছিল কবির ভিতরের সংকট। শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত ঋতু-উৎসবের আদলে রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতেও কয়েকবার বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু নিসর্গবিচ্ছিন্ন নাগরিক মন শ্যামলসুন্দরের অভ্যর্থনায় কতটা আন্তরিক, তা নিয়ে কবির সংশয় ঘোচেনি। রামমোহন লাইব্রেরি হলে নির্ধারিত উৎসবের প্রস্তুতি-পর্বে কবি রাণুকে লিখছেন তাঁর অস্বস্তির কথা : “যে গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি হয়েছে সে গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে?”[২৩] (কলকাতা, ১৯২২) হাট মানে রসোপভোগের ক্ষেত্র নয়, বিকিকিনির আসর। ব্যবসায়িক বুদ্ধির আগ্রাসনে শোষিত-হৃদয় শহর কলকাতার কাছে কবি যথার্থ সহমর্মিতা প্রত্যাশা করতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে কলকাতাবাস অসহনীয় হয়ে ওঠার একটি বড় কারণ খ্যাতির বিড়ম্বনা। তাঁর অর্জিত প্রতিষ্ঠা বারবার তাঁর নিভৃতলোকের বেড়া ভেঙেছিল। যত্রতত্র সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব করার বা বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বান, সম্বর্ধনা দেওয়ার ধূম,—এর কোনোটাই কবির কাছে প্রীতি-উৎপাদক ছিল না। অথচ উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হত। উষ্মা বিকিরণের জন্য সমব্যথীদের কাছে লেখা চিঠিই ছিল তাঁর সহায়। কবির অসহিষ্ণু অভিব্যক্তির দু একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। চৈতন্য লাইব্রেরিতে প্রদত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন জনতাবিড়ম্বিত কবি : “সম্পাদকের অবিশ্রাম উত্তেজনায় এই অসমসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, নইলে পাব্লিকের কাছে ঘেঁষতে আমার আর বড় ইচ্ছা করে না।”[২৪] (কর্মাটার, ১৮৯৩) এই মানুষটিই কিন্তু গ্রামের সাধারণ অধিবাসীদের সঙ্গ পরমানন্দে উপভোগ করতেন। তাঁর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানে তিনি পেয়েছিলেন আত্মীয়তার আনন্দ। অন্যদিকে একই উপলক্ষে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সভার সদস্যদের দলীয় সংঘাতের আঁচ পেয়ে কবির অস্বস্তির অন্ত ছিল না। দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠির একটি ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ পংক্তি তাঁর যন্ত্রণা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট : “বলি হবে অথচ পাঁঠা নেই এরকমটা কেউ পছন্দ করে না।”[২৫] (পাতিসর, ১৯১১) ছিয়াত্তর ছুঁই-ছুঁই বার্ধক্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রসম্ভাষণের ডাক পেয়ে কবি বুঝেছিলেন, আমন্ত্রকদের পক্ষ থেকে তাঁকে ব্যবহার করার তাগিদটাই বেশি। হেমন্তবালা দেবীকে কথাটা জানাতে গিয়ে কবির আহত কণ্ঠ অভিমানে ভেঙে পড়েছে : “আমার নামটাকে নিয়ে সবাই আপন আপন ঢাক বানাতে চায়, কাঠি পড়ে আমার পৃষ্ঠে।”[২৬] (শ্রীনিকেতন, ১৯৩৭) কবির প্রতিটি অভিব্যক্তির পিছনে বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংযোগ থাকলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া কলকাতার নিষ্করুণ হুজুকে নাগরিক সমাজের বিরুদ্ধে।

খ্যাতির শিখরাসীন কবির পক্ষে কলকাতায় স্বগৃহও নিরাপদ ছিল না। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অহরহ দর্শনার্থীদের ভিড়ে কবির প্রাণের গানের আলাপ আপনিই বন্ধ হয়ে যেত। ব্যর্থ প্রহর যাপনের সেই দিনলিপি পৌঁছেছে রাণুর কাছে : “নীচের ঘরে বিস্তর লোক এসে জমেচে—তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আমাকে কাজ করতে না দেওয়া এবং কুঁড়েমি করতেও না দেওয়া।”[২৭] (কলকাতা, ১৯১৭) চিঠির পাতায় কবির ভদ্র মোলায়েম কথাগুলো আদতে কত নিষ্ঠুর সত্য, তার সমর্থন

মেলে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণীতে : ‘‘রবীন্দ্রনাথের বিনয় ও ধৈর্য অসাধারণ। কলকাতায় এলে তাঁর কাছে দর্শকের আনাগোনার আর অন্ত থাকে না। সকাল সাতটা থেকে আসতে আরম্ভ করে, আর রাত নটা দশটা পর্যন্ত আসতে থাকে। কবির যে বিশ্রাম করার অবকাশ পাওয়ার দরকার, তাঁর যে স্নানাহার আবশ্যক, এ সম্বন্ধে কারুরই হুঁশ থাকে না।’’[২৮] সামনাসামনি অভব্যতা দেখাতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে উঠতেন। আর তখনই স্মৃতিকে নাড়া দিত বালকবেলার নির্জন মধ্যাহ্নগুলো। শহুরে জন্মনিকেতনের সেকাল নিয়ে কবির বিন্দুমাত্র আক্ষেপ ছিল না। উত্তরকালে জনতাবর্তে ক্লান্ত কবি তাঁর সঙ্গোপন অভিলাষ জানান অমিয় চক্রবর্তীকে : ‘‘আবার একবার আমার সেদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ফিরে গিয়ে কল্পলোকের রহস্যনিকেতনে তেমনি করে পথ হারিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে।’’[২৯] (কলকাতা, ১৯২৩)

কল্পচারণের জন্য শুধুই পুরনো সেই দিন কেন, উত্তরজীবনেও শহর কলকাতা কবির সব পথ রুদ্ধ রিক্ত করে দেয়নি। আতিথ্যের কিছু রমণীর আশ্রয় ছিল জোড়াসাঁকোর সীমানার বাইরে। শহরের প্রান্তভাগে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাগানবাড়ি আর শহরের হৃৎপিণ্ডের উপর চৌরঙ্গী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল চন্দ্র দে’র মিউজিয়াম সংলগ্ন গৃহ, দুটিতেই প্রকৃতির আঁচল বিছানো ছিল। কংক্রিটের শহরে তা দুর্লভ প্রাপ্তি বইকি। সেখানে যতবার কবি এসেছেন, মন ভরে গেছে। তাঁর উপাদেয় আস্বাদনের শরিক করেছেন হেমন্তবালা দেবীকে। মুকুলচন্দ্রের গৃহবাসী কবির কলমে তৃপ্ত বর্ণনা : ‘‘এ জায়গাটি খুব সুন্দর, একটি বড়ো পুকুর, বড়ো বড়ো গাছ, চাঁপাফুলের গন্ধ, আর নিরন্তর পাখির ডাকে কলকাতার সমস্ত অপরাধ চাপা দিয়ে রেখেছে। শহরের পাথুরে রাস্তা বেয়ে এইখানে এসে বসন্ত ঋতু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, আমিও ঋতুরাজের সহচর।’’[৩০] (কলকাতা, ১৯৩২) প্রশান্তচন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণের দৃশ্যরূপেও সমভাবেই মুগ্ধ এবং মুখরপ্রাণ কবি লিখছেন : ‘‘আমার শান্তিনিকেতনের নীড় ছেড়ে চলে এসেচি রাজধানী পাড়ায়। শরৎ শ্রী সেখানে দেখা দিয়েছে তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে। বরানগরের যে কোণে আশ্রয় নিয়েছি এখানেও বিশ্বপ্রকৃতির আতিথ্য পাওয়া যায়। চোখ মেলে দেখতে পাই বাংলা পল্লীশ্রীকে। জানলা থেকে সামনে দেখা যায় পুকুরের একটা প্রান্ত কলমি শাকে ঢাকা, আম কাঁঠাল জামরুল বাতাবিলেবুর ঘনসন্নিবিষ্ট গাছে গাছে আকাশকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রেখেছে।’’[৩১] (বরানগর, ১৯৩৪)

এ কলকাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবতই কোনো বিরোধ ঘটেনি। এখানে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আবহমান বাংলার চেনা মুখ। কিন্তু গোটা শহরের মানচিত্রে নিসর্গের এমন লীলাক্ষেত্র কতটুকু অবশিষ্ট ছিল? সবই তো বিকিয়ে গিয়েছিল বাণিজ্যের দরে। তাই কবি পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন কলুষের রূঢ়তা থেকে। তবে কলকাতার বুকে বিরল কিছু স্থানের মতো বিরল কিছু রমণীয় মুহূর্তকেও কবি গেঁথে রেখেছেন তাঁর চিঠির পাতায়। সৃষ্টির চেতনায় স্পন্দিত হলে অন্তত সাময়িক কালের জন্য তিনি ভুলতে পারতেন শহরের অপরাধী মুখ। তখন ক্লৈব্যের কালের দায় নিজে নিয়ে কলকাতার অনুকূলে রায় দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। ঠাকুরবাড়ির দোতলায় দক্ষিণ কোণের ‘অলিন্দবেষ্টিত কাষ্ঠনীড়ে’ আশ্রয় নিয়ে কবি স্বীকার করছেন তাঁর ভাইঝির কাছে : ‘‘আমার তেতালার ঘরে কিছুতেই মন বসিয়ে লিখতে পারতুম না, মনে করতুম কলকাতার দোষ, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এঘরে এসে লেখার কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না।’’[৩২] (কলকাতা, ১৮৯৫) এমন প্রীতিকর ব্যতিক্রমে কবির কণ্ঠ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হত। পরিবর্তিত নাগরিক আবহেও কবি ফিরে পেতেন হারানো অনুভূতির রেশ। কলকাতার চলতি পথের উপর কয়েকটি মুহূর্ত। পিতার সঙ্গে দেখা করে

পার্কস্ট্রীট থেকে ফিরছেন কবি। চোখ পড়ল গড়ের মাঠের দিকে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির পর মেঘমুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে কবির অভিভূত ভাবটা সঞ্চারিত হল তাঁর চিঠিতে : ‘‘পৃথিবীটা অনেকটা সেই আগের মতোই আছে, কেবল আমার আজকাল অবসর নেই, মাঠের উপর সকাল বেলাকার সুকুমার রোদ্দুরটি বিষাদ শান্তি এবং সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ সরস নির্মল শ্যামশ্রীতে মণ্ডিত করে রেখেছে। মনের ভিতরটাতে সেই আগেকার মতো খানিক ক্ষণের জন্যে একটি অনির্বচনীয় কোমল সুন্দর রাগিণী কম্পিত হয়ে বেজে উঠতে লাগল।’’[৩৩] (কলকাতা, ১৩০২)

স্থানিক অনুষঙ্গটুকু বাদ দিলে এ রাগিণীকে শিলাইদহ বা শান্তিনিতেনের মুক্ত সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে অসুবিধা নেই। এমন সুরের সঙ্গতে কবি ‘সেন্টিমেন্টাল’, ‘পোয়েটিকাল’ হওয়ার অবকাশ পেয়েছেন। তবু, ব্যতিক্রম তো নিয়ম নয়। ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে দাঁড়িয়ে বৈশ্যগোত্রের কলকাতার কাছে কবি হার্দ্য এবং শোভন নাগরিকতা প্রত্যাশা করেননি। অবচেতনের প্রতিক্রিয়ায় দুঃস্বপ্নে আবির্ভূত বিকৃতাঙ্গ কলকাতা সাজাদপুরবাসী কবিকেও তাড়া করে বেড়িয়েছে। ভাইঝিকে লেখা চিঠিতে স্বপ্নের বৃত্তান্তটা এই, গোটা শহর জুড়ে ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের ভিতর চলেছে তুলকালাম কাণ্ড। ভাড়াটে গাড়ি করে পার্কস্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কবি যেন দেখলেন, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজটা হু হু করে বেড়ে উঠছে। একদল অচেনা বিদেশি লোক এসে দাবি করছে, টাকা পেলে তারা মানুষকে বড় করে দিতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়িটাকে উঁচু করে দেবে বলে ভাঙতে শুরু করে অগ্রিম টাকা না পেয়ে তারা চটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা গেল বেঁকে চুরে। দেয়ালের মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা গাঁথা মানুষ, আধখানা তার বেরিয়ে। গোটা আজগুবি ঘটনার সারার্থটা কবি নিজেই ব্যাখ্যা করছেন চিঠির অন্তিমে : ‘‘সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব—সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকী কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ংকর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।’’[৩৪] (সাজাদপুর, ১৮৯১) উপনিবেশিত শহরে কাঞ্চন-মূল্যের বিনিময়ে সর্বনাশা সমৃদ্ধির প্রলোভনে খণ্ডিতসত্তা নাগরিক জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজিডিকে কবি প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর প্রতীকী স্বপ্নে। যন্ত্রণার দুর্ভার বোঝা একা বইতে পারলেন না। তাই চিঠি।

বণিকসভ্যতার অশুভ তাড়নায় শঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পরদেশি রাষ্ট্রশক্তিনিরপেক্ষ স্বদেশি সমাজ, যেখানে আত্মশক্তি বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। কৃত্রিম বাহ্যাড়ম্বরের যে-নেশা প্রকৃতি লালিত পল্লীর মূল শিকড় থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, তার আত্মবিস্মরণকারী মোহ অতিক্রম করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে সেই সম্মোহনে ধরা দেননি, তাঁর চিঠির পাতা জুড়ে তার প্রমাণের ঘাটতি নেই। স্বেচ্ছায় তিনি নগরের সঙ্গে বিচ্ছেদ স্বীকার করেছিলেন ‘মডেল ভিলেজ’ নির্মাণের পরিকল্পনা সফল করার জন্য তো বটেই, সঙ্গে নিসর্গ-সাহচর্যের আকাঙ্ক্ষাও কম ছিল না। শহর ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কি অভূতপূর্ব দৃশ্যান্তর ঘটেছিল তাঁর জীবনে, তা শুনে নেওয়া যায় কবির উচ্ছ্বসিত জবানীতে : ‘‘কোথায় সেই কলকাতা, সেই তেতালার ছাত, সেই বিশৃঙ্খল খাট পালং চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিয়মিত জীবনযাত্রা। হঠাৎ স্বপ্নের মতো চার দিকের অভ্রভেদী অট্টালিকাগুলি বায়ুতরঙ্গিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, চিৎপুরের বড়ো রাস্তাটি প্রশস্ত প্রসারিত তরলকলগীতিময় তরঙ্গিণীরূপে প্রবাহিত, ধূলিপূর্ণ ঘন বাতাস নির্মল স্বচ্ছ হয়ে অবাধ মুক্ত আকাশময় প্রাণহিল্লোল সঞ্চার করে দিচ্ছে—একটি উন্মুক্তবাতায়ন তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্রলিখনে নিযুক্ত।’’[৩৫] (শিলাইদহ, ১৮৯৪)

'স্বপ্নের মতো' মনে হলেও আসলে এই রূপান্তর কবির জাগ্রত চেতনার এক রমণীয় উপভোগ, যার অবিরাম নিঃসরণ পত্রকার রবীন্দ্রনাথের কলমকে সচল রেখেছে। লক্ষ করতে হবে বহির্বিশ্ব ভ্রমণের বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা প্রবাসী কবির পত্রাবলী, যা বহুক্ষেত্রে পত্রাকারে প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে, সেখানে নাগরিক সভ্যতার প্রসঙ্গগুলিতে কলকাতা ইতি উতি উঁকি মেরেছে। কবির ঘরোয়া চিঠির আবার নানান ধরন। একটু কেজো চিঠিতে কলকাতা সম্পর্কে আছে প্রয়োজনীয় সংবাদ, প্রায়শ কবির তির্যক মন্তব্যসহ। আমরা দেখেছি, শহরের প্রতিবেশ অথবা ব্যক্তিগতভাবে সম্পৃক্ত ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতার কারণগুলি প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে অপরপক্ষের সহমত বা সমর্থনের প্রত্যাশাও থেকে গেছে। আরেক ধরনের চিঠিতে কবি যেন চাইছেন নিজের আবেগে কথা বলতে। তাঁর 'পত্রধারা'র ভূমিকায় কবি বলেছেন : ''ভরতি মনের অবস্থায় জরুরি কথা ছাপিয়েও উদ্‌বৃত্ত থাকে মুখরতা। যাঁরা মজলিশি স্বভাবের লোক তাঁদের সেই উদ্‌বৃত্ত প্রকাশ পায় বৈঠকে, যাঁরা অন্তর্নিবিষ্ট তাঁরা স্বগত উক্তি লেখেন ডায়ারিতে, আমার মতো যাঁদের রচনায় মৌতাত তাঁরা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে।''[৩৬] এই সহজ রাস্তার সংযোগের ক্ষেত্রে প্রান্তবর্তীর সহৃদয়তায় কবি আস্থাশীল। তবু তাঁরা যেন উপলক্ষ। আনন্দ বিষাদ বৈরাগ্যের বিমিশ্র অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত না করে কবির স্বস্তি নেই। এভাবেই লেখা হয়েছিল ''ছিন্নপত্র'', যেখানে মগ্নকণ্ঠ কবি তাঁর আজন্ম পরিচিত শহরের কথা বলেননি, বলেছেন নতুন অভিজ্ঞতায় পাওয়া গ্রামের কথা : ''গ্রাম্য দৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে।''[৩৭] আরেক পর্যায়ের রচনা ''ভানুসিংহের পত্রাবলী'', যার বেশির ভাগ চিঠি শান্তিনিকেতন থেকে লেখা। ফলে ''সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি।''[৩৮]

দুটি পত্রধারাতেই কবির কলম তাঁর মনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সুরে বাঁধা। শহর কলকাতার বেসুরো গৎ মাঝে মাঝে সেই নিবিড়তাকে আঘাত করেছে। তখনই নগরের প্রতি বিরাগের স্থায়ী ভাবটা চেতিয়ে উঠেছে। উপনিবেশ শহরের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে রবীন্দ্রনাথ যখন গ্রামীণ প্রকৃতির আদিগন্ত বিস্তারের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, কলকাতার পরিসীমাকে আরও সংকীর্ণ দেখাল। নগর আর না-নগরের বিরোধ প্রতিস্থাপিত হল নিসর্গ-ব্যবহিত ও সন্নিহিত অবস্থানে। কবির মর্জি কতটা পরিবেশসাপেক্ষ, তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাতে চাইলেন চিঠির নানা কথার ফাঁকে :

> ''অনেক পুরনো শুকনো কবিতা, কলকাতায় যাকে উপহাসানলে জ্বালিয়ে ফেলবার যোগ্য বলে মনে হয়, তারা এখানে আসবামাত্র দেখতে দেখতে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে।''[৩৯] (শিলাইদহ, ১৮৯২)
>
> ''একদিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়। কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেন্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি''[৪০] (শিলাইদহ, ১৮৯৩)
>
> ''আমি যখন কলকাতায় থাকি তখন অন্নময় প্রাণময় কোষটাই প্রবল হয়ে উঠে অন্য সমস্ত সূক্ষ্ম কোষগুলিকে অভিভূত করে ফেলে। ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়। ... চতুর্দিকটা বেশ সাদাসিধা ফাঁকা হলে মনের জন্য অনেকখানি জায়গা পাওয়া যায়।''[৪১] (কলকাতা, ১৮৯৪)

সৃষ্টির অনুকূল এই মানসিক পরিসর রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর পূর্ণ যৌবনে। জমে উঠেছিল রসের মহোৎসব। তবু একটি প্রশ্ন অবধারিত ভাবেই না উঠে পারে না, কলকাতাকে প্রত্যাখ্যান

করে কবি বাংলার যে-সুদূর পল্লী অঞ্চলে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছিলেন, সেই নতুন অধিবাসের আদত চেহারাটা কেমন? নিসর্গপ্রীতির রোমান্টিক প্রলেপ সরিয়ে কবির বাস্তব দৃষ্টি যখন সজাগ থাকছে, তখন আর কবির কলমে কাব্য নেই। জমিদারি পরিদর্শনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ভাইঝিকে জানাতে গিয়ে উঠে আসছে সত্যের অনাবৃত মূর্তি : ''যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায় তখন সে দৃশ্য কোনমতেই ভাল লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে ... এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়!''[৪২] (দিঘাপতিয়া, ১৮৯৪)। সহ্য করতে না পেরেই রবীন্দ্রনাথ নিজের অধিকারের সীমানার মধ্যে সমস্যার সাধ্যায়ত্ত নিরাকরণে সর্বশক্তি ব্যয় করেছিলেন। শহর-গ্রামের আরোপিত বিচ্ছেদ ঘোচাতে সভ্যতাভিমানী শহুরে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বারবার আহ্বান জানিয়েছিলেন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগী ভূমিকা নিতে। কল্পলোকবিহারী কবি হয়ে উঠেছিলেন কর্মী রবীন্দ্রনাথ।

অথচ 'লোলুপতার মহামারী'-গ্রস্ত উপনিবেশ শহরের কৃত্রিমতা ও নির্জীব লাবণ্যহীনতাকে প্রকট করার সময় কবি সমস্যাজর্জর গ্রামবাংলাকে রিয়ালিটির রূঢ়তায় স্থাপন না করে তার অনিঃশেষ নিসর্গশ্রীকে আত্মপ্রসাদ চরিতার্থ করার একটি প্রধান উদ্দীপক হিসেবে রসময় বর্ণময় করে তুলেছেন। আগ্রাসী ঔপনিবেশিক শক্তির কৌশলী ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিত দুয়োরাণী পল্লীর পক্ষ নিয়ে তিনি আপাত সুখভোগ্য সুয়োরাণী কলকাতাকে আন্তর দৈন্যের পরাজিত মূর্তিতে দেখাতে চেয়েছেন। আসলে পক্ষাপক্ষ নির্ধারণের মানকটি তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ও মননের অনেক গভীরে। তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের পরিক্রমণের মধ্যেই সেই উৎসে পৌঁছন সম্ভব। চিঠিপত্রের সীমিত বাচনে প্রাসঙ্গিক স্বল্প সূত্রে কবির ভাবনার আদলটুকু পাওয়া যেতে পারে। তাতে একটা কথা স্পষ্ট, উপনিবেশের মাটিতে বাণিজ্য-শহর কলকাতা এমন কোনো আকর্ষণীয় গরিমার সন্ধান দেয়নি, যাতে কবি তার সংকীর্ণতা ও ক্লেদ ভুলতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের নগরবিমুখতাকে তাঁর কালের পক্ষে কোনো ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য বলে ভাবার কারণ নেই। গ্রামীণ সামাজিকতার সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাও পূর্বাপর ধারায় বিরল নয়। সাধারণভাবে পশ্চিমি কবিকুলের রোমান্টিক প্রবণতার সঙ্গে বস্তুসর্বস্ব নাগরিকতার অসহযোগ প্রায়শ লক্ষণীয়। তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে দেখলে স্পর্ধিত প্রতীচ্যের আধুনিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সমষ্টিগত উদ্যমে নাগরিকতার বিষাক্ত ব্যাধিগুলি দীর্ঘদিন ধরে প্রতিপক্ষের সমালোচনার নিশানায় এসেছিল। অভিযোগ উঠেছিল ভিতর এবং বাইরে থেকে। ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শের বিরোধী Traditional conservative বা অনুবর্তনপন্থী রক্ষণশীলেরা ঐতিহ্যবাহী ইউরোপীয় সমাজেরই সপক্ষতা করেছিলেন, তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতা এডমণ্ড বার্কের ভাষায় যে সমাজ কোনোমতেই "the gross animal existence of a temporary and perishable nature"[৪৩]-এর নয়, বরং সজীবতা, পূর্ণতা ও সমন্বয়ের ধারক। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রাচ্য প্রাচীন সমাজের অন্তর্গত কোনো প্রভেদ নেই। বস্তুত এর বিপরীত মেরুতেই প্রতীচী নাগরিক সমাজের স্থাপনা। জাপানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল প্রতিক্রিয়াশীল বিক্ষোভের মধ্যে বিশ শতকীয় যে 'Occidentalism'-এর তাত্ত্বিক উদ্ভব,[৪৪] তাতেও প্রাচ্যের শিকড় বিনাশকারী এক অমানবিক এবং আধ্যাত্মিকতা বর্জিত তথাকথিত প্রগতিশীল প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে যন্ত্রকবলিত নাগরিকতার বিকলাঙ্গ মূর্তিকেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক প্রতীচ্য সম্পর্কে এতটা আক্রমণাত্মক হননি। তবে বিকল্প ভাষ্যের এই

'spiritual civilization' তাঁরও অভীষ্ট ছিল। প্রাচ্যের এমন এক ভাবমূর্তি তিনি সন্ধান করেছিলেন, যার ভিত্তিমূলে আছে বিচ্ছিন্নতা-প্রশ্রয়কারী নগর নয়, পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনে নিবিড় আবহমান গ্রামীণ সামাজিকতা। ঔপনিবেশিক ধাঁচের মধ্যে পাওয়া বৃহত্তর জনবিচ্ছিন্ন, গ্রামবিচ্ছিন্ন, নাগরিকতার পক্ষপুটে পুষ্ট মোহান্ধ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই সমঝোতা করতে পারেননি। মানতে পারেননি প্রভুপক্ষীয় শাসনতন্ত্রের আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক পক্ষপাতদুষ্ট সংবিধানকে।

আমরা শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের অতীতচারী মুগ্ধ কল্পনায় গ্রাম আর নগরের যে নির্বিরোধ সহাবস্থান দেখেছিলাম, তাকে বর্তমানের মধ্যে ফিরিয়ে আনার বড় বাঞ্ছিত অথচ বাস্তবে অসম্ভব অসাধ্য এক তাড়নায় তাঁর ভাববাদী দার্শনিক মনটি ভিতরে ভিতরে দীর্ণ হয়েছিল। যন্ত্রণার উপশমে পল্লীনিকেতন হয়েছিল তাঁর প্রিয়তর আশ্রয়। অনাবাস্য হয়েছিল 'ইতর কলকাকলি'র কলকাতা। উপলক্ষ পেলেই পত্রের বয়ানে পরিস্ফুট হয়েছে কবির সেই অভিপ্রায়।

উল্লেখপঞ্জি

১। রবীন্দ্রনাথ—বাসন্তী দেবীকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (৯মখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পরিবর্ধিত সং ১৪০৪, পৃ: ৪৩১

২। রবীন্দ্রনাথ—''মেঘদূত'', 'প্রাচীন সাহিত্য', রবীন্দ্ররচনাবলী (১০ম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১৩

৩। রবীন্দ্রনাথ—'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্ররচনাবলী (১২শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৪। বিহারীলাল চক্রবর্তী—'সারদামঙ্গল' (৫ম সর্গ), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিলিসানি পাবলিশিং কনসার্ন, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ৮৬

৫। রবীন্দ্রনাথ—প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (৩য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৪১০, পৃ. ৫২

৬। প্রাগুক্ত

৭। রবীন্দ্রনাথ—''সমবায়নীতি'', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৩ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৯৯০, পৃ. ৭৫৩

৮। রবীন্দ্রনাথ—''পল্লীপ্রকৃতি'', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৯

৯। রবীন্দ্রনাথ—''বৃহত্তর ভারত'', 'কালান্তর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৭

১০। রবীন্দ্রনাথ—মৃণালিণী দেবীকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত ১৪১৭, পৃ. ৩১

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

১২। রবীন্দ্রনাথ—রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (২য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৪১৯, পৃ. ৫৩

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

১৪। রবীন্দ্রনাথ—প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (৮ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৩৭০, পৃ. ৮৯

১৫। রবীন্দ্রনাথ—রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৬। রবীন্দ্রনাথ—প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড), প্রাগুক্ত ১৪০০, পৃ. ৩০১

১৭। রবীন্দ্রনাথ—'ছিন্নপত্র', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১১শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫৮

১৮। রবীন্দ্রনাথ—প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১৯। রবীন্দ্রনাথ—দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখাচিঠি, চিঠিপত্র (১৭শ খণ্ড), প্রাগুক্ত

২০। রবীন্দ্রনাথ—রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (১৮শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৪০৯, পৃ. ১৪১

২১। রবীন্দ্রনাথ—জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৯৯৩, পৃ. ১৮

২২। রবীন্দ্রনাথ—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (১২শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৩৯৩, পৃ. ১৫১

২৩। রবীন্দ্রনাথ—রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

২৪। রবীন্দ্রনাথ—প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

২৫। রবীন্দ্রনাথ—অরুণচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (১০ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৪০২, পৃ. ৭১

২৬। রবীন্দ্রনাথ—হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (৯ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

২৭। রবীন্দ্রনাথ—রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২৮। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—''রবীন্দ্র-পরিচয়'', চিঠিপত্র (১৪শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৪০৭, পৃ. ২২৪-২২৫

২৯। রবীন্দ্রনাথ—অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র (১১শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৪১৭, পৃ. ৩৪-৩৫

৩০। রবীন্দ্রনাথ—হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-২৬৬

৩২। রবীন্দ্রনাথ—'ছিন্নপত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

৩৩। রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

৩৬। রবীন্দ্রনাথ—ভূমিকা, 'পত্রধারা', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১২শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ১৯৮৯, পৃ. ৪৯০

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯

৩৮। প্রাগুক্ত

৩৯। রবীন্দ্রনাথ—ছিন্নপত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

৪৩। উদ্ধৃত, Paul Schumaker—From Ideologies to Public Philosophies : An Introduction to Political Theory, Black well Publishing, UK, 2008, p. 158

৪৪। দ্রষ্টব্য : IAN BURUMA and Avishai Margalit—Occidentalism : The West in the Eyes of its Enemies, Penguin Books India, 2004

চণ্ডালিকা : এক অমানী অস্তিত্বের জাগরণ

সত্যবতী গিরি

বৌদ্ধ ধর্মের নানা কাহিনি, নানা প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিপরিসরে বারবার নানাভাবে স্থান করে গিয়েছে। এর মধ্যে নানা কারণে ‘চণ্ডালিকা’র প্রসঙ্গ আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে যায়।

বৌদ্ধ দিব্যাবদানের একটি কাহিনি ‘শার্দূল কর্ণাবদান’। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “The Sanskirt Buddhist Literature of Nepal” গ্রন্থের সংকলিত এই কাহিনি থেকেই নেওয়া হয়েছে অথবা বলা যায় তৈরি হয়েছে এর গল্প।

প্রথম এটি ছিল গদ্যনাট্য। প্রকাশিত হয় ১৯৩৩-এ। তারপর নৃত্যনাট্য ‘চণ্ডালিকা’ হয়ে ওঠে ১৩৪৪-এ। (১৯৩৬ বা ৩৭)

গল্পটি সংক্ষেপে এইরকম শ্রাবস্তী নগরের পথের পাশে কূপ থেকে জল তুলছিল চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতি। সেই সময় বুদ্ধের শিষ্য তৃষার্ত আনন্দ তাঁর কাছে জল চাইলেন।

প্রকৃতি তার জাতের প্রসঙ্গ তুলে জল দিতে আপত্তি করায় আনন্দ তাকে বলে ‘যে মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ...’। মানব অস্তিত্বের এই গরিমায় স্বীকৃতি প্রকৃতিকে মুগ্ধ করল। সে আনন্দকে পাওয়ার জন্য তাঁর মায়ের বশীকরণ ক্রিয়ার সাহায্য নিল। কিন্তু মায়া দর্পণে ‘আত্ম পরাজয়ের’ ‘প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে’ মাথা হেঁট করা আনন্দের নিরানন্দ মূর্তি যখন ভেসে উঠল, বিচলিত প্রকৃতি সমস্ত অভিচারের উপকরণ, পদাঘাতে দূর করে বল্‌লো ‘প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে’। প্রকৃতির জননীও অনুতপ্ত হল। আত্মসমর্পণের আকুতি নিয়েই তার মৃত্যু হল।

‘চণ্ডালিকা’র ঠিক আগে প্রকাশিত হয়েছে ‘কালের যাত্রা’। এতে তিনটি ছোট সংলাপময় রচনা এক সঙ্গে কালের যাত্রা নামে প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি ‘রথের রশি’। এখানেও দেখা যাচ্ছে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহিত পন্থায় রথ কিছুতেই নড়ল না। অবশেষে রথ চল্‌লো তথাকথিত শূদ্র বা অস্পৃশ্য দলের স্পর্শে।

আর চণ্ডালিকাতেও চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ পেলো ‘মানহারা’ মানবীর মূল্য পাওয়ার ছবি। নৃত্যনাট্য ‘চণ্ডালিকা’য় প্রকৃতি বলেছে—‘দেবার আমার আছে কিছু। এই কথাই যে ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ বর্ণভেদজনিত বৈষম্য ও সেই কারণে মনুষ্যত্বের অমর্যাদা প্রথম থেকেই কবির সহানুভূতি পেয়েছে। আমাদের মনে পড়ে যায় তাঁর সেই সাবধানবাণী—

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি

দেখিবারে পাও নাকি—
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথ 'Mahatmaji and The Depressed Humanity' নামে একটি ছোটো বই লেখেন। এর উপস্বত্ব দেওয়া হয় বিশ্বভারতীর 'সংস্কার সমিতি'কে।

বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কার সমিতির যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন — তাতে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—

১। 'কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকে আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিবে না।'
(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯, পৃ. ৩৩৭)

সেদিনের সেই সময়ের পক্ষে এই বিজ্ঞপ্তি খুব সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটি সম্ভব করে তুলেছিলেন। তাঁর মধ্যেই উনিশ শতকের নবজাগরণের পূর্ণ উদ্ভাসন ঘটেছিল বলা যায়।

আত্মসম্মান—মানুষ হিসেবে প্রত্যেক মানুষের মানবিক মূল্য যে কী বস্তু, সেটিই তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন 'চণ্ডালিকা' নাটকে।

'চণ্ডালিকা'কে কবি গানে ও নৃত্যে নতুন রূপদান করেন। এই রূপ দেওয়ার সময় পূর্ববর্তী নাটকের বিষয়কে কিছুটা পরিবর্তিত করা হয়েছে। প্রথমে এটি ছিল দুটি চরিত্র—আনন্দ ও প্রকৃতির মানসিক সংগ্রামের নাটক। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটি দাঁড়ালো একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত।

প্রতিমাদেবীর প্রবন্ধে চণ্ডালিকার মূল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত এই রচনায় প্রকৃতি পুরুষের অন্তরের চিরন্তন দ্বন্দ্বকেই 'চণ্ডালিকা'র কেন্দ্রীয় ভাব বলা হয়েছে।

চণ্ডালিকা তথা প্রকৃতির মনোবিকাশের ঘটনাই এখানে প্রধান ''প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে, সেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এসে পৌঁছল কোন্ প্রেমের ডাক, প্রথম সাড়া দিয়ে উঠল তার দেহ, তার কামনা, তারপর অসীম ছন্দের মধ্যে দিয়ে টানা ছেঁড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে।" ('চণ্ডালিকা' প্রবন্ধ; প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৫)।

প্রথম প্রকাশিত গদ্য 'চণ্ডালিকা'য় প্রকৃতি বলেছে—''সমস্ত শ্রাবস্তী নগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা? এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে? একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা"। (চণ্ডালিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ২৩)

নৃত্যনাট্য ‘চণ্ডালিকা’য় যে সামান্য পরিবর্তন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—

বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল।
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর সম্মান

(নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, ফাল্গুন ১৩৪৪; রবীন্দ্র রচনাবলী ২৫, পৃ. ১৭০-৭১)

‘শিরোপা’-র পরিবর্তে ‘সম্মান’ শব্দটির ব্যবহারই এক্ষেত্রে বুঝিয়ে দিচ্ছে শিল্পীর অভিপ্রায়কে।

আনন্দ প্রকৃতিকে বলেছিল—‘‘যে মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে’’ আনন্দর এই বাণীই প্রকৃতির জাগরণের বাণী। এ তার অন্তর্লোকের জাগরণ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানতেন বাস্তবে এই শ্রেণির মানুষকে জাগানোর জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার। তিনি বুঝেছিলেন মানুষকে মর্যাদা দেওয়ার এই শিক্ষা উচ্চ বর্ণ আর নিম্ন বর্ণ দু’ধরণের মানুষের জন্যই এবং এটি সময় সাপেক্ষ।

স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোনো শর্টকাট পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর অন্য নানা রচনার সঙ্গে ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে নিজের এই রাজনৈতিক অভিমতকে তিনি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন।

অস্পৃশ্যতার ক্ষেত্রেও তিনি কোন আকস্মিক বা অলৌকিকে আস্থা রাখেননি। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ছিল বিপুল। এই ঘটনার পর গান্ধিজী ঘোষণা করেন বিহারের ভূমিকম্পের কারণ অস্পৃশ্যতার পাপ। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ তারিখে এর তীব্র প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লেখেন গান্ধিজীকে। সেই চিঠিতে তিনি বলেন যে, যারা নিম্নবর্ণের মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করে; যারা ধনী, পাকা বাড়িতে থাকে এই ভূমিকম্পে তাদের ক্ষতি বেশি হয়নি। ক্ষতি হয়েছে অস্পৃশ্যদেরই কারণ তারা গরিব, তারা থাকে কুটিরে। ভূমিকম্পের কারণ যদি অস্পৃশ্যতার পাপ হয়, তাহলে যারা পাপী তাদের শাস্তি না হয়ে অস্পৃশ্য দরিদ্রদেরই শাস্তি হল কেন—এই প্রশ্ন তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আনন্দ ও প্রকৃতির কাহিনি আছে উইন্টার নিটজ-এর “A History of Indian Literature”-এর দ্বিতীয় ভলিউম-এ। সেখানে কাহিনির শেষে প্রকৃতি আনন্দকে বিবাহ করতে বা পেতে চায়নি। তার পরিবর্তে বুদ্ধের প্রভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীতে পরিণত হয়েছে।

কাহিনি কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। এরপর ব্রাহ্মণেরা, ক্ষত্রিয়রা ও শ্রাবস্তীর অন্যান্য নাগরিকরা যখন শুনলেন যে বুদ্ধ এক চণ্ডাল কন্যাকে ভিক্ষুণী করেছেন, তাঁরা খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। রাজা প্রসেনজিৎ-এর কাছে তাঁরা নালিশও করলেন। বুদ্ধ তাঁদের বললেন চণ্ডাল নেতা ত্রিশঙ্কুর গল্প। ত্রিশঙ্কু তাঁর অত্যন্ত বিদ্বান পুত্র শার্দূলকর্ণের সঙ্গে অহংকারী ব্রাহ্মণ পুষ্করসারিন-এর কন্যার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে তিরস্কার করে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ত্রিশঙ্কু অত্যন্ত কঠোরভাবে জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা করেন এবং ব্রাহ্মণেরও সমালোচনা করেন। তিনি

বলেন আত্মা ভিন্ন শরীরে প্রবেশ করে, মানুষকে পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী জন্মাতে হয়। তাহলে তো এই তত্ত্ব অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা থাকতেই পারে না। তিনি বলেন—শুকনো কাঠ ঘষে আগুন যেভাবে বেরোয়, সেভাবে তো আর জন্ম হয় না ব্রাহ্মণের। চণ্ডাল যেমন মাতৃগর্ভ থেকে জন্মায়, ব্রাহ্মণ ও জন্মায় একইভাবে। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নেতার কথায় তাঁর পুত্রের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন। বুদ্ধ বলেন পূর্বজন্মের ব্রাহ্মণকন্যাই এখন প্রকৃতি। শার্দূলকর্ণ হলেন আনন্দ। আর বুদ্ধ স্বয়ং ত্রিশঙ্কু।

মূল উপাখ্যানে বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম প্রথাকে অস্বীকার করে মানুষের কর্মফলকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যনাটক ও নৃত্যনাট্যে সেই বিষয়টিকে রেখেও তাকে মানবসত্তার জাগরণের ইতিবৃত্তে পরিণত করেছেন। বৌদ্ধ অবদানের এই একই কাহিনি নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন আর এক কবি দক্ষিণ ভারতের কুমারন আসান। তাঁর দীর্ঘ কবিতার নাম 'চণ্ডাল ভিক্ষুকী'।

এর আগেও আর একজন কবি একই বৌদ্ধ কাহিনি নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। তিনি বাঙালি কবি। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৯-এ শেষে লেখা হয়।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'তিন চণ্ডালী' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—''বৌদ্ধ কাহিনীটির আধুনিক রূপায়ণে সেইটেই ছিল আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা, অথচ বাঙালি পাঠকের চেতনা থেকে একেবারে হারিয়ে গেছে সতীশচন্দ্রের সামর্থ্যবান সেই লেখাটি।'' (ঐতিহ্যের বিস্তার, শঙ্খ ঘোষ; প্যাপিরাস, ২, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৪, ১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ২৪)। সতীশচন্দ্র কবিতাটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে আর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এটিকে নাট্যরূপ দেওয়ার কথা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। হয়তো সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে লিখে ফেলেন গদ্যনাটক 'চণ্ডালিকা'। পরে সেটিই আবার রূপায়িত হয় 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে।

কুমারন আসানের কাহিনি সূত্র খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে নেওয়া নয়। তিনি এটি পেয়েছিলেন 'The Essence of Buddhism' নামক একটি গ্রন্থ থেকে। আসান জন্মেছিলেন অন্ত্যজ থিয়া সম্প্রদায়ে। কেরলের জাতপাত বিচারের তীব্রতাও এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে।

'চণ্ডাল ভিক্ষুকী'র কাহিনি যেন কুমারন আসানের নিজের জীবনেরই একটি দিক। বাঙালোরের সংস্কৃত কলেজে আসান ছাত্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলেন বিশেষ অনুমতিতে। কারণ সেখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। শেষ পর্যন্ত অনেকের বিরোধিতায় তাঁকে কলেজ ছেড়ে দিতে হয়। কেরলের সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল থিয়া সম্প্রদায়ের। কিন্তু তাদেরকে সরকারি স্কুলে পড়তে দেওয়া হতো না। এমনকি সরকারি চাকরি পাওয়ার অধিকারও তাদের ছিল না। 'থিয়া ছেলের ভাবনা' কবিতায় তিনি লেখেন—

> চির দাসত্ব মা তোর কপালে লেখা—
> হে ভারত, এই আর্তনাদে কী হবে?
> জাতপাত নিয়ে অন্ধ ছেলেরা তোর
> হানাহানি করে—মুক্তি কোথায় তবে?

(তিন চণ্ডালী; ঐতিহ্যের বিস্তার; পৃ. ২৮ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

তাঁর কাব্যে বুদ্ধের প্রশ্নেও সেই তীব্র উচ্চারণ থাকে—

কোথা থেকে আসে এই দ্বিজ ব্রাহ্মণ?
কোনো উদ্ভিদ না কি মেঘ থেকে উড়ে?
চণ্ডালিনীর অচ্ছুৎ দেহ, সেও—
অনুর্বরা কি থাকে ব্রাহ্মণ বীজে?
ব্রাহ্মণ তার উপবীত শিখা তিলক
জন্ম থেকেই বয়ে নিয়ে আসে নিজে?

(পূর্বোক্ত; পৃ. ২৯)

অন্যদিকে সতীশচন্দ্রের কবিতা ‘দ্বন্দ্বক্ষোভময় এক আত্মোদবোধনের কবিতা’ (তিন চণ্ডালী, পৃ. ৩৪) এই আত্মোদবোধনে প্রচ্ছন্ন আছে লালসাকে পরাভূত করার সংগ্রাম। কুমারন আসানের ‘চণ্ডাল ভিক্ষুকী’তে মাতঙ্গী (রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সতীশচন্দ্রে অম্বিকা) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর ব্রাহ্মণ সমাজের আলোড়নই দীর্ঘ পর্ব। এখানেই প্রসেনজিৎকে বুদ্ধ বুঝিয়েছেন জাতপাতের নিরর্থকতার কথা। তাই কুমারন আসানের কাব্য সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত নারীর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অন্যদিকে সতীশচন্দ্রের ‘চণ্ডালী’ অবদান শতকের কাহিনির মতোই আনন্দের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে—

একী রূপ মরি মরি। একী রূপ আগুন সমান—
তৃষায় শরীর খানি মৃদু মৃদু তাহে কম্পমান।

তার কামনার প্রাবল্য যেও দেখিয়েছেন কবি—

‘‘একবার তাঁরে শুধু এ ভুজবন্ধন মাঝে নিয়া
যাব যেথা যেতে হয়।’’

রবীন্দ্রনাথের ‘চণ্ডালিকা’য় শঙ্খ ঘোষ আবিষ্কার করেছেন এক ‘মর্যাদাময়ী নারীর ছবি’, যে কুমারন আসান আর সতীশচন্দ্রের থেকে কিছুটা পৃথক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা তার পূর্ণ জাগরণেরও আগে, চূড়ান্ত আত্মোপলব্ধিরও আগে যেভাবে সমাজকে ব্যাখ্যা করে, উন্মোচিত করে তার ব্যক্তিসত্তাকে সেখানেই তার মর্যাদার বিশেষত্ব। ‘চণ্ডালিকা’র এই দিকটি হয়তো এড়িয়ে যায় অনেকের দৃষ্টি। ১৯৩৩-এ প্রকাশিত গদ্যনাট্য রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা যে কোনো উচ্চবর্ণের যুবকের যেকোনো ধরণের আহ্বানে সে সাড়া দিতে চায় না। তার মা তাকে প্রশ্ন করেছে—

‘মৃগয়ায় বেরিয়ে রাজার ছেলে এসেছিল তোরই কুয়োতলায়।
মনে পড়ে তো?
কেন গেলি নে রাজার ঘরে! রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল’।

(চণ্ডালিকা; জন্ম শতবার্ষিক রবীন্দ্ররচনাবলী; ষষ্ঠ খণ্ড; ১৪৬ পৃষ্ঠা)

এর উত্তরে প্রকৃতি বলেছে—

‘‘ভুলেছিল না তো কী। ভুলেইছিল যে, আমি মানুষ। পশু মারতে বেরিয়েছিল; চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চাই বাঁধতে সোনার শিকলে’’। (তদেব, পৃ. ১১৪৬)

এই সংলাপে প্রকৃতির মধ্যে স্ফুরিত অস্তিত্বের নতুন বয়ান। মেয়েমানুষ থেকে মানুষ হওয়ার উত্তরণের ইতিহাসও চণ্ডালিকার ভিন্ন ব্যাখ্যান। এই উত্তরণ সমস্ত রকমের দমনকেই উচ্ছেদ করে।

নারী শোষণ, অন্যায় আর অপমানের বিরুদ্ধে এ তার তীব্র প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময়ে নারীর নিজের শরীরের ওপর অধিকারের যে দাবি উঠেছিল চণ্ডালিকা যেন তারই প্রাণরূপ। তথাকথিত সমাজ কাঠামোর আপাত নিশ্ছিদ্র দৃঢ়তার দিকেও সে ছুঁড়ে দেয় তার বিধ্বংসী বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত—

> ‘‘রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে, দেশে, আমি নই চণ্ডাল’’। (তদেব; পৃ. ১১৪৭)

রবীন্দ্রনাথের ‘চণ্ডালিকা’ এইভাবেই তার অনন্য জাগরণের ইতিবৃত্ত উপহার দেয় আমাদের। সময়কে ছুঁয়েও হয়ে যায় ভবিষ্যতের। ‘রবীন্দ্রনাথের রচনায় নারী তার শেষ মুক্তিতে পৌঁছয়নি, পুরুষের সিদ্ধির জন্য নিজেকে ত্যাগ করে সে’ ধূর্জটিপ্রসাদের এটিই রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে সমালোচনা। কিন্তু আমাদের মনে হয় ‘অপরিচিতা’-র ‘কল্যাণী’, আর ‘চণ্ডালিকা’র ‘প্রকৃতি’ সম্পর্কে একথা বলা যায় না।

আরও বলা যায়, ‘শ্যামা’য় বারাঙ্গনার প্রেমিকা সত্তার উন্মোচন, ‘চণ্ডালিকা’র প্রকৃতির মতো সেও অন্যায় আর নিষ্ঠুর কাজের মধ্য দিয়ে প্রেমের সার্থকতা চায়, ‘চিত্রাঙ্গদা’য় চিত্রাঙ্গদা ব্যক্তির পূর্ণ মর্যাদা চায়, ‘চণ্ডালিকা’তে ও সেই একই দাবি।

প্রবাদপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বনাথ রায়

প্রথম ঘটনা ঃ

‘‘আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের ‘Proverbs and their lessons’ বইখানি পড়ছিলেম, তিনি [B নামে জনৈক ইয়ুরাসীয় যাত্রী] এসে বইটি নিয়ে শিস দিতে দিতে দু’চার পাতা উল্‌টিয়ে পালটিয়ে বললেন, ‘হাঁ ভালো বই বটে।’ ট্রেঞ্চের শুভা দৃষ্ট!’’[১]

১২৮৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে মাত্র সতের বছর বয়সে প্রথমবার বিলাত যাত্রাকালে জাহাজে Richard Chenevise Trench-এর প্রবাদ সম্পর্কিত বইটি পাঠ করার এই স্বীকারোক্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। ইংরেজি ভাষায় সড়গড় হওয়ার জন্য যে সব বই তরুণ কবি সঙ্গে নিয়েছিলেন তার মধ্যে নিজের বয়সী প্রবাদের এই বইটিও (প্রকাশ ১৮৬১) ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ

ঠিক দশ বছর পরে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার ঠাকুরবাড়ির ‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকায় (পৃ. ২১১-২২১) ইংরেজি প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ ‘বিবাহ ও স্ত্রী সম্বন্ধে ইংরেজি পুরাতন প্রবচন’ প্রকাশিত হয়। নারী ও বিবাহ বিষয়ক প্রবাদগুলির বঙ্গানুবাদও সে লেখায় ছিল।

তৃতীয় ঘটনা ঃ

আবার ঠিক দশ বছর পরে (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) ঠাকুরবাড়ির ‘পুণ্য’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি শোভনা সুন্দরীর (সেজদা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা) একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের সূচনা—‘কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবচন’[২]। প্রবাদে আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; ঠাকুরবাড়ির এই বিদুষী কন্যাটিও বিবাহসূত্রে সুদূর রাজস্থানের জয়পুরে অবস্থানকালে সেখানকার প্রবাদ-প্রবচনগুলি সংগ্রহ করে তার বঙ্গানুবাদসহ বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের সঙ্গে তুলনামূলক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন।

কলকাতার নাগরিকতা ঋদ্ধ পরিবার হলেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেক নারী পুরুষের মধ্যেই লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির সম্পর্কে যে অন্তরিক প্যাশন ছিল—প্রবাদ-প্রবচনকেন্দ্রিক এই তিনটি ঘটনার মাধ্যমে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। পরিবারটি সার্বিকভাবে আধুনিকতামুখী হলেও শিকড়টি ছিল দেশীয় গ্রামীণ সাহিত্য সংস্কৃতির গভীরে ছড়ানো। বলতে গেলে বাংলায় লোকসাহিত্য চর্চার উৎসমুখটি খুলে দিয়েছিল ঠাকুর পরিবার, এবং তার মধ্যমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের দেশে লোকসাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ, সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পথিকৃত। নানাজনকে উৎসাহিতও করেছেন এ বিষয়ে। মেয়েলি ছাড়া, ছেলেভুলানো ছড়া, রূপকথা, উপকথা, মেয়েলিব্রত, বিভিন্ন লোকসংগীত, বাউলগান প্রভৃতি মৌখিক (oral) সাহিত্য সংগ্রহের দিকেই তাঁর

নজর ছিল বেশি। কেননা কালে কালে নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্যের চাপে সেসব হারিয়ে যায়। ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বাউলের গান' সমালোচনা সূত্রে লোকসংগীত সংগ্রহে বঙ্গবাসীকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন নবীন কবি। তারপর 'সাধনা', 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'প্রবাসী'র মাধ্যমে বারেবারেই সে আবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ১৩০১ বঙ্গাব্দে 'সাধনা' পত্রিকার 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' সম্পর্কে তিনি লেখেন—

> ''সাহিত্য পরিষদ সভা হইতে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধের প্রত্যাশা করি যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনায় সহায়তা করে। ... বাঙ্গালা রূপকথা (Folk lore), প্রবচন (Proverb) ... ছড়া (Nursery Rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।''[৩]

এই প্রথম ছড়া-রূপকথার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহের গুরুত্বও স্বীকার করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে সেকালের অনেক বিখ্যাত মানুষ লোকসাহিত্যের উপকরণগুলি সংগ্রহ-সংকলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমাদের অনুমান এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মতো প্রবাদসংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'প্রবাদপদ্মিনী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। এই বছরেই রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশ করেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'প্রবাদ প্রসঙ্গ'। অবশ্য 'ভারতী'তে 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল আগের বছরেই। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে উক্ত পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় এই শিরোনামে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

জীবনের প্রান্তসীমায় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাধিক প্রবাদখণ্ড বা বাগ্‌ধারা সংগ্রহ করেছিলেন সম্ভবত সুধীরচন্দ্র মজুমদারের 'বাগধারা সংগ্রহ' গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। সুধীরচন্দ্র নিজের লেখা বই-এর একটি কপি কবির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে সেই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখেন—

> ''বিশ্বকবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে গ্রন্থখানি সশ্রদ্ধ উপহার সমর্পিত হইল। শ্রী সুধীরচন্দ্র মজুমদার, ২৭ পৌষ ১৩৪৩; অভিমত প্রার্থনীয়।''

সুধীরচন্দ্রকে কোনো অভিমত রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে (১৫৯ নং) রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে বেশ কিছু প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে 'বৃহৎ খনার বচন' (১৩১৫) 'খনার বচন' (১৩৪০) প্রভৃতি দেখে মনে হয় দেশীয় ডাক ও খনার প্রবাদমূলক বচনগুলির সঙ্গে তিনি অপরিচিত ছিলেন না। তাঁর লেখাতেও ডাক ও খনার বচনের উল্লেখ[৪] ও উদ্ধৃতি আমরা পাই।

দুই

মানুষের মনে আপনা থেকে সৃষ্ট বাংলা প্রবাদ-প্রবচন (Proverbs) ধাঁধা, বাগধারা বা বিশিষ্টার্থক শব্দগুলি (idioms, phrases) যুগ যুগ ধরে বাঙালির লোকস্মৃতিতে মুখে মুখে চলে এসেছে। লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে বিশেষ অর্থজ্ঞাপক এই ধরনের 'চলতি কথা'র ছড়া, বাক্য বা বাক্যাংশগুলি গুরুত্ব সহ বিবেচিত হয়ে থাকে।

মেয়েলি ছড়া বা ব্রতকথার মতো প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ তেমন

মনোযোগ দেননি। এর কারণ সম্ভবত, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই উইলিয়াম মটন, জেমস লঙ, দ্বারকানাথ বসু, কানাইলাল ঘোষাল প্রমুখের চেষ্টায় সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল তা কবির অজানা ছিল না। তাহলেও মেয়েলি ছড়া সংগ্রহের সঙ্গে কিছু কিছু ধাঁধা[৫], 'প্রবাদের ছড়া' তিনি সংগ্রহ করেছিলেন[৬]। তবে এ বিষয়ে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা কবি করেননি।

অপরপক্ষে নিজের লেখায় প্রবাদ-প্রবচন, বাগ্‌ধারা, ধাঁধা ইত্যাদির সুনিপুণ প্রয়োগ ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লোকপ্রিয় প্রবাদগুলির 'সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনার সরসতা'-কে কাজে লাগিয়ে নিজের রচনাকে যেমন এপ্রিগ্রামিক তীক্ষ্ণতা দান করেছেন তেমনি 'এতো বড় রঙ্গ জাদু'[৭] কিংবা 'পায়ে ধরে সাধা/রা নাহি দেয় রাধা'[৮]র মতো ধাঁধার ব্যবহারেও তিনি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় বেশ কয়েকটি রবীন্দ্ররচনার নামকরণ অতি পরিচিত প্রবাদ দিয়ে—যেমন, 'একটা আষাঢ়ে গল্প', 'উলুখড়ের বিপদ', 'কড়ায় কড়া কাহনে কানা', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'চোখের বালি' ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো প্রবাদ প্রবচন কিংবা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে দেখতে পাই। এগুলি কবির প্রিয় এবং অতিপরিচিত ছিল বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসাবে 'শিলা জলে ভাসে', 'ভিটেয় ঘুঘু চরানো', 'ঊনপঞ্চাশ বায়ু', 'দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা', 'খোঁড়ার পা খানায় পড়া' প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

নিজের লেখায়; সে কবিতা, গদ্য যাই হোক না কেন প্রবাদ, প্রবচন, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা খণ্ডপ্রবাদ, বাগধারা, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা ইডিয়মকে নানাভাবে বিচিত্র শিল্প চমৎকারিত্বে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবাদের প্রয়োগ প্রযুক্তির এই নির্মাণ কৌশল রবীন্দ্র রচনাকে শুধু নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেনি তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার পাঠককেও বিস্মিত করেছে। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের দু'টি বিপদ নিয়ে প্রবাসী পত্রিকায় 'যাত্রীর ডায়ারি' (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংকলিত হবার সময় লেখাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'সাহিত্যে নবত্ব'। লেখাটির সূচনায় একটি প্রবাদকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন প্রাবন্ধিক। যে দেশে পাঠক সমাজ শক্তিশালী, সেখানে লেখককেও ভেবেচিন্তে উচ্চমানের লেখা লিখতে হয়; 'কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যবসা সেখানে চলে না।' তুচ্ছ 'দিন আনি দিন খাই তহবিলের ওজনে'র সাহিত্যকে তিনি 'বনেদি' সাহিত্য বলতে অপারগ। বিষয়টিকে বুদ্ধির চাতুর্যে অসাধারণ ভাবে একটি প্রবাদের সাহায্যে তুলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথ। মূল প্রবাদটি আমাদের অতি পরিচিত—'আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে লাভ কি।'[৯] রবীন্দ্রনাথ প্রবাদটিকে ভেঙে ধ্বনির সাদৃশ্যে নতুন শব্দ জুড়ে নিজের বক্তব্যকে পাঠকের মর্মে গেঁথে দিলেন। লিখলেন—''সেখানকার বড়ো মহাজনদের কারবার আধা [<আদা] নিয়ে নয়, পুরো নিয়ে। তাদের আধা'র ব্যাপারী বলব না, সুতরাং জাহাজের খবর তাদের মেলে।''

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য নেড়ে চেড়ে মনে হয়েছে প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্রবন্ধ বা গদ্য সাহিত্যে; আর সবচেয়ে কম প্রযুক্তি লক্ষ করা গেছে কবিতায়। তবুও অল্প যে কয়টি প্রবাদের প্রয়োগ দেখা গেছে তার সবকটিই বস্তুমূলক কবিতায়—ভাবমূলক কবিতায় একেবারেই নয়। প্রথমজীবনে (১৮৮৬ খ্রিঃ) ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চমৎকার পত্র কবিতায় 'সবুরে মেওয়া ফলে' প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন কৌতুক রঙ্গের বাতাবরণে। খবরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছেন কবি—

"কল্পতরু তলায় থাকি
নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে।"

—চিঠি (শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু) সংযোজন, 'কড়ি ও কোমল'

সুবিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারার ব্যবহার অজস্র—কয়েক সহস্র। কবি-কৃত-প্রয়োগ-প্রযুক্তির পদ্ধতি স্বরূপ সহ সেগুলি সংকলন করলে একটি ছোটো খাট পুস্তিকাও হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে তার সবগুলি উল্লেখ করা তেমন প্রয়োজনীয় নয়। কেবলমাত্র নমুনা হিসাবে রবীন্দ্ররচনার প্রতিটি শাখা থেকে (কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি) পাঁচ সাতটি করে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার সংকলন করা যেতে পারে।

(ক) কাব্য

১. "সুখ নেই, আছে শান্তি, ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
'বিমুখা বান্ধবা যান্তি' বুঝিয়াছি সার।
* * *
তবু কেন খিটিমিটি মাঝে মাঝে কড়া চিঠি
থেকে থেকে দুচারটি চোখা চোখা বুলি।
'পেটে খেলে পিঠে সয়' এই তো প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে থাকি।
বিষম উৎপাদ এ কী হায় নারদের ঢেঁকি
শেষকালে এ যে দেখি ঝগড়ার মতো।"

—(পত্র, মানসী)

এখানে 'বিমুখা বান্ধবা যান্তি' একটি সংস্কৃত প্রবচন, 'পেটে খেলে পিঠে সয়' বহুল প্রচলিত প্রবাদ এবং 'নারদের ঢেঁকি' প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা খণ্ড প্রবাদ।

২. "তাইনাশাস্ত্রে করে মানা
দুধ কলায় পুষতে সাপের ছানা।"

—(মায়ের সম্মান, পলাতকা)

এক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রবাদ-'দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।'

৩. "নামজাদা দানুবাবু
রীতিমতো খরচে
অথচ ভিটেয় তার
ঘুঘু সদা চরচে"

—(৫৪ সংখ্যক কবিতা, খাপছাড়া)

এখানে ব্যবহৃত প্রবাদ 'ভিটেয় ঘুঘু চরা।'

৪. ‘‘দাঁয়েদের গিন্নিটি
কিপটে সে অতিশয়,
পান থেকে চুন গেলে
কিছুতে না ক্ষতি সয়।’’

—(৭৪ সংখ্যক কবিতা, খাপছাড়া)

এখানে যে প্রবাদটি প্রযুক্ত তাহল—‘পান থেকে চুন খসা।’

৫. ‘‘আমি যত গোলে পড়ি
শুনি নানান বাক্যি
খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে
আমিই তাহার সাক্ষি।’’

—চিঠি (শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু) ‘কড়ি ও কোমল’ সংযোজন।

এখানে ব্যবহৃত প্রবাদটি হল ‘খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।’

অল্প হলেও কবিতায় প্রবাদের এরকম আলংকারিক ব্যবহার অভিনব।

(খ) নাটক

১. ‘‘প্রথম পথিক—জব্দ বলে জব্দ। তাকে নাকের জলে চোখের জলে করব’’
—(দ্বিতীয় দৃশ্য, পথিকদের কথোপকথন, প্রকৃতির প্রতিশোধ)

২. ‘‘শিরোমণি—কাশীধামে বৃষ্টি হল আর খড়দহে পঙ্গপালে ধান খেলে’’।
—(গুরু বাক্য, হাস্যকৌতুক)

৩. মনসুখ চাষা ... —‘‘ওই যে কথায় বলে—আছে যার বুকের পাটা যমরাজকে সে দেখায় ঝাঁটা।’’ —(প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, রাজা ও রানী)

৪. ‘‘চন্দ্রকান্ত—হায় পোড়া কপাল। মাথা নেই তার মাথাব্যথা।
...একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, শিকি পয়সার ফাউ দেননি।’’
—(দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, গোড়ায় গলদ)

৫. ‘‘কেদার—রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব।
—(দ্বিতীয় দৃশ্য, বৈকুণ্ঠের খাতা)

৬. ‘‘ক্ষীরো— মরা পাখিরেও শিকার করে
তবে তো বিড়াল মুখেতে পোরে।’’ —(লক্ষ্মীর পরীক্ষা)

৭. ‘‘লক্ষেশ্বর—ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি।’’
—(দ্বিতীয় দৃশ্য, শারদোৎসব)

৮. ‘‘ইশা খাঁ—শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না।’’
—(তৃতীয় দৃশ্য, মুকুট)

নাট্যসংলাপে প্রবাদের ব্যবহার চরিত্রগুলির মুখের কথাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছে।

(গ) ছোটগল্প

১. ‘দেনাপাওনা’ গল্পে রামসুন্দরের বেহাই রায়বাহাদুরের সংলাপ—‘‘একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।” —(দেনাপাওনা)

এক্ষেত্রে ইঙ্গিত করা প্রবাদটি হল—‘ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ’।

২. ‘‘নবদ্বীপের মহাপুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন।” —(রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)

এখানে উল্লিখিত প্রবাদটি হল ‘পুরুষের ভালোবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা।’[১১]

৩. ‘‘ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব।” —(শাস্তি)

এখানে প্রাসঙ্গিক প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ‘ঝড়ের আগে ছোটা’।

৪. ‘‘চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, এমন কি ধরা পড়িলেও।” —(অধ্যাপক)

এখানে প্রাসঙ্গিক প্রবাদ ‘চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদিনা পড় ধরা।’

৫. ‘‘প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম পাড়া নিয়ে একটা গুজব আছে।” —(ঘোড়া, লিপিকা)

প্রাসঙ্গিক প্রবাদটি হল ‘ঘোড়ার ডিম’ অর্থাৎ ‘অলীক বস্তু’।

কবিতা বা নাটকের ক্ষেত্রে প্রবাদগুলির ব্যবহার যেমন অখণ্ড রূপে, গল্পে উপন্যাসে তেমন নয়। রবীন্দ্রনাথের আখ্যানবিশ্বে প্রবাদগুলির শৈলীগত প্রযুক্তি একটু ভিন্ন গোত্রের। দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রবাদগুলি ভেঙে নিজের ভাষায় এক একটি বাক্যে উপস্থাপিত করেছেন তিনি।

(ঘ) উপন্যাস

১. ‘সাপের পাঁচ পা দেখা’—প্রচলিত এই প্রবাদটির উল্লেখ পাওয়া যায় ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসে যখন রুক্মিনী প্রহরীদের বলেছেন—

‘‘তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে,
তোমরা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ।
পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে।” —(বউ ঠাকুরানীর হাট)

এখানে উক্ত ‘পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে’ও একটি প্রচলিত প্রবাদ।

২. ‘রাজর্ষি’তে রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে বলেছেন—
‘‘তুমি কিনা আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা, হইয়া বসিয়াছ।”
—(রাজর্ষি, ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ)

এখানে উল্লেখিত প্রবাদ ‘বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা।’

৩. ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে আশা বিনোদিনীকে বলেছে—
‘‘তোমাদের ওসব কবিতার কথা আমার আসে না ভাই,—কেন বেনা বনে মুক্তা ছড়ানো।” —(চোখের বালি, ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ)

এখানে ‘বেনা বনে মুক্ত ছড়ানো’ প্রবাদটি ব্যবহৃত।

৪. ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে জগমোহন বলেছে,
“তোমার এঁটো পাতার অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ।”
—(চতুরঙ্গ, জ্যাঠামশায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

‘কুকুর ভোলানো’—একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা খণ্ড প্রবাদ।

৫. ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে মধুসূদন কুমুকে বলেছেন—
“আমি তোমার দাদার সেই মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারি।” —(যোগাযোগ, পরিচ্ছেদ ২৫)

মূল প্রবাদটি হল—

‘এক হাটে বেচতে পারে,
আর এক হাটে কিনতে পারে।’

(ঙ) প্রবন্ধ ও সমধর্মী গদ্যরচনা

১. “ঘরের গৃহিনী যেখানে বউকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।” —(ছাত্র শাসনতন্ত্র, শিক্ষা)

এখানে ব্যবহৃত প্রবাদ—‘ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।’

২. “আমি মনে মনে ভাবলেম, ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না।” —(প্রথমপত্র, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র)

এখানে উল্লেখিত প্রবাদ—‘মশা মারতে কামান দাগা।’

৩. “ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার শখটা পুরুষের, তার একমাত্র কারণ, ঘরের খাওয়াতে তাকে প্রাণের শাসন মানতে হয়, কিন্তু বনের মোষ তাড়ানোতে প্রাণের প্রতি তার যে রাজভক্তি নেই, এইটে প্রচার করবার একটা উপলক্ষ জোটে—সেটাকে সে পৌরুষ মনে করে।” —(পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪)

এখানে যে প্রবাদটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হল ‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।’

৪. “প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই কি মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়?” —(অবস্থা ও ব্যবস্থা, আত্মশক্তি ও সমূহ)

এখানে উল্লেখিত প্রবাদ ‘ভাগের মা গঙ্গা পায় না।’

৫. “অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।” —(হিন্দু মুসলমান, কালান্তর)

এখানে উল্লেখিত প্রবাদ ‘চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া।’

৬. “আমি বললুম তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িশ তাহলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব। তারা বললে, একি মাছের তেলে মাছ ভাজা।” —(পল্লীর উন্নতি, পল্লীপ্রকৃতি)

এখানে উল্লেখিত প্রবাদ ‘মাছের তেলে মাছ ভাজা।’

৭. “বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় না বটে, কিন্তু সে কখন? যখন বাঘও পূর্ণতা পাইয়া উঠিয়াছে, গোরুও পূর্ণ গোরু হইয়াছে।” —(সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য)

এখানে উল্লেখিত প্রবাদ ‘বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া।’

(চ) চিঠিপত্র

১. ‘‘প্রবাদ আছে, কাজ না থাকলে লোকে জ্যাঠাইমার গঙ্গা যাত্রা করে—সুবিধামতো অনাবশ্যক জ্যাঠাইমা প্রায়ই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, তখন নিজের মনটাকেই নিয়ে পড়তে হয়।” —(ছিন্নপত্রাবলী, ২৫০ সংখ্যক পত্র)

এখানে উল্লেখিত প্রবাদ—‘জ্যাঠাইমার গঙ্গাযাত্রা’।

২. ‘‘কল্যাণীয়েষু, ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে দৌড় মারে, এই জন প্রবাদটা মনে রেখো।”

—(ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮০ পৃ. ২৭)

এখানে উক্ত জন প্রবাদ ‘ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়।’

৩. ‘‘আমার কথা যদি বলো আমার রুচিটা কনের ঘরের মাসি বরের ঘরে পিসি, দুপক্ষের ভোজেই আমি লুচি সন্দেশ লুটি।”

—(দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ. ২৬)

এক্ষেত্রে উল্লেখিত প্রবাদ ‘কনের ঘরে মাসি, বরের ঘরে পিসি’।

৪. ‘‘গোরু মেরে জুতোদান বলে একটা প্রবাদ আছে, কর্ত্তারা আমাদের গোরুও মারচে, আমাদের জুতোও দান করচে। একে বলে শূ-শাসন।”

—(কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, সুরের গুরু, রবীন্দ্রনাথ ও গুরুদেবের পত্রাবলী, পৃ. ১০০)

এখানে উল্লেখিত প্রবাদ ‘জুতো মেরে গোরু দান।’

৫. ‘‘আমাদের দেশে প্রবাদ আছে তিন শত্রু, তিন খানা কাগজের বোঝা মাথায় লইলেন এ সংবাদে আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপান্ন লোকবাক্যে আমি বিশ্বাস করি না—অনেক সময় কেবলমাত্র তিপ্পান্নতেই নৌকাডুবি ঘটে। শাকের আঁটিতে ভার নাও বাড়তে পারে, কিন্তু ভার সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ নষ্ট করিবার পক্ষে ঐ টুকুই যথেষ্ট।”

—(রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, চিঠিপত্র, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৮৪)

এখানে তিনটি প্রবাদের উল্লেখ আছে। যথা—

(i) তিন শত্রু

(ii) যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন

(iii) শাকের আঁটি

তিন

প্রথম জীবনে ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা, বিভিন্ন লোকসংগীত, বাউলগান প্রভৃতি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের যে উৎসাহ ছিল, সে আগ্রহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি পরিণত জীবনেও। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে সুধীরচন্দ্র মজুমদার তাঁর ‘বাগধারা সংগ্রহ’ বইটি উপহার দিলে, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ (বাগধারা) গুলি সংগ্রহ করতে শুরু করেন তিনি সম্ভবত ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ (১৯৩৮) বইটি লেখার উপকরণ হিসাবে। জীবনের প্রান্ত সীমায় এ বিষয়ে কবির অনুসন্ধিৎসা তথা ‘প্যাশন’

আমাদের বিস্মিত করে। মোট ৮০টি বাগ্‌ধারা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। একটি খাতায় চারপৃষ্ঠা ধরে সেগুলি লিখে রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাগধারা (idioms) সংগ্রহ

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত ১৫৯ নং পাণ্ডুলিপিতে[১২] রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে আমাদের দেশে প্রচলিত যে বাগধারাগুলি সংগৃহীত আছে সেগুলি সংকলিত করা হল এখানে—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৬]

১। চুলোয় যাক্‌গে।
২। ভাতে মারা।
৩। চালচুলো নেই।
৪। পেটে পেটে বদমাইসি।
৫। হাতে হাতে ফল।
৬। মণিকাঞ্চন যোগ।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৭]

৭। পাততাড়ি গুটিয়ে নেওয়া।
৮। দোকানপাট বন্ধ করা।
৯। তিন কুলে কেউ নেই।
১০। সাতপুরুষ বা চোদ্দ পুরুষের সাধ্যি।
১১। সাত জন্মে।
১২। মরবার অবকাশ।
১৩। পিটিয়ে লম্বা।
১৪। মেরে লাট করা।
১৫। হাত নিশপিস।
১৬। গোলে হরিবোল।
১৭। হাড় ভাজা ভাজা।
১৮। লোপাট করে দেওয়া।
১৯। পিটটান।
২০। বুকের পাটা।
২১। সাতবাঁও জলের নিচে।
২২। কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
২৩। ছাতি ফুলিয়ে।
২৪। ল্যাজ গুটিয়ে নেওয়া।
২৫। হাত সুড় সুড়।
২৬। পাড়া মাৎ করা।
২৭। রেগে আগুন।
২৮। মারমূর্তি।
২৯। পাড়া মাথায় করা।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৮]

৩০। গা জ্বালা করে।
৩১। পিত্তি জ্বলে যায়।
৩২। বুক জুড়িয়ে যাও।
৩৩। তুলো ধুনে দেওয়া।
৩৪। পাড়ায় পাড়ায় টী টী করা (দুর্নাম)।
৩৫। বুদ্ধির ঢেঁকি।
৩৬। ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির।
৩৭। ঘেন্না পিত্তি।
৩৮। হাড় জ্বালাতন।
৩৯। হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।
৪০। তেলে বেগুনে জ্বলে।
৪১। মাটির মানুষ।
৪২। বাগে পেলে হয়।[১৩]
৪৩। দা কুমড়ো।
৪৪। হেসে অজ্ঞান।
৪৫। হাসতে হাসতে পেট ফাটা।
৪৬। আদায় কাঁচকলা।
৪৭। ভাসুর ভাদ্র বৌ।
৪৮। মরে ভূত হয়ে যাওয়া।[১৪]
৪৯। কানে তালা ধরানো।

৫০। ভিটেয় ঘুঘু চরানো। ৫১। ভিটে মাটি উচ্ছন্ন।
৫২। একূল ওকূল দুকূল যাওয়া। ৫৩। সাতেও নেই পাঁচেও নেই।
৫৪। হেস্তনেস্ত করা। ৫৫। ছাতি ফেটে যাওয়া।
৫৬। সাতপাঁচ ভেবে। ৫৭। গায়ে ফুঁ দেওয়া।
৫৮। নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো। ৫৯। চেঁচিয়ে মাৎ।
৬০। শুকনো কাট খোট্টা। ৬১। আষ্টে পৃষ্টে বাঁধন।
৬২। মাথায় মাথায় ভাবনা। ৬৩। পাঁচ ভূতে লুটেছে।
৬৪। ভূতের কের্তন।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৯]

৬৫। পাশ কাটিয়ে যাওয়া। ৬৬। ঘাড়ে এসে পড়া।
৬৭। মরে গেলেও ওমুখো হব না। ৬৮। আকাশ থেকে পড়া।
৬৯। আকাশ পাতাল ভাবনা। ৭০। হাতে কলমে।
৭১। উঠে পড়ে লাগা। ৭২। হাড় কালি করে দিলে।
৭৩। এক হাত নেওয়া। ৭৪। কারো পিছনে লাগা।
৭৫। বিদ্যে তো চোদ্দ পোওয়া। ৭৬। হেসে অজ্ঞান।
৭৭। জল হয়ে যাওয়া। ৭৮। মুখের মতো জবাব।
৭৯। জলের মতো সোজা। ৮০। কারো উপর চাল মারা।

সূত্র নির্দেশ ও মন্তব্য

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র দ্র. রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সং) খণ্ড-১০, পৃ. ২৩৭

২. দ্র. শোভনাসুন্দরী দেবী : জয়পুরী কথা, প্রত্যুষকুমার রীত সম্পাদিত (২০০৯) পৃ. ৯-৩০

৩. সাধনা, পৌষ ১৩০১, পৃ. ১৯০-১৯১

৪. দ্র. বাংলাভাষা পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্ম শতবার্ষিক সং) খণ্ড-১৪, পৃ. ৪৬৩-৪৬৪

৫. বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে ‘রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়া’ নামাঙ্কিত একটি ফাইল আছে। (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৪৬৫)। এই ফাইলের আলগা কাগজে নানা জনের হস্তাক্ষরে ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে প্রথম গুচ্ছের তৃতীয় উপগুচ্ছের কাগজগুলিতে পাঁচটি ধাঁধাও লেখা আছে। সেগুলি প্রকাশ করা হল :

ক. এক থালা সুপুরি
গুন্‌তে না পারে বেপারি।—(তারা)

খ. বন থেকে বেরল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।—(আনারস)

গ. তেল কুচ কুচ পাতা
ফলে ধরে আটা
পাক্‌লে অমৃত মত,
বিচি গোটা গোটা। —(কাঁঠাল)

ঘ. ছোট ছোট ডালে
কেষ্ট ঠাকুর দোলে। —(বেগুন)

ঙ. হাতা আছে মাতা নেই,
পেট ঝল্ ঝল্ করে।
বাঘ নয় ভালুক নয়
আস্ত মানুষ গেলে। —(জামা)

৬. দ্র. অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলেভুলানো ছড়া (১৪০২), পৃ. ১৮, এবং ১০৫-১০৭

৭. দ্র. রঙ্গ, প্রহাসিনী।

৮. দ্র. গুপ্তধন, গল্পগুচ্ছ।

৯. দ্র. সুশীলকুমার দে: বাংলা প্রবাদ, পঞ্চম সং (২০০২) পৃ. ১২, ৩৮৬ সংখ্যক প্রবাদ।

১০. দ্র. সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী, ১৯৬৮ সং পৃ. ৮৫

১১. প্রবাদটির অনেক পাঠান্তর আছে।

১২. পাণ্ডুলিপি পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, নির্মীয়মান তালিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৮

১৩. রবীন্দ্রনাথ লিখে কেটে দিয়েছেন।

১৪. ঐ

স্বীকৃতি : বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন ও শ্রীমতী প্রমা পাল।

রবীন্দ্রনাথ : ছুটির নিমন্ত্রণে

তরুণ মুখোপাধ্যায়

একজন কবি বা লেখকের ব্রত কি? এর উত্তর দিয়েছেন এমিল জোলা—No day without a line. যা পারো, যতটুকু পারো লেখো। লেখা ছাড়া কোনো লেখকই বাঁচতে পারেন না। বাঁচা উচিত নয়। নিন্দুক বা ঈর্ষাকাতর অক্ষমের দল যতই গালাগালি দিক, কুৎসা রটাক, তবু লিখে যেতে হবে। ভালো বা মন্দ বিচারের দায় মহাকালের। সমকালের করতালি বা নিন্দায় কিছু যায়-আসে না। ভবভূতির মতো এই প্রত্যয়ে স্থির থাকা দরকার, নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীতে কোনোদিন কোনো সমানধর্মা জন্ম নেবেন। রবীন্দ্রনাথ সৌভাগ্যবান, জীবৎকালেই তিনি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা পেয়েছিলেন। অনলস সাহিত্যচর্চাও করেছেন। তাঁর জীবনপঞ্জি ও দিনপঞ্জি ঘাঁটলে দেখা যাবে, কোনো মুহূর্তই তিনি অপচয় করেননি। সম্ভবত তাঁকেই আমরা যথার্থ 'কলম-পেষা মজুর' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য অর্থে বলেছিলেন) বলে অভিহিত করতে পারি। এমন পরিশ্রমী মানুষের জন্য অবকাশ বা ছুটি তো জরুরি। শুধু কি লেখা? তিনি তো কর্মীও। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, সমবায় ব্যাঙ্ক, চাষবাস—কত কিছু তাঁর পরিকল্পনা আর রূপায়ণ। এমন মানুষ তাই সংগতকারণে বলতেই পারেন,

বিদায় দেহো, ক্ষম আমারে ভাই—
কাজের পথে আমি তো আর নাই। (বিদায়)

তবে আমরা জানি, সেইভাবে ছুটি নেওয়া তাঁর হয়নি। 'সমে' এসে গানের শেষে থামলেও, পুনরায় শুরু করেছেন। তাঁর গোধূলিবেলার কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণ দেখলে সেটা বোঝা যায়। পুনশ্চ, পরিশেষ, শেষ সপ্তক—শেষ হয়েও যা অশেষ। জীবনদেবতার কাছে তাঁর নম্র নিবেদনই সত্য,

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।

হয়তো এই কারণেই ছুটির প্রতি তাঁর ভারি লোভ। নিজেকে 'স্কুল পালানো ছেলে' বলতে গৌরব বোধ করতেন। কেননা স্কুলের রুটিন, নিয়মকানুন তাঁর সহ্য হতো না। শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্যা-শ্রম বা বিদ্যায়তন রচনা করেছিলেন, সেখানেও ছিল যতখানি পড়া, তার চেয়ে বেশি অবকাশ ও অবসর—ছুটির আমন্ত্রণ। কচিকাঁচাদের মন যাতে পড়ার চাপে নষ্ট কিংবা যান্ত্রিক না হয়, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

'ছুটি' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের কাছে কত প্রিয়, তার পরিচয় মেলে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্রে, সম্বোধনে। 'ভাই-ছুটি' কী মিষ্টি আহ্বান। কেন ছুটি? ছোট বৌ বলে আদরার্থে ছুটি নিশ্চয়।

তার চেয়ে আরো গভীরার্থ এই, যার কাছে মন খুলে কথা বলা যায়, যার পাশে বসলে বিশ্রামের আরাম ও শান্তি পাওয়া যায়, সেই তো 'ছুটি'। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী-কে নিয়ে অনেক জল্পনা, কুকথা আমরা শুনেছি। কিন্তু ভেবে দেখিনি, দাম্পত্য-সম্পর্ককে কবিগুরু কতটা মর্যাদা দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে মৈত্রেয়ী দেবী বা রাণী চন্দ, নির্মলকুমারী মহালনবীশকে কথাচ্ছলে কবি পত্নীহারা জীবনের নিঃসঙ্গতা বলেছেন। মন খুলে কথা বলার লোক নেই, এমন আক্ষেপ-ও শুনেছি। তাই কাদম্বরী দেবীর ছায়া তাঁরা জীবনে গভীরতর হলেও স্ত্রীর ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়নি। ''পূরবী'' কাব্যের 'কৃতজ্ঞ' কবিতাটি এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি।—

আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি—সবচেয়ে, মানি, তুমি ছিলে একদিন।

তাঁর ''ছেলেবেলা'' ও ''জীবনস্মৃতি'' পাঠেও আমরা দেখেছি কবি কেমন ছুটি-ব্যাকুল ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধেবেলা প্রাইভেট টিউটরের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা উপেক্ষা করে নিয়মিত আগমনে বালক-কবি শঙ্কিত হতেন। স্যারের কেন অসুখ করে না, ভাবতেন। স্কুলেও প্রত্যহ যেতে আপত্তি ছিল। উভয়ক্ষেত্রে অসুখের বাহানা করতেন। ছিনিয়ে নিতেন নিজের জন্য নির্জন অবকাশ। বাবা মহর্ষিদেবের তেতলার নিভৃত কক্ষে অদ্ভুত সব কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। পরবর্তী জীবনে এমনই ঔদাস্য, আলস্য আর ছুটি ভোগের ছবি পাই দুটি কবিতায়। ''ক্ষণিকা'' কাব্যের 'উদাসীন' কবিতাটি পড়া যাক—

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, ছুটিনে কাহারো পিছুতে;
মন নাই মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।

এবং তাঁর সিদ্ধান্ত, 'এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি, মন ফেলে তাই ছুটেছি'। অর্থাৎ মনে-র দাপট তাঁকে অস্থির করত, মনের তাড়নায় জড়িয়ে পড়তেন কাজে। আজ তার থেকেই মুক্তি। এই অবকাশটুকু কেমন? ''উৎসর্গ'' কাব্যের 'আমি চঞ্চল হে' কবিতায় (বা গানে) তার ধারনা পাই।—

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্রমাখানো অলসবেলায়
তরুমর্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে ওঠে গো আভাসি।

শুধু কি নিজের অবকাশ-যাপন? বন্ধুর কর্মব্যস্ততাও তাঁর পছন্দ নয়। ''মানসী'' কাব্যের 'শ্রাবণের পত্র' কবিতায় কবির অনুরোধ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে—

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম করো সায়, এসো চট্‌পট্‌।
শামলা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব
একা পড়ে মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌।

*　*　*　*　*

ছুটি লয়ে কোনমতে　　পোট্‌মান্টো কুলি রথে
　　সেজেগুজে রেলপথে করো অভিসার।

ইংরেজ সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে কবির হাহাকার—'শুধু কাজ, শুধু কাজ, শুধু ধড়্‌ফড়্'। তিনি নিজে অবশ্য 'মানসী' পর্বে অন্যরকম অবকাশরঞ্জন করেছেন।

এ চিরজীবন তাই　　আর কিছু কাজ নাই,
　　রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে　　তাহে ভালোবাসা দিয়ে
　　গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

একে আমরা বলতে পারি, কবির কাজ। কবির তো কর্মী হতে বাধা নেই। বরং কবি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় আমরা চন্দ্রভুক্ মানুষ বা গজদন্তমিনারবাসীকে কবি যখন ভাবি, সেটাই আমাদের প্রতারণা করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভ্রান্তি নিরসনে লিখেছেন 'কবি' নামে কবিতা।

কাব্য দেখে যেমন ভাবো
　　কবি তেমন নয় গো।
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
　　মনের সুখেই বয় গো। (ক্ষণিকা কাব্য)

তাহলে কবির জীবনেও আছে অবকাশ। নিরবচ্ছিন্ন কলমপেষা কিংবা কর্মজগতে পাক খাওয়া তাঁর নিয়তি নয়। শুধু কবি কেন, সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। কাজের সঙ্গে বিরাম বা ছুটি জড়িত না থাকলে দুই-ই নষ্ট হতে বাধ্য। ''বাতায়নিকের পত্র''-এ কবি লিখেছেন, একদল আছে যারা 'বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা লোকসান বলে গণ্য করে'। আরেকদল আছে, 'অহংকারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই, লোকসানকেও তারা লোকসান জ্ঞান করে না।' এ প্রসঙ্গে আমরা ভাবতে পারি ''রক্তকরবী'' নাটকে বিশু পাগলের কথা। চন্দ্রার কথার উত্তরে ফাগুলাল যখন বলে, 'যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই', তখন বিশুর সংলাপ—

আমাদের না আকাশ, না আছে অবকাশ—তাই
বারো ঘন্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া
করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে।
যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।

কাজ আর ছুটির দ্বান্দ্বিকতাও বিশুর কথায়, চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

> একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে—বলছে 'কাজ করো' অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে —বলছে 'ছুটি! ছুটি!'

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'কাজ' মানেই 'জ্বালা' যন্ত্রণা; আর 'ছুটি' মানে 'মায়া', আনন্দ। যক্ষপুরীর রাজা কর্মপাকে বাঁধা। তাই তিনি ছুটি কি জেনেও তার নাগাল পান না। বরং ছুটির

বার্তাবহ রঞ্জন কিংবা বিশুর প্রতি হিংস্র হয়ে ওঠেন। নন্দিনী যখন বলে, রঞ্জন 'যেখানে যায়, ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।' কাজের রশি খুলে দেয়। শুনে রাজা বলেন, 'নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব?' সেইসঙ্গে জানাতে ভোলেন না 'রক্তকরবীর মধু দিয়ে' ঐ ছুটিকে ভরিয়ে রাখে নন্দিনী। ঈষৎ আপত্তি জানিয়ে নন্দিনী বলে,

> ছুটি কী করে মধুতে ভরে তার জবাব রঞ্জনকে
> চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

প্রত্যুত্তরে রাজার ক্রুদ্ধ স্বর শুনি, 'সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়।' তিনি অসুন্দর তাই তাঁর হাতে 'বীণার তার বাজে না ছিঁড়ে যায়।' যারা বৈষয়িক, কর্মী, অতি ব্যস্তলোক তারা এই অসুন্দরের প্রতিনিধি। ছুটির মধুপানে তারা আগ্রহী নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। বন্ধুত্ব-ও নেই।

"Crisis in Civilisation and other Essays" সংকলনে রবীন্দ্রনাথের, একটি প্রবন্ধের নাম "The Philosophy of Leisure'। এখানে কবি 'Leisure' বলতে কী বুঝিয়েছেন তা দেখার আগে Oxford Advanced Learner's Dictionary'র শব্দার্থ ব্যাখ্যা দেখে নিই।

1. time that is spent doing what you enjoy when you are not working or studying;
2. no prticular activities;
3. without hurrying;
4. a man/woman who does not have to work.

তাঁর প্রবন্ধের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় জানাচ্ছেন—"In my country, the cultivation of leisure has been a vital necessity'. তার কারণ 'restless activity'তে আমাদের শরীর ও মনের তাপমাত্রা সমতা পায় না। জীবনযাপন তথা জীবিকার জন্য কঠোরতর শ্রম করতে হয়। তুলনায় অবকাশ, ছুটি, বিশ্রাম কমই মেলে। অরণ্য, জীবজন্তু ও মানুষের তুলনা করে তিনি এও দেখিয়েছেন, 'race of life'-এ মানুষই 'has the materials of his living'। বুদ্ধি, শ্রম, শক্তি ছাড়া তার চলে না। এর ফলে ব্যস্ততা তার সদাসঙ্গী। বাস্তব সংসারে বড়ো কথা ইউটিলিটি। এজন্য মানুষ প্রকৃতির নিয়ম ভাঙতে দ্বিধা করে না। বন কেটে বসতি বানায়। অন্নময় কোষকে তৃপ্ত রাখতে গিয়ে আনন্দব্রহ্ম উপেক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের চোখে এই যুগ 'the modern age is riding on a tornado of rapidity'। এই অবস্থায় আলস্য, অবসর, অবকাশ বা ছুটি শব্দগুলি গুরুত্ব পায় না। মানুষ শুধু ছুটে চলে—'reckless rush of ambition' জীবনের আনন্দময় ছন্দ নষ্ট করে আনে সুখের মোহ। জাপান ভ্রমণে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, তারা একদিকে মান্য করে ঐতিহ্য, অতীতের আদর্শ, সৌন্দর্যবোধ। অন্যদিকে চলমান জীবনের সঙ্গেও তারা যুক্ত। যেজন্য তাদের এত উন্নতি। আমাদের দেশে সবই একঝোঁকা। ''মানসী'' পর্বে তিনি 'তৈলঢালা স্নিগ্ধতনু' বাঙালি সন্তানদের আলস্যপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন, আলস্য ও অবকাশ তো এক নয়। কাজ, অর্থ, উন্নতি, সুখ, সমৃদ্ধির হাতছানিতে মানবসভ্যতা বিপন্ন। উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> And we say time is money, while we forget to say that leisure is wealth, the wealth which is a creation of human spirit whose material may be money. (Do)

অবিরাম কাজ, লোভ, ক্ষমতার দম্ভ নিয়ে আসে বিকলাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি; অপ্রসন্ন মন; 'spiritual dyspepsia'। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে মুক্তি আনে ছুটি, অবকাশ। যে কাজ অবকাশহীন, তার মূল্য নেই। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে বলেন, সমগ্র পৃথিবী বা মাটির পরিসরেই এককণা বালি মূল্য পায়। ঘন পাতার মাঝখানেই তো ফুলের শোভা বাড়ে। কাজের সৌন্দর্য বিশ্রাম বা ছুটি। রৌদ্রদগ্ধ আকাশ জুড়ে যখন ঘন বর্ষার মেঘ পুঞ্জিত হয়, তখন প্রকৃতিও ছুটির আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠে। ''স্ফুলিঙ্গ'' কাব্যে সেকথা রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন—

দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা
মেঘের দলে জুটি
লিখে দিল—আজ ভুবনে
আকাশ-ভরা ছুটি।

পাছে কেউ তাঁকে আলস্যবিলাসী, কর্মবিমুখ ভাবে, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সতর্ক থাকতেন। শেষ জীবনে লেখা ''নবজাতক'' কাব্যে নিজেকে রোমান্টিক ও 'রসতীর্থ পথের পথিক' ঘোষণা করেও বলেছিলেন, যেখানে 'নির্মম কর্ম'

সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ'
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

উত্তরীয় ফেলে বর্ম পরে নিতেও তাঁর আপত্তি নেই। কেননা সুন্দর ও ভৈরবের দ্বৈত ভূমিকা তিনি স্বীকার করেন। ''সাহিত্য'' গ্রন্থে 'আলস্য ও সাহিত্য' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেও বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। সূচনায় বলেছেন,

> 'অবসরের মধ্যেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া আলস্যের মধ্যে নহে। মানবের, সহস্র কার্যের মধ্যে সাহিত্যও একটি কার্য।'
>
> পরে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, অবসর আর আলস্য সমার্থক নয়। কারণ, 'আলস্য কার্যের বিঘ্নজনক এবং অবসর কার্যের জন্মভূমি।'

সাধারণত, সাহিত্যচর্চাকে লোকে সুনজরে দেখে না। ভাবে, এর চেয়ে অকর্ম কিছু নেই। যে লেখে, সেও অকর্মণ্য। এমন ভাবনার প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যও মানব সমাজের জীবন, স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়।' কল্পনা জীবন, মন ও চেতনার পুষ্টি দান করে। তবে যে-কল্পনা ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষের ও সমাজের কাজে লাগে না। এদেশে যথার্থ 'কাজের লোক' নেই, সকলে 'বিষয়ী লোক' বলেই রবীন্দ্রনাথের ধারণা। তাই বিষয়ীরা অবকাশ, অবসর, ছুটির তাৎপর্য বোঝে না। সভ্যতার অতি প্রসারও ক্ষতিকর। কাজের চাপে, সভ্যতার উন্নতিকল্পে সকলে এতই ব্যস্ত যে, সাহিত্যের কথা ভাবার সময় নেই। বরং সংবাদপত্র পাঠ কিংবা রেডিও, টি.ভির খবরে সকলে আগ্রহী। একালে সিরিয়াল যে 'সাহিত্য' দৃশ্যময় করে তাতে আপামর জনসাধারণ মগ্ন হয়ে থাকে। এই ভীতিকর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, প্রকৃতিকে ধ্বংস নয়, লালন করতে হবে। তবে মানুষ ও সভ্যতা বাঁচবে। তাঁর 'সাহিত্য ও সভ্যতা' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

> '...সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। ইহার জন্য অনেকখানি আকাশ, অনেকখানি সূর্যালোক, অনেকখানি শ্যামলভূমির আবশ্যক।'

মনের বিকাশ, চেতনার উন্নতি ঘটাতে হলে অবকাশ দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঘুরে ফিরে তাই ছুটির কথা বলেন। ছুটির জয়গান করেন। যা কখনই তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় না।

তাহলে ছুটি উপভোগের, আস্বাদনের, অবকাশ যাপনের। নিয়মের বাঁধন ছিঁড়ে মুক্ত হওয়ার আনন্দ-ই ছুটি। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র যেমন রবিবার এলে উল্লসিত হয়। রেনি-ডে পেলে আত্মহারা হয়। ''শেষের কবিতা'' উপন্যাসে যতিশঙ্কর যখন অমিত রায়কে বলে, 'আজ আমি ছুটি চাই।' তৎক্ষণাৎ—

> অমিত পুলকিত হয়ে বললে, 'পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন?'

আর ''খেয়া'' কাব্যে কবি তাঁর জীবনদেবতার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন,

দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
আকাশ লয় না লুটি। (ভার)

এই ছুটি মনকে প্রসারিত করে। কবির মন-বালক গেয়ে ওঠে ''আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।' কতভাবে ও ভাবনায় কবিগুরু তাঁর ছুটিকে দেখেছেন তার ছোট্ট একটি তালিকা বিনা মন্তব্যে সাজিয়ে দিতে পারি।

১. আজকে আমার ছুটি, আমার শনিবারের ছুটি (শিশু কাব্য)

২. দাও না ছুটি, ধরো ত্রুটি, নিই নে কানে (গীতিমাল্য)

৩. ছুটি তোরে পেতেই হবে (গীতালি)

৪. তোমার ছুটি নীল আকাশে (পলাতকা কাব্য)

৫. আমার ছুটি চারদিকে ধু-ধু করছে
ধান কেটে নেওয়া খেতের মতো (পত্রপুট)

৬. দুই চোখে তার নীল আকাশের সুদূর ছুটি (বীথিকা কাব্য)

৭. আমার ছুটি অবেলাতেই (গীতিমাল্য)

৮. তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে (গীতবিতান)

৯. যেমন নিত্য কাজের পালা
তেমনি নিত্য ছুটি (ছড়ার ছবি)

১০. বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর (পরিশেষ কাব্য)

১১. পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই। (গীতিমাল্য)

তবে বালক বা পড়ুয়াদের প্রসঙ্গে কবি বারেবারে ছুটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেন তাঁর বাল্যকাল ফিরে এসেছে শিশুর মধ্যে। যে শিশু বলে, 'মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল।' তার বদলে সে চায় 'পড়া-পড়া খেলা।' শিশুমনের এই মুক্তি-ভাবনা তাঁকে উতলা করে। তাঁর ''ডাকঘর'' নাটকের অমল যেজন্য পণ্ডিত হতে, পুঁথি পড়তে চায় না। তার মন ধেয়ে চলে পাঁচমুড়ো পাহাড়ে বা ক্রৌঞ্চদ্বীপে, ঝর্ণাধারায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেই বাঁধন ছেঁড়ার সাধনায় বিশ্বপথিক হন। ঘর নয়,পথ তাঁকে ডাকে।

গানে মন ভাসিয়ে দেন। 'পথে-চলার নিত্য রসে' সিক্ত হয় তাঁর মন। ''শান্তিনিকেতন'' ভাষণমালায় কবি বলেছেন,—

> '...আনন্দ করতে যেদিন চাই, সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেননা হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাইনে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখা রূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়—আপনার সমস্ত কর্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাই নে।'

এই যে অনবকাশ, এই যে ছুটে চলা, এর পরিণাম ভালো হতে পারে না। সব কিছুতেই ছন্দ আছে; তা অমিল পয়ার হলেও। সেখানে যতিচিহ্নের হেরফের হলেই সর্বনাশ। তাঁর জীবনেশ্বরীর কাছে কবি শুধু 'মালঞ্চের মালাকর' হওয়ার আবেদন জানান। যারা কর্মবীর তাদের সঙ্গে তিনি প্রতিযোগিতায় না গিয়ে চান—'অকাজের কাজ যত,/আলস্যের সহস্র সঞ্চয় শত শত/আনন্দের আয়োজন।' সব কাজ থেকে অবসর নিতে চান। কারণ, জানেন—

> বিরাম কাজেরই অঙ্গ একসাথে গাঁথা,
> নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা। (কণিকা)

আমাদের জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে 'ছুটি-লোকে' মিলিত হওয়ার উদার আমন্ত্রণ।

দেশ-কাল ভাবনা : আমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই মহান কবি-দার্শনিক আঁরি ফ্রেদেরিক আমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথের বয়সের পার্থক্য ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। আমিয়েল জন্মেছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায়—১৮২১ সালে। আর রবীন্দ্রনাথের জন্ম ভারতবর্ষের কলকাতায়—১৮৬১ সালে। আমিয়েল যখন মারা যান তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় কুড়ি বছর। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বা পত্রীয় যোগাযোগের সুযোগ তাঁদের ছিল না। তা সত্ত্বেও আমিয়েলের 'Journal Intime' ছিল রবীন্দ্রনাথের 'মনের মতো'[১] গ্রন্থ এবং আমিয়েল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর 'অন্তরঙ্গ বন্ধু'[২]। এই অ-লৌকিক বন্ধুত্বের প্রধান কারণ ছিল জগৎ ও জীবনকে বিচারণার ক্ষেত্রে উভয়ের ধ্যান-ধারণাগত সাধর্ম্য। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে তাঁদের মধ্যে কোথাও কোনো দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বা বিপ্রতীপতা ছিল না। তবে অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন একই পথের পথিক।

দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়—দেশ-কাল। অনেকদিন পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক দার্শনিকই জগৎ-বিচারের ক্ষেত্রে দেশ ও কালের অনপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও দার্শনিক বার্গসঁর তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার জগতের সবকিছুকেই যুগপৎ দেশ-কালের সৃষ্টি এবং দেশ ও কালকে পরস্পর সাপেক্ষ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর কথায়—'there neither is Space without Time nor Time without Space—'[৩]। আমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ধারণা ছিল এ ভাবনার সমান্তরাল। যদিও আমিয়েল ছিলেন আলেকজাণ্ডারের পূর্ববর্তী তা সত্ত্বেও তাঁর অপৃথক দেশ-কালের আলোচনা থেকে বোঝা যায় জাগতিক বিষয় বিচারের ক্ষেত্রে তিনি এ দুইয়ের যৌগপত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও যে দেশ-কালের যৌগপত্যের ধারণায় আস্থাশীল ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর এই উচ্চারণ থেকে : 'বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশকালের মাত্রা-অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়।'[৪]

আমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই দেশ-কালকে অসীম বলে জেনেছিলেন। অনেক আগে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনও দেশ কালকে নিত্য ও অসীম, বিভু ও নিরবয়ব, এবং অখণ্ড বলে প্রচার করেছিলেন। জার্মান দার্শনিক কান্টও তাঁর 'Critique of Pure Reason'-এ দেশ-কালের অসীমতা ও অখণ্ডতার কথা বলেছিলেন এইভাবে : 'Space for us is an infinite magnitude extending in three dimensions ... Time is an infinite magnitude in one dimension.'।[৫] তাঁর মতে দেশ ও কালের অনুভব a-priori pure intuition। এসব ভাবনার সমীপবর্তী হয়ে আমিয়েলও 'limitless duration'[৬] এবং 'boundless space'[৭]-এর কথা বলেন। এবং সেই সঙ্গে বলেন —'Time and Space are fragments of the infinite for the use of finite creatures'।[৮] এরই পাশাপাশি

আমিয়েল কাল সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে জানিয়েছিলেন—'In itself it is relative'।[৯] দেশ ও কাল সম্পর্কে এই আপেক্ষিকতার কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন দার্শনিক লাইব্‌নিজও। এস. ক্লার্ককে লেখা তাঁর তৃতীয় চিঠিতে তিনি বলেছিলেন—'I have said more than once that I hold space to be something relative, as time is.'।[১০] সেজন্যেই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে দেশ-কালের প্রত্যক্ষ আসলে ভ্রম-প্রত্যক্ষ বা illusion। আমিয়েলও সময় সম্পর্কে বলেন—'Time is the supreme illusion'।[১১] কান্টের মতো রবীন্দ্রনাথের ধারণাতেও দেশ-কালের অনুভবপূর্বতঃসিদ্ধ বা a-priori। সেজন্যেই তিনি বলতে পারেন—'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-'পরি/চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান'।[১২] তাঁর কাছে দেশ-কাল যেমন অখণ্ড ও অসীম তেমনি আপেক্ষিক বা মায়াও। তাই 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'-তে তিনি বলেন, 'ঘড়ি-ধরা অবিশ্বাসী, সময়কে আপেক্ষিক অর্থাৎ মায়া বলে মানতে চায় না, সে জানে না—নিমেষই বল আর লক্ষ যুগই বল, দুয়ের মধ্যেই অসীম সমানভাবে আছেন—'।[১৩] দেশ ও কালকে যে তিনি অখণ্ড মনে করেন তা বোঝা যায় ইন্দিরাদেবীকে লেখা 'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠি থেকে : 'আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম'।[১৪] এই অখণ্ড অন্তহীন কালকে কবি প্রায়ই তাঁর সাহিত্যে মহাকাল নামে অভিহিত করেন। এই মহাকাল যাবতীয় আঘাত-সংঘাত বিরোধ-বিসম্বাদের ঊর্ধ্বে। তাই সে বৈরাগী, সে সন্ন্যাসী। 'শেষ সপ্তক'-এর কবিতায় তার উদ্দেশেই বলেন—'মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি'।[১৫] সম্ভবত এই মহাকালের ধারণা থেকেই কবি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান 'সময়হারা সময়'[১৬]-এর ধারণায়। 'শেষ সপ্তক'-এর 'মর্মবাণী' কবিতায় তিনি যে 'কালহীনতা'র[১৭] কথা বলেন বা এলিয়ট তাঁর 'Burnt Norton' কবিতায় যে 'Timeless'[১৮] -এর কথা বলেন তার থেকে এই 'সময়হারা সময়'-এর ধারণা কিছুটা পৃথক। কেন না কালহীনতা বা timelessness কালের অনুপস্থিতি বা অস্তিত্বহীনতার কথা বলে। কিন্তু 'সময়হারা সময়'-এর ধারণায় আছে কালহীনতার মধ্যেও এক ধরনের সময়ের অস্তিত্ব —যা প্রচলিত ধরনের সময়ের তুলনায় পৃথক। তা একই সঙ্গে 'আছে' এবং 'নেই'-এর সমন্বিত রূপ। অস্তিত্ববান অথচ অক্রিয়। আমিয়েলও লক্ষ করেন সময় অস্তিত্ববান হয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রিয়াসাধনে ব্যর্থ : 'I am conscious of the river of time passing before and in me, of the impalpable shadows of life gliding past me, but nothing breaks the cataleptic tranquility which enwraps me.'[১৯]

কান্টের ধারণায় দেশ ও কাল অবভাসিক (phenomena)। তারা অনুভবের দুটি আকার বা forms of intuition। তাই তাদের কোনো বাস্তব অবস্থান নেই—তাদের অবস্থান আমাদের মনে। আমিয়েলও একইরকমভাবে বলেন—'time and number are contained in the mind'।[২০] রবীন্দ্রনাথও একই ভাবনার অংশীদার হয়ে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন—'সময়ের মাপ পঞ্জিকায় নয়, চিত্তে'।[২১]

আমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই কালের সর্বগ্রাসী ও বিনাশী শক্তির কথা স্বীকার করেন। আমিয়েল তাঁর জার্নালে লেখেন—'Yes, and the implacable flight of time is driving us towards the grave.'[২২] রবীন্দ্রনাথও একই ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'বলাকা' কাব্যের ৭ সংখ্যক কবিতায় : 'একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান/কালস্রোতে ভেসে যায় জীবনযৌবন ধনমান'।[২৩]

সেন্ট অগাস্টিন্ তাঁর 'Confessions'-এ কালের বর্তমান রূপকেই একমাত্র বলে মনে করেছিলেন। অগাস্টিনের এই কালতত্ত্বের ব্যাখ্যায় রাসেল বলেছিলেন—'Neither past nor

future, he says but only the present, really is.'[২৪] আমিয়েলও সময়ের কেবল বর্তমান রূপকেই স্বীকার করেন : 'For the supreme intelligence there is no time; what will be, is.'[২৫] অগাস্টিন ও আমিয়েলের মতো রবীন্দ্রনাথও কালের বর্তমান রূপকেই শুধু সত্য বলে মনে করেন। তাঁর মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ আসলে বর্তমানেরই প্রসারিত রূপ—যা প্রাসঙ্গিকভাবে উইলিয়াম জেমসের Spacious Present সূত্রের কথা মনে করিয়ে দেয় আমাদের। কবির 'রক্তকরবী' নাটকে দেখি এরই সাহিত্যিক প্রকাশ : 'পুরাণ ব'লে কিছু নেই। বর্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলছে। ... মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে : মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্চে'।[২৬] আমিয়েল অবশ্য অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো সংস্রব লক্ষ করেননি—অতীতকে শুধু অতীত বলেই জেনেছিলেন—'What is past is past—'।[২৭] রবীন্দ্রনাথ এই সংস্রব লক্ষ করেন ও তার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন বলেই রচনা করেন 'ফাল্গুনী' নাটক—যেখানে পাকা চুলের সাদা রঙে আছে প্রাণের সব রঙের বাসা।

আমিয়েল সেন্ট্ অগাস্টিনের মতোই ঈশ্বরকে সময়ের অতিবর্তী বলে জেনেছিলেন। আমিয়েলের মতেও : 'God is outside time because He thinks all thought atonce.'[২৮] আর অগাস্টিনের ধারণায়—'He stands eternally outside the stream of time'।[২৯] ঈশ্বর ও সময় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এঁদের ভাবনারই সমান্তরাল। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে কবি এ বিষয়ে লিখেছিলেন—'আমরা যেখানে আরম্ভ দেখি তার পূর্বেও তাঁর প্রকাশ—আমরা যেখানে অন্ত দেখি তারপরেও তাঁর প্রকাশ।'[৩০] 'পূরবী' কাব্যের 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবি যে কালের অধীশ্বরের কথা বলেন—তা থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে সেই অধীশ্বর কালের অতিবর্তী। কাল তাঁরই অধিগত, অন্তর্বর্তী ও অন্তঃস্যূত।

তথ্যসূত্র

১. ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১১, পত্রাঙ্ক ১০০, লেখার তারিখ : ২২ মার্চ ১৮৯৪, পৃ: ২০১

২. তদেব

৩. Space Time and Deity (Vol.-I)—S. Alexander, Macmillan And Co. Ltd., London, Reprint 1934, p. 44

৪. পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৫৯৬

৫. A History of Modern Philosophy—William Kelley Wright, The Macmillan Company, New York, Fifteenth Printing, 1958, p. 266

৬. Amiel's Journal—Henri Frederic Amiel, Tr. by Mrs. Humphry Ward, Macmillan And Co., London, Reprint 1921, p.112

৭. তদেব

৮. তদেব, পৃ. ১০১

৯. তদেব, পৃ. ১১২

১০. A History of Philosophy (Vol.-IV)—Frederick Copleston, S.J. Image Books, Doubleday, New York, January 1994, p. 303

১১. Amiel's Journal—Henri Frederic Amiel, Tr. by Mrs. Humphry Ward, Macmillan And Co., London, Reprint 1921, p. 101
১২. সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়/প্রভাতসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৬৩
১৩. পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৫৯৬
১৪. ছিন্নপত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১১, পত্রাঙ্ক ১২১, পৃ. ১৮৫
১৫. ৭ সংখ্যক/শেষ সপ্তক, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ১৫৫
১৬. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা—৭০০০০৯, কোজাগরী পূর্ণিমা ১৪১২, পৃ. ১১৯-১২০
১৭. মর্মবাণী/শেষ সপ্তক (সংযোজন), রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ২৩২
১৮. Burnt Norton/Collected Poems (1909-1935)—T.S. Eliot, Faber & Faber, Fifteenth Impression, p.190
১৯. Amiel's Journal—Henri Frederic Amiel, Tr. by Mrs. Humphry Ward, Macmillan And Co., London, Reprint 1921, p. 72
২০. তদেব, পৃ. ২২৮
২১. চিঠিপত্র (একাদশ খণ্ড)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৮১, পত্রাঙ্ক ৪৬, পৃ. ৭২
২২. Amiel's Journal—Henri Frederic Amiel, Tr. by Mrs. Humphry Ward, Macmillan And Co., London, Reprint 1921, p. 127
২৩. ৭ সংখ্যাক/বলাকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৪৭৭
২৪. History of Western Philosophy—Bertrand Russell, George Allen & Unwin Ltd., London, Ninth Impression 1965, p. 352
২৫. Amiel's Journal—Henri Frederic Amiel, Tr. by Mrs. Huonphry Ward, Macmillan And Co., London, Reprint 1921, p. 101
২৬. রক্তকরবী/রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৬৭৬
২৭. Amiel's Journal—Henri Frederic Amiel, Tr. by Mrs. Humphry Ward, Macmillan And Co., London, Reprint 1921, p. 106
২৮. তদেব, পৃ. ১১২
২৯. History of Western Philosophy—Bertrand Russell, George Allen & Unwin Ltd., London, Ninth Impression 1965, p. 352
৩০. ভক্ত ও কবি—সম্পাদনা রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-৭০০০২০, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৬২

‘পড়েছি আজ রেখার মায়ায়’

গোপা দত্ত ভৌমিক

১৯৩৭ সালের ১১ জুন আলমোড়া থেকে শিল্পী বন্ধু রোদেনস্টাইনকে একটি চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ :

> “With the ruthless freedom of an invader, I have been playing havoc in the complacent and stagnant world of Indian art and my people are puzzled for they do not know what judgement to pronounce upon my pictures. But I must say I am enjoying hugely my role as a painter.”[১]

১৯৩৭ এ অবশ্য চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি বিশ্বপরিচিতি পেয়ে গিয়েছেন। বিদেশে এবং দেশে বহু প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে। জীবনের উপান্তে এসে নতুন একটি শিল্পমাধ্যমের প্রতি তাঁর এই প্রবল উন্মুখতা সে যুগে বিস্ময় এবং সংশয়ের মিলিত প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছিল। তার ঢেউ আজও থামেনি। একদিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, অন্যদিকে যথেষ্ট বিরূপতা, দুটি ধারাই এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট। তা থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে, রবীন্দ্র চিত্রকলা অব্যর্থ ধাক্কা দেয় দর্শকের মনে, প্রশংসাকারী বা নিন্দুক কেউই অন্যমনস্ক থাকতে পারেন না। এবং এই নাড়া দেবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন, রোদেনস্টাইনকে লেখা চিঠিই তার প্রমাণ। বেশ বোঝা যায় নির্মম স্বাধীনতা নিয়ে এই ঝাঁপিয়ে পড়াটা তাঁকে গভীর আনন্দ দিচ্ছে।

রবীন্দ্রচিত্রকলা নিয়ে বিভ্রান্তির একটা কারণ নিশ্চয়ই আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্যজগতের সঙ্গে একে মেলাতে না পারার সংকট। তাঁর সাহিত্যজগতের সুকুমার প্রধানত শান্তশ্রী আবহের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে এইসব ছবি, তীব্রবর্ণের প্রবল উচ্চারণ, অজানা, অবাস্তব নানা ধরনের পশুপক্ষী, ডিম্বাকৃতি রমণীমুখে অদ্ভুত রহস্যময়তা, প্রকৃতিও যেন থমথমে কালিমাখা স্তব্ধতা নিয়ে আসে। প্রচলিত অর্থে সুন্দর নয় এমন সব মুখশ্রী, কিন্তু নাক বা চিবুকের তীক্ষ্ণতায় স্পষ্ট চারিত্র্যের অধিকারী, কখনো কিম্ভূতের দল এসে হাজির হচ্ছে বলিষ্ঠ রেখায়। কিন্তু শুধুই কি উদ্ভট? আমরা রঙ আর রূপের প্রাণবন্ত সুষমাকেও ঢেউ তুলতে দেখি ছবির পর ছবিতে। আড়াই হাজার ছবি ভরপুর হয়ে আছে বৈচিত্র্যে আর নবত্বে।

জীবনের শেষ সতেরো বৎসরে অজস্র স্কেচ আর ছবি এঁকে নাটকীয় একাকিত্বে ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিক যুগ প্রবর্তন করলেন একজন কবি। এইসব ছবিতে কলারসিক যা দেখে স্তব্ধ হয়ে যান তা হল প্রচণ্ড মৌলিকতা।

এমনকি যে রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে অনেক সময় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছেন তিনিও এই অত্যাশ্চর্য মৌলিকতা এবং প্রাণশক্তি লক্ষ না করে পারেননি, স্টার্জ মূরকে লিখেছেন :

> “The drawings are extraordinarily vital they show none of the weakness of the revivalist schools which stand for modern Indian art.”[২]

এই অত্যাশ্চর্য মৌলিকতাই তাঁকে স্বতন্ত্র বলয়ে ঘিরে রেখেছে, না হলে শিল্প-মাধ্যমের পরিবর্তন খুব বিরল কিছু ঘটনা নয়। সাহিত্য থেকে চিত্রকলা বা চিত্রকলা থেকে সাহিত্যে আনাগোনা করেছেন অনেকেই। ব্লেক, ভিকটর হিউগো, উইলিয়াম মরিস, ডি. এইচ. লরেন্স এঁদের চিত্রচর্চার কথা আমরা সবাই জানি। ব্লেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনাও করেছিলেন আনন্দকুমারস্বামী বোস্টন প্রদর্শনীর সময়। চিত্রকলা যে কত প্রবল ভাবে সৃজনশীল চিত্তের শিকড়ে টান দেয় তা অনুভব করি যখন দেখি রিচার্ড ফাইনম্যানের মতো বিজ্ঞানমগ্ন মানুষ চুয়াল্লিশ বছরের প্রান্তে এসে দূরাবস্থিত এই মাধ্যমে অনুরক্ত হয়ে পড়েন।[৩] উল্টোটাও ঘটে, স্পেনের কিউবিস্ট চিত্রকর রাফায়েল আলবার্তি কবিতায় মনোনিবেশ করে যশস্বী হয়েছেন।[৪]

চৈনিক কবি-চিত্রকর মি-ফেই-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য দেখেছেন মনোরঞ্জন গুপ্ত।[৫] মি-ফেই-এর কাছে ছবি ছিল বিশ্রামকালীন এক আনন্দের খেলা। কিন্তু দু-একটি দিকে মিল ধরা যেতে পারে, সামগ্রিক ভাবে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিঃসন্দেহে তিনি অদ্বিতীয় এ ব্যাপারে।

আত্মপ্রকাশের সাধনায় কবি ব্যাপৃত গোটা জীবন। প্রকাশের সব মাধ্যমগুলিকে তিনি পরখ করে দেখতে চান। সাহিত্যে যেমন কোনো ধারাই তাঁর অস্পর্শিত থাকে না, গানে, অভিনয়ে মেলে ধরেন নিজেকে, এমনকি গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করেন বিশ শতকের সূচনায় বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি এবং নিজেই কলম ধরে লিখে ফেলেন 'বিশ্ব পরিচয়ে'র (প্রকাশ ১৩৪৪) মত অসাধারণ বই, তিনি যে কালি, কলম এবং পরে রং তুলি নিয়ে এমন একটা ব্যাপার করে তুলেছেন এতে সত্যিই অবাক হবার কিছু নেই। তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর নজিরবিহীন তারুণ্য আমরা দেখি রবীন্দ্রসৃজনকলার নানা স্তরে। চিত্রকলাও সেই ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রৈতিরই একটা দিক।

আর এরই মধ্যে ধরা পড়েছে সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া। মানব-সভ্যতার বর্বরতার পুনরাবির্ভাব দেখছেন চারপাশে—ছবির মধ্যে জেগে ওঠে তার বিরুদ্ধে ধিক্কার আর অভিশাপ। কলারসজ্ঞ সমালোচকরা এইসব ছবিতে দেখেছেন তীব্র যন্ত্রণা, সংশয় আর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সমকালীন ক্লেদাক্ত পৃথিবীর বর্ণনায় বারবার শেষ দুই দশকে তাঁর রচনায় দেখা দিয়েছে যে সব আদিম প্রতিমা, ছবিতেও তারাই ভিড় করে আসে লক্ষ করেছেন শঙ্খ ঘোষ।[৬] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও কদাকার অসম্পূর্ণ এই পশুদের প্রাগৈতিহাসিক মিছিলে সমসাময়িক দানবীয় নিষ্ঠুরতার ছায়াপাত দেখেছেন।[৭] অশ্রুকুমার সিকদারের মনে হয়েছে কবির শুভপরিণামী প্রত্যয়ে ক্ষয়জীবাণু প্রবেশ করেছে আর সেই দ্বিধান্বিত সংশয় ধরা পড়েছে অন্ধকারসংকুল চিত্রাবলিতে।[৮] আবার অবচেতনের আলোকে এই ছবিগুলির ব্যাখ্যা খুঁজেছেন অনেকেই। শিবনারায়ণ রায় অনুমান করেছেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার মধ্যে তাঁর সযত্ন নিরুদ্ধ প্রাক্‌চেতনিক সত্তা কোনো অপ্রস্তুত প্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর মনে হয়েছে ছবি আঁকার সঙ্গে কবির জীবনের দুটি প্রধান অভিজ্ঞতার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে :

> "প্রাণের যে 'ক্ষুব্ধ ডাক' ভাষায় এবং ব্যবহারে তবুও প্রকাশ করা গেলনা তারি তাড়না থেকেই কি ছবিদের জন্ম? তাঁর ছবির জগতের এক অক্ষ কি নতুন বৌঠানের আত্মহত্যা-জাত অন্ধকার পাপবোধ, এবং অন্য অক্ষ বিজয়ার ভাষাহীন ভালোবাসা?"[৯]

রবীন্দ্রজীবনের শেষপর্বের বিচিত্র ফসল এই চিত্রকলার উৎস নিরূপণে 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপির মস্ত একটি ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপির (রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি, ১০২) পৃষ্ঠা উল্টে গেলে প্রবল একটি বিস্ময় মনকে অভিভূত করে। পাতার পর পাতায় কাটাকুটিগুলিকে লুপ্ত

করে রেখার জাল বোনা হয়েছে। তৈরি হয়েছে অদ্ভুত, জটিল সব মূর্তি, কখনো বিচিত্র পাখি, কখনো ভয়ার্ত মনুষ্যমুখ। সর্বত্র চোখে পড়ে রেখার লীলাময় ছন্দ, এই কাটাকুটির পথ ধরেই কবির মধ্য থেকে উঠে এলেন একজন শিল্পী। 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি দেখলে মনে হয় সেই শিল্পীর প্রকাশিত হবার আকাঙ্ক্ষা যেন রেখার অস্থির নৃত্যে স্পন্দিত হচ্ছে। বুয়েনাস এয়ারিসে এই পাণ্ডুলিপি থেকেই ভাবী শিল্পীকে আবিষ্কার করেছিলেন ভিকটোরিয়া ওকাম্পো, রেখার ছন্দ আর ধ্বনিতে যে শিল্পী কান পেতে আছেন।

কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি তো আকস্মিক বিস্ফোরণ নয়, প্রদীপ জ্বালার আগেও তো সলতে পাকানোর একটা পালা আছেই। এই সূত্রে আমরা তাকিয়ে নিতে পারি পূর্ববর্তী যুগে কবির চিত্রচর্চার দিকে। কারণ এই ধারণাটা এখনো একেবারে মুছে যায়নি যে চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয়টা খানিকটা আকস্মিক ও অতর্কিত।

প্রকৃতপক্ষে ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বহুদিনের। 'জীবনস্মৃতি'তে ড্রইং শিক্ষকের উল্লেখও আছে কিন্তু সেকালের প্রথামত সেই ড্রইংশিক্ষা নিশ্চয়ই নিবদ্ধ ছিল অনুলেখন কিংবা স্কেল, ডিভাইডার কম্পাসের ব্যবহারে। ড্রইং ক্লাসে নয়, ছবি দেখার আনন্দ পেয়েছেন কখনো প্রচুর ছবিওয়ালা 'ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ' থেকে, কখনো চুনকাম খসা দেয়ালে নানা উদ্ভট রেখাচিত্রে। এই শেষোক্তচিত্র স্বভাবতই সাধারণ চোখে পড়ার কথা নয়। বালক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভবিষ্যতের চিত্রীর সম্ভাবনা যেন 'জীবনস্মৃতি'র ঐ ছোট্ট ঘটনাটির কোরকে গুহাহিত হয়ে আছে। বিদেশে তরুণ বয়সে দেখেছেন বিখ্যাত চিত্রসম্ভার, সেই মুগ্ধতার চিহ্ন আছে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে।

আক্ষরিক অর্থে 'ছবি আঁকা'র অভ্যাসও তাঁর ছিল। সতেরো বছরের রচনার দুর্লভ নিদর্শন 'মালতী পুঁথি'তেও লেখার পাশে চিত্রনিদর্শন আছে। ১৮৮৯ সালের পকেটবুকেও দেখা দিয়েছে পক্ষীমূর্তি, মানবমুখ। লেখার পাশাপাশি এই সব আঁকিবুকি ছাড়াও পেনসিলে কারো কারো ছবি তিনি এঁকেছেন জানিয়েছেন ইন্দিরাদেবী।[১০] আর এই সব দুর্লভ প্রতিকৃতির কিছু কালের গ্রাস এড়িয়ে রক্ষাও পেয়েছে। ইন্দ্র-কিশোর কেজরিওয়াল সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির মধ্যে সাতটি ১৮০০-১৮৮৬ সালে আঁকা। তার মধ্যে রয়েছে মৃণালিনী দেবীর তিনটি পেনসিলে আঁকা প্রতিকৃতি ও দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো পাকা হাত না হলেও এই পেনসিল ড্রইংগুলিতে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় রয়েছে।[১১] ১৮৯২ সালের ছবির 'হেঁয়ালি খাতা' (২য় সংখ্যক) তেও কয়েকটি পেন্সিল স্কেচ রবীন্দ্রনাথের করা। ১৮৯৩ সালে আঁকা বেশ কিছু ছবি আছে পূরণচাঁদ নাহারের সংগ্রহে, নন্দলাল বসু এগুলির প্রতিলিপি রচনা করেছিলেন। দীপাধার, কয়েকটি উপর্যুপরি সাজানো ঘট, গাছ, পাখি, আর মুখোশ এগুলির বিষয়বস্তু।

১৮৯৩ সালেই ইন্দিরাদেবীকে চিঠিতে লিখেছেন যে চিত্রবিদ্যার প্রতি হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকেন তিনি, কিন্তু পাবার আশা নেই—বয়স চলে গেছে।[১২] মন্তব্যটির আয়রনি আজ আমাদের কৌতুক জাগায়। জগদীশচন্দ্র বসুকে ১৯০০ সালে লেখা একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন একটি স্কেচবুক নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকার কথা :

> ''বলা বাহুল্য সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন এর জন্যে তৈরি করচিনে এবং কোনো দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। ... সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা এবারে ষোলো আনা কুঁড়েমিতে মন দেব তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে।''[১৩]

এই স্কেচবুকটি পাওয়া যায়নি এবং মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আশঙ্কা সত্যে পরিণত হবে কবি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি। কিন্তু ঐ চিঠির শেষ অংশটি আমাদের খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। তাঁর অবকাশের সঙ্গে ছবি আঁকা তাহলে জড়িয়ে ছিল সেই সময়েও।

এই দৃষ্টান্তগুলি এটা প্রমাণ করে যে ছবি আঁকার প্রবল একটা বাসনা তাঁর মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল এবং কিছু অভ্যাসও ছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালে 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপিতে যে বাঁধাভাঙা বন্যা দেখা দিয়েছে তেমনটি আগে কখনো হয়নি, যদিও কাটাকুটিগুলিকে অবগুণ্ঠিত করে দেবার অভ্যাস তাঁর বরাবরই কিছু ছিল।

চিত্রকলার ব্যাপারে যাকে বলে নাড়া বেঁধে প্রথাসম্মত পাঠ নেওয়া তা অবশ্য কোনোদিনই তাঁর হয়ে ওঠেনি, এবং সঙ্গতকারণেই মনে হয় তাতে লাভই হয়েছিল, যদিও কবি আগাগোড়াই এই 'অশিক্ষিত পটুত্ব' নিয়ে কিছু দুঃখ ও সংশয়ে বিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু যদি গোড়া থেকেই শিল্পচর্চার বাঁধা পথে এগোতেন তবে সেকালের প্রচলিত ঔপনিবেশিক পটভূমিতেই তাঁর শিক্ষা চলত এবং ভারতীয় ও পারসিক শিল্পধারা এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং এশিয়ার জাতীয়তাবাদ জাগরণের প্রথম অধ্যায়ের অভিজ্ঞতা তাঁর ছবিতে থাকতে পারত।

যে আশ্চর্য মৌলিকতা তাঁর ছবিতে আমরা দেখি যৌবন ও মধ্যবয়সের নানা মন্তব্যে কিন্তু তার তেমন আভাস নেই। সেই সব শিল্পচিন্তা বরং অনেকটা গতানুগতিক। ১২ মে, ১৮৯৩ চিঠিতে লিখছেন :

> ''রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা গেল। আমার সত্যি বেশ লাগে। হাজার হোক, দিশি বিষয় এবং দিশি মূর্তি ও ভাব আমাদের কাছে কতখানি, এই ছবি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়।''[১৪]

অর্থাৎ চিত্রকলার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দেশীয়তার ওপর তিনি জোর দিচ্ছেন। কিন্তু শিবনারায়ণ রায় লক্ষ করেছেন,[১৫] ১৯০৯ সালে গগনেন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে কবি জানাচ্ছেন যে হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তিগুলি আর্য আদর্শের বিকৃতি বলে তাঁকে কিছুটা পীড়া দেয়। তাঁর ধারণা অনার্য প্রভাবের দ্বারা বিকৃত না হলে এদেশের শিল্প গ্রিক ধরনেই গড়ে উঠতো। কবির এই সব মতামত স্ববিরোধী কোনো সন্দেহ নেই।

তবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পুনরুজ্জীবনেরই একজন পৃষ্ঠপোষক ও প্রাচ্যসংস্কৃতির একজন ভাষ্যকার। দুই ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ যে নতুন শিল্প আন্দোলন প্রবর্তনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেছিলেন তিনি। তাঁদের উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি কলকাতায় তাঁর বাসভবনের একটা অংশে বিচিত্রা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে শিল্প আন্দোলনের এই দিকটির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েও ফেলেছিলেন অনেকটা।

কিন্তু ১৯২৪ থেকে নিজস্ব চিত্রচর্চার যে ধারা তিনি শুরু করলেন সেখানে কোনো জাতীয়তা বোধের গণ্ডি মানা হয়নি। মেজাজে তা জোড়াসাঁকো বাড়ির শিল্প সাধনা থেকে আলাদা। কিন্তু কবে থেকে এই নিজস্ব একক ভাবনার শুরু, এই জিজ্ঞাসা আমাদের নিয়ে যায় ১৯১৬ সালে কবির প্রথম জাপান-ভ্রমণের সময়টিতে। জাপান থেকে লেখা চিঠিপত্রে দেশের চিত্রকলা বিষয়ে একটা প্রবল অতৃপ্তি ফুটে উঠেছে। অবনীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে ক্ষোভ বেশ স্পষ্ট :

''জাপানে যতই ঘুরলুম দেখলুম ক্রমাগতই বার বার এইটে মনে হল যে আমার সঙ্গে তোমাদের

আসা খুবই উচিত ছিল। আমাদের দেশের আর্টের পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্যে এখানকার সজীব আর্টের সংস্রব যে কত দরকার সে তোমরা তোমাদের দক্ষিণের বারান্দায় বসে কখনও বুঝতে পারবে না। ... এখানে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে তোমাদের আর্ট ষোলো আনা সত্য হতে পারেনি।"[১৬]

একই সুর গগনেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতেও :

"গগন, তোমরা কবে ঘর থেকে একবার বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়বে? ... কিন্তু তোমাকে তাড়া দেওয়া মিথ্যে।"[১৭]

সমরেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, জাপানি আর্ট তাঁকে কতখানি নাড়া দিয়েছে, আবার সেই সঙ্গে এর অভাবাত্মক দিকটিরও বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মনে হয়েছে জাপানি আর্টে প্রকৃতিকে নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে, মানব হৃদয়ের গভীরতাকে তা ততটা স্পর্শ করেনি। জাপানের আর্টে কালা-গোরার পাশাপাশি ভারতবর্ষের রঙের গমকের কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে 'এইটেই ভারতবর্ষের দিক'। জাপানি শিল্পকলার তুলনায় ভারতীয় শিল্পকলার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর, কিন্তু এই মুহূর্তে সেই শিল্পকলা যেন কিছুটা নীরক্ত। রথীন্দ্রনাথকে জাপান থেকে লেখা চিঠিতেও এই প্রাণশক্তি পৌঁছনোর কথাই বলেন:

"আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর, সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার আছে এইকথা বরাবর আমার মনে হয়েছে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটখাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েছি। টাইকান, শিমোমুরার ছবি একদিকে খুব বড় আয়তনের, আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশেপাশের বাজে জিনিষ নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবলমাত্র সেইটেকেই খুব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। ... নন্দলাল যদি আসত তাহলে এখানকার এই দিকটা বুঝে নিতে পারত। ওদের কারো এখানে আসার খুবই দরকার আছে, নইলে আমাদের আর্ট একটু কুনো রকমের হবার আশঙ্কা আছে।"[১৮]

জাপানভ্রমণে মুকুল দে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী। তাঁর স্মৃতিচারণায় আছে কতখানি উৎসাহ নিয়ে জাপানি ও চীনা চিত্রকলার বিভিন্ন ধারার অনুধ্যান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

"তখন দেখেছি তিনি জাপানী ছবি দেখবার কোনো সুযোগই কিছুতেই হারাতেন না। মিঃ টি হারার চমৎকার চিত্রসংগ্রহ তিনি মাত্র শনি-রবিবারের জন্য দেখতে গিয়ে, ইয়োকোহামা শহরে প্রায় তিন মাস থেকে গেলেন—শুধু, জাপানী ও চীনা ছবির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধারা দেখবার জন্য।

১৯১৭ সালে তিনি যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলেন, স্থির করলেন শান্তিনিকেতনে একটা আর্টস্কুল খুলবেন এবং ১৯২০ সালে এই চিত্র-শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা হল।"[১৯]

জাপানের ক্যালিগ্রাফির প্রতি কবি কতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার স্মারক রূপে দোসরা আগস্ট ১৯৮৯ রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহে এসে পৌঁছেছে যে অমূল্য স্ক্রলটি তার উল্লেখ করা যেতে পারে। জাপানে অবস্থান কালে এতে 'শাক্যমুনি' শব্দটি এবং নিজের স্বাক্ষর বাংলা অক্ষরে লিখেছেন কবি, কিন্তু জাপানী Sumiestyle ক্যালিগ্রাফির ধরনে।[২০] ক্যালিগ্রাফি বা অক্ষর-লিখন শিল্পের উদ্ভব এবং সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছিল চীন দেশে। ক্যালিগ্রাফি শেখায় রেখা ও রূপের নানা বৈশিষ্ট্য—তার বলিষ্ঠতা, নম্রতা, নতোন্নত বিষমতা, রেখার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা, ভারসাম্য, দীর্ঘছন্দতা।

ক্যালিগ্রাফির এই বিশেষত্ব রবীন্দ্রচিত্রকলারও বৈশিষ্ট্য বটে, 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপিতে এই লক্ষণ ফুটে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রেই।

ছবির ব্যাপারে ১৯১৬ সালে কবির মনে একটা নতুন ভাবনার ঢেউ উঠেছিল, দেশীয় চিত্রশিল্পের অগ্রগতির বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল এটুকুই সব নয়। নিজে এগিয়ে আসার কথাও কি তখনি ভাবেননি তিনি? কোনো প্রথাগত শিল্পদীক্ষা নেই বলে হয়তো সংকোচ আছে মনে, কিন্তু মীরাদেবীকে লেখা চিঠিতে লক্ষ্য করি নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে শিল্পীসুলভ সচেতনা—

> ''আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্য ভাবে নিবেদন করতে পারলে না। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি ত করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও ত প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা ত আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম।''[২১]

১৯১৬ সালে অবশ্য তিনি হাতে কলমে করে দেখাতে পারেননি। কিন্তু তাঁর স্বভাবের এই লক্ষণটি চিরকালই প্রবল, কোনো কিছু উদ্যোগ প্রয়োজন হয়ে পড়লে, অন্যকে নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে কখনোই ক্ষান্ত হতেন না। 'আপনি আচরি' তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতেন। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তিনি অনুভব করেছিলেন তথাকথিত বেঙ্গল স্কুলের সম্ভাবনা ও শক্তি কিছুটা নিঃশেষিত হয়েছে। নতুনপথের সন্ধান করতে হবে। সেই সন্ধানের দায়িত্ব ক্রমশঃ নিয়েছেন নিজেই।

আপন চিত্রচর্চার প্রারম্ভটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "The only training which I had from my young days was the training in rhythm in thought, the rhythm in sound. I had come to know that rhythm gives reality to that which is desultory, which is insignificant in itself. And therefore, when the scratches in my manuscript cried, like sinners, for salvation, and assailed my eyes with the ugliness of their irrelevance, I often took more time in rescuing them into a merciful finality of rhythm than in carrying on what was my obvious task."[২২]

'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে এই ছন্দের খেলার। রবীন্দ্রচিত্তের অন্তর্নিহিত যে ছন্দবোধ এই সব লিপিচিত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সমগ্র চরাচরে যে কবি ছন্দের লীলা দেখেছেন তাঁর চিত্রাঙ্কনের সূচনায় যে এই তাগিদ থাকবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 'সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়'—এই কথাটাই তো কতো ভাবে কতো সুরে গোটা জীবন ধরে বলেছেন। বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যে ছন্দ জাগছে তার প্রতি উৎসুক কান পেতেছেন, দৃষ্টি মেলেছেন—'পূরবী'র পাণ্ডুলিপিতে দেখি এই রেখার নৃত্য।

লেখার খাতায় কাটাকুটিগুলিকে রেখাজালে অবলুপ্ত করার অভ্যাস তাঁর আগেও ছিল। এ তাঁর দীর্ঘদিনের একটি সংস্কার। খাপছাড়া কাটাকুটির অসঙ্গতি তাঁর চোখে সইত না। কিন্তু ১৯২৩-২৪ সাল থেকে দেখা গেল একটা নেশার মতো এই ব্যাপারটি তাঁকে পেয়ে বসছে। নন্দলাল বসুর অনন্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী—

> ''এখানে সেখানে আর একটু কারিকুরি করলেই কোনোটি ফুল, কোনোটা পাখি, কোনোটা বা অপরিচিত অদ্ভুত প্রাণী হেন সাকার শরীরী হয়ে উঠছে—ঠিকটি না হয়ে ওঠা পর্যন্ত লেখক হিসাবে লেখ-শিল্পী হিসাবে তাঁরও কিছুতে রেহাই নেই।''[২৩]

রবীন্দ্রনাথের সুছাঁদ হস্তাক্ষর থেকেই বোঝা যায় রেখার গতি তাঁর কতটা আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তাই ফসকে যাওয়া কোনো আকার, বা রেখা তাঁর রচনার মধ্যে প্রায় কখনোই চোখে পড়ে না। রেখার সঙ্গে রেখা মিলিয়ে গভীর একটা নান্দনিক অভিজ্ঞতা ঘটছিল তাঁর—এই অকুণ্ঠ আত্মউন্মোচনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেন এতখানি সময় দিচ্ছেন তিনি এই কাটাকুটির পেছনে। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন, ''মজা এই যে বাইরে কাজের ভাবনার দাবি যখন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, কবি তখনই ছবি এঁকেছেন সবচেয়ে বেশি।''[২৪] অপ্রগল্‌ভা অর্থহীনা রেখার সঙ্গে তখনি আলাপে মগ্ন হয়েছেন। ছবি আঁকাটা তাঁর কাছে একটা মনস্তাত্ত্বিক মুক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনের মধ্যে জমে থাকা চাপটাকে ছবির মাধ্যমে নামিয়ে হালকা হতে চাইছেন তিনি।

নোবেল পুরস্কার পাবার পর থেকে তিনি দেশের জনসাধারণের দৃষ্টির কেন্দ্রে, তাঁর নিভৃতচারী কবিস্বভাবের পক্ষে ব্যাপারটা খুব আরামপ্রদ হয়নি। সর্বদাই তাঁর মধ্যে জনতা ও নির্জনতা চেতনার একটা দ্বন্দ্ব আছে, এই সময়ে সেই দ্বন্দ্ব প্রায় চূড়ান্তে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যের অন্যত্রও তিনি যেন ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক এক সন্ত। এই ইমেজটাই প্রায় সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল।

অ্যান্ডরুজকে লেখা কবির চিঠিপত্রে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উদ্ধৃত করছি ১৯৩০ সালে শিল্পীবন্ধু রোদেনস্টাইনকে লেখা কবির একটি পত্রাংশ :

> "The artist in me ever urges me to be naughty and natural—but it requires good deal of courage to be what I truly am. Then again I do not really know myself and dare not play tricks with my nature. So the good for nothing artist must have for his bed-fellow the man of a hundred good intentions."[২৫]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ ও তৃতীয় দশকে মনের মধ্যে এই ভারটা বোধহয় সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছেন আর তখন রেখার জগতে অপরিসীম মুক্তির আনন্দ পেয়েছেন।

'রক্তকরবী'র পাণ্ডুলিপিতেই লাল কালো কালিতে গড়ে উঠছে একটি অদ্ভুত আকৃতি। 'পূরবী'র গোড়ার দিকের কবিতা 'যাত্রা' বা 'তপোভঙ্গে'র পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি থেকে গড়ে উঠছে বিচিত্র পক্ষীমূর্তি। এই নেশাটা ক্রমেই তাঁকে পেয়ে বসেছে। দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার সময় জাহাজে বন্যার মতো আসছে কাব্যসৃষ্টির আবেগ আবার কবিতার কাটাকুটি, সংশোধনগুলির কুশ্রীতা আবৃত করে ফুটে উঠছে কালি-কলমে আঁকা ছবির পর ছবি। এখানেই 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপির কবিতা আর ছবির নিগূঢ় যোগাযোগ। কীর্তি ও খ্যাতি সমাকীর্ণ জীবন—বিশ্বশান্তি মৈত্রী আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচারে উৎসর্গীকৃত জীবন, এরই মধ্যে কবির কর্মব্যস্ত চিত্তলোকের কপাটে বেজেছে এক অপার্থিব কঙ্কণ ঝংকার।

'পূরবী'র পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় দেখি বলিষ্ঠ, শক্তিময় রেখার ছন্দ। কলমের আঁচড়ে সাদা-কালোয় বৈপরীত্যে রচিত নকশা, জ্যামিতিক প্যাটার্ন, মনুষ্য মুখাবয়বের সঙ্গে লেখার লাইনের সঙ্গতি রেখে রূপ ফুটে উঠছে—কখনো ভীষণ, কখনো অদ্ভুত, অভিনব, অপ্রাকৃত। চোখে দেখলে বোঝা যায় কতোখানি জোরে তিনি কলম চালিয়েছেন, কোথাও হাল্কা অমনোযোগের ভাব নেই। এত চাপ দিয়ে এঁকেছেন কালি পাতা ফুঁড়ে ছোপ ফেলেছে পরের পৃষ্ঠায়। মনের মধ্যে জমে থাকা আবেগকে মুক্তি দিতে গিয়ে শিল্পীর যেন কোনো দিকে খেয়াল নেই। মনে পড়ে বহুকাল পরে রানী চন্দকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন আঁকবার সময় তাঁর পেনসিলগুলো কেন এত ভেঙে যায়— 'অবশ্যি আমি একটু চাপ দিয়ে আঁকি—মনটা জোরে চলতে থাকে কিনা।'[২৬]

নিঃসন্দেহে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার এইসব অঙ্কন, তার জন্য এত বিপুল সময় দেওয়া তাঁর কাছে খুব জরুরি হয়ে উঠেছিল। অবকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বারে বারেই বলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু অবকাশ আর আলস্য তাঁর কাছে কখনোই সমার্থক নয়। তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি দিনকে কীভাবে সৃষ্টিশীল করে তুলেছেন তার উদাহরণ দেওয়া তো বাহুল্যমাত্র। আমরা অনুভব করি 'বৃহৎ জীবনের পক্ষে বৃহৎ নির্জনতা, বৃহৎ একাকিত্বটাও একান্তভাবে জরুরী।"[২৭] অখণ্ড অবকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই আকুলতা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শিল্প-ভাবনার পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য। ১৩৩০ সনের ১৯ ফাল্গুন চীনযাত্রার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে কবি বলেছিলেন :

> "...সৃষ্টির বাজে-খরচের বিভাগেই অসীমের খাস-তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গি। যারা মুনফার হিসাব রাখে তারা বলে, এটা লোকসান; যারা সন্ন্যাসী তারা বলে, এটা অসংযম।
>
> ...লীলাময় মানুষ প্রকৃতিকে ডেকে বললে, 'আমি রসে ভোর, আমি তোমার তাঁবেদার নই, চাবুক লাগাও তোমার পশুদের পিঠে। আমিতো ধনী হতে চাইনে, আমি তো পালোয়ান হতে চাইনে, আমার মধ্যে সেই বেদনা আছে যা নিখিলের অন্তরে। আমি লীলাময়ের শরিক।'
>
> এই কথাটি জানতে হবে—মানুষ কেন ছবি আঁকতে বসে, কেন গান করে। কখনো কখনো যখন আপন-মনে গান গেয়েছি তখন কীটসের মতোই আমাকেও একটা গভীর প্রশ্ন ব্যাকুল করে তুলেছে, জিজ্ঞাসা করেছি—এ কি একটা মায়ামাত্র না এর কোনো অর্থ আছে। গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল।"[২৮]

এই কথাটি গোটা জীবনই নানা সুরে বলেছেন। ছবি আঁকাও সেই লীলার আসরে বিশ্বের মহাখেলা-ঘরের এক কোণে জমে উঠেছে। ১৩৩৮-এর ১৯ বৈশাখ হেমন্তবালাদেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—

> "আমি কর্মীও বটে—কিন্তু যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে আমি কারুকর্মের কর্মী। আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি, নাচি, নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি হাসাই, একান্তে কোনো একটামাত্র আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় রাখিনে। যারা আমাকে ভক্তি করতে চায় তাঁদের পদে পদে খট্‌কা লাগে। আমার এই চঞ্চলতা যদি না থাকত তবে কোনদিন হয়তো হাল আমলের একজন অবতার হয়ে উঠে ভক্তব্যূহের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়তুম।"[২৯]

যশের একটা মারাত্মক দায় আছে, আপন ভোলা, লীলারসিক শিল্পীমনকে যদি পদে পদে মনে রাখতে হয় 'কবিত্বশক্তির মাপকাঠি হাতে যারা গম্ভীর হয়ে বসে থাকে' তাদের কথা—খ্যাতি যে তখন কী নিষ্করুণ সংকট তৈরি করে রবীন্দ্রনাথকে বার বার তা উপলব্ধি করতে হয়েছে, যন্ত্রণা পেতে হয়েছে। 'পূরবী'র কবিতাগুলি লেখবার সময় তিনি যে সাময়িকভাবে এইসব সমালোচকদের ক্ষুরধার অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলেন কালিদাস নাগকে লেখা চিঠিতে তা অকপটে স্বীকার করেছেন। এসব কবিতা যেন একেবারেই আত্মগত সংলাপ। এমন কি বলে ফেলেন এতটাও—

> "এ কবিতাগুলো এখন ছাপবার দরকার নেই, আমার মৃত্যুর পরে ছাপিয়ো। তাছাড়া এগুলো নিয়ে কাগজে কাগজে হরির লুঠ দিয়ো না।"[৩০]

ছবি এঁকে যে তাঁকে যশস্বী হতে হবে না এটাও সর্বদাই একটা মস্ত বড়ো নিষ্কৃতির মতো মনে হয়েছে তাঁর। ১৯৩৪ সালে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন :

''সাহিত্যে একটা খ্যাতি পেয়েছি তার কাছে আমার দায় আছে, সে দায় বাঁচিয়ে চলতে হয়— কিন্তু যদি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে একটা ছবি আঁকতে থাকি—তাহলে যা তা আঁকতে দ্বিধা করিনে। লোকে যদি বলে আমি ছবি আঁকতে পারিনে, তবে তাতে সঞ্চিত যশের অপচয় ঘটে না। ... তাই আমার জীবন-যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে যখন আলো ম্লান হয়ে এসেছে তখন ইচ্ছা করে ছবি এঁকে সময় নষ্ট করি।''[৩১]

পূরবী রচনার সময় যখন তিনি কান পেতে দিচ্ছেন যেদিক থেকে সুর আসছে সেই দিকে, কবুল করছেন তিনি অস্থায়ীদের দলে, তখনি রেখার মায়ায় পড়ে তৈরি করেছেন নতুন শিল্পের সূচনাপর্ব। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে *পূরবীর* পাণ্ডুলিপিতে ১৯২৪ সালে কাটাকুটি থেকে গড়ে ওঠা বিস্ময়কর লিপিচিত্রের পর সত্যিকারের রংতুলির জগতে তিনি মগ্ন হলেন চার বছর পর ১৯২৮ সালে। ১৯২৪-এ ধারণা গড়ে উঠছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। ডায়রির পাতায় এই অভিযোগের বিষয়ে যে বিস্তৃত কৈফিয়ৎ দিয়েছেন কবি, তাতে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় এই কথাটাই—

''সৃষ্টির মূলে এই লীলা, নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি নেই।''[৩২]

আবার ১৯২৭ এবং ২৮ সালে আরেক ধরনের অভিযোগ উঠল কবির বিরুদ্ধে। ১৯২৭-এ ঢাকা থেকে 'প্রগতি' পত্রিকার তরুণেরা ঘোষণা করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ আর নেই। সাহিত্যিক রুচিবদলের হাওয়া উঠল, কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকাগুলির রবীন্দ্রবিমুখতা ঢেউ তুলতে লাগল, রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হল 'সাহিত্যের ধর্ম' (*বিচিত্রা*, ১৩৩৪, শ্রাবণ) এবং 'সাহিত্যে নবত্ব' (*প্রবাসী* ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ) এর মতো প্রবন্ধ, প্রতিআক্রমণ করতে ছাড়লেন না তিনি। বাদ-প্রতিবাদে ভরে উঠল বাংলাদেশের সাহিত্যাকাশ। কয়েকমাস পরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই ভিন্ন ভিন্ন, সাহিত্যরুচির মীমাংসা নিয়ে বসল আলোচনা সভা দুদিন ধরে। 'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোল-কালিকলম' এই দুই দলের বোঝাপড়ায় রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিতে হল। ৪ ও ৭ চৈত্র ১৩৩৪-এর এই দুটি আলোচনা সভায় মধ্যস্থতার প্রধান অংশ নিয়েছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও অপূর্বকুমার চন্দ। এই আলোচনা সভায় কবি যা বলেছিলেন তাতে অভিমানের সুর চাপা থাকেনি—

''আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। যদি বলেন, এ মত সেকেলে, পুরনো, তা হলে সেটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে রাজি আছি। যে মত নিয়ে কাজ করেছি, লিখেছি, সেটা সত্য জেনেই করেছি, তাকে যদি মূঢ়তা বলে বিচার করেন করুন। ... আমরা এতদিন যা ভেবে এসেছি সেটা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ উলটা রকমের ব্যাপার হবে, এরকমই যদি আপনাদের মত হয় বলুন।''[৩৩]

একদিকে যখন নতুন এই দ্বন্দ্ব চলছে, তখনি যেন এই কোলাহল থেকে ছুটি নেবার আয়োজনে তিনি রংতুলির জগতে ডুবে গেলেন। শুরু হল ছবির যুগ পুরোপুরি। নিজের সঙ্গে নিজের সংঘাত আর নিজের সঙ্গে সময়ের সংঘাত কবির মানসিকতার এই দুটি সূত্র ধরে মিলিয়ে নিতে পারি আমরা ১৯২৪ আর ১৯২৮-কে। দুটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন শঙ্খ ঘোষ

''ভাষাশিল্পের সঙ্গে সংঘাতের একটা সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের হাতে উঠে এল ছবির এই শিল্প।''[৩৪]

১৯২৪-এ দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা পথে দিগন্তে দেখছেন অল্প কয়েকটি রেখা অল্প কিছু উপকরণে আকাশ আর সমুদ্রের নীলে দিনাবসানের শেষ আলো মেশা একটি ছবি—

''ডেকের ওপর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমি যা দেখলুম তাকে আমি বিশেষ অর্থেই ছবি বলছি, যাকে বলে দৃশ্য এ তা নয়।''[৩৫]

এই ভাব নিয়ে যে কবিতাটি লেখা হচ্ছে তার নামও 'ছবি'। আর জাহাজে যাত্রার সময়েই রেখার তরঙ্গ আবির্ভূত হচ্ছে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায়। ধারাটা চলেছে বুয়েনোস এয়ারিসে পৌঁছবার পরও। সান ইসিদ্রোতে অবস্থান কালে আশ্চর্য এই পাণ্ডুলিপি ভিকটোরিয়া ওকাম্পোকে উৎসাহিত করে তুলল এটা নিশ্চয়ই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু সেই সঙ্গে এই ব্যাপারটাও স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো রবীন্দ্রনাথের নতুন শিল্প-মাধ্যমের প্রতি উন্মুখতা প্রকাশ পেয়েছে ভিকটোরিয়ার সঙ্গে দেখা হবার আগেই। আন্ডেস জাহাজে লেখা *পূরবীর* প্রায় প্রতিটি কবিতার পাণ্ডুলিপিতে সংশোধনগুলিকে আবৃত করে নানা রূপের মেলা জমিয়েছে।[৩৬] এই যে একটা খেলায় মেতেছেন তিনি, সান ইসিদ্রোতে ভিকটোরিয়ার আতিথ্যে তাতে লেগেছে নতুন প্রেরণার উদ্দীপন। এভাবে তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপির বিচিত্র মূর্তি সাড়া জাগায়নি আর কারো মনে, যেমন ভাবে উৎসাহিত হয়েছেন এই বিদেশিনী। ভিকটোরিয়ার সংবেদনশীল, শিল্পবোধ-প্রদীপ্ত মনে ধরা পড়েছিল এই পাণ্ডুলিপির চিত্রময়তা—

"When Tagore lived in San Isidro I was impressed by the copy-book where he was writing his Puravi poems in Bengali. ... I begged him to let me photograph some of the pages. The permission was granted. That copy-book, I think, was the beginning of Tagore the Painter, of his urge to translate his dreams with a pencil or a brush."[৩৭]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভিক্টোরিয়া 'সুর' পত্রিকার অগাস্ট ১৯৪১ সংখ্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন একটি চিত্তস্পর্শী প্রবন্ধে, কেতকী কুশারী ডাইসন এই প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন, এতেও পাচ্ছি ঐ খাতাটির কথা—

''আমি ওঁকে ঠাট্টা ক'রে বলতাম, 'সাবধান। আপনার কবিতায় যত বেশি ভুল ভ্রান্তি থাকবে আপনি তো তত বেশিই ছবি এঁকে মজা পাবেন। শেষে দেখবেন যে নিজে ইচ্ছে করেই বাজে কবিতা লিখছেন।'

কোথায় ঘুমোচ্ছে এখন সেই খাতাটা, কতবার কৌতূহল ভরে যার পাতা উলটেছি, যার শুধুমাত্র কয়েকটা ফোটোগ্রাফ রয়েছে আমার কাছে।''[৩৮]

রবীন্দ্র-চিত্রকলার উন্মেষ পর্বের সঙ্গে অনেকখানি জড়িয়ে আছেন ওকাম্পো। নিজের ভিতর থেকে যখন প্রবল একটা সংবেগ কবিকে চিত্ররচনার পথে নিয়ে যাচ্ছে তখন বিজয়ার অনুপ্রেরণা মস্ত একটা শক্তির মতো কাজ করেছিল।

১৯৪৮ সালের ৮মে আকাশবাণীতে এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথের নাতনী নন্দিনী দেবী (পুপে) জানান, তাঁর ছেলেবেলায় তাঁকে চিঠি লিখতে গিয়ে কবি কাটাকুটি থেকে ছবি তৈরির অনুপ্রেরণা পান। ছোট্ট পুপে দাদামশায়কে একটি চিঠি লিখেছিল, শিশুর হাতের হিজিবিজি রেখায় ভর্তি। কবি

তখন বুয়েনোস এয়ারিসে যে ভিকটোরিয়ার আতিথ্যে, সেখান থেকে প্রতিমাদেবীকে লেখা চিঠিতে এই প্রসঙ্গটি আছে :

> ‘পুপের চিঠি পেলুম। ভাগ্যি তোমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েচ তাই ভাবার্থটা বোঝা গেল। কিন্তু ভাবার্থটা ওর আসল অর্থই নয়, ওটা বাজে কথা। ওর নাচ যেমন নিরর্থক, ওর লেখাও তেমনি, হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজি বিদ্যায় আমারও সখ আছে, তোমরা জান। এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁরা অতিথি তিনি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক। পাছে ভাঁজ করতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্যে তিনি এর জন্যে একটা বড় লেফাকা আনবার ব্যবস্থা করচেন। এলে পাঠিয়ে দেব।’[৩৯]

শুধু বুয়েনোস এয়ারিসের এইসব ঘটনার অনুপ্রাণনা নয় আমরা সবাই জানি ছ’বছর পরে ১৯৩০-এ প্যারিসে ‘গ্যালারী পিগাল’এ রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনীও সম্ভব হয়েছিল ভিকটোরিয়ারই আন্তরিক উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন ‘‘ভিকটোরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক মন্দই হোক কারো চোখে পড়ত না।’’[৪০] প্যারিসের প্রদর্শনীর বিপুল সাফল্য আমাদের সকলেরই জানা। ঐ ঘটনা চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে নিঃসন্দেহে প্রবল আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। ‘ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে—কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি।’[৪১] তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশে এই সম্মাননা অনেকখানি বল জুগিয়ে দিয়েছিল। প্রকাশের তপস্যায় আকাশবাণীকে ডেকে নিয়ে আসে যে আলোকদূতী, কবি তার প্রতি কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানিয়েছেন :

> ‘‘সে বললে, আমি এগুলো এ দেশের বড়ো বড়ো ক্রিটিকদের দেখাব। সে দেদার টাকা খরচ করে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করলে; একজিবিশন করলে, তাও কত খরচ করে। তাই দেখেছি যে, বিদেশি মেয়েরা তাদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা করে কাজের মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে।’’[৪২]

উল্লেখপঞ্জি

১. Imperfect Encounter, Letters of William Rothenstein and Rabindranath Tagore. 1911-1941, Edited by Mary M. Lago, Harvard University Press. Massachusetts, U.S.A., 1972, p. 363

২. Mary M. Lago. Imperfect Encounter, p. 329 (Notes).

৩. Richard P. Feynman, What Do You Care What Other People Think, W. W. Norton and Company, New York, 1988, p. 9-12

৪. চিন্তামণি কর, ‘চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ’, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, সম্পাদক ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র, বৈতানিক, কলকাতা, ১৩৮২, পৃঃ ২৬

৫. মনোরঞ্জন গুপ্ত, রবীন্দ্র-চিত্রকলা, সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১১। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মনোরঞ্জন গুপ্তের রবীন্দ্র-চিত্রকলা গ্রন্থের সমালোচনাসূত্রে চীনা চিত্রকরদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য স্বীকার করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি জীবনের শেষে ক্লান্ত লিওনার্দো দা ভিঞ্চির রূপকথা বা মাইকেল এঞ্জেলোর সনেটচর্চার সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রচর্চার তুলনা দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য : গ্রন্থ পরিচয়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৫৮, পৃঃ ২৮৩

৬. শঙ্খ ঘোষ, নির্মাণ আর সৃষ্টি, বিশ্বভারতী, ১৩৮৯, পৃঃ ৮৬

৭. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘দস্তুর সভ্যতার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ’, রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক : দেবীপদ ভট্টাচার্য, ইষ্টলাইট বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ৩০৪

৮. অশ্রুকুমার সিকদার, বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮১, পৃঃ ২০

৯. শিবনারায়ণ রায়, কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১৯৭৩, পৃঃ ১৪০-১৪২

১০. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, রবীন্দ্রস্মৃতি, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৫২-৫৩

১১. দ্রষ্টব্য : অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, রবির 'সর্ব্ব প্রথমোদ্যম', দেশ, সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, ৫ অগাস্ট ১৯৮৯ পৃঃ ১৫

১২. ইন্দিরাদেবীকে লেখা পত্র, ৩০ আষাঢ়, ১৩০০। দ্রষ্টব্য : 'ছবির কথা' বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৫১, পৃঃ ৪০৯

১৩. জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা পত্র, ১ আশ্বিন, ১৩০৭। দ্রষ্টব্য : তদেব, পৃঃ ৪০৯

১৪. ছিন্নপত্রাবলী, ১২ মে, ১৮৯৩

১৫. শিবনারায়ণ রায়, 'পটুয়া রবিঠাকুর ও চিত্রবিপ্লব', দেশ, ১০ মে, ১৯৮৬, পৃঃ ৬২

১৬. অবনীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি, ৮ই ভাদ্র ১৩২৩। 'চিঠিপত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩, পৃঃ ১৩৬

১৭. আগস্ট ১৩২৩ এর চিঠি, তদেব, পৃঃ ১৩৪

১৮. রথীন্দ্রনাথকে ৬ই ভাদ্র, ১৩২৩-এ লেখা চিঠি, চিঠিপত্র ২ বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃঃ ৪৬-৪৭

১৯. কথাসাহিত্য পত্রিকায় ১৩৬৮ বৈশাখে মুকুল দে রচিত প্রবন্ধ, মনোরঞ্জন গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রচিত্রকলা, পৃঃ ১৫

২০. The Statesman, 14 July 1989 and 3rd August 1989

২১. মীরা দেবীকে লেখা চিঠি, ১৭ই আশ্বিন, ১৩২৩, চিঠিপত্র ৪, বিশ্বভারতী, ১৩৫০, পৃঃ ৭৯

২২. Rabindranath Tagore, 'My Pictures (I), on Art and Aesthetics, Orient Longmans, Calcutta 1961, p. 97

২৩. নন্দলাল বসু, 'গুরুদেবের আঁকা ছবি', রবীন্দ্রায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২

২৪. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-চিত্রকলা : রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ২০

২৫. Tagore to Rothenstein, from Geneva, August 24, 1930, Imperfect Encounter, p. 328

২৬. রানী চন্দ, আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৭৭, ১৩.৭.৩৯

২৭. পূর্ণেন্দু পত্রী, 'বিশ্বের অলসতম কবি' আমার রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮২, পৃঃ ২৪

২৮. 'তথ্য ও সত্য', সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬

২৯. চিঠিপত্র ৯, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ২১

৩০. কালিদাস নাগকে লেখা চিঠি, ৯ জানুয়ারি, ১৯২৫, সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ ও গুরুদেবের পত্রাবলি, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ১০১

৩১. চিঠিপত্র ৯, ৫ জুলাই, ১৯৩৪-এর চিঠি, পৃঃ ২৩৮

৩২. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ৭ অক্টোবর, ১৯২৪, রবীন্দ্ররচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী।

৩৩. 'সাহিত্য সমালোচনা', সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৫০৭-৫০৮

৩৪. শঙ্খ ঘোষ, নির্মাণ আর সৃষ্টি, পৃঃ ৯৫

৩৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ২ অক্টোবর ১৯২৪

৩৬. এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন শঙ্খ ঘোষ 'সূর্যাবর্ত' সম্পাদনা কালে। তাঁর লিখিত মতামত আনন্দবাজার, রবিবাসরীয়, ২৫ জুন, ১৯৮৯ থেকে উদ্ধৃত হল :
''পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি থেকে ছবির উৎস বোঝাবার জন্য 'পূরবী'র যে দুটি পাণ্ডুলিপির ব্যবহার আছে, তা যে ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে কবির দেখা হবার আগেই সৃষ্ট, ইচ্ছাকৃত ভাবেই সে দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি।''

৩৭. Victoria Ocampo, 'Tagore on the banks of the River Plate', Rabindranath Tagore. A Centenary Volume, 1861-1961, Sahitya Akademi, New Delhi, 1961, p. 40

৩৮. কেতকী কুশারী ডাইসন, রবীন্দ্রনাথ ও ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে, নাভানা, কলকাতা, ১৩৯২, পৃঃ ৫০

৩৯. বুয়েনোস এয়ারিস ১৯২৪, চিঠিপত্র ৩, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃঃ ৪০, (পত্র সংখ্যা ১৮)

৪০. তদেব, পৃঃ ৯৫, (পত্র সংখ্যা ৩৯)

৪১. ইন্দিরাদেবীকে লেখা চিঠি, ২৭মে ১৯৩০, চিঠিপত্র ৫, বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃঃ ৭৫

৪২. রানী চন্দ, আলাপচারি, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১১৩

রবীন্দ্রনাটকে নারী

সৌমিত্র বসু

Feminism : A Paradigm Shift গ্রন্থে Neeru Tandon ফেমিনিজ্‌মের তিনটে ঢেউ-এর কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, The feminist movement emerged in around the late 19th century, with the beggining of the first wave of feminism. Feminism, as a whole, came in three 'waves', each dealing with different aspects of the same issue. The first wave being the feminism movement in the 19th to early 20th centuries, which dealt mainly with the Suffrage movement. The second wave (1960s - 1980s) dealt with the inequality of laws, as well as unofficial inqualities. The third wave of Feminism (1990s- current) arose from the perceived failures of the second wave. বলা বাহুল্য এদের মধ্যে শেষের দুটি পর্বের আগেই রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হয়েছেন, তাঁর নারীভাবনার পটভূমি হিসেবে আমরা প্রথম ঢেউটিকেই গণ্য করতে পারব। উনিশ শতকে য়ুরোপের হাত ধরে যে সব নতুন ভাবনা চিন্তা এখানে প্রবেশ করেছিল, তাদের মধ্যে নারীকে অন্য চোখে দেখার বিষয়টিও ছিল। এই চিন্তা যে আমাদের আলোকপ্রাপ্ত তরুণদের উদ্দীপিত করবে তাতে সন্দেহ থাকার কারণ নেই। উনিশ শতকের মাঝের পর্বে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি করে পাশ্চাত্য ভাবনায় স্নাত হয়ে বাংলা সাহিত্য লিখতে বসেছিলেন, সেই মধুসূদন দত্তের ভাবনার কেন্দ্রে ছিল নারীর মুক্তি কল্পনা, তা তাঁর সাহিত্যকর্মের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। শুধু মধুসূদন নন, উনিশ শতকের সমাজ আন্দোলনের একটি প্রধান বিষয় ছিল নারীর মুক্তি, অবশ্যই সে মুক্তি যেন পুরুষের পক্ষে বিপজ্জনক না হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ না করে উপায় নেই, যদিও সে উল্লেখ নিতান্ত বাহুল্য বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিবারেই পুরুষের তৈরি বাধ্যতার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা নারীর একাধিক উদাহরণ আছে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবীর কথা, উনিশ শতকের প্রথম পর্বের সমাজে দাঁড়িয়ে স্বামী যবনী সংসর্গ করেন বলে যিনি সেই যুগে পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের বিধান নিয়ে স্বামীকে পরিত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সে যুগের আই সি এস, তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামীর সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন। স্বামী ছাড়া, একা তিনি বড়লাটের পার্টিতে গিয়েছিলেন। পরপুরুষদের সঙ্গে বাড়ির বধূকে দেখে প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেখান থেকে মুখ ঢেকে পালিয়ে আসেন। মনে পড়বে স্বর্ণকুমারীর কথা, আপন ক্ষমতায় যিনি বাংলা সাহিত্যে একটি জোরালো স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। সরলা দেবীচৌধুরাণীর কথাও ভুলে গেলে চলবে না আমাদের।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলেতে যান ১৮৭৮ সালে, সতের বছর বয়েসে। বিলিতি আদব কায়দায় দুরস্ত করে তোলবার জন্যে দাদা সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে পাণ্ডুরং পরিবারে তাঁকে কিছুদিন রাখা হয়।

সেই পরিবারের মেয়ে আনা তড়খড় রবীন্দ্রনাথের প্রেমে পড়েন। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে কোনো সাড়া ছিল না এমন ভাবলে ভুল হবে। তিনি আনার নাম দিয়েছিলেন নলিনী। নলিনী নামটি রবীন্দ্রনাথের কম বয়েসের লেখায় বহুবার ব্যবহৃত হতে দেখি। আনার অনাড়ষ্ট প্রেম নিবেদন, য়ুরোপীয় ধরনে তাঁর সহজ মেলামেশা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়। ১৮৭৮ সালে বিদেশে গিয়ে তিনি ইংলন্ডীয় সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সঙ্গে পরিচিত হলেন। এই সহজতা যে তাঁকে কতটাই উত্তেজিত করেছিল তা বুঝতে পারা যায় ভারতী পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিক য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের সূত্রে নারী স্বাধীনতা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে। কম বয়সের বেশ কিছু লেখায়, যেমন ভগ্নহৃদয় বা নলিনী, যার সূত্র অবলম্বন করে রচিত হয় মায়ার খেলা—নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ছবি তৈরি করা হচ্ছে। এর পেছনে য়ুরোপে দেখা পার্টিগুলির প্রভাব থাকতে পারে, যেমন থাকতে পারে বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে পাওয়া রাসলীলার অনুষঙ্গ।

অন্য সংরূপের আলোচনা বাদ দিয়ে যদি আমরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, একেবারে প্রথম নাটক থেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখায় নারীর একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা তৈরি হয়ে উঠছে। রুদ্রচণ্ড, বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ—সব কটি নাটকেই প্রধান চরিত্র হয়ে এসেছে একজন কঠোর হৃদয় পুরুষ, যে সামূহিক এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের ধারণাকে অস্বীকার করে বাঁচতে চায়। যেমন ধরা যাক, রুদ্রচণ্ড থাকে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে, একটি তীব্র প্রতিশোধস্পৃহাকে মনের মধ্যে লালন করে সে। বাল্মীকি প্রতিভার বাল্মীকি বা প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীও সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধনকে ছিন্ন করে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে। একটি বালিকা আসে এই বিচ্ছিন্ন একা মানুষগুলির জীবনে, সে তার ভালবাসা দিয়েই তাদের পালটে দেয়, স্বাভাবিক মায়া মমতাভরা জীবনের দিকে নিয়ে আসে। এ যে কেবল প্রথম পর্বের নাটকগুলির কাহিনিবৃত্তের বৈশিষ্ট্য এমন নয়, বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটকেই নারী এমন একটা ভূমিকা নিয়ে এসেছে।

নারী বিষয়ে এই রকম একটা ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠছিল হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিক্রিয়া থেকেই। আমরা জানি, ঠাকুরবাড়ির অত্যন্ত সফল এবং বরেণ্য বেশ কিছু ভাইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যর্থ এক বালক, পড়াশোনায় ভাল নন, কোনোভাবেই তাঁকে তাঁর অধিকাংশ দাদার সঙ্গে তুলনীয় বলা যাবে না। জীবনস্মৃতি পড়লে জানা যায়, ঠাকুরবাড়ির এই বালকটি ছিল নিঃসঙ্গ, অন্য রকমের। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে খাতাটি পাওয়া গেছে, তাঁর তের-চোদ্দ বছরের বেশ কিছু রচনা জায়গা পেয়েছে যার মধ্যে, সেই মালতী পুথির একাধিক লেখায় এই একাকিত্বের কথা আছে, আছে যেখানে সবাইকার হৃদয় যন্ত্রের মত সেই পরিবেশ ছেড়ে কৃষক বালক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। কম বয়সের ভাবাবেগ এর পেছনে কাজ করছিল তা তো বুঝতেই পারা যায়। নিজেকে কী চোখে দেখছে ছেলেটি? ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের বয়েস তখন তেইশ বছর, প্রকাশিত হল প্রভাতসংগীত। কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসুকে। এই উৎসর্গপত্রের সঙ্গে একটি দীর্ঘ কবিতা ছিল, কোনো অজানা কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। সেই কবিতার মধ্যে এই লাইনগুলিকে খুবই তাৎপর্যময় বলে মনে হতে পারে—

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাবলা গাছের মত,
বড় বড় কাঁটার ভয়ে তফাৎ থাকে লতা যত।

সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখী,
(আমার) কাঁটা ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি!
নেই বা লতা এলো কাছে নেই বা পাখী বসল শাখে,
যদি আমার বুকের কাছে বাবলা ফুলটি ফুটে থাকে!
বাতাসেতে দুলে দুলে ছড়িয়ে দেয় রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি।

প্রসঙ্গত, পাখি একটি গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ হয়ে এসেছে প্রভাত সংগীত কাব্যগ্রন্থে। হৃদয়ারণ্যে যখন কবি পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়ান তখন একটি পাখিই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এ কথা ভেবে একটু আশ্চর্যই মনে হয়, গাছ আর পাখির এই উপমা আবার ফিরে আসবে বহুকাল পরে লেখা রক্তকরবী নাটকে, সেখানেও রাজাকে দেখে নন্দিনীর মনে হবে সে যেন এক প্রকাণ্ড বটগাছ আর নন্দিনী যেন এক ছোট্ট পাখি।

তাহলে, নারী সম্পর্কে এই হল রবীন্দ্রনাথের ধারণা, জীবনের নানা আঘাতে ক্লান্ত দুর্দান্ত পুরুষকে আশ্রয় দেওয়া, তার সামনে একটি স্নিগ্ধ কোমল ভালবাসাময় পটভূমি ছড়িয়ে রাখা। এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীবাদীদের অনুমোদন পাবে এমন ভাবা কঠিন। বাংলার ১২৯৬ সালে, অর্থাৎ ইংরেজির ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মরাঠি বিদূষী রমাবাইয়ের বক্তৃতার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন, ''অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসংগত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন কি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত। ... কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়; সেগুলিকে যদি অধীনতাহীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তাহলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তাহলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।'' ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক রচনার প্রবেশক কবিতা হিসেবে যে কবিতাটি তিনি নির্বাচন করেন তার একটি অংশ উদ্ধৃত করলেই অন্তত ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার একটি অবয়ব বুঝতে পারা যাবে—

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো তব হেমঝারি।
ধুয়ে-মুছে দাও ধুলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন,
সুন্দর করো সার্থক করো
পুঞ্জিত আয়োজন।

উন্মেষ পর্বের নাটকে নারীর এই রূপটিই যে বারবার ফুটে উঠছে তাই নিয়ে আগে দু একটা কথা

বলেছি। কঠিনহৃদয় একজন পুরুষ শারীরিক আশ্রয় দিচ্ছে এক নারীকে, আর বিপরীতে সেই নারী মানসিক আশ্রয় দিচ্ছে পুরুষটিকে—রুদ্রচণ্ড, বাল্মীকি প্রতিভা প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো নাটকে এই হল নারী পুরুষ সম্পর্কের মূল বিন্যাস। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা রাজা ও রাণী থেকে এর সঙ্গে একটি বৃহৎ সামাজিক পটভূমি যুক্ত হল, আর তার সূত্রেই চলে এল দায়িত্ব বা ধর্মের প্রশ্ন।

কঠোর পুরুষ এবং কোমল হৃদয় নারীর এই নকশাটা পালটাচ্ছে না, কিন্তু তার সঙ্গে আরো কতকগুলি প্রশ্ন এসে যুক্ত হচ্ছে। যেমন, সমাজ বিচ্ছিন্নতা বা স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখা বলতে যে সরলীকৃত ধারণা থেকে তৈরি হয়েছিল উন্মেষ পর্বের পুরুষ চরিত্রগুলো, এবং নারীরা যে ভাবে তাদের যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চায় তার ছবিও বদলে গেল। একজন দায়িত্বশীল সামাজিক মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন রাজার কর্তব্যের কথা, এবং পুরুষের সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার বিষয়টিও। নারীভাবনার ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এখন, একদিকে যেমন আছে রাজা ও রাণীর সুমিত্রা, যে স্বামীকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করবার জন্যে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়, অন্যদিকে আছে রেবতীর মতো দয়ামায়াহীন নারী, যাকে কিছুটা লেডি ম্যাকবেথের আদলে গড়া বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের অমানবিক নারীকে বাদ দিলেও, বিসর্জন নাটকে আমাদের মনে পড়বে অপর্ণার বিপরীতে গুণবতীর কথা, যাকে রেবতীর মতো খল চরিত্র বলে ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব হয় না আমাদের পক্ষে। নারীর দুটি রূপ চলে আসছে তাঁর নাটকে, ইতিবাচক আর নেতিবাচক, দুই রূপেই তাকে দেখছেন রবীন্দ্রনাথ। আশ্রয়দাত্রী এবং ভয়ঙ্করী, বা অন্তত বৃহৎ ভাবনার প্রতিস্পর্ধী—এই দু'ভাবেই নারীকে দেখছি উনিশ শতকের শেষ পর্বের রবীন্দ্র নাটকে। এর পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, নারীকে নিয়ে নানা ধরনের ভাবনা চলছিল তখন রবীন্দ্রনাথের মনে, তাঁর ছোটগল্পে, চোখের বালি থেকে শুরু হওয়া উপন্যাসে যার নিদর্শন পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে বেশ কিছু কবিতায় আর প্রবন্ধে। নরনারী নামে একটি প্রবন্ধই লিখছেন পঞ্চভূতে, যেখানে সমাজে নারীর অবস্থানকে নানা দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। পঞ্চভূত গ্রন্থে দুজন নারীকে দেখছি আমরা, স্রোতস্বিনী আর দীপ্তি, যাদের স্বভাব এবং জীবনবীক্ষা পরস্পরের বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের দুই নারী তত্ত্বের কথা এই সব সূত্রেই মনে পড়ে যায়।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কার্ল গুস্তাভ জুং মাদার আর্কিটাইপ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দু'ধরনের নারীভাবনার কথা বলেছেন। মনোবিজ্ঞানী বলছেন, the Great Mother is creative and loving, on the other, she is destructive and hateful. ... Terrible Mother is the bloodstained goddess of death and destruction; she is Kali dancing on the hapless form of Shiva,... (Archetype : A Natural History of the Self; By Anthony Stevens). রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক চিন্তাকে এই বীক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে অসুবিধে হয় না।

বিশ শতকের প্রথম দশকের কাছাকাছি সময়ের দুটি রবীন্দ্র রচনার কথা বলব আমরা, যেখানে রবীন্দ্রনাথ একটি চরিত্রের মধ্যেই নারীর এই দুই রূপকে সংহত করতে চেয়েছেন, এবং এই দুই সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে তাঁর রচনার প্রধান বিষয়। এদের মধ্যে একটি হল ঘরে বাইরে উপন্যাস, যা আমাদের এই নাটক বিষয়ক আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে না, অপরটি হল ১৯১০ সালে প্রকাশিত রাজা নাটক, সেখানেও সুদর্শনার মধ্যে ভালবাসা আর ধ্বংসকারী প্রবণতার যুগ্ম প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি।

রাজা নিয়ে সামান্য আর দু-চারটি কথা বলা দরকার। এ নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সংক্রান্ত ভাবনা রূপ পেয়েছে বলে মনে হয়। যে শক্তি আমাকে চালায়, আমাকে দিয়ে তার গূঢ় কিছু উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেয় তাকে আমি চিনি না, অথচ চিনতে চাই—এই হল এ নাটকের মূল সংকট। নাটকটিকে যদি এই অর্থে ভাবি, তাহলে দুটি কথা মনে হয়। এক, এ হল একজন মানুষের আত্ম আবিষ্কারের আখ্যান, যে ভুল করে, কষ্ট পায়, এবং অবশেষে সত্যকে চিনে নিতে পারে। মনে পড়বে, কালিদাসের কাব্যে নাটকে এই যাত্রাই দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—মোহ মানুষকে ভুল পথে চালিত করে, এবং সেই মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর শকুন্তলা অথবা কুমারসম্ভবমের পার্বতী যথার্থ প্রেমকে খুঁজে পায়। বলা বাহুল্য, এ ব্যাখ্যা হয়তো কালিদাসের নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবণতা অনুযায়ী এই ব্যাখ্যা তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের বহু লেখায় এই ভাবনার প্রকাশ দেখব আমরা, রাজা তার মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু এই অভিযাত্রা তো শুধু নারীর হতে পারে না, বস্তুত এই অভিযাত্রা আসলে একজন শিল্পীর, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে বুঝে নিতে চাইছেন। মনে রাখতে বলব, নানা আঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথকে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন বা ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা তাঁর অজস্র লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। বলা যেতে পারে, রাজা নাটকে বলা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের এক অন্তর্জীবনের কথাই। তাই যদি হবে, তাহলে এ আখ্যানের মুখ্য চরিত্র হিসেবে এক নারীকে আনা হল কেন? এ কথাও মনে রাখতে বলব, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে শারদোৎসব থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফাল্গুনী পর্যন্ত মোট পাঁচটি নাটকে—আমাদের আলোচ্য রাজা নাটককে বাদ দিলে নারী চরিত্র এসেছে মাত্রই একটি নাটকে, ডাকঘরের সুধা। এ কথা ঠিক, রাজা নাটকের মূল উৎস যে বৌদ্ধ পুরাণ, সেখানে রানির কথা ছিল, কালিদাসের আখ্যানেও নারীদের দিক থেকেই বোনা হয় গল্প, কিন্তু এ সবের বাইরে আরো একটি কারণের কথা মনে হয়।

মনোবিজ্ঞানী কার্ল গুস্তাভ য়ুং প্রতিটি মানুষের মধ্যে anima এবং animus-এর অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, the anima is an important archetypal structure that holds the feminine aspects of man; its counterpart, the animus, similarly holds the masculine aspects of women. Jung believed that each person has contrasexual attitudes and feelings actively at work in the unconscious and that the development of a whole personality required those to become assimilated to consciousness. (The Transcendent Function: Jung's Model of Psychological Growth Through Dialogue with the Unconscious By Jeffrey C. Miller). সৃজনের এলাকাটি মূলত anima-র দখলে। সুদর্শনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি নিজের সেই সৃজনশীল নারীসত্তাকেই প্রকাশ করতে চাইছিলেন?

যাকে বলছি শারদোৎসব পর্ব, তার শেষের দিকে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই সময়ে, এবং এর অব্যবহিত পরে, ২০-২১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছেন পশ্চিমের নানা দেশে, বক্তৃতা করেছেন, মহাযুদ্ধের সমকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক পালাবদলের চিহ্নগুলি লক্ষ করেছেন নিজের চোখে।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় তিনি যে বক্তৃতাগুলি দেন তার মধ্যে অন্যতম হলো Women. যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত ধরা আছে এই রচনাটিতে—At the

present stage of history civilization is almost exclusively masculine, a civilisation of power, in which woman has been thrust aside in the in the shade. Therefore it has lost its balance and it is moving by hopping from war to war ... And at last the time has arrived when woman must step in and impert her life rhythm to this reckless movement of power ... But woman cal bring her fresh mind and all her power of sympathy to this new task of building up a spiritual civilization, if she will be conscious of her responsibility.

এই উদ্ধৃতি সামনে রাখলে হয়তো স্পষ্ট হয়, বিশ শতকের নাটকে নারী বলতে রবীন্দ্রনাথ সব সময় রক্তমাংসের নারীকে দেখাতে চাইছেন না, রক্তমাংসের সম্ভাব্যতার আওতার মধ্যে রেখেও তাকে তিনি দেখতে চাইছেন এই masculine সভ্যতার বিপরীত একটি সদর্থক শক্তি হিসেবে। এই শক্তির প্রকাশ মুক্তধারার অম্বা বা ফুলওয়ালীর মধ্যে, যারা সন্দেহপরায়ণ পুরুষের বিপরীতে শুধু ভালবাসা দিয়ে এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চায়। নিশ্চয় বলে দেবার দরকার করে না, এই নারীভাবনার সবচেয়ে তীব্র প্রকাশ রক্তকরবীর নন্দিনীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন মানবীর ছবি, সে কথা স্বীকার করে নিয়েও দেখা যায়, Mother Archetype-এর সব কটি লক্ষণ তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। য়ুং দেখেছেন, Mother Archetype-এর মধ্যে একদিকে যেমন পালন করা বা রক্ষা করার নানা অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে আছে, অন্যদিকে তেমনি আছে সর্বনাশের অনুষঙ্গও, যাকে তিনি বলবেন negative, evil meaning. নারীর এই আশ্রয়দাত্রী রূপের দেখা পাওয়া যাবে গৃহপ্রবেশের হিমি আর মাসির মধ্যেও। শেষ বয়েসে লেখা নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যেও একদিকে যেমন আছে নারীর অভিযাত্রা, অন্যদিকে তেমনি দেখা যাবে তার তীব্র ভালবাসা, যা তাকে আত্মধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আমরা হয়তো মনোবিজ্ঞানীর এই মতটিকেই চরিত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সামনে আনতে পারি। Women in Europe নামের রচনায় C.G. jung বলছেন The love of woman is not sentiment, as is a man's. But a will that is at times terrifyingly unsentimental and can even force her to self sacrifice. কল্যাণময়ী এবং আশ্রয়দাত্রী নারী কল্পনা দিয়ে যার সূচনা, নানা সময়ের বাঁক পেরিয়ে সে যে নিজেকে অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করার স্পর্ধা অর্জন করল, তার পেছনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে দাঁড়ানো পৃথিবীর পালটে যাওয়া সম্পর্কের বিন্যাস এবং সমাজে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান বিষয়ে নতুন চিন্তা নিশ্চয় ছাপ ফেলেছিল।

সুরের বাঁধনে : রবীন্দ্রনাথ ও স্যাঁ-জন পের্স

চিন্ময় গুহ

"তোমার মত কবির জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি..."

একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে আধুনিক ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ কবি স্যাঁ-জন পের্স (১৮৮৭-১৯৭৫)। প্রথম জনের কাছে একদিন নতজানু হয়েছিল সারা পৃথিবী, আর দ্বিতীয় জনের ভক্তদের মধ্যে পড়েন সমকালের শ্রেষ্ঠ কবিরা : উঙ্গারেত্তি ও রিলকে, এলিয়ট ও আরাগঁ, ভালেরি ও জিদ।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যখন এক ভাঙাচোরা, বিপন্ন বাস্তবের হাড়মাংসের দিকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ইউরোপের কবিতা, বিষয় ও ভাষা নিয়ে চলছে বিতর্ক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, স্বয়ংক্রিয় লিখন-পদ্ধতির সহজ ও বিপজ্জনক রাস্তা বেছে নিয়েছেন নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান কবিদের কেউ কেউ, সেই সময় স্যাঁ-জন পের্স ছদ্মনামে ওই তরুণ সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখছেন বস্তু ও মানুষকে নিয়ে মর্মরিত এক মহাকবিতা। যেখানে তাৎক্ষণিকতার কোনও জায়গা নেই।

সতীর্থদের পরিপ্রেক্ষিত যে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, সময়চিহ্নের ছাপ হয়ে উঠছে কাব্যগুণের মাপকাঠি, সেসব তোয়াক্কা করছেন না তিনি।

কোথা থেকে এল তাঁর রচনার এই মহাকাব্যিক বিস্তার? তাঁর অনুরণনময় সাংগীতিক গদ্যের জনক পল ক্লোদেলের কাছ থেকে, বলবেন ফরাসি কবিতার সমালোচকেরা। অথবা মরমিয়া কবি ফ্রাঁসিস জামের কাছে, যাঁর বাড়িতে ১৯০৫ সালে ক্লোদেলের সঙ্গে প্রথম তাঁর দেখা হয়েছিল? নাকি অন্য এক মাত্রা রয়েছে তাঁর স্বতন্ত্র বয়নশিল্পের আড়ালে, যা অজানা রয়ে গেছে সকলের?

লন্ডনের সাউথ কেনসিংটনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্যাঁ-জন পের্স (আসল নাম মারি-রনে-অগ্যুস্ত আলেক্সিস স্যাঁ-লেজে লেজে[১], ছদ্মনাম ব্যবহার করবেন আরও পরে) দেখা করেছিলেন ১৯১২ সালের ১৭ অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ তখন জুন থেকে ইংলন্ডে, গীতাঞ্জলির ঐতিহাসিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হতে চলেছে, তার আগে একবার তিনি আমেরিকা ঘুরে আসবেন ভাবছেন, যেখানে ইতিমধ্যেই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এজরা পাউন্ডের উৎসাহে। লন্ডনের একটি কাগজে[২] ইয়েট্সের উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি নাকি প্রকাশিতব্য ইংরেজি অনুবাদটি প্রুফে পড়েছিলেন (যা তাঁকে দেখিয়ে থাকবেন ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ)। ১৪ অক্টোবর স্ট্র্যাংওয়েজের পরিচয়পত্র-সহ ওই আনন্দমুগ্ধ ফরাসি লিখেছিলেন: '...Will you, will you be so kind as to let me know at what time I might find you at home, from now to next Sunday?'[৩] ১৮ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে লেখেন : 'কাল সকালে একজন ফরাসী গ্রন্থকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি প্রুফে আমার তর্জ্জমাগুলো পড়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আমার

কাছে এসেছেন। তিনি বল্লেন, তোমার মত কবির জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমাদের Lyrics-এ আমরা কেবল accidental-কে নিয়ে বদ্ধ হয়ে আছি—তোমার লেখা দেশকালের অতীত, চল তুমি আমাদের ফ্রান্সে চল, সেখানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। ইত্যাদি। ইনি আমার এই তর্জ্জমাগুলো ফরাসীতে অনুবাদ করবার অনুমতি নিয়ে গেলেন।'[৪]

রবীন্দ্রনাথকে তিনি দিয়েছিলেন এক বছর আগে প্রকাশিত তাঁর *Eloges* গ্রন্থের একটি কপি। আর কী কথা বলেছিলেন তাঁরা? অনেক দশক পার হয়ে, পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-বিষয়ে উৎসাহ নিঃশেষ হওয়ার পরও, তাঁদের সেই আশ্চর্য সংলাপ অব্যাহত থেকেছে। ১৯৬১ সালের মার্চে ব্রজমোহন নেহরুকে লেখেন স্যাঁ-জন পের্স : 'আপনার বইটি দেখে আমার মনে পড়েছে পঞ্চাশ বছরের পুরনো এক সংলাপ, যা খুব কম বয়সে আমি শুরু করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লন্ডনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে।'[৫]

পাঁচ দশক পরে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সময় ফ্রান্সের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গিয়ে সাউথ কেনসিংটনের সেই শান্ত বাড়িটির স্মৃতিচারণ করেছেন : 'তিনি আমাদের মাঝে বসেছিলেন পুরাণের সেই অতিথি সেবকের মতো, পরনে শ্বেত পোশাক, বহন করে এনেছিলেন তাঁর বাণী। মানব-মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত অমন সুন্দর মুখ প্রায় দেখা যায় না। তিনি কথা বলছিলেন সংগীতকার হিসেবে, দার্শনিক হিসেবে, চোখে তাঁর মহাত্মাদের অদ্ভুত কোমলতা। জ্যোতির্বলয়ের মতো একটি কিংবদন্তী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। ... সারা ইয়োরোপে চতুর্দিকে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিল বিরাট বিরাট সব চুল্লি, আর রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন বস্তুবাদের বিপদ সম্পর্কে তাঁর গভীর উদ্বেগ ও ভয়ের কথা...'[৬]

স্যাঁ-জন পের্সের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এক পুরোহিত, দুই পৃথিবীর, দুই যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, পুরাণ-পুরুষের মতো। তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্যের শুরুতেই লিখেছিলেন : 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বড়, কারণ তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিল মানবতায় প্রোথিত। তাঁর কপালে আজও জ্বলজ্বল করছে মহত্ত্বের যৌথ টীকা : কবি হিসেবে তিনি জানতেন কীভাবে মানুষের কাছ থেকে সরে না এসে স্বপ্নকে উঁচুতে তুলে ধরতে হয়। সময় ও স্থানোত্তর (spaceless) তাঁর কবিতা, আবহমান মানুষের পদচিহ্ন ধরে যা শেকড়ের কাছে ফিরে যায়। সেই নদীতীরের সন্ধানে তাঁর যাত্রা যেখানে সমস্ত রাত্রির অবসান।'

'রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব হল কবিতার মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠায়, সৎ ও তীব্রভাবে জীবন্ত।' গীতাঞ্জলি পাঠের পাঁচ দশক পরেও তাঁর কাছে বইটির 'পরিপূর্ণ স্নিগ্ধতা ও নির্যাস' এতটুকু ম্লান হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধতম শিল্প তাঁর সম্পূর্ণ সত্তাকে মধুরভাবে আন্দোলিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতে এত উত্তেজিত হয়েছিলেন আলেক্সিস লেজে যে এক সপ্তাহের মধ্যে (২৩ অক্টোবর ১৯১২) জিদকে লেখেন : 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ' আর্নল্ড বেনেটের বদলে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পরিচিত করালে অন্তত একটা কাজের কাজ করত। তাঁর কবিতার স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ পনেরো দিনের মধ্যে প্রকাশিত হতে চলেছে। বহু বছরের ভেতর এটিই ইংরেজিতে একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবিতার বই।'[৭] ডিসেম্বরের চিঠিতে তিনি জিদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে 'grand vieillard pélerin d'un charme délicat et d'une distinction très sure' ('গভীরভাবে বিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম আকর্ষণময় এক মহান বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী') বলে বর্ণনা করেন এবং তাঁকে সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজি গীতাঞ্জলির ব্যক্তিগত কপিটি পাঠিয়ে দেন, বইটি খোয়াতে একেবারেই প্রস্তুত নন সেকথা যোগ করে। তারপর ১৯১৩-র ১২ জানুয়ারি লন্ডন থেকে সমান উৎসাহে লেখেন : 'Cher ami, l'oeuvre de Tagore est belle... প্রিয় বন্ধু, রবীন্দ্রনাথের বইটি সুন্দর।

নিঃসন্দেহে ফ্রান্সে একমাত্র আপনিই ওটা পড়েছেন।' ২৮ জানুয়ারি চিঠিতে খোঁজ নিয়েছেন জিদ সেটিকে তাঁর পত্রিকার জন্যই অনুবাদ করার কথা ভাবছেন, না বই হিসেবে বের করার পরিকল্পনা আছে তাঁর।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরাসি সাহিত্যপত্র 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ'-এর নবতম আবিষ্কার আলেক্সিস স্যাঁ-লেজে লেজে-র (যাঁর পাঠকদের মধ্যে তখনই পল ভালেরি, লেয়ঁ-পল ফার্গ ও স্বয়ং জিদ) অভিমতের মূল্য রবীন্দ্র-গবেষকেরা ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

ফরাসি অনুবাদ-স্বত্ব পাওয়া খুব সহজ হয়নি, কারণ ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ তিনজন অতি সাধারণ মানের অনুবাদকের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন। অবশেষে আলেক্সিস লেজে রবীন্দ্রনাথকে আঁদ্রে জিদের পরিচয় দিয়ে অনুবাদ-স্বত্ব সংগ্রহ করার পর, ১০ জুলাই ১৯১৩ তারিখে জিদকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন তাঁর অনুবাদ-কর্ম হয়ে উঠুক 'শুদ্ধতা ও আবহমানতার একটি দীর্ঘ ঋতু' ('Une longue saison pure et sans âge')। রবীন্দ্রনাথ পড়ে অভিভূত জিদ তরুণ কবির কাছে তাঁর অশেষ ঋণ স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। প্রত্যুত্তরে আলেক্সিস জানালেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জিদের প্রতিভাকে মেলাতে পেরে তিনি সম্মানিত। তিনি চেয়েছিলেন বোদল্যের যেমন এডগার অ্যালান পো-কে, জেরার দ্য নেরভাল যেমন গ্যোয়েটেকে, জিদ তেমনি ফরাসি ভাষায় জীবন্ত করে তুলুন রবীন্দ্রনাথকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও ১৯১৩ সালের গোড়ায় এই কাঙ্ক্ষিত মণিকাঞ্চন-যোগের কথা লিখেছেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত জিদের অনুবাদে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয় প্রথমে 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ' পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায় (১ ডিসেম্বর ১৯১৩) ও পরে সেই প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত প্রকাশনায়। স্বভাবতই তা স্যাঁ-লেজে লেজেকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। উৎসর্গপত্র Epître dédicatoire-এ জিদ স্পষ্টই লিখেছেন স্যাঁ-লেজে লেজের জন্যই তিনি ফরাসি দেশে প্রথম রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।[৮]

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে আঁদ্রে জিদের ফরাসি অনুবাদের (অবশ্য ইংরেজি থেকেই) ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইংরেজিমুগ্ধ বাঙালি সম্ভবত তা কোনওদিন বুঝতে পারেননি। স্পেনে হুয়ান রামোন হিমেনেথ, আর্জেন্টিনায় ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো, পর্তুগালে প্লাসিদো বারবোসা এবং ইতালিতে জুসেপ্পে উঙ্গারেত্তি থেকে শুরু করে লাতিন বিশ্বের বহু সংবেদী পাঠকের কাছে খুলে গিয়েছিল এক অনাস্বাদিতপূর্ব জগৎ। এমনকী প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্র-উৎসাহী রিলকেও জিদের অনুবাদেই গীতাঞ্জলি পড়েছিলেন। হয়তো ইংরেজির জানলা দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে গিয়ে আমরা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলেছি।

১৯০৮ সালে *La porte étroite* ('শীর্ণ তোরণ') প্রকাশিত হওয়ার পর জিদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি তখন তুঙ্গে। তাঁর সাহিত্যপত্রটিকে ঘিরে (যদিও সম্পাদক হিসেবে কখনও তাঁর নাম ছাপা হয়নি) সৃজনশীলতার জোয়ার, যাতে সামিল ছিলেন ভালেরি, ক্লোদেল, পেগি, জিরোদু, ফ্রাঁসিস জাম, জাক রিভিয়ের, আল্যাঁ-ফুর্নিয়ে, ভালেরি লারবো, লেয়ঁ-পল ফার্গ, মার্সেল প্রুস্ত, জর্জ দ্যুয়ামেল, দ্রিয়্য লা রোশেল...। ছাপা হচ্ছে জিদের 'শীর্ণ তোরণ', *Si le grain ne meurt, Isabelle* (এবং পুস্তকাকারে ও বেনামে কুখ্যাত *C.R.D.N*) ছাড়াও পল ক্লোদেলের *L'Annonce faite à Marie* ও ভালেরি লারবোর *A. O. Barnabooth; Journal d'un milliardaire,* আল্যাঁ ফুর্ণিয়ের *Le grand Meaulnes* ও ক্রমশ মার্সেল প্রুস্তের *A la recherche du temps perdu,* ভালেরির *Le*

cimetière marin, র‍্যাঁবো ও লাফর্গের অপ্রকাশিত লেখা, আঁদ্রে ব্র্যতঁর *Pour dada,* আঁদ্রে সালমঁ-র *L'Age de l'humanité...* এক কথায় সমকালীন ফরাসি সাহিত্যের সোনার ফসল। এঁদেরই পাশে জায়গা করে নিল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি।

আর ১৯১০ সালের ১ এপ্রিল 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ'-এর ১৬ নং সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল এক অনন্যসাধারণ তরুণ কবির রচনা, স্যাঁ-লেজে লেজে-র *Eloges* (পৃ. ৪৩৮-৪৪৯, রচনাকাল ১৯০৭)। এই কবির সন্ধান জিদকে দিয়েছিলেন ফ্রাঁসিস জাম। গদ্য-কবিতাগুলি পড়ে হতবাক হয়ে যান ভালেরি লারবো এবং যুবকটির সঙ্গে দেখা করতে ফ্রান্সের প্রত্যন্ত শহর পো পর্যন্ত দৌড়ে যান। ১৯১১ সালে জিদের সুপারিশে গাস্তঁ গালিমার *Eloges*-কে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ওই বছর ২০ ডিসেম্বর *La phalange* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *Eloges* সম্পর্কে লারবোর সমালোচনা। ঠিক ওই সময় প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারে বাস করছিলেন এক তীর্থার্থী মার্কিন তরুণ, যিনি লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ-এর প্রতিটি সংখ্যা সংগ্রহ করতেন। দু-দশক পরে তিনি স্যাঁ-জন পের্সের (ততদিনে ছদ্মনামে লিখছেন স্যাঁ-লেজে লেজে) কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন। সারা জীবনে আর কারও কবিতা তিনি অনুবাদনীয় মনে করেননি! এই মার্কিন কবিটির নাম টি. এস. এলিয়ট।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় স্যাঁ-লেজে লেজে ইতিমধ্যেই কবিতার জগতের বাসিন্দা। রবীন্দ্রনাথকে ফ্রান্সে পরিচিত করানোর আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল, ইংরেজি-জানা অনুবাদক-কবি লারবোকে সে ব্যাপারে রাজি করানো কঠিন হত না; কিন্তু তিনি চাইছিলেন তুমুল সৃজনশীলতার ফাঁকে আঁদ্রে জিদই ফরাসি সাহিত্যে নতুন ঢেউ আনুন। বোদল্যেরের এডগার অ্যালান পো-অনুবাদের তুলনাটি বিশেষ তাৎপর্যময়; বোদল্যের শুধু ফরাসিতে পো-অনুবাদই করেননি, ফরাসিতে পো-প্রভাবিত বোদল্যের এক নতুন শিহরনের ('frisson nouveau' : বোদল্যের প্রসঙ্গে ভিক্তর য়্যুগোর উক্তি) সূত্রপাত করেন, যা মালার্মের ভাষায় 'purified the dialect of the tribe' ('এডগার পো-র সমাধি')। ফরাসি কবিতার পাঠক জানেন কীভাবে পো প্রায় সম্পূর্ণ এককভাবে প্রতীকবাদকে শাসন করেছেন, এবং তৈরি করে দিয়েছেন এক নতুন বচন।

অর্থাৎ স্যাঁ-লেজে লেজে গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদটিতে এমন কিছু পেয়েছিলেন যা তাঁর মতে পো-র মতোই ফরাসিতে এক নতুন দিগন্তের উদ্বোধন করবে। জিদের সম্মানিত অনুবাদটি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে?

স্যাঁ-জন পের্স নিজে সারা জীবন এক অভ্রময় গদ্যকবিতা ছাড়া কিছু লেখেননি। তাঁর কাব্যের মর্মস্থলে যে গভীর ধ্বনিময়তা ও স্তোত্রধর্মিতা তার আড়ালে কি রবীন্দ্রনাথ, অথবা হ্যারল্ড ব্লুম যাকে বলেছেন 'misreading', যা পো-র ক্ষেত্রে ফরাসিদের সাহায্য করেছিল?

বাইবেলে ব্যবহৃত টানা, ছন্দিত গদ্যের স্তবক—যা তিনি ক্লোদেলের কাছ থেকে নিয়েছিলেন—ফ্রান্সে verset ('ভের্সে') নামে খ্যাত। সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্যকে এক ঐশ্বরিক সম্পূর্ণতার অনুভবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন ক্লোদেল। আর পের্স তাতে ঝর্নাধারার মতো এক স্বাধীন সুর সঞ্চার করেছিলেন। মালার্মের রুদ্ধ ও মানব-বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম জগতের থেকে এ-একেবারে আলাদা, প্রত্যক্ষ জীবনের ধূলিধূসর ব্যঞ্জনাই এখানে কাব্যের উৎসারকে সম্ভব করে তুলেছে। বস্তু ও মানুষকে নিয়ে তৈরি করেছে এক বিরাট সিম্ফনি।

স্যাঁ-জন পের্সের অখণ্ড সৃষ্টিতে সমস্ত খনিজ ও উদ্ভিদের সঙ্গে একাত্মতা, আলোর ঝর্নার সঙ্গে, মাটি, বাতাস ও সমুদ্রের সঙ্গে এক মৌলিক সংযোগ। গতিবেগ, ঘনত্ব ও ভাবনার বিস্তারে তা এক

সাংগীতিক মাহাত্ম্য পায়। এক ফরাসি সমালোচকের ভাষায়, তা কথার সত্যকে ('verite verbale') মহাবিশ্বের সত্যের সঙ্গে ('vérité cosmique') একসূত্রে গ্রথিত করে।

স্যাঁ-জন পের্স লিখেছেন, 'প্রশ্নটা সমুদ্রকে নিয়ে নয়, মানুষের হৃদয়ে সমুদ্রের রাজত্বকে নিয়ে।'

টি. এস. এলিয়ট যখন ইংরেজিতে অনুবাদ করছিলেন তাঁর *Anabase,* পাণ্ডুলিপির ওপর পের্স লিখে দিয়েছিলেন, 'এ এক অন্তর্যাত্রার কবিতা।'[৯]

জীবনের প্রতি ভালবাসায় মুখরিত এক ভারতীয় কবির কাছে কি এ কারণেই তাঁকে আসতে হয়েছিল? খুচরো অভিনবত্বের পেছনে ধাবমান সমসাময়িক ফরাসি বা ইংরেজি কবিতায় এই মানব-অনুরণন তিনি পাননি বলে?

উজ্জীবনের গান, নবজীবনের উৎসবের গান আর কার কাছেই বা শিখতে পারতেন স্যাঁ-জন পের্স? সমস্ত জীর্ণতা ও পচনকে ধুয়ে মুছে শেষ করার গান, যেমন আছে *Vents* কাব্যে?

যে অন্তহীন জীবনমুখিনতা তিনি রবীন্দ্র-কবিতায় খুঁজে পেয়েছিলেন, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তা তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছিল। ১৯৬০ সালের ১০ ডিসেম্বর স্টকহোমে নোবেল পুরস্কারের ব্যাংকোয়েটে মানুষের যে ছবিটি স্যাঁ-জন পের্স এঁকেছিলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-ভাবনার মিল খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন কবির সততা (intégrité) নির্ভর করে অনন্তের সঙ্গে, সত্তার সঙ্গে তার আত্মীয়তার ওপর। স্যাঁ-জন পের্স চেয়েছিলেন কবি হয়ে উঠুন সময়ের বিবেক।

আধুনিক স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিমেনেথের মতো, বিশ শতকে ফরাসি দেশের মহত্তম কবিটিও (লুই আরাগঁ-র মতে) লিখতে পারতেন :

> একদিন আমি পরিচিত সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় এল এক চেনা ঢেউ, সেই ঢেউয়ের ফেনা ধরলাম হাতে, মুক্তাজননীশুক্তির মতো শুভ্র সেই ফেনপুঞ্জ; আমার হাতে আটকে গেল সেই ফেনা।[১০]

উল্লেখপঞ্জি

১. পেশায় কূটনীতিবিদ ছিলেন, বিশিষ্ট কবি পল ক্লোদেলের মতো। ১৯১৬ সাল থেকে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি করতেন: দূতাবাসের সম্পাদক হিসেবে পেইচিং-এ (১৯১৬-১৯২১), আরিস্তিদ্ ব্রিয়াঁর মন্ত্রীসভার পরিচালক হিসেবে (১৯২৫-১৯৩২) এবং 'কে দর্‌সে' অর্থাৎ পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান কার্যালয়ে প্যারিসে (১৯৩৩-১৯৪০)। নাৎসী জার্মানির তাঁবেদার ভিশীর পেত্যাঁ সরকার 'bellicisme' বা নিজ স্বার্থে যুদ্ধ বাঁধানোর মিথ্যে অভিযোগ তুলে তাঁকে সাসপেন্ড করায় ১৯৪১ সালে তিনি ফ্রান্স ছেড়ে ওয়াশিংটন চলে যান এবং ১৯৪৬ পর্যন্ত সেখানকার কংগ্রেস গ্রন্থাগারে পরামর্শদাতার কাজ করেন। ফরাসি দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৭ সালে ও ১৯৬০ সালে আধুনিক ফরাসি কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান (সুলি প্রুদমকে না ধরলে)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ নটি: *Eloges,* ১৯১১; *Anabase,* ১৯২৪; *Exil,* ১৯৪৪; *Vents,* ১৯৪৬; *Amers,* ১৯৫৭; *Chronique,* ১৯৬০; *Chanté par celle qui est là,* ১৯৬৯; ও *Chant pour un équinoxe,* ১৯৭৫

২. মনে হয় ১৩ জুলাই-এর টাইমস পত্রিকা, যেখানে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা মুদ্রিত হয় : 'I was not aware of the moment when I first crossed the threshold of this life' ও 'In the deep shadows of the rainy July'। দ্র. 'রবিজীবনী', প্রশান্তকুমার পাল, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ,

১৯৯৩, পৃ. ৩১৮। ইয়েটসের 'উদ্ধৃত' বলতে সম্ভবত 'ইয়েটস-পঠিত' বোঝানো হয়েছে। টাইমস্-এর ওই প্রতিবেদনে ১০ জুলাই ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজের খবর দেওয়া হয়েছিল। ইয়েট্স্ সেখানে তিনটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন।

একটি জিনিস এখানে স্পষ্ট : ট্রোকাডেরো রেস্তোঁরায় ওই ডিনারে স্যাঁ-লেজে লেজে নিজে উপস্থিত ছিলেন না। টাইম্স্-প্রকাশিত অভ্যাগতদের তালিকাতেও তাঁর নাম নেই।

একটিই খটকা রয়ে গেল : অতখানি উত্তেজিত হয়েও স্যাঁ-লেজে লেজে কেন তিন মাস অপেক্ষা করলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্যে? এমন কি হতে পারে যে তিনি লন্ডনে ছিলেন না?

৩. রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি। তাছাড়া, 'খ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে', সৌরীন্দ্র মিত্র, আনন্দ, ১৯৯৫ সং, পৃ. ৩২২। সৌরীন্দ্র মিত্র লিখেছেন আলেক্সিস স্যাঁ-লেজে তখন ফরাসি কূটনৈতিক মিশনের চাকুরে হিসেবে লন্ডনে ছিলেন। এ তথ্য ভুল, তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেবেন ১৯১৪ সালে। তা ছাড়া কূটনীতিক হিসেবে তিনি লন্ডনে নিযুক্ত ছিলেন না। দ্র. টীকা ১। দ্বিতীয়ত, একথাও ঠিক নয় যে স্যাঁ-লেজে লেজে তখন 'অখ্যাত'। আধুনিক ফরাসি কবিতার ধার না ধারা ইংরেজদের কাছে অখ্যাত হতেও পারেন, তবে ফরাসি কাব্যজগতে নয়।

৪. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬, ১৭ নং পত্র। দ্র. 'রবিজীবনী', প্রশান্তকুমার পাল, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ, পৃ. ৩৪১

৫. 'স্যাঁ-জন পের্স রচনাসমগ্র' প্লেইয়াদ সংস্করণ, গালিমার এন. আর. এফ। পরবর্তী সমস্ত সূত্রই এখানে পেয়েছি।

৬. ১৯৬২ সালে অ্যাঁস্তিত্যু দ্য সিভিলিজাসিয়ঁ অ্যাঁদিয়েন কর্তৃক প্রকাশিত। পের্স-রচনাসমগ্রের অন্তর্ভুক্ত।

৭. ১৯৯১ সালের ১২ মে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'Tagore and Perse' নামক নিবন্ধের উত্তরে এক পত্রলেখক জানান জিদ নাকি আগেই রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্যাঁ-জন পের্স-রচনাসমগ্রে জিদ ও পের্সের চিঠিপত্র থেকেও বোঝা যায় কথাটি ঠিক নয়।

৮. পের্স-রচনাসমগ্র।

৯. পের্স-রচনাসমগ্র।

১০. শিশিরকুমার দাশ-অনূদিত হিমেনেথের 'রবীন্দ্রনাথের ভস্ম' (Ceriza de Rabindranaz Tagore), 'শাশ্বত মৌচাক: রবীন্দ্রনাথ ও স্পেন', শিশিরকুমার দাশ ও শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, প্যাপিরাস, ১৩৯৪, পৃ. ১৪৮

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথ-পাঠে যে 'প্রাথমিক মুগ্ধবোধ ও পরিণামী মোহভঙ্গে'র কথা লিখেছেন ('শরণার্থীর ঋতু ও শিল্পভাবনা', আনন্দ, ১৯৯৩, পৃ. ৯৭) হিমেনেথ ও স্যাঁ-জন পের্স তার দুই আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সৃজন-চেতনার উন্মেষে সাহায্য করেছিলেন বলে?

রবীন্দ্র-নাটকের উত্তরাধিকার

শেখর সমাদ্দার

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, সমকালীন লেখক কিংবা কবিগণ রবীন্দ্র সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যকে যে যতই অস্বীকার করবার চেষ্টা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের লেখালেখি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বাইরে যেতে পারেনি। মোটের ওপর, বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে-র সময় থেকে আধুনিককালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা দেবেশ রায়, জয় গোস্বামী কিংবা আরও তরুণ কবি সম্পর্কেও একথা খাটে। বুদ্ধদেব বসুরা যে 'শেষের কবিতা' পড়ে মুহ্যমান হয়েছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার কারণেই। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকরণজনিত আধুনিকতার পরিণামও যে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যের কাছে দীক্ষা নিয়েই 'কালের যাত্রার ধ্বনি' শোনাবার কাজে ব্রতী হয় এ সত্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রমাণ করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্র নাটকের বেলায় এমনটা ঘটেনি। অবশ্য শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, এ ঘটনা বাংলার কোনো নাট্যকারের ক্ষেত্রেই ঘটেনি। বাংলার নাট্যকারগণ কালের গণ্ডী অতিক্রমণে সক্ষম নন। নিতান্ত যাঁরা বাংলা সাহিত্য পড়েন, বাঙালির সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য পাঠ্যসূচিতে তাঁদের মাইকেল মধুসূদন থেকে মন্মথ রায় পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাস যাঁদের হাতে গড়ে উঠেছিল, তাঁদের প্রতিনিধিমূলক নাটকগুলি পড়ানো হয়। এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই পড়া বা পড়বার কাজটির মধ্যে শ্রদ্ধা বা রসাগ্রহ খুব কমই কাজ করে, নাটকের গুণগত পর্যালোচনা বাদ দিয়ে প্রায়শই পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে তার বহিরঙ্গিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো হয়। এটুকুর বাইরে, বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে পুরনো নাটকগুলি মূলত মৃত এক ইতিহাসের দলিলমাত্র, বড়ো জোর সেকালের উত্তর কলকাতার মঞ্চে জনপ্রিয়তার সাক্ষী, মফঃস্বলের সৌখিন অভিনয়ের উপভোগ্য স্মৃতিমাত্র। এসব নাটক সেই 'ক্ল্যাসিক' মর্যাদা লাভ করেনি যার দৌলতে শেক্সপিয়ার যেমন আজও ইংলন্ডের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নতুনতর পাঠের বিষয়, থিয়েটারের নব্যতম অভিব্যক্তির আধার হতে পারেন—তেমনি গিরিশচন্দ্র বা মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদ কোনোভাবে নতুন সহস্রাব্দের জীবন ও সংস্কৃতিকে আকর্ষণ করতে পারেন।

এই না-পারার ইতিহাস মোটেই তেমন সরল নয় যে খুব সহজে, যে কোনো এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় বলে দেওয়া যাবে। এইসব নাট্যকারই কমবেশি তাঁদের নাটকের বিষয় বা প্রকরণ নির্বাচনে, নাটকের গুণগত ও ভাবগত বিন্যাসে যুগরুচিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেই ঝোঁক নাটকগুলিকে ভবিষ্যতের ইতিহাসের সঙ্গে অনেকখানি সংযোগরহিত করে তুলেছে, এমনটা মনে করাই যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকের ক্ষেত্রে তো এই অভিযোগ চলে না। গান কিংবা কবিতার ভাবকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে পরীক্ষা করে দেখবার আগ্রহ থেকে তাঁর নাট্যচর্চার শুরু প্রধানত ইংরেজি রোমান্টিক নাটকের ধারাকে আত্মস্থ করে, কিছুটা সমকালীন মঞ্চের নাট্যপ্রবণতাকে প্রশ্রয়

দিয়ে কিছু নাটক লেখবার পর তাঁর নিজের জীবনবোধ প্রকাশের উপযুক্ত আধার ও আঙ্গিক খুঁজে নেবার যে পথ শুরু হল বিংশ শতাব্দীতে এসে, তার ইতিহাসটি তো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক! তাতে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ইউরোপের যাবতীয় শিল্পানুসন্ধান, সমস্ত প্রকারের নাট্য অভিব্যক্তির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে মিলে যাচ্ছে তাঁর নাটক। ফলে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এবং পরবর্তী সময়েও বেশ কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার পাশাপাশি তাঁর নাটকের অনুবাদ হয়ে চলেছে নানা ইউরোপীয় ভাষায়। লন্ডনে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়মিত অভিনয় করবার একটি সমবায়ই গড়ে উঠেছিল। তাঁদের অভিনয়ের ইতিবৃত্ত লক্ষ করলে মনে হতেও পারে, তাঁরা মূলত 'গীতাঞ্জলি'র কবির নাটক বলেই রবীন্দ্রচর্চা করে যাচ্ছেন—তার ভিতর দিয়ে নতুন কোনো উদ্বোধনে হয়তো তাঁরা পৌঁছতে পারছেন না। তবু তারই ভিতরে রবীন্দ্রকল্পিত আন্তর্জাতিক ভারতীয় নাট্যভাবনাকে তাঁদের নিজেদের নাট্যরুচি অনুযায়ী যেমন করে সাজিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা—সে ইতিহাস বেশ মুগ্ধ করে। তার চেয়েও বড়ো কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে বিশেষত জার্মানী ও ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের নাটক হয়ে দাঁড়াচ্ছে অসহায় আর্ত মানুষের বিরামস্থল। অপরপক্ষে, এই যুদ্ধের কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ এই দুই দেশের নাট্যচর্চার আধুনিকতম ভাবনায় রীতিমতো অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছেন—সেই প্রেরণাবশত জন্ম নিচ্ছে রক্তকরবী-মুক্তধারা-কালের যাত্রা-তাসের দেশ কিংবা চণ্ডালিকার মতো নাটক।

বলা বাহুল্য, বাংলার পেশাদার রঙ্গালয়ের পরিকাঠামো কোনোকালেই রবীন্দ্রনাটকের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিক্‌কার ভাবনা থেকে লেখা নাটকগুলির মধ্যেই যেগুলি বিষয়ে বা বক্তব্যে ঈষৎ ভারি—সেগুলি গ্রহণ করাই ভাবাবেগপ্রবণ বিনোদনপ্রত্যাশী পেশাদার মঞ্চের দর্শকবর্গ গ্রহণ করেননি। নতুন রীতির নাটক গ্রহণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। এব্যাপারে হরীন্দ্রনাথ দত্তের মতো ঐতিহাসিকরা রবীন্দ্রনাটককে দায়ী করতে পারেন, অথবা রবীন্দ্রানুরাগী গবেষকগণ ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে 'রক্তকরবী' না করা এবং পরবর্তীকালে এই অক্ষমতা ঢাকতে তাঁর ওই নাটকটিকেই দায়ী করার অভিযোগ করতে পারেন—তাতে কিছুই যায় আসে না। রবীন্দ্রনাটক যে প্রধানত বাংলার অপেশাদার নাট্যমঞ্চের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠবে এ সত্য এইজন্যই অনিবার্য ছিল, কেননা প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন নাট্যরুচির বাইরে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে তাঁর নাট্যমুক্তির পথ খুঁজেছিলেন, দ্বিতীয়ত, তাঁর নাটকের ভাববস্তুতে ধরা পড়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের আধুনিকতম জিজ্ঞাসা, তৃতীয়ত, সেই ভাবনাকে প্রকাশ করবার জন্য তিনি যে প্রকরণের উদ্ভাবন করেছিলেন, তা আধুনিক পৃথিবীর নাট্যপ্রকরণকে ঐতিহ্যায়ত নাট্যরীতির সঙ্গে একীভূত করে তৈরি করছে।

কিন্তু এই সংযোগ সম্মেলনে বাধা হয়ে দাঁড়াল দুটি। প্রথমত, বিশিষ্ট সমালোচক ও পণ্ডিতবর্গ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নাটকগুলিকে এক রহস্যময় অধ্যাত্মভাবনা পুষ্টি তত্ত্বের পোশাক পরিয়ে আড়াল করে দিলেন। সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে তাঁর নাটকগুলিও হয়ে দাঁড়াল এমন কি বুদ্ধিজীবী নাট্যকর্মী বা নাট্যরসিক বাঙালির পক্ষেও সম্ভ্রমসূচক দূরত্বের বস্তু। দ্বিতীয়ত, আধুনিক অপেশাদার থিয়েটারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল বস্তুনিষ্ঠ নাটক করা, কেননা তার কর্তব্য হয়ে উঠল সামাজিক দায়বদ্ধতায় চালিত হয়ে সমাজ পরিবর্তনের কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাটকের বস্তুতন্ত্র কখনোই বাইরের চেহারা সর্বস্ব নয়, তার বাস্তবতা কাব্যেরই দোসর—তাকে আবিষ্কার করতে হয় নতুন মঞ্চভাষ্য ও তাৎপর্যে। রবীন্দ্রশতবর্ষ থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাটক গণনাট্য সংঘের নানান শাখা এবং গত পঞ্চাশ বছরে অজস্র নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা বারবার অভিনীত

হয়ে আসছে—কিন্তু যাবতীয় বিরোধের দায়িত্বপূর্ণ মীমাংসার সূত্র সন্ধান করে যে প্রয়োজনাগুলি নিজেদের নাট্যচর্চা ও রবীন্দ্রচেতনার প্রতি সুবিচার করতে পেরেছে, তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা হওয়া জরুরি। সেই সঙ্গে জরুরি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রবীন্দ্রনাটকের তাৎপর্যপূর্ণ অভিনয় সম্পর্কে সংবাদ নেওয়া এবং—অবশ্যই, নতুন দিনের স্বচ্ছ আলো আর সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তত্ত্বকে মনে রেখেই তত্ত্বসর্বস্বতাকে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাটকের অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ।

পর্যবেক্ষক রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের আধুনিকতা

জহর সেনমজুমদার

আজ এই চলমান সময়স্রোতে অন্তর্যোগে ও অন্তর্ঘাতে একটি মীমাংসিত সত্যে আমরা সহজেই স্থির হতে পারি যে সর্বকালীন এবং সর্বজনীন আধুনিকতা বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা সেই পর্যায়ভুক্ত; যতবার যুগ পরিবর্তিত হয়েছে কিংবা যতবার দৃষ্টান্তস্বরূপ বদলে গেছে প্রথাবদ্ধ মূল্যবোধ—বদলানো সেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও আরও বেশি করে উজ্জ্বলতর চলমানতায় গ্রাহ্যতা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা; ফলে রবীন্দ্রনাথ কালও আধুনিক ছিলেন; আজও ততদূর প্রসারিত আধুনিক; তাঁর আধুনিকতা মর্জি নয়, হঠাৎ বাঁক ফেরা চিত্তবৃত্তি নয়—তাঁর আধুনিকতা নিঃশব্দ প্রজ্ঞার অন্তহীন ধারাবাহিক চলন; মর্মে মর্মে এতখানি আধুনিক হাওয়া সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই যে তিরিশের দশকের কবিদের নব্য আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথের অন্তরবাসী সত্তা ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি; আর আমাদের প্রশ্নটা উঠে আসে ঠিক এখান থেকেই; কেন পারলেন না তিনি? কোথায় ছিল তাঁর দ্বিধা কিংবা অসুবিধা? এই দ্বিধাজাত প্রতিক্রিয়াই নানা সময় নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে কখনও তাঁর বিশ্লেষণী গদ্যে; কখনও অন্তরঙ্গ চিঠিপত্রে; আবার কখনও ইঙ্গিতধর্মী কবিতায়; প্রত্যক্ষভাবে; পরোক্ষভাবেও; যত দিন গেছে, দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিধাজাত প্রতিক্রিয়া ক্রমশই পরিণত হয়েছে উষ্মায় উৎকণ্ঠায় বিরক্তিতে বিরোধিতায়; এমনটা কিন্তু সমাহিত রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল না; তাহলে কি সমাহিত রবীন্দ্রনাথের সহিষ্ণু প্রত্যয়ে কোথাও তখন তাৎক্ষণিক টান পড়েছিল? তাহলে কি সমাহিত রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তি ও প্রসন্নতার ধ্যানভঙ্গ ঘটবার মতো আধুনিকতা তাঁকে সমূলে বিব্রত করতে শুরু করেছিল? একদা রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতায় সেরেনিটি (serenity)-র অভাব লক্ষ করেছিলেন; জীবনানন্দকে চিঠি লিখে সেকথা তিনি বলেওছিলেন; প্রশ্ন ওঠে তিরিশের নব্য আধুনিকতা প্রসঙ্গে গদ্যে কিংবা চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, সেই মনোভাবও কি একধরনের সেরেনিটির অভাব নয়? এইসব প্রশ্নের বিস্ময় ও তীক্ষ্ণতা ক্রমশই কিন্তু অনিবার্যভাবে আমাদেরও মন ও মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে দিতে শুরু করেছে; সুতরাং অবশ্যই জানা দরকার নব্য আধুনিকতার বিরুদ্ধে কোথায় ছিল তাঁর আপত্তি? কেন ছিল তাঁর অপছন্দ? সেই আপত্তি বা সেই অপছন্দের পর্যায়ক্রমিক বিভঙ্গে সত্যিই কি তিনি তিরিশের আধুনিকতার প্রতি এবং আধুনিক কবিদের প্রতিও প্রজ্ঞাদীপ্ত সুবিচার করতে পেরেছিলেন? আমরা বলতে বাধ্য : একেবারেই নয়; বরং তিরিশের নব্য আধুনিকতার চরিত্র ও স্বরূপবিচারের ক্ষেত্রে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী আজকের সময়ের প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণতই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে; তিরিশের কবিরা প্রায় সম্মিলিতভাবেই রবীন্দ্র ভাবনা ও রবীন্দ্র উৎকণ্ঠাকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে পরবর্তী বাংলা কবিতার জগতে স্থায়িত্ব অর্জন করে নিতেও পেরেছেন; তাহলে কোথায় ভুল ছিল রবীন্দ্র অভিজ্ঞানের? যে দিক নির্দেশী বিচার সবসময়েই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রত্যাশিত

ছিল, তিনি কেন এবং কোন কারণে সেই প্রত্যাশাপূরণে অসফল হলেন? এই সত্য কালের নিয়মে এবং কবিতার ইতিহাস রচনায় আমাদেরও আজ জানা দরকার।

দুই

একথা অনস্বীকার্য যে অগ্রজ কবিমাত্রই বহু শ্রমে বহু সাধনায় নিজস্ব একটি কাব্যজগৎ তিল তিল করে গড়ে তোলেন; এঁদের মধ্যে কম শক্তিসম্পন্ন অগ্রজ কবিরা পরবর্তী কবিদের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথের মতো একজন দু-জন অগ্রজ কবি সব যুগের সবকালের কবিদের কাব্যরচনার মধ্যে নিজস্ব মহিমায় বিচরণ করেন; সম্প্রসারিত এবং সংক্রমিত হন; সেটাই স্বাভাবিক এবং শিরোধার্য; রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন এই কথা; তিনি জানতেন, তিনি থাকবেন, পরবর্তী সবার মধ্যেই থাকবেন; ছিলেনও সেইভাবে; যতীন্দ্রমোহন বাগচী কুমুদরঞ্জন মল্লিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কালিদাস রায়দের কবিতায় নানাভাবেই ছড়িয়ে ছিল তাঁর বিশ্বাস তাঁর ভাবনা; বাংলা কবিতার চলমান শাশ্বত রূপ গঠনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রবিশ্বাস এবং রবীন্দ্রভাবনাকে এঁরাই কিন্তু আরও বৃহত্তরভাবে চিরকালীন চিরপদার্থে পরিণত করেছেন; যতই এঁদের রবীন্দ্র-অনুকারী বা অনুসারী কবি বলা হোক না কেন, এঁরা কিন্তু অনুকরণ বা অনুসরণের থেকেও বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন বাংলা কবিতার চলমান শাশ্বত রূপটাকেই; কবিতা চর্চার মাধ্যমে সাধনা করেছেন বাংলা কবিতার ধারাবাহিক চলন এবং গমনের চিরন্তনীকে; এক্ষেত্রে রবীন্দ্রবিশ্বাস এবং রবীন্দ্রভাবনা সেই চলন ও গমনের সহায়ক হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁরা কিন্তু আমূল আস্তিক্যে রবীন্দ্রনাথকে আষ্টেপৃষ্টে সব অর্থেই আঁকড়ে ধরেছিলেন; রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন কুমুদরঞ্জনদের দ্বারা বাংলা কবিতার স্বাভাবিক সনাতন স্বভাবধর্ম নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই, ধ্বস্ত হবারও আশঙ্কা নেই; রবীন্দ্র পরবর্তী প্রাথমিক আধুনিকতার সূত্রপাতে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামরাও স্বর বদলালেন ঠিক কথা, বিষয়ের নতুনত্বও আনলেন ঠিক কথা, কিন্তু চলমান স্বাভাবিকতার কোনো বড়োরকমের ব্যাঘাত ঘটালেন—এমনটা নয়; নতুন কণ্ঠে পুরোনোর এই ফেরি-র মধ্যে এমন কোনও অস্বাভাবিকতা এবং অপ্রকৃতিস্থতা ছিল না যা প্রতিদিনের স্বাভাবিক নান্দনিকতার পক্ষে বিসদৃশ বা প্রতিপ্রশ্নস্থাপক; সুতরাং এঁদের নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বড়ো রকম ভাবনায় পড়েননি; ভাবনাটা শুরু হল তিরিশের কবিদের নিয়ে; তাঁদের প্রবণতা নিয়ে; এই সময়েই প্রথম রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হলেন; কারণ তাঁর স্পষ্টই মনে হল চিরন্তনী স্বাভাবিক নান্দনিকতার কোথাও যেন একটা টান পড়ছে; কোথাও যেন এই চিরন্তনী স্বাভাবিক নান্দনিকতার নীতিনৈতিকতা খুব দ্রুত ভেঙে পড়ছে; রবীন্দ্রনাথ উদ্বেগের সঙ্গেই এই ভাঙনটাকে সনাক্ত করতে গিয়ে ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থে ‘সাহিত্যের নবত্ব’ প্রবন্ধে বলেছিলেন :

> বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অ-পূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। একেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনই সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল করে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে তখনই বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য-ধারায় নৌকো চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্‌ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে

> স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। ... এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি একথা মানতেই হবে। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্কা না করে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনই বুঝি, সর্বনাশ হল বলে।

এইসব কথার মধ্যে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথের ভেতরকার চিন্তা ও উদ্বেগ যেমন পাই, তেমনই পেয়ে যাই নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের 'ঝাঁজ'-এর প্রতি তাঁর তীব্র উষ্মা বা বিরক্তিও। সাহিত্য নৈতিক চিত্তবিকারের ঝাঁজ নয়, সাহিত্য লালসাকে উন্মথিত করবার মস্ত ওস্তাদি নয়, সাহিত্য শস্তা উত্তেজনার উদ্‌গীর্ণ নির্লজ্জতা নয়—এইসব কথনের মধ্যে বোঝা যায় একজন ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন; একজন আক্রমণাত্মক রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন; গদ্যটির রচনাকাল আগস্ট ১৯২৩; প্রায় এক দশক পরেও রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর এই উৎকণ্ঠিত মতামত থেকে এতটুকু সরে আসেননি, তার উদাহরণ অবশ্যই 'আধুনিক কাব্য' গদ্যটি; রচনাকাল এপ্রিল ১৯৩২; দুটি গদ্যেই লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ স্বাভাবিতার বিরুদ্ধে গাঁজিয়ে ওঠা এবং ঝাঁঝিয়ে তোলা বিকৃতিকে সনাক্ত করতে করতে সমকালীন প্রবণতাকে ধুলোয় লুটোনো মাতলামি বলতেও দ্বিধা রাখেননি; নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ বর্জন করে যে সব কবিরা কাদা এবং পাঁকের মধ্যে কবিতাকে টেনে নামাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বিকৃত চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধে এই দুটি গদ্যে যে মতামত সেদিন জ্ঞাপন করেছিলেন, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিরিশের আধুনিকতার অন্তর্গত স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা ও বিবমিষা কতখানি গভীরে চলে গিয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ প্রগাঢ়ভাবে এও বিশ্বাস করেছিলেন চলমান নান্দনিক কাব্যবিশ্ব এই আধুনিক আবর্জনা কিছুতেই গ্রহণ করবে না; মহাকালের করতলে ঠাঁই হবে না এই উত্তেজনার, এই লালসার, এই কুৎসিত কল্পনার; রবীন্দ্রনাথ তিরিশের এই আধুনিকতাকে অঘোরপন্থী আধুনিকতা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি; 'আধুনিক কাব্য' গদ্যটিতে তিনি তাই স্পষ্ট তীক্ষ্ণতায় বলেছিলেন :

> অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয় তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়। কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না—প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব সাধনা বলে বাহাদুরি করতে হবে।

কিন্তু সময়ের বহুরৈখিক স্তর স্তরান্তরে বদলে গেছে জীবনের অনেক কিছুই; বদলে গেছে সমাজপ্রেক্ষিতও। পরিবর্তিত মূল্যবোধের প্রবাহিত চেতনার কাছে তাই কাল যা ছিল একেবারেই বর্জনীয়, আজ তা জীবনের প্রতিটি পর্বেই প্রবলভাবেই সমাদৃত; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তিরিশের আধুনিকতাকে অঘোরপন্থী আধুনিকতা ভাবলেও আমাদের মনে আজ কিন্তু প্রশ্ন জাগে সেদিনের সেই আধুনিকতার সম্পূর্ণটাই কি অঘোরপন্থী আধুনিকতা ছিল? কিংবা সবটাই কি ছিল উত্তেজনা, লালসা আর কুৎসিত কল্পনার? তা তো নয়; যদি রবীন্দ্রনাথের অভিমতই সত্যতা পেত—তাহলে কিন্তু বাংলা কবিতা থেকে জীবনানন্দরা পরবর্তী সময়কালে একেবারেই মুছে যেতেন; তাহলে বোঝাই যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিও সেদিন চিনতে পারেননি তিরিশকে; বুঝতে পারেননি

তার আধুনিক স্বভাবধর্মের গতিপ্রকৃতিকে; এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যা করলেন, অর্থাৎ তাঁর মনোধর্মের বা স্বভাবধর্মের সঙ্গে যাঁদের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যবাচক আত্মীয়তা লক্ষ করলেন—তাঁদের তিনি সস্নেহ অভিভাবকত্ব দিয়ে কৌতুকে কাছে টানলেন আর মনোধর্মের বা স্বভাবধর্মের চক্রব্যূহ থেকে বাইরে বসবাসকারী কবিদের সম্পর্কে বেশ খানিকটা বিরূপ ও অভিব্যক্তিহীন ভূমিকা পালন করতে শুরু করলেন; রবীন্দ্রনাথের এ হেন প্রশ্রয় ও ঔদাসীন্যের মানসিক চলনপ্রক্রিয়া ওপর থেকে কিন্তু চট করে বোঝা সম্ভব নয়; একটু মনোযোগ দিয়ে কিংবা পর্যবেক্ষণ সহকারে কবি-লেখকদের কাছে লেখা চিঠিপত্রগুলো দেখলেই বোঝা যায় পছন্দ-অপছন্দের মাত্রাভেদ, আনুকূল্য ও নিস্পৃহতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ; উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রথমেই দুটি বিপরীত চিন্তার চিঠিতে মনোস্থাপন করতে চাই। প্রথমেই অপরাজিতা দেবী অর্থাৎ রাধারাণী দেবীকে লেখা চিঠিটি (২৯ বৈশাখ, ১৩৩৮) উদ্ধৃত করা আবশ্যক, যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> তোমার কবিতাগুলি পড়ে দেখলুম। ভাল লাগল। তোমার রচনার ভাষা ও ভঙ্গী তোমার স্বকীয় পন্থা অবলম্বন করেছে অথচ তার স্খলন হয়নি। যারা তোমার কবিতাকে অশ্লীলতার অপবাদ দিয়েছে তাদের কথায় কান দিও না। তাদের মন অশুচি। ... লেখবার যে সহজ শক্তি তোমার আছে তা নিয়ে তুমি গৌরব করতে পারো।

ঠিক এরই পাশাপাশি পরবর্তী আধুনিক কবিতার গুরুত্বপূর্ণ স্থপতি জীবনানন্দকে কাব্যসূচনার আদিতে সংশয়প্রবণ অসহযোগে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিটি লেখেন, তা অত্যন্ত মর্মবিদারক। রাধারাণী দেবীর ভাষা ও ভঙ্গি নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, সেই একই রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের ভাষা নিয়ে বেশ কয়েকটি ইঙ্গিতবহ কটাক্ষ করেছেন। জীবনানন্দের নতুন ভাষার এবং নতুন ভঙ্গির ছবিময় দক্ষতা রবীন্দ্রনাথকে তখন একেবারেই স্পর্শ করেনি বোঝা যায়; পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার ইতিহাস অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কোনোভাবেই সমর্থন করেনি; তাহলে বাংলা কবিতায় রাধারাণী দেবী থাকতেন, জীবনানন্দ নন; হতে পারে জীবনানন্দ তখন সবে কবিতা লিখছেন; হয়তো কাঙ্ক্ষিত পরিপক্কতা তেমন ছিল না; কিন্তু তাঁর কবিত্বশক্তির বিচ্ছুরিত দ্যুতি একেবারেই ছিল না এমনটা তো নয়; চিঠির শুরুতে সেই কবিত্বশক্তির স্বীকৃতিও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ; তথাপি এও বলেছেন :

> তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যেও একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্টো।

লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত শব্দাবলী। 'জবরদস্তি' এবং 'ওস্তাদী' শব্দদ্বয় যথেষ্ট তীক্ষ্ণ এবং লক্ষ্যভেদী; রবীন্দ্রনাথ এও বুঝিয়ে দিয়েছেন জীবনানন্দের রচনাকর্ম বড়ো জাতের নয়; কারণ? সেখানে পরিশ্রুত শান্তির ব্যাঘাত রয়ে গেছে; রবীন্দ্রনাথ এখানে 'শান্তি' দেখলেন, যা আসলে নিজের সময়ের এবং নিজস্ব মানসের শান্তি; কিন্তু দেখেও দেখলেন না জীবনানন্দ নিজে কোন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। দেখেও দেখলেন না পৃথিবীর চারিপাশে সময়ের স্রোত কতখানি পঙ্কিল হয়ে গেছে। তর্কের প্রবণতায় মনে করা যেতে পারে জীবনানন্দের অপরিপক্ক কাব্যপ্রয়াসই রবীন্দ্রনাথের হয়তো অপছন্দের কারণ হতে পারে। কিন্তু এই তর্কও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না যখন আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বেরিয়ে

যাবার পরেও 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটির অঙ্গহানি করে সংকলনে গ্রহণ করেছিলেন, যা যথেষ্ট বিতর্কিত ও অমর্যাদাকর। রবীন্দ্রনাথের এমন পরিমার্জনা কবি বুদ্ধদেব বসুও সহ্য করতে না পেরে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। জীবনানন্দ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তার জন্য প্রত্যাহার করেননি; একই কাজ রবীন্দ্রনাথ শুধু জীবনানন্দের ক্ষেত্রেই করেছিলেন এমন নয়; আর তাই যে প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র পেয়েছেন, সেই প্রেরণা কখনোই পাননি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; যে আশীর্বাদ পেয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার কণামাত্র লাভ করতে পারেননি; এমনকি যে অনুরাগী বচনবাণীতে আপ্লুত করেছেন মৈত্রেয়ী দেবীর 'উদিতা' কিংবা বন্দে আলী মিয়ার 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থ, সেই সহায়ক আনুকূল্য থেকে অনেকক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়েছেন কখনও বুদ্ধদেব বসু আবার কখনওবা বিষ্ণু দে-র মতো কবি; এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিরপেক্ষতা আজকের প্রেক্ষিতে আমাদের বিস্ময়চিহ্নের সামনে পড়ে যায়; এই বিস্ময়চিহ্ন নিয়েই আমরা দুটি চিঠির দ্বৈততায় আরও একবার ডুব দিতে পারি। সেই দ্বৈততার প্রথম পাঠে সুধীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্র চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না; রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিনিবেশী ভক্তকে এই চিঠিতে লিখেছেন :

> বাংলা সাহিত্যে তুমি যথার্থই আধুনিক কিন্তু তোমার কাব্য আধুনিকত্বের ভেক ধারণ করতে উপেক্ষা করেছে, অথচ পরিচিত কাব্যের নেপথ্য বিধানে যে উত্তরীয় তোমার পছন্দ হয়েছে সেটা সহজেই গায়ে দিয়ে সাহিত্যসভায় প্রবেশ করতে তোমার কুণ্ঠা হয়নি।

উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথ কথিত 'আধুনিকত্বের ভেক' বাক্যবন্ধে আমাদের একটু স্থিতধী হতে হবে। কারণ এই বাক্যবন্ধ থেকেই তো সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্নটি উঠে আসে। তিরিশের আধুনিকতায় তাহলে 'আধুনিকত্বের ভেক' ছিল? তিরিশের আধুনিকতায় তাহলে কেউ কেউ সেই 'ভেক' গ্রহণও করেছিল? কারা তাঁরা? রবীন্দ্রনাথের ছড়ানো মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে নামগুলো কিন্তু বেশ ভালোভাবেই সনাক্ত করে নেওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখানেই থেমে যাননি; সুধীন্দ্রনাথও এই চলমান প্রশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে যতটা পেরেছেন ততটাই রবীন্দ্রনাথের 'অপরিমিত দাক্ষিণ্য' আজীবনের 'প্রাপ্য বলেই কুড়িয়ে' নিয়েছেন। এভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছেন 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যগ্রন্থটি সুধীন্দ্রনাথকেই সানন্দে উৎসর্গ করেছিলেন। আর সুধীন্দ্রনাথ? আত্মলঘিমার বিনয়ে এই সম্মান গ্রহণ করে চিঠিতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত এও জানিয়েছিলেন— ''আকাশ প্রদীপ আপনার গ্রন্থাবলীর সমোচ্চ উৎকর্ষেও প্রথম শ্রেণীর।'' এই সূত্রে স্মরণ করা দরকার 'আকাশ প্রদীপ'-এর উৎসর্গপত্র, সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্ত প্রায় হয়ে এসেছে এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে, এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

তাহলে রবীন্দ্র-ভাবাদর্শ বিরোধিতার কালে সুধীন্দ্রনাথের দিক থেকে কোনো 'অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য' উত্থিত হয়নি বলেই কি প্রসন্ন রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথকেই 'আকাশ প্রদীপ' অর্পণ করেছিলেন? সুধীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে কোনো অস্বীকৃতির সংশয় থাকলে তাহলে কি কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্র পাল্টে যেতো? তাছাড়া আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেছেন— ''তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।'' বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক

সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে' সুধীন্দ্রনাথকে প্রধান প্রতিভূ হিসেবে স্থান দিতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত নন। অথচ এরই পাশাপাশি তিনি বিষ্ণু দে-কে একটি চিঠিতে (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) 'চোরাবালি' প্রসঙ্গে বলেছেন—''তোমার নতুন লেখা বইখানি পড়তে চেষ্টা করিনি তা ঠিক নয়। কিন্তু তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছ যে আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে।" এরই পাশাপাশি অচিন্ত্যকুমারকেও তাঁর 'মিথুন প্রবৃত্তি' বিষয়ে অভিযুক্ত করে বলতে এও দ্বিধা করেননি—পৌনঃপুন্য প্রমত্ততা নয়, 'সংযম আবশ্যক'। তৎসহ এও বলেছেন—''লালসার অতি বর্ণনায় আমরা মানুষের যে মূর্তি দেখি সেটা বীভৎস ... এরকম রোগবিকারের বর্ণনার স্থান সাহিত্যে নয়, এটা ডাক্তারি শাস্ত্রে শোভা পায়।" বলা দরকার অনেকক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ ব্যজস্তুতির ঘনীভূত সাহায্যও নিয়েছেন। বিশেষ করে কাউকে কাউকে লেখা চিঠি পড়লেই বোঝা যায় তিনি যা বলছেন, লিখছেন, তার ভেতরে রয়ে গেছে গভীরতর তির্যকতা, ইঙ্গিতবহ অন্য কথা অন্য অভিপ্রায়; সুতরাং তিরিশের আধুনিকতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই কিন্তু স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব অবস্থানগত ভাব ও ভাবনাজগৎ; যেখান থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসবার বা সরে যাবার বাসনা তাঁর ছিল না; আসলে নিজস্ব অবস্থানগত ভাব দিয়ে ভাবনা দিয়ে তিনি সর্বতোভাবেই তিরিশের আধুনিকতাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। তিরিশের আধুনিকতায় তিনি কখনো দেখেছেন 'দারিদ্র্যের আস্ফালন', কখনো দেখেছেন 'লালসার অসংযম।' তিরিশের আধুনিকতায় তিনি কখনো পেয়েছেন 'ভাষার মাতলামি', কখনো পেয়েছেন 'দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা'। তিরিশের আধুনিকতায় তিনি কখনো শুনেছেন 'পাকশালার প্রলাপ', আবার কখনো শুনেছেন আত্মপ্রতারণাজাত 'ব্যক্তিগত চিত্তবিকার'। নিজের মধ্যে নিজেকে এবং বিশ্বকে সমাহিত করতে করতে তিনি বিরক্তির সঙ্গেই সেদিন পার হয়ে যেতে চেয়েছিলেন এ হেন উঞ্চি পরা ফ্যাসন ও বিকৃত প্রকৃতির আবর্জনাকে। আর তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন তিরিশের আধুনিকতাকে 'হুজুগ' প্রতিপন্ন করে 'সত্যকার কাব্যাদর্শ'-কে সম্মানিত করবার প্রচেষ্টায় 'নিরুক্ত' পত্রিকা বার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে চিঠি পাঠালেন, রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন; খুশি হয়েছিলেন সম্ভবত এই ভেবে যে তাঁর দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যলালিত সাহিত্যবোধের নিঃশব্দ লাবণ্যের প্রতি তাহলে এক শ্রেণির তরুণ কবির আস্থা এখনও রয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাহলে সেই আস্থারই নিসঙ্কোচ স্বীকৃতি (তৎসহ 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থটি পাঠাতেও ভুল করেননি) দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় 'নিরুক্ত' পত্রিকার জন্য আশীর্বাদ ও উৎসাহ প্রার্থনা করা কালে প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথকে এও লিখেছিলেন—''বর্তমান বাংলা কবিতায় কোথাও কোথাও যে নকল করা বাতুলতার হুজুগ চলছে তাতে আপনার সহানুভূতি ও স্নেহ থাকতে পারে না বলেই আমাদের ধারণা।" যেহেতু এই ধারণা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল, তাই তিনি প্রত্যুত্তরে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ২২.৮.১৯৪০-এ লেখা চিঠিতে অত্যন্ত উষ্মা সহকারেই লিখেছিলেন :

> কিছুকাল থেকে ভাষায় বিকৃতি ছন্দের স্খলন ও ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে। সাহিত্যে এই মারীর সংক্রামকতা এখনকার বাতাসকে অধিকার করেছে সুতরাং বাহির থেকে কোনো প্রতিকার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। রুগ্ন সাহিত্য হয় আপনিই আপনার সাংঘাতিকতাকে নিঃশেষিত করে দেবে, নয়তো বিদেশী সাহিত্যের পালে যখন হাওয়া দেবে উল্টো দিকে তখন দেখাদেখি এরাও সেইদিকে পালের মুখ ফেরাবে। তোমাদের রচনায় সাহিত্যের সুস্থ স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকো। সেই দৃষ্টান্তের ফল যতটুকু হয় ততটুকুই ভালো। মানুষ ফ্যাশানের তাড়ায় দীর্ঘকাল নিজেকে ব্যঙ্গ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই, সেইদিনের জন্য অপেক্ষা কর এবং অবিচলিত চিত্তে আপন কর্তব্য করতে নিযুক্ত থাক।

তিরিশ দশকের আধুনিক অবস্থান এবং অবস্থানগত চিত্তপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত রবীন্দ্র-ভাবনা এই চিঠিতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়েছে। বোঝা যায় এই সময়ের লিখনকর্মে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই 'মারীর সংক্রামকতা' এবং 'ফ্যাশানের তাড়া' লক্ষ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এ-সবই 'রুগ্ন সাহিত্য'। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ তিরিশের আধুনিকতায় নিজেকে ব্যঙ্গ করবার আত্মপ্রতারণাই শুধু ক্রমাগত দেখেছিলেন, যা তাঁর একবারেই পছন্দ ছিল না। 'সাংঘাতিকতা' শব্দের প্রয়োগ মুখ্যত সেইজন্যই। এই চিঠির একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে অবশ্যই অভিনিবেশ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ এখানে অত্যন্ত সচেতনভাবেই 'বিদেশী সাহিত্যের' প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। কেননা সেই সময়পর্বে তিনি দেখেছিলেন তিরিশের কবিরা মুখ্যত বিদেশি সাহিত্যের অনুগামী। বিদেশি সাহিত্যের অভিমুখ লক্ষ করেই এরা কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও পিছিয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ এই পাশ্চাত্য প্রবণতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন এ অহেতুক এ অকারণ। এর ফলে নিজত্ব এবং নিজস্ব দুই-ই চলে যাবে। আমাদের সাহিত্যপরম্পরা বা তার চলমান ঐতিহ্য ঢের বেশি উপাদেয় ঢের বেশি সম্পদশালী। এই প্রচুর দেশজ ভাঁড়ার ছেড়ে কেন এমন পাশ্চাত্যপ্রীতি? বিদেশি সাহিত্যের পালে উল্টো হাওয়া কখন বইবে আর কেন তার ওপর নির্ভর করে থাকবে আমাদের সাহিত্যচর্চা? চিঠিতে এতটা খুলে বলেননি রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে তা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার এর অন্তরালে কিন্তু অবভাসের মতো রয়ে গেছে। তা হল—সে সময় বুদ্ধদেব বসুর মতো কেউ কেউ (দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটি) রবীন্দ্র-অনুসারী বা রবীন্দ্র-অনুকারী কবিদের তীব্র ভাষায় ক্রমাগত আক্রমণ করছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন বাংলা কবিতা রবীন্দ্রবলয় থেকে সবদিক থেকেই মুক্ত হোক। রবীন্দ্রনাথও তা জানতেন। জানতেন বলেই তিনিও তিরিশের আধুনিকতাকে বিদেশি সাহিত্যেরই অনুগামী বা অনুসারী বলে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন রাখতে চেয়েছিলেন একটাই। তা হল—রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে কুমুদরঞ্জনরা যদি রবীন্দ্র অনুসারী কবি বলে নিন্দিত হন, তাহলে পাশ্চাত্য সাহিত্য অনুগমন করে তিরিশের কবিরাই বা কেন অকারণে বন্দিত হবেন? তাঁরাও কেন একই দোষে অভিযুক্ত হবেন না? হয়তো এমন ভাবনা রবীন্দ্রমনে জাগ্রত হওয়াটা স্বাভাবিকই ছিল। সেই স্বাভাবিকতারই অন্তর্বর্তী প্রতিফলন আমরা দেখি কামাক্ষীপ্রসাদকে লিখিত, ১৯৩৮-এর ৪মে লিখিত রবীন্দ্রচিঠিতে; যেখানে তিনি আরও তীক্ষ্ণ, আরও তির্যক, আরও শানিত। এখানে তিনি লিখেছেন যে কথা, তার উদ্ধৃতি সমধিক গুরুত্বে আবশ্যক :

> তোমাদের ছন্দহারা কবিতাগুলি দেখে মনে হয় যেন আধুনিক কাব্য যুগের বিনতানন্দন। ডিম ভালো করে ফোটবার আগেই বেরিয়ে পড়েছে—ডানা সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু খিদে ও চঞ্চলতা কম নয়। তোমরা রবি রথের বলগা ছিন্ন করে ধুমকেতুর মতো দৌড় মারবার চেষ্টায় আছ, একটা সৃষ্টিছাড়া জগতের দিকে এমন পথ বানাতে চাও যার কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যাবে না—কেন্দ্রবিদ্রোহী বৈরাগী তোমরা।

রবীন্দ্রনাথ এখানে আর নিজেকে একেবারেই নিরপেক্ষ অন্তরালে রাখলেন না; বরং নিজের ভেতরে উদ্ভূত কথনটি বাইরে আনলেন তিনি এবং সরাসরি বলে দিলেন তাঁর চূড়ান্ত কথাটি—"তোমরা রবি রথের বল্‌গা ছিন্ন করে ধুমকেতুর মতো দৌড় মারবার চেষ্টায় আছ।" তারপর এও বললেন—"এমন পথ বানাতে চাও যার কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।" বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়—তাহলে তিরিশের আধুনিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি ও আপত্তির মূলীভূত কারণ এখানেই

নিহিত। 'রবি রথের বলগা' ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ এই প্রবণতা কীভাবে মনে নেবেন? কীভাবে সমর্থন করবেন? জ্ঞানত তিনিও ভালো করেই জানতেন চলমান বাংলা কবিতার একমাত্র গ্রহণযোগ্য 'কেন্দ্র' তিনিই। তিরিশের আধুনিকরা সেই 'কেন্দ্র'কেই চারপাশ থেকে ঘিরে আবর্তিত এবং বিচ্ছুরিত হবে, এমনটাই তো তাঁর কামনা। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। বরং তিনি বিস্ময়াপন্ন হয়ে দেখলেন—তিরিশের কবিরা 'অদ্ভুত ছাপের উল্কিপরা ফ্যাশন' নিয়ে কিংবা 'বাঁকা ভঙ্গীর দুর্বোধ্যতা' নিয়ে 'আবিলতার চর্চা' করতে করতে একেবারেই 'কেন্দ্রবিদ্রোহী' হয়ে পড়েছে। রক্তমাংসের রবীন্দ্রনাথ এই কেন্দ্রবিরোধীতা-ই সহ্য করতে পারেননি। তিরিশের আধুনিকতা দেশ ছেড়ে, ঐতিহ্য ছেড়ে, স্বধর্ম ছেড়ে, এমনকি এসবের সম্মিলিত সারাৎসারস্বরূপ অনির্বচনীয় 'কেন্দ্র' রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে এইভাবে টি.এস.এলিয়ট কিংবা বোদলেয়ার কিংবা লরেন্সের শরণাপন্ন হয়ে নিজ নিজ কাব্যাদর্শের পথ তৈরি করবে—রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সমগ্র গমনটাই একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন। তিনি মানতে পারেননি, তিনি ভাবতে পারেননি, তিনি গ্রহণ করতেও পারেননি। তিরিশের আধুনিকতায় ভাবে ও ভঙ্গিতে যে নতুনত্ব এসেছিল, তা তিনি হয়তো মানতেও পারতেন, যদি কেন্দ্রীয় ভাবস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ সমাদৃত গ্রাহ্যতা পেতেন। কিন্তু পাননি; আর পাননি বলেই উষ্মা ক্রমে পরিণত হয়েছে বিরক্তিতে; বিরক্তি ক্রমে পরিণত হয়েছে ব্যক্তিগত বীতরাগে। এইজন্যই ১৯৪০ সালের ১৯ মে তিনি কামাক্ষীপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে এলিয়ট অডেন প্রভৃতি ইংরেজ কবির উল্লেখ করে 'অভ্যস্ত ভাষাধারার কাঠামো' যে ভেঙে পড়েছে তা যেমন বলেছিলেন, তেমনই এও বলে দিয়েছিলেন—"মুস্কিল এই আধুনিকের বাজারে কাব্যে স্বচ্ছতার মূল্য কমে গেছে। ইচ্ছা করে এই আবিলতার চর্চা করছ কিনা বুঝতে পারিনে।"

তিন

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে বাংলা কবিতার 'সিদ্ধিদাতা গণেশ' রবীন্দ্রনাথের কাছে তিরিশের আধুনিকতা আসলে একধরনের রুগ্ন সাহিত্য এবং ইচ্ছাকৃত আবিলতার চর্চা। রবীন্দ্রনাথ 'বাজার' শব্দটি প্রয়োগ করে তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাবকে কিন্তু তীব্রভাবেই সে-সময় সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। ভাগ্যিস, তিরিশের আধুনিকতায় জীবনানন্দের মতো কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের এমন বিরুদ্ধ কথন দ্বারা আবিষ্ট হননি। হলে বাংলাকবিতার পরবর্তী গতিপ্রকৃতির রূপ স্বরূপ কী দাঁড়াতো কেমন দাঁড়াতো অবশ্যই তা অনুমানের বিষয়। লক্ষণীয় এই যে কেন্দ্রীয় ভাবস্বরূপ রবীন্দ্রনাথে সেদিন যাঁরা আচ্ছন্ন ও অবলীন ছিলেন (হয়তো বাইরের স্তুতিবাদ নিয়ে), আজ তাঁদের অনেকেই কিন্তু তিরিশ এবং তিরিশ পরবর্তী আধুনিকতায় সম্পূর্ণই অস্ত চলে গেছেন; সেদিন রবীন্দ্রনাথ যাঁদের সাগ্রহে গ্রহণ করেননি, বরং আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ভবিষ্যৎ নিয়ে—মহাকাল কিন্তু সে আশঙ্কা ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁদের কাব্যপ্রয়াসকেই সাদরে বক্ষদেশে স্থান দিয়েছেন; তার জন্য অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে অস্ত যেতে হয়নি।

চলমান গদ্যঋণ ঃ

১। 'সাহিত্যসৃষ্টি', 'সাহিত্য' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী ১৯৭৪ সংস্করণ।
২। 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট', ঐ।
৩। 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য', ঐ।
৪। 'কাব্য, ঐ।

৫। ‘বাস্তব’, ‘সাহিত্যের পথে’ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী ১৯৬৮ সংস্করণ।
৬। ‘সাহিত্যে নবত্ব’, ঐ।
৭। ‘আধুনিক কাব্য’, ঐ।
৮। ‘সৃষ্টি’, ঐ।
৯। ‘উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ’, পিনাকী ভাদুড়ী, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১৯৮৮ সংস্করণ।
১০। ‘কালের পুতুল’, বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৮।
১১। ‘কেন লিখি’, জীবনানন্দ দাশ, পরিশিষ্ট অংশ, কাব্য সংগ্রহ, ভারবি ১৯৯৩ সংস্করণ।
১২। ‘রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী’, নেপাল মজুমদার, দে’জ, ১৯৯৫ সংস্করণ।
১৩। ‘কাব্যভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল’, সঞ্জয় মজুমদার, পত্রলেখা, ১৩৯৮ সংস্করণ।
১৪। ‘বাংলা ভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ’, রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান, ভাষাবিন্যাস ২০০৬ সংস্করণ।
১৫। ‘টি.এস. এলিয়ট, বাঙালী মন ও মননে’, সম্পাদনা-তাপস বসু, পুস্তক বিপনি, ১৩৯৭ সংস্করণ।
১৬। ‘আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়’, সুমিতা চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ সংস্করণ।
১৭। ‘তিরিশ চল্লিশের বাংলা’, অবনী লাহিড়ী, সেরিবান ২০০১ দ্বিতীয় সংস্করণ।
১৮। ‘কবির চিঠি কবিকে’, সম্পাদনা—নরেশ গুহ, প্যাপিরাস ১৯৯৫ সংস্করণ।
১৯। ‘নির্বাচিত প্রবন্ধ’, আহমদ শরীফ, আগামী, ১৯৯৯ সংস্করণ।
২০। ‘প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব’, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক ২০০২ সংস্করণ।
২১। ‘আমার রবীন্দ্রনাথ’, সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপনি ২০১০ সংস্করণ।
২২। ‘পাঠক রবীন্দ্রনাথ’, বিশ্বনাথ রায়, বাণীশিল্প ২০১১ সংস্করণ।

লিঙ্গ রাজনীতি ও রবীন্দ্র-ছোটোগল্প

শম্পা চৌধুরী

'স্ত্রীর পত্র'-র মৃণাল তার স্বামীকে চিঠিতে লিখেছিল, ''...আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।'' কিন্তু শুধু গল্পের চরিত্র মৃণালই নয়। তার স্রষ্টা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা কিছু কম ছিল না। রাণী চন্দকে যদিও তিনি বলেছিলেন যে 'স্ত্রীর পত্র'-এই প্রথম তিনি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর গল্পের পাঠকমাত্রেই জানেন গল্প লেখার একেবারে প্রাথমিক পর্ব থেকেই বিষয়টি তাঁকে রীতিমতো ভাবিয়েছে। যে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ গল্প লেখার সূচনা সেই 'হিতবাদী'তেই প্রকাশিত হয়েছে 'দেনাপাওনা' এবং 'খাতা'র মতো গল্প যাদের ভরকেন্দ্রই হল নারীর পারিবারিক অবস্থানগত সংকট। যদিও 'খাতা' গল্পটি আদৌ 'হিতবাদী'-তে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে কিছু মতান্তর আছে কিন্তু তাকে এই পর্বের গল্প বলে মেনে নিতে কারোরই খুব একটা আপত্তি নেই। 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার বাবা পণের পুরো টাকা মেটাতে না পেরে প্রথমাবধি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অপরাধী হয়ে থাকেন আর কারণে অকারণে পিতৃনিন্দা শুনে চোখের জলে বুক ভাসানো হয়ে দাঁড়ায় নিরুপমার রোজকার রুটিন। বাড়ির সবাই এমন ভাব দেখায় যেন সে বিনা অধিকারে ফাঁকতালে এখানে ঢুকে পড়েছে। ''বিশেষত শাশুড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না।'' কেউ নববধূর রূপের প্রশংসা করলে তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেন, ''শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।'' শ্বশুরবাড়িতে নিরুপমার খাওয়া পরারও যত্ন হয় না। কোনও সহৃদয়া প্রতিবেশিনী এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করলে তাঁকে শুনতে হয় ''ঐ ঢের হয়েছে।'' আর কথকের পক্ষপাত ধরা পড়ে যায় তাঁর ব্যাখ্যায়—''অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত।'' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীটি থাকেন বিদেশে। তাঁর সঙ্গে নিরুপমার কোনও যোগাযোগ থাকে না আবার সংসর্গ দোষে হীনতা শিক্ষার সম্ভাবনায় বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গেও নিষিদ্ধ হয় দেখাসাক্ষাতের যাবতীয় সম্ভাবনা। আত্মীয়হীন শ্বশুরবাড়িতে সে যে পরের ঘরের দাসদাসী আর পরিবারের কর্তাগৃহিণীর একান্ত অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে নিরুপমার মনে। আহারের প্রতি তার সামান্যতম অবহেলায় শাশুড়ির তিরস্কারে ঝলসে ওঠে শাণিত বিদ্রূপ ''নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা! গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।'' তার গুরুতর পীড়ার অর্থ দাঁড়ায় ন্যাকামি আর মৃত্যুশয্যায় একবার বাবা ভাইদের দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শাশুড়ি বলেন, ''কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।'' যে অত্যাচারের কোনও প্রমাণ বাইরে থেকে দেখা যায় না শেষপর্যন্ত তারই জেরে নির্বাপিত হয় বালিকার জীবনপ্রদীপ। শ্বশুরবাড়ির সব আদর উথলে ওঠে তার মৃত্যুর পর। মহা ধুমধামে সম্পন্ন হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। চন্দনকাঠের চিতা, মহাসমারোহের শ্রাদ্ধ বাদ যায় না

কিছুই। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হয় না। কর্মস্থলে বউকে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জানিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের চিঠি এলে মা উত্তরে লেখেন, ''বাবা তোমার জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি। অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।'' উদ্ধৃতি চিহ্নের বাইরে কথকের শেষ মন্তব্য এবং গল্পের শেষ লাইন, ''এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।'' বুঝতে অসুবিধে হয় না আরেক নিরুপমার গল্পেরও আঘোষিত সূচনা হয়ে গেল এখানেই। তবে শুধু বাবার পণের টাকা মেটাবার অক্ষমতা নয় আরও কত নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়ও যে শ্বশুরবাড়িতে বধূর অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে তার লেখাজোখা নেই। 'খাতা' গল্পের উমাকে মাত্র ন'বছর বয়সেই ঘোমটা টেনে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়েছিল আর যাওয়ার আগে বাপের বাড়ির বিভিন্ন জনের অজস্র উপদেশ সমাকীর্ণ সতর্কবাণী শুনতে শুনতে সে একরকম করে বুঝে গিয়েছিল, ''সে যেখানে যাইতেছে সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না; এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, ত্রুটি বলে, তাহা অনেক ভর্ৎসনার পর অনেক দিনে শিখিয়া লইতে হইবে।'' কিন্তু তার ছেলেমানুষী খাতা লেখার অভ্যাসটাই যে তার শিক্ষিত স্বামীর কাছে চরম অপরাধ বলে গণ্য হবে তা বোধহয় সে স্বপ্নেও ভাবেনি। স্বামীর মনের রহস্য উমার জানা ছিল না কিন্তু সর্বজ্ঞ কথক প্যারীমোহনের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, ''প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।'' বিশেষ চিন্তা করে এবিষয়ে সে একটি অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্বও নির্মাণ করেছিল। তত্ত্বটি এই রকম ''...স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সঙ্গে পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়।'' গল্পে বিশেষভাবে প্যারীমোহনের চিন্তা বলে বর্ণিত হলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রকৃত প্রস্তাবে এটি আধিপত্যকামী পুরুষতান্ত্রিক হেজমনিরই সাধারণ উচ্চারণ। উমারা শিক্ষিত হয়ে উঠলে বাড়িতে নাটক নভেল ঢুকবে এবং সেইসূত্রে গৃহধর্ম লোপ পাবে কিংবা লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা নিশ্চিত বিধবা হবে এ জাতীয় নীতি উপদেশ বা ভীতি প্রদর্শন আসলে মেয়েদের শিক্ষা থেকে দূরে রাখার এক পরিচিত অজুহাত। কোনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজই সাধারণভাবে কখনও মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে না। কারণ শিক্ষা জাগায় সচেতনতা আর সচেতনতা জাগায় প্রশ্ন যা পুরুষতান্ত্রিক একাধিপত্যের পক্ষে আদৌ স্বস্তিকর নয়। নিজেদের আধিপত্যের দুর্গটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পুরুষকে তাই এসব ক্ষেত্রে সর্বদাই সুবিধামতো নানান যুক্তি খাড়া করতে হয়। পতি পরম গুরু, তাঁর কথার অন্যথা হলে শাস্তি অনিবার্য। স্বামীর কথা অমান্য করার অপরাধে উমার নিরপরাধ খাতাটি তাই বাজেয়াপ্ত হয় এবং তার লেখা নিয়ে তার স্বামীর বিদ্রূপ পরিহাস ও প্রায় সমবয়সী তিন ননদের প্রবল হাস্যে সমস্ত ঘর মুখরিত হয়ে ওঠে। উমার খাতাটি বাজেয়াপ্ত করে প্যারীমোহন তাকে শুধু অবাধ্যতার শাস্তিই দেয় না একই সঙ্গে তার নারী থেকে মানুষ হয়ে ওঠার রাস্তাটাও বন্ধ করে দেয়। উমার লেখা তা সে যত হাস্যকর, যত অপরিপক্কই হোক না কেন তা ছিল তার নিজস্ব একটা 'space'; এই একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরটুকু কেড়ে নিয়ে এক অর্থে প্যারীমোহন তাকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে দিল। মনে পড়বে মৃণালের কথা, সেও লুকিয়ে কবিতা লিখত। সেই ছিল তার মুক্তি। সে নিজেই লিখেছে, ''সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। ... সেইখানে আমি আমি।''

''প্যারীমোহনের সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া

লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।" 'খাতা' গল্পের এই শেষ বাক্যে সর্বজ্ঞ কথকের উচ্চারণে পুরুষতান্ত্রিক হেজিমনির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষ যতই সোচ্চার হোক না কেন পিতা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর বড় মেয়ে বেলাকে শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর একান্ত অনুগত হয়ে থাকারই উপদেশ দিয়েছেন। 'খাতা' হিতবাদী পর্বের গল্প অর্থাৎ মোটামুটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময়ের আর বেলার বিবাহ, বৈশাখ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ। এ বিবাহের দেনাপাওনা নিয়ে প্রভূত মতান্তরের ইতিহাস আজ সর্বজনবিদিত। এই বিবাহের পর আষাঢ় মাসে শ্বশুরবাড়িতে তার কর্তব্য অকর্তব্য বিষয়ে মাধুরীলতাকে একটি চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিটি পাওয়া যায় না কিন্তু মাধুরীলতার উত্তর থেকে বাবা তাকে ঠিক কী ধরনের উপদেশ দিয়েছিলেন তা কতকটা আন্দাজ করা যায়। ২৯ জুন (শনিবার ১৫ আষাঢ়) মাধুরীলতা তার বাবাকে লিখছে, ''তুমি আমাকে যা যা উপদেশ দিয়েছ আমি তা প্রাণপণে পালন কর্ত্তে চেষ্টা করব। আমার স্বামী যে আমার চেয়ে সকল বিষয় শ্রেষ্ঠ এবং আমি যে তাঁর সমান নই এটা বরাবর মনে রাখব। তাঁর ঘরের শ্রী যাতে বৃদ্ধি পায় যথাসাধ্য তাই করব। এ বাড়ীর মেয়ে বলে উনি আমাতে অনেক সদগুণ আশা করেন তাতে যাতে না নিরাশ হন আমি সেই চেষ্টা করব।"[১] অবশ্য সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি সংসারে কেবলমাত্র বাবার উপদেশ তথা স্বামীর শ্রেষ্ঠত্বে প্রশ্নহীন বিশ্বাসমাত্র সম্বল করে একটা গোটা জীবন কাটানো যে সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে তা পিতা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। আগের চিঠির অল্প কিছুদিন পরে মেজো মেয়ে রেণুকার বিবাহ-চিন্তা সূত্রে তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন, ''রাণীও যদি বিবাহ করে দূরে যায় তাহলে ওর ভালই হবে। অবশ্য প্রথম বছর দুই আমাদের কাছে থাকবে কিন্তু তার পর বয়স হলেই ওকে সম্পূর্ণভাবেই দূরে পাঠান ওর মঙ্গলের জন্যই দরকার হবে। আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র— সেইজন্য বিবাহের পর আমাদের মেয়েদের একটু দূরে যাওয়া বিশেষ দরকার। ... রাণীর যে রকম প্রকৃতি বাপের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ও শুধরে যাবে—আমাদের সঙ্গে নিকট যোগ থাকলে ওর পূর্ব association যাবে না।"[২] আসলে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানতেন 'সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে' জাতীয় আপ্তবাক্যের বাচ্যার্থে মেয়েদের গৃহিণীপণা ও মাতৃত্বের গুণাবলীর যতই ধ্বজা ওড়ানো হোক না কেন এর আভিপ্রায়িক অর্থটি হল সমস্ত বিষয়ে পুরুষের প্রশ্নহীন আনুগত্য ও কায়মনোবাক্যে পুরুষতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা।

বস্তুত আমাদের গোটা পরিবার ব্যবস্থাটাই গড়ে উঠেছে পুরুষের শ্রেষ্ঠতার তত্ত্ব আর নারীর যৌন বন্দিত্ব তথা সার্বিক অধিকারহরণ প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করে। হাজার হাজার বছর ধরে কখনও ক্ষমতা আর হিংস্রতাকে হাতিয়ার করে, কখনও বা নারীত্ব ও মাতৃত্বের উচ্চকিত গৌরব ঘোষণা করে পুরুষ ক্রমশ আধিপত্যের এমন এক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে যেখানে পরিবারের মধ্যে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসিত আর শাসকের। নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা বা ক্ষমতা থাক বা না থাক কেবলমাত্র লিঙ্গ পরিচয়ে পুরুষ হওয়ার সুবাদে পরিবারের কর্তার আসনটি করায়ত্ত হয়েছে সংসারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের আর সেই সূত্রে তিনি অনায়াসে পেয়ে গেছেন নারী ও বয়োকনিষ্ঠদের শাসন তথা নিয়ন্ত্রণের অধিকার। হাইডি হার্টম্যানের মতো তাত্ত্বিকের কাছে পুরুষতন্ত্র তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এক সার্বিক আধিপত্যবাদ তথা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থারই নামান্তর মাত্র।

দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সন্তান আর পরিবারের দোহাই দিয়ে মেয়েদের চিরকালই উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আবার সন্তান উৎপাদনকে পুঁজি উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার ফলে তৈরি করা গেছে সেই কৌশল যার দ্বারা মেয়েদের আটকে রাখা

যায় পুরুষের প্রয়োজনে। উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছে পুরুষের হাতে আর নারী হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সম্পত্তি, এক সার্বিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। বহুযুগ ধরে চলে আসতে থাকা এই প্রক্রিয়া এমন এক শক্তিশালী পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে যা ক্রমশ নারীর স্বাধীন চিন্তা জগতকে আচ্ছন্ন করে তাকেও সেই একই মূল্যবোধের শরিক করে তুলেছে। এর অনিবার্য পরিণাম কেট মিলেট কথিত সেই আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ যা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কোনও সম্ভাবনাই বিকশিত হতে দেয় না আর এভাবেই আধিপত্যবাদী ও নিপীড়িতের মনোভাব একই লক্ষে চালিত হয়ে সম্পূর্ণ করে প্রভুত্বের বৃত্ত, সুনিশ্চিত করে পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। 'খাতা' গল্পের প্যারীমোহনের নারীশিক্ষা বিষয়ক আশঙ্কাকে তার সহজাত প্রভুত্বের মানসিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেলেও 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমার শাশুড়ির আচরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের মানসিকতায় আচ্ছন্ন। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধে বন্দী মানুষটি হয়তো বা না জেনেই কাজ করে চলেছেন সার্বিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যবস্থার সহযোগী হিসাবে। 'স্ত্রীর পত্র'-এ বিন্দুর শাশুড়িও স্পষ্টতই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। পাগল ছেলের সঙ্গে একটি অসহায় মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার সর্বনাশ করতে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না, বরং তিনি সগর্বে বলতে পারেন, ''ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।'' এর সবচাইতে ভালো উদাহরণ অবশ্য মৃণালের বড় জা। বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিন্দু তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এসে আশ্রয় নিলে তিনি পড়েন বিষম বিপদে। বাড়ির পুরুষদের সার্বিক আপত্তির মাঝখানে বোনকে সাদরে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। ভাব করতে থাকেন এ আপদ বিদায় হলেই তিনি বাঁচেন। রূপ এবং বাপের বাড়ির অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে সংসারের সব বিষয়ে তিনি সর্বদা নিজেকে একপাশে সরিয়ে রাখেন। সবাইকে দেখিয়ে নিজের বোনের জন্য নিতান্ত মোটা রকমের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করেন আর একই সঙ্গে বাড়ির সকল প্রকারের দাসীবৃত্তিতে তাকে নিয়োজিত করে প্রমাণ করতে চান যে ভারি সুবিধাদরে বিন্দুকে পাওয়া গেছে—''ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।''

পিতৃতান্ত্রিকতার প্রধান পীঠস্থান ও প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। সচেতন বা অসচেতনভাবে ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে পুরুষ যে আধিপত্য কায়েম করতে চায় তার সূচনা এমনকি পরিধিও সীমায়িত থাকে পরিবারের বৃত্তে। বৃহত্তর সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতার বৃত্তে পরিবার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। যেহেতু পরিবারই ব্যক্তি ও সমাজের প্রধান যোগসূত্র তাই তার গুরুত্ব অপরিসীম। নারী ও সন্তানের দাসত্ব ও আনুগত্য সুনিশ্চিত করার এ এক প্রবল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। বস্তুত পরিবার বা গার্হস্থ্য ব্যবস্থার সূত্রেই পুরুষতান্ত্রিকতা নারীজীবনের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করে শুধু সদরে অন্তরে নয় শরীরে এমনকি মনেও। পরিবারতন্ত্র যেমন একদিকে পুরুষের ক্ষমতা বা আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে অন্যদিকে তেমনি মূলত পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হওয়ার ফলে মেয়েদের ব্যক্তিত্বও নির্ধারিত হয় পরিবারেরই দ্বারা। পুরুষের তৈরি করা আর তারই স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত শ্রেষ্ঠতার বোধ নারী যখন তাঁর নিজের মূল্যবোধে রূপান্তরিত করে তখন জয় হয় পুরুষতন্ত্রের যার অনিবার্য ফলশ্রুতি নারীর দুর্দশার অন্তহীন পরম্পরা। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পের নায়িকা বিন্ধ্যবাসিনীর নামটাই যে তার স্বামীর না-পসন্দ তা নয়, রূপে গুণেও তিনি তাকে আদৌ নিজের যোগ্য বলে মনে করতেন না কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামী সৌভাগ্য গর্বের অন্ত্য ছিল না। শ্বশুরের টাকা আত্মসাৎ করে অনাথবন্ধু বিলাতযাত্রার আয়োজন করলে বিন্ধ্যবাসিনী স্বেচ্ছায় সে চুরির দায় নিজে গ্রহণ করে অপমানিত হয়। বিলেতে স্বামীর অর্থের অনটন মেটাতে নিজের যাবতীয় অলঙ্কার এমনকি বেনারসি শাড়ি, শাল

প্রভৃতিও বিক্রি করে। শুধু তার অজানা থেকে যায় এই তথ্যটুকু যে বিলেত থেকে ডিগ্রির সঙ্গে তার স্বামী একটি জলজ্যান্ত বিদেশিনী স্ত্রীও সংগ্রহ করে এনেছেন। বিলেত ফেরত অনাথবন্ধুর প্রায়শ্চিত্তের দিনে মেমসাহেব বউ-এর আগমনেই কাহিনি সমাপ্ত। কিন্তু আলাদা করে ব্যাখ্যা করা না হলেও বিন্ধ্যবাসিনীর অবস্থাটি পাঠক সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন।

আধিপত্য বলয়ের চক্রব্যূহের মধ্যে থেকে নারী যখন মুক্তির উপায় খোঁজে অথবা নিজস্ব একটি পরিসর গড়ে নিতে সচেষ্ট হয় অর্থাৎ পুরুষ আধিপত্যের দুর্গে সামান্য হলেও একটি ফাটল ধরাতে সক্ষম হয় তখন পাল্লা ঝুঁকে যায় তারই দিকে। আর পরিস্থিতি প্রকৃতই জটিল হয়ে ওঠে যখন পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আত্মস্থ করে নিয়ে মেয়েরাও নিজেদের মতো করে পুরুষের ক্ষমতা দখল করতে চায়। লিঙ্গ রাজনীতির এ এক অন্তহীন খেলা যেখানে আধিপত্য বিস্তার, ক্ষমতা দখল আর শেকল কাটার কার্যক্রম একই সঙ্গে চলতে থাকে। নারী পুরুষ সম্পর্ক শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের এক জটিল সমীকরণ। ক্ষমতার রাজনীতি কাউকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিতে হয় না। বস্তুত জন্মসূত্রেই পুরুষ ও নারী উভয়েই জেনে যায় এই ক্ষমতার উৎস, আয়ত্ত করে নেয় তার ব্যবহার বা অপব্যবহারের রীতিপদ্ধতি। 'একরাত্রি' গল্পের নামহীন কথক নায়ক পাঠশালার বয়সেই বুঝে যায় সুরবালা তার সম্পত্তি। ''...সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকার মদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকল রকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। ... আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।'' গল্প কথকের এই প্রভুত্ববাসনা পাত্রপাত্রীর বয়সের নিরিখে যতই সরল মনে হোক না কেন শেষপর্যন্ত যে তা পরবর্তী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কেরই এক নির্ভুল গৌরচন্দ্রিকা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কথক নায়ক এই তাৎপর্য কতটা অনুধাবন করতে পারে তা আমাদের জানা হয় না কিন্তু 'হৈমন্তী'র সংবেদশীল কথক সব বুঝেও যে তার দাম্পত্যের কোনও অবস্থান্তর ঘটাতে পারে না তা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গার্হস্থ্য রাজনীতির সুকঠিন নিষ্পেষণ থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করার সোচ্চার বাসনা সে কখনোই কাজে পরিণত করতে পারে না। সদিচ্ছার বাধা হয়ে দাঁড়ায় আজন্মলালিত সংস্কার। অবশ্য মাঝে মাঝে উলটেও যায় ছবিটা। শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে কখনও মেয়েরাও অবতীর্ণ হয় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। 'মহামায়া' গল্পে রাজীব-মহামায়া সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে মহামায়া। বয়স, রূপ ও কৌলিন্য তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে শ্রেষ্ঠত্বের বোধ। রাজীবের সঙ্গে একত্রবাসের সিদ্ধান্তেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে তার একতরফা শর্তাবলী। চিতার আগুন যে তার মুখাবয়বের একাংশের সৌন্দর্য চিরতরে হরণ করে নিয়েছে সে কথা প্রকাশ করে সে রাজীবের কৃপাপ্রার্থী হতে চায় না। মহামায়ার এই আচরণ তার চরিত্রের পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ সন্দেহ নেই কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় এটাই যে, বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং সেই সৌন্দর্যের নিরিখে একটি মেয়ের অস্তিত্বের মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে পুরুষতান্ত্রিক নির্মাণ আর সেই নির্মাণের দ্বারা চালিত হয়ে মহামায়া এখানে নারী ক্ষমতায়নের ব-কলমে আসলে আধিপত্যকামী পুরুষতান্ত্রিক হেজিমনিরই জয় ঘোষণা করছে।

উৎস নির্দেশ ঃ

১। প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা, আনন্দ, ১৩৯৭, পৃ. ১৮

২। তদেব, পৃ. ২২-২৩

রবীন্দ্রনাথ ও পাঁচজন ফরাসি দার্শনিক

ঊর্মি রায়চৌধুরী

ঠাকুরবাড়ির বিদগ্ধ পরিমণ্ডল শুধুমাত্র বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র তিন বছর (১৮৬৪) তখন তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ আই.সি.এস. হয়ে দেশে ফিরে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখনই ফরাসি ভাষা শিখে এসেছিলেন। তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে ফরাসি সাহিত্য পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসি শেখেন সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষের কাছে। (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', সুবর্ণরেখা, পৃ. ৩০)। জ্যোতিদাদা ফরাসি ভাষা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করেন। বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণে' ফরাসি প্রভাবের কথা অনেকেই বলেন। ১৮৮০ সন থেকে রবীন্দ্রনাথ সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন 'সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেনের। দেশি ও বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের জগতে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তিনি ফরাসি ও ইটালিয়ান ভালো জানতেন। ১৮৮১ সন থেকে রবীন্দ্রনাথ সান্নিধ্য লাভ করেন আশুতোষ চৌধুরীর। ইনিও ফরাসি ভাষা খুব ভালো জানতেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিতও ফরাসি জানতেন। প্রথমবার বিলাত বাসের কাল অর্থাৎ ১৯৭৮-৮০ থেকেই তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং এতগুলি ফরাসি ভাষা জানা মানুষের সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যে ফরাসি-ইংরেজি অভিধান সহযোগে ফরাসি দার্শনিক ভিক্টর কুজ্যাঁর 'Du Vari, du beau er du bien', (সত্য, সুন্দর, মঙ্গল) বইটি পড়ছেন, এ তথ্যও আমরা পাচ্ছি। (পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি, পরিশিষ্ট পৃ. ৮৮ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', সবুর্ণরেখা)।

তাই বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমণ্ডল ও বন্ধুবান্ধবের জগৎ তাঁকে ফরাসি সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথ পাঁচজন ফরাসি দার্শনিকের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন—

১। ভিক্টর কুজ্যাঁ (Victor Cousin)
২। জুবেয়ার
৩। আমিয়েল
৪। বের্গসঁ
৫। কোঁত

সৌন্দর্যদর্শন—রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টর কুজ্যাঁ

সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত। যুগে যুগে মানুষ সুন্দরকে বরণ করে নিতে চেয়েছে। শিশুর মধ্যে এই সহজাত সৌন্দর্যস্পৃহা দেখতে পাই। আকাশের চাঁদের সৌন্দর্য শিশুকে আকর্ষণ

করে, তাকে আকর্ষণ করে টুকটুকে লাল বল, বা একটি ফুল। অসভ্যজাতির মধ্যে যে সৌন্দর্যস্পৃহা দেখি সে তো এই 'সহজাত' বোধেরই প্রমাণ। অশিক্ষিত সাঁওতাল রমণী মাথার চুলে ফুল গোঁজে, সে তো তার সহজাত সৌন্দর্যস্পৃহারই দৃষ্টান্ত। সে তো 'ইকেবানা' শেখেনি। সে তো কোনও Beauty Parlour-এ যায়নি। তাই বলতে পারি, সৌন্দর্যস্পৃহা সহজাত। মনের গহন কোণে তা লুকিয়ে থাকে। শিক্ষাদীক্ষা এই স্পৃহাকে আরও উজ্জ্বল করে।

কিন্তু পণ্ডিতেরা তো মতান্তর প্রকাশ করার জন্য আছেনই। ডারুইনের মতে সৌন্দর্যস্পৃহা স্বাভাবিক নয়, সহজাত নয়। তিনি বলেন—সৌন্দর্যস্পৃহা যৌননির্বাচনে উৎপন্ন হয়েছে। ময়ূরীর সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলেই ময়ূর সুন্দর হয়েছে। নরের নারীদেহের প্রতি অনুরাগের ফলেই নারী সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েছে। ডারুইন মানবের নারীদেহের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ থাকার কথা স্বীকার করেছেন। 'সুতরাং ডারুইনের মত দ্বারা সৌন্দর্যস্পৃহার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করি না।' (অভয় গুহ পৃ. ২৯)। বিজ্ঞানী ওয়ালেশ বিশ্বাস করেন যৌননির্বাচনে সৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়নি। পণ্ডিতেরা মতান্তর করুন, আমরা জানি, সৌন্দর্য নিয়ে যুগে যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের মনীষীরা নানা আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের জন্মদাতা সক্রেটিস বলেন, সুন্দর ও উত্তম (good) অথবা হিতকর (useful) একই জিনিস।

সুন্দর জিনিস আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি করে বলে সুন্দর। বিষ্ঠার ঝুড়ি কর্ম সাধনোপযোগী বলে সুন্দর, স্বর্ণনির্মিত ঢাল কর্মসাধনের অনুপযোগী বলে কুৎসিত। প্লেটো 'Republic' গ্রন্থে সুন্দর সম্পর্কে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথই কি সত্য, সুন্দর, মঙ্গলকে সর্বপ্রথম একসূত্রে গাঁথলেন, যদি বলি, 'না'?

> সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine) বলেন, ''ভগবান অনন্ত মঙ্গল, সত্য ও সৌন্দর্যের আকর। তিনি স্বীয় সৌন্দর্য দ্বারা বস্তুসমূহের সৌন্দর্য সম্পাদনা করেন। বস্তুসমূহে যে পরিমাণে ভগবদসৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাহারা সেই পরিমাণে সুন্দর। একত্বই সমস্ত সৌন্দর্যের আকৃতি''।

Emerson বলেছেন, "Truth, and goodness, and beauty are but different faces of the same all."

টেনিসন বলেন, "Beauty, good and knowledge are three sisters."

এবার দার্শনিক ভিক্টর কুর্জ্যাঁ-র কথায় আসা যাক। কে এই ভিক্টর কুর্জ্যাঁ? তিনি ফরাসি দার্শনিক। জন্ম ১৭৯২, মৃত্যু ১৮৬৭। এক ঘড়ি নির্মাতার পুত্র। কুর্জ্যাঁ ছিলেন উদারপন্থী ফরাসি দার্শনিক। প্যারিসের বিখ্যাত সরবন (Sarbonne) বিশ্ববিদ্যালয়ে কুর্জ্যাঁ মাত্র তেইশ বছর বয়সে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। স্বাধীনচেতা ও মুক্তচিন্তার অধিকারী হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি থেকে বহিস্কার করেন। এরপর কুর্জ্যাঁ জার্মানিতে যান। সেখানে দার্শনিক কান্টের সঙ্গে পরিচয় ও সখ্য স্থাপন করেন। তাঁদের সঙ্গে দর্শন বিষয়ে আলোচনায় অনুপ্রাণিত হন।

ফ্রান্সে কয়েকমাসের জন্য তিনি জনশিক্ষামন্ত্রী রূপে নির্বাচিত হন। কিন্তু ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় তাঁকে এপদ থেকে সরে যেতে হয়। তিনি পড়াশুনায় মন দেন। যার ফল এই 'সত্য সুন্দর মঙ্গল' বইটি। ১৮৩৫ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪-তে বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯১০-১১—ফরাসি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এর অনুবাদ করেন। আমাদের উপনিষদে 'সুন্দর' শব্দটি ছিল না। ব্রাহ্মধর্মের উপাসনার ক্ষেত্রে 'সুন্দর' শব্দটি কুর্জ্যাঁর

প্রভাবে প্রবেশ করে। সৌন্দর্য এবং আমাদের ইচ্ছাবৃত্তির লক্ষ্য মঙ্গল (goodness)। আমাদের অনুজ্জ্বল অথবা ‘‘ইন্দ্রিয়সম্ভূত জ্ঞানের পূর্ণত্বই সৌন্দর্য এবং যাহা পূর্ণত্বলাভের প্রতিবাদী তাহাই কুৎসিত।”

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনার সঙ্গে এখানে সামান্য মিল পাই। কুজ্যাঁ-র গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়—সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। এই বইটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্য’, ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থে আমরা তা দেখতে পাই।

ভিক্টার কুজ্যাঁ-র ‘সত্য-সুন্দর-মঙ্গল’ গ্রন্থটি শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, ব্রাহ্মধর্মকেও প্রভাবিত করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কুজ্যাঁ-র গ্রন্থটি অনুবাদ করার পর, ‘‘ব্রাহ্মধর্মে ঈশ্বরের ওপরে এই তিনটি গুণের আরোপ নির্বিবাদে গ্রাহ্য হয়ে গেল...

সত্য এবং মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের এই যোগসাধনটিকে বাংলার সৌন্দর্যতত্ত্বালোচনায় রবীন্দ্রনাথই বিশেষভাবে শাস্ত্রীয় আলোচনার মর্যাদা দান করেছেন।” (অধ্যাপক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়)।[১]

ভিক্টর কুজ্যাঁ (Cousin, 1792-1867) বলেন, ‘‘সুন্দর থেকে সুখদ, প্রয়োজনীয় ও উপযোগী পৃথক পদার্থ। সুপরিমাণ ও সুশৃঙ্খলা সৌন্দর্যের নিয়ম বটে, কিন্তু উহা সমস্ত শ্রেণীর সৌন্দর্যের নিয়ম নহে। উৎকৃষ্ট ছবির সৌন্দর্য, কবিতা-পদের সৌন্দর্য, উচ্চভাবের কোন একটা গীতি- সৌন্দর্য নিয়ম পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।” তবে কি হয়? সে কেবলই সৌন্দর্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মত্ততাকে আনন্দ বলিয়া ভুল করে।

‘‘যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।” রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ‘সৌন্দর্য সৃষ্টি দুর্বলতা হইতে চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা।’

সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, যথার্থ যে মঙ্গল, তা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে এবং তা সুন্দর। ‘সৌন্দর্য মূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্ত্তি মঙ্গল-মূর্ত্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।’ কাব্যসাহিত্যের লক্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘সত্যের সেই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য সাহিত্যের লক্ষ্য।’ রসস্বরূপ ভগবানই নিখিল সৌন্দর্যের মূলতত্ত্ব—এটিই রবীন্দ্রনাথের ঘোষণা।

ভিক্টর কুজ্যাঁ বলেন—‘‘ভৌতিক সৌন্দর্যের সাহায্যে কিরূপে নৈতিক সৌন্দর্য প্রকাশ করা যায় ইহাই শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য। ভৌতিক সৌন্দর্য নৈতিক সৌন্দর্যেরই সাঙ্কেতিক রূপ।” কুজ্যাঁ বলেন (২০২ পাতা)—‘‘যাহা মঙ্গল তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাই নৈতিক নিয়ম। ইহাই সমস্ত নীতির ভিত্তিভূমি।”

রবীন্দ্রনাথ ঐ একই কথা বলেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধে।

ফরাসি দার্শনিক ভিক্টর কুজ্যাঁ সৌন্দর্যকে ভৌতিক, মানসিক ও নৈতিক এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে শিল্পকলার সৌন্দর্য মানসিক সৌন্দর্য।

‘সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘সৌন্দর্যবোধ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের লক্ষ্য মঙ্গলসাধন একথা বলেছেন। ‘‘পরিণামে সৌন্দর্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে। মানুষকে সে এমন একটি অমৃত দিতেছে যাহা পান করিয়া মানুষ ক্ষুধার রূঢ়তাকে দিনে দিনে জয় করিতেছে। অসংযমকে অমঙ্গল বলিয়া

পরিত্যাগ করিতে যাহার মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় সে তাহাকে অসুন্দর বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে চাহিতেছে।

সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না। একপরায়ণা সতী স্ত্রীই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী তো পারে না। সতীত্ব সেই চাঞ্চল্যবিহীন সংযম যাহার দ্বারা গভীরভাবে প্রেমের নিগূঢ় রস লাভ করা সম্ভব হয়। আমাদের সৌন্দর্য প্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে তবে কী হয়? সে কেবলই সৌন্দর্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে। যাহাকে পাইলে সে একেবারে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে পারিত তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।

সৌন্দর্যসৃষ্টি দুর্বলতা হইতে চঞ্চলতা হইতে অসংযম হইতে ঘটিতেছে এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধকথা।

কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী সেখানে তাহারা তপস্বী; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না, সেখানে চিত্তের সাধনা ও সংযম আছেই।

কালিদাস তো বসন্তের বাতাসকে বিরহিনী যক্ষের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এ কার্যে তাহার হাতযশ আছে বলিয়া লোকে রটনা করে; বিশেষত উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিণা-বাতাসকে কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। কিন্তু কবি প্রথম আষাঢ়ের নূতন মেঘকেই পছন্দ করিলেন; সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে, সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্তা প্রণয়ীর কানের কাছে প্রলাপিত করিবে? সে যে সমস্ত পথটার নদীগিরিকাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুবন ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছলছল করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূবিলাশহীন প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরো জুড়াইয়া যাইবে।

বিরহীর বার্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্যরসপিপাপু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।

কুমারসম্ভবের কবি অকালবসন্তের আকস্মিক উৎসবে পুষ্পশরের মোহবর্ষণের মধ্যে হরপার্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত করিয়া তোলেন নাই। স্ত্রী-পুরুষের উন্মত্ত সংঘাত হইতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেই প্রলয়াগ্নিতে আগে তিনি শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াছেন, তবে তো মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন। কবি গৌরীর প্রেমের সর্বাপেক্ষা কমনীয় মূর্তি তপস্যার অগ্নির দ্বারাই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ ম্লান, কোকিলের মুখরতা স্তব্ধ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছে, বাসনার চাঞ্চল্য যেখানে বেদনার তপস্যার গাম্ভীর্যলাভ করিয়াছে, যেখানে অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানেই রাজদম্পতির মিলন সার্থক হইয়াছে। প্রথম মিলনে প্রণয়, দ্বিতীয় মিলনেই পরিত্রাণ। এই দুই কাব্যেই (শকুন্তলা, কুমারসম্ভব) শান্তির মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে যেখানেই কবি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন সেইখানেই তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল, তাঁহার বীণা অপ্রমত্ত।”

অর্থাৎ পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গল একান্ত হয়ে উঠেছে। সুন্দর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন। কুজ্যাঁও সেই একই কথা বলেছেন। ''কেহ কেহ সুপরিমাণের মধ্যে সুন্দরকে দেখিতে পান। উহা সৌন্দর্যের নিয়ম বটে। কিন্তু উহা অন্যান্য নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম মাত্র। এ কথা ঠিক—কোনও বেমানান জিনিস কখনই সুন্দর হইতে পারে না। তাবৎ সুন্দর পদার্থের মধ্যে জ্যামিতিক আকার অন্তত দূরভাবেও থাকা চাই। কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে বৃক্ষটি উর্দ্ধে উঠিয়াছে, যাহার শাখাপ্রশাখা এমন নমনীয়, এমন সুশোভন, যাহার শাখা পল্লব এমন নিবিড়, এমন বিচিত্রবর্ণ, সুপরিমাণই কি ইহার সৌন্দর্যের একমাত্র বিশেষত্ব?" (পৃষ্ঠা-১০৮, সত্য-সুন্দর-মঙ্গল)

সকল সৌন্দর্যের মধ্যে একতার অন্বেষণের কথা বলেছেন কুজ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সামঞ্জস্য অর্থ হল রূপবৈচিত্র্য এবং তাঁদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য—একদিকে রূপ-বৈচিত্র্যের অজস্রতা এবং অন্যদিকে সুবিহিত ঐক্যের কথা।

> 'গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর, সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড়ো করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদার প্রাচুর্য অথচ তেমনি কঠিন সংযম; তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তির অপরিসীম বৈচিত্র্য আপনাকে চতুর্দিকে সহস্র করিতেছে এবং কেন্দ্রানুগ শক্তির এই উদ্দাম বৈচিত্র্যের উল্লাসকে একটিমাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে।'

'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে 'সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই কথা বলেন। 'সাহিত্যের পথে'-র 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে বলেন—'গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে এই ফুলে আমরা ঐক্যের সুষমা দেখি'। কুজ্যাঁ—সুন্দর বস্তুর দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী উপাদান আছে, উহা একতা ও বিচিত্রতা; সাম্য ও বৈষম্য। মনে কর, একটি সুন্দর ফুল। অবশ্য উহাতে একতা আছে, সুশৃঙ্খলা আছে, সুপরিমাণ আছে, এমন কি সৌসাম্য আছে। কেন না, এই সকল গুণ না থাকিলে, সৌন্দর্যের মূলে যুক্তির ভিত্তি থাকে না, ... আবার সেই সঙ্গে কতই বিচিত্রতা। রঙের মধ্যে কত সূক্ষ্ম ভেদ ... সকল শ্রেণীর সৌন্দর্যের প্রতিই সাম্য ও বৈষম্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। (পৃষ্ঠা-১০৯, সত্য-সুন্দর-মঙ্গল)

ভিক্টর কুজ্যাঁ-র 'সত্য-সুন্দর-মঙ্গল' গ্রন্থের 'চতুর্থ উপদেশ', 'ধর্ম্মনীতির প্রকৃত মূলতত্ত্ব' অধ্যায়টির বেশ কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত 'ন্যায়দণ্ড' কবিতাটিকে স্মরণ করায়।

> 'তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
> অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে'

হয়তো কোন একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কুজ্যাঁ বলেন,

> ''তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী ধৃত হয় এবং ধৃত হইয়া বিচারার্থ রাজপুরুষদিগের নিকট সমর্পিত হয়, উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত হয়; এবং সে দণ্ডিত হইলেই তুমি সন্তুষ্ট হও। এ কি তোমার কল্পনার ও হৃদয়ের একটা খামখেয়ালী চেষ্টা মাত্র? না, তাহা নহে। তুমি শান্তই থাক, কিংবা ঘৃণা ও রোষে উত্তেজিতই হও, সেই হত্যাকাণ্ডের সময়েই হউক কিংবা বহুকাল পরেই হউক, প্রতিশোধ লইবার কোন ব্যক্তিগত ভাব তোমার মনে থাকিতে পারে না, কেন না তোমার উহাতে লেশমাত্র স্বার্থ নাই, তথাপি তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী দণ্ডিত হয়।" (পৃষ্ঠা-১৮৭, সত্য-সুন্দর-মঙ্গল)

যে কোন হত্যাকাণ্ড দেখে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তা হল ‘‘ঘৃণামিশ্রিত রোষের ভাব”। (কুজ্যাঁ, পৃষ্ঠা-১৮৬)

রবীন্দ্রনাথ—

‘‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।” (ন্যায়দণ্ড)

কোন ব্যক্তি অপরাধ করেছে। কুজ্যাঁ বলেন—‘‘দণ্ডিত না হইয়া প্রত্যুত যদি সেই অপরাধী ব্যক্তি তাহার সেই পাপ কার্য্যের দরুণ কোন প্রকার সৌভাগ্য লাভ করে; তুমি তখন আবার এই কথা নিশ্চয় বল যে, সৌভাগ্য লাভ করা দূরে থাক, তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কষ্ট পাওয়াই উচিত; তুমি তাহার সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর, তুমি তখন কোন এক উচ্চতর ন্যায়বিচারের দোহাই দেও।” (১৮৭ পৃষ্ঠা)

‘‘আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে।।
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহার পরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে—
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমার কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনার মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।।”

(রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের ‘শ্যামা’ নৃতনাট্যে বজ্রসেন—

‘‘ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা
পাপীজনশরণ প্রভু!
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষমো হে মম দীনতা।

জানি গো, তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা—
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা।”

কুজ্যাঁ আরও বলেন, ‘‘ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ ও অধর্ম্মের দণ্ড দুঃখ—এইরূপ একটি দুর্লঙ্ঘ্য

উচ্চতর নিয়ম আছে বলিয়া মানুষ বিশ্বাস করে।” এই ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘ন্যায়দণ্ড’ কবিতাটির ভাবনা মিলে যায়।

কুজ্যাঁ তাঁর গ্রন্থের ‘দ্বিতীয় খণ্ড’ অর্থাৎ ‘সুন্দর’ অধ্যায়ে বলেন—“সৌন্দর্যরস ও বাসনা—এই উভয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ উভয়ই উভয়কে খণ্ডন করে।

বাসনার উদ্রেক করা—বাসনাকে উদ্দীপিত করা সৌন্দর্যের কাজ নহে, বাসনাকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলা—মহৎ করিয়া তোলাই তাহার কাজ।”

এই ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধটির ভাবনার মিল আছে। রবীন্দ্রনথের ‘দুই আমি’ ভাবনা, মঙ্গল ভাবনা, পাপ-পুণ্য, দণ্ডদান, সুন্দর ও সুখদ-র তফাৎ ইত্যাদি ভাবনার সাথে কুজ্যাঁ-র অজস্র ভাবনা মিলে যায়।

আমিয়েল

আমিয়েল ১৮২১ সনে জেনিভায় জন্মান। অল্পবয়সে তিনি পিতামাতাকে হারান। প্রবীণদের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আমিয়েলের Journal intimate প্রকাশিত হয় ১৮৮২ তে। এই জার্নালটি তাঁর জীবনের নানা সময়ে লেখা। এখানে লেখক নিজের মনটিকে মেলে ধরেছেন। এই জার্নাল ফরাসি ভাষায় লেখা। ফরাসি সাহিত্যের লঘুচাপল বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে নয়, গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে এটি রচিত। বইটি গভীর উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞানের প্রকাশ।

ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে (১৮৯৪-এর ২২ মার্চ লেখা) রবীন্দ্রনাথ লেখেন “আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা ‘Amiel’s Journal, ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্‌টে—পাল্‌টে দেখি; ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি, এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। এমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটা ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন—ব(লু)-র লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি।”

‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৫) উপন্যাসে নিখিলেশ বলছে “Amiel’s Journal” বইখানা নিতে এসেছি। আর এক জায়গায় নিখিলেশ বলছে—“Amiel’s Journal’ পড়ে আছে আমার কোন ফল হোত না।”

ড. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার তাঁর ‘এ মণিহার’ গ্রন্থে ‘আমিয়েলের জার্নাল ও রবীন্দ্র মানসিকতা’ প্রবন্ধে বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার চেতনা যেমন উপনিষদ, বৈষ্ণবকাব্য, মধ্যযুগের মরমিয়া সাহিত্য, প্লেটোর রচনা ইত্যাদির দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, আমিয়েলের জার্নালের প্রভাবেও তেমনি।”

‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে নিখিলেশ প্রেমের ক্ষেত্রে আমিয়েলের ভাবনার দ্বারা অনেকাংশে চলত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জীবনধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও আমিয়েলের দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ ‘পথের সঞ্চয়’ গ্রন্থের ‘জলস্থল’ প্রবন্ধে অনুরূপ ভাবনার কথা বলেছেন।

আমিয়েল বলেন—“The East prefers immobility as the form of the infinite : the west, movement...”

রবীন্দ্রনাথও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্যের স্থিতি আর প্রতীচ্যের গতির কথা বলেছেন।

ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেন, ‘‘এই দুয়ের সমন্বয়ে (রবীন্দ্রনাথ) যে নতুন প্রগতিবাদী জীবনাদর্শের কথা বলেছেন, আমিয়েল তেমন কোনো ইঙ্গিত দেননি। তা না দিলেও উভয় দেশের জীবনধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যটুকু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমিয়েলের মধ্যেও পাচ্ছি”।

আমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথ—দুজনেরই ‘অনন্তের পিপাসা রয়েছে। আমিয়েল বলেন—“The thirst for infinite is never appeased. God is wanting.”

রবীন্দ্রনাথের কাছেও “The universe is the struggle of the finite to reach the infinite. It is a play of hide and seek between the two—God and man.”

বের্গসঁ

ফরাসি দার্শনিক বের্গসঁ গতির কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ কাব্যে বের্গসঁর তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করি। ‘‘ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে/হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা অন্য কোন খানে।” রবীন্দ্রনাথের কলমে উপনিষদের ‘চরৈবেতি’র সঙ্গে বের্গসঁর গতিবাদ মিলে যায়।

বের্গসঁর গতিবাদের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও, বের্গসঁর তত্ত্বের প্রভাব ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ সম্পর্কে একটি নিজস্ব ভাবনা ছিল। বের্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখি সুখ ও আনন্দ সম্পর্কিত ভাবনায়। ‘‘সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত।” (পাগল, বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৯০৭, পৃ. ৯৯)।

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১১ সনে বের্গসঁর দেওয়া বক্তৃতায় (জীবন আর চেতনা) সুখ ও আনন্দ সম্পর্কে ঐ একইরকম ভাবনার প্রকাশ দেখি।

কোঁত

‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০) ও ‘গীতালি’ (১৯১৪) কাব্যে মানবতার পূজাই যে ঈশ্বরের পূজা, সেই সত্যটিকেই তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ফরাসি দার্শনিক কোঁত-এর দর্শন ভাবনার সঙ্গে মিল পাই। কবির কলমে এই দর্শন অনায়াসে উঠে এসেছে।

‘বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।’

নৈবেদ্য (১৯০১) কাব্যেও অনুরূপ ভাবনার প্রকাশ দেখি।

কোঁত-এর দর্শনের প্রকাশ দেখি ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের জ্যাঠামশাই-এর মননে।

জুবেয়ার (Jon-bert 1754-1824)

ফরাসি দার্শনিক জুবেয়ারের সাহিত্যরচনা, কলা সমালোচনা ইত্যাদি সম্পর্কে অভিনব মতামত দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘জুবেয়ার’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ও লিপিকুশল লেখকের পার্থক্য কী ইত্যাদি বিষয়ে জুবেয়ারের মতামত নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ‘জুবেয়ারের’ ‘Selection of Thoughts’ বইটি কিনেছিলেন। এই বইয়ের দার্শনিক সুলভ ভাবনার কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করে তিনি বঙ্গদর্শনে (বৈশাখ, ১৩০৮) প্রকাশ

করেন। ম্যাথু আর্নল্ডই জুবেয়ারের গ্রন্থ প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, সেকথাও রবীন্দ্রনাথই আমাদেরকে জানান। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, জুবেয়ারের সাহিত্য বিষয়ক মন্তব্যগুলির মধ্যে বিশেষ গভীরতা আছে।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মন আরও ঋদ্ধ হয় এই পাঁচজন ফরাসি দার্শনিকের অনুপ্রেরণায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সত্য-সুন্দর-মঙ্গল—ভিক্টর কুজ্যাঁ (অনুবাদ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)
সম্পাদনা — তরুণ মুখোপাধ্যায়/আরুণি/১৯১১

২। এ মণিহার—ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শৈব্যা পুস্তকালয়, ১৩৮৮ (আমিয়েলের জার্নাল ও রবীন্দ্র মানসিকতা প্রবন্ধ)।

৩। সৌন্দর্যতত্ত্ব—অভয় কুমার গুহ, প্রতিভাস, ২০০৮

৪। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব — ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, দে'জ।

অ-সহজপাঠ : রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা শিশুপাঠ্য

সোহিনী ঘোষ

আমাদের ছোটবেলা কেটেছিল নানা রকম দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। আমাদের শৈশব-বাল্য যতটা 'ছেলে' ময় ছিল (ছেলেপিলে, ছেলেবয়স, ছেলেমানুষ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে), ততখানি 'মেয়ে' ময় ছিল না। 'মেয়েমানুষ' শব্দের ব্যবহার সাধারণত 'অব' অর্থেই হত। 'ঐ মেয়েমানুষ যে কী ভালো'— এমনতরো প্রয়োগ ছিল না বললেই চলে। বরং 'মেয়েমানুষের এ কি রকম আচার' বা 'আমি একলা মেয়েমানুষ একাজ কেমন করে করব' বা 'এইজন্যই মেয়েমানুষ নিয়ে পথে বেরোতে নেই, বা 'অসভ্য মেয়েমানুষ' জাতীয় বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়ে জাত নির্ণীত হত মেয়েদের। আর 'মেয়ে'-র সঙ্গে 'ছেলে' জুড়লে? হয় সেটা নিতান্ত অশিক্ষিতের ভাষা, নতুবা ইচ্ছাকৃত 'স্ল্যাং'। 'মেয়েবেলা'ও যে একটা থাকতে পারে সে কথা তসলিমা নাসরিন ঝুঁটি ধরে না শেখালে কবে যে শিখতুম কে জানে!

এ-হেন শৈশবে হাতেখড়ির বয়সে প্রথমেই হাতে আসে বিদ্যাসাগর মশাই-এর 'বর্ণপরিচয়'; কিছু পরে 'হাসিখুসি' আর 'নিজে পড়'-র সঙ্গে সঙ্গে 'সহজ পাঠ—প্রথম ভাগ'। বাংলা প্রাইমারের সঙ্গে এইভাবেই পরিচয় ঘটে আমার। 'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ' চিত্রহীন বৈচিত্র্যে কঠিন। 'আম' আর 'ইট' যদি বা অকিঞ্চিৎকর স্বল্প পরিচিত জীবনে চিনে নেওয়া যায়—'অজ' আর 'ঈশ'-য় বালিকা বয়সের জ্ঞান পৌঁছোয় না কিছুতেই। তার চেয়ে ঢের ভালো লাগত 'নিজে পড়' আর 'হাসিখুসি'। 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগের সামনে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত 'গেল ভয়'। কারণ? 'চারিদিক ঝিকমিক'। সে এক আনন্দযাত্রা ছিল পাঠের মধ্যে দিয়ে। অক্ষর পরিচয় করানোর জন্য কোনো তাড়া নেই। তাড়া নেই আ-কার, ই-কার, উ-কার, এ-কার শেখানোয়। অলস মন্থর পায়ে এ-পথ সে পথ হাঁটতে হাঁটতে, এ-নদী সে-নদীর পাড় দেখতে দেখতে, বাঁক ঘুরে ঘুরে, গাছ-ফুল-মেঘ-পাখি চিনতে চিনতে কখন যে শেষ হয়ে যেত প্রথম ভাগের পাঠ! মানুষও কি কিছু কম চেনা হল? ভোলা মালী, চুনি মালি, বেণী বৈরাগী, লোকা ধোবা, পাখি পোষা দীনু—এমন কত মানুষ এল-গেল সহজ পাঠের পাতায় পাতায়!

প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ এবং অংশত তৃতীয় ভাগ লিখলেন রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষার কথা মাথায় রেখে। মূলত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য লেখা হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের (১৯৩০) সঙ্গে সঙ্গে পালাবদল ঘটে গিয়েছিল বাংলা প্রাইমারের পাতায়। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এভাবেই মুদ্রিত আছে প্রকাশকাল) পরিণত হল বাংলা শিশুপাঠ। কেন পরিণত? কেন না পাঠের মধ্যে উপদেশ নেই, নেই নিষেধাজ্ঞা। অমিত অপার আনন্দযাত্রায় ভয় ভাঙানোর সুর! পরিণতির একটা বড় লক্ষণ প্রতি পৃষ্ঠায় জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া। প্রথম পাতায় খোকার অর্থহীন ধ্বনির আড়ালে অব্যক্ত বক্তব্যই হোক, বা, শাল মুড়ি দেওয়া হক্ষ-র ঘরের কোণে বসে খক্ষ কাশিই হোক, বা বড় বউকে ভাত আনতে বলার সহজ দৈনন্দিনতাই হোক—পাতায় পাতায়

ঘরের ছবি সেখানে। উচ্চাসনে বসা বেত্রহস্ত গুরুমশাই নন, যেন জীবনের পাঠ দিচ্ছেন সেই সহৃদয় শিক্ষক—যিনি পড়ুয়ার হাত ধরে অলিতে, গলিতে, মেঠোপথ-রাজপথে, নদীর ধারে ধারে, মাঠের পাশে পাশে কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর চেনাচ্ছেন জীবনকে। প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি এঁকে দিলেন নন্দলাল বসু। সাদা-কালো সে সব ছবিতে শিশুর সামনে খুলে গেল এক আশ্চর্য কল্পনার জগৎ। দ্বিতীয় ভাগে তো নির্দেশই রইল ছবিগুলিকে রঙ করার। রঙে, রেখায়, রসে ভরপুর হয়ে গেল বাঙালি শিশুর পাঠ।

অথচ, সহজ পাঠে শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করতে গেলে অবাক হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কি তবে লিখলেন বালকদের সহজ পাঠ? বর্ণশিক্ষার পরেই যে প্রথম পাঠ—সেখানে খুদিরাম, মধু রায়, জয়লাল, অবিনাশ, হরিহর, পাতু পাল, দীননাথ, গুরুদাস থাকলেও বুড়ি দাই-এর বাইরে মেয়েদের অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয় আর তৃতীয় পাঠেও নেই। চতুর্থ পাঠে বিনিপিসি, বামি, দিদি, রাণী দিদি মা, মাসি আর কিনি-র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অবশ্য, পঞ্চম পাঠে চড়িভাতি করতে না যাওয়া উমা আর উষার জন্য কুল আনার পরিকল্পনাও থাকে—কিন্তু আশ্চর্য লাগে দশটি পাঠে বিন্যস্ত প্রথম ভাগের বাকি আটটি মেয়েদের সম্পর্কে একেবারে নীরব।

দ্বিতীয় ভাগের ষষ্ঠ পাঠে শান্তা আর ক্ষান্তমণির উল্লেখ, অষ্টম পাঠে খাতা ছেঁড়া প্রসঙ্গে কঙ্কার উল্লেখ, নবম পাঠে বোষ্টমীর গান গাইবার সংবাদ, দশম পাঠে রক্ষামণির খুকুকে দেখভাল করার খবর, ত্রয়োদশ পাঠে নিস্তারিণীর বিবাহ সংক্রান্ত গোলযোগ এবং কাত্যায়নীর সহৃদয় উপস্থিতির বাইরে তেরটি পাঠের বাকিগুলিতে মেয়েদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তৃতীয় ভাগে রবীন্দ্রনাথের তেরটি কবিতা এবং একটি গল্প সংকলিত হয়েছে। তারমধ্যে একমাত্র মোটা কেঁদো বাঘের সঙ্গে তক্‌রার করা পুঁটু ছাড়া, বাকি কবিতাগুলির মধ্যে সাতটিতেই মেয়েদের একটাই পরিচয়—'মা'। মা—জননী এবং স্বদেশ দুই অর্থেই।

সহজপাঠে উল্লিখিত মেয়েদের সামাজিক অবস্থানটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। 'দাই' তো নিশ্চয়ই 'দাসী'র অপভ্রংশ। অনুমান করা যেতে পারে—আলো হবার কারণে ভয় দূর হয়ে চারিদিক ঝিকমিক করছে যখন, যখন সকলেই কাজে বেরিয়ে পড়েছে—তখন বাড়ির বৃদ্ধা পরিচারিকার অশক্ত শরীরের কারণে হয়তো বা ঘুম ভাঙেনি। বাড়ির মেয়েরা করুণাবশত তাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়নি নিশ্চয়ই। নইলে জাম পাড়া, খেয়া বাওয়া, হাল টানা, ঘাস কাটা, চাষ দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেলে বাড়ির মেয়েরা তো নিশ্চয় শুয়ে নেই। দাসীকে অবশ্য টিয়ে পাখিকে জল খাওয়ানো ছাড়া আর কোনও কাজ করতে হয় না। তার জন্য অন্যরা আছে। কান্ত চাকরের বোন ক্ষান্তমনির ওপর খাওয়ানোর ভার। খুকুর নিরাপত্তার ভার রক্ষামণির হাতে। মাটি দিয়ে ঘটি মাজা বামিও কি কাজেরই লোক? বিনিপিসি আর দিদির সঙ্গে বামির ঘাটে যাওয়ার সংবাদ আছে। বিনিপিসি আর দিদি ঘাটে গিয়ে কি করে তা অবশ্য জানা যায় না—তবে ঘরকন্নার কাজই করে হয়তো—ঘটি না মাজলেও রান্নার জল আনা কি কাপড় কাচা—এসবই হবে! স্নান করতেও মানা নেই। তবে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। মেয়েদের ঘাটে যাওয়া সংবাদ হিসেবে কতটাই বা মূল্যবান! আর রাণীদিদির তিনদিন কাশি বলে সে ঘাটে যায় না। মা আর মাসি তার দেখাশোনা করেন। মা-মাসিরা তো আর ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতে পারেন না—তাই তাঁদের কেবল শুশ্রূষার ভারই নিতে হয়! অন্যসময়ে রাণীদিদি যে কোনও কাজ করে না তা নয়—সে যে টিয়ে পাখিকে বাটি ভরে দানা খাওয়ায় সে খবরও আমরা জেনে যাই। পাড়ার মেয়েরা বাঁকা সরু গলি বেয়ে দিঘিতে জল আনতে আসে—সেও তো এই

পাঠেই। উমা আর উষা ছেলেদের সঙ্গে চড়িভাতি করার অনুমতি পায় না। তাই তাদের মনখারাপ ভালো করার জন্য এক ঝুড়ি কুল পেড়ে আনার খবর পাই। কিন্তু কেন তারা অনুমতি পায় না? শান্তিনিকেতনে সহ-শিক্ষার পাঠ যখন আগেই শুরু হয়ে গেছে? সেকি এইজন্যই যে রবীন্দ্রনাথ মনে করছেন যে মেয়েরা সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়বে? হ্যাঁ, তেমন কথাই তো বোধহয় ভাবছেন তিনি। অন্তত দ্বিতীয় ভাগের ষষ্ঠ পাঠে তো স্পষ্ট বললেন সে কথা! দল বেঁধে যখন উস্রি নদীর ঝরনা দেখতে যাচ্ছে সবাই, অনন্ত আর সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্রকেও ডাকাডাকি করা হচ্ছে, তখন সংশয় প্রকাশিত হচ্ছে কেবলমাত্র শান্তা প্রসঙ্গেই—"শান্তা কি যেতে পারবে। সে হয়তো শ্রান্ত হয়ে পড়বে।"

নিজের ওপর আস্থাশীল মেয়েদের খবর পাই জমিদার দুর্লভবাবুর পিসি কাত্যায়নী প্রসঙ্গে। অন্যায় হচ্ছে দেখে যিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। উদ্ধবের জরিমানার অর্থ যুগিয়ে তাকে মুক্ত করেছিলেন। বহু তত্ত্ব পাঠিয়ে, সোনার হার দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন উদ্ধবের মেয়েকে। কন্যাদায়-গ্রস্ত, দরিদ্র, অত্যাচারিত, অসহায় পিতার দুর্দশা মোচনের জন্য যথাসাধ্য করেছেন। নিজে উপস্থিত থেকেছেন বিয়ের আসরে—জমিদারের বিরোধিতা সত্ত্বেও। আর নিজের ওপর অটল আস্থায় অবিচলিত থেকেছে পুঁটু। সে মোটা কেঁদো বাঘকে ভয় না পেয়ে যুক্তি বিস্তার করেছে কেন সে বাঘেরও অভক্ষ্য। খেয়াল করলে বোঝা যাবে কাত্যায়নী বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। প্রিভিলেজ্‌ড্‌। বিত্ত আর আভিজাত্য তাঁকে যে সুবিধা দিয়েছে—সে ধরনের সামাজিক সুবিধার নিরাপদ বলয় সাধারণ মেয়েদের ছিল না। তাই তারা ঘাটে যায় কিংবা পাখিকে দানা খাওয়ায় কিংবা ঘরের কাজ করে। আর কী অপরিসীম দারিদ্র্য থাকলে তবে ঘোর বর্ষায় বোষ্টুমী ভিজে ভিজে গান শোনাতে আসে। বাড়িতে একমুঠো অন্নের সংস্থান থাকলে কি আর এমন হতো? ঢেঁকিঘরে পুঁটুর ধান ভানাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু বাঘের আবির্ভাবেও সে যে অকুতোভয় থাকল—সে কি এইজন্য যে, সে প্রান্তবাসী? 'অস্পৃশ্যতার' আপাত আচ্ছাদন কি তাকে মুখর করে তুলেছিল? মহাত্মা গাঁধিজীর এই শিষ্য যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেছে—তার পিছনে কি প্রচ্ছন্নভাবে কার্যকর হয়ে রয়েছে কোনও রাজনৈতিক ইশারা?

ঘটনা যাই হোক না কেন—সহজ পাঠের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অজান্তেই যে সত্য প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে তা হল এই—'সহজ' পাঠের মেয়ে'রা 'সহজ পাঠে'র পড়ুয়া নয়। তাদের জন্য এ বই লেখা হয়নি। সহজ পাঠে যে সব ছেলেদের কথা আছে তারা বরং হতে পারে সহজ পাঠের পড়ুয়া। তারা মঙ্গলবারে দঙ্গল বেঁধে পাড়ার জঙ্গল সাফ করায় যেমন ওস্তাদ, তেমনি খেলার মাঠে দল বেঁধে বল খেলার অধিকারী, চড়িভাতি করতে কুলবনে যাওয়াতেও বাধা নেই তাদের—আবার বাড়ি ফিরে হাত মুখ ধুয়ে অংক করতে বসে যায় বাবা আপিস থেকে ফিরলে। মাঝে মাঝে কঙ্কারা যে অংক খাতা ছিঁড়ে দেয় না তা নয়—তবু।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রথম প্রকাশ 'সহজ পাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের। তার আগেই রবীন্দ্র সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে—মৃণাল-বিনোদিনী-আশা-হেমনলিনী-সুচরিতা-ললিতা-বিমলা-দামিনী-কুমু-লাবণ্য। এদের শৈশবের পাঠ্য কি তবে? একটু ঘুরে দেখা যাক চিত্রটা। উনিশ শতকে প্রথম বাংলা প্রাইমারের প্রকাশ হয় শ্রীরামপুরের মিশনারীদের হাত ধরে। নাম—'লিপিধারা' (১৮১৬)। এরপর 'বর্ণমালা' (১৮১৮) আর 'শব্দসার' (১৮৩৫)। হিন্দু কলেজ পাঠশালা (১৮৩৯) এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০)—এসব প্রাইমার পড়াতে অস্বীকার করলে লেখা হয়—'শিশুসেবধী' (১৮৪০; রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ)। তবে যুগান্তর ঘটেছিল ১৮৪৯-এ, যখন ক্যালকাটা

ফিমেল স্কুল-এর উপযোগী করে তৈরি হল 'শিশুশিক্ষা' সিরিজ (১৮৪৯-৫০-৫১)—যার প্রথম তিন খণ্ড লিখলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, চতুর্থ খণ্ড লিখলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পঞ্চম খণ্ডের লেখক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে চতুর্থ খণ্ড 'বোধোদয়' ও পঞ্চম খণ্ড 'নীতিশিক্ষা' নামে পরিচিতি পেয়েছে। ১৮৫৫ সাল—বাংলা প্রাইমার আবার দিক বদলালো। 'শিশুশিক্ষা'র কাব্যময়তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নির্মেদ যুক্তিশীল সুঠাম গদ্যে রচিত হয়েছিল 'বর্ণপরিচয়'। উনিশ শতকের প্রাইমার-এ বালকদের একাধিপত্য। বর্ণপরিচয় তো কঠোরভাবে বালিকারহিত। তবে আশ্চর্য এই যে উনিশ শতকে কোনও কোনও মহিলা বালিকাদের জন্য প্রাইমার রচনা করেছিলেন। কামিনীসুন্দরী দাসী লিখেছিলেন 'বালাবোধিকা' (১৮৬৮), প্রতুলকুমারী দাসী রচনা করলেন 'বালিকা বোধিকা'-১ (১৮৭৭) এবং সরোজিনী দেবী তৈরি করলেন 'বালিকা শিক্ষা সোপান' ১/২ (১৮৯৮)।

'শেষের কবিতা' (১৩৩৬) লেখা হয়ে যাচ্ছে যখন, তখনও প্রকাশ পায়নি 'সহজ পাঠ'। বস্তুত 'সহজ পাঠ' যখন প্রকাশ পাচ্ছে তার কয়েকদিন মাত্র পরেই ঊনসত্তর পূর্ণ করবেন রবীন্দ্রনাথ, পা দেবেন সত্তরে। এই সমর্থ অভিজ্ঞতায় তৈরি হয়ে উঠেছে 'সহজ পাঠ'। তবু কি তিনি একটু অমনোযোগী থেকে গেলেন? মনে পড়ল না তাঁর—শিশুপাঠ্যে শিশুরা যদি লিঙ্গ বিভাজনের কারণে ব্রাত্য হয়ে যায়, বিমলারা পরবর্তী সময়েও ঘরের বাইরে গিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়তে পারে! কোন্ প্রত্যয় থেকে চিত্রাঙ্গদারা উচ্চারণ করবে—

'পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি,
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।

১৩২১—'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'শ্রীবিলাস' পর্বে জানা হয়ে যায় আমাদের—'...আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিনী হইল না, সে মায়া হইল না। সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাহাকে ছায়া বলে।' অথচ, তার ষোল বছর পরে প্রগাঢ় প্রজ্ঞায় রচিত হল যে শিশুপাঠ্য তাতে বালিকার 'সত্য' হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গেল না।

আমার ইতিহাস পড়ুয়া মেয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলে—'লিবারাল শভিনিষ্ট'। লিবারাল শভিনিষ্ট? হবেনও বা!

নিরুপমা থেকে সোহিনী : নারীর আত্মসত্তা নির্মাণ—একটি খসড়া

শ্রাবণী পাল

‘হিতবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘দেনাপাওনা’ (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮) আর শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ল্যাবরেটরি’ (আশ্বিন ১৩৪৭) গল্পের মধ্যে ব্যবধান প্রায় পঞ্চাশ বছরের। এই পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় যে স্বরান্তর ঘটেছে, তার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচনায়। তাঁর গল্পের চরিত্র-পরিকল্পনা বদলে গেছে, বদলে গেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের ভাষা। তবু মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের গল্পের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমাবধি এক পরম্পরা লক্ষ করা গেছে—তারা বারবার যাত্রা করেছে আত্মস্বরূপের সন্ধানে। সেই যে নিরুপমা তার পিতাকে বলেছিল, ‘‘তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি যে যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।’’ তারপর থেকে এইধরনের আত্মসচেতন প্রতিবাদ গিরিবালা শশিকলা চন্দরাদের কথায় প্রায়শই উচ্চারিত হয়েছে। ‘সবুজপত্র’ পর্বে অনিলা মৃণাল কিংবা কল্যাণীর জীবনের পথে যাত্রা যেন নিজেদের খুঁজে পাবার জন্য। পুথিগত বিদ্যায় নিরুপমারা শিক্ষিত ছিল কিনা গল্পের পরিসরে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব চেনায়, ব্যক্তিত্বের নির্মাণ আর বিকাশ করে—রায়বাহাদুরের বাড়িতে কিংবা জয়গোপালের গৃহে প্রাত্যহিক অবমাননায় ক্লিষ্ট হতে হতে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তারা সেই শিক্ষায় আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল। এই পথেই আরো পরে এসেছে ক্যারেকটারের তেজে ঝক্‌ঝক্ করা সোহিনী—সে প্রচলিত অর্থে সতী নয়, প্রেয়সী ও জননীরূপেও তার চরিত্র মুখ্য নয়, তবু নারীরূপে, ব্যক্তিরূপে সে খাঁটি এবং অকৃত্রিম। ব্যক্তিত্বের এই ধরনের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নারীচরিত্রে নেই, এ একেবারে অভিনব। নারীর অসহায়তা থেকে আত্ম-শক্তিতে উত্তরণের আধার তাই রবীন্দ্রনাথের গল্প, নিরুপমায় এর সূচনা, সোহিনীতে তার পরিণতি।

‘নারী’ (কালান্তর) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন—

> ‘‘...আমাদের বাল্যকালে ঘরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পালকির যুগ। মানী ঘরে সেই পালকির উপরে পড়ত ঘটাটোপ। বেথুন স্কুলে যে মেয়েরা সর্বপ্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বারখোলা পালকিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয়নি। সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা করে রেলগাড়িতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।’’

তারপর সেই ঢাকা পালকির যুগ চলে গেছে বহু দূরে। মেয়েদের জীবনেও এসেছে পরিবর্তনের নানামুখী স্রোত। তাদের বিবাহের বয়স বেড়েছে, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। তারা এসে দাঁড়িয়েছে কর্মক্ষেত্রে—বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা তখন মেয়েদের জন্য আরো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মেছিলেন, সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃতি তখনকার বাঙালি সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র ছিল। ঐ পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতেন, সাহিত্যচর্চা করতেন, বাংলাভাষা ছাড়াও ইংরেজি ও সংস্কৃতভাষায় ঐ পরিবারের মেয়েদের সহজাত ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁরা নিজেদের বাড়ির প্রাঙ্গণে পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় করতেন অতিথি পুরুষ-দর্শকের সামনে; এমনকি ঐ পরিবারের বধূর স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে গড়ের মাঠে বায়ুসেবনের ঘটনাও সকলের জানা। অর্থাৎ একথা বলাই যায়, রবীন্দ্রনাথ যখন ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছেন, তখন নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির আবহাওয়া ঠাকুরবাড়িতে ছিল এবং সেই আবহেই তাঁর মন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এইরকম প্রগতিশীল অভিজাত পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করেও রক্ষণশীলতা থেকে, প্রচলিত কিছু সংস্কার থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত রাখতে পারেননি। তিনি বাল্যবিবাহ সমর্থন করতেন না, অথচ নিজের দুই মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন অল্পবয়সে। পণপ্রথা সমর্থন করতেন না, পণপ্রথা ব্যক্তিজীবনে যে কত মর্মান্তিক হয়ে উঠতে পারে, তা তিনি জানতেন এবং তাঁর একাধিক গল্পের পরিসরে পণপ্রথার নিষ্ঠুরতা যুগপৎ কারুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। অথচ নিজের কন্যার বিবাহে চড়া পণ দিয়ে আর্থিকভাবে চরম বিপর্যস্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ একটা স্ববিরোধী ধারণার মধ্যে তিনি চলেছিলেন প্রায় সময়। তবু সেইসময় তাঁর ভাবনার প্রাগ্রসরতাও লক্ষ করার মতো। নির্বাচিত কিছু গল্পের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার—নারীর আত্মপরিচয় সন্ধানের বিশেষ অভিমুখটি চিহ্নিত করার প্রয়াস থাকবে এই প্রবন্ধে।

‘দেনাপাওনা’ গল্পের বিষয় প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অপারগ হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে বধূনির্যাতন ও পরিণামে বধূমৃত্যু। কিন্তু এই ঘটনার আড়াল থেকে রবীন্দ্রনাথ টেনে এনেছেন নিরুপমাকে—পণপ্রথার নিষ্ঠুর আঘাত যার বৈবাহিক জীবনকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। বাপ ‘পুরা দাম’ দেয়নি বলে নিরুপমা শ্বশুরবাড়িতে ‘পুরা যত্ন’ পেলো না, রামসুন্দর কন্যার উপর স্বাভাবিক অধিকার হারালেন। অপমানিত রামসুন্দর বসতবাড়ি বিক্রি করে অর্থসংগ্রহ করে কন্যার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও ভাইদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে নিরুপমা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। বলে—

> তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা
> টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।

এইখানে নিরুপমার স্বাতন্ত্র্য, তার প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব। সেযুগে আর পাঁচটা মেয়ের মতো নিরুপমাও পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত, কিন্তু এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই তার ব্যতিক্রমী চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে। প্রাপ্য মর্যাদা তো সে পেলোই না শ্বশুরবাড়িতে, বরং আরো নিঃসঙ্গ, বন্দিনী হয়ে পড়ল নিরুপমা। শ্বশুরবাড়ির অনুগ্রহ সে উপেক্ষা করল আত্মনিগ্রহের মধ্যে দিয়ে, ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল সে। এবং হত্যা এবং আত্মহত্যার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকে নিরুপমার ‘মৃত্যু’। সমকালীন এই সমস্যাটিকে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই এখানে তুলে ধরেছেন। বহুবিবাহ কৌলীন্যপ্রথা এবং বিস্তর পণের দাবিতে এদেশের বাঙালি সমাজে এক করুণ অবস্থা তৈরি হয়েছিল সেদিন। একদিকে কন্যার পিতা ঋণভারে বিপর্যস্ত, অন্যদিকে পুত্রের অভিভাবকদের ক্রমস্ফীত অর্থলালসা, নব্যধনী এবং শিক্ষিতরাও যে পুরোপুরি পণপ্রথার বিরোধী ছিল তা নয়। নিরুপমার স্বামীর মতো ব্যতিক্রম ছিল, তবে এখানে তার প্রাথমিক প্রতিবাদ শেষপর্যন্ত নিরুপমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনায় নিরুপমার প্রতিবাদের মাত্রাটি অন্যরকম। হয়তো সে অর্থে বলিষ্ঠ নয়, সে তার পিতাকে ফিরিয়ে দিতে পারে কিন্তু পতিগৃহের

চৌকাঠ ডিঙোতে পারে না, সে সময় তখনও আসেনি। তবু তার নিজের মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা তাৎপর্যবহ।

একই বছরে (ফাল্গুন ১২৯৮) লেখা 'কঙ্কাল' গল্পেও পণপ্রথার এক বীভৎস দিক রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। এ গল্পের নায়িকা নিরুপমা নয়, সে নীরবে সবকিছু সহ্যও করেনি। বাল্যবিধবা 'কনকচাঁপা' পরিপূর্ণ যৌবনে তার দাদার বন্ধু শশিশেখর ডাক্তারের সঙ্গে প্রণয়সম্পর্কে লিপ্ত হয়। কিন্তু সে প্রণয় পরিণয়ে চরিতার্থ হতে পারেনি। আত্মরূপমুগ্ধ এই মেয়েটি নিজের প্রেমের অমর্যাদা সহ্য করতে পারেনি। সে আত্মহত্যা করেছে, তবে তার আগে প্রণয়ীর পানপাত্রে ঢেলে দিয়েছে বিষ। শশিশেখর অন্যত্র বিয়ে করতে যাচ্ছে তাই নয়, মেয়েটির কাছে আরো অসহ্য মনে হয়েছিল তার অর্থলালসা—

> অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন। কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কী। আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব। পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই।

একে 'বিষকন্যা' অপবাদ, বাল্যবিধবার বিবাহ সম্ভব ছিল না সেদিন অথচ মেয়েটির প্রবল রূপাসক্তি, সামাজিক বিধানের মধ্যে প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মকে চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা এখানে। গল্পের পরিবেশ অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু নায়িকার দীর্ঘশ্বাস মিথ্যা নয়। বিশেষত, মেয়েটির আমিত্ব প্রবল, 'আমিত্ব' অপমানিত হয়েছে বলে তার আত্মখণ্ডন-নারীর ব্যক্তিসত্তা সমাজে তখনও তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সমকালের সমাজের ভিন্ন পথে হেঁটেছেন—তাঁর গল্পে নারী নিজের মর্যাদা বুঝে নিতে উচ্চকণ্ঠ।

ব্যক্তিসত্তার পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার দৃপ্ত ঘোষণার যে সূত্রপাত নিরুপমার মধ্যে, 'মহামায়া' গল্পেও তার প্রকাশ অব্যাহত। কৌলীন্য প্রথা সহমরণ উনিশ শতকের প্রথম পর্বে প্রচলিত। যদিও ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ রদ হয়েছিল, তবে এ গল্পের নায়িকা মহামায়া আধুনিক যুগের ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী। রাজীবকে ভালোবাসলেও বিবাহ হয়নি, মহামায়ার অহঙ্কার ছিল রূপের, কুলীনমর্যাদার। তার বিবাহ, অর্ধদগ্ধ চিতা থেকে উঠে আসা এবং রাজীবের শপথ এসবকিছুর মধ্যেই একটা অন্য মাত্রা আছে। কিন্তু যেদিন শপথ ভুলে অনুকূল এক নিসর্গ আবহে রাজীব মহামায়াকে দেখেছে, দেখেছে তার অগ্নিদগ্ধ সৌন্দর্য; জেগে উঠেই মহামায়া ঘর ছেড়ে গেছে। তার এই নীরব প্রস্থানের মধ্যেই ব্যক্তিসত্তার বিস্ফোরণ ঘটেছে—এ নারী দয়া পেতে চায়নি, তার প্রচণ্ড আত্মগৌরব তাকে রাজীবের করুণার আশ্রয়ে থাকতে দেয়নি, রাত্রির অন্ধকারে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করিয়েছে। এ গল্পের স্থান-কাল-ঘটনা প্রাচীন প্রথাবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু যে নারীকে গল্পকার এখানে উপস্থিত করেছেন চরিত্রগৌরবে সে দীপ্তিময়ী—নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে সমাজের কিংবা বিশেষ ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নয়, সে নিজের মতো করে মুক্তি খুঁজেছে—কখনও প্রথায়, কখনও প্রেমে এবং শেষপর্যন্ত বোধহয় আত্মস্বরূপের সন্ধানে।

সপত্নীর প্রতি স্বামীর অত্যধিক আগ্রহ হরসুন্দরীকে আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত করেছিল, দীর্ঘ সাতাশ বছরের দাম্পত্যজীবনে তার অবস্থান কোথায় তা সে মূল্যায়ন করেছিল। সতীন নিয়ে ঘর করা সেসময়ে বিরল কোনো ঘটনা ছিল না, অধিকাংশ মেয়েই প্রচল এই প্রথা আর সংস্কারের মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দিত। সেই প্রেক্ষিতে হরসুন্দরীর এই আত্মমূল্যায়ন নারীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ

মনোযোগ দাবি করে। স্বামীর অপমান ভুলতে না পেরে অভিমানিনী চন্দরা আত্মবিনাশের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে, সেখানে স্বামী কিংবা সমাজের কোনো ভূমিকা নেই। ব্যক্তিত্বময়ী চন্দরা নারীত্বের অবমাননা ও আত্মগ্লানি থেকে বাঁচবার জন্য মৃত্যু অভিসারে যাত্রা করেছে। যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি বলে বিবেচিত হয়, সেই সমাজ পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে চন্দরা বিদ্রোহ করেছে। নিজের অস্তিত্বকে সে চিনে নিতে শিখেছে ছিদামের ঐ অলীককথনের মধ্যে দিয়ে। তারপর আর কোনকিছুর সঙ্গেই চন্দরা আপস করেনি। চারদিকের সব লাঞ্ছনা আর অপমানের মধ্যে থেকে চন্দরা সযত্নে নিজের নারীত্বকে রক্ষা করতে চেয়েছে—এইখানে সে তার সময়কে অনেকখানি অতিক্রম করে গেছে। স্বামীর আশ্রয়ে থেকে স্বামীর যাবতীয় দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করেছে শশিকলা 'দিদি' গল্পে। 'প্রীতিপূর্ণ নম্র হৃদয়ে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে'—এই ভাবনা থেকে ক্রমশ সরে এসেছে শশিকলা। স্বামীর 'অগ্নিমূর্তি' শশীকে সন্ত্রস্ত করতে পারেনি, অনাথ ভাইকে রক্ষার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অসংকোচে সব কথা ব্যক্ত করেছে। এইখানেই প্রচলিত ছকের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শশিকলা। একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যকেও সে বিরাট এক প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। স্বামীর আচরণের প্রতিবাদ করবার মতো সাহস সঞ্চয় করে শশিকলা নিজ ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শেষরক্ষা হয়নি। শশিকলা জয়গোপালের গৃহে ফিরে আসার পর তার মৃত্যু ঘটেছে। হয়তো স্বামীই তার মৃত্যুর কারণ, কিন্তু শশিকলার প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য।

'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালা এইরকমই এক প্রতিবাদী চরিত্র। উনিশ শতকের কলকাতার বাবুবিলাসের এক বাস্তব প্রেক্ষাপট আছে এখানে। ধনবান নব্যযুবার উচ্ছৃঙ্খলতা ও বারাঙ্গনাগমন সেসময়ের খুব সাধারণ একটি ঘটনা, সমকালের অনেক নাটক উপন্যাসে তার ছবি আছে। কিন্তু এই গল্পে প্রচলিত সমাজচিত্রের অতিরিক্ত যা আছে তা এক উপেক্ষিতা গৃহবধূর তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা এবং নটীতে রূপান্তর। পত্নী গিরিবালাকে অবহেলা করে গোপীনাথ শীল থিয়েটারের অভিনেত্রী লবঙ্গতে সমর্পিত, স্বামীর এই অনাদরের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গিরিবালাকে তার পরিবারসীমা ছাড়িয়ে রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। এখানে তার প্রতিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ রয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চূড়ান্ত আত্ম-রতিও গিরিবালার জীবন-রহস্যের একটা দিক। দীর্ঘদিন স্বামীর অবহেলা পেয়েও সে বধূজনোচিত সীমা অতিক্রম করেনি কেবল গোপনে থিয়েটার দেখা ছাড়া, গোপীনাথের প্রত্যাবর্তনের ক্ষীণ আশা মনের গভীরে লালন করে চলেছিল। কিন্তু যেদিন তার নারীত্ব অপমানিত হল সেদিন গিরিবালার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বস্তুত, মদমত্ত গোপীনাথের কাছে পত্নী এবং নটীকে প্রহারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে নটীকে প্রহার করলে তার প্রতিবিধান আছে, কিন্তু পত্নীকে প্রহার তো সেকালের সমাজে প্রচলিত ব্যাপার, তার কোনো সামাজিক প্রতিবিধান নেই। স্বামীর অবহেলা আর অপমান চূড়ান্ত আত্মরতিমুগ্ধ গিরিবালাকে রঙ্গমঞ্চের বহু দর্শকের সহর্ষ করতালির মধ্যে এনে একদিকে তার অহংকেই তৃপ্ত করেছিল। মনোরমার ভূমিকায় তার রক্তাম্বর গিরিবালার বিদ্রোহের প্রতীক রূপেও চিহ্নিত হতে পারে। 'মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া' তার প্রকাশ গৃহবধূর অবগুণ্ঠন অপসৃত করে জনসমক্ষে নটীকেই তুলে ধরেছে—স্বামীর প্রতি প্রতিশোধ বাসনায় গিরিবালা কি একভাবে আত্মখণ্ডনই করল—এ প্রশ্নও উঠতে পারে। হতে পারে একদা স্বামীর পদাহত পত্নী আজ স্বামীকেই লাঞ্ছিত করেছে—কিন্তু এরমধ্যেই সঞ্চিত রয়েছে গিরিবালার কান্না আর দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস। উনিশ শতকের নববাবুবিলাসের সমস্ত ছক ভেঙে দিয়ে গিরিবালা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের ফাঁকটুকুকে সে চিহ্নিত করেছে এবং ঘরের কোণে বসে

অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চোখের জল না ফেলে স্বামীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছে। নিরুপমার মতো কেবল উচ্চারণ নয়, চন্দরার মতো নীরব অভিমান নয়, শশিকলার মতো স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন নয়; গিরিবালা এদের থেকে অনেক সক্রিয়। থিয়েটারের নটীর কৃত্রিম ছলাকলার কাছে তার নিজের অপরূপ সৌন্দর্যের পরাভব ঘটবে, একথা গিরিবালা নির্বিবাদে মেনে নিতে পারেনি। যেদিন লবঙ্গের জন্য গোপীনাথ তাকে পদাঘাত করে চলে গেছে, সেদিনই গিরিবালার নবজন্ম হয়েছে। গল্পের শেষাংশে মনোরমা-রূপী গিরিবালার অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসায় নারীশক্তির অন্যমাত্রা—'সবুজপত্র' পর্বে লিখিত গল্পগুলির নারীচরিত্রের সঙ্গে গিরিবালার এখানেই যেন সাদৃশ্য।

'নষ্টনীড়' গল্পের চারুলতার সংকট তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি আধুনিক। পণপ্রথা এ গল্পের প্রেক্ষিতে নেই, স্বামীর অন্যাসক্তি কিংবা অত্যাচার এ গল্পের আধার তৈরি করেনি; তবু নীড় নষ্ট হয়ে গেল চারুলতার। কি ছিল তার সমস্যার স্বরূপ? অভিজাত অন্তঃপুরে ব্যস্ত স্বামীর অন্যমনস্কতায় পত্নীর সঙ্গে কীভাবে অনপমেয় দূরত্ব তৈরি হতে যাকে আর সব প্রচলিত ছকের বাইরে গিয়ে নারীকে যে সংকটের মুখোমুখি হতে হয় 'নষ্টনীড়' যেন তারই গল্প। পারিবারিক জীবনে অজস্র বিধিনিষেধের অনুশাসনের মধ্যেও যে প্রেম এসেছে চারুর জীবনে, তাকে অঙ্গীকার করার উপায় যেমন তার নেই, অস্বীকার করার সাধ্যও তেমন নেই। অপ্রত্যাশিত সেই সম্পর্কের আলোয় নতুন করে চেনাশোনা শুরু হয় তখন—নিজেকে এবং চারপাশকে। অমলের সাহচর্যেই চারুলতার ব্যক্তিত্বের মুক্তি ঘটেছিল। নিছক ঘরকন্না থেকে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল কবিকল্পনার সৃজনশীতার মধ্যে। চারুলতা নিজে বলেছে—

> আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।

হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যের আদর্শ নয়। সতী স্ত্রী-র অহংকার নয়, বরং স্বামী-ব্যতিরিক্ত প্রণয়কে আপন অন্তরে লালন করেছে উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক গৃহবধূ—বিষয়টি নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ বর্ণনায় নারী হৃদয়ের সেই জটিল ব্যাসকূটকে এখানে উপস্থাপন করেছেন—

> এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালাসজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

অর্থাৎ এইভাবে নারী তার সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করে নিচ্ছে, বিবাহ-অতিরিক্ত একটি সম্পর্ককে প্রচলিত পাপপূণ্যবোধে নস্যাৎ করছে না, বরং বুকের গভীরে গোপনে তাকে লালন করছে। তার প্রণয়ী-হৃদয় আর দাম্পত্য কর্তব্যকে পৃথক রেখে বাঁচতে চাইছে চারুলতা, 'ছদ্মবেশ' কিংবা 'মুখোশ' এইসব শব্দের ব্যবহারে ক্রমশ স্পষ্ট হয় যে, নিতান্ত আভ্যাসিক দাম্পত্য সম্পর্ক নারীকে আর তৃপ্ত করতে পারছে না, সে অন্য একটা আড়াল খুঁজছে—এই গল্পে চারুলতার মধ্যে দিয়ে তার সূচনা। চারু তার উদাসীন স্বামী কিংবা পলায়নপর প্রেমিক কাউকেই অভিযুক্ত করেনি, সে ঘর থেকে

বেরিয়েও আসেনি; কিন্তু যে নারী অন্তরের মধ্যে মৃত প্রেমের মাধুরীকে বহন করে সংসার স্বামী যে তার পক্ষে কত দুঃসহ বন্ধন, চারুর মধ্যে তার প্রমাণ আছে। বস্তুত, কর্মব্যস্ত স্বামীর সময়াভাব, তার হয়তো অনিচ্ছাকৃত উপেক্ষার আঘাতেও চারুর জীবনরসপিপাসু নারী-প্রাণ যে মরে যায়নি, অবসন্নতার ঊর্ধ্বে আপন মুক্তির আকাশ খুঁজে ফিরেছে—এইখানেই 'নষ্টনীড়' গল্পের সামাজিক সমস্যা আর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূত্রপাত। প্রেম আর কর্তব্যের দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত তার নারীসত্তা সত্য চিনেছে। বিবাহিত এই নারী-পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য কোনো সেতু গড়ে তুলতে পারল না পারাপারের জন্য। তাদের পুনর্মিলনের আর সুযোগ নেই—সমাধানহীন এক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন নষ্টনীড়ের দুই বাসিন্দা। বস্তুত, এইখান থেকেই যাত্রা শুরু আত্মস্বরূপের সন্ধানী নারীদের—মৃণাল কিংবা অনিলা, দামিনী থেকে বিমলায় যে নারী বারবার নিজেকে খুঁজে নিতে চেয়েছে, চিনে নিতে চেয়েছে।

'সবুজপত্র' পর্বে লেখা গল্পগুলির একটি সাধারণ লক্ষণ যেন নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন। এখানে নারী উর্বশী নয়, মানসসুন্দরী নয়। শুধুমাত্র জননী বধূ কিংবা কন্যারূপেই দিনযাপনের জন্য ব্যস্ত নয়, বরং নারীরূপেই সে তার জীবনে সার্থকতা অর্জনে উন্মুখ। মন্ত্রপূত বিবাহের আভ্যাসিক সম্পর্ককে এখানে প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে, হিন্দু বিবাহ আইনে বিচ্ছেদপ্রথা আছে কি নেই তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে এখানে বিবাহিতা নারীর স্বামী পরিত্যাগের মতো বিষয়। মৃণাল-আনন্দী-অনিলা পরিচিত পারিবারিক সীমা ত্যাগ করে গেছে, হৈমন্তীর সত্যকথন, তার নীরব প্রতিবাদ, কিংবা কল্যাণীর বিবাহ প্রথাকেই অস্বীকার করে নারীশিক্ষার ব্রতগ্রহণ—এই সব কিছুর মধ্যে মেয়েদের সে ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে, তাতে মনে হয় সমকালের সমাজে ও সাহিত্যে এরা সত্যই 'অপরিচিতা'।

বোষ্টমী-স্ত্রীর পত্র-পয়লা নম্বর, এই তিনটি গল্পে এক জায়গায় সাদৃশ্য আছে যে তিনক্ষেত্রেই নারীচরিত্রগুলি তাদের সংসারসীমা ত্যাগ করে গেছে। স্বামী-পরিত্যাগের যে সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছে তা তাদের নিজস্ব। 'নষ্টনীড়'-এর চারুলতা গৃহত্যাগ করেনি, কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই তিন নারীই গৃহসীমা অতিক্রম করেছে। তিনজনেই প্রিয়জনের মৃত্যুর আয়নায় হঠাৎ দেখেছে তাদের এযাবৎ যাপিত জীবনের ফাঁকি। আনন্দী হারিয়েছে তার ছেলেকে, মৃণালের মেয়ে জন্ম নিয়েই মারা গেছে, আত্মহত্যা করেছে বিন্দু, আর নিঃসন্তান অনিলা হারিয়েছে তার পুত্রপ্রতিম সহোদরকে। প্রচলিত সম্পর্কের অভ্যাসে এরা ফুরিয়ে যেতে চায়নি, সমকালীন সমাজের আরোপিত অনুশাসনকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি এরা নিজেরাই অর্জন করে নিয়েছে।

'বোষ্টমী' গল্পে আনন্দীর স্বামী 'বড়ো সাদা মানুষ', লাভের ওপর কোনো লোভ ছিল না তার। আনন্দীর প্রতিও তার ছিল যেন একটা ভক্তিভাব। তবে তার সমস্ত ভক্তি ও প্রীতি সমর্পিত হয়েছিল তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ ও বাল্যকালের খেলার সঙ্গী গুরুঠাকুরের উদ্দেশে। আনন্দীর বিবাহের সময়, তার স্বামীর খরচেই কাশীতে অধ্যয়নার্থ অবস্থান করছিলেন গুরুঠাকুর। যখন তিনি দেশে ফিরলেন, আনন্দীর বয়স তখন আঠারো। পনেরো বছর বয়সে মাতৃত্বের প্রথম আস্বাদ লাভ করেছিল আনন্দী, কিন্তু অল্প বয়স আর চঞ্চল মন নিয়ে ছেলেকে যত্ন করতে শেখেনি তখনও সে, তার অসতর্কতায় ছেলে প্রাণ হারাল জলে ডুবে। সন্তানহারা আনন্দীর সেই শোকের দিনেই গুরুঠাকুর দেশে ফিরে এলেন। সেই কথা স্মরণ করতে গিয়ে আনন্দীর প্রথম মনে পড়ল তাঁর দেহসৌষ্ঠবের

কথা—'কী সুন্দর রূপ তাঁর'! পুত্রহারা আনন্দীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গুরুকে অনুরোধ করলেন তার স্বামী। গুরুর শাস্ত্রবচন শোক কতটা শমিত করল জানা নেই, তবে আনন্দীর কাছে 'সে-সব কথার যা-কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া।' আনন্দীর গুরুসেবায় তার স্বামীও প্রীত হল। এভাবেই কেটে গেল চার পাঁচ বছর, আরো কয়েকবছর, হয়তো আনন্দীর বাকি জীবনও কেটে যেত, কিন্তু

> গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল।

এক ফাল্গুনদিনে স্নাতা সিক্তবাস আনন্দীকে পথ মধ্যে দেখে গুরুঠাকুর যখন বলে উঠলেন, 'তোমার দেহখানি সুন্দর', তখন মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়ল আনন্দীর পাতিব্রত্য সতীত্বসাধনা আর গুরুভক্তির আচ্ছাদন। একদিকে তার মৃত পুত্রের স্মৃতি, স্বামীর অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং অন্যদিকে গুরুঠাকুরকে কেন্দ্র করে চিত্তে নতুন এক উপলব্ধি—আনন্দীর জীবনের এই তিন পরম সত্য। এবং এই তিন সত্য মিথ্যা সইতে পারবে না বলেই অনিবার্য হয়ে উঠল আনন্দীর গৃহত্যাগ এবং স্বামী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-বাস পর্বে তাঁর কাছে প্রায়শই আসতেন যে সর্বখেপী বৈষ্ণবী, তিনি অবশ্য স্বামীকে ছাড়লেও গুরুকে ছাড়েননি। আনন্দী স্বামী এবং গুরু দুজনকেই ছেড়েছে। সংসারে থেকে আত্মপ্রতারণার মধ্যে নিজেকে ক্রমশ ডুবিয়ে দিতে চায়নি আনন্দী। তবে তার স্বামীর অতিরিক্ত গুরুভক্তিকেও এখানে একভাবে অভিযুক্ত করেছে আনন্দী, এমনও মনে হয়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল তার চিঠিতে সরাসরি পুরুষশাসিত সমাজের অধিকার আর অনাচারের দিকে তার দৃপ্ত তর্জনী নির্দেশ করেছে। শ্বশুরবাড়িতে মৃণাল অন্তত শারীরিকভাবে নিগৃহীত ছিল না, তার সমস্যা অন্যরকম। রূপ ও বুদ্ধির তুল্যমূল্য সম্মিলন মৃণাল চরিত্রের সম্পদ। আরো একটা দিক তার ছিল, তার সৃজনশীল কবিকল্পনা, তার কবিতা লেখার নিজস্ব জগৎ। মৃণাল জানত, 'সেইখানে আমার মুক্তি, সেইখানে আমি আমি।' নারীর এই 'আমিত্ব' সেকালে শুধু মূল্যহীন ছিল না, ছিল উপেক্ষণীয়। সংসারে তাই 'মেজোবউ' পরিচয়ের বাইরে আর কিছু তার ছিল না। মেয়েটি বেঁচে থাকলে হয়তো 'মেজোবউ' থেকে মাতৃপদে উত্তরণে তার ভূমিকার কিছু বদল হোত। তবে তার বড়ো জা-এর বোন বিন্দুকে কেন্দ্র করে মৃণালের মনে জেগেছে সংসারে মেয়েদের অবস্থান বিষয়ে কিছু প্রশ্ন। একজন মেয়ে, বিন্দু, পিতৃমাতৃহীন বলে ভাইদের পক্ষে 'বোঝা', আশ্রয় পায় মৃণালদের বাড়িতে, প্রায় 'মানবেতর' জীবনযাপনে বাধ্য হয় সে। তাকে পাগলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায়, স্বামীসঙ্গে অসম্মত হলে পুলিশ মকদ্দমার ভয় দেখানো যায়। কারণ 'পাগল হোক, ছাগল হোক স্বামী তো বটে'। মৃণালের প্রতিবাদ ছিল সনাতন এইসব বাঁধাবুলির বিরুদ্ধে। সংসারে সে অর্থে কোনো 'অভাব' ছিল না মৃণালের। চিঠিতে সে লিখেওছিল—

> দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি।

তাহলে কি সেই বিপন্নতা যা তার অন্তর্গত রক্তের ভিতরে ক্রীড়াশীল থেকে মৃণালকে পরিবার আয়তনের বাইরে নিয়ে এল? বিন্দুকে দেখে মৃণাল বুঝতে পারল সংসারে মেয়েমানুষের জায়গা কোথায়—বিন্দুর অসহায়তা বিন্দুর আত্মহত্যা মৃণালকে এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দিল যে একটা

প্রতিবাদ করা দরকার। চিরকাল মনে মনে সবকিছু মেনে নিতে নিতে মেয়েদের জীবন ঢাকা পড়ে গেছে অবজ্ঞা আর অবহেলার অন্ধকারে। তাই স্বামী সংসার ত্যাগ করে গেল সে, জানাল—

> আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

বিন্দুর মৃত্যুর দর্পণে মেজোবউ দেখল তার নারীস্বরূপ, মেজোবউ 'মরেছে', জন্ম নিয়েছে মৃণাল। চিঠির শুরুতে চিরাগত সংস্কারের ফলেই লিখেছিল 'শ্রীচরণকমলেষু', আর বক্তব্য জানানোর পর সরাসরি জানিয়েছে 'তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন-মৃণাল'। গল্পটি সেদিন সাড়া জাগিয়েছিল রীতিমতো, মৃণালের গৃহত্যাগ অনেকের পক্ষেই পরিপাক করা সম্ভব হয়নি। প্রতিক্রিয়ায় বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন 'মৃণালের কথা', শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে মৃণাল জীবিকানির্বাহ করবে কীভাবে এমন প্রশ্নও উঠেছিল। সমালোচনা হতেই পারে, কিন্তু মৃণাল যে বহুদিনের অভ্যাস অপমানের বেড়ি ভাঙতে পেরেছিল, সেটাই বড় কথা। এ গল্প যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেইসময়ে চারপাশে অনেক পালাবদল চলছে, নারীর স্বাধিকার অর্জনের পালাও শুরু হয়ে গেছে। নারী নীরবে গৃহকোণে বসে সব অত্যাচার সহ্য করবে—এই 'নিয়ম' ভাঙার সূচনা হল মৃণালের মধ্যে দিয়ে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছিলেন—

> বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস যাঁহারা লিখিবেন, তাঁহারা সাহিত্যের অপরূপ সৃষ্টি 'মৃণাল'কে অবাস্তব বলিয়া অবহেলা করিতে পারিবেন না। (রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৮৩)

'পয়লা নম্বর' গল্পে দেখি গ্রন্থকীট স্বামীর হাতে অনিলার নারীত্ব পুরো মূল্য পায়নি, সে তার এক দুঃখ। আবার পাশের বাড়ির সিতাংশুমৌলি তার প্রতি যুগপৎ 'মুগ্ধ' ও 'লুব্ধ' দৃষ্টি দিয়েছিল, সে-ও অনিলার আরেক দুঃখ। অদ্বৈতচরণের কাছে তার পত্নী কেবল ভোজসভার আয়োজনের 'নিমিত্ত' একটি অভ্যাস, কিন্তু আরো কিছু যে তার জীবনেও ছিল, যার জন্য সে 'অনিলা', একথা স্বামী হয়েও সে জানল অনেকদিন পর। অদ্বৈতচরণের আপাত-নিস্পৃহ অথচ সুবিধাভোগী মানসিকতা, স্নেহের ভাই সরোজের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া ও বিমাতার গঞ্জনায় আত্মখণ্ডন; অন্যদিকে গলির পয়লা নম্বর বাড়ির জমিদার সিতাংশুমৌলির ক্রমাগত বন্দনায় অনিলার অন্তর্গত জাগরণ তার এযাবৎ যাপনকে অন্য মাত্রা দিল। স্বামীর উদাসীনতার বিপরীতে প্রতিবেশী পুরুষের স্তুতিপূর্ণ অভিবাদন অনিলাকে ভিতরে ভিতরে হয়তো কোথাও অস্থির করে তুলেছিল, আর সরোজের মৃত্যুর আয়নায় স্বামী ও প্রেমিকের প্রতিচ্ছবি যেন অন্যভাবে ধরা দিল তার চোখে। দ্বৈতদলের পূর্ণিমার ভোজের আয়োজন সম্পর্কে অনিলার প্রস্তুতির খোঁজ নিতে গিয়েই অদ্বৈতচরণ জানতে পারে গতদিন বিকেলে সরোজের আত্মহত্যার কথা। অর্থাৎ শ্যালকের মৃত্যুর খবর সে জেনেছে একদিন পরে এবং এ-ও জেনেছে যে,

> সিতাংশুমৌলি এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিশকে ঠাণ্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

প্রিয়-মৃত্যুর এই পটভূমিতে দাঁড়িয়েও পূর্ণিমার ভোজের উদ্যোগপর্ব থেকে নিরস্ত করা যায়নি অনিলাকে। প্রস্থানের সিদ্ধান্ত সে ইতিমধ্যে নিয়েই ছিল। তার শান্ত অথচ দৃঢ় প্রত্যুত্তরের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ অনুধাবনে অদ্বৈতচরণের বহু বিলম্ব হয়ে গেল। অনিলা জানিয়ে দিল—

> আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না। ... তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।

পুত্রপ্রতিম সহোদরের মৃত্যুশোকভার নীরবে বুকের গভীরে বহন করে অনিলা কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাল অথবা বিদ্রূপ করল সামাজিক কর্তব্যের দায়কে। আর একই চিঠি স্বামী এবং প্রণয়ীর উদ্দেশে লিখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—'আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।'

আনন্দী এবং মৃণাল যেভাবে সংসারসীমা পেরিয়ে এসে ধর্মের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, অনিলার ক্ষেত্রে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। অনিলার বিদ্রোহ শুধু স্বামীর বিরুদ্ধে নয়, প্রেমিকের বিরুদ্ধেও। পত্নী হিসেবে নয়, জননী হিসেবে নয়, প্রণয়িনী হিসেবে নয়—কোথাও যেন অনিলার নারীসত্তা পূর্ণ মর্যাদা পেল না। প্রচণ্ড অভিমান নিয়েই সংসার ত্যাগ করে গেলো সে। যদিও শেষপর্যন্ত 'তার শাঁখা এবং হাতের লোহা' অর্থাৎ স্ত্রী-র সংস্কারটুকু অনিলা ত্যাগ করতে পারেনি, তবু যেভাবে সে পতি-সংস্কারকে অভিযুক্ত করেছে, তাতে তার সততা ও সাহসের পরিচয় আছে। এই পর্বে নারী যে তার আপন ভাগ্য চিনে নিতে চাইছে, শুধু 'মেয়েমানুষ' পরিচয়ে সংসারে পুতুল-প্রতিমা হয়ে থাকতে চাইছে না, এইসব গল্পে তারই ঘোষণা, বিশেষত অদ্বৈতচরণের 'ইবসেনের মনস্তত্ত্ব' আলোচনার বিপ্রতীপে অনিলার গৃহত্যাগ তথা তার প্রতিবাদ অন্য মাত্রা পেয়ে যায়।

আর পণপ্রথার যে লজ্জাকর দিক 'অপরিচিতা' গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কল্যাণী বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আত্মনিয়োগ করেছে নারীশিক্ষার কর্মযজ্ঞে—এইভাবে বিবাহ প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করে কালের কাছে কল্যাণী যেন এক 'বার্তা' পৌঁছে দিতে চেয়েছে। লক্ষণীয়, এই পর্বের গল্পে পুরুষচরিত্রগুলি সে অর্থে সক্রিয় নয়, কখনও নিছক দর্শক হিসেবে, কখনও কিছুটা শোচনার মাধ্যমে তারা তাদের 'কর্তব্য' সম্পন্ন করেছে। তুলনায় অনেকবেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মেয়েদের ভয়হীন অগ্রণী ভূমিকা। নিজেদের অস্তিত্বকে যথার্থ বুঝে নেবার জন্য সব সংস্কার বর্জন করে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে তারা।

এইভাবে 'হিতবাদী' পর্ব থেকে 'সবুজপত্র' পর্বের বেশ কিছু গল্পের মধ্যে নারীসত্তার একটা ক্রমজাগরণ লক্ষ করা যায়। পণপ্রথার বলি নিরুপমা, হৈমন্তী কিংবা কল্যাণী, কিন্তু তাদের ভাবনা আলাদা, পরিণতি আলাদা। জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ গল্পের চরিত্রগুলিকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন, যদিও তাদের বিদ্রোহকে সর্বস্তরেই মান্যতা দিয়েছেন। উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার মধ্যে একটা রক্ষণশীলতা ছিল, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ এদেশি মেয়েদের দেশি পুতুল আর ইউরোপের মেয়েদের বিলিতি পুতুল বলে মনে করেছিলেন। অর্থাৎ তাদের স্বাধীন সত্তা বিকাশলাভ করেনি, এদেশ বিদেশ কোথাও না। একসময় তিনি নিজেও মনে করতেন—

> পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে।
>
> (রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে)

অনেক পরে, সত্তরোর্ধ রবীন্দ্রনাথ 'নারী' ('কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত, প্রথম প্রকাশ—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> আমার মনে হয়, পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে। অতিদীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল

> পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়েছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; ... আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে। গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়—যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে মানবসমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্য কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।

বোঝা যায়, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে অনেকদূর হেঁটে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। নারী যে আর পুরুষের হাতে নিছক পুতুল হতে চাইছে না, তারই আগমনী শোনা গেল আনন্দী-মৃণাল-অনিলায়। কবিতায় তারাই যেন কথা বলে উঠল—

> আমি নারী, আমি মহীয়সী
> আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায়
> নিদ্রাবিহীন শশী।
> আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যাতারা ওঠা,
> মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা। ('মুক্তি', পলাতকা)

কেবল মাতা-কন্যা-বধূরূপে নয়, নারীরূপেও যে জীবনে সার্থকতা আছে, একথাই সেদিন যেন প্রধান হয়ে উঠেছিল। তাই নিরুপমাদের খনন করা পথে ক্রমশ দেখা দিল অনিলা মৃণাল আনন্দী কিংবা কল্যাণী। আরো পরে পেয়ে যাই 'বদনাম' গল্পের সদুকে, যার ভাষা আরো শাণিত আরো তীব্র। নিজের হৃদয়ানুভূতিকেই সে সবচেয়ে বেশি মান্য করেছে, দেশভক্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে পতিভক্তির আজন্মলালিত সংস্কার। সৌদামিনীর উচ্চারণে ভেঙে গেছে পুরুষের হাতে গড়া নারীর আদর্শায়িত ছাঁচে ফেলা মূর্তি। সে বলেছে—

> পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা—এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা, কুকুরের গলায় শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি। আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি বল না কেন—সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জানো, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না।...
>
> সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আস্তাকুঁড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে।...

বোঝা যায়, মৃণালের বিদ্রোহ থেকেও অনেকদূর হেঁটে এসেছে বিপ্লবী এই সৌদামিনী। আর তার থেকেও আরো অন্যরকম হল 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী। মনে হয়, সোহিনী চরিত্রায়ণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ববর্তী ধারণা থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। সোহিনীকে আদর্শ প্রেয়সী বলা যাবে না।

শুধু প্রেমের আকর্ষণে সে নন্দকিশোরকে অবলম্বন করেনি, বরং নন্দকিশোরের প্রবল ব্যক্তিত্ব তাকে আকৃষ্ট করেছিল। তার নিজের ব্যক্তিত্বের স্ফূরণের জন্য ঐরকম এক প্রবল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য প্রয়োজন ছিল। সোহিনী আদর্শ জননীও নয়। তার একমাত্র সন্তান নীলিমা, তার পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত এবং নীলিমার প্রতি সোহিনীর আচরণও ঠিক মাতৃজনোচিত নয়। নীলিমাকেও সে ব্যবহার করেছে স্বীয় ব্যক্তিত্বের অস্ত্ররূপে অর্থাৎ প্রেয়সী ও জননীর পদটি বাদ দিলে বাকি থাকে তার চরিত্র। নন্দকিশোর সেই চরিত্রটিকেই দেখতে পেলেন, দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্‌ঝক্‌ করছে ক্যারেকটারের তেজ, বোঝা গেল নিজের দাম ও নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।

এই চরিত্রই—তার ব্যক্তিত্ব, তার নারীত্ব এখানেই সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথ বিশীর মনে হয়েছে—

> সোহিনী প্রচলিত অর্থে সতী-রমণী নয়, প্রেয়সী ও জননী রূপেও তাহার দৃষ্টান্ত স্পৃহনীয় নয় তবু সে খাঁটি ও অকৃত্রিম। শয়তান যে অর্থে খাঁটি সেই অর্থে সে অকৃত্রিম। ... সোহিনী সমস্ত প্রকার নারীধর্ম বিসর্জন দিয়া কেবল কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি রক্ষা করিয়াছে। ল্যাবরেটরি রক্ষার দ্বারাতেই সে তাহার অভিনব সতীধর্ম পালন করিয়াছে। প্রচলিত অর্থে ইহা কায়মনোবাক্যগত সতীত্ব নয়, ইহাকে বলিতে পারি নারীব্যক্তিত্বের সতীত্ব বা স্বধর্ম পালন। (রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৭, পৃ. ৭৮-৭৯)

ব্যক্তিত্বের এই প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নারীচরিত্রে নেই, এ একেবারে অভিনব, স্বয়ং গল্পকারেরও মনে হয়েছিল—

> সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায় কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজম্‌, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজমই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।

এইভাবে বহমান সময়ের স্রোতে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে যাত্রা করে নিরুপমারা, পারিপার্শ্বিকের আবর্তে বন্ধুর সে যাত্রাপথে আলোড়িত হয় তাদের চৈতন্য, তারা খুঁজতে চায় জীবনের মানে, বেঁচে থাকার অর্থ। জায়া জননী প্রণয়িনীর কোঠা থেকে বেরিয়ে নারী হিসেবে নিজের মূল্য বুঝতে চেয়ে বিক্ষত হয় তারা, তবু চলা থামে না। অগ্রবর্তিনীর রক্তাক্ত পদরেখাচিহ্ন অনুসরণ করে পরবর্তী প্রজন্ম। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরিসরে দেখা মেলে আত্মস্বরূপের সন্ধানী এই অভিসারিকাদের, তারা অর্ধেক মানবী নয়, কল্পলোকচারী নয়; উনিশ-বিশ শতকের সমাজপীঠে তাদের অবস্থান। 'দেনাপাওনা' থেকে 'ল্যাবরেটরি', নিরুপমা থেকে সোহিনীতে পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথের সময় লেগেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। এই অর্ধশতাব্দী জুড়ে বিবর্তিত নারীসত্তার ইতিহাসও তো রবীন্দ্রনাথের গল্প। সমাজের সঙ্গে পুরুষের সঙ্গে সংঘাতে-সমন্বয়ে সহযোগিতায় বিপ্রতীপতায় প্রেমে-অপ্রেমে অশ্রু-হাসিতে কখনও উজ্জ্বল কখনও বেদনার্ত হতে হতে নারী ক্রমশ তার জীবনের সত্য চিনেছে। রবীন্দ্রনাথ তাদের সাহস যুগিয়েছেন। ভাষা দিয়েছেন। বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের ইহিতাস তাই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে লেখা হতে পারে না।

একবিংশ শতকে রবীন্দ্রভাবনা : পরিবেশ ও স্থাপত্যের প্রেক্ষিতে

সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহ্য বিস্মৃত আমাদের কাছে অপ্রমেয় সৃষ্টির স্থপতি রবীন্দ্রনাথ কি কেবলই হারানো দিনের এক সোনালি অধ্যায়?—এ প্রশ্নের সদর্থক সমর্থিত উত্তর দিয়ে গেছেন গুণীজনেরা। তাঁদেরই ভাবনায় ভর করে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ-বান্ধব স্থাপত্য-ভাবনা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। স্থপতি অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে আমায় কৌতূহলী করেছেন। প্রকৃতির সাযুজ্যে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার এক আদর্শ স্থাপত্য-পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন। আজকের দূষণ-আক্রান্ত জীবনযাপনে ঐ পরিবেশবান্ধব স্থাপত্যচর্চার গুরুত্ব অসীম। দেবেন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথের সময়কাল পর্যন্ত কীভাবে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে এই পরিবেশ নির্মিত হয়েছিল, তার উল্লেখের পাশাপাশি আমরা দেখে নেব তাঁর সৃজিত সাহিত্যেও কেমন করে চরিত্ররা পরিবেশমুখী হয়েছে বা হয়েছে স্থাপত্য সন্ধানী।

মনে পড়ে তো 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনীর কথা—নূরনগরের পুরনো বাড়িতে যার চারপাশে ছিল এক প্রাণময় পরিমণ্ডল—গ্রাম-দিগন্তে কোথাও ঘন বন, কোথাও বালুচর, কোনোদিকে নদী তো কোনো দিকে বিস্তৃত মাঠে বনঝাউ-এর ঝোপ—যা নানা রেখায় রঙে আকাশকেও করে তুলেছিল 'কুমুদিনীর আপন আকাশ'। সূর্যের আলোর মায়াময় উপস্থিতি সে দেখতো দিঘিতে, শস্যখেতে, বেতঝাড়ে, বাঁশগাছে আর মসৃণ কাঁঠালপাতায়। কিন্তু কলকাতায় মধুসূদনের বাড়ির ছাদে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তার চিরদিনের সেই আকাশ আলো সবই যেন হারিয়ে গিয়েছিল। আসলে মধুপ্রাসাদ নামক দু'মহলা সেই বাড়িটা ছিল দু'জাতের; বহির্মহল অতি চাকচিক্যময়, আর অন্তঃপুরের একতলার ঘরগুলি মলিনতার স্মৃতিচিহ্নময় আবার তেতলার মধু-কুমুর শোবার ঘরটি দামি আসবাবে ঠাসা। লেখকের ভাষায় 'এই ঘরটি ময়লা কাঁথা-গায়ে দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরি জহরাত দেওয়া পাগড়ি।'

অথচ 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তিনি আপন পছন্দের নীড় রচনার যে সূত্র দিয়েছিলেন, তাতে যথাসম্ভব কম আসবাব রেখে বহির্প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কথাই তো ছিল। প্রকৃতি ও পরিবেশকে জীবনযাত্রায় সামিল করতে তিনি গৃহস্থাপত্যে সরলতা, উপযোগিতা ও সৌন্দর্যের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর শৈশবের বন্দিদশা থেকে প্রথম মুক্তির স্বাদ পাওয়া পেনেটির ছাতুবাবুর বাগানবাড়ি বাসের অভিজ্ঞতার কথা তো 'জীবনস্মৃতি'-র পাঠক মাত্রেরই স্মৃতিতে অমলিন। প্রতিদিন সকাল বেলায় তাঁর মনে হত দিনটা যেন সোনালি পাড় দেওয়া নতুন চিঠির মতো। নদী তাঁর বরাবরের প্রিয়। মুক্তির দীক্ষা পেয়েছিলেন তিনি নদীর জলধারার কাছেই। যে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের যুগে পদ্মাতীরবর্তী মানুষকে দেখেছিলেন জৈবপরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে, তিনিই 'মুক্তধারা'-য় প্রযুক্তি দিয়ে প্রকৃতির ঝর্ণাধারাকে বাঁধ দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। শুধু বেগবান বড় নদীই নয়,

কোপাই-এর মতো শ্লথ ছোটো নদীরও প্রভাব তাঁর জীবনে অফুরান। তাই লোকজীবন সম্পৃক্ত 'পুনশ্চ'-এ লোকনদী কোপাই 'কবির ছন্দকে আপন সাথি করে' নিল।

তাঁর উপন্যাসেও নদী নগণ্য নয়। মনে পড়েছে 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের 'বন্যা' হয়ে ওঠা, অমিতের আদরের আহ্বানে। শিলং পাহাড়ে অমিত তার জীবনের ঝর্ণাকেই তো খুঁজে পেয়েছিল—

'মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়ে
নিজেরে চিনি।'

আর মনে পড়ে প্রেমিক যুগলের সেই কাল্পনিক ঘরবাড়ির কথা, সেই 'মানসী' আর 'দীপক'-এর কথা, যার মাঝে নদীর খাঁড়ি। নিখিলেশ বিমলা-ও প্রতি ভাদ্র পূর্ণিমায় শামলদহর বিলে বোটে করে বেড়াতো—ভুলিনি তো আমরা। সাত বছর প্রতি ভাদ্র মাসের চাঁদ তাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়েছিল। গোরা-ও তো বাগবাজারের গঙ্গার ধারে এক নির্জন রাতে নিবিড় প্রকৃতির কাছে কেমন করে যেন ধরা পড়ে গিয়েছিল। সুচরিতার চিন্তায় তার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হয়ে উঠেছিল। এভাবেই প্রকৃতি পরিবেশ যেমন তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে, তেমনি বাস্তুর সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংযোগের কথাটিও এসেছে তাঁর 'দুই বোন'-এ। এঞ্জিনিয়ার শশাঙ্কের ভবানীপুরের বিশালাকৃতির বিলাসবহুল বাড়িটি কিন্তু শর্মিলার স্নেহের উদ্যমেই ফুলে ফুলে রঙীন হয়ে উঠেছিল। এমন রঙীন মল্লিকায় সাজানো বাগানেই তো আসতেন লিখিলেশ নিজের বিস্রস্ত মনকে আরো একবার নিজের মতো করে গুছিয়ে নিতে। আবার 'গোরা'-র ব্রাহ্ম পরেশবাবুর ছাদ-বাগানের কথাও তো মনে পড়ে। আর কিছুতেই কি ভোলা যায় আদিত্য নীরজার 'মালঞ্চ'কে? তাদের ভালোবাসার নানা ধারা উপধারা শেষে এসে মিশেছিল ঐ বাহারী বাগানে।

আসলে জাপান যাত্রী রবীন্দ্রনাথ দেখে এসেছিলেন ওদের স্থাপত্যের বাইরে ও ভিতরে ফুলের রঙবাহারী সজ্জাকে। নীচে গাছের শ্যামলিমা, ফুলের বর্ণালি, নদীর কলধ্বনি আর উপরে আকাশের উধাও নীলিমা—আমাদের দৈনন্দিনতার গ্লানিকে অবশ্যই দূর করে। জলযুক্ত বাস্তুর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা বাস্তুর এই রাবীন্দ্রিক ভাবনাই হয়তো প্রণোদিত করেছে আজকের বড় প্রোমোটারদের। বিজ্ঞাপনগুলো তো তেমনটাই ভাবায়। আবার শহরের সৌন্দর্যায়ন, গঙ্গার ধারের বা পথ বাগানের শ্যামল বাহার যেন মনে পড়ায় শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর নিজস্ব পরিবেশ ও স্থাপত্য ভাবনাকে। 'কবির নীড়' গাছবাড়িটিও (১৯২৩) তাঁর প্রকৃতি ভিত্তিক গৃহস্থাপত্যের উজ্জ্বল উদাহরণ; আজ এমন ধরনের গাছবাড়ির নির্মাণ eco-tourism-কে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। জাপানযাত্রী রবীন্দ্রনাথ দূষণহীন সবুজ স্থাপত্যে, স্থানের পরিমিতিবোধে ক্রমে আগ্রহী হয়েছিলেন। জাপান-ভারত শিল্প সমন্বয়ের শান্তিনিকেতনের পরিবেশ স্থাপত্যটি একদিনে তো গড়ে ওঠে নি। মনে পড়ে দ্বারকানাথ নির্মিত 'পদ্মা' হাউসবোট-বাস পরে তাঁকে প্রাণিত করেছিল জাপানি কারিগর দিয়ে আরো হাউসবোট নির্মাণে (চিত্রা, লালডিঙি ইত্যাদি)। রবীন্দ্রনাথের জাপান সংসর্গ সুদীর্ঘকালীন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র শিতোকুহরিকে দিয়ে জাপানি তাঁতযন্ত্র তৈরি, বা কুসুমাতোকে দিয়ে কাঠের নৌকা তৈরি, বা হাসেগাওয়াকে দিয়ে আসবাব তৈরি প্রভৃতি প্রমাণ করে তিনি জাপানিদের কর্মনৈপুণ্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। এভাবেই ভারত-জাপানের শিল্প সংস্কৃতি আদানপ্রদান হয়েছিল।

তাঁর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের 'ল্যাবরেটরি'তে প্রয়োগশিল্প, চিত্রশিল্প, স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতির মিলন ঘটেছিল। উত্তরায়ণ উদ্যান স্থাপত্য তাই এক সমন্বয়ী শিল্পভাবনারই ফসল। চিত্রভানু গুহাঘরের ল্যাণ্ডস্কেপিং স্থাপত্যের সবুজশিল্প, লতা-গুল্ম-গাছ-এর শ্যামলিমা ও আকাশের নীলিমার মাঝে মিতালি স্থাপন—শান্তিনিকেতন-এর আদি থেকে উত্তর পর্বে এক নতুন পরিবেশ পরিসরের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পসমন্বয়ের এই ভাবনার ভিতরে হয়তো কোথাও ছিল দ্বারকানাথের অবদান; মনে পড়ে দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলার উদ্যান-বিন্যাসের কথাও। অন্যদিকে পাঁচবার জাপান ভ্রমণে দেখেছিলেন আকারায়িত প্রয়োগের শিল্পরূপ। তাই তলে তলে তৈরি হয়েছিল উত্তর আধুনিক এই আশ্রমিক অবয়ব, যেখানে গুরুত্ব পেয়েছিল ওদের পরিবেশ-সখ্য বসবাস নির্মাণ ধরনের 'space design'। আজো আমরা আশ্রমভবনের ছোট ধাপে, কুলুঙ্গিতে, জানলার ফ্রেমে তল বিভাজনে, দাওয়াতে যার চিহ্ন খুঁজে পাই। এই দূষণ ক্লান্ত জনপদে আমরা ফিরিয়ে আনতেই পারি শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন ও জোড়াসাঁকোয় ছড়িয়ে থাকা যৌথ শিল্প অভিযানের নিদর্শনগুলিকে। প্রয়োজন শুধু এই পরিবর্তিত সময়ের উপযুক্ত করে সেগুলির নববিন্যাস। এই creative cross-over-এর যুগে, তথ্য-প্রযুক্তি-সংযোগ-এর সুবৃহৎ আন্তর্জালে জড়িয়ে থাকা এই প্রজন্ম তো সেদিনের সৌহার্দ্য সংস্কৃতিকে আরো সুদৃঢ় করতেই পারে। ঠাকুরবাড়ির কর্মকাণ্ডে যে creative culture-এর correlation ছিল (মনে পড়ে শিউলি ফুলের সুগন্ধে মেলানো 'রাসলীলা' ছবিটির কথা), তাকেই আজ আরো প্রসারিত করতে হবে—এভাবেই তো আসবে বন্ধুশিল্পে নতুন আলো। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর তৈরি ল্যাবরেটরি (শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন) রেখে যাওয়ার কথাটি বলেছিলেন প্রতিমাদেবীকে, বা লিখেছিলেন ''তিনসঙ্গী''-র 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সেই অসাধারণ প্লট ও চরিত্র, তেমনি তো আমরাও আত্মনির্মাণপর্বে ফিরে ফিরে যাই রবীন্দ্রভুবনে। আজকের পরিবেশ ভাবনার আদি রূপ আছে তো 'ছিন্নপত্রাবলী'তে, এই পৃথিবীকে মা বলে ভাববার কথা। আমরা আজ পরিবেশ দিবস পালন করি, অথচ তিনি কত আগে তাঁর কথায় ও কাজে ভূমি ও ভূমার চেতনাটি মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা ও গান সেই সচেতনতার বাণীতেই তো সমৃদ্ধ—

''আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে...''।

এভাবেই কি তিনি সবুজ স্থাপত্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন? পরবর্তী সময়ে তাঁর 'পুনশ্চ' বাড়ির পরিবেশবান্ধব স্থাপত্যের প্ল্যান (প্রতিমাদেবীকে পত্রে লেখা) অনেকটাই যেন স্থপতির স্থাপত্য ভাবনার নোটবুক। রবীন্দ্রনাথ কবির চিঠি ও কবিতা মিলিয়ে যে স্টুডিও-বাড়ি (চিত্রভানু-গুহাঘর) নির্মাণ করেছিলেন, তা আলোছায়ার স্থাপত্যে, প্রাকৃতিক মানবিক পরিবেশ নির্মাণের সমন্বয়ী ভাবনায় আজো অনন্য। তাঁর এই স্থাপত্য ভাবনার পাশাপাশি স্মরণীয় তাঁর পরিবেশ ভাবনামূলক সাহিত্যের কথা—ছোট গল্প 'বলাই'। 'কুটিরবাসী' কবিতায় তালধ্বজ কুটির নির্মাণের লোকস্থাপত্যকে যেন অভিনন্দন জানিয়েছেন কবি। আর এসবের সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে তাঁর আকারায়িত দর্শন—তাঁর সৃষ্ট ল্যাবরেটরির সহজ চলন ও সুন্দর অধিষ্ঠান।

তাঁর ল্যাবরেটরি (শান্তিনিকেতন) থেকে ভূগোলের ভেদরেখা মুছে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন 'পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান'। আর তাঁরই ১৩টি গানের ইংরাজি অনুবাদ ব্যবহার করে আর্থার গেডেস শ্রীনিকেতন অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতি নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি-পৃথিবীর আঙিনায় নিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনকে। প্রকৃতিকে নাটকের পাত্র-পাত্রী করে লেখা তাঁর 'বসন্ত' ঋতুনাট্য বা 'মুক্তধারা' আসলে তো তাঁর পরিবেশ ভাবনারই সারাৎসার।

যে ভাবনার সূচনা সেই ছিন্নপত্রের পদ্মাতীরবর্তী বসবাসপর্বে। গোরাই নদীর গতিপথ আটকে রেলপথ তৈরির প্রতিবাদ করেছিলেন কবি। তাঁর এ বিষয়ক কালীগঙ্গা নথি বা লাহনী গ্রাম প্রকল্প তাই বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। প্রকৃতির পরিসরে মানুষ ও প্রকৃতির সখ্যে এমনতরো পরিকল্পনা আজো দেশবাসীকে নানাভাবে সম্পন্ন করতে পারে। শুধু ভাবনা নয়, ভাবনার রূপায়ণগুলি আজো আমাদের সমৃদ্ধ করে। তাঁর সৃষ্ট ল্যাবরেটরিতে স্থাপত্যশিল্পের ভাস্কর্যশিল্পের অসংখ্য উদাহরণ ছড়ানো। কালোমাটির বাসা, শ্যামলীবাড়ি, চৈতী, বেদী, সাঁওতাল দম্পতি ও পরিবারের ভাস্কর্য—এভাবেই বিদ্যায়তনের আঙিনায় তিনিই আনেন লোক-শিল্প-স্থাপত্যকে। উদয়নে এনেছেন স্থাপত্যে সমন্বয় ভাবনা, তাই বৌদ্ধ-মুঘল-রাজপুতানা-হিন্দু-জাপানি সব ঘরানার বিচিত্র ডিজাইন এখানে ব্যবহৃত। তাঁর পরীক্ষাগারে শিল্প-সংস্কৃতি-প্রযুক্তি-সাহিত্য সব মিলেমিশে গেছে। তাঁর আকার দেওয়া শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন-ই বিশ্বের সবুজ স্থাপত্যের আদিতম প্রয়াস। শান্তিনিকেতনে ছড়িয়ে থাকা স্থাপত্য শিলীভূত সুরের মতো, যা থেকে একুশ শতকীয় ঐকতান বাজানো যায়। তিনি যেভাবে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন তাতে পরিবেশ ভাবনায় ভৌগোলিক সীমা গেছে ভেঙে, তাঁরই হাত ধরে আমরা পৌঁছে যাই এক ভূ-কাব্যিক (Geo-poetical) ভুবনে; ভুবনডাঙার মাঠে বিশ্বভুবন চর্চার যাবতীয় আঙ্গিক যেন একত্রিত। একালের পরিভাষায় বলতে গেলে তাঁকে বলা যেতেই পারে Social Environmental Entrepreneur; যিনি বিশ্ব প্রকৃতি, বিশ্ববিদ্যাচর্চা, প্রয়োগশিল্প ও বিশ্বভরা প্রাণকে এক দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে মিলিয়েছেন। তাই তাঁরই ভাবনার অনুষঙ্গে চোখ মেলে চোখের বাহিরকে দেখার দিন যে আজ সমাগত; এভাবে বিশ্বভরা প্রাণের সন্ধান পাব তো আমরা।

দলিত-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

সনৎকুমার নস্কর

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দির-দ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।...
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

'পত্রপুট'-এর এই ১৫ সংখ্যাত কবিতাটি লিখছেন যখন (১৮ বৈশাখ ১৩৪৩) রবীন্দ্রনাথ, পঁচাত্তর পূর্ণ হতে তখন মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। এ কবিতায় কবি তাঁর সমগ্র জীবনের ওপর দিয়ে একবার দ্রুত বিহঙ্গ-পরিক্রমা করে নিয়েছেন, সবশেষে এসে পৌঁছেছেন তাঁর 'মনের মানুষ'-এর দরজায়। কবি যেন বাঁধন-হারা বাউল, যে উদাসীনের মতো জীবন-পথের মলিন ধুলো থেকে খুঁটে নিচ্ছে দু'একটি অমৃত সঞ্চয়, তার শেষ পারানির কড়ি হিসেবে। দীর্ঘ পথযাত্রার শেষে এবার যে তাঁর বিরতির সময় এসেছে। ক্ষণিকের অবসরে কবির বাউল মন ফিরে দেখছে অতিক্রান্ত দূর বিসর্পিল পথরেখাকে। কী দেখলেন তিনি? অবারিত আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষকে, মানব-বিশ্বে চিরকালের মানুষকে। ব্রাত্য, পংক্তিহীন, জাতিহারা কবি সেই মহান পুরুষের কাছে প্রার্থনা জানালেন—

হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।

রবীন্দ্র-জীবনের অন্যতম মর্মবাণী এই। চিরকাল যিনি সংগ্রাম করে গেছেন যাবতীয় ইতরতা, নীচতা, বর্বরতা, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। মুক্তমনা রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ তাঁর প্রতিভার মতোই প্রাতিস্বিক—যা কোনোদিনই প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাল্যে উপনয়নের পর গায়ত্রীমন্ত্রের উচ্চারণে তিনি যে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত অসীম পুরুষের অনুভব-প্রয়াসে হৃদয়কে প্রসারিত করে দিতেন, সেই জ্যোতির্ময় সত্তা ক্রমশ তাঁর নিভৃত সাধনার ধারা বেয়ে জীবনদেবতা, অন্তর্যামী ইত্যাদি অভিধার মধ্য থেকে নেমে এসেছিলেন এই 'মনের মানুষ'-এ। রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক নন, আস্তিক। কিন্তু তাঁর আস্তিক্যবোধ শাস্ত্র-শাসনের সীমাকে লঙ্ঘন করে, মন্দির-মসজিদ-গির্জার চার দেওয়ালকে ভেঙে উদার মানবতার দিকে প্রসারিত। এজন্য দীর্ঘদিনের সংস্কার-

পোষিত ধর্মাচারের সঙ্গে তাঁর বারেবারেই বিরোধ বেঁধেছে, এ নিয়ে কোথাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন, স্বচ্ছ সহজ যুক্তি দিয়ে অবোধকে বোঝাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, আবার কোথাও নিজের অকপট আচরণে দেখিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত ধর্ম বলতে কী বোঝায়। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে একাধিকবার তিনি নিয়ে এসেছেন ধর্মাচার-পোষিত দেবতার সঙ্গে মানুষের অন্তরের গহনে লুকিয়ে থাকা দেবতার ভিন্নতার প্রসঙ্গ। 'খেলার দেবতা'র বিপরীতে তাঁর কাছে সবসময় বড়ো হয়ে উঠেছেন 'মানুষের দেবতা।' আর একটা সময় তিনি উপলব্ধি করবেন, সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠা মানুষ আর দেবতায় কোনো ভিন্নতা নেই। 'নর-দেবতা'ই যে তাঁর নমস্য একথা বলতে বাধা থাকবে না 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানে। একইভাবে তাঁর বিনম্র প্রণতি বারে বারে নিবেদিত হবে 'নর-নারায়ণ'-এর পায়ে। মানুষের যেখানে দুঃখ দুর্দশা ক্রন্দন আর্তি—সেখানেই এসে দাঁড়াবেন কবি। আমরা দেখতে থাকব : জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ মানুষের ওপর নির্বিচার গুলি চালনার প্রতিবাদে অবহেলায় ঘৃণায় ত্যাগ করবেন 'নাইট' উপাধি, হিজলী জেলে বন্দিদের ওপর অমানুষিক নিগ্রহ ও হত্যার বিরুদ্ধে অত্যাচারী ব্রিটিশের সমালোচনায় ফেটে পড়বেন তিনি, নির্দোষ আফ্রিকার ওপর শ্বেতাঙ্গদের বর্বর আক্রমণে তাঁর লেখনী তীব্র চিৎকার করতে থাকবে, ফ্যাসিস্টদের সাম্রাজ্যবাদী লোভের দংষ্ট্রায় ছিন্নভিন্ন পশ্চিম গোলার্ধের রক্তাক্ত মানুষকে দেখে তিনি নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবেন।

আসলে এসব ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় মানবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারি, মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সাধক, মুক্তচিন্তার দিশারী রবীন্দ্রনাথকে। তাই তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধে পাওয়া 'মনের মানুষ' কেবল অন্তরের মণিকোঠাতেই নিভৃতে বিরাজ করেননি, তিনি ধুলো হয়ে মিশেছেন ধুলোতে, নিজেকে সামিল করেছেন কঠিন কঠোর কর্মের জগতে; তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় 'ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে', তিনি থাকেন 'সবার পিছে সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে'। এইজন্য, নাগরিক সংস্কৃতির ঝলমলে প্রাঙ্গণে যাঁদের নিত্য আনাগোনা, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে কেবল কুক্ষিগত করে রাখেন আভিজাত্যের ঘেরাটোপ দিয়ে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে একই পংক্তিতে দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথ বারেবারেই সেইসব সংস্কৃতি-অভিমানীদের প্রত্যাখ্যান করেন, জানিয়ে দেন তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ঘৃণিত অত্যাচারিত দলিতের পাশে দাঁড়ানো মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে ফেরাই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটির লক্ষ্য।

বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষ নানা ধর্ম ও বর্ণের দেশ। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক আদি পীঠস্থান। ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বলছে, ভারত ভূখণ্ডে আর্য-সংস্কৃতি প্রসারের আগে প্রাগার্যদের বাসভূমি ছিল এখানে। আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা আসে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ। তারা এদেশের মূলনিবাসী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষকে সংগ্রামে পরাজিত করে ভূখণ্ডের দখল নেয় এবং নব্য সংস্কৃতির পত্তন ঘটায়। যাগযজ্ঞপটু আর্যদের সমাজব্যবস্থায় চার বর্ণের উদ্ভব—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মূলত বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা, দেশরক্ষণ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও অন্যান্য দেহশ্রমনির্ভর কর্মসম্পাদন—যথাক্রমে উক্ত চার শ্রেণির কাজ ছিল। আদিতে বর্ণবিভাগ ছিল গুণ ও কর্মভিত্তিক, কিন্তু পরে তা হয়ে দাঁড়ায় জন্ম তথা বংশকেন্দ্রিক। সম্ভবত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা অর্বাচীন কালে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তটি কৌশলে সংযোজন করেছিল, যাতে বর্ণগুলির উদ্ভবের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : ব্রহ্মপুরুষের মুখ, হাত উরু ও পা থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ নির্গত হয়েছে এবং উৎপত্তিস্থল অনুযায়ী তাদের কর্মও তদনুযায়ী বিভক্ত হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, পৃথিবীর অন্যত্রও সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে ওই ধরনের চারটি শ্রেণির ভূমিকা লক্ষ করা গেছে। এরা যাজক,

শাসক, বণিক ও শ্রমিক শ্রেণি রূপে পরিচিত, তবে তা কখনোই ভারতীয় হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রমধর্মের মতো ব্যাপার নয়। লক্ষণীয় যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতবর্ষে বর্ণভেদ হয়ে ওঠে উচ্চবর্ণ কর্তৃক ক্রমনিম্নবর্ণগুলি শোষণের যাঁতাকল। আর এই বর্ণবাদী শোষণকে শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চূড়ান্ত সংবিধান 'মনুসংহিতা'। পৌরাণিক যুগ থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে বর্ণাশ্রমের এক কদর্য নরকভূমি, যেখানে শূদ্ররা কেবল জন্মায় অন্য তিন উচ্চবর্ণের ক্রীতদাস সেবাদাস ও শ্রমদাস হবার জন্য। বর্ণ (caste) এখানে আসলে অবরুদ্ধ শ্রেণি (class), আর হিন্দুসমাজের চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থা যেন ওঠানামার সিঁড়িবিহীন চারতলা এক সুরম্য অট্টালিকা—যার এক তল থেকে অন্য তলে যাওয়ার কোনো পথ নেই। এই অট্টালিকার সর্বোচ্চ তলে সবচেয়ে সুবিধাবাদী শ্রেণির বাস, আর সর্বনিম্নে থাকে সবার শোষণে জেরবার মেহনতি মানুষের দল। থাক-বিন্যস্ত সমাজে ব্রাহ্মণই সমাজের মধ্যমণি, সেই ব্যবস্থাপক; আর শূদ্ররা একেবারে অবতলে দাঁড়িয়ে— সামাজিক সম্মান বলতে যাদের কিছু নেই। তারা মানুষ হয়েও মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ধর্মস্থানে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ উচ্চবর্ণ কর্তৃক ব্যবহৃত প্রকৃতি-প্রদত্ত জল ব্যবহারেও। তাদের সঙ্গে একত্রে পান-ভোজনে জাত খোয়ানোর সমূহ সম্ভাবনা। অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করা তো দূরের কথা তাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ। তাদের মুখ দেখা অমঙ্গলের সূচক। তাদের দৃষ্টি অশুচি, নিঃশ্বাস অপবিত্র, জিহ্বা অশুদ্ধ। শাস্ত্রের এই বিধিবিধান তাদেরকে চিরকালই ঘৃণ্য করে রেখেছে। অন্যান্য সামাজিক কর্ম থেকে তাদেরকে সরিয়ে রেখেছে অযৌক্তিক, অমানবিক ছুঁৎমার্গিতা। নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্ণের এই উন্নাসিক মনোভাব মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য ও সহজ সম্পর্ককে অনর্থক জটিল করেছে; মনুষ্যত্বের সুউচ্চ মহিমাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করেছে জাতিভেদ তথা বর্ণাশ্রম প্রথা। শাস্ত্রাচারী হিন্দুসমাজ বিগত দু'হাজার বছর ধরে এক বদ্ধ কারাগারে পরিণত হয়েছে।

শুদ্ধ মানবতার হত্যাকারী বর্ণাশ্রমপ্রথার বিরুদ্ধে যুগে যুগে বিপরীত শক্তির উত্থানও ভারত-ইতিহাসের ভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছে। এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি জাতিভেদ অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর, অদৃষ্ট, পরলোক, যাগযজ্ঞ পূজা, আড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান সবই অসার বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁর ধর্মমত চারটি আর্যসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা দুঃখের অস্তিত্বকে স্বীকার করেও তার থেকে মুক্তির দিশা দেখাতে সমর্থ হয়েছে। পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও দশটি পারমিতা অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়ে তিনি ধর্মকে করে তুলেছিলেন মানুষের আত্মশুদ্ধির সরণী। আত্মদীপের আলোয় তাঁর ও তাঁর অনুসারী শ্রমণদের ধর্মনিষ্ঠ জীবনের পথ চলা। আরো পরবর্তীকালে বর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে কিছু গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ্যবাদের অসারতা দেখাতে দক্ষিণ ভারতের তামিল ও তেলুগু কবিরা এগিয়ে এসেছিলেন। তামিল কবি অগস্ত্যের মতে, সহজ অন্ন সংস্থানের জন্য জাতিভেদ একদল সুযোগসন্ধানী মানুষেরই রচিত ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ পোষণের জন্যই বেদ রচিত। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের জন্মমৃত্যুর সমতা দেখিয়ে সেই একই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন কবি সুব্রহ্মণ্য। 'সূক্ষ্মবেদান্ত'-এ যুক্তি সরবরাহ করে জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়েছে এই বলে যে, নারীমাত্রেই যদি শূদ্রা হয়ে থাকে তাহলে তার সন্তানেরা নিশ্চয়ই পারশর। আর পারশরের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে সন্তানের জন্ম হয় তার কোনো জাতিবিচার থাকে না। ফলে ব্রাহ্মণের জাত ও ব্রাহ্মণত্ব মিথ্যা ও কষ্টকল্পিত। 'ভবিষ্যপুরাণ'-এ মানুষের জীবতাত্ত্বিক উপসর্গগুলিকে সামনে রেখে প্রশ্ন করা হয়েছে, দেহে বর্ণে কেশে রক্তে ত্বকে মাংসে মেদে সুখে দুঃখে সকলে সমান হলে চারবর্ণের ভেদ কি আর থাকে? বোঝাই যায়, সমাজের

নীচের তলায় পড়ে থাকা অগণিত মানুষের সামাজিক সম্মান লাভের আকুতি ও বর্ণব্যবস্থার প্রতি আক্রোশ যুগপৎ প্রকাশিত হয়েছে এইসব মত ও মন্তব্যে। মধ্যযুগের ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন ধর্মসাধক যাঁরা শাস্ত্রাচারের বাঁধা পথ ছেড়ে নেমে এসেছিলেন লোকসমাজের প্রশস্ত রাস্তায়। আচারধর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রচার করেছিলেন বিশুদ্ধ মানবতার আদর্শ। বিভেদ ভুলিয়ে মেলাতে চেয়েছিলেন হিন্দু আর মুসলমানকে, ঘোচাতে চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদ, ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছিলেন জাতপাতের বেড়া। কবীর, রজ্জব, দাদূ, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ লোকনায়করা ধর্মসংস্কারের ঘেরাটোপের আড়ালে আসলে সমাজ-কাঠামো বদলের স্বপ্নই দেখেছিলেন ভেতরে ভেতরে। 'চণ্ডালো'পি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ' কিংবা 'কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার'— এই ধর্মীয় বিধানগুলি তো প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ভেদবুদ্ধিকে বিনষ্ট করার প্রয়াস। আরও পরে এপথেই দেখা মিলেছে রামপ্রসাদ কিংবা লালন ফকিরের, যাঁরা ধর্মীয় সংকীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে জাতপাতের গোঁড়ামিকে সমাজ থেকে উচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন।

মানবতার এই মহান ঐতিহ্যকে বহন করে রবীন্দ্রনাথের আর্বিভাব। তবে তিনি জীবনের একেবারে সূচনাভাগেই এই সত্যদৃষ্টি লাভ করেননি। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠবার পর, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর এই উপলব্ধির প্রাপ্তি। তাঁর অন্য অনেক ভাবনার মতোই দলিত সম্পর্কিত চেতনাও বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারাপথ অনুসরণ করে পুষ্ট ও পরিণত হতে পেরেছে। সুতরাং তাঁর অভিপ্রায় মতো এ সম্পর্কিত 'রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত'। কেননা 'যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে', তার ভাবনায় স্বাভাবিকভাবে এসে মিশেছে সমকালীন ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত; সুতরাং এ সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনায় পর্ব-পর্বান্তর দেখা দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। দলিত, অন্ত্যজ সম্পর্কিত রবীন্দ্র-ভাবনার বিবর্তনের রূপরেখাটিকে অনুসরণ করতে গেলে তাই একেবারে গোড়া থেকেই এগোতে হবে আমাদের।

যে পরিবারে প্রথম চোখ মেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর জন্মের অনেক আগে থাকতেই সে পরিবার ছিল বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কাছে ব্রাত্য, পতিত। বহু পুরুষ আগে যখন যবন-সংসর্গে পাতিত্য ঘটেছিল তাঁদের, বর্ণে ব্রাহ্মণ হলেও তাঁরা কথিত হলেন 'পীরালি ব্রাহ্মণ' নামে। তবুও তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ স্মার্ত হিন্দুর আচার-আচরণ প্রথম দিকে পালন করতেন। পরে বিলেতে গিয়ে সে সংস্কারও তাঁর দূর হয়ে যায়। পিতা দেবেন্দ্রনাথের আমলে এ পরিবারে লাগে ব্রাহ্মধর্মের ঢেউ। পরিবার থেকে বিসর্জিত হয় পৌত্তলিকতার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম। স্মৃতিশাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত আচারবাদী হিন্দুধর্মের অভ্যস্ত গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি হয়। কিন্তু তখনও কবির চারপাশে ছিল সামাজিক আভিজাত্যের বন্ধন। ফলে নিতান্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর তেমন কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। 'ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে' কখনো কখনো গেলেও ভেতরে প্রবেশের ছাড়পত্র পাননি তিনি। তাই ভিতরে ভিতরে ছিল একটা গুমরে মরার ভাব। সে অবরুদ্ধতাও ঘুচল একদিন। তিনি নেমে এলেন একেবারে সাধারণ মানুষের কুটিরের দরজায়। মাত্র আটাশ বছর বয়সে দায়িত্ব পেলেন জমিদারি পরিচালনার। চলে এলেন নদ-নদী-ঝোপ-ঝাড় উদার আকাশ-বাতাস সমন্বিত পল্লিপ্রধান পূর্ববঙ্গে। পেলেন মাটির কাছাকাছি মানুষের আতিথ্য ও সেবা, সঙ্গ-সাহচর্য, অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আনুগত্য। এই প্রথম কাছ থেকে দেখলেন গ্রামকে, গ্রামবাসীকে, দরিদ্রকে, দুঃখীকে, অন্ত্যজকে, দলিতকে। যুবক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নতুন দৃষ্টির জন্ম হল। 'চিত্রা'-র 'এবার ফিরাও মোরে' (২৩ ফাল্গুন ১৩০০) কবিতায় তাঁর যে কষ্ট, বেদনা, আক্ষেপ, স্বপ্ন, সংকল্প অভিব্যক্ত হয়েছে

তা এদেরকে ঘিরেই। রোমান্টিক কবির কাব্যজীবনের আর এক পর্ব সূচিত হল পূর্ববঙ্গের জনপদের সান্নিধ্যে এসে। তাঁর জীবনদর্শনেও দেখা দিল নতুন একটি প্রত্যয় : মানববাদ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ। নবজাগরণের বাণীকে আত্মস্থ করে শিক্ষিত অভিজাত হিন্দুদের জেগে ওঠা। তবে এর ঢেউ হিন্দুসমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। ইংরেজরা এসে এদেশে সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার ঘটায়। এতদিন নিম্নবর্গের মানুষেরা যারা পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল, এবার তাদের মধ্যে চেতনার আলো প্রবেশের পথ পায়। বাংলার নবজাগরণের মূল ধারার সমান্তরালে সাড়া জাগতে থাকে আরেকটা মহলে। অন্ত্যজ সম্প্রদায় হিসেবে যারা এতদিন বিবেচিত হয়ে এসেছে তাদের ভিতর সচেতনতা গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু শহরের শিক্ষিত উচ্চবর্গীয় হিন্দু নেতাদের চোখে এসব পরিবর্তন সেভাবে ধরাই পড়ে না। তাঁরা তখন ব্যস্ত ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টধর্মের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে। হিন্দু বীর পুঙ্গবদের নিয়ে মৌলবাদীরা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী গড়ছেন। আর আত্মরক্ষার জন্য শশধর তর্কচূড়ামণিরা নানা অপযুক্তির ফিকির খুঁজছেন। এরই পাশাপাশি শুরু হয়েছে আচার-বিচারে বিপুল আর্যামি ও হিন্দুয়ানির হিড়িক। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, স্থিরবুদ্ধির অধিকারী যুবক রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছিল এই সময়কার হিন্দু হিপোক্রাসির নগ্নরূপ। ধর্মের নামে ধর্মমোহ কীভাবে সমাজে জাল বিস্তার করছে, তা তিনি দেখাতে শুরু করলেন ''মানসী'' কাব্যগ্রন্থের একাধিক ব্যঙ্গ কবিতায়। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৮৮) জ্যৈষ্ঠের ১৮, ১৯, ২১ ও ৩২ তারিখগুলিতে যে কবিতাগুলি ('দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর' ও 'ধর্মপ্রচার') কবি লিখেছিলেন সেগুলিতে নকল দেশসেবার ভণ্ডামির প্রতি তাঁর উপহাস প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাগুলির নানা স্থানে তিনি হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ধিক্কার ও ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন। 'ধর্মপ্রচার' নামের লেখাটিতে একধরনের নাট্যিক আবহের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে গেরুয়াধারী ও নগ্নপদ শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান প্রচারকদের ওপর ক্রোধোন্মত্ত একদল হিন্দুপুঙ্গবের গুণ্ডামি প্রদর্শিত হয়েছে। হিন্দুর এই জিঘাংসার প্রকাশ যে কবির স্বকল্পিত নয়, তারও উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে।

লক্ষণীয় যে, হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ পিছড়েবর্গদের নিয়ে সরাসরি ভাববার আগে, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও ভণ্ডামি বিষয়ে সর্বপ্রথম সচেতন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর এগিয়েছেন পরবর্তী ধাপে। জাতিভেদ ও তার থেকে জাত অস্পৃশ্যতা যে মুক্ত মানবতার পরিপন্থী, মনুষ্যত্বের নির্মম অপমান এটা বুঝতে তাঁর কিছু সময় লেগেছে। প্রথমে ভেঙেছেন প্রথা বা সংস্কারের বেড়ি, পরে ভেঙেছেন বর্ণাশ্রমধর্মের বেড়া। তথ্য হিসেবে এটা দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম দিকে জাতিভেদ প্রথা মেনে চলা হত। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা অব্রাহ্মণ শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত না। ছাত্রাবাসে আহারের সময়ও মেনে চলা হত বর্ণাশ্রম ধর্মানুযায়ী পংক্তিভোজনের বহুকালাগত রীতি। পরে রবীন্দ্রনাথ এগুলি নিষিদ্ধ করেন। সে কেবল অপ্রয়োজনের কারণে নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে এতে অতি অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে, মানুষের অন্তরের দেবতা যে এতে অপমানিত হন—একথা ভেবে। ১৯০৫-এ যখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হল তখন সে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে কবির চোখে প্রকট হয়ে পড়ল যুগ-যুগান্তরের জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষময় কুফল। অভিজ্ঞতা আগেই পেয়েছিলেন তিনি পূর্ববঙ্গে জমিদারি চালাতে এসে। ঠাকুর পরিবারের বর্ণহিন্দু কর্মচারীরা মুসলমান ও অন্ত্যজ হিন্দুদের সঙ্গে কী জাতীয় ব্যবহার করে জানা ছিল তাঁর। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করতে।

শিলাইদহ পর্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এখানকার লোকধর্মের বিশিষ্ট সাধক প্রখ্যাত বাউল গগন হরকরার সঙ্গে। বাউলের গানের ভাষায়-সুরে পেয়েছিলেন বন্ধনমুক্তির আনন্দ যারা জন্মবিদ্রোহী, যারা ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে দীর্ঘদিন ধরে অগ্রাহ্য করে এসেছে। এদের গানেই পেলেন সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরের কথা, যিনি 'মনের মানুষ'। কোনো ধর্মের আড়াল দিয়ে নয়, নিতান্ত সাদা চোখে দেখলেন এখানকার দীনদরিদ্র গরিব-গুর্বো মানুষের অসহায় করুণ জীবন, অভাব অশিক্ষা অপুষ্টি আর উচ্চবর্গের শোষণে যা জেরবার। তাঁর পদ্মাতীরের প্রজারা অধিকাংশই ছিল মুসলমান আর নীচুজাতের হিন্দু—নমঃশূদ্র, বাগদী, জেলে, মুচি, রাজবংশী কিংবা পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের। এরা উচ্চবর্ণের চোখে জল-অচল সম্প্রদায়। অথচ এদের নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। ''ছিন্নপত্রাবলী''-র একাধিক চিঠিতে তাঁর সেই উৎকণ্ঠা ছাড়িয়ে আছে। এদেরকে খাজনা দানকারী প্রজা হিসেবে দেখার তুলনায় বিপন্ন মানুষ হিসেবেই দেখেছেন বেশি। আর এই কারণে মুনাফালোভী জমিদারের মতো প্রজার নিজস্ব সমস্যা বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে না গিয়ে দরদী অভিভাবকের মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শিলাইদহ-পতিসরের পল্লিসংগঠনের গুরুদায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন স্রেফ মানবপ্রীতির কারণেই।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার সঙ্গে মিশেছিল সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও বিশ্বাস। নগরে কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত নেতাদের রাষ্ট্রিক আন্দোলনে কোথায় যেন আন্তরিকতার অভাব দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। তাঁদের কথায়-কাজে তফাৎ রবীন্দ্রনাথকে ব্যথাহত করছিল। সেজন্য স্বদেশি আন্দোলন থেকে অচিরে সরে দাঁড়ালেন তিনি। অন্যদিকে তাঁর দৃষ্টি এড়াল না তথাকথিত শূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের সামাজিক উত্থান। এদের শিক্ষিত মনের পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হলেন। পূর্ববঙ্গের বৃহত্তর দলিত জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের শক্তিশালী নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) যখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধীদের সঙ্গে কণ্ঠ না মিলিয়ে বিপ্রতীপ অবস্থান নিলেন, তখন চমকে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। দলিতদের সমস্যা ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে নতুন করে ভাবতে হল তাঁকে। ফলে যে রবীন্দ্রনাথ একদা প্রাচীন ভারতীয় সমাজকেই আদর্শ বলে মনে করতেন, তিনি সেই সমাজের উৎসৃষ্টি বর্ণাশ্রম প্রথার সমালোচনায় মুখর হলেন। ঠিক ঠিকভাবে ধরতে গেলে ''গীতাঞ্জলি'' কাব্য রচনার সময় (১৯১০) থেকে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-ভাবনার এই পরিবর্তনটি ধরা পড়ে। ওই কাব্যের ১০৬, ১০৭, ১০৮ ও ১১৯ সংখ্যক রচনায় কবি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে তাঁর সামাজিক ভেদবুদ্ধি-রহিত বিশুদ্ধ মানবতাবাদী কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে। ''গীতাঞ্জলি'' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই চারটি রচনা অন্যান্যগুলির মতো সংখ্যা-চিহ্নিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকালে ও ''সঞ্চয়িতা''-তে স্থান পাওয়ার সময় কবি তাদের শিরোনাম যুক্ত করেই প্রকাশ করেছিলেন। যেমন :

সংখ্যা-চিহ্ন	পত্রিকায় প্রদত্ত নাম	সঞ্চয়িতায় প্রদত্ত নাম	কবিতার প্রথম চরণ
১০৬	মাতৃ-অভিষেক	ভারততীর্থ	হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে
১০৭	প্রণতি	দীনের সঙ্গী	যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
১০৮	অপমান	অপমানিত	হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
১১৯	সাধনা	ধূলামন্দির	ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে

সবাই জানেন ''গীতাঞ্জলি''র গানগুলি ছিল মূলত রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন অধ্যাত্ম-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। তাঁকে এ সংগীতাখ্য কাব্যে এক মিস্টিক সাধকরূপেই পাওয়া যায়। ''চিত্রা''-পর্বে যে অন্তরস্থ জীবন-দেবতাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যেন তাঁর কাছে প্রবল আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হল ''গীতাঞ্জলি''-র গানে। ঠিক এইরকম এক অধ্যাত্মঘন পরিবেশে তিনি উচ্চারণ করলেন নতুন জীবনবেদ। কাদের জন্য? কীসের জন্য? এই চারটি রচনা কি ''গীতাঞ্জলি''-র মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গত করে না? একেবারেই বেমানান, খাপছাড়া? প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধান থেকে আমরা পৌঁছে যেতে পারি কবির বিশিষ্ট জীবনদর্শনে, যার কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে নিম্নকোটির মানুষ।

মানুষই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানুষের মধ্যেই তাঁর মহত্তম প্রকাশ—এ বিশ্বাস ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথের আগাগোড়া। পৃথিবীর কোথাও এমন কোনো ধর্ম নেই যা মানুষকে ছাপিয়ে যেতে পারে। তাঁর ধারণায়, যে ধর্ম মানুষকে দুঃখ দেয়, কাতর করে—সে ধর্ম ধর্মই নয়। ''বিসর্জন'' (১৮৯০) নাটকে এই কারণে নিষ্ঠুর বলিদান প্রথার বিরোধিতা করে শক্তির প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেমকেই জয়ী করেছিলেন তিনি। একই ভাবনা নিয়ে লিখেছেন অনেক কবিতাও। প্রৌঢ় বয়সে দক্ষিণ ভারতের খ্যাতনামা মন্দিরে গিয়ে দেখেছিলেন দেবতার নামে জমানো স্বর্ণালঙ্কারে অদৃশ্যভাবে লেগে রয়েছে অহংকারের চিহ্ন। এই অভিজ্ঞতায় তাঁর অন্তর অনুভব করেছিল : 'খেলার দেবতা মানুষের দেবতাকে বঞ্চিত করে—মাদুরার দেবতা মানুষেরই গায়ের অলংকার হরণ করে নিয়ে।' ১৯৩১ সালে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একাধিক পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচারের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধ ধর্মের প্রভেদ দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে বলে আমি ঠাকুরঘর থেকে দূরে থাকি একথা সত্য নয়—মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলেই আমার নালিশ। যে সেবা যে প্রীতি মানুষের মধ্যে সত্য করে তোলবার সাধনাই হচ্ছে ধর্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপব্যয় ঘটাচ্ছি। এইজন্যই আমাদের দেশে ধার্মিকতার দ্বারা মানুষ এত অত্যন্ত অবজ্ঞাত।' (২৯ চৈত্র ১৩৩৭) আর একটি চিঠিতে দীন দুঃখী মানুষের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, '...দেবতার প্রতি আমাদের মানবদায়িত্ব নেই। ... সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি নিয়ে মানব-ভগবানের অন্ন-বস্ত্র-পানীয়-পথ্যের আয়োজন করতে হয়। যুগে যুগে আমরা তাকে অবহেলা করেছি বলেই মন্দিরের ভগবান পাণ্ডা পুরুতের মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছেন, লোকালয়ে তাঁর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়ল, তাঁর পরনে ট্যানা জোটে না।' (৪ বৈশাখ ১৩৩৮) ঈশ্বরের সঙ্গে দরিদ্র মানুষের এই সমীকরণ ''গীতাঞ্জলি'' কাব্যের উক্ত চারটি কবিতায় সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি পেল, সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দলিত-ভাবনায় এদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

''গীতাঞ্জলি''র ১০৬ সংখ্যক তথা 'ভারততীর্থ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের দেশচেতনার এক আশ্চর্য বাণীরূপ। তিনি 'দেশ' বলতে কেবল ভৌগোলিক সীমানায় ঘেরা কোনো ভূখণ্ডকে বুঝতেন না, সেইসঙ্গে তাঁর চেতনায় সম্পৃক্ত হয়ে থাকত সেই ভূখণ্ডের সর্বশ্রেণির মানুষজন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলীতে 'রাজাপূজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ' ও 'সমাজ' নামে যে চারটি স্বদেশ-ভাবনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ স্থান করে নিয়েছিল, সেগুলির ভেতর দিয়ে তাঁর দেশচেতনা স্পষ্ট একটি রূপ পরিগ্রহ করছিল। ১৯১০-এ প্রকাশ পেল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ''গোরা''। বহু বর্ণ ও সম্প্রদায়ের দেশ ভারতবর্ষে সঙ্কট উত্তরণের পথ দেখালেন তিনি। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবের দিকে তাঁর ভাবনার উড়ান শুরু হয়ে যাবে এরপর। ঠিক এইরকম একটা সময়ে 'ভারততীর্থ'-এর আবির্ভাব

(১৮ আষাঢ় ১৩১৭)। এ কবিতায় কবি ধর্ম-বর্ণ-জাত-গোত্র-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভারতীয়ত্বের মহান ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষাব্রত দান করেছেন। ভারত-ইতিহাসের অন্তর্লীন স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে এমন মহাসূক্তভুল্য কবিতা লেখা যায় না। কবিতাটির শেষ স্তবকে কবির উদাত্ত আহ্বান :

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।

এই দুই পংক্তিতে ভারতবর্ষের চিরন্তন জাতব্যবস্থার ওপর কবি আলো ফেলেছেন। বর্ণাশ্রমধর্মের সংকীর্ণতায় ব্রাহ্মণের মন যে অশুচি হয়ে আছে কবি তা দৈনন্দিন ব্যবহারে সমাজের নানাক্ষেত্রে টের পাচ্ছিলেন। একইভাবে পতিতের উপর চাপিয়ে দেওয়া শত-শতাব্দীর অসম্মানভার যে তার মনুষ্যত্বকে প্রতিমুহূর্তে নিগৃহীত করছে এ ব্যাপারেও কবি নিশ্চিত। নব্য ভারতের সেই মিলনতীর্থে তাই কবির সকলকে অকুণ্ঠিত আহ্বান—যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, বৈষম্য, ক্লিন্নতা, ক্রন্দন। মানবতার এতবড়ো ভূমি রবীন্দ্রনাথের আগে আর কেউ ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেননি।

এ কবিতা লেখার পরের দিনই লিখলেন 'দীনের সঙ্গী', যেখানে কবির ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে মানবপ্রীতির আশ্চর্য সুন্দর মিশেল ঘটেছে। এই 'দীন' কেবল অভাবী মানুষকেই নির্দেশ করছে না, যারা 'সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারা' তাদের কথাও বলছে। বস্তুত, ''গীতাঞ্জলি''-তে রবীন্দ্রনাথ যে ভগবৎ সাধনায় ব্যাপৃত সেখানে সংসার-বৈরাগ্যের কোনো ঠাঁই নেই। বরং অসংখ্য বন্ধনের ভিতর দিয়ে মুক্তির স্বাদ পাওয়াই তাঁর সাধকসত্তার লক্ষ্য। তাই সংসারের সর্বত্র তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর ঈশ্বরানুভবকে। মনে রাখতে হবে, এই দেবতার অধিষ্ঠানভূমি কোনো দেবালয় নয়, নয় কোনো আপাত শুচিস্থান। পরিবর্তে তাঁর আসন পড়েছে অধঃপতিত, নির্যাতিত, দরিদ্র, নিঃস্ব, অন্ত্যজ, সর্বহারাদের মাঝখানে। যাঁরা ধন-মান-কুলের দম্ভে অন্ধ, তাঁরা দেবতাকে খোঁজেন মন্দিরের পাষাণবেদীতে, তাই মানুষের ভিতর তাঁর সানন্দ অবস্থানকে দেখতে পান না। কবি নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন সেই তাঁদেরই দলে, যাঁদের শাস্ত্রগত অন্ধতা ঈশ্বরোপলব্ধির পথে মস্ত বড়ো প্রতিবন্ধ। 'দেবতার উদ্দেশে' কবি তাই আক্ষেপ জানিয়ে বলেন :

যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।

কবির এই 'সবহারা'-রাই আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে প্রলেতারিয়েত বা 'হ্যাভ-নটস্'। এ কবিতার সাত বছর পরে সর্বহারার মহান বিপ্লব সংসাধিত হবে জার-শাসিত রাশিয়ায়, যে দেশকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হবে তাঁর স্বপ্নকে সাকার করে তুলেছেন সোভিয়েতবাসীরা, যেখানে না এলে তাঁর সারাজীবনের 'তীর্থদর্শন' অসম্পূর্ণ রয়ে যেত।

সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের অনুষঙ্গ ধরে এবার ঐ তালিকার চতুর্থ কবিতা 'ধূলামন্দির'-এর আলোচনাটি সেরে নিই। আগের কবিতার থেকে মাত্র আটদিন পরে (২৭ আষাঢ় ১৩১৭) লেখা এ কবিতা। এ কবিতায় শাস্ত্রব্যবসায়ী ও মুক্তিলোভী সংস্কারাবদ্ধ মানুষকে তাদের ধর্মসাধনার ভ্রান্তি

ও নিষ্ফলতাকে দেখবার চেষ্টা করেছেন কবি। আদ্যিকাল থেকে ধর্মনিষ্ঠ ভক্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে মঠ-মন্দির-মসজিদ-গির্জার প্রাঙ্গণে। মন্দিরের দেবতা সেখানে পাষাণরূপে বদ্ধ। কিন্তু কবির দেবতা মন্দিরের বেড়া ডিঙিয়ে চলে এসেছেন মেহনতি মানুষের মাঝে। তিনিও সেখানে শ্রমজীবী কর্মী। তাঁর দু'হাতে লেগেছে ক্লিন্ন ধূলি, শরীর ভিজেছে ঘামে, তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে মালিন্যের চিহ্ন। দেবতা কর্মজগতের মাঝখানে এসেছেন কর্মীদের সঙ্গ দিতে, তাদের সঙ্গে একসাথে খাটতে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে। সুতরাং যাঁরা ঈশ্বরকে সত্যই পেতে চান আপন করে তাঁদের শুচিবসন ছেড়ে আসতে হবে ধূলার মাঝে, কর্মযোগে একসাথে খাটতে হবে গায়ের ঘাম ঝরিয়ে। ধুলোর মধ্যে নিজেদেরকে মিশিয়ে দিয়েছেন যাঁরা সেই শ্রমিক-কৃষকদের ভেতর ঈশ্বরের পুণ্য অধিষ্ঠানভূমির কল্পনায় কবির মানবতাবাদী দর্শন উত্তুঙ্গ সীমা স্পর্শ করেছে এ কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথের দলিত-ভাবনার অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে ''গীতাঞ্জলি''র ১০৮ সংখ্যাত কবিতা 'অপমানিত'-এ। এ অপমান মনুষ্যত্বের অপমান, মানুষের বিশুদ্ধ আত্মার অপমান। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদী ভাবনায় ঈশ্বরের পৃথিবীতে সব মানুষ সমান। সকলে তাঁর সন্তান। তাই সব কিছুতে সকলের সম-অধিকার। সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণের কৃত্রিম ফতোয়া দিয়ে শাস্ত্রবচনের চোখ-রাঙানিতে কাউকে দাবিয়ে রাখা, নীচু করে রাখা নৈতিক বিচারে অন্যায়, অপরাধ। অথচ শত শত শতাব্দী ধরে হিন্দু সমজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সমাজপতিরা একশ্রেণির মানুষকে শূদ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য বলে দেগে রেখেছে। মহারাষ্ট্রের মাহাররা, উত্তরপ্রদেশের কামাররা, বঙ্গদেশের চণ্ডাল ও পোদরা এভাবেই উচ্চ সমাজের ঘৃণা ও অবজ্ঞার নির্মম শিকার। অনুদার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে এদের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত। আর্যসমাজের দীর্ঘপ্রচলিত বিধিবিধানে এরা হারিয়েছে সমস্ত রকমের অধিকার, স্বাধীনতা; এদের মাথায় চেপে বসেছে শত শতাব্দীর অসম্মানের গুরুভার। এরা প্রবঞ্চিত, শোষিত, ধিক্কৃত, নির্যাতিত। মানবেতর প্রাণীরও অধম। যে জল গবাদি পশুরা পান করার অধিকারী, অন্ত্যজ মানুষের পক্ষে সে জলে তৃষ্ণা নিবারণ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করারও অধিকার নেই। (স্মরণীয় : ১৯২৭ সালে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে অস্পৃশ্য মাহারদের চৌদার পুকুর অভিযান) কেউ ছুঁয়ে দিলে তা আবার প্রায়শ্চিত্ত করে শোধন করে নিতে হয়। (এ যেন বৈদিক যুগের ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞের আধুনিক সংস্করণ) এভাবে দীর্ঘদিনের অবহেলায় এরা ভুলে গেছে নিজেদেরকে সামাজিক জীব হিসেবে ভাবতে। আত্মবিশ্বাসের অভাবে এরা পশুবৎ জীবনযাপন করে এসেছে দীর্ঘকাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে তাদের সেই হীনতার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করলেন এবং অবমানিত মনুষ্যত্বকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন তার যোগ্য স্থান। নিম্নবর্গ সম্পর্কে উন্নাসিকদের অবজ্ঞাকে আঘাত করে তাদের সচেতন করতে চাইলেন। এই কবিতায় তিনি পক্ষ নিলেন সেই 'মানহারা'-দের যারা এতকাল অপমানিত, অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। এর প্রতিটি অক্ষর তাদের প্রতি সহমর্মিতায় আর্দ্র। তাই এ কবিতাকে বলা যায় নিপীড়িত দলিতের শ্রেষ্ঠ 'ম্যাগনাকার্টা'। 'দুর্ভাগা দেশ' সম্বোধনে কবি তাঁর ভাবনাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সমাজের সেই উচ্চকোটিতে যারা এতকাল ধরে এদেরকে দলিত করে রেখেছে। এরা অশুচি হওয়ার ভয়ে তথাকথিত অন্ত্যজদের ঘৃণা করে প্রাণের ঠাকুরকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কর্মমুখর সমাজের মূল শক্তি যে এরাই সে সত্য বুঝতে পারেনি এইসব উঁচুতলার উন্নাসিক মানুষ। ফলে সামাজিক অগ্রগতি প্রতি পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কবির এই ভাবনাটি আরও চমৎকার ফুটে উঠেছে এর বাইশ বছর পরে লেখা ''রথের রশি'' নাটকে, যার প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

এ কবিতায় কবির বাণী যেন ঋষিকণ্ঠ থেকে উচ্চারিত। সমস্ত রচনাটি জুড়ে রয়েছে অত্যাচারী উচ্চ সমাজের প্রতি কবির সাবধানবাণী। তারা কীভাবে অন্ত্যজকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, অধিকার কেড়ে নিয়ে, মনুষ্যত্বকে পদদলিত করে স্বার্থের রাজত্ব কায়েম করেছে এবং তার সামাজিক প্রতিফল কী ঘটতে চলেছে, কবি তা অগ্নিগর্ভী ভাষায় ছয়টি স্তবকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। হিংসা যেমন প্রতিহিংসা আহ্বান করে, সন্ত্রাস যেমন আর এক সন্ত্রাসের জনক, তেমনি যে অসম্মানিত হয় সেও অন্যকে ঘৃণা ফিরিয়ে দেয়। দুর্ভাগা দেশে শক্তিদম্ভে মত্ত বর্ণাশ্রমধর্মের কঠোর অনুষ্ঠাতাদের সেকথা স্মরণ করিয়া দিয়ে কবি সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন :

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন-পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

এই ‘হীন-পতিতের ভগবান’-ই ‘‘গীতাঞ্জলি’’ পর্বের রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরানুভব। অন্ত্যজদের অসম্মানকারী উচ্চবর্ণের প্রতি এমন বলিষ্ঠ সাবধানবাণী স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া বিগত পাঁচশো বছরে ভারতের আর কোনো মহাপুরুষ, সত্যদ্রষ্টা ঋষি উচ্চারণ করেছেন বলে জানা নেই। অবশ্য সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে, স্বামীজীর ‘‘বর্তমান ভারত’’ রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার এক দশক আগে লেখা, যেখানে তিনি স্পষ্টভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় শূদ্রশক্তির উত্থানের ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। সমাজচিন্তায় এই দুই সমকালীন মনীষীর সাদৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর।

ধর্মের নামে মানুষকে পীড়ন করা সারা পৃথিবীতে চালু একটি অমানবিক প্রক্রিয়া। ধর্মের নামে জিগির তোলাও সহজ, কেননা প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মব্যবসায়ীরা একে আফিম হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে, ধর্মানুসরণকারীকে বুঝিয়েছে বিধর্মী মাত্রেই শত্রু। অথচ ধর্ম বলতে তারা মানুষের অন্তরস্থ হৃদয়বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশকে বোঝেনি, কেবল বুঝেছে কিছু অনড় বাহ্যিক আচার-আচরণকে, সামাজিক ক্ষেত্রে মান্য কিছু নিয়মকানুনকে। এসব দিয়েই যে মানুষের অন্তরাত্মাকে পীড়ন করা যায় রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছেন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায়। হিন্দুধর্মের অনুশীলনযোগ্য এমন আচার-সংস্কারের মধ্যে ছুঁৎমার্গিতা অন্যতম। এই ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রাচারী হিন্দু ঠেকিয়ে রেখেছে বাকি বিশ্বসংসারকে। মুখে সে বলে বটে সবই ঈশ্বরের প্রকাশ, আর কার্যক্ষেত্রে গিয়ে শুচি-অশুচির ভেদ করে। এই ভণ্ডামি রবীন্দ্রনাথের অসহ্য। এই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যে কতখানি মানুষের হৃদয়ধর্মকে লাঞ্ছিত করে রবীন্দ্রনাথ তা বিশদভাবে বুঝিয়েছেন ‘ধর্মের অধিকার’ (১৯১১) প্রবন্ধে। একাধিক

দৃষ্টান্ত তুলে দেখিয়েছেন কোথায় কোথায় ধর্ম আমাদের সহজাত প্রকৃতির চেয়ে, সহজ বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের চেয়ে ধর্মাচরণকারীকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা না দিয়ে জাতবর্ণ-গত ভাবে বিচার করা যে মূঢ়তা দুটি উদাহরণে তিনি স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বাচনেই দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করি :

ক) ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ছেলেরা স্বভাবতই তাদের সহপাঠী বন্ধুদিগকে জাতিবর্ণ লইয়া ঘৃণা করে না ... তথাপি আহারকালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল—সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতি-অসহ্য মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান?

খ) আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে; বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ?

বলা বাহুল্য, উৎকলনের অন্তিম প্রশ্নগুলি সবই কাকু-বক্রোক্তিধর্মী। পূর্ববঙ্গের পল্লিজীবনের ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহ পর্বে সদিরাজপুরের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের পাষাণ মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। জেনেছিলেন চণ্ডাল জীবনের অভিশাপ। সমকালে লেখা 'গোরা' উপন্যাসে চরঘোষপুরের যে-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় কোনো এক নাপিতের ঘরে এক মুসলমান বালক প্রতিপালিত হচ্ছে বলে তার বাড়ির জল রমাপতি ও গোরার কাছে অগ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে। তারা উচ্চবর্গের প্রতিনিধি। তাদের চোখে জাতধর্মের যারা বালাই রাখে না, তারা ভ্রষ্টাচারী। উপন্যাসের শেষে গোরাকে এই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ তাকে দাঁড় করিয়েছেন মানবতার উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। নানা ধর্ম ও বর্ণের মিলিত ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়ে যায় তার দৃষ্টির সামনে, যখন গোরা জানতে পারে তার জন্মরহস্য। এতদিন যে আচার-বিচারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সে আবদ্ধ ছিল, তার বেড়া ভেঙে সে আনন্দময়ীকে বলতে পারে, তাকে বলতে হয় : 'মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাক। তাকে বল আমাকে জল এনে দিতে।'

জল। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক শব্দ ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতার সহস্রাব্দব্যাপী সামাজিক প্রেক্ষাপটে। হিন্দু সমাজের মান্যগণ্য সমাজপতিরা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের যে ভাগ করেছিলেন, সেই বিভাজনের অন্যতম প্রধান মানদণ্ড ছিল জল। কার হাতের ছোঁয়া জল চলবে ও কারটা চলবে না, এরই নিরিখে সমগ্র হিন্দুসমাজ বিভক্ত ছিল দুটি শিবিরে—জল-চল ও জল-অচল। জল-চলরা জাতে-ওঠা সম্প্রদায়, যাঁরা অব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর নেকনজরে ছিলেন। অন্যদিকে জল

ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করে বিশেষ কিছু গোষ্ঠীকে চিরতরে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। তাদের হাতের ছোঁয়া জল যেমন অপবিত্র ছিল, তেমনি উচ্চবর্ণের জন্য ব্যবহার্য জলে তাদের হাত ছোঁয়ানোর কোনো অধিকার ছিল না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, ১৯২৭ সালে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে অস্পৃশ্য মাহারদের চৌদার পুকুর (চাভাদর লেক) অভিযানের কথা। এই জলাশয়ের জল মহারাষ্ট্রের উচ্চবর্ণেরা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করলেও অস্পৃশ্যদের তা পান করা তো দূরের কথা স্পর্শ করারও অধিকার ছিল না। সেজন্য কোলাবা জেলার অস্পৃশ্য সমাজ মাহাদে ১৯২৭ সালের ১৯ ও ২০ মার্চ একটা সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা চায় ওই জলাশয়ের জল মুখে দিয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। একে কেন্দ্র করে সমাজের নীচুতলার নির্যাতিত শ্রেণির মানুষের মনে নবজাগরণের যে এক ব্যাপক জোয়ার আসে তেমনটি আর কখনই দেখা যায়নি। ওই আহূত সম্মেলনে আগত দশ হাজার মানুষের সামনে দলিতদের তৎকালীন নেতা ড. বি.আর. আম্বেদকর যে উজ্জীবনী ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি এই আন্দোলনের আসল তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'চাভাদের লেকের জল খেলেই আমরা অমর হয়ে যাবো না। আমরা এই জল না খেয়েই খুব ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারব। আমরা লেকের জল পান করার জন্য সেখানে যাচ্ছি না। আমরা সেখানে যাচ্ছি এটাই প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে, আমরা অন্যদের মতোই মানুষ।' এই ভাষণ থেকে বোঝা যায়, অস্পৃশ্যদের এই আন্দোলনে 'জল' একটি প্রতীকী হাতিয়ার মাত্র, তাদের আসল লক্ষ্য ছিল স্বাভিমান (আত্মসম্মান বা self-respect) ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথও এই তাৎপর্যেই জলকে ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে, কবিতায়, নৃত্যনাট্যে।

'গোরা' থেকে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র যাত্রাপথে রবীন্দ্রচেতনাপ্রবাহে লগ্ন হয়ে থাকা 'জল' নানামাত্রিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। আমার অনুমান, এই তিন দশকের কাছাকাছি সময় জুড়ে ভারতবর্ষে আম্বেদকরের নেতৃত্বে জাতপাত-বিরোধী যে আন্দোলন চলেছিল তার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। এই সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে ছিল তৎকালীন রাজনীতিও। ১৯১৯ সালের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। এই বৎসরের জানুয়ারি মাসে সাউথ বরো কমিটি ভারতে আসে। কমিটি ৩৮ জন প্রতিনিধিকে আহ্বান জানায় যারা এদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নেতা। অস্পৃশ্য সমাজের অবিসংবাদিত নেতা তখন বাবাসাহেব। তিনি কমিটির সামনে অন্ত্যজদের সমস্যা ও অধিকার বিষয়ে মত দেন। ১৯১৯ সালেই ভারত শাসন আইন ঘোষিত হয় এবং এই আইনে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে অস্পৃশ্যদের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে আম্বেদকরের সম্পাদকত্বে মারাঠি ভাষায় 'মূকনায়ক' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে, যার প্রথম সংখ্যায় বর্ণব্যবস্থাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে সম্পাদক লিখলেন, 'ভারত একটি অসাম্যের দেশ। ... যাঁরা হিন্দুদর্শন আউড়ে বলেন—জীবজন্তু, এমনকি যেখানে জীবন আছে, সেখানেই ভগবানের বাস, তাঁরাই স্বধর্মের লোকগুলিকে অস্পৃশ্য করে রেখেছে। অব্রাহ্মণদের পিছিয়ে পড়ার কারণ তাঁদের শিক্ষা নেই এবং তাঁরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। তাই আজন্ম দাসত্ব, দারিদ্র ও অজ্ঞতা থেকে এইসব মানুষকে মুক্ত করতে, ওরা যে ভালো নেই, বঞ্চিত—এ বোধটা ওদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে।' ১৯২০-র মে মাসের শেষ সপ্তাহে নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অস্পৃশ্যদের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন। এদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১৯২৪ সালের ২০ জুলাই বম্বের দামোদর হলে আম্বোদকরের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'। এই সময়ে দলিতদের

আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্য বাবাসাহেব রণধ্বনি তোলেন—'Educate, Agitate and organise'। ১৯২৭ থেকে '৩১ সাল পর্যন্ত তিনি লাগাতার আন্দোলনে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত নাড়ানোর চেষ্টা করেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। চৌদার পুকুর অভিযান কিংবা মন্দির প্রবেশ আন্দোলন ছিল এই উদ্দেশ্য সাধনের পথ।

অস্পৃশ্যতা বিষয়ে গান্ধীজির অবস্থান দেশের লোকের অজানা ছিল না। তিনি অন্ত্যজদের বলতেন 'হরিজন'। এদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যতার ব্যাধিকে 'পাপ' বলে মনে করতেন, কিন্তু যার থেকে এই রোগের জন্ম সেই বর্ণব্যবস্থাকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করতেন না। সুতরাং এটা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আগে বাবাসাহেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। সম্ভবত তাঁর ধারণার মধ্যে ছিল অখণ্ড বঙ্গদেশের নিম্নবর্গের মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। মহারাষ্ট্রের মতো এ প্রদেশেও শুরু হয়ে যায় অন্ত্যজ হিন্দুর মন্দির প্রবেশ আন্দোলন। ঢাকা জেলায় চণ্ডাল তথা নমঃশূদ্রদের বাস সব থেকে বেশি। সেখানকার মুন্সিগঞ্জ এলাকার স্বামী সত্যেন্দ্রের নেতৃত্বে নমঃশূদ্ররা সেখানকার একটি কালীমন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করে (৩০ আগস্ট, ১৯২৯)। পুলিশ বাধা দেয় ও আন্দোলনকারীদের মারধর করে। ওখানকার বার এসোসিয়েশন (যারা এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল) ও প্রশাসন অন্ত্যজদের আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ওই বৎসর দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন (১৪ অক্টোবর) প্রায় দু হাজার নমঃশূদ্র স্বামী সত্যেন্দ্রের নেতৃত্বে মন্দির প্রবেশের জন্য আবার যাত্রা করে। এবার পুলিশের লাঠি চালনায় ১৭ জন দলিত গুরুতর আহত হয়, রক্ত ঝরে। অবশেষে নেতাকে গ্রেপ্তার করে স্তব্ধ করা হয় এই আন্দোলন। অনুমান, এইসব সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক ঘটনাবলি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন দলিত-ভাবনাকে পুষ্ট করেছিল। এর আগে ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি যখন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লায় গিয়েছিলেন, তখন সেখানে নমঃশূদ্রদের কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন (২২ ফেব্রুয়ারি)। (তথ্যসূত্র : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ২৩৬) নমঃশূদ্ররা তখন গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভে ক্রমশ সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। এ সম্মেলনে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে অন্ত্যজদের অধিকার অর্জন ও উন্নয়নের এই উদ্যোগকে তিনি সর্বান্তঃকারণে সমর্থন করেন।

এই ১৯২৬ সালেই শান্তিনিকেতনে কয়েকটি তরুণ ছাত্র মিলে একটি সমিতি গঠন করে। তারা সমিতিটির নাম দেয় 'সংস্কার সমিতি'। আশ্রম বিদ্যালয়ে প্রচলিত সমস্ত কুসংস্কারকে ত্যাগ করাই ছিল সমিতির সভ্যদের ঘোষিত প্রতিজ্ঞা। আগেই বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ের পাকশালায় একদা ছোঁয়াছুঁয়ির জাতবিচার চলত। আহারের সময় জাতিভেদ অনুযায়ী পংক্তিভোজনের রীতি প্রচলিত ছিল। সংস্কার সমিতি এই ভেদাভেদ তুলে দিতে চাইল। তারা বিভিন্ন ধর্মের পক্ষে নিষিদ্ধ মাংস রন্ধন ও ভোজনের ব্যবস্থা করে কুসংস্কার তাড়াবার উদ্যোগ নেয়। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সংস্কার সমিতির পুনর্জন্ম হয়। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আম্বেদকর অন্ত্যজ সমাজের পক্ষ থেকে পৃথক নির্বাচনের দাবি ছিনিয়ে নিলে তার প্রতিবাদে গান্ধীজি পুনার যারবেদা জেলে আমরণ অনশন করতে শুরু করেন। এই সময়েই ২৩ সেপ্টেম্বর তরুণদের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হন। এ সময়ে সমিতির সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাভবনের গবেষক-ছাত্র সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি 'রবির আলোকে শান্তিনিকেতন' নামের এক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে এই সময়ের বিবরণ দিয়ে লিখছেন :

''৮ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, দুপুর বেলা, মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে পাকশালার দিকে রওনা হয়েছি—এমন সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জরুরী আহ্বান এলো।

উত্তরায়ণে প্রবেশ করে দেখি—রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ—'কোনার্কে'র বাইরের বারান্দায় তাঁর টেবিলের উপর একখানি সাদা তুলট কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ঃ ''এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা মানিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।''

গভীর মনোযোগের সহিত লেখাটি পড়ছি—এমন সময় রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। তাঁর তখনকার সেই মূর্তি কোনদিন ভুলব না।...

তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। চক্ষু ভ্রূকুটি-পূর্ণ। শরীর কম্পমান। সেই 'ভীষণ মধুর' অপরূপ রূপের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চেয়ে আছি—সহসা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হল :

''মহাত্মাজীর উপবাসে আমি অভিনয় করছি, তাঁর বেদনা আমাকে স্পর্শ করেনি—করেছে তোমাদের কলেজের ঐ তরুণ অধ্যাপকদের।

''এ নাটকটা কী—তারা কি তা বোঝে না!''

''এই নাটকের রিহার্সেলে যারা দোষ দেখে—রতনকুটির সন্ধ্যেবেলায় তাদের প্রতিদিনের 'ব্রিজ খেলা' কি বন্ধ হয়েছে?''

তিনি সেই লিখিত তুলট কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন। যাও। নিয়ে যাও। তোমাদের ঐ অধ্যাপকদের কাছে! এই 'প্রতিজ্ঞাপত্রে' সই করার সাহস তাঁদের আছে কি?''

(সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, ''রবির আলোকে শান্তিনিকেতন'',
চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃ. ২০৮-০৯)

এই হলেন স্থিতধী, আপন কর্তব্য সম্বন্ধে কঠোর রবীন্দ্রনাথ। চিন্তায় ও কর্মে যাঁর কোথাও ব্যবধান ছিল না; যিনি কারুর মুখাপেক্ষী ছিলেন না। বোঝাই যায়, তৎকালীন দেশীয় প্রেক্ষাপট রবীন্দ্রনাথকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল। বলা বোধহয় বাহুল্য যে, এখানে যে নাটকটির রিহার্সেলের কথা বলা হয়েছে সেটি রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত নাটক ''কালের যাত্রা''। এটি গ্রন্থাকারে বেরয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১ ভাদ্র (সেপ্টেম্বর ১৯৩২)। এ বইয়ের দুটি অংশ— 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'। এর মধ্যে 'রথের রশি' ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত ''রথযাত্রা'' নাটিকার পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ। কবি ''রথযাত্রা''র ভাবনা-বীজ পেয়েছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র প্রমথনাথ বিশীর কোনো লেখা থেকে। সুতরাং ১৯২৩ সালের শেষ দিক থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের মাথায় শূদ্র জাগরণ বিষয়ক ভাবনার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আর ১৯৩২-এ তিনি নাটকটির পুনর্লিখন করলেন সেই সময় যখন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দাবি উঠল। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সহমত ছিলেন, কিন্তু সম্ভবত আম্বেদকরের তোলা মৌলিক প্রশ্নটির অন্দরে প্রবেশ করেননি। গান্ধীজি যেখানে বলেছিলেন, তিনি অস্পৃশ্যতা মানেন না, কিন্তু বর্ণবিভাজনে তাঁর সায় আছে; সেখানে আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল : অস্পৃশ্যতা আর বর্ণবিভাজন দুটোই ওতপ্রোতযুক্ত—একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সোনার পাথরবাটি যেমন হয় না, তেমনি অস্পৃশ্যতা ছাড়া বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব নেই। আউট-কাস্ট হল কাস্ট সিস্টেমের বাই-প্রোডাক্ট। ফলে কাস্ট সিস্টেম যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আউট-কাস্টের প্রশ্নটিও

থেকে যাবে। যাইহোক, 'রথের রশি'-তে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমাজবিকাশের ধারাকে রূপকান্তরালে বিবৃত করলেন নাট্য-উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে, যার মূল তাৎপর্যের সঙ্গে অনেকাংশে মিল রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের ''বর্তমান ভারত'' (১৯০৫) গ্রন্থে উপস্থাপিত এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের। স্বামীজি যে শূদ্র জাগরণের কথা দিয়ে শেষ করেছিলেন তাঁর সামাজিক চিন্তাঋদ্ধ গ্রন্থটি, বিশ্বকবিও সাতাশ বছর বাদে গিয়ে দাঁড়ালেন উপলব্ধির সেই ভূমিতেই। কবি ও সন্ন্যাসীর এই ভাব-সাদৃশ্য আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, দুইজনেই তাঁদের ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতবর্ষীয় সমাজ-বিবর্তনের অন্তর্নাট্যকে, পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন ভবিষ্যতের দেওয়াল লিখন। 'রথের রশি' নাটকের মূল ভাবটি কী, সেটি কবি নিজেই লিখে গিয়েছেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে লেখা একটি আশীর্বাণীতে। কেননা বইটি পুনর্লিখিত হলে ১৩৩৯-এর ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৬তম জন্মদিনে কবি লেখাটিকে উৎসর্গ করেন তাঁর নামে। টাউন হলে আয়োজিত সেই জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথেরই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি বলে পাঠিয়েছিলেন এই আশীর্বচন। আর সেখানেই ধরা পড়েছে নাটকটির মূল কথা, যার সঙ্গে যোগ রয়েছে দলিত, শূদ্র সাধারণের প্রতি কবির বিশেষ মনোভাব। তিনি লিখেছেন :

> ''তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।''

রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর এত গ্রন্থ থাকতে এমন একটি স্বল্পায়তন নাটিকা উৎসর্গ করলেন শরৎচন্দ্রকে? ওই আশীর্বাণীতেই ছিল তার ইঙ্গিত। যে শরৎচন্দ্র চিরকাল দুর্গত বঞ্চিত ব্যথাহত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর কথাশিল্প নিয়ে, যা 'কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র' জোগায় দুর্বল ও উৎপীড়িতকে, কবি সেই 'প্রবল লেখনী'র দীর্ঘজীবন ও সার্থকতা কামনা করেছেন এই অকিঞ্চিৎকর উৎসর্গের মধ্যে। তবে লক্ষণীয়, এই নাটিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ এক 'উলটো রথের পালা'র কথাও বলেছেন, যা তাঁর স্থিতধী চৈতন্যের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেচনা।

কেবল 'রথের রশি'ই নয়, ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ দলিত তথা অস্পৃশ্যতা বিষয়ে একগুচ্ছ কবিতা লিখবেন সমকালীন ভারতবর্ষের অভিঘাত হৃদয়ে নিয়ে। তখন তিনি পরিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিকতাবোধে উত্তীর্ণ। কেবল মানুষই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। যাবতীয় ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেখতে চাইছেন মানুষের অন্তরাত্মাকে। কাব্যে ততদিনে গোধূলির রং লাগতে শুরু করেছে। চলছে ''পরিশেষ'' ও ''পুনশ্চ''-র পালা। শেষোক্ত কাব্যটিতে তো একেবারে সাধারণ মানুষের ছড়াছড়ি। যাদেরকে আমরা নিতান্ত অবজ্ঞা অবহেলা করে থাকি, যারা আমাদের ব্যস্তসমস্ত কেজো জগতে অতি নগণ্য বলে বিবেচিত হয়, কবি তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন অপরূপ

মাধুর্য ও অসাধারণত্বকে। এই কাব্যগ্রন্থেই পাওয়া যায় ৪/৫টি কবিতা যারা ভাবের দিক থেকে খুবই কাছাকাছি। 'প্রথম পূজা' (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯), 'শুচি' (১৭ নভেম্বর, ১৯৩২), 'রঙরেজিনী' (২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯), 'প্রেমের সোনা' (২৪ পৌষ ১৩৩৯) ও 'স্নান সমাপন' (১৫ ফাল্গুন ১৩৩৯)—এই পাঁচটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবনদর্শন, যার সঙ্গে নিম্নবর্গচেতনার ব্যাপক যোগ আছে। এদের অগ্রজা হিসেবে আগেই জন্ম নিয়েছে ''পরিশেষ''-এর 'জলপাত্র' (২৪ জুলাই ১৯৩২) কবিতা। এ কবিতায় কবি ফিরিয়ে আনলেন সেই 'জল'কে যা দীর্ঘদিন ধরে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকী হাতিয়ার। এক অন্ত্যজ নারী যে তার জন্মের হীনত্বে কুণ্ঠিত, সমাজের একপাশে থাকে গুটিয়ে, হঠাৎ তার কাছে এক বিশ্বজয়ী দৃপ্ত পুরুষ চাইল তৃষ্ণার জল। মেয়েটির মনে নানা ভাবনা উঠল কিলবিলিয়ে, আনত হল সে হীন বর্ণে জন্মলাভের অপরাধে। তখন সেই পুরুষ তার সেই সংকোচ ভেঙে দেবার জন্য প্রসন্ন কণ্ঠে বললে :

হে মৃন্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা,
সেইমতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণরাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা;
তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।
মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।

সুন্দরের কোনো জাত নেই, পাঁকে জন্ম নেওয়া শতদল পদ্মের সৌন্দর্য ভিন্ন অন্য কোনো পরিচয় নেই, নেই তার পাপড়িতে জন্মস্থান পঙ্কের মালিন্য ও দুর্গন্ধ—এই তত্ত্ব প্রচার করে রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকেই দিলেন প্রতিষ্ঠা। আর মেয়েটি সেই জলপাত্রের গায়ে আলপনা এঁকে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটির উদ্দেশে করলে নিবেদন, যে একদিন ঘুচিয়ে দিল তার হীনতার আবরণ। এই ভাবনাটিকেই বীজ করে এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখবেন 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) গদ্য-নাটিকা এবং সেটা ভেঙে বানাবেন 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' (১৯৩৯)। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসবার আগে ''পুনশ্চ''র কবিতা-পঞ্চক বিষয়ে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

অনেকে মনে করেন ''পরিশেষ''-এর না-বলা কথাই ''পুনশ্চ''-র মধ্যে বাণীরূপ পেয়েছে। এ কাব্যে তুচ্ছ, অবহেলিতদের প্রতি কবির সহানুভূতির অন্ত নেই। আগেই বলেছি, এই সময়ে দেশে গান্ধীজির নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার জোর ঢেউ এসে লেগেছে কবির হৃদয়-তটে। এরই ফল পূর্বোল্লিখিত ওই কবিতা-পঞ্চক। লক্ষণীয়, ওই পাঁচটি কবিতাই কমবেশি গল্প-নির্ভর। কাহিনি উপস্থাপনের মাধ্যমে কবি তুলে ধরেছেন তাঁর মানবতাবাদী বক্তব্য। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ

জাতপাতের তুলনায় মানবতা যে অনেক বড় ও মহার্ঘ বস্তু—রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলতে চেয়েছেন কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে। 'প্রথম পূজা' অস্পৃশ্যতার পাপ বিমোচনের লক্ষ্যে লেখা। একইসঙ্গে, কীভাবে বর্ণবাদীরা অন্ত্যজদের অস্তিত্ব ও অধিকারকে নস্যাৎ করে দেয়, একটি ছোট্ট কাহিনির আশ্রয়ে তা ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির। যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে লোকের ধারণা কোন মান্ধাতার আমলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি গড়েছিলেন এ দেবগৃহ। আর তার ঢাউস পাথর বয়ে এনেছিলেন রামসেবক হনুমান, যাঁর অসাধ্য কাজ বলে কিছু নেই। এ কিংবদন্তির বাইরে আর একটা খবরও আছে। এ মন্দির সর্বপ্রথমে ছিল কিরাতদের, যারা হিন্দু সমাজে অন্ত্যজ। তাদের আরাধ্য দেবতার পূজার্চনা হত এখানে। কালক্রমে ক্ষত্রিয়রা কিরাতদের হটিয়ে এটি অধিকার করে নেয়, লাগায় তাদের আর্যসংস্কৃতির শিলমোহর। সুতরাং মন্দিরে পূজাপদ্ধতি একসময় বদলে যায়। দেবালয় চত্বরে কিরাতরা হয় অস্পৃশ্য। যা ছিল তাদেরই হাতে গড়া, সেখানে প্রবেশের চিরকালীন অধিকার তারা হারায়। তারা থাকে বর্ণবাদী সমাজের বাইরে। সেই কিরাতদের আজ আর মন্দির নেই, কিন্তু গান আছে। তারা দূর থেকে মন্দিরের উদ্দেশে জানায় প্রণাম। এমন একটা সময়ে দেখা দিল প্রকৃতির রুদ্ররোষ। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সব কিছু ছারখার হয়ে গেল। মন্দিরের প্রাচীর, চূড়া ভেঙে পড়ল, দেববিগ্রহও হল ক্ষতিগ্রস্ত। পণ্ডিতদের পরামর্শে রাজা নৃসিংহ রায় মন্দির সংস্কারের হুকুম দিলেন। কিন্তু অস্পৃশ্য কিরাতরা ছাড়া আর কেউ পাথরের কাজ করে না। রাজা সংকটে পড়লেন। ঠিক হল, কিরাতের দল বাইরে কাজ করবে, আর ওদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাধব দেবতার মূর্তি গড়বে চোখ বেঁধে, যাতে দেবতার মূর্তির ওপর তার চোখের অশুচি দৃষ্টি না পড়ে। মাধব প্রতিশ্রুতি দিলে : 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী।/যতক্ষণ কাজ চলবে চোখ খুলব না।' তবুও মন্দির-দ্বারে রাজা প্রহরী রাখলেন। মন্দিরের বাইরে কাজ করে কিরাতের দল, আর মন্দিরের ভিতরে চোখ-বাঁধা মাধবের ক্ষিপ্র হাত চলে। দেবতার সুঠাম অবয়ব ধীরে ধীরে রূপ নেয় তার নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। মন্ত্রী এসে তাড়া লাগান। দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে আগামী একাদশীর রাতে প্রথম পূজার শুভক্ষণের আগেই। নির্দিষ্ট সময়ে মূর্তি তৈরির কাজ শেষ হয়। প্রহরী যায় রাজাকে খবর দিতে। আর মাধব খুলে ফেলে তার চোখের বাঁধন। সে কি নিজের সৃষ্টিকে দেখবে বলে, না আরাধ্য ঈশ্বরকে? বিশ্বকবির হাতে অপূর্ব ভাষায় ধরা পড়েছে সেই অসামান্য মুহূর্ত :

মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশীর চাঁদের আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে তার ভক্তের।

বাকি ঘটনাটুকু অতি সামান্যই। যা ঘটে আখছার নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের ব্যবহারে। কবি লিখছেন :

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

আর্য সংস্কৃতির এই বর্ণান্ধ বলদর্পিতা হিন্দু ভারতবর্ষে তখনও যে জাঁকিয়ে রাজত্ব করছে, রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন।

'শুচি' কবিতাটির পিছনে দক্ষিণ ভারতের কোচিনের বিখ্যাত জননেতা কেলাপ্পনের মন্দির প্রবেশ আন্দোলন প্রভাব ফেলেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। কেলাপ্পন বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্য সকলের কাছেই দেবতার মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে বলে এক তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর আন্দোলন আমৃত্যু অনশনে গিয়ে পৌঁছেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন কোচিনের মহারাজাকে ওই জননেতার দাবি মেনে নেবার জন্য একটি পত্র দেন। এই সময়েই লেখা হয় 'শুচি'র মতো কবিতা। রবীন্দ্রনাথের মতে, সত্য যা সে চিরন্তন। আমাদের অন্তর্দৃষ্টি তাকে চিনতে না পারলে সে আমাদেরই মূঢ়তা। আমাদের সত্যবোধকে আচ্ছন্ন করে অহঙ্কার—জাতের, বর্ণের, ধর্মের নিরর্থক অহমিকা। ধর্মের পথে যখন সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়, তখন প্রকৃত ঈশ্বরকে আর খুঁজে পায় না মানুষ, আশ্রয় করে থাকে কিছু বাহ্য সংস্কার, আচারের জীর্ণ খোলস। এর চেয়ে মূঢ়তা আর কী হতে পারে? কবীরের গুরু রামানন্দের জীবনের একটুকরো ছবি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন এ কবিতায়। সেই সোনালি মুহূর্তের ছবি, যখন তিনি বর্ণের, ধর্মের সংকীর্ণতা ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন ভাবনার অন্য দিগন্তে। যেদিন তাঁর মন্দিরে এসে হাজির হল 'নানা চিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল', সেদিন 'প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে,/আহার হল না সেদিন'। এমনি করে দু'সন্ধ্যা গেল। দেবতার পায়ে মাথা কুটে তাঁর অপরাধ জানতে চাইলেন রামানন্দ।

ঠাকুর বললেন, 'আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে।
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে,
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।'

রামানন্দ তুললেন লোকস্থিতির প্রশ্ন। দেবতা নস্যাৎ করে দিলেন সেই বানিয়ে তোলা সংকীর্ণতার বেড়া। বললেন :

যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা!

রামানন্দ বুঝলেন ভুল করেছেন তিনি। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। স্বয়ং ঈশ্বরই জাগিয়ে দিলেন তাঁকে। তখন রাত্রির নিঝুম অন্ধকার। কিন্তু চিত্ত যার জেগেছে, সে কি অপেক্ষা করবে সামান্য সূর্যোদয়ের জন্য? মন্দির ছেড়ে রামানন্দ নগর, গ্রাম পেরিয়ে গেলেন প্রত্যন্ত লোকালয়ে। নদীতীরে শ্মশানে দাহকার্য করছে অন্ত্যজ চণ্ডাল। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে নিলেন বুকে। গেলেন মুসলমান

জোলা কবীরের ঘরে। ধরলেন তার গলা জড়িয়ে। কবীর ব্যস্ত হলেন রামানন্দের জাত বাঁচাতে। রামানন্দ বললেন,

‘এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধূলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।’

এমনই আর কয়েকটি অসামান্য চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ‘‘পুনশ্চ’’র অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কবিতায়। দেখিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি চরিত্রের আত্ম-উদ্বোধন, যাঁরা সংকীর্ণতার গণ্ডি টপকে উত্তীর্ণ হয়েছেন বৃহত্তর মানবতাবোধের জগতে। ‘শুচি’-র কয়েকদিন পরেই লিখলেন ‘মুক্তি’ (১৪ মাঘ ১৩৩৯)। এ মুক্তি, অহংকার আর আভিজাত্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি। এ কবিতা বাজীরাও পেশোয়াকে ঘিরে, যাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হবে রাত্রি পোহালেই। মন্দিরে ঠাঁই না-পাওয়া অন্ত্যেবাসী কীর্তনী এসেছে সেই অভিষেক উৎসবে। আঙিনার এক কোণে পিপুল গাছের তলায় কুণ্ঠিত হয়ে বসে সে একতারায় বাজিয়ে চলেছে তার মরমিয়া গান। গান শুনে উদাসী হলেন বাজীরাও, তারপর রাত পোহানোর আগেই রাজসিংহাসন দু'হাতে ঠেলে রাজবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন যুবরাজ ‘পথের পথিক হয়ে’। কী ছিল সেই গানের ভাষায়, যা শুনে তিনি আর চান না ‘কঠিন সোনার সিংহাসন’, ইচ্ছে নেই তাঁর থাকতে ‘পাথরের বন্দীশালায় অহংকারের কাঁটার বেড়া ঘেরা’ হর্ম্যতলে? আসলে, জাত-হারা কীর্তনী তার গানের ভাষায়, সুরে সুপ্ত প্রাণ জাগিয়েছেন বাজীরাওয়ের; যে কারণে স্বার্থলীন মূঢ় জীবনযাপনের গ্লানিময় গণ্ডিতে আর আটকে থাকতে চান না তিনি।

এমনই আর এক প্রান্তবাসী নারীর সহজ ভাবনার স্পর্শে জেগে ওঠে আর এক পুরুষের মন— যার ভিতরে বিদ্যার বিপুল দম্ভ, যুক্তির সূক্ষ্ম তর্কজাল। তিনি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শংকরলাল। রাজবাড়িতে শংকরলালের ডাক পড়েছে তর্কযুদ্ধে, বিজয়ী হলে মিলবে রাজার জয়পত্রী, পাণ্ডিত্যের সেরা শিরোপা। মলিন পাগড়ি রং করতে দিয়ে গেলেন তিনি বিধর্মী জসীম রঙরেজের কাছে। জসীমের মেয়ে আমিনা, বয়েস তার সতেরো। পণ্ডিতের পাগড়িতে লেখা দেখলে, ‘তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে’। অনেক ভেবে আমিনা তার পাশেই রঙিন সুতো দিয়ে লিখলে, ‘পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে।’ শংকরলাল লেখাটা পড়লেন, বুঝলেন কঠিন শাস্ত্রচর্চা আর জ্ঞানের সাধনার অহংকারে এতদিন প্রাণের ঠাকুরকে তিনি মাথাতেই তুলে রেখেছিলেন, হৃদয়ের উষ্ণ অনুরাগে তাঁকে আপন করে পাননি। সরল শাস্ত্রজ্ঞানহীন এক বিধর্মী কিশোরী মেয়ের হৃদয়ের অনুভব কত সত্য, কত সজীব! তাই কাহিনির শেষে, খ্যাতিমান পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শংকরলাল তাঁর আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে ধরা দিলেন তুচ্ছ এক রঙরেজিনীর কাছে। বললেন :

‘রঙরেজিনী,
অহংকারের পাকে-ঘেরা ললাট থেকে নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।

রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,
আর পাব না খুঁজে।'

ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কোথায়—ধর্মের শুষ্ক আচারে, না হৃদয়ের নিভৃত অনুভবে? কে সত্যজ্ঞানের অধিকারী—পথের ধুলো ঝাঁট দেয় যে চামার, না স্মৃতিশিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত? 'প্রেমের সোনা' কবিতায় এ তর্কের অবসান ঘটিয়েছেন কবি একটি গল্পানুর মাধ্যমে। সংস্কারমুক্ত রামানন্দের স্পর্শধন্য রবিদাস চামার, অচ্ছ্যুৎ। পথিকেরা চলে তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে। চিতোরের রানি ঝালি রবিদাসের গানে পেলেন সহজ প্রাণের উত্তাপ। অস্পৃশ্য চামারের কাছে নিলেন হরিপ্রেমের দীক্ষা। সব শুনে ধিক্কার দিলেন রাজকুলের পুরোহিত। জানালেন, এতে নত হয়েছে বর্ণশ্রেষ্ঠের মাথা, তার শাস্ত্রচর্চার গরিমা। প্রত্যুত্তরে কী বললেন রানি?

'ঠাকুর শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পার নি তা।
আমার ধুলোমাখা গুরু
ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।
অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনী
ধুলোর সে দান নিলেম মাথায় করে।'

এ পর্যায়ের এবং ''পুনশ্চ''-এর শেষ কবিতা 'স্নান সমাপন'। এ কবিতারও অন্যতম চরিত্র রামানন্দ, যিনি অন্তরে দেবতার কল্যাণময় রূপ অনুভবের জন্য ব্যাকুল। গঙ্গার জলে শুচিস্নান করতে নেমেছিলেন তিনি। প্রাতঃকাল। সূর্যকে আজ প্রণাম করতে তাঁর প্রণাম বেধে গেল। অন্তরে উপলব্ধি করলেন দেবতার কল্যাণজ্যোতির আচ্ছন্নতা। হঠাৎ কী মনে করে জল ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি, ভিজে কাপড়ে যাত্রা শুরু করলেন সেইদিকে, যেদিকে ভদ্রপাড়া নেই। সঙ্গের শিষ্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। রামানন্দ এসে প্রবেশ করলেন অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অশুচি ভাজন মুচির ঘরে। শিষ্য ঘৃণায় গুটিয়ে গেল। ভাজন এসে লুটিয়ে প্রণাম করলে সাবধানে। গুরু তাকে তুলে নিলেন বুকে। ভাজন সংকুচিত হল, বললে—'কী করলেন প্রভু,/অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।' রামানন্দ জানালেন, যে স্নান গঙ্গার পাবনীধারাতেও সম্পূর্ণ হয়নি, আজ মুচির ঘরে তাকে আলিঙ্গন করে শুদ্ধ হলেন তিনি। 'এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে/বইল সেই বিশ্বপাবনধারা।' মানুষকে অন্তর থেকে ভালোবাসতে না পারলে যে ঈশ্বরও ধর্মনিষ্ঠের কাছে অধরা থাকেন, এই জীবনসত্য এ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বৃত্তির বিচার নয়, বর্ণের বিচার নয়, একমাত্র বিচার হৃদয়ের। গুরু রামানন্দ সেই সত্যটি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন বলে ভাজন মুচি অন্যের কাছে অস্পৃশ্য হলেও তাঁর কাছে 'বিশ্বপাবনধারা', যার স্পর্শে আত্ম-উদ্বোধিত গুরুর হল স্নান সমাপন। আসলে, বর্ণভেদের মূল্যবোধে যারা বিশ্বাস করে, কৌলীন্যের দম্ভে যাদের মাটিতে পা পড়ে না,

তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ তাদের কাছে ঘৃণিত ও স্পর্শের অযোগ্য মনে হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবতার চিরন্তন মাপকাঠিতে এদের সাধনা যে উচ্চতর, রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে সে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। 'ছোট জাত' বলে ছোট করে রাখার চেষ্টা করেননি।

শুধু কাব্য-কবিতায় উচ্চ জীবনবোধের আদর্শ প্রচার নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও তিনি সেই আদর্শকে অনুসরণ করেছেন যথাসাধ্য। অনেকেই জানেন, তিনি নিজের জীবনেও পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়ামির মূঢ় আঘাত। পীরালি ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় তাঁকে। ব্যথিত হন তিনি। এই পীড়িত বোধ তাঁর সারাজীবন ছিল। তাই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের, যারা শুদ্ধ মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়াই করেছে দেশ থেকে সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কার, ভণ্ডামি, অনাচার ও তজ্জনিত পীড়নকে দূর করতে চেয়েছে। ১৯৩২ সালের ১১ ডিসেম্বর চন্দননগরে এমনই এক অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সভার আয়োজন করেছিলেন প্রবর্তক সঙ্ঘের নেতা মতিলাল রায়। সঙ্ঘের তরফ থেকে সভায় আহ্বান জানানো হয়েছিল সত্তরোর্ধ রবীন্দ্রনাথকে। তিনি সশরীরে হাজির থাকতে পারেননি, তবে আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাঠিয়েছিলেন একটি লেখা, যাতে তাঁর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছিলেন :

> ''প্রবাদ আছে 'কথায় চিঁড়া ভেজে না।' তেমনি কথার কৌশলে অসম্মান অপ্রমাণ হয় না। কুকুরকে স্পর্শ করি, মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি। বিড়াল ইঁদুর খায়, উচ্ছিষ্ট খেয়ে আসে, খেয়ে আচমন করে না, তদবস্থায় ব্রাহ্মণীর কোলে এসে বসলে গৃহকর্ম অশুচি হয় না। পঙ্কের মধ্যে মেছুনী মাছ ধরে, তাই বলে সকল অবস্থাতেই সে পঙ্কিল এমন কথা বলা চলে না। ... উচ্চবর্ণের মানুষ যেসব দুষ্কৃতি করে থাকে, তার দ্বারা তাদের চরিত্র কলুষিত হলেও দেবমন্দিরে তাদের প্রবেশ অবাধ। ... দেহ বা চরিত্র যার কলুষিত, ঘৃণা করে সেই সকল ব্যক্তিবিশেষকে দূরে বর্জন করলে দোষ দিতে পারি নে, কিন্তু কোনো সমগ্র জাতকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেবতা ক্ষমা করেন না। ... কোনো জাতির হীনতা জন্মগত ও নিত্য, এ কথা মনে করাকে আমি অমার্জনীয় অধর্ম জ্ঞান করি। খৃষ্টান শাস্ত্রে চিরনরকবাসের কল্পনা যেমন গর্হিত, কোনো জাতিকে সমাজে চির-নারকী করে রাখাও তেমনি নিষ্ঠুর অন্যায়।''

বর্তমান কালের মতো গত শতকের প্রথমার্ধেও দেশে অব্রাহ্মণ শ্রেণির মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তখনও রাজনীতি পরিচালিত হত উচ্চবর্গের দ্বারা যাঁরা দেশের অধিকাংশ মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন। মুসলমানদেরকেও তাঁরা নেড়ে, ম্লেচ্ছ, বিধর্মী যবন বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। অথচ স্বরাজ লাভের উদ্যমে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী কম বর্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এর অন্তঃসারশূন্যতা লক্ষ করেছিলেন। ''কালান্তর''-এর 'লোকহিত' প্রবন্ধে উচ্চবর্ণের নেতৃবর্গের লোকদেখানো সম্প্রীতি-কুনাট্যের যেমন তিনি সমালোচনা করেছিলেন, তেমনি ১৯৩১ সালে শ্রীনিকেতনের একটি অভিভাষণে বলেছিলেন : 'আমাদের দেশে আমরা পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। যখন দেশকে 'মা' বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব!'

শুধু দলিতদের অস্তিত্ব ও মানবিক মর্যাদার পক্ষেই রবীন্দ্রনাথ সওয়াল করেননি, তিনি নিম্নবর্গের রচিত সাহিত্যকেও (যা মৌখিক সৃষ্টি) খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যচিন্তায়। নীচু জাতের

মানুষেরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি, কিন্তু সৃষ্টিশীলতায় তারা ন্যূন নয়। এই লোকসাধারণের গড়া সাহিত্যকে তিনিই প্রথম নামাঙ্কিত করলেন 'লোকসাহিত্য' অভিধায়। তাঁর বিবেচনায় লোকসাহিত্য হল সংস্কৃতি-মহীরুহের সেই অদৃশ্য শিকড় অংশ যা দিয়ে সমগ্র বৃক্ষটি পুষ্টি সংগ্রহ করে। এই সাহিত্য অকৃত্রিম ও শাশ্বত। এর সৃষ্টির পিছনে দলিত জনগোষ্ঠীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'যখন নমঃশূদ্র, ছুতার, জেলে, মুচি, ভুঁইমালী প্রভৃতি কুলে উৎপন্ন বাউলদের কথা ও রচনা দেখি তখন আমার মনে হয় এমন সব কথা বলিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইতাম। ইহাই খাঁটি, শাশ্বত, সার্বভৌম গণসাহিত্য। আধুনিক এ দেশে কৃত্রিম গণসাহিত্যগুলি তো বিদেশের উচ্ছিষ্ট ও অধম অনুকরণ মাত্র।' জীবনের গভীর উপলব্ধিকে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করতে পারা সহজ নয়। অথচ নিম্নবর্গের কবি-সাধকেরা যে সে ব্যাপারে যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছিলেন আপন অভিজ্ঞতায়। অনক্ষর কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষায় শিক্ষিত দলিত মানুষের সৃজনশীলতার ব্যাপারেও তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি তাঁর নিজের গানে ও কবিতায় স্বীকার করেছিলেন বাউল, ফকির, পল্লীকবিদের রচিত গানের বাণী ও সুরের প্রভাব।

রবীন্দ্রনাথের দলিত-ভাবনার আর একটি স্মারক তাঁর বিশিষ্ট গদ্য-নাটিকা 'চণ্ডালিকা'। এটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৩ সালের ৪ অক্টোবর। এর সৃষ্টির পিছনে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ সমকালের অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে লিখেছেন —'চণ্ডালিকা''র সময় ভারতবর্ষে মহাত্মাজির হরিজন-আন্দোলন খুব জোরে চলছে—এই আন্দোলনের সমর্থনেই গুরুদেব 'চণ্ডালিকা' নাটক লিখেছিলেন।' 'চণ্ডালিকা'র কাহিনি-সূত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের 'শার্দূলকর্ণাবদান'-এর চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি ও বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দর উপাখ্যানটিকে। এ বিষয়টি নিয়ে নাটক বানানোর পরিকল্পনা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের। দেখা যাচ্ছে, এই একই কাহিনিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্র-স্নেহধন্য তরুণ কবি সতীশচন্দ্র রায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'চণ্ডালী' নামের এক কবিতা। বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা সতীশচন্দ্রের পত্র থেকে জানা যায়, কবিতাটি তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই লিখেছিলেন। তখনই কবি তাঁকে এ নিয়ে নাটক লিখতে বলেন, কিন্তু নাটক লেখবার চেষ্টা তাঁর সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিপ্রায়কে সফল করলেন এর তিন দশক বাদে। আবার এ নাটক ভেঙে এরও পাঁচ বছর পরে প্রকাশ করলেন 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'—নাচ আর গানের যুগল মিলনে যা অনন্য, শিল্পের আঙ্গিক হিসেবে সেকালের পক্ষে একেবারেই অভিনব।

যাইহোক, নাট্যের এই দুটি সংরূপেই রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল-সংকলিত মূল গল্পকে অনেকাংশে অনুসরণ করেও ভিন্ন লক্ষ্যের দিকে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির বর্ণগত পরিচয়টির উপর আলো ফেলেছেন বেশি। জন্ম থেকেই সে শুনে আসছে সমাজে চণ্ডালরা অস্পৃশ্য, অচ্ছ্যুৎ। তাদের সামাজিক মর্যাদা নেই কোনো। সবাই তাদের এড়িয়ে যায়। প্রকৃতিকে ফুলওয়ালীর দল ফুল বিক্রি করে না, দইওয়ালা দই বিক্রি করে না, চুড়িওয়ালী তার পসরা নামায় না। অন্য মেয়েরা দোকানীদের সতর্ক করে দেয়—'ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,/ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।' সবাই তাকে ঠেলে ফেলে দেয় পরিত্যক্ত আবর্জনার মতো 'অপমানের অন্ধকারে'। কুণ্ঠায়, অপমানে কুঁকড়ে থাকে সে। চণ্ডাল-জন্মের গ্লানি প্রতি পদে পদে অশুচিতার নরকে পচিয়ে মারে ফুলের মতো মেয়ে প্রকৃতিকে। গ্লানিজর্জর প্রকৃতি মাকে প্রশ্ন করে, 'জন্ম কেন দিলি মোরে।' এমনই আত্মগ্লানির দিনে

তার কাছে এসে তৃষ্ণার্তের জল চাইলে এক সৌম্যদর্শন যুবক। বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ। পীতবসন পরনে। 'ভোরবেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তার রূপ।' শিউরে উঠল প্রকৃতি, চমকে উঠল তার প্রাণ। ঘটতে পারে এমন অভাবনীয় ঘটনা ভাবতে পারেনি সে আগে। বিস্ময় কাটিয়ে দূর থেকে প্রণাম করে নতমুখে সে জানালে, 'ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—/আমি চণ্ডালের কন্যা,/মোর কূপের বারি অশুচি।' ভিক্ষু আনন্দ তাকে বললেন, 'যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থ জল, যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।' সম্মোহিত, স্তম্ভিত, আপ্লুত প্রকৃতি দিল তাকে এক গণ্ডুষ জল। তৃষ্ণায় পরিতৃপ্ত আনন্দ প্রকৃতির কল্যাণ কামনা করে চলে গেল। এবার প্রকৃতির মনের মধ্যে শুরু হল তোলপাড়। তার নারকী জন্মের সব পাপ যেন ধুয়ে গেল ওই এক গণ্ডুষ জলে। অজানা পুলক ভুলিয়ে দিল তার নৈমিত্তিক কাজ, দিনানুদৈনিক সব ব্যস্ততা। চুপ করে গাছের তলায় বসে সে তার নবজন্মের আনন্দ আস্বাদন করতে লাগল। তার মা মায়া মেয়ের অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত, কৌতূহলী। মায়ের প্রশ্নের জবাবে প্রকৃতি জানালে—'সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।' উপাখ্যানের অভিমুখ পরে অন্যদিকে প্রধাবিত হয়েছে, যা আলোচ্য ক্ষেত্রে সামান্য অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ এ কাহিনি রচনা করে তুলে ধরতে চেয়েছেন মনুষ্যত্বের সেই অমর মহিমাকে, যা জাতবর্ণধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ অযাচিতভাবে চণ্ডালপল্লীতে এসে এক চণ্ডাল কন্যাকে মানুষের সমানাধিকার দিয়ে তার হাতে তৃষ্ণার জল পান করে অস্পৃশ্য প্রকৃতির জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে-মুছে তার হীনম্মন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। জানিয়ে দিয়ে গেলেন, তার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে। এতদিনে ধর্মের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছে প্রকৃতি : 'যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে।' এ তো মানব-সাধক রবীন্দ্রনাথেরই কথা। যিনি ধর্ম বলতে বোঝেন কেবল 'মানুষের ধর্ম', কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আচার-বিচারের বেড়ি-শৃঙ্খল নয়। বিশ্বকবি তাঁরা সারা জীবনের সাধনায় সেই ধর্মকেই সত্য, প্রাণবান, সাকার করে তুলতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের দেড়শো বছর পেরিয়ে গেল। পার হবে আরও কয়েক শতাব্দী, কিংবা সহস্রাব্দ। কিন্তু তিনি চিরদিনই অমলিন থাকবেন, কেননা বিশ্বমানবতার প্রশস্ত আঙিনায় জগতের আনন্দযজ্ঞে তিনি সকল বিশ্ববাসীকে করেছেন প্রাণখোলা নিমন্ত্রণ, যেখানে ভেদ নেই ধর্মের, বর্ণের, জাতের, জন্মের। তাঁর দলিত-ভাবনা আসলে বৃহত্তর মানবচিন্তারই অংশ। অন্ত্যজদের প্রকৃত বন্ধু হয়ে-ওঠা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মেলে তাঁর 'বড় আমি'র সমুন্নত এক চেহারা। সেই বিরাট মহিমময় পুরুষকে এক অন্ত্যজের দীন প্রণাম।

সোনার তরী : কাব্যপরিচয় ও রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ব্যাখ্যায় ফিরে দেখা

অরূপকুমার দাস

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। তার তিন বছর পর রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করে একে প্রকাশ করেন সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর প্রায় কুড়ি বছর বা দুই দশক এই গ্রন্থের কোনো মুদ্রণ হয়নি। এই অমুদ্রণ কাব্যগ্রন্থটির তৎকালে জনপ্রিয়তা না পাওয়ারই সূচক, এ সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। দীর্ঘ কালব্যবধানে কাব্যগ্রন্থটি আবার ছাপা হ'ল ১৩২২ বঙ্গাব্দ বা ১৯১৫ সালে। তখন এটা ছাপলেন 'ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস' কর্তৃপক্ষ। ততদিনে কবি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গেছেন। স্বভাবতই তাঁর সমগ্র কাব্যসম্ভার সম্পর্কে একটা ঔৎসুক্য তৈরি হয়েছে পাঠকমহলে। অনুমান করা যায়, সেই আগ্রহ পরিপূরণের জন্যই এই কাব্যগ্রন্থ আবার মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। এরপর কবির জীবৎকালে কাব্যগ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তার ক্রম এইরকম : ১৩৩৪, ১৩৩৯, ১৩৪৩, ১৩৪৭ ও ১৩৪৮। এরমধ্যে ১৩৪৭-এর মুদ্রণ 'রবীন্দ্র রচনাবলী' সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। ১৩৪৮-এ কবির মৃত্যু বছরে 'সোনার তরী' সম্পূর্ণ 'নূতন সংস্করণ' মুদ্রিত হয়।

কাব্যগ্রন্থটিতে আছে সর্বমোট তেতাল্লিশটি কবিতা। কবিতাগুলির শিরোনাম বাংলাতে বর্ণনাক্রমে সজ্জিত, তাই নামকবিতা 'সোনার তরী' এসেছে ৪০তম স্থানে। যদিও অঙ্গবিন্যাসে 'সোনার তরী' স্থান পেয়েছে গ্রন্থ সূচনাতেই। 'সোনার তরী' কবিতাটি ছয়টি স্তবকে সজ্জিত, এতে মোট বিয়াল্লিশটি পঙ্‌ক্তি আছে। কবিতাটি আদ্যন্ত অন্ত্যমিল যুক্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আশ্রয়ে রচিত, যদিও প্রথম পর্ব আট মাত্রা এবং অন্তিম পর্ব পাঁচ মাত্রাযুক্ত। অনুপ্রাসময়, ব্যঞ্জনধ্বনির কুশল প্রয়োগে ঋদ্ধ মধুর শব্দ বিন্যাসের সার্থকতা লক্ষ্য করা যায় এখানে। এর ভাষারীতি অনেকটাই পদাবলীর কাছাকাছি। অধ্যাপক ড. ক্ষুদিরাম দাস এজন্যই তাঁর 'বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি' গ্রন্থে জানান, ''...মানসী-সোনার তরী-চিত্রা পর্বে উত্তম গীতিকাব্যের স্ফুরণক্ষণে পদাবলীর ভাষারীতি ... সহজ অথচ এক বিশেষ ঢঙের বাক্‌রীতির মিশ্রণ।''[১]

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রূপক এবং সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার সূক্ষ্মতর সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়—যা সূচিত হয়েছিল 'মানসী'তে। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়, ''এবারকার 'সাধনা'র (আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দ) আর একটি মহামূল্য অলংকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'। আমরা বহুদিন এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই। আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।'' এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করে তারপর 'সাহিত্য' পত্রিকার উক্ত প্রশস্তি-মূল্যায়নে লেখা হয়, ''ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য বর্ণনাতীত, তাহা কেবল হৃদয়

দিয়া অনুভব করা যায়; তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। রবীন্দ্রবাবু বহুদিন এমন কবিতা লেখেন নাই, ... তিনি 'সোনার তরী'র মত কবিতা লিখুন, তাঁহার 'সোনার' লেখনী অমর হইয়া থাকিবে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ নিজে 'সোনার তরী' কাব্যের বিশেষত্ব ব্যাখ্যায় অনেক পরে, প্রায় চার দশক-কালের ব্যবধানে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল) 'রবীন্দ্র রচনাবলী' সংস্করণের 'সূচনা' শীর্ষক মুখবন্ধে জানান, ''বস্তুত 'সোনার তরী' তার নানা পণ্য নিয়ে কোন্ রপ্তানির ঘাট থেকে আমদানির ঘাটে এসে পৌঁছল, ইতিপূর্বে কখনো এ প্রশ্ন নিজেকে করিনি; কেননা এর উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্যের অঙ্গ নয়। মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না; আমি তো মাঝি, হাতের কাছে যা জোটে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে পৌঁছিয়ে দিই।

'মানসী'র অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম, এর পূর্বে তা আর কখনো করিনি। নূতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারই এসেছিল ডাক; মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু 'সোনার তরী'র লেখা আর এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানা-শোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে;...।

'আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণের পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোকছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি—সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল 'সোনার তরী'-তে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে, কিন্তু আমাকে নেবে কি।"

তবে 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রশংসা, কবির নিজের প্রত্যাশা ইত্যাদি সদর্থক ব্যাপারের অন্যথাও ছিল 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের অভিব্যক্তি' শীর্ষক বিরুদ্ধ সমালোচনায় (১৩১৩ কার্তিক) লেখেন, ''রবিবাবুর ভক্তগণ রবিবাবুর 'সোনার তরী'কে সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন। সভায় সভায় ইহার আবৃত্তি হইয়াছে। একজন এইটি পড়িয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'তাঁহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক'। ... বলা বাহুল্য, কবিতাটি যার-পর-নাই অস্পষ্ট। ... এ কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে—একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপতা এতটাই ‘সোনার তরী’কে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয় যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই কবিতাটির ‘একটি পুরাতন মাঝির গান’ নামে প্যারডি রচনা করেন। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গৌরব অবশ্য খর্ব হয়নি এই বিরোধিতায়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ‘রবীন্দ্র সাহিত্য পরিক্রমা ১ম খণ্ড’, গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘রবীন্দ্র প্রতিভার যে মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, তাহার অন্তর্নিহিত যে রহস্য তাঁহার বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখি এই ‘সোনার তরী’ কাব্যে।’’ যে দুটি বিপরীতমুখী প্রেরণার দ্বান্দ্বিকতা লক্ষ্য করা যায় ‘সোনার তরী’র কবিতাগুলোর মধ্যে তা হ’ল—ক. বাস্তব জীবন পিপাসা বা প্রগাঢ় জীবনাসক্তি ও খ. দুর্নিবার সৌন্দর্য পিপাসা তাড়িত রোম্যান্টিক কল্পনাবিহার।

অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরীর ভাষায়, ‘‘...প্রকৃতিপ্রীতি মানবপ্রীতি ও সৌন্দর্যপ্রীতি কাব্যখানিতে অজস্রধারায় উৎসারিত হইয়াছে। প্রগাঢ় জীবনাসক্তি এবং দুর্নিবার সৌন্দর্য পিপাসাসঞ্জাত রোম্যান্টিক কল্পনাবিহার, উভয় সুরই পাশাপাশি ইহাতে বাজিয়াছে। এ দুইটি সুর পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, একে অন্যের সম্পূর্ণতার সহায়ক। ... বাস্তবজীবন-পিপাসা এবং সৌন্দর্যতৃষ্ণার নিরন্তর দ্বন্দ্ব তাঁহার কবি প্রতিভাকে একটি বিশেষ পরিণামের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।’’

‘সোনার তরী’তে বিশ্বসৌন্দর্যের সঙ্গীত এবং নৃত্য অভিনব কাব্যভাষায় প্রকাশ পেল। বাস্তব বিশ্বের প্রকৃত সত্য ও সুন্দর রূপকে কবি যেন উপলব্ধি করলেন এখানে পরিপূর্ণ চেতনায়। বিশ্বের বৈচিত্র্যময় লীলাকে ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে অখণ্ডভাবে গ্রহণ করে অনুভবী কবি এই কাব্যের ভাষা নির্মাণ করেছেন। সমালোচকের ভাষায়, ‘‘বিশ্বের রূপজগতে যে তরঙ্গ অহরহ উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রবাহ তাঁহার মনকে নিরন্তর প্লাবিত করিয়াছে। বিশ্বকে সমগ্রভাবে অনুভব করা এবং উহার সৌন্দর্য ও রহস্যে আত্মহারা হওয়া এ যুগে কবিমানসের একটি বিশিষ্ট অবস্থা এই বিশ্ববোধ এবং বিশ্বের সৌন্দর্য ও রহস্যের সুতীব্র অখণ্ড অনুভূতি ‘সোনার তরী’র মূল সুর...। এই যে বিশ্ব সৌন্দর্যচেতনা, এই আকাশ, মাটি, তরু-লতা-পশু-পক্ষীর বিচিত্র রূপের প্রাণময় লীলা—এই সকল সৌন্দর্যের একটা সংগীতময় নৃত্য অনুক্ষণ তাঁহার কবিচিত্তের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া দিতেছিল। এই বিশ্বসৌন্দর্যের সঙ্গীত এবং নৃত্যই এক অভিনব কাব্যরূপে আমরা ‘সোনার তরী’তে প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম।’’ ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মূল্যবান ব্যাখ্যা যুগোপযোগী ক্রিয়াপদান্তরিত করে বলা যায়, ‘‘সংসারের দৈনন্দিন জীবনের রূপ ও এক নূতন সৌন্দর্যময় আনন্দময়রূপে কবির চোখে ধরা পড়ল। শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসমূহ গভীরতর ভাবরহস্যে সমৃদ্ধিলাভ করল। বাক্য, পদ ও শব্দ ভাবব্যঞ্জনায় অনির্বচনীয় হয়ে উঠল; ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির মূল্য যেন কবি এই প্রথম আবিষ্কার করলেন।’’

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই কবিতাকে ‘কবিরই আত্মকথা’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি কবিতাটির মধ্যে দেখেছেন ‘একটি গভীর নৈরাশ্যবোধ এবং তজ্জনিত বিষণ্ণতা’র সর্বাত্মক পরিকীর্ণতা। ইন্দিরা দেবীকে লেখা ‘ছিন্নপত্রাবলী’র ২৬ সংখ্যক পত্রের সমর্থন-যোজ্যতা অবলম্বনে তাঁর সিদ্ধান্ত, ‘সোনার তরী’তে আছে, সাধক-আত্মার অভিমান নয়, ভিখারি ‘অহং’-এর বিলাপ। ... মানুষের ‘অহং’-এর ...বেদনাই ‘সোনার তরী’র বেদনা।’’[৪] তাঁর মত, ‘‘সোনার তরী’ কবির একটি বিষণ্ণ মুহূর্তেরই বাণীরূপ।’’[৫]

রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ব্যাখ্যায় ‘সোনার তরী’

‘ক্ষণিকা’ (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের ‘আবির্ভাব’ কবিতা বিষয়ে প্রখ্যাত সমালোচক ‘রবিরশ্মি’ গ্রন্থের

লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়; যে-মায়া শরৎ ঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে মনকে রাঙিয়ে তোলে এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।''

তবে নিজের এই সাহিত্যতাত্ত্বিক মতে স্থির থেকে স্বরচিত কাব্যকে তিনি বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত ছিলেন এমন নয়। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এর নামকবিতাটি তো বটেই, অন্যান্য কয়েকটি কবিতা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথকে মন্তব্য করতে দেখা গেছে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে। সেই ব্যাখ্যাত অর্থের জ্ঞাপন বা বিশ্লেষিত বাচনের সরলার্থ ও নিষ্কর্ষ আমাদের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থটির ভাব ও মর্ম উপলব্ধিতে বিশেষ সাহায্য করে নিঃসন্দেহে। 'সোনার তরী' কবিতাটি প্রসঙ্গে চারটি ক্ষেত্রে তাঁকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণমূলক মত প্রকাশ করতে দেখা গেছে। এছাড়া এই কাব্যগ্রন্থের 'বিম্ববতী', 'শৈশবসন্ধ্যা', 'হিং টিং ছট', 'দুই পাখি', 'গানভঙ্গ', সমুদ্রে প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী', 'অনাদৃত', 'দেউল' ও 'ঝুলন' কবিতা বিষয়েও তাঁর মতামত পাওয়া যায়।

'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) গ্রন্থের 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে 'ঝুলন' কবিতা সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেন, ''বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধ-মরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

এক দিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম।''

এই উপলব্ধির ঘনীভূত প্রকাশ ঘটেছে কবিতাটির যে অংশে তা স্মরণযোগ্য

''...ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া
মারিবে ঠেলা—
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথ বেলা।।
* * * * * *
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কী কল্লোল!
* * * * *

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে,
ভাবে বিভোল।”

এই কাব্যপ্রকাশিত ভাব বিহ্বলতা ও প্রাণাবেগের উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলতাকে কবি উক্ত ‘সাহিত্যতত্ত্ব’ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাষায়, ‘‘বলেছিলেম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়ত্ব ... ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।”

‘ছিন্নপত্র’-র ৯২ সংখ্যক পত্রে ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩ ‘দেউল’ কবিতা সম্পর্কে লেখেন, ‘‘...যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন ক’রে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র প’ড়ে সেই সমস্ত সুদীর্ঘ কালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখা পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।” কবিতাটির প্রাসঙ্গিক অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক—

‘‘একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি
* * * *
দেবতাপানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর।
নূতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি,
জাগিছে এক প্রসাদহাসি
অধর চারিধার।
* * * *
যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।

আমার দীপ জ্বালিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দোহারে।
কী গান আজি উঠিল চারি ধারে।।

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি—
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি।
দেবের করপরশ লাগি
দেবতা মোর উঠিল জাগি,
বন্দী নিশি গেল যে ভাগি
আঁধার পাখা তুলি।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি।।"

'অনাদৃত' কবিতাটায় কবিসত্তা তাঁর সৃষ্টির মহিমাকে কালাতীতের মাত্রায় স্থাপন করে আত্মমূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিশীলতার যা কিছু সম্ভার পরিত্যক্ত স্থূলমূল্যে, তার যে একটা শাশ্বত মূল্য আছে সেটাই ব্যাখ্যা করেছেন কবি : "...এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়, অতএব, এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে—'তোমরাও অবহেলা করো, আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন পস্টারিটি এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে।' ...'পস্টারিটি' যে অভিসারিনী রমনীর মতো দীর্ঘ রাত্রি ধ'রে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে, এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।" এখানে কবি বস্তুত তাঁর সৃষ্টি সুখের আবেশে এতটাই বুঁদ যে তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রায় উপেক্ষিত অনাদৃত সম্ভারগুলোর মধ্যে অমূল্য ও দুর্লভ বিশেষণ-ভূষিত করে একে যেন লেহনে, চোষণে সুধারস-পানের আস্বাদন আবেশে ভাষায়িত করেছেন :

"কোনোটা হাসির মতো কিরণ ঢালে,
কোনোটা-বা টলটল্
কঠিন নয়নজল,
কোনোটা শরমছল
বধূর গালে—"

'মানসসুন্দরী' ৩৪২ পঙক্তিবিস্তৃত দীর্ঘপ্রসারিত রোম্যান্টিক গীতিকবিতা। এই কবিতাটির মধ্যে যেন রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার প্রেয়সীর ভাবমূর্তিকে ধরা আছে। 'ছিন্নপত্র'-র ৮০ সংখ্যক পত্রে তেত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক কবিকে যেমন বিহ্বলতা আচ্ছন্ন প্রগলভচিত্তে পাওয়া যায় তা খুবই বিরল। নিজের কবিপ্রকৃতি, রোম্যান্টিক প্রেমাভিসারের ভাবনায়িকা এবং কবিজীবন যাপনের আবেশতৃপ্তি একাকার

হয়ে গেছে এই 'মানসসুন্দরী' কবিতা উপলক্ষিত ব্যাখ্যাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যটি : ''কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়ি ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ, এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত; কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি, কবি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়, আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েশ করে বসা সে লক্ষীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু, আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। 'সাধনা'ই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাকরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয় স্থান।'' এই বিবৃতি যে কতটা অকপট হৃদয়োত্থিত, তা বোঝা যায় একই ভাবের পুনরাবৃত্তি থেকে; যখন ভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি একই কথার পুনরুচ্চারণ করে বলেন, ''আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি।'' (প্রথম চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র ভূমিকায়, 'সবুজ পত্র' আষাঢ় ১৩৩৩)।

'দুই পাখি' কবিতা যেন কবির শৈশবের যাপনস্মৃতি থেকে উঠে এসেছে। এই কবিতায় বৈপরীত্যের মধ্যে আকর্ষণ অথচ মিলনের প্রতিকূলতার রোমান্টিক বেদনাভাষ্য রূপকাশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে :

''এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে,
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।''

'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) এই কবিতা স্মরণ করে লিখেছেন, ''বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া, এদিক ও দিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ; মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ [ভৃত্য শ্যামের অঙ্কিত] সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—খাঁচার পাখি সোনার খাঁচাটিতে/বনের পাখি ছিল বনে।''

'বিম্ববতী' কবিতাটিতে রূপগরবিনী নারীর শ্রেষ্ঠমন্যতার স্থূলতা প্রকটিত হয়েছে রূপকাশ্রয়ে। এখানে এই শ্রেষ্ঠমন্যতা জন্ম দিয়েছে ঈর্ষার। সেই ঈর্ষার তাড়নায় সুন্দরী রানি শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী পরিণতিতে পৌঁছে যায়। কবিতার উপশিরোনামে 'রূপকথা' শব্দটি এই রূপকটিকে হয়তো কিছুটা হাল্‌কাভাবে গ্রহণ করতে প্রাণিত করে। এ কবিতার সৃষ্টি উৎস যে একান্ত ব্যক্তিগত একটি বাৎসল্য প্রকাশক পরিস্থিতি থেকে, তা জানা যায় ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ শ্রীমতী নলিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে : ''অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কী একটা কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা-তা বকে গেল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি 'সোনার তরী'তে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলেম।''

'শৈশবসন্ধ্যা' গভীর দার্শনিক উপলব্ধি সঞ্জাত কবিতা। তরুণ কবির মনে এই দার্শনিকতার উদয় হয়েছিল স্ব-সত্তাকে পরিবেষ্টনীর জীবন-কোলাহলের মধ্যে রেখে মনন-গভীরতায় জীবনের এবং মনুষ্যত্ব প্রবাহের অর্থ-উপলব্ধির স্বতোৎসারিত চিন্তাপ্রবাহ থেকে। একই ধরনের চিন্তাপ্রবাহ কার্যকর থেকেছে এই কাব্যপর্বের আগে-পরেও। এমনকি 'সোনার তরী'রও অনেক কবিতায় (যেমন 'বসুন্ধরা') মানব-জীবন প্রবাহ ও প্রকৃতির সম্পৃক্ততা বিষয়ে কবির দার্শনিক মন বিজ্ঞান ভাবুকতা ও ভাবের গভীরতার সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছে। কবির মনে উদ্ভিন্ন 'ভারী একটা অপূর্ব আবেগ' তাঁকে উন্নীত করে বিজ্ঞান-চেতন আত্মীকৃত দার্শনিকতায়, যার ফলে তাঁর মনে হয় : ''...মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখ দুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে; মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে; সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্‌ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়—তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।'' ('ছিন্নপত্র', পত্রসংখ্যা ১০৮, জুলাই ১৮৯৪)

কবি হৃদয়ের ভাবুকতা, দার্শনিক মনন গভীরতা ও বিজ্ঞানবোধের এই সংমিশ্রণ যুবক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিস্ময়কর হলেও সত্য। তবে এটা কোন আশ্চর্য সমাপতন নয়, স্বাভাবিক সংগতি। সমালোচক লিখছেন, ''রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের 'টার্মস'-এই বুঝতে হবে—এই সরল কথাটা কি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিজ্ঞান খননের উৎসাহে আমরা ভুলে যাচ্ছি? তাঁর উপনিষদ-পুষ্ট ভাবজগতের বিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের নিজস্ব বিবর্তনকে কী ভাবে তিনি খাপ-খাইয়ে নিলেন, কী ভাবে 'অব্যবসায়ী' হয়েও আধুনিক বিজ্ঞানের 'মোকাবিলা' করলেন—অনুসন্ধানের বিষয় তো আসলে সেটাই। ... আধুনিক বিজ্ঞানের বহুতত্ত্ব ও তথ্যকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণ করে তাঁর 'সৃষ্টিভঙ্গি'র অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। অন্য অনেক কিছুর মতো এখানেও তিনি স্বভাবত স্বতন্ত্র। ... আসলে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে তার সারদর্শনটিকে তিনি আত্মস্থ করতে জানতেন। কবি হিসেবে সে কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। ... অধ্যাত্মচেতনা আর বিজ্ঞানের সংশয়কে রেখেছেন পাশাপাশি। ... রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে বিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র-লব্ধ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে অতিক্রম করে তাঁর কবিতা ও গানে বিশ্বানুভূতি এবং ভূমার আনন্দ স্বতই উৎসারিত,

এ কথা আরও বেশি করে সত্য। এই দুটো দিককে এক সঙ্গে না বুঝলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা হয় না; ... বিজ্ঞানের নিজস্ব অন্তরায়ণেই রবীন্দ্রনাথ স্বরাট। তাঁর উপনিষদও থাকছে, তাঁর বিজ্ঞানও থাকছে। যেন কলয়েড পাশাপাশিই থাকছে, কিন্তু মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে না।"[৬]

'সোনার তরী'র 'রচনা-প্রসঙ্গ'তে জানানো হয়েছে 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'বসুন্ধরা' এই দুই কবিতাতেই 'বৃহৎ ধরণীর প্রতি কবির ... নাড়ীর টান অপূর্ব ছন্দোবন্ধে উদ্গীত'। তবে এই ব্যাপারে 'ছিন্নপত্র'র ২০.৮.১৮৯২ তারিখে লেখা ৬৪ সংখ্যক পত্রের কবিকৃত ব্যাখ্যাকে ভাবুকতার সুতো ছিঁড়ে উড়ে চলা ঘুড়ির মতো মনোবিহার ভাবলে ভুল হবে। খুব সঙ্গত কথা বলেছেন একালের রবীন্দ্র গবেষণায় বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যাকার : "রবীন্দ্রনাথের জন্মের দু'বছর আগেই বেরোয় ডারউইনের 'অরিজিন'। কিন্তু বিবর্তনবাদের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রবীন্দ্রনাথের সৃজনধর্মী রচনায় পাওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় 'মানসী' (১৮৯০) ও 'সোনার তরী'-র (১৮৯৪) যুগ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরকাল যদি কেটে থাকে নিউটনের আলোয়, তাঁর যৌবনকাল আরম্ভ হয়েছিল ডারউইনের ছায়ায়। যার প্রসিদ্ধ পরিণতি 'বসুন্ধরা' কবিতা।" এবার আর একবার পরিক্রমা করে নেওয়া যাক 'বসুন্ধরা'র সমভাবাত্মক 'ছিন্নপত্র'র ৬৪ সংখ্যক চিঠির বহু আলোচিত ও উদ্ধৃতিক্লিষ্ট ভাষ্য : "এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম—তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে-শিকড়ে শিরায়-শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভালো ক'রে প্রকাশ করতে—কিন্তু, ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না, কী একটা কিম্‌ভূত রকমের মনে করবে।"

'সোনার তরী'র 'মানে' বা 'ব্যাখ্যা' নিয়ে প্রায় একশো বছর ধরে নানান তর্কবিতর্ক চালু আছে। কবি নিজেও এতে অংশ নিয়েছেন নানা উপলক্ষ্যে। কোথাও তিনি নিজেই প্রগলভ হয়ে 'মানে' বলার মতো করে বাগ্‌বিস্তার করেছেন, আবার কোথাও ব্যাখ্যা করেও শেষে ব্যাখ্যাতীত অর্থাতীত উপলব্ধিগম্যতার উপর কবিতাটিকে ছেড়ে দেবার কথা বলেছেন। তাঁর সেই অমূল্য মতামতগুলো এক্ষেত্রে একবার পরিক্রমা করে নেওয়া যায়।

৪ চৈত্র ১৩১৫ 'তরী বোঝাই' নামক উপদেশ-ভাষণে ('শান্তিনিকেতন' গ্রন্থভুক্ত) 'সোনার তরী' কবিতা ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেইজন্য গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না, কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ওই সঙ্গে আমাকেও নাও' 'আমাকেও রাখো' তখন সংসার বলে, 'তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু, মানুষ যখন সেইসঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।"

এই ব্যাখ্যার প্রায় আড়াই বছর আগে (৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৩) একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লেখেন, ''সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমারও ওই সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকেই দুই দিনেই ভুলিয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখো, কত লক্ষ কোটি বিস্মৃত মানবের জীবনপাতের উপর আমাদের প্রত্যেকের জীবন গঠিত। আমাদের আহারবিহার, বসনভূষণ, ধর্মকর্ম, ভাষাভাব, সমস্তই পূর্ববর্তী অসংখ্য মানবের বিস্মৃত কর্ম বিস্মৃত চেষ্টার দ্বারাই বিধৃত। আমরা আগুন জ্বালাইয়া রাঁধি, যাহারা আগুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে? যাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়? যাহারা যুগে যুগে নানা রূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নামধাম সুখদুঃখ লইয়া কোন্ বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকেই সংসারকে বলিয়াছিল, 'আমার সমস্ত লও, তোমার জন্যই আমি খাটিতেছি, তোমাকে দিয়াই আমার সুখ। আমার সমস্তই লও; কিন্তু আমাকেও ঠেলিয়ো না, আমাকে ভুলিয়ো না—আমার কাজের মধ্যে আমার চিহ্নটুকু যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়ো।' কিন্তু এত স্থান কোথায়? আমাদের জীবনের ফসল কোনো না কোনো আকারে থাকিয়া যায়, কিন্তু আমরা থাকি না।"[৮]

প্রসঙ্গত স্মরণ করে নেওয়া যাক 'সোনার তরী' কবিতার এই ব্যাকুলতা প্রকাশক প্রাসঙ্গিক অংশটি :

''এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে।।"

এই কাব্যাংশের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ''মানুষের এই একটি ব্যাকুলতা, এই বেদনা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও এই ব্যথা আছে; আমাদের সেবা, আমাদের প্রেম আমরা দিতে পারি, সেইসঙ্গে নিজেকে দিতে গেলেই সেটা বোঝা হইয়া পড়ে।

আমরা প্রীতি দান করিব, কর্ম দান করিব, কিন্তু সেইসঙ্গে আমাকেও চালাইতে যাইব না, ইহাই জীবনের শিক্ষা; কারণ আমাকে চালাইতে গেলেই সেটা নিতান্ত অনাবশ্যক হয়, তাহাতে স্থান কুলায় না, সুতরাং যাহা দিলাম তাহার মূল্য কমিয়া যায়।" কাব্যভাষায় কবির এই ব্যাখ্যাত ভাবটি ঘনীভূত হয়ে আছে মাত্র দুই পঙক্তির স্ফটিকস্বচ্ছ প্রকাশে, যা বক্তব্যের স্বচ্ছতার সঙ্গে গভীরতায় দৃঢ় কেলাসখণ্ডের মতো :

> "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী
> আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

প্রত্যাখ্যাত এই মানুষ বিশেষ মানুষ নয়, এ আসলে বিচ্ছিন্ন ভাবুক সত্তা। যাদের পাশাপাশি সহাবস্থানের মধ্যেও পরস্পরের থেকে 'স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান' এই একাকিত্বের বেদনা জাগিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট বিশদীকৃত ভাবার্থভাষ্যে, "'এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা' —একলা নয় তো কী? আমরা—প্রত্যেকেই যে একলা—আমাদের প্রত্যেকের চারিদিকে যে অতলস্পর্শ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান আছে তাহা কে অতিক্রম করিবে? এই ব্যবধানের মধ্যে, প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের অন্তরালে আপনার জীবনের ক্ষেত্রটুকু লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি—কাজ করিতে করিতে, ফসল জমা হইতে হইতে, এমন দিন আসিয়া পড়ে যখন বুঝিতে পারি, এ ফসল আমি কোথাও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। এ সমস্তই আমাকে দিয়া যাইতে হইবে। কাহাকে দিয়া যাইব? তাহাকে চিনি এবং চিনি না, সে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে কিন্তু ধরা দেয় নাই। আমি তাহাকে বলি, 'ওগো, তুমি আমার সব লও, এবং আমাকেও লও।' সে আমার সব লয়, কিন্তু আমাকে লয় না। আমাদের সকলের কুড়াইয়া লইয়া সে কোথায় চলিয়াছে তাহা কি আমরা জানি? সে যে অনির্দিষ্টের দিকে অহরহ যাইতেছে তাহার কূল কি আমরা দেখিয়াছি? কিন্তু, তবু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অপরিচিত অথচ পরিচিত মানবসংসারকেই আমাদের যাহা কিছু সমস্ত দিয়া যাইতে হইবে; নিজে তো কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না, নিজেকেও দিয়া যাইতে পারিব না।"[৯]

'সোনার তরী'র সূত্রার্থ প্রকাশক রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই অর্থবোধক ভাষ্য পাঠে এই কবিতার ভাবদ্যোতনার কোনকিছুই অস্পষ্ট থাকেনা। বস্তুতপক্ষে এই মরমীয়া (mystic) কবিতাটির সারবান ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের থেকে ভালভাবে আর কেউ দেননি, এ বাংলা কবিতা পাঠকদের অসীম সৌভাগ্য। চারটি উপলক্ষ্যে তাঁর এই কবিতা উপলক্ষিত টীকাভাষ্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে আর একটি হ'ল 'রবিরশ্মি' গ্রন্থ প্রণেতা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে লিখিত পত্রাংশ। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাহিরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। ... যেমন 'সোনার তরী' কবিতাটি। ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ও পারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা-ধানে-বোঝাই চাষীদের ডিঙিনৌকা হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান। ... ভরা পদ্মার উপরকার ওই বাদল দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।"[১০]

নিজের কবিতা বিষয়ে এত বিশদীকরণ করেও রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যের ব্যাখ্যায় অপরার্থবাদী ছিলেন তার প্রমাণও তাঁর এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতার রস তার অর্থান্তরে, অপরার্থ বা অর্থভেদ সেখানে স্বাগত। তাই বলেন, ''...এ সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক্। কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই লিখিত হইয়াছিল। মনে করো না কোনোই বিশেষ অর্থ নাই; কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলা দিনের ভাব, একটা ছবি, একটা সংগীত মাত্র এই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কী?'' কবিতার সৃজন-প্রেরণা, সৃষ্টিলীলার পুষ্পায়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একইরকমের উদার এবং কল্পনাকে গুরুত্ব দেবার দলে, তাই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন, ''যে দিন বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙি নৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এ পারে চলে আসছে, সে দিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজও আমার মনে আছে। সেই দিনেই 'সোনার তরী' কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা। কারণ, আমার মনে 'সোনার তরী'র যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাস, সেটা কোন্ তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক—সে দিনটা বিশেষ দিন নয় সে দিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায়নি। ... আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে—'শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে।'

রবীন্দ্রনাথের মরমীয়া কবিতা 'সোনার তরী' বা ওই নামাঙ্কিত কাব্যগ্রন্থের সমভাবযুক্ত কবিতাগুলির চূড়ান্ত অখণ্ডনীয় ব্যাখ্যায় পৌঁছানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বর্তমান আলোচনায় প্রায় একশো বছর ধরে প্রবাহিত একটি কাব্যগ্রন্থ ও তার কেন্দ্রীয় কবিতাটির উপরে স্বয়ং কবি ও তাঁর সমকাল এবং পরবর্তীকালের ভাষ্যকারদের অপরার্থ ও অর্থান্তরগুলো পরিক্রমা করে এ সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠকের উপলব্ধির অংশ বিনিময় করতে চেয়েছি মাত্র।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১. 'বাঙ্লা কাব্যের রূপ ও রীতি', বুকল্যান্ড প্রা.লি., পৃ.২৭৬, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

২. নন্দরানী চৌধুরী, 'সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', ১৩৭৭, পৃ. ৭

৩. 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা.: রথীন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ৮৪০-৮৪৫

৪. 'রবীন্দ্র কবিতাশতক' দ্বিতীয় দশক, 'কবি ও কবিতা প্রকাশন' ১৯৭৯ পৃ. ১৩

৫. ঐ... পৃ. ১৮

৬. আশীষ লাহিড়ী, ''দয়া করে রবীন্দ্রনাথকে 'বিজ্ঞানী' বানাবেন না, সেটা তাঁর প্রতি অবিচার হবে'', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৭.৮.২০১২, পৃ. ৪

৭. আশীষ লাহিড়ী, তত্রৈব।

৮. বীরেশ্বর গোস্বামীকে লেখা ৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৩-র পত্র।

৯. বীরেশ্বর গোস্বামীর প্রতি ৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৩ লেখা পত্র।

১০. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩৩৯-এ লিখিত পত্র।

ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে : *শিশু* আর *শিশু ভোলানাথ*

সুদক্ষিণা ঘোষ

১

কত হবে ঠিক আমার বয়স, সেই জন্মদিনে, তিন কি চার। সেইবারের জন্মদিনের সকালটাই প্রথম, যা স্পষ্ট ধরা আছে আমার স্মৃতিতে। এত বছরের ওপার থেকে ফিরে তাকালেও জ্বলজ্বল করে ওঠে সেদিন সকালবেলা প্রথম চোখ মেলে তাকানোর মুহূর্তের খুশিটা, চোখ মেলেই বালিশের পাশে একরাশ বই আবিষ্কার করবার বিস্ময়টা। আমার বই-অনুরাগী বাবা-মা বই দিয়েই নতুন জন্মদিনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদের শিশুকন্যাটিকে, তার নতুন পৃথিবীটার সঙ্গে অমনি করেই পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ছোটো মানুষটির। অনেক বই উপহার পেয়েছিলাম সেদিন, আমার বয়সের পক্ষে অনেক, আর এখনও মনে পড়ে, এত বই, সব আমারই, একেবারেই আমার, এই ঐশ্বর্যের বোধে দিশাহারা হয়েও ওই অত বইয়ের ভিড়ে প্রথমেই আমার চোখ টেনেছিল যে বইটা, হয়তো তার একটু অন্যরকম গড়নের জন্যই, সে বইয়ের নাম *বীরপুরুষ*।

রবীন্দ্রনাথেরই *বীরপুরুষ*, ওই একটামাত্র কবিতা নিয়েই আস্ত একটা বই। একটাই কবিতা আর আস্ত একটা বই। কী গভীর বিস্ময় সেদিন আমার বইটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে! কেমন আড়াআড়ি লম্বাটে চেহারা বইটার, কেমন একটা সুন্দর হলদে রঙের মলাট, আড়াআড়ি একটু ছড়ানো গড়ন বলে একটু হয়তো উপচে যাচ্ছে আমার ছোট্ট দু'হাতের সীমানা, কিন্তু একেবারেই মোটাসোটা নয় বলে ওই দুই হাতেই বেশ ভালোভাবেই ধরাও যাচ্ছে তো বইয়ের সবখানিটা; আর ওই যে একটাই কবিতা আর আস্ত একটা বই, এ-বিস্ময় তো অধিকার করে রেখেইছে আমার ছোট্ট মনটাকে। মনের গভীরে ওই বিস্ময়টুকু নিয়েই বইয়ের মলাট পেরিয়ে কখন ঢুকে পড়ি তার লেখার রাজ্যে আর আমাকে আরো চমকে দিয়ে আমার মেলে ধরা হাতের ওপর ডান দিকে এক-একটা পাতায় বড়ো বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে থাকে কবিতার এক-একটা স্তবক আর বাঁ-দিকে তারই ছবির পর ছবি, পাতার পর পাতায়, কখনো বা দেখি পাতাজোড়া কেবলই ছবি! *বীরপুরুষের* টগ্‌বগিয়ে রাঙা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলা খোকা আর তার পাল্কিতে এক কোণে বসা মায়ের জোড়াদীঘির মাঠ অভিযানের বিন্দুবিসর্গ না জেনেই, সেই মুহূর্তেই আমার মনোহরণ করে নিতে থাকে ওই বই। তবে, একথা ঠিক, বইয়ের ওই কবিতা আর ছবির বিন্যাসের ধরনটাই বোধহয় অমন চমক জাগিয়েছিল সেই প্রথম দিনটিতে, নইলে তার পর *বীরপুরুষের* ওইসব ছবির কাছে আর তেমন ফিরে গেলাম না কেন আমি, যেমন কতবার ফিরে ফিরে গেছি *সহজ পাঠের* ছবির কাছে, *বীরপুরুষের* ছবিগুলো আমার শিশুমনকে তেমন করে আর টানল না বলেই তো ফিরে যাইনি আর; তবে সেই বীরপুরুষ খোকাটি কিন্তু আমার মনের গভীরে চিরদিনই রয়ে গেল, আমার বীরপূজার জগতের প্রথম হিরোর ঔজ্জ্বল্য মেখে।

বীরপুরুষই তবে আমার পড়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা। ওই জন্মদিনের সকাল থেকেই আমার সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল তো একলা কবিতার ওই বইটা, কবিতাটা তখনই মুখস্থ হয়ে যেতেও তাই দেরি হয়নি একটুও; তারপর বাবা-মায়ের মুখে শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে যেতে থাকে আরো আরো কত কবিতা, একটা ছোটো মেয়ের চোখে ক্রমে দল মেলতে থাকে শিশুর জগৎ, ছন্দের জগৎ; তার জীবনে স্কুলের ছায়া পড়বার আগেই আপন হয়ে উঠতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ, গানে-কবিতায়। বাবার কাছে আটাত্তর রেকর্ডে যেমন অনেকদিন ধরে অনেক ধৈর্য ধরে রবীন্দ্রনাথের লেখা গান শুনেছে ওই ছোটো মেয়ে, তেমনি, ওই ছোটো বয়সেই রেকর্ডে শুনল সে রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ কাঁপা কাঁপা গলায় আবৃত্তি। প্রথমবার শোনবার আগে, তার যেন ঠিক প্রত্যাশায় ছিল না অমন মানুষের এমন গলার স্বর, কিন্তু শোনবার পরে, ওই ধরনটাতেই যেন অনেক বেশি কাছের, অনেক আপন মনে হল তার রবীন্দ্রনাথকে। ছোটোবেলার সেই মুহূর্তগুলো তো এখনো বাসা বেঁধে আছে মনের মধ্যে, বারে বারে ফিরে ফিরে যখন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনতে ইচ্ছে হত *লুকোচুরি* বা *বীরপুরুষের* মতো কবিতা, বাড়তি এক আকর্ষণ ছিল তখন, ওই কবিতাগুলো আবৃত্তি শুরু করবার আগে রবীন্দ্রনাথের মুখে দু'চার কথায় তার ভূমিকাটুকু শুনে নেওয়ার লোভ। *লুকোচুরি* কবিতার আবৃত্তি শুনতে বসেই যেমন, শুরু হয়ে যেত এক অপেক্ষা, এইবার আসবে সেই ভালো লাগার মুহূর্তটি, রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা এইবার মেলে ধরবে সেই ছোট্ট খোকাটির ছবি, খাটের তলায়, আলমারির পাশে, এমনকি ধোবার বস্তার মধ্যেও যার লুকোবার প্রাণান্তকর বিফল প্রয়াসের বিবরণ রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনতে শুনতে তাকে আমারই এক খেলার সাথী বলে চিনে নিতে এতটুকু কষ্ট হবে না আমার, আর তারপর, প্রত্যেকটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর খোকার এমন চাঁপাগাছে ফুল হয়ে ফুটে উঠতে চাওয়ার অনুপম সৌন্দর্যে, মায়ের সঙ্গে খোকার এমন ফুলের খেলা খেলবার অ-পূর্ব কল্পনায় অভিভূত হয়ে যেতেইবা আর কত দেরি হবে আমার?

রবীন্দ্রনাথ চেনা হলেন তো সে কোন ছোট্টবেলাতেই, আপন হয়ে উঠলেন, হয়ে উঠলেন কাছের মানুষ, তাঁর হাত ধরে, তাঁর গল্প-গান-কবিতার জগতেই তো একটু একটু করে বড়ো হয়ে উঠলাম আমি। তবু হলেনই বা আপন, হলেনই বা কাছের মানুষ, কতবার করে মুখস্থ হয়ে যাওয়া কবিতার রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমার তখন কী সুগভীর অভিমান তাঁর ওপর, কী সুতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, খুকুরা কেন এমন নির্বাসিত অপরূপ আনন্দময় এ-জগৎ থেকে? জানতে ইচ্ছে করে, আমারই মতো ছোটোবেলায় *শিশু* বা *শিশু ভোলানাথের* জগতে ছাড়া পেয়েছে যে শিশুকন্যারা, তাদের মধ্যে এমন ক'জন আছে, যার মনে কখনো জাগেনি এ-জিজ্ঞাসা, এ-অভিমান?

একথা অবশ্য ঠিক যে, বই পড়তে শেখবার আগে-পরে অনেকদিন পর্যন্ত খোকার সঙ্গেই মন মিলে যেতে কোনো সমস্যা হতো না আমার, তেমনটাই হয় বোধহয় সব শিশুরই, পুত্রকন্যা নির্বিশেষেই; খোকার ভাবনা, খোকার সব কাজকেই তখন মনে হতো আমারই ভাবনা, আমারই কাজ, অন্তত তেমনটাই মনে করতে ইচ্ছে তো করত সে-সময়ে, আর তার পর মন খারাপটা আসতে শুরু করল খোকার পাশে খুকুকে মাঝে মাঝে আবিষ্কার করতে শুরু করে। তখন যে কেবলই চোখে পড়তে লাগল, খুকী যদি বা আছে দাদার পাশে পাশে আবছা মোছা মোছা ছবির মতন, তবে সেখানে তার জায়গা হয়েছে তো কেবল সে বড়ো বোকা বলেই! আমার সন্ধানী চোখ অপলকে দেখত তখন, ধোপার বাচ্চা গাধাটিকে যে দাদার বাচ্চা ছাত্র বলে মেনে না নিয়ে গুরুমশাই দাদাটিকে চিৎকার করে ডেকে নিতে চায় খুকী, সে হয়তো ছোটোবেলা থেকেই সচরাচর মেয়েরা ছেলেদের

চেয়ে চালাক আর প্র্যাকটিক্যাল হয় বলেই, কিন্তু তার এই কাজটাকে তার পারঙ্গমতা বলে আদৌ মনে করছে নাকি কেউ; সবাই তো ব্যস্ত কেবল তার অপারগতার হিসেব নিতেই, কেবল জেনে নিতে চাইছে, গণেশকে ঠিকঠাক নামে ডাকবার ক্ষমতাটুকু ধরা দিল কিনা তার মুখে, জানতে চাইছে, খেলাঘরের থালায় সাজিয়ে দেওয়া নুড়িগুলো তুলে নিয়ে সে মুখে পুরছে কিনা, কিংবা ছিঁড়ছে কিনা *শিশুশিক্ষার* পাতা, বা... নাঃ, ফানুস আর তারার তফাত বুঝতে পারা না পারার ক্ষমতার কথাটা তো না তোলাই বোধহয় ভালো! কানাই মাস্টারের ছাত্র ওই বেড়ালছানাটির চেয়ে কতটাই বা উন্নত তার বোধের জগৎ, তার মান্যবর দাদাটির চোখে আর দাদাটিকে যাঁরা এত ভালোবাসেন, তাঁদের চোখেও? ভারি হতাশ আর অবাক মনে ভাবতে বসতাম তখন আমি, *শিশুর* রাজ্যে কেন হবে এমন, এইটুকুনই কেন হবে খুকীর ভূমিকা!

অথচ, রবীন্দ্রনাথের গল্প তো খুব কম পড়ে ফেলিনি ততদিনে, কবিতার পাতা থেকে গোগ্রাসে পড়া ওই গল্পের বইয়ের জগতে মন সরিয়ে আনলেই তো আরো অনেকখানি বেড়ে যেতে থাকে আমার বিস্ময়বোধ, গল্পের পাতা থেকে ভারি উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে চেয়ে থাকে বাক্‌পটু মিনি, কর্মদক্ষ রতন, বিষণ্ণ সুভা, এমনকি হিংসুটে চারুশশীও! *শিশুর* পাতা খুলে আকাশপাতাল ভাবতে বসা ছাড়া তখন আর উপায় কোথায়, উপায় কোথায় এই কথাটা ভাবা ছাড়া যে, অমন একটাও মিনি রতন সুভাষিণী বা চারুর ছবি আঁকা *কাবুলিওয়ালা-পোস্টমাস্টার-সুভা-অতিথি* তো কোথাও নেই কবিতার পাতায়!

তবে, পেয়ে যেতাম একটা কবিতা, সেটা হয়তো অতো ভালো লাগত না ঠিক খোকা-র কবিতার মতো, তবু তো খুঁজে পেতাম এমন একটা কবিতা, যেখানে খোকার চিহ্ন নেই, আশেপাশের মানুষজনের চাওয়া-পাওয়ায় আকাঙ্ক্ষায়-ভালোবাসায় খুকুই যেখানে সম্রাজ্ঞী; কবিতাটা অতো যে ভালো লাগত না ঠিক খোকা-র কবিতার মতো, সে বোধহয় এইজন্যই যে, এ-কবিতার ভুবনে ছোটোদের চোখের চাওয়ার জগৎটা অনুপস্থিত, এ-কবিতার বয়ান একান্তই বড়োদের, তবু, ও-কবিতাতেও অনেকখানি স্নেহ ঝরছে বলেই মনে হতো যখন শুনতাম,

একটি মেয়ে আছে জানি,
পল্লীটি তার দখলে,
সবাই তারি পুজো জোগায়
লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায়
কথায় যদি মন দেহ—
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে
আছে আমার সন্দেহ।

তবুও তো ওই ‘লক্ষ্মী মেয়েটি’কে ঘিরেই যে ওই সন্দিগ্ধ মানুষটিরই মনে না হয়ে পারে না,

সে নইলে যে তেমন করে
ঘরের বাঁশি বাজে না।

মনে হয়,

সে না হলে সকালবেলায়

এত কুসুম ফুটবে কি।
সে না হলে সন্ধেবেলায়
সন্ধেতারা উঠবে কি।

তবে অনেক সময় লেগেছিল আমার জানতে, সত্যি সত্যি কাকে নিয়ে লেখা এই কবিতা। অনেকদিন পরে *কড়ি ও কোমলের* পাতায় ইন্দিরা দেবীকে ঘিরে এ-কবিতার আদি রূপের কিছু কিছু অংশ পড়তে পড়তেই বুঝেছিলাম, কেমন করে এত স্নেহ ঝরে পড়েছে এর অক্ষরে অক্ষরে!

২

মনে পড়ে, আজ একশো বছর পেরিয়ে গেছে, *ঠাকুরমার ঝুলির* ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলাম আমরা,

> ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের "Fairy Tales" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে।

বাংলা সাহিত্যের সব বয়সের পাঠকই জানেন, *ঠাকুরমার ঝুলির* এ-ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, বিশ শতকের প্রথম দশকটিতেই, বাংলার শৈশব-কৈশোর আচ্ছন্ন করে হ্যারি পটার যুগের আগমনের কত শত দিন আগেই! তবু তো তখনই তাঁর মনে হচ্ছিল, দেউলে হয়ে গেছে 'স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী', মনে হচ্ছিল, 'কোথায় গেল—রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী, কোথায়—সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের সাত রাজার ধন মাণিক!' মনে হচ্ছিল,

> পাল পার্বণ যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুস্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্কলোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসীন্-দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান-বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে।
>
> কেবলি বইয়ের কথা! স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল! দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়!

দেশলক্ষ্মীর বুকের কথার জগৎ, স্নেহময়ীদের ভুবন হারানোর এই আক্ষেপের সুর রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনতে শুনতে মনে হয়, জগৎ-পারাবারের সেই যে তীর, যেখানে ছেলেরা করে খেলা, সেই নিবিড় গহন ভুবন এমনভাবে রবীন্দ্রনাথের কলমে ধরা দিল কেমন করে, ১৯০৩ সালে, এসব কথা মনে জেগে ওঠবার কয়েক বছর আগেই? কবিমনকে উস্কে দেওয়ার মতো প্রস্তাব একটা অবশ্যই ছিল এর আড়ালে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর আসন্ন খণ্ডটিতে 'শিশু' বা 'শৈশব' নামের একটি শ্রেণি যোগ করে দেওয়ার একটা প্রস্তাব করেছিলেন সে-সময়ে *কাব্যগ্রন্থ*-সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেন, উৎসাহিত রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল,

> গ্রন্থাবলীতে একটা "শিশুখণ্ড" জুড়ে দেবার যে প্রস্তাব করেছেন সে অতি উত্তম।

সময়টা তখন ১৯০৩ সালের জুলাই মাস। উত্তরে মোহিতচন্দ্রকে লেখা ১৩১০ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণের চিঠিটিতেই নিজের উৎসাহ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ওই খণ্ডে প্রকাশের উপযোগী বেশ কিছু পুরোনো কবিতার সন্ধানও দিয়েছিলেন সম্পাদককে, মনে করিয়ে দিয়েছিলেন পূর্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ বা 'মুকুল' 'বালক'-এর মতো সাময়িকপত্র থেকে পুরোনো কবিতা নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা, *কাগজের নৌকা, পুরাতন বট, শীতের বিদায়, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর* প্রভৃতি কবিতার অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা, কোনো কোনো কবিতা 'ছেঁটে ছুঁটে' একটু পরিমার্জনা করে দেওয়ার দায়িত্বও নিয়েছিলেন নিজেই, প্রস্তাব করেছিলেন 'শিশু' বা 'শৈশব'-এর পরিবর্তে খণ্ডটির বিকল্প নামেরও,

> গ্রন্থাবলীর যে অংশে ছেলেদের কবিতা বেরবে তার নাম শিশু বা শৈশব না দিয়ে ''কিশোর'' বা ''কুমার'' নাম দেবেন। কারণ শিশু অতি ছোট—সব কবিতা ও নামে খাপ খাবে না।

'কিশোর' নামটি *কাব্যগ্রন্থ* সম্পাদকের বেশ মনোমতো হওয়া সত্ত্বেও পরের চিঠিতেই অবশ্য মত পাল্টেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ফিরে এসেছিলেন প্রথম নাম 'শিশু'-র কাছেই।

এইসব পরিকল্পনা, পরিমার্জনা আর নতুন কবিতা রচনার পক্ষেও, সময়টা কিন্তু তখন একেবারেই অনুকূল ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তাঁর সে-সময়ের প্রতিকূলতার কথা মনে করেই পরবর্তী ১০ শ্রাবণের চিঠিতে লিখেছিলেন মোহিতচন্দ্র,

> আপনার unconscious self আমার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এই দুশ্চিন্তার ভেতর আপনি এত শৈশব লীলা অন্তরে কোথা থেকে পেলেন?

রবীন্দ্রনাথের এত 'দুশ্চিন্তা'র কারণ তখন তাঁর মধ্যম কন্যা রেণুকা, তার মরণাপন্ন অসুখ, সেই অসুস্থতার কারণেই মাতৃহারা রুগ্ন কন্যাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন আলমোড়ায়। সেই সব দিনের কথা অনেকদিন পরে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নির্মলকুমারীর *বাইশে শ্রাবণ* থেকে যে কথাগুলি শুনে নিয়েছেন নিরবধিকালের পাঠক,

> আমার মেজ মেয়ে রানীর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি। তার মৃত্যুর সময় তার মা বেঁচে ছিলেন না। সমস্ত অসুখের মধ্যে আমিই তার সেবা করেছিলুম শেষ পর্যন্ত। ... সর্বদা তার বাবাকে কাছে চাই। যদিও তার বিয়ে হয়েছিল, তবু তার সমস্ত মন জুড়ে বসে ছিল তার বাবা। আলমোড়াতে যখন তাকে চেঞ্জে নিয়ে যাই, তখন তার অসুখ খুব বেশী। তাকে খুশি রাখবার জন্যে রোজ রোজ কবিতা লিখে বিছানার পাশে বসে শোনাতুম, যাতে কিছুক্ষণও অন্তত রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকে। এমনি করে আমার 'শিশু' বইখানা লেখা হয়েছে—ও কবিতাগুলো রানীর অসুখের সময় লিখেছিলুম।

মরণাপন্ন মেয়েকে তার রোগযন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখবার জন্য, তার বিবর্ণ মুখে একটু খুশির আভা দেখবার জন্য এক অসহায় পিতা অসুস্থ কন্যার শিয়রে বসে লিখছেন এইসব কবিতার পর কবিতা, অথচ আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়েনি রবীন্দ্রনাথের কলমে, বিষাদছবি সচরাচর ধরা দেয়নি খোকাকে ঘিরে লেখা তাঁর এত ঝলমলে কবিতার বর্ণে বর্ণে। রবীন্দ্রজীবনের সন্ধানী মাত্রেই জানেন, ওই ১৩১০ বঙ্গাব্দেই তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে রানী নামে সেই মেয়েটির মুখ; *আকুল আহ্বান* কবিতায় ধরা রইল কি তারই সুর, সেই অসুস্থ মেয়েটিই জেগে রইল কি সেবারত বাবার সস্নেহ দুটি চোখের চাওয়ায়,

কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা,
নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।
শ্রান্ত দেহ ঢুলে পড়ে, তবু
মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে।

মাতৃহারা মেয়েকে ঘিরে বাবার বেদনাসিক্ত এই উচ্চারণই কি বেজে উঠল শেষে,

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
একটি সে তো পরতে পেল না।

যদিও তথ্যগতভাবে একথা তো আমরা, এ-কবিতার পাঠকেরা অনেকেই জানি যে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর লেখা *পুষ্পাঞ্জলির* পাণ্ডুলিপিতেই ধরা ছিল *আকুল আহ্বান* কবিতার প্রথম রূপটি, ১২৯২-এর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা 'বালক'-এ কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সময় অনেকটাই পরিবর্ধিত হয়েছিল সেই মূল রূপ, আর 'বালক'-এর সেই দীর্ঘ কবিতাটির সঙ্গে শিশুর *আকুল আহ্বান*-এর প্রভেদও অনেক; তবু ইতিহাসের এসব বর্ণমালায় মন না দিয়ে কেবল শিশুর কবিতার বিধুরতার দিকে চাইলে কেন যে পাঠকমনে এমন করে উঁকি দিয়ে যায় আলমোড়ায় এক একলা পিতার বিষাদ। আর তখনই তো মনে পড়তে থাকে, কেবল কি পীড়িত কন্যাটি, আর তার আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা, অসহায় ওই পিতাটির বুকের মধ্যে কি রয়ে গেল সদ্য হারিয়ে-যাওয়া আরও কোনো মুখ, রোগে এইরকমই শুশ্রূষা করেছিলেন যাঁর, ১৯০২ সালে যিনি মুছে গেছেন জীবন থেকে, জীবনসঙ্গিনী সেই মৃণালিনী দেবী, রানীর মায়ের? সতেরো বছরের সেই প্রথম শোকে আর নতুনতর শোকের পরতে পরতে হয়তো কখন কে জানে, মিশে গেছে বেদনার মালা গাঁথার আঙুলখানি!

আর একথা তো ঠিকই যে, নতুন করে কাব্যগ্রন্থাবলীর 'শিশু' খণ্ডের জন্য কবিতা লিখতে লিখতে ছোট্ট এক খোকা আর তার মায়ের জগতের যাবতীয় হাসিকান্না হীরাপান্নার দ্যুতি নিজের মনে মেখে নিতে নিতে হারিয়ে-ফেলা গৃহস্মৃতির কথাই ভাবছিলেন বিয়াল্লিশ বছরের বিপত্নীক রবীন্দ্রনাথ, *বিদায়* কবিতাটি লেখা শেষ করে ১৩১০ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ মোহিতচন্দ্রকে চিঠিতে এমন কথাই তো লিখেছিলেন তিনি; 'পিণ্ডি না দিলে যেমন ভূতের শান্তি হয় না', তেমনই 'শেষের মত একটা কিছু না লিখলে' তাঁরও আইডিয়া থামতে চায় না, কিংবা, কোনো 'গড়ানে জায়গায় বেগে নাবার' সময় যে 'তলা না পেলে দাঁড়াবার জো নেই', 'বিদায় কবিতায় সেই তলা পাওয়া গেল', এখন তিনি নিশ্চিন্তে মন দিতে পারবেন অন্য বিষয়ে, এইসব কথাও সে-চিঠিতে মোহিতচন্দ্রকে অবশ্যই বলছিলেন তিনি; তবে সেই সঙ্গেই লিখছিলেন যে এই কথাও,

এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়! শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্ব্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম কিন্তু এমন বরাবর চলে না—পৃথিবীতে আবার আপিস্ আছে। আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আমি কম লোক নই—অতএব কেবল অন্তঃপুরে কাটালে চলবে না—সাড়ে দশটা বেজেছে—গাড়ি তৈরি—চল্লেম।

'পৃথিবীতে আপিস্ আছে', 'আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আমি কম লোক নই'—এ-জাতীয় কৌতুকে মুড়ে পরিবেশন করতে চাইলেও এসব কথার আড়াল থেকে কোন্ পাঠকের সামনে না

উঁকি দিয়ে যায় এক নিরালয় গৃহপতির গভীর মায়াভরা মুখ, যাঁকে এখন শিশুর মা-র সঙ্গপিপাসা মেটাতে 'ছলনা'র আশ্রয় খুঁজতে হয়, খুঁজতে হয় শিশুকে ঘিরে কবিতা রচনার উপলক্ষ্য। এমনি কত স্মৃতিবেদনার মালা গেঁথে তুলে লেখা হয়ে ওঠে একটি একটি করে কবিতা।

আর, *শিশুর* কবিতার জগৎ জুড়ে কেন কেবলই খোকার রাজত্ব আর খুকীর কেন এমন অবহেলা? সে প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই কি আর কখনো জবাবদিহি করতে হয়নি কোনো, যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে কতদিন কত অভিমানে ভরে গেছে বাঙালি শিশুকন্যার বালিকাবেলা, সেই প্রশ্নের উত্তরটাই তো জানাতে হয়েছিল তাঁকে *কাব্যগ্রন্থ*-সম্পাদক মোহিতচন্দ্রের স্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে; ১৩১০-এর ২৫ শ্রাবণে লেখা চিঠিতে এমনটি ঘটবার একাধিক কারণের কথাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিশেষত একটি কারণে তো তাঁর উত্তরে ভেসে আসে তাঁর গৃহস্মৃতির সেই শেষ মাধুরীর কথা, ফুটে ওঠে মায়ের কোলে চক্রবর্তী সম্রাট খোকাটিকে ঘিরে তাঁর স্মৃতির ছবি; রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

> খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ, সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন 'চক্রবর্ত্তী সম্রাট' ছিল—সেই জন্যে লিখতে গেলেই খোকা আর খোকার মার ভাবটুকুই সূর্য্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এইরকম খেলা খেলচে—তাকে নিবারণ করতে পারিনে।

অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত বেদনা সংহত করে, মৃত্যুপথযাত্রী কন্যার শিয়রে বসে, নিয়ত সৃষ্টিশীল এই মানুষটি নতুন এক 'শিশু' খণ্ডের উৎসাহে লিখে ফেলেছিলেন অনেকগুলি নতুন কবিতা। জীবনের এমন এক প্রতিকূল পর্বে, কন্যার পরিচর্যার মধ্যে লিখে-চলা সেই নতুন কবিতাগুলির মধ্যে রয়ে গিয়েছিল *রাজার বাড়ী, মাস্টারবাবু, প্রশ্ন, সমব্যথী, মাঝি, মাতৃবৎসল, লুকোচুরি, বিজ্ঞ, নৌকাযাত্রা, ছুটির দিনে, চাতুরী, কেন মধুর?, নির্লিপ্ত* প্রভৃতি *শিশুর* পরিচিত কবিতাগুলি।

তবে, *বিদায়* কবিতায় থামবার মতো একটা 'তলা পাওয়া গেল', এখন তিনি নিশ্চিন্তে অন্য কাজে মন দেবেন, মোহিতচন্দ্রকে চিঠিতে এসব কথা লিখলেও, *বিদায়* কবিতাতেই থামতে পারেননি তিনি শেষ অবধি, সম্পাদককে ওই চিঠি লেখবার পরেই লিখেছিলেন *জন্মকথা* নামে *শিশুর* বিখ্যাত কবিতাটি, পরিমার্জনা করেছিলেন আগে লেখা বেশ কয়েকটি কবিতা, আর রানীকে নিয়ে আলমোড়া ছেড়ে ফিরে আসার আগের দিন, ১৩১০-এর ৬ ভাদ্র, লিখলেন—জগৎ পারাবারের তীরে/শিশুরা করে খেলা..., লেখা শেষ করে মোহিতচন্দ্রকে চিঠিতে জানালেন,

> আজ আলমোরা প্রবাসের শেষ দিনে শিশুখণ্ডের কবিতা শেষ করলেম—এইবার বোধ হচ্ছে পজিটিভলি দি লাষ্ট্‌! এই কাগজটায় যে নামহীন কবিতাটা লিখে দিলেম সেইটেই বোধ হয় শিশুখণ্ডের সূচনারূপে ব্যবহার হতে পারে।

আর, বিষয়ের দিক থেকে মানানসই হবে বলে আগেই প্রকাশিত হয়ে-যাওয়া কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচন করে নেওয়া হয়েছিল যে সব কবিতা, তার মধ্যে *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছিল *বিম্ববতী*; *অভিমানিনী*, *ঘুম* আর *স্নেহময়ী* এসেছিল *ছবি ও গান* থেকে; *সাধ* নেওয়া হয়েছিল *প্রভাতসংগীত* থেকে; *মঙ্গলগীত কড়ি ও কোমল* থেকে আর *সুখদুঃখ* নেওয়া হয়েছিল *ক্ষণিকা* থেকে; স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হলেও, *নদী*ও ছিল *শিশুর* কবিতার তালিকায়। 'মুকুল'

'বালক' 'ভারতী' বা 'বঙ্গদর্শন'-এর মতো সাময়িকপত্রের পাতা থেকেও সংকলন করা হয়েছিল *পূজার সাজ*, *কাগজের নৌকা*, *শীতের বিদায়*, *আকুল আহ্বান*, *পরিচয়*, *উপহার*, *অস্তসখী*, *খেলার* মতো কিছু কবিতা। সাময়িকপত্রের এই সব কবিতা অবশ্য অনেক সময়েই প্রকাশ পেয়েছিল ভিন্ন নামে, কখনো কখনো ভিন্ন রূপেও; অগ্রহায়ণ ১২৯১-এর 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত *শরতের শুকতারা* কবিতারই অনেকখানি পরিবর্তিত রূপ যেমন ধরা দিয়েছিল *অস্তসখী* কবিতাটিতে; *পরিচয়* আর *উপহার* নামে শিশুর চেনা কবিতা দু'টিতেও রূপ নিয়েছিল যথাক্রমে 'বালক'-এর ১২৯২ ফাল্গুন আর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত *চিঠি* আর *জন্মদিনের উপহার* কবিতা দু'টিরই পরিবর্তিত রূপ; *খেলা* কবিতাটিও ১৩১০-এর ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ পেয়েছিল *শিশু* নামেই। পরে, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে *শিশু*কে অন্তর্ভুক্ত করবার সময় অবশ্য অন্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি আবার ফিরে গিয়েছিল স্ব স্ব স্থানেই, ফলে *শিশু*র কলেবরে বেশ কিছুটা বদল ঘটে গিয়েছিল রচনাবলীতে।

মোহিতচন্দ্র সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থটির 'শিশু' খণ্ডের সম্পাদনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-মোহিতচন্দ্রের চিঠিপত্র-বিনিময়ের ধারাটি অনুসরণ করলে বোঝা যায়, গ্রন্থ-পরিকল্পনায় কতখানি ভূমিকা ছিল রবীন্দ্রনাথের, কীভাবে বাছাই করা কবিতাগুলি সাজানোর ক্রম স্থির করে দিয়েছিলেন তিনি, আর সেটা স্থির করেছিলেন, নতুন-পুরোনো সব জাতের লেখা মিলিয়ে একটা নির্দিষ্ট ভাবনাকে ভিত্তি করেই। ১৩১০-এর ২৫ শ্রাবণের চিঠিতেই 'শিশুখণ্ডের কবিতাগুলি আপনি যেরকম সাজিয়েছেন তথাস্তু' বলেও, 'কেবল একটি বক্তব্য আছে' বলে মোহিতচন্দ্রের সাজানো কবিতার ক্রমে কিছুটা অদলবদল ঘটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, লিখেছিলেন,

> খোকা নিজের জবানীতে যে কবিতাগুলির নায়ক সেগুলিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া কি চলে? বস্তুত সেটা একই মানুষের চরিত্রচিত্রাবলীর মত—তারা সবগুলো জড়িয়ে একটি খোকাকে প্রকাশ করচে—সে যে কেবল সাধারণ খোকার type মাত্র তা নয়—সে একটি বিশেষ খোকাও বটে—কাজেই এই কবিতাপর্য্যায়ের মাঝে মাঝে অন্য কবিতার প্রবেশ কি অনধিকার প্রবেশ হবে না?

শিশু প্রকাশ পেয়েছিল ১৩১০ বঙ্গাব্দে, আর *শিশু ভোলানাথ* ১৯২২ সালে; উভয়ের জন্ম-ইতিহাসও স্বতন্ত্র। *শিশু ভোলানাথ* যে কেন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার উত্তর কবি একেবারেই অস্পষ্ট রেখে যাননি তাঁর উত্তরকালের পাঠকের কাছে। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকেরা অনেকেই জানেন, 'কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে' আটকা পড়ার অবসন্নতা আর বিতৃষ্ণায় কতখানি জড়িয়ে আছে তাঁর *শিশু ভোলানাথ* লিখতে বসার একটা খুব বড়ো কারণ; *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির* পাঠক যে শুনতে পান,

> আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত।

এই সেই কারণ যে জন্যে কল্পনায় সেই 'শিশুলীলার মধ্যে ডুব' দিলেন তিনি, সাঁতার কাটলেন 'সেই শিশুলীলার তরঙ্গে', 'মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে'।

একটা 'মন-কেমন-করার হাওয়া' মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে ১৯২৪-এর ডায়েরির পাতা জুড়ে লিখে চললেন রবীন্দ্রনাথ,

> একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল তারা বলছে, সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি, বিদায়ের গোধূলি-বেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলি সাঙ্গ করে যেতে হবে। সেইজন্যেই সকালবেলাকার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনীগন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে।

তবে একটা অভিমানী সুরও জড়িয়ে আছে ডায়েরির পাতার পংক্তিতে পংক্তিতে, ১৯২৪-এর ৭ অক্টোবরের *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির* পাতায় খুঁজলেই মেলে, নিমন্ত্রণসভায় যাওয়ার পথে সহযাত্রী এক অপরিচিত যুবকের মুখে কেমনভাবে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 'আজকাল পদ্য আকারে যে সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না', জেনেছিলেন, তাঁর 'কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে'; ডায়েরির পাতায় ধরে রাখা রবীন্দ্রনাথের অভিমানী উচ্চারণ জানিয়েছিল,

> যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তারই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রি-শেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেহিসাবি দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাকবেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ ফস্ করে মারা গেল বলে চিকিৎসাশাস্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়।

তবু এই কথাটা বলতে ভোলেননি সেদিনও,

> কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, কবি হোক, অকবি হোক, কারো সঙ্গে তকরার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন-কি, সেই অবসরে 'শিশু ভোলানাথ'-এর জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তা হলেও মনটা খুশি থাকে।

৩

> এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্য্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

বাংলার চির পুরাতন গভীরতম এই মাতৃস্নেহের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনেছিল একদিন বাঙালি পাঠক, শুনেছিল *ঠাকুরমার ঝুলির* ভূমিকায়, আর শুনতে শুনতে কি তার মনে হয়েছিল, সেই একই স্নেহের আঁচল ছড়ানো রয়েছে রবীন্দ্রনাথেরও *শিশু* আর *শিশু ভোলানাথ* ঘিরেও?

খোকার জগতের যাবতীয় কথা তো তার মা-কে ঘিরেই, তার বেশির ভাগ কবিতাতেই বাবা বোধহয় কাজের সূত্রে থাকেন দূর প্রবাসে, নিষ্ঠুর মনিবের অনুশাসনে পুজোর ছুটি ছাড়া বিশেষ সুযোগ মেলে না তাঁর বাড়িতে রেখে যাওয়া স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্যে আসবার, খানিকটা *সমাপ্তি*-র মৃন্ময়ীর বাবার মতোই হয়তো; খোকা শিশু বটে, তবে কারো চেয়ে এতটুকু কম সংবেদনশীল নয়

তো সে, বাবার চিঠি আসতে দেরি হলে মায়ের উদ্বেগের গুরুত্ব সবটা বোঝে না হয়তো এখনও, তবে মায়ের লুকোনো চোখের জলটুকু আর মনখারাপের মেঘে ঢেকে যাওয়া মুখের বেদনার রেখাটুকু পড়ে ফেলতে পারে কিন্তু সে সহজেই, নইলে কি *ব্যাকুল* কবিতায় এমনি করে মায়ের মনখারাপের ভার মুছে দিতে চেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে জানতে চায় সে, 'অমন করে আছিস কেন মা গো', সান্ত্বনা দিয়ে বলতে পারে, ডাকপেয়াদাটা 'ভারি দুষ্টু স্যায়না' বলেই সবার চিঠি ঝুলি থেকে বার করে বিলি করে দিলেও, নিজে পড়বে বলেই কেবল বাবার চিঠিখানাই ঝুলিতে নিয়ে ফিরে চলে যায় সে; আশ্চর্য সমাধান শুনিয়ে মুহূর্তে কৌতুকে উজ্জ্বল করে দিতে পারে মায়ের ছলোছলো চোখ, বলতে পারে, বাবার চিঠি আসেনি বলে এত চিন্তার দরকার কি, এতটুকু ভুল না করে, নিজের ছোট্ট জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে, লাইন কেটে নিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে 'ক খ থেকে মূর্ধন্য ণ' বাবার চিঠি সবটাই তো লিখে ফেলতে পারে সে নিজেই; আর সে-চিঠি হাতে পেতেও কোনো সমস্যাই যে হবে না খোকার মায়ের, তার কারণ তো খোকা বুদ্ধি করে ও-চিঠি ডাকঘরে গিয়ে বাড়ির ঠিকানায় ফেলবেই না মোটে, সগর্বে বলে সে, 'আপনি নিয়ে/ যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে', কেননা, বাবা জানেন না, কিন্তু খোকা তো জানে, 'ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে।' খোকার লেখা 'বাবার চিঠি' পড়িয়ে মা-কে খুশি করে দেওয়ার এই আশ্চর্য প্রতিষেধক আবিষ্কারের মুহূর্তে তার আনন্দে গর্বে ভালোবাসায় ঝলোমলো মায়ের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসিমুখে চেয়ে থাকা মুখটি মনে মনে অজস্রবার দেখেননি, এমন কোনো বাঙালি পাঠক আছেন নাকি আজও?

তবে, ব্যতিক্রমী যে-সব বাড়িতে, খোকার বাবাও থেকে যান খোকার বাড়িতেই, আর নিজে বই লেখেন বলে বেশ অনেকটা সময়ই হয়তো কাটান বাড়িতেই, সেইসব ক্ষেত্রে খোকাকে তো তার বাবার ভূমিকার বেশ সমালোচনা করতেই দেখি; *সমালোচক* নামের এই চেনা কবিতাতেই তো, বাবার লেখা বই যে পড়ে কিছুই বোঝা যায় না, এই তো খোকার এক নম্বর অভিযোগ, এমনকি, বাবা যে মা-কে তাঁর নিজের লেখা পড়ে শোনান, সেখানেও খোকার মতোই বাবার লেখা মা-ও কিছুই বোঝেন না বলেই খোকার ধারণা; তবে তার চেয়েও বড়ো এক অভিযোগ আছে খোকার, সে অভিযোগ পারিবারিক দণ্ডবিধিতে দ্বৈত মানদণ্ডের। চোখের সামনে রোজ দেখছে না কি খোকা, তার নৌকো করতে কাগজ নেওয়াটাই কেবল সকলের কাছে কাগজ নষ্ট করার মতো অপরাধ, আর বড়ো বড়ো রুলকাটা কাগজ যে আরো অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিদিন নষ্ট করেন বাবা, সেটা কিছুই নয়? তাঁকে তো এজন্য কেউ এতটুকু বকে না? খোকার বিচারবোধের এত সহজ আর এই অসামান্য যুক্তিটাই কি বোঝে বিশ্বজগতের কেউ, ভেবে দেখে একবারও,

> সাদা কাগজ কালো
> করলে বুঝি ভালো?

তবে, বাবা কাছে থাকুন বা দূরে, অভিমানে অনুযোগে ভালোবাসায় কিংবা লুকোচুরি খেলার রমণীয়তায়, মা তো আছেনই, আছেন সবটুকু জুড়ে। মা ছাড়া কার কাছে এমন করে সত্যিকার পড়াশুনোর গুরুভার থেকে ছুটি নিয়ে কেবল 'পড়া-পড়া খেলা' করার আর্জি জানানো যায়, এমন নির্ভয়ে, এমন নিঃসঙ্কোচে, যেমনটা শুনি *প্রশ্ন* কবিতায় খোকার মুখে? আর কার কাছেই বা পেশ করা যায় কল্পনার জগৎ উথালপাথাল করা এই যুক্তি,

> রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
> দুপুর বেলা রাত হবে না কেন।

অর্থহীন অভিমানে আর কাকে প্রশ্ন করা যায়, খোকা না হয়ে কুকুরছানা বা টিয়েপাখি হয়ে মায়ের ঘরে এলেও মায়ের এমনই আদর ছায়া হয়ে থাকত তো তার জীবন জুড়ে? অনাদরের মনগড়া এক সম্ভাবনাতেই অথৈ অভিমানে ডুব দিয়ে অভিমানী ঠোঁট ফোলাতে দেরি করে না *সমব্যথী* কবিতার খোকা,

তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে।

সব সময়েই অভিমানে নয়, তবে বনে যাওয়ার ভাবনা যে কতসময়েই মনে এসেছে খোকার। মায়ের মুখে শোনা রামায়ণের গল্পে নিজেকে নায়ক বলে ভাবতে ভাবতেই বোধহয় চোদ্দ বছর বনবাসে কাটানোটা বেশ সহজ কাজ বলেই মনে হয়েছে তার। চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়, তার অঙ্ক শেখেনি এখনো *বনবাস* কবিতার খোকা, তাই ঠিক কতদিনের বনবাস সে-খবরটা জানা গেল না বলে খুব বেশি অভাববোধ নেই তার, যেটুকু অভাববোধ আছে তা কেবল ওই লক্ষ্মণ ভাইটির জন্য, খেলার সঙ্গীটির জন্য।

নিজেকে নায়ক ভাববার এই যে অভ্যেসটা তৈরি হয়েছে খোকার, সে কি কেবল রামায়ণের গল্পে ডুব দিয়েই? পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যাওয়া রূপকথার নায়কটি ঘুমিয়ে নেই তার বুকের গভীরে? মায়ের কথার তালে তালে যে পেরিয়ে যায় কত দূরের যে পথ, ‘যত তুমি ভাবতে পারো, তার চেয়ে সে অনেক আরো’, জয় করে আনে সাত রাজার ধন এক মানিক, আনে সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি ছোঁয়া এক রাজকন্যা।

রাজকন্যা? রাজকন্যার স্বপ্ন দেখে নাকি এই আধুনিক রাজপুত্তুর? *দুঃখহারী* কবিতায় মায়ের দুঃখভার হরণ করতে চায় যে খোকা, সে তো দেশান্তর থেকে দু'হাত ভরে জিনিস আনে মায়ের জন্যে, সোনামতী নদীতীরের সোনার চাঁপা কুড়িয়ে আনে, আনে সাগরপারের মুক্তো, দাদার জন্য নিয়ে আসে মেঘে-ওড়া পক্ষিরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া, বাবার জন্যে কনকলতার অনেকগুলি চারা, মায়ের জন্যে সাত রাজার ধন জোড়া মানিক; আর নিজের জন্য? এইখানে সে চুপ। লক্ষ্মণ ভাইয়ের জন্যে যে কবিতায় কাতর দেখি খোকাকে, সেখানেও তো নিশ্চিন্ততা তার একটাই, ‘রাবণ আমার কী করবে মা, নেই তো আমার সীতা।’ এইটাই তবে সেই কারণ, যেজন্য *ছোটোবড়ো* কবিতায় দিদিমা প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? বাদ দিয়েছিলেন অবশ্য সম্পাদক মোহিতচন্দ্রের পরামর্শেই, ১৩১০-এর ৩২ শ্রাবণের চিঠিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন মোহিতচন্দ্র,

> এই ... কবিতাটিতে গুরুমহাশয় ও দিদিমা সম্বন্ধে যে উক্তি দুটি আছে—সে দুটি মনে হচ্ছে না থাকলেও চলে—খোকার ‘বাবার মত বড়’ হওয়াই সাজে ‘জ্যাঠার মত বড়’ হলে কি তেমন হয়?

মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে একমত হয়ে ৩ ভাদ্রের চিঠিতেই জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ‘‘ছোটোবড়ো’’ কবিতার গুরুমহাশয় ও দিদিমা সংক্রান্ত দুটো শ্লোক পরিত্যাগ করবেন’, তবে আমরা পাঠকেরা সকলেই জানি, গুরুমশায়ের সেলেট এনে পড়তে বসতে বলার ধমকের বিপরীতে কাঁচুমাচু হয়ে ‘বাবুমশায়, আসি এখন তবে’-র কৌতুকছবিটি রয়েই গেছে ও কবিতায়, বাদ পড়েছে কেবল দিদিমাকে ঘিরে এই শ্লোকটিই,

দিদিমা রোজ বলেন মিছিমিছি
"খোকার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক।"
মা শুনে কয় "আগে আমার খোকা
তোমার মতন বড় হয়ে নিক্।"
বড় হব যত শীগগির পারি
হাঁকিয়ে আসব জুড়িঘোড়ার গাড়ি,
বাজবে সানাই জ্বলবে মোমের বাতি,
উঠোনেতে লোক হবে ঢের জড়।
তখন এসে বলব দিদিমাকে
"তোমার চেয়ে আজ হয়েছি বড়।"
তখন মা আর কেমন করে ক'বে
"বড় হলে খোকার বিয়ে হবে!"

মোহিতচন্দ্রের দাবি মেনে নিতে দেরি করেননি রবীন্দ্রনাথ, তাই আমরা *ছোটোবড়ো* কবিতায় খোকার বাবার মতো বড়ো হয়ে ওঠা অন্য আচরণগুলোর সঙ্গে তার এই জুড়িঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে, সানাই বাজিয়ে, মোমের বাতি জ্বালিয়ে, উঠোনে অনেক লোক জড়ো করে জাঁকজমকের আয়োজনে বিবাহবাসনাটিকে ঠিক মিলিয়ে নিতে পারি না। কিন্তু, মাঝে মাঝে একটা জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়ে যায়, রাজকন্যা-পুরস্কারের একটা স্বপ্ন যদি কখনো দেখেই বসে খোকা, সে কি সত্যিই তার পক্ষে বড়ো বেশি বেমানান, জ্যাঠার মতো বড়ো হয়ে ওঠার পাকামি? *জীবনস্মৃতির* পাতা খুলে এ-কবিতার স্রষ্টার দিকে চেয়ে যে কান পেতে শুনে নিয়েছি আমরা কবেই,

> এই শিশুকালের আর একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুয্যে তাহার নাম।...
>
> সেই কৈলাস মুখুয্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত।...

যদিও বালকের মনের এমন করে মেতে ওঠার কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এর পরে বলেছেন দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা আর ছন্দের দোলার ভূমিকার কথাই, তবে ভবিতব্যতার কোল আলো করে জেগে থাকা সেই ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের উজ্জ্বল আশাটিও মিথ্যে হয়ে যায়নি তো তবু!

৪

> আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে—তার একটি প্রধান কারণ এই—যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের অতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল— খুকীর চিত্ত তার কাছে এত সুস্পষ্ট নয়।

১৩১০ বঙ্গাব্দের ২৫ শ্রাবণে মোহিতচন্দ্রকে লেখা এই চিঠিটিতে কেবলই খোকার নামে কবিতা রচনার আর এক ধরনের কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর এই কৈফিয়তেই কবিতাগুলির জন্মকথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের অতি প্রাচীন খোকাজন্মের নিভৃত ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথের খোকাজন্মের এই নিভৃত ইতিহাসটির দিকে চেয়ে আজকের কোন্ পাঠকের আর মনে পড়বে না রবীন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গিনী ইরাবতীর রহস্যময় হাসিতে উদ্ভাসিত মুখখানি আর *রাজার বাড়ি* কবিতার এইসব পংক্তি,

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো;
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।

আজকের সেই পাঠকেরই তো এ-ও মনে পড়বে যে, রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর পুত্র সত্যপ্রসাদ যেমন বাল্যসঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের, অপর্যাপ্ত কল্পনার ভাণ্ডার নিয়ে শান্তিনিকেতন বিষয়ে অজস্র উদ্ভট কাল্পনিক ধারণা দিয়ে গিয়েছিলেন বালক রবিকে; তেমনি তাঁর বোন ইরাবতীর কল্পনাসাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রয়োজন ছিল না এমনকি শান্তিনিকেতনের খোলা পটেরও, একটা আস্ত রাজার বাড়ির সাতমহলা কোঠার ঐশ্বর্য গড়ে তোলার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়ির রহস্যমাখা আলো-আঁধারি অন্দরটাই যথেষ্ট ছিল তার কাছে। *জীবনস্মৃতির* সাক্ষ্য তো মনে পড়বেই পাঠকের, মনে পড়ে যাবে রবীন্দ্রনাথের এই বয়ান,

> বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, ''আজ সেখানে গিয়াছিলাম।'' কিন্তু, একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত, সেটা অত্যন্ত কাছে; একতলায় বা দোতলায় কোনো একটা জায়গায়; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ''রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে।'' সে বলিয়াছে, ''না, এই বাড়ির মধ্যেই।'' আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়! রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকুমাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

আর তারপর, ইরাবতীর মতোই আলো ঝলকানো মুখের নিশ্চয়তাসূচক এই কথাগুলিও কি আর শুনে নেবে না সে-পাঠকটি, জেনে নেবে না কোথায় সেই রাজার বাড়ি, কোথায় রাজকন্যার ঘুমের নিশ্চিন্ত আসনখানি পাতা, আর কোথায়ই বা নাপিতপাড়া, শুনবে সে মায়ের বিশ্বস্ত শ্রবণে খোকা যখন পৌঁছে দিতে থাকবে এ-সব খবর, জানাবে, এসবই সে খুঁজে পেয়েছে সেখানেই,

ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

কিন্তু কেন, কেবল ইরাবতীর ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হবে কেন বালকটিকে, তার হাতের নাগালে জোড়াসাঁকোর মস্ত বাড়িতে খাতাঞ্চিখানার বারান্দার এক কোণে নেই কি একটা বাতিল পুরোনো পালকি, যে 'পাল্কির ভিতরকার দিনটা ঘন্টার হিসাব মানে না', যাকে দেখতে দেখতে ও বাড়ির একলা এক বালকের মনে হয়, 'ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ', আর সে নিজে 'ছুটির দিনের

রবিন্‌সন্‌ক্রুশো', বসে আছে 'বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে'? *ছেলেবেলার* পাতায় পাতায় ছড়িয়ে নেই কি রবি নামে কল্পনাপ্রবণ ওই বালকটির একলা মানস-ভ্রমণের এমন সব বিবরণ,

> একলা বসে আছি। চলেছে বনের মধ্যে আমার অচল পাল্কি, হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পাল্কি দূরে দূরে দেশে দেশে, সেসব দেশের বই-পড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনও বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে, গা করছে ছম্ ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম্! ব্যাস্, সব চুপ। তার পরে এক সময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি; ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্-ছপ্ ছপ্-ছপ্। ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে 'সামাল সামাল, ঝড় উঠল।' হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। একলা ওই বালকের মানসভ্রমণের এমনি সব ছবিও কি রূপ নেয়নি তার কবিতার বর্ণমালাতেও? পালকির এই চলনে কি দুলে উঠছে না জোড়াসাঁকোর শাসনে বন্দী সেই বালকটির একলা দুপুরের নির্জন কল্পনার মুহূর্তগুলিই,

> আমি একলা,
> এইটুকু সীমানার অসীমে আমি একেশ্বর।
> মনে মনে চলেছে সেই পালকি—
> বাহক নেই, পথ নেই
> দিনরাতের চিহ্ন-হীন অবকাশে।
> বালকের ইচ্ছাভ্রমণের বাহন ঐ পালকি,
> ও তার গল্পের জগতের অচল গতির পক্ষিরাজ।

রবীন্দ্রনাথের এই নিজস্ব ছেলেবেলাই তো জেগে উঠছে *শিশুর* পুরোনো বট-এর মতো কবিতাতেও, *জীবনস্মৃতির* সাক্ষ্যই মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে বাহিরবাড়ির দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে জানলার ধারে কাটানো বালক রবির দিনের পরে দিন,

> জানালার নিচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—
>
> নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
> ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

এই নিজস্ব ছেলেবেলা, এই ছোটো ছেলেটিই তো নতুন রূপ নিয়েছে ছেলেদের জন্য ছড়ার ছন্দ

লিখতে বসে, ছবির পাশাপাশি যেখানে ধরা দিয়েছে ছড়ার রূপ, ধ্বনির সুর; *ছড়ার ছবি* নামে সে-বইয়ের বালক, *আকাশ* বা *আতার বিচির* মতো কবিতাতেও তো আঁকা হয়ে গেছে অনুভূতিময় এক বালকের ছোটোবেলার টুকরো টুকরো কিছু মুহূর্তের মায়া। লালপেড়ে শাড়িতে মুখখানি ঘের-দেওয়া বৌদিদির আশেপাশে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় যে মন, চাবির গোছা লুকিয়ে রেখে 'স্নেহের রাগে রাগিয়ে' দেয় তাঁকে নানা উপদ্রবে, সেই কাঁচা বয়সের মনটিকেই তো ধরে রেখেছে *বালক* নামের কবিতাটি, আর ঘরের কোণে আতার বিচি পুঁতলে ন'বছর বয়সে কী নির্মমভাবে বুঝে নিতে হয় 'মূর্খ আমি ছেলেমানুষ', সত্য কথাই সে তো, *জীবনস্মৃতির* পাশাপাশি *আতার বিচি* কবিতাতেও ধরা রয়েছে তারই পরিচয়। কিন্তু এই নিতান্ত ছেলেমানুষ ছেলেটি নয়, ওই একলা বালকেরই আর একটি পরিচয় উঁকি দিয়ে যায় *আকাশ* কবিতায়, যখন সে বলে,

শিশুকালের থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।
দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা
কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা;
তাই সুদূরের পিপাসাতে
অতৃপ্ত মন তপ্ত ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে,
চুরি করতেম আকাশভরা সোনার বরন ছুটি,
নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি।
দুপুর রৌদ্রে সুদূর শূন্যে আর কোনো নেই পাখি,
কেবল একটি সঙ্গীবিহীন চিল উড়ে যায় ডাকি,
নীল অদৃশ্যপানে;
আকাশপ্রিয় পাখি ওকে আমার হৃদয় জানে।...

ছড়ার ছবির আকাশ নামে এই কবিতায় বালকটির ভরদুপুরের নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই মনে হয়, এই আকাশ এই প্রকৃতির রাজ্যই বড়ো নিবিড় হয়ে উঠে ধরা দিয়েছে না *শিশু ভোলানাথের* ছোটো ছেলেটির জগতে? এ-কথার মানে কি তবে *শিশুর* মতো ছোটোদের যুক্তিক্রমে সাজানো বিষয় নিয়ে কথা বলবার মতো কোনো কবিতাই নেই *শিশু ভোলানাথেও*, আছেই তো তেমন কত কবিতাও, যে সব কবিতা বুঝিয়ে দেয়, আমাদের খোকাটি 'কেবল সাধারণ খোকার type মাত্র'ই নয়, 'সে একটি বিশেষ খোকাও বটে'; *পুতুল ভাঙাকে* কি বলব না তেমন কবিতা, যেখানে 'সাত আটটে সাতাশ' বলে ফেলার বিড়ম্বনা আর রথের দিনে মায়ের কিনে দেওয়া পাঁচ পয়সার রঙিন পুতুলের আছড়ে ভেঙে ফেলার শাস্তি ঘিরে জ্বলজ্বল করে উঠতে থাকে সেই খোকাটির মুখ, মায়ের নিজের হাতে কিনে দেওয়া পুতুল হারানোর শোক যাকে খুবই বেজেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু, তার চেয়েও সে অনেক বেশি কৌতূহলী, এই শাস্তিটাই তার দণ্ডদাতা গুরুমশাইকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় কিনা, সেইটাই জেনে নিতে, আর তাই তো গুরুমশাইয়েরও গুরু আছেন কিনা, খোকা এক্ষুনিই তাঁর কাছে গুরুমশাইয়ের নামে নালিশ করতে পারে কিনা, এসব জরুরি কথা এখনই মায়ের কাছে জেনে নিতে হয় খোকাকে, কারণ তার প্রশ্নের আড়ালে আড়ালে এইরকম একটা প্রত্যয়ও তো মিশেই থাকে যে, যত বড়ো আর যত নিষ্ঠুরই হোক এমনকি গুরুমশাইয়ের মতো কোনো মানুষও, পুতুল ছাড়া কি

তাঁরও চলে সত্যি? খোকা তাই জগতের সব বড়োদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার মতো প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করে বসে তার মাকেই,

কোনোরকম খেলার পুতুল
নেই কি মা, ওঁর ঘরে?
সত্যি কি ওঁর একটুও মন
নেই পুতুলের পরে?
সকাল-সাঁজে তাদের নিয়ে
করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেন নি কি
কোনোরকম হেলা?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে,
বল্ দেখি মা, ওঁর মনে তা
কেমনতরো লাগে?

এমন এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় যাওয়া খোকার কাছে সোম মঙ্গল বুধ—এইসব বারগুলো যে প্রিয় হতে পারে না, তা তো বলে দেওয়া চলে প্রায় বিনা আয়াসেই, সোম মঙ্গল বুধবারের মুখগুলো কেন যে তার 'হাঁড়ি'র মতো লাগে এমন, আর তারই পাশাপাশি রবিবারের মুখটা এমন আলো-ঝলমল হাসিখুশি, বুঝে নেওয়া কঠিন নয় সেটাও, সোম মঙ্গল বুধেদের বাড়িতে বুঝি বা হাওয়াগাড়ি আছে, তাই তাদের আসতে দেরি হয় না এতটুকু, আর রবিবারের বেলায়, পাওনা ঘন্টাগুলোও এমন দ্রুত তালে চলতে থাকে, 'ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন/আধ ঘন্টার পরে', খোকার এ ছেলেমানুষি যুক্তিও অসুবিধে হয় না বুঝতে, কিন্তু খোকার সব ক্ষোভ সব যুক্তি সব জিজ্ঞাসাকে স্নিগ্ধতায় ধুইয়ে দেয় রবিবারকে ঘিরে ঘিরে এ কবিতার একটিমাত্র পুনরাবৃত্ত চরণ,

সে বুঝি মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে?

মায়ের সঙ্গে মান-অভিমানের খেলা তো আর ফুরোবার নয় খোকার, তাই *দুষ্টু* কবিতা থেকে উঁকি দিতে থাকে খোকার ঠোঁট ফোলানো অভিমানী বয়ান,

তোমার কাছে আমিই দুষ্টু
ভালো যে আর সবাই!

মিত্তিরদের কালু নীলু, যতীশ সতীশ, ন্যাড়া নবীন, মাখনবাবুর ছেলেরা, পাঁচকড়ি ঘোষ, দত্তপাড়ার গবাই—অভিমানী উচ্চারণে এই সমস্ত খেলার সাথীদের নাম করে ফেলার পরে খোকা জানতে চায়, মায়ের চোখে এরা সবাই না হয় খোকার চেয়ে ভালো, তবু তো থেকেই যায় খোকার প্রশ্ন,

বাবা আমার চেয়ে ভালো?
সত্যি বলো তুমি,
তোমার কাছে করেননি কি
একটুও দুষ্টুমি?

যা বল সব শোনেন তিনি
কিছু ভোলেন নাকো?
খেলা ছেড়ে আসেন চলে
যেমনি তুমি ডাকো?

এত অভিমান বুকে নিয়েও, মায়ের কাছে আর সব্বাই খোকার চেয়ে ভালো হয়ে উঠবে, এমন আশঙ্কার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, তবু তো 'মুর্খু' তো থেকে যেতে চায় খোকা, তার যে সংকল্প, অম্বিকে গোঁসাই হবে না সে, হবে না পণ্ডিতমশাই; খোকার মতো এমন করে আর কে জানে, 'মুর্খু হয়ে রইব তবে?/আমার তাতে কীই বা হবে,/মুর্খু যারা তাদেরি তো/সমস্তক্ষণ ছুটি।' এমনি ছুটির নিশ্চিত খবর জানা আছে বলেই না খোকা এখন বেরিয়ে পড়তে পারে পথেবিপথে, *শিশু ভোলানাথের* কবিতার পর কবিতা জুড়ে তার দূরে কোথায় দূরে দূরে চলে যাওয়ার, কত দূরে চলে যেতে চাওয়ার কত গল্পই শোনা যায় তাই এখন, কতদূরে গিয়েছিল তার বিবরণ দেওয়ার বাসনা ঝরে পড়তে থাকে কত কবিতা জুড়ে,

আজকে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চলে।
যত তুমি ভাবতে পার
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।

তাই, *শিশু ভোলানাথের* অনেকগুলো পাতা জুড়ে খোকার শৈশবলীলার অনেক কবিতারই উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু *শিশু ভোলানাথের* পাতার পরে পাতায় এগিয়ে চলতে চলতে কেবলই মনে হতে থাকে, *গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি* পেরিয়ে, *বলাকা-পলাতকার* পালা সাঙ্গ করে যে খোকা এসে পৌঁছেছে এতটা দূর, সে-খোকা যেন বড়ো হয়ে গেছে একটু, *শিশুর* খোকাটির চেয়ে বেশ একটু বেড়েই গেছে তার বয়স, তার নবীন সতেজ উজ্জ্বল চোখ দু'টো তাকাতে শিখেছে বাইরে, চিনতে শিখেছে প্রকৃতির প্রসন্ন অভ্যর্থনা।

তাই এমনকি মায়ের সঙ্গে বাণীবিনিময়ের ভাষাও তার বদলে গেছে এমনটা, মা আর খোকার একান্তের সে-রাজ্যের সেই বিনিময়েও এখন লেগেছে প্রকৃতিরাজ্যের সুর, *শিশুর* কবিতাতেও মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে বলে কি দুষ্টুমি করে চাঁপার গাছে একটি চাঁপার ফুল হয়েই ফুটে উঠতে চায়নি খোকা, সেই চাঁপাফুলের জীবনকথাতেও তো কল্পনার রসদ কিছু কম ছিল না তার, কিন্তু সেসব কল্পনার যা কিছু সবই ছিল কেবল খোকারই পক্ষে, মা-টি তো তার ছিলেন মানবী মা-ই, বিকেলে ফুলের খেলা সেরে টুপ করে ভুঁয়ে ঝরে পড়ে আবার মায়ের খোকা হয়ে ফিরে এসেই সাঙ্গ হয়ে যেতে পারত খোকার মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার স্বপ্ন-সাধ। আর, *শিশু ভোলানাথের* এই পর্বে এসে দেখি নিজেকে কেবল চাঁপার গাছ বলেই ভাবতে চাইছে না খোকা এখন, মা-কে সে এখন বলতে চাইছে, 'মা তুই যদি আকাশ হতিস্'....। মা যদি তার আকাশ হয়, তবে এমন এক বিনি কথার বিনিময় সম্ভব হবে মা আর খোকার মাঝখানে, যে বিনিময়ের পালা কিছুতেই সম্ভব ছিল না *লুকোচুরির* কালে, তখন যে আলাদাই রয়ে যেত চাঁপা-হয়ে-ফোটা খোকা আর তার মায়ের জগৎ, আর এখন, খোকা যে বলতে পারছে,

তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।
মা বলে তার সাড়া দেব
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠত তাই।

বাদলদিনের মেঘলা আকাশে তাকিয়ে খোকা তো এখন অনায়াসেই দেখতে পায়, 'আজ যেন ওই জড়োসড়ো/আকাশ জুড়ে মস্ত বড়ো/মন-কেমন-করা।' আর, *বৃষ্টি রৌদ্র* নামের ও-কবিতা থেকে চোখ ফিরিয়ে *ইচ্ছামতী*র দিকে তাকালেই দেখতে পাই, যখন যেমন মনে করে তাই হতে পায় যদি, তবে তো খোকা এক্ষনি হতে চায় ইচ্ছামতী নদী, নিজের দিকে চেয়ে চেয়েই বিভোর হয়ে ভাবতে চায়, 'গাঁয়ের লোকে চিনবে আমার/কেবল একটুখানি/বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে/ আমিই সে কি জানি!' *বাউল* কবিতা জুড়ে বেজে উঠতে থাকে খোকার আকাঙ্ক্ষা,

আর-কিছু না চাই,
যেন আকাশখানা পাই,
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।

আকাশ জুড়ে বৃষ্টি-মেঘের খেলা দেখতে দেখতে আনমনা খোকা কখন ভাবতে বসে *দুই আমি* কবিতায়,

আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা,
একটা সে ওই আকাশ-ওড়া,
আরেকটা এই ভুঁই-খেলা।

তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতির নেশা ছুঁয়ে গেছে বটে একটু-বড়ো-হয়ে-ওঠা *শিশু ভোলানাথের* এই খোকাটিকে, আশ্চর্য এক আশ্বাসও আছে কিন্তু খোকাটির বুকে, যত দূরেই যাই, বুকের মাঝে ধরা আছে যে মায়ের মুখ, তাকে হারিয়ে ফেলার সাধ্য আছে নাকি কারো? *অন্য মা* কবিতায় খোকা কি নিশ্চিত নয়, 'আমার মা না হয়ে, তুমি/আর-কারো মা হলে' তবু মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মা-কেও বলতে সে পারবেই, 'আমায় তোমার চিনতে হবেই, আমি তোমার অবু!' কিংবা, *দূর* কবিতায় খোকা যখন খুঁজে ফিরেছে, 'দূরের সঙ্গে কাছের কেবল/কেনই যে এই লুকোচুরি', তখনই ফিসফিস করে কি সে শুনিয়ে যায়নি ওই আশ্বাসের কথাটিই,

আমায় এরা যেতে বলে,
যদি বা যাই, জানি তবে
দূরকে খুঁজে খুঁজে শেষে
মায়ের কাছেই ফিরতে হবে।

৫

শেষ কথা, কিন্তু শেষের কথা নয় বোধহয়, শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে আমি অধ্যাপনা করছি তখন, ছোটোদের ক্লাসে নিজেই আবিষ্কার করতে শুরু করেছি, *শিশু* আর *শিশু ভোলানাথের* স্রষ্টার কলমের জাদুতে কথার রঙের আর রেখার কী বৈভবে ভরে গিয়েছিল আমাদের ছেলেবেলা, বড়ো হয়ে ওঠা ওই বয়সে বিভোর হয়ে দেখতে শুরু করেছি তখন, 'মেঘের ওপর মেঘ করেছে/রঙের ওপর রঙ'...; বা, 'ওপারেতে মেঘ করেছে/ঝাপসা গাছপালা/এপারেতে মেঘের মাথায়/একশো মানিক জ্বালা'...; কিংবা, ফুলের সারির মাঝে দেখছি ইস্কুলের পুঁথিপত্র-কাঁখে ছেলেমেয়েদের মুখ, আষাঢ় মাসে আঁধার ঘনালে বিকেল হয় যাদের, মেঘের ডাকে সাড়ে চারটে বাজে, আর ছুটির ঘন্টায় পুলকিত হাসিমুখগুলি নিয়ে ছুটে আসে তারা মাটির উপরে...! অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করেছি, পাখি সব করে রব পেরিয়ে এ কী ঐশ্বর্য ছোটোদের কবিতার পাতায় পাতায়, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে-র আকাঙ্ক্ষা ছাপিয়ে, নীতিশাস্ত্রের পাঠ পেরিয়ে কল্পনার কতখানি খোলা আকাশ মেলে দিয়েছেন আমাদের সামনে রবীন্দ্রনাথ, চেনা পয়ারের চলন ছাড়িয়ে দুলিয়ে দিয়ে গেছেন কতরকম ছন্দের দোলায়।

ছোটোদের ক্লাসে বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে আরো কতভাবে যে নিজেরই ছেলেবেলা ফিরে ফিরে জেগে উঠতে শুরু করেছে তখন বুকের মধ্যে, কিন্তু কে জানত ছোটোদের এক ক্লাসের পরিসরে এমন এক গভীর মনকেমনকরা অপেক্ষা করে থাকবে আমার জন্য, লিখতে দিয়েছিলাম সেদিন 'আমার রবীন্দ্রনাথ'; একটা খাতা এসে পৌঁছল, পড়তে শুরু করে থমকে গেল আমার দু'চোখ, লেখা বলব একে, নাকি এ বিন্দু বিন্দু চোখের জল টলটল করছে ছোট্ট কলমের আঁচড়ে! আমার হাতের ওপর মেলে ধরা খাতার খোলা পাতায় স্থির হয়ে আছে এক ছোট্ট মেয়ের একান্ত এই অনুভব,

> রবীন্দ্রনাথ আমায় ভুলিয়ে দিয়েছেন আমি কোনোদিন আমার মা-কে দেখিনি। আমায় জানিয়েছেন, মা-কে দেখিনি কিন্তু আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে গাওয়া মায়ের গানের সুর আছে আমায় ঘিরে, আমার দিকে মায়ের অনিমেষ চেয়ে থাকা ছড়িয়ে আছে সারা আকাশ ছেয়ে। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করেছি তাই 'মনে পড়া' কবিতায় খুঁজে পেয়েছি আমার হারিয়ে ফেলা মা-কে, স্বপ্নে আর কাঁদি না আমি।

খাতা দেখা হলো না আর, কতবার পড়া *শিশু ভোলানাথের* পাতাউল্টোতে বসলাম আবার, মনে পড়ল, *মনে পড়া* নামে এই কবিতাই এক মা-হারা জার্মান কিশোরীকে জার্মান অনুবাদে শুনিয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী, জল ছলছলিয়ে এসেছিল সেই ভিন্‌দেশী ভিন্নভাষী মেয়েরও দু'চোখের কোল ভরে দিয়ে; আমার ছাত্রী ছোটো মেয়েটির চোখ দিয়ে আমি এবার পড়তে শুরু করলাম দেশ-কালের গণ্ডি মুছে দেওয়া, তার নিশীথ রাতের কান্না ভুলিয়ে দেওয়া সেই কবিতা,

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,

মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।...

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে
জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে,
মনে হয় মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের ‘পরে ধরে কবে
দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

কাজ ভুলে, খাতা ছড়িয়ে রেখে, একসময় এলোমেলো উড়তে থাকে কোলের ওপর খোলা বইয়ের পাতা, আনমনা মন আপন খেয়ালে ভাবতে থাকে, এ কার কবিতা, মা-হারা শমী-র? ভৃত্যরাজকতন্ত্রে বেড়ে ওঠা একলা বালক রবির? নিখিল বিশ্বের মা-হারা সমস্ত শিশুর? নাকি এ এক বিশ্বজোড়া মনকেমনের কবিতা? মনের মাঝে গুনগুনিয়ে ওঠে সুর, পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে...।

‘*সোনার তরী*’র দুটি কবিতা : নির্মাণ ও ভাষাশৈলী

অভিজিৎ মজুমদার

বিম্ববতী

রূপকথা

সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল করবী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনকদর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধাইল তারে—কহো মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

২

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপি অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।
সুবর্ণমুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি—কহো সত্য করে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

৩

তার পরদিনে—আবার রুধিল দ্বার
        শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
        রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—কহো সত্য করি
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।
        উজ্জ্বল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
        রানী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
        ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

৪

তার পরদিনে—আবার সাজিল সুখে
        নব অলংকারে; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা,
        পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি—সত্য কহো মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
        সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি
        মোহনমুকুরে। রানী কহিল জ্বলিয়া—
        বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

৫

তার পরদিনে রানী কনকরতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল সত্য করে।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি—
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।

চীৎকারি কহিল রানী কর হানি বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

৬

ঘষিতে লাগিল রানী কনকমুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব না হইল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ—
        সর্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে। ভূমে পড়ি তারি পাশে
        কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতিনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

শিলাইদহ, ফাল্গুন, ১২৯৮ [অনুচ্ছেদের সংখ্যাসূচক নিবন্ধকার চিহ্নিত করেছেন]

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

রূপকথা

১

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
        রাজার মেয়ে যেত তথা।
দুজনে দেখা হত পথের মাঝে,
        কে জানে কবেকার কথা।
রাজার মেয়ে দূরে সরে যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে দিত
        ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
        রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
        পাখিরা গান গাহে গাছে।

রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে

উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কী ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে,
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,
আবার পড়ে যায় খসে।
উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর-পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে।

৩

সায়াহ্নে

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে,
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে,
আপন মণিহার মনোভুলে
দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
নদীর তীরে একশেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
যে যার গেল নিজ দেশে।

৪

নিশীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা-হাসি।
করিছে আনাগোনা সুখ-দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্বপনে কেটে যায় রাতি।

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা চৈত্র, ১২৯৮

১.০ প্রস্তাবনা : শৈলী ও শৈলীবিজ্ঞান

বিশ শতক এবং এই সময়ের সাহিত্য সমালোচনায় শৈলীবিজ্ঞান (stylistics) এক অভিনব দিগ্‌দর্শন। শৈলীবিজ্ঞানকে ভাষাবিজ্ঞানেরই (linguistics) এক অন্যতম শাখা বলা যায়। ভাষাবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রকরণ অনুসরণ ক’রে কোনো সাহিত্যকৃতি (text) বা সন্দর্ভের (discourse) শৈলীগত অনুধাবনই হল শৈলীবিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য। শৈলী বলতে কী বুঝি, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে (মজুমদার ২০০৭ : ১২)। সহজ ক’রে বলতে গেলে ‘শৈলী’ (style) লেখকের দ্বারা সচেতনভাবে অথবা তাঁর অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত ভাষাগত উপায় (means), যার সাহায্যে লেখক ও পাঠকের ঈপ্সিত যোগাযোগ সাধন সম্ভব হয় (সরকার ১৯৮১ : ৬১)।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই য়ুরোপ ও মার্কিন দেশে শৈলীবিদ্যার তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক সূচনা ঘটেছিল সুইস্ ভাষাবিজ্ঞানী স্যসুর-এর জেনেভা বক্তৃতামালার ভিত্তিতে, যা ১৯১৬ সালে Cours de linguistique Générale (ইংরেজি অনুবাদে Course in General Linguistics) নামে প্রকাশিত। ভাষাবিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধ চিন্তাধারায় পরবর্তী স্তরে সংযোজিত হয়েছে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান (structural linguistics) এবং নোয়াম চমস্কির ভাবদর্শন। বলা বাহুল্য, এরই সমান্তরাল ধারায় শৈলীবিজ্ঞানের সমৃদ্ধ তত্ত্বাদর্শ গড়ে উঠেছে। আর সে-নির্মাণে সহায়তা করেছেন, চার্লস্ এঙ্কুইস্ট, সেমুর চ্যাটম্যান, পল গারভিন, স্টিফেন উলম্যান, জিওফ্রে লিচ প্রমুখ বিদগ্ধ শৈলীবিদ্।

সাহিত্য সমালোচনার যে ধারা এতকাল ধরে চলে এসেছে, তা সাহিত্যকৃতির ভাববস্তু (theme), আখ্যানের প্লট, চরিত্র এবং সমাজ ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু শৈলীবিজ্ঞান

সমালোচকের এহেন সাহিত্যশৈলী (literary style) বিশ্লেষণে নতুন এক মাত্রার সংযোজন করেছে, আর তা হল রচনার ভাষা। সাহিত্য যে মূলত ভাষাশিল্প (language craft), ভাষার মতো তারও একটা নিজস্ব ব্যাকরণ রয়েছে, এ ধারণাটি একালে নতুনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী যে-কারণে বলেন শৈলীবিজ্ঞান হল—'the branch of linguistic study which is primarily concerned with the integration of language and literature.' (Simpson 1997 : 2)। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সেতুবন্ধ নির্মাণ ক'রে চলে শৈলীবিজ্ঞান। আর এই নির্মাণে ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রকৌশল দুই-ই আমাদের সম্বল।

সাহিত্যের আলোচনায় ভাষা কেন প্রয়োজন, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। আসলে ভাষাশাস্ত্রীদের কাছে সাহিত্য একধরনের বাচিক শিল্প (verbal art)। নান্দনিকতায় সমকক্ষ হলেও নৃত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পের এলাকা থেকে তা স্বতন্ত্র। শিল্পী যখন মূর্তি গড়েন, তখন মূর্তির উপাদান তিনি বদলাতেই পারেন—ব্রোঞ্জ, মাটি অথবা পাথর। এতে শিল্পসুষমার খুব একটা ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে উপাদানের এই বদল সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ভাষা দিয়েই গড়তে হয় সাহিত্যমূর্তি। লেখকের ভাষাবিন্যাসের সামগ্রিক বুনোটেই কেবল ধরা পড়ে রচনার অপরিহার্য উপাদান—রচনার প্লট, চরিত্র কিংবা কাহিনি (Srivastava 1994 : 2)।

শৈলীবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হয়—**প্রথমত**, শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনা কেবল সাহিত্যের অঙ্গনে সীমাবদ্ধ নয়। একেবারে কেজো ভাষায় শৈলীবিচারেরও অবকাশ রয়েছে। ফলে সাহিত্যকৃতির পাশাপাশি বাচনের শৈলীবিচার এই শাস্ত্রালোচনার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত, আধুনিক শৈলীবিদ্যার দুটি স্বতন্ত্র মতধারা—একটি সাহিত্যাশ্রিত শৈলীবিজ্ঞান (literary stylistics), আর অন্যটি ভাষাবিজ্ঞান-আশ্রিত শৈলীবিজ্ঞান (linguistic stylistics)। ফলত, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, আইনের নথি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বক্তৃতামালাও হালে শৈলীবিশ্লেষণের আওতাভুক্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্য বা কাব্য-কবিতার নিছক ব্যাকরণ রচনা করা শৈলীবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যকৃতির শৈলীবিচার মানে কেবল তার ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ নয়। মাইকেল রিফাতেরের সতর্কবাণী প্রসঙ্গত স্মরণ করি—'No grammatical analysis of a poem can give us more than the grammar of the poem.' (1966 : 213)। নিছক রচনার ব্যাকরণ নয়, রচনার যে সকল ভাষিক উপাদান পাঠকের অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, সেগুলির সামগ্রিক অনুধাবনই শৈলীবিজ্ঞানীর বিচার্য—'The relevant poetic structures would comprise only those elements which evoke a reader's response.' (Gargesh 1990 : 75)।

তৃতীয়ত, লেখক কী সর্বদাই সচেতনভাবে নির্মাণ করেন তাঁর ভাষাশৈলী? অনেকসময় তাঁর অজান্তেই কী গড়ে উঠতে থাকে না রচনার ভাষাপ্রকৌশল? সেক্ষেত্রে শৈলীবিদ্ রচনাশৈলীর যে মূল্যায়ন করেন, তা নেহাতই আরোপিত বলে মনে হতে পারে।

আসলে রচনার মূল্যায়নে লেখকের থেকেও পাঠকের গুরুত্ব অনেক প্রবল হয়ে উঠছে আজকের অধুনান্তিক (post-modern) সমালোচনা পদ্ধতিতে। বয়ানের পাঠ পাঠকের অনুভূতিতে কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তাকেই গুরুত্ব দিতে চাই আমরা। প্রথাগত সাহিত্যতত্ত্বে লেখক যেন ছিলেন ঈশ্বর, পাঠক ভক্তকুল, আর সমালোচক পুরোহিত। অধুনান্তিক পাঠক-সংবেদী মূল্যায়নে (reader-sensitive evaluation) লেখকের মৃত্যু ঘটে যায় (Barthes 1977), সমালোচকও তুচ্ছ, থাকে কেবল পাঠ ও পাঠক।

বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের দুটি কবিতা বেছে নিয়েছি আমরা। এ আলোচনা প্রধানত রচনার অণু বিশ্লেষণ (micro-analysis)। লেখকের সামগ্রিক রচনাকর্ম নয়, কেবলমাত্র একটি বয়ান (text) কিংবা বয়ানের একটি পংক্তিও তুলে ধরতে পারে রচয়িতার সৃষ্টিশীল অবচেতন—এমন একটা মতবাদে বিশ্বাসী আমরা।

দ্বিতীয়ত, এ আলোচনা তুলনামূলক শৈলীচর্চার (comparative stylistics) অন্তর্ভুক্ত। দুটি কবিতার ভাষাপ্রকৌশল কোথায় স্বতন্ত্র, কোথায়ই বা সম্পৃক্ত, তার অনুধাবনই আমাদের লক্ষ্য।

তৃতীয়ত, কবিতা দুটির অধিবাচনিক বিশ্লেষণই (discourse analysis) আমাদের উদ্দিষ্ট। নিছক ধ্বনি, শব্দ বা বাক্যের খুঁটিনাটি প্রযুক্তি আলোচ্য নয়। উইডোসন 'Stylistics and the Teaching of Literature' (1975) গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞানের অর্থ বুঝেছিলেন—'Study of literary discourse from a linguistic orientation'। আমাদের উদ্দেশ্যও এখানে তাই।

১.১ 'সোনার তরী'-র দুটি কবিতা

রবীন্দ্র-কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা 'সোনার তরী' কাব্যে। আমাদের আলোচ্য 'সোনার তরী' (বাং ১২৯৮-১৩০০) কাব্যের দুটি কবিতা—'বিম্ববতী' (ফাগুন, ১২৯৮) এবং 'রাজার ছেলে রাজার মেয়ে' (চৈত্র ১২৯৮)। প্রকাশ-সময় থেকে বুঝি, দুটি কবিতাই একই বছরের পরপর দুটি মাসে লেখা। কবিতাগুলির দুটি প্রধান বিশেষত্ব আছে—

প্রথমত, কবিতাগুলিকে বলা যেতে পারে 'পদ্য-গল্প'। কবিতার আঙ্গিকে গল্প বলতে চেয়েছেন কবি। এরকম কবিতায় গল্প তিনি লিখেছেন প্রায় ৯২টি। সম্ভবত, ছোটগল্পকে আদর্শ শিল্পসিদ্ধি দেবার জন্যই কবিতায় ছোটগল্প লেখাটা কেমন দাঁড়ায়, তা দেখতে চাইছিলেন তিনি (গুপ্ত ২০০৭ : ২০)। আরো দেখি, যখন একেবারেই ছোটগল্প লিখছেন না, তখনও কবিতায় গল্প লিখে সে-অভাব পূরণ করতে চাইছেন—যেমন, পুনশ্চ-শ্যামলী পর্ব (১৯৩২-৩৬)। স্মরণে রাখতে পারি, 'সোনার তরী' পর্বেই 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁর মনোরম গল্প লেখার শুরু। 'সোনার তরী' কাব্যে গল্পাশ্রয়ী কবিতা অন্তত আটটি। এর মধ্যে চারটি রূপকথাশ্রয়ী।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য কবিতা দুটি রূপকথাশ্রয়ী। শিরোনামে কবি খুব সচেতনভাবে এদের রূপকথা ব'লে চিহ্নিত করেছেন। অন্য দুটি কবিতা ('নিদ্রিতা' এবং 'সুপ্তোত্থিতা') রূপকথা নামে চিহ্নিত নয় বটে, তবু এরা রূপকথাশ্রিত অবশ্যই।

'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতা দুটির সুস্পষ্ট যোগ আছে। দুয়ে মিলে তারা একটিই কাহিনি। পূর্বোক্ত কবিতা দুটিতে অবশ্য এ যোগ নেই। এদের নির্মাণকৌশলও ভিন্ন—কবিতাগুলির গ্রন্থন ও ভাষাবিন্যাসে তার প্রমাণ রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খেলাচ্ছলে পদ্যে গল্প বলার সূচনা রূপকথা দিয়েই। 'বিম্ববতী' কবিতা এর প্রথম নিদর্শন। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে 'লিপিকা'-র (১৯২২) অনেক রচনাতেই নব-রূপকথা গড়ে তোলার প্রয়াস দেখিয়েছেন কবি।

'বিম্ববতী' কবিতাটি গ্রিমের ফেয়ারি টেলের আধারে রচিত। রাণীর রূপের গর্ব ও ঈর্ষা চরিত্রটির বিষাদ-পরিণতি ঘনিয়ে আনে। এ 'রাণীর রূপ আছে, প্রেম নেই। অহং-এর জিগীষা আছে, আত্মার জিজ্ঞাসা নেই।' (মুখোপাধ্যায়, ১৩৬২ : ২৭)। একই সময়ে লেখা 'সোনার তরী'-র (১২৯৮, ফাগুন) পাশেই যেন এ কবিতার স্থান। তিনটি কবিতায় যেন অহং-এর তিনটি মাত্রা প্রকাশিত—

'সোনার তরী' কবিতায় যেন অহং-এর পরিমাপ, দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ 'বিম্ববতী' কবিতায় অহংসর্বস্বতার পরিণতি। আর আলোচ্য তৃতীয় কবিতায় অহংশূন্যতায় প্রেমের আত্মঘোষণা।

'রাজার ছেলে রাজার মেয়ে' কবিতাটিতে নিটোল রূপকথার গল্প না ব'লে রূপকথার নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে কবি আধুনিক কল্পনার কিছু মুহূর্ত তৈরি করেছেন। কয়েকটি কাব্যিক চিত্রের মধ্য দিয়ে কৈশোরের সাহচর্য পরিণতি পেয়েছে প্রেমের প্রগাঢ় আবেদনে। অবশ্য এ কবিতায় প্রেম এসেছে স্বপ্নের সরণি বেয়ে। তাই আশঙ্কা থেকে যায় স্বপ্ন থেকে জাগরণের, প্রকারান্তরে যা হয়তো প্রেমের বিচ্ছেদেরই ইঙ্গিত।

লক্ষ্য করি, 'সোনার তরী' কাব্যের মূল সুরটি বহন করছে এই দুই কবিতা। 'বিম্ববতী' কবিতায় সৌন্দর্য দেহাতীত, এই দেহোত্তীর্ণ প্রেম ও বিমূর্ত সৌন্দর্যের জয়গান 'সোনার তরী' কাব্যটিতে সার্থক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মানুষ ও প্রকৃতির একাত্মতা, সৃষ্টির অতি তুচ্ছ বস্তুতেও যে অপরিসীম সৌন্দর্যের বিকাশ, তার প্রমাণ দ্বিতীয় কবিতা। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও কাব্যের মূল থিমটির প্রতিফলন ঘটেছে কবিতাটিতে (রায় ১৩৫৩ : ১৫৮)।

১.২ দুই কবিতার তুলনামূলক বিচার

- শিরোনামে দুটি কবিতাই 'রূপকথা' নামে আখ্যাত। তবে দ্বিতীয়টি কবিতায় গড়া নব-রূপকথা। আর প্রথমটিকে বলা যায়, কবিতার ছাঁচে গড়া গদ্যাশ্রয়ী রূপকথা-কাহিনির বিনির্মাণ। আকারের দিক থেকে প্রথমটি দীর্ঘ—ছ'টি স্তবক। দ্বিতীয়টির স্তবক সংখ্যা চার, প্রতিটি স্তবক সংখ্যাসূচকে চিহ্নিত।
- 'বিম্ববতী' কবিতায় নিহিত কাহিনির পরিসমাপ্তি আছে। রাণীর ঈর্ষায় যার সূচনা, মৃত্যুতে চূড়ান্ত পরিণতি। নারীর বহিরঙ্গ রূপসজ্জা আর অন্তর্নিহিত দ্বেষ ও মালিন্যের বৈপরীত্য চূড়ান্ত পর্বে ব্যর্থতায় পর্যবসিত; জয় হয় প্রকৃত প্রেম ও সৌন্দর্যের।

  বিপরীতপক্ষে, দ্বিতীয় কবিতায় এ জটিলতা নেই। এখানে গল্পের আভাস আছে, কিন্তু সমাপ্তি নেই। ফলে আঙ্গিক অনেকটা open structure। সমগ্র কবিতা জুড়ে যেন এক শাশ্বত ঘটনাপ্রবাহের ছবি। বিপ্রতীপ এক কাঠামোয় দুটি চরিত্রকে রেখে পরিণতিতে নব অঙ্কুরিত প্রেমের উদ্ভাস, লক্ষ করা যায়।
- প্রথম কবিতায় অংশগ্রাহী নারী এবং দর্পণ। রাজকন্যা বিম্ববতী ও রাজপুত্রের কেবল পরোক্ষ উল্লেখ। 'বিম্ববতী' সামনে নেই, নেই বর্ণনায় বা ক্রিয়ায়। মুকুরে প্রতিফলিত নীরব হাস্যে সে তার বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছে। নামকরণেও সে 'বিম্ব'-বতী। দর্পণের বিম্বেই তার পরিচয়। দ্বিতীয় কবিতায় চরিত্র দুটি—রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে। যদিও পূর্বোক্ত কবিতার রাণীর মতো সক্রিয়তা নেই তাদের।
- প্রথম কবিতায় দুটি চরিত্র একে অন্যের প্রতিস্পর্ধী। তাদের মধ্যে দেখি, সৌন্দর্যের এক অসম প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় কবিতায় এ প্রতিযোগিতা নেই, বরং প্রেমের প্রথম স্পর্শে চরিত্র দুটি একে অন্যের পরিপূরক। প্রথম কবিতায় নারী অধিকারবোধে প্রবল হয়ে উঠতে চায়, আর দ্বিতীয়টিতে শর্তহীন আনুগত্য প্রেমকে করে তোলে শাশ্বত এবং অলৌকিক।
- দ্বিতীয় কবিতাটি অনুষঙ্গ (setting) অনুসারে বিভাজিত। প্রতিটি স্তবক দিনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তারিত। যেন একই দিনের মধ্যে গ্রথিত সমস্ত কাহিনি। আরও লক্ষণীয়, দিনের বিভিন্ন পর্যায়

সমগ্র কবিতায় বৈপরীত্যমূলক বর্ণনায় সজ্জিত। পাশাপাশি এই বিপ্রতীপতার প্রেক্ষাপটেই মানুষ এবং প্রকৃতিকে একসূত্রে বেঁধেছেন কবি।

বিপরীতপক্ষে, দ্বিতীয় কবিতায় প্রত্যেক স্তবক এক একটি দিনে বিস্তারিত। কেবল রাণীর রূপসজ্জার বৈচিত্র্য প্রতিবেশের বিভিন্নতা তৈরি ক'রে দেয়।

- 'রাজার ছেলে রাজার মেয়ে' কবিতাটির অধিবাচন বিবৃতিধর্মী (narrative discourse)—বিবরণই এখানে প্রধান। কিন্তু 'বিম্ববতী' কবিতাটি মিশ্র অধিবাচনের (mixed discourse) নমুনা। বিবরণের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ উক্তির সংমিশ্রণ অধিবাচনকে সংলাপধর্মী করে তুলেছে।

১.৩ রূপকথার আঙ্গিকে দুটি কবিতা

পুরুষ-পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক কাহিনিকে বলে লোককথা (folktale)। লোককথার একটি অন্যতম বিভাগ হল রূপকথা (fairy tale)। বলা বাহুল্য, ইংরেজি fairy tales-এর যথার্থ অনুবাদ 'রূপকথা' নয়। কারণ নির্ভেজাল পরীকথা হিসেবে বাঙলা রূপকথাকে চিহ্নিত করা যায় না। বরং আমাদের রূপকথাকে জার্মান marchen-এর প্রতিশব্দ বলা যেতে পারে। রূপকথা তথা marchen-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ্ Thompson বলেছেন—marchen একধরনের কাহিনি যার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে, আছে মটিফ (motif) বা অনুকাহিনির পরম্পরা। এই কাহিনির ঘটনা ঘটে অবাস্তব বিশ্বে—যে পৃথিবীতে না আছে নির্দিষ্ট স্থান-চরিত্র, তাছাড়াও অতি-অদ্ভুত ব্যাপারে তা থাকবে পরিপূর্ণ (হাফিজ ১৯৭৬ : ৬, দ্র. Thompson 1956)।

আমাদের আলোচ্য কবিতা দুটি কতটা রূপকথার আঙ্গিক অনুসারী—এ প্রশ্ন তোলা খুবই সঙ্গত। রূপকথার অঙ্গসজ্জা বিচার করলে এর একটা যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলতে পারে।

- কাহিনি (episode) : রূপকথার কাহিনি অন্যান্য লোককথার তুলনায় জটিল, নাটকীয় এবং চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ। আঙ্গিকের নমনীয়তা রয়েছে। ফলে কথক ইচ্ছে করলে কাহিনিকে দীর্ঘায়িত করতে পারেন।

  'বিম্ববতী'-র কাহিনি এদিক থেকে কিছুটা জটিল ও নাটকীয়। আঙ্গিকের দীর্ঘায়িত হবার সুযোগ রয়েছে। বিপরীতপক্ষে, দ্বিতীয় কবিতায় নাটকীয়তা ও জটিলতার অভাব। বিশেষ কয়েকটি পর্যায়ে বাঁধা ব'লে কবিতাটির দীর্ঘ হয়ে ওঠার অবকাশও সেরকম নেই।

- অধিবাচন (discourse orientation) : রূপকথার বাচনরীতি সংলাপধর্মী। মানুষ ও প্রাণী-অপ্রাণীর কথনের সম্ভাবনা রয়েছে। সংলাপ গদ্যধর্মী হলেও ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি লোকায়ত উপকরণের অনুপ্রবেশের সুযোগ রয়েছে।

  'বিম্ববতী' সংলাপধর্মিতার পরিচয় বহন করে। দর্পণ ও রাণীর সংলাপ লক্ষণীয়—যদিও সংলাপ এখানে খানিকটা স্বগতোক্তির (monologue) মতো। কিন্তু 'রাজার ছেলে...' কবিতাটি বর্ণনা-প্রধান, সংলাপের উদ্যোগ নেই এখানে।

- বিষয়বস্তু (theme) : প্রেম, দুর্জয় জীবনীশক্তি, নিয়তি-তাড়িত ভাগ্যবিড়ম্বনা এবং ক্ষুদ্র ও অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি রূপকথার প্রধান উপজীব্য।

  'বিম্ববতী' মৃত্যুঞ্জয় প্রেম ও রাণীর ভাগ্যবিড়ম্বনার কাহিনি। আরও দেখি, প্রান্তিক চরিত্র 'সতিনের

মেয়ে' কেন্দ্রিক-চরিত্র হয়ে উঠে এখানে রাণীর আধিপত্য খর্ব করেছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় কবিতায় অস্ফুট প্রেমই কেবল সম্বল। রূপকথার বিশেষ কোনো উপকরণও নজরে পড়ে না।

- চরিত্র : রূপকথার চরিত্র নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক। নাম থাকলেও তা বিমূর্তধর্মী। চরিত্রগুলো type character; flat ও বিপরীতধর্মী—ভাল নয়তো মন্দ।

  নৈর্ব্যক্তিকতার দিক থেকে দ্বিতীয় কবিতাটি রূপকথার কাছাকাছি। নামকরণ নির্বিশেষ, তবে রূপকথার ছোঁয়া রয়েছে। অবশ্য type চরিত্রের ব্যাপারটা প্রথম কবিতায় স্পষ্ট। যদিও প্রথম কবিতার নামকরণ তুলনায় নির্বিশেষ নয়।

- দেশ ও কালগত লক্ষণ : রূপকথার প্রেক্ষাপট ও কালিক পরিসীমা নির্বিশেষ। ঐতিহাসিক বিচারে রূপকথার উৎসমূলে আদিম সমাজের প্রতিফলন। রূপকথার সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। তাই রাজকন্যা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়। রাজা-রাণী-রাজপুত্রের কথায় ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিফলন। রাজা সাধারণত বহুপত্নীক—যা সাধারণত আদিম সমাজের কৌম প্রথার প্রতিফলন। প্রাচীনত্বের আরো প্রমাণ—অতিলৌকিকতা এবং প্রথাগত বিশ্বাস।

  দুটি কবিতাতেই প্রেক্ষাপট নির্বিশেষ। প্রথমটিতে নারীর প্রাধান্য, আর দ্বিতীয়টিতেও পুরুষ প্রেমে নারীরই অনুগত। বহুপত্নীক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব প্রথম কবিতায় কেবল প্রতিফলিত। তেমনি দ্বিতীয় কবিতায় অলৌকিক প্রসঙ্গ না থাকলেও প্রথমটিতে দর্পণের উদ্দেশে রাণীর সংলাপে অতিলৌকিকতার প্রসঙ্গটি উপস্থিত।

- কাহিনি সংগঠন : রূপকথার একটি বিশেষ কাহিনিবৃত্ত ও সুনির্দিষ্ট অবয়ব রয়েছে। ফিন্‌ল্যান্ডের লোকবিজ্ঞানী এন্টি আর্নে যে-কারণে বলেছেন—'every single tale or story has particular plot and its unified composition.' ডেনমার্কের লোকবিজ্ঞানী অ্যাক্সেল ওল্‌রিক বিভিন্ন দেশে প্রচলিত লোককাহিনির সংগঠনের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন (1965:131)। এগুলিকে তিনি কয়েকটি অনন্য সূত্রের (epic law) সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। আলোচ্য কবিতা দুটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে—

১. কাহিনির আরম্ভ ও সমাপ্তির সূত্র (Law of opening and closing): কাহিনির সূচনা রূপকথার ক্ষেত্রে কোনো দুষ্কর্ম দিয়ে বা অভাববোধ থেকে, আর সমাপ্তি দুষ্কর্মের শাস্তিপ্রদানে এবং অভাববোধের নিরসনে। 'বিম্ববতী' কবিতায় এই প্যাটার্ন রক্ষিত। সৌন্দর্যের অভাববোধ থেকে রাণীর দুষ্কর্মের সূত্রপাত, রাণীর মৃত্যুতে তার নিরসন। যদিও দ্বিতীয় কবিতায় এই সূত্র প্রযোজ্য নয়।

২. পুনরাবৃত্তির সূত্র (Law of repetition): যেমন, রাজপুত্রের অনুসন্ধান যাত্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—'কিরণমালা' গল্পে রাজার দু'বার মৃগয়া যাত্রা, রাণীর একাধিকবার গর্ভধারণ ইত্যাদি।

   'বিম্ববতী' কবিতায় রাণীর বারবার রূপসজ্জা এবং একই প্রশ্নালাপের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তির এই আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়। বিপরীতপক্ষে, দ্বিতীয় কবিতায় ভাষিক পুনরাবৃত্তি ঘটলেও ঘটনার পুনরাবর্তন সেভাবে লক্ষ করি না।

৩. একই দৃশ্যে দুয়ের সূত্র (Law of two to a scene) : রূপকথায় সাধারণত একই দৃশ্যে দু'জনের বেশি উপস্থিত থাকে না; দু'জনের বেশি উপস্থিত থাকলে সক্রিয় অংশভাগী হয় কেবল দু'জন। একটি চরিত্র উপস্থিত থাকলে অন্যটি সহায়ক রূপে কাজ করে।

এক্ষেত্রে দুটি কবিতাতেই দুটি প্রধান চরিত্র। তবে প্রথমটিতে 'বিম্ববতী'-র উপস্থিতি পরোক্ষ। সহায়ক হিসেবে কেউই সক্রিয় নয়।

৪. পরস্পর-বিরোধী গুণ, বস্তু বা ব্যক্তির সূত্র (Law of contrast) : যেমন, চরিত্র :: সুয়োরানী, দুয়োরানী; বস্তু :: কন্যার বদলে পুতুল (অরুণ বরুণ কিরণমালা); গুণ : : ছেলের বদলে কুকুরছানা (বুদ্ধুভুতুম) ইত্যাদি।

পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাহার দেখি রাণী ও বিম্ববতীর চরিত্রে, আচরণের বৈপরীত্য রয়েছে রাজার ছেলে এবং রাজার মেয়ের মধ্যেও।

৫. লোককাহিনির যুক্তিনীতি (Logic of the Saga): সবথেকে দুর্বল ব্যক্তির জয় ঘটে। এখানে প্রথম কবিতার ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রাসঙ্গিক। বিম্ববতী 'সতিনের মেয়ে'; প্রান্তিক (marginal) চরিত্র। যদিও সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় সে শ্রেষ্ঠ।

আঙ্গিকের সবদিক বিচার ক'রে বলা যায়, ভাববস্তুর দিক থেকে 'বিম্ববতী' রূপকথার বেশ কাছাকাছি। দ্বিতীয় কবিতাটি রূপকথার অতটা অনুসারী নয়। তবে ভাষাগত সারল্যে এই কবিতা রূপকথার অনুগত।

১.৪ অধিবাচন ও সংলগ্নতা প্রসঙ্গ

সাহিত্যের বিশ্লেষণে বিচ্ছিন্ন বাক্যের ভূমিকা গৌণ। কারণ শৈলীবিজ্ঞানী মনে করেন, সাহিত্যের সংজ্ঞাপন আসলে একধরনের অধিবাচনিক বিনিময় (exchange of discourse)। শৈলীবিজ্ঞান তাই রচনার অধিবাচনিক মূল্যায়নে গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে অধিবাচন বলতে খুব স্বাভাবিক অর্থে বুঝি, 'A term used in linguistics to refer to a continuous stretch of (especially spoken) Language larger than a sentence.' (Crystal 1985)। প্রসঙ্গত, মনে রাখা দরকার, এই নিবন্ধে বয়ান (text) ও অধিবাচনকে আমরা সমার্থক ধরে নিয়েছি। সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে, তবে বিশ্লেষণগত দিক থেকে দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট সাধর্ম্যও লক্ষ করা যায়। ক্রিস্টাল যেজন্য বলেন, 'there is considerable overlap between the domains of discourse analysis and text linguistics ... and any attempt at a principled distinction would be premature.' (1985 : 96)।

বাক্যের থেকেও বড় একক হল অধিবাচন। প্রতিদিনের জ্ঞাপনে বাক্য বা উক্তির থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে অধিবাচন। কারণ একটি উক্তি (utterance) বা বাক্যের পরিসরে সংজ্ঞাপনিক বিস্তার সীমায়িত নাও থাকতে পারে। ফলে মৌখিক সন্দর্ভ/অধিবাচন গড়ে ওঠে একাধিক উক্তির সমন্বয়ে, আর লিখিত বয়ান হয়ে ওঠে একাধিক বাক্যের সংগ্রন্থন। ভাষার প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত বলেই সামাজিক সম্পর্কজাল, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি নানা বিষয় অধিবাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

রচনার সামগ্রিক বয়ানের বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন শৈলীবিজ্ঞানীর অন্যতম দায়িত্ব। প্রশ্ন উঠতে পারে, কবিতার শৈলীবিচারে বয়ানের বিশ্লেষণ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? আসলে কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে তখনই, যখন তার বয়ানে নিহিত ভাব ও ভাষার ঘটে যায় এক আশ্চর্য মেলবন্ধন। ভাবের ঘনত্ব ও সংহতি (coherence) যখন ভাষাতেও প্রতিফলিত হয়, তখনই রচনা হয়ে ওঠে সার্থক বয়ান। বয়ানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হ্যালিডে-হাসান জানিয়েছেন, 'the word text is used

in linguistics to refer to any passage spoken or written of whatever length that does form a unified whole.' (1990 : 1)।

কোনো সন্দর্ভে দুটি একককে আমরা তখনই সংলগ্ন বলতে পারি, যখন একটির ব্যাখ্যানে অন্যটির ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। এ ধরনের সম্পর্ক বয়ানের নিজস্ব বুনোট নির্মাণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে (Gargesh 1990 : 96)। হ্যালিডে-হাসান (1990) সংলগ্নতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর করেছেন। যেমন, নির্দেশকতা (reference), বিকল্পন (substitution), অনুক্ত গঠন (ellipsis), শাব্দিক সম্পর্ক (lexical relation) প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে, ঠিক কী কী প্রকৌশলের মধ্য দিয়ে বয়ানের ভাষিক সংলগ্নতা গড়ে ওঠে, কী উপায়েই বা সন্দর্ভের অর্থগত সংহতি তৈরি হয়, সন্দর্ভতত্ত্ব তারই গবেষণা করে।

১.৫ 'বিম্ববতী' কবিতার শৈলীগত অনুধাবন

এ নিবন্ধে প্রমাণ করতে চাইছি, 'বিম্ববতী' কবিতায় ভাবগত সংহতি ও ভাষিক সংলগ্নতা প্রধানত দুটি প্রকৌশলের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে—পুনরুক্তি (recurrence) এবং বৈপরীত্য (contrast)।

লক্ষ করি, কবিতায় পুনরাবৃত্ত ঘটনার প্রাধান্য। ভাষার স্তরেও এই পুনরাবৃত্তির প্রতিফলন ঘটে ভাষিক পুনরুক্তির মাধ্যমে। অবশ্য পুনরুক্তি বলতে এখানে আমরা কেবল ধ্বনি, পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যের পুনরুক্তি বুঝব না, প্যাটার্নের পুনরাবর্তনও চিহ্নিত করব (দাশ ১৯৮৭)।

- প্রথমেই দেখি, এ কবিতায় একই পংক্তির পুনরাবর্তন—যা গড়ে তুলেছে ধ্রুবপদের (refrain) আঙ্গিক। কবিতার প্রতিটি স্তবকের সমাপ্তিতে প্রত্যাশিত পংক্তির আবর্তন—'ধরাতলে রূপসী সে সবাকার/সকলের চেয়ে'। এই পুনরাবর্তন প্রতিটি স্তবককে যেন স্বতন্ত্র করে তোলে। স্তবকের একেবারে শেষে একই পংক্তির বারবার ঘুরে আসা, পাঠকের কাছে এক স্তবকের সমাপ্তি আর অন্য স্তবকের সূচনার সংকেতবহ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এই পুনরাবর্তনের প্রবহমাণতা স্তবকগুলির মধ্যে গড়ে তোলে এক অদৃশ্য গ্রন্থন। ফলে প্রতিটি স্তবক হয়ে ওঠে পরস্পর-সংলগ্ন।

পুনরুক্তির অনুষঙ্গে বৈপরীত্যের ব্যাপারটিও লক্ষণীয়। স্তবকের শুরু রাণীর রূপসজ্জায়, আর শেষ বিম্ববতীর সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায়। ফলে দুই নারীর বৈপরীত্য—প্রয়াস এবং ব্যর্থতার বৈপরীত্য। আরও দেখি, ভাষায় যখন পুনরুক্তির প্রত্যাশা তৈরি হয়, ঠিক তখনই পুনরুক্ত বাক্যের ভাবার্থ রাণীর অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার দ্যোতনা বহন করে আনে।

- লক্ষ করি, কয়েকটি স্তবকে অন্তিম চরণের আগের পংক্তিটি—এখানে প্যাটার্ন পুনরুক্ত হলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ২, ৩, ৪ স্তবকে প্রায় একই পংক্তি যেন ঘুরে ফিরে আসে—

  ১. তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে (২য় স্তবক)

  ২. এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে (৩য় স্তবক)

  ৩. তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে (৪র্থ স্তবক)

এই মৃত্যুকামনায় যে দ্বেষ বা হিংসা আছে, তা যেন রাণীর রূপসজ্জায় নিহিত সৌন্দর্যচেতনার বিপরীত ছবি। স্তবকের সূচনায় নারীর বহিরঙ্গ রূপ, আর পূর্বান্ত্য পংক্তিগুলিতে তার অন্তরঙ্গ জগতের গোপন অবচেতনের পরিচয়। ফলে সচেতন ও অবচেতন মনের বৈপরীত্য—একদিকে

সচেতন অঙ্গসজ্জা, অন্যদিকে অবচেতন বিদ্বেষ। দর্পণে ধরা পড়া এই দুই বিপ্রতীপ চিত্রের মধ্য দিয়ে রাণী কেন অসুন্দর, তার ব্যাখ্যা যেন পেয়ে যান পাঠক।

অথচ এই মৃত্যুকামনার বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে পঞ্চম স্তবকের পূর্বান্ত্য চরণ—

৪. কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে (৫ম স্তবক)

একদিকে নেতিবাক্যে মৃত্যুকামনা, অন্যদিকে প্রশ্নবাক্যে মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবনের প্রতি বিস্ময়। দেখতে পাই, প্রেম এসেছে রাজপুত্র ও বিবাহের পূর্বপ্রসঙ্গ ধরে—'রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি বিবাহের বেশে (৫ম স্তবক)। মৃত্যু এবং মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম ও জীবনের বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে পঞ্চম স্তবকের পূর্বান্ত্য দুটি চরণে, বিবৃতি-ও প্রশ্ন-বাক্যের বিপ্রতীপতায়—'মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে/কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে'। প্রেম আর প্রেমহীন সৌন্দর্য, জীবন এবং মৃত্যুর দুই বিপ্রতীপ সহাবস্থান হয়ে ওঠে এ দুটি চরণ।

সুতরাং বলা যেতেই পারে, আলোচ্য কবিতাটির বয়ানে পুনরুক্তির প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বৈপরীত্য।

- আরো দেখি, মৃত্যুর অনুষঙ্গ এ কবিতায় সহসা আসে না, তার উপলক্ষ্য তৈরি করেন রাণী নিজে—

৫. পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা (২য় স্তবক, ১০ম পংক্তি)

৬. বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া (৩য় স্তবক, ১০ম পংক্তি)

৭. বিষফুল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া (৪র্থ স্তবক, ১০ম পংক্তি)

বলা বাহুল্য, বাক্যের হুবহু পুনরুক্তি হয় না বটে, কিন্তু স্তবকের একই অবস্থানে বিভিন্ন বাক্যের ছাঁদে লক্ষ করা যায় একই অনুষঙ্গের পুনরাবর্তন। দেখতে পাই, একদিকে রূপসজ্জার প্রস্তুতি, আর অন্তরালে মৃত্যুর আয়োজন।

এই প্রয়াসের বিপরীত ছবি শেষ স্তবক—যেখানে মৃত্যুর আয়োজন ও উপলক্ষ্যের পরিবর্তে সরাসরি মৃত্যু ফলাফল রূপে যেন হাজির হয়। অধিবাচনে ভূমিকার বদল (role shift) ঘটে। রাণী মৃত্যুর আয়োজক, অথচ মৃত্যুর কারণ না হয়ে তিনি নিজেই মৃত্যুর শিকার। রাণী অভিধেয় (agent) থেকে হয়ে ওঠেন ভোক্তা (patient)। আর 'বিম্ববতী' ভোক্তা (patient) হলেও কবিতার সমাপ্তিতে তারই হাতে চলে আসে যেন সৌন্দর্যের কর্তৃত্ব। পুনরাবর্তন আবারও বৈপরীত্যের সূচক হয়ে ওঠে। পাশাপাশি ভূমিকাবদলের মাধ্যমে অন্যান্য স্তবক ও শেষ স্তবকটি সংলগ্ন হয়ে যায়।

- পুনরাবর্তনের আরো একটা প্যাটার্ন দেখা যায় প্রশ্নোত্তরের কাঠামোয়। (১ম-৫ম) স্তবকে রাণী মায়ামুকুরের উদ্দেশে যে প্রশ্ন করে, প্রতি স্তবকের শেষে সেই প্রশ্নেরই উত্তর। এধরনের পুনরুক্ত বিন্যাসের প্রবহমাণতা প্রতিটি স্তবককে পরস্পর-সংলগ্ন করে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

৮. ক — কহো মোরে সত্য করি/সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।

খ — রাজকন্যা বিম্ববতী সতিনের মেয়ে,/ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে। (১ম স্তবক)

৯. ক — কহো সত্য করে/ধরামাঝে সবচেয়ে কে আজি রূপসী।

খ — ...সতিনের মেয়ে/ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে! (২য় স্তবক)

উল্লেখ্য, পঞ্চম স্তবকে রাণীর উত্তেজনার প্রাবল্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশ্নের বারংবারতা (frequency) বেড়েছে। প্রত্যেক স্তবকেই প্রশ্ন এসেছে একবার, কিন্তু এখানে প্রশ্নের সংখ্যা দুই—

১০. ক — সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল সত্য করে। (৫ম স্তবক, ৪র্থ পংক্তি)

খ — কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে। (৫ম স্তবক, ১১ পংক্তি)

প্রথম প্রশ্ন রাণীর জিজ্ঞাসা, যার উত্তর এসেছে যথারীতি অনুচ্ছেদের শেষ চরণে। যদিও শেষ প্রশ্নের উত্তর অনুচ্চারিত, পাঠককে তার জবাব অনুমান করে নিতে হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন কেবলমাত্র রাণীর প্রশ্ন নয়। এ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পাঠক, লেখক এবং চরিত্র যেন একই তলের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। কারণ এ জিজ্ঞাসা এদের সকলেরই।

প্রশ্নোত্তরের প্যাটার্ন আরো এক ধরনের বিপ্রতীপতা তৈরি করে—বিবৃতিমূলক (narrative) বনাম সংলাপাশ্রিত সন্দর্ভের (dialogue-oriented discourse) বৈপরীত্য। প্রশ্নোত্তর অধিবাচনকে সংলাপাশ্রয়ী করে তোলে। ফলে কবিতার ছাঁচে কাহিনির আঙ্গিক আরোপিত হওয়ার খানিক সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। রচনার বয়ান লেখককেন্দ্রিক থেকে চরিত্রকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার সুবাদে দৃষ্টিভঙ্গিরও (point of view) ঘটে পরিবর্তন। লক্ষণীয়, ক্রিয়ার বিন্যাসেও অধিবাচনের এই বৈপরীত্য ধরা পড়ে—বর্ণনাশ্রয়ী ক্রিয়া : সাজিল, বাঁধিল, পরিল ইত্যাদি; সংলাপাশ্রয়ী ক্রিয়া : কহো, পাঠালেম, পরালেম প্রভৃতি (উত্তম পুরুষের জবানিতে)।

- প্রশ্নোত্তরের বিন্যাসের মতোই প্রশ্ন ও নেতিবাক্যের বৈপরীত্য প্রায় প্রতিটি স্তবকেই পুনরুক্ত (কেবল ১ম ও অন্তিম স্তবক বাদে)। নেতিবাক্যের অবস্থান পূর্বান্ত্য পংক্তিতে, যদিও প্রশ্নবাক্য বিভিন্ন পংক্তিতে সূচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১১. ক ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।/...এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে (৩য় স্তবক)

খ ধরামাঝে সবচেয়ে কে আজি রূপসী।/...তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে (৪র্থ স্তবক)

একেবারে শেষ স্তবকে নেতিবাক্যের প্রাবল্য বেড়ে গেছে—

১২. ...প্রতিবিম্ব না হইল দূর/...তবু ছবি ঢাকিল না।

...তবুও তো গলিল না সোনা। /...ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ।

বলতে পারি, প্রতি স্তবকে ব্যবহৃত এক একটি স্বতন্ত্র নেতিবাক্য, একেবারে শেষ স্তবকে গিয়ে নেতিসূচক বাক্য পরম্পরার সঙ্গে যেন সংলগ্ন হয়ে উঠেছে। রাণীর ছোটো ছোটো ব্যর্থতা অবশেষে পরিণতি পায় এক বৃহৎ নেতির মধ্যে—যা প্রকারান্তরে এক ভয়াবহ শূন্যতা এবং নিশ্চিত পরাজয়েরই সূচক।

প্রথম আর শেষ স্তবকের বৈপরীত্যও লক্ষ করার মতো। প্রথমটিতে প্রশ্ন আছে, নেতিবাক্য নেই। আর শেষটিতে শুধুই নেতিবাক্যের সমান্তর গঠন (parallel structure)—এই নেতিবাচন প্রতিফলিত করে রাণীর অসাফল্য এবং পরাজয়। রাণীর সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা পর্যবসিত হয় নিষ্ফল শূন্যতা আর হাহাকারে। প্রথম স্তবকের প্রশ্ন উত্তর হয়ে আসে শেষটিতে। এভাবেই কবিতার শেষ ও শুরু সংলগ্ন হয়ে ওঠে, ফলস্বরূপ কবিতার অবয়ব সংবদ্ধ ও সম্পূর্ণ রূপ পায়।

আরো এক ধরনের বৈপরীত্য দেখতে পাই, বিবৃতি ও নেতিবাক্যের সহাবস্থানে—

১৩. ক. পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,/তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে (২য় স্তবক)

খ. বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া/এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে (৩য় স্তবক)

- শেষ স্তবকে দেখা যায়, সহসা সতিনের মেয়ের বিকল্প প্রতিস্পর্ধী যেন দর্পণ হয়ে উঠেছে। আগাগোড়া বিভিন্ন স্তবকে সতিনের মেয়ে ছিল প্রতিপক্ষ। শেষ স্তবকে দর্পণ তার জায়গা নিয়েছে। ফলে দর্পণ বিম্ববতীর substitute হয়ে উঠেছে। হয়তো যুক্তি এই—রাণীর নার্সিসাস complex দর্পণে আহত হয়। সেকারণে দর্পণকে ঘিরে তৈরি হয় ধ্বংসের উপলক্ষ্য। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা দ্যোতিত হয় নেতিবাক্যের পরম্পরায়। লক্ষ করতে পারি, একই ধাঁচের সমান্তরাল নেতিবাক্য রাণীর দু'ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রয়াসের বিফলতাকে চিহ্নিত করে—

১৪. ক. পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,/তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে (২য় স্তবক) বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,/তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে (৪র্থ স্তবক) [বিম্ববতী প্রসঙ্গ]

খ. মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না/অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা (শেষ স্তবক) [দর্পণ প্রসঙ্গ]

সুতরাং পুনরুক্তির প্যাটার্ন প্রশ্ন আর নেতিবাক্যের বিপ্রতীপতায় কেবল সাফল্য আর ব্যর্থতার বৈপরীত্য সূচিত করে না, একই সঙ্গে নেতিবাক্যের পরম্পরায় 'নারী' এবং 'দর্পণ' এই দুই ভিন্ন কোডের বিকল্প প্রয়োগেরও সহায়ক হয়ে ওঠে।

- পুনরাবর্তনের আরো একটা আভাস রয়েছে প্রতিটি স্তবকে রাণীর রূপসজ্জার বিবরণে। বলাই বাহুল্য, এ পুনরাবর্তন স্তবকের শেষ পংক্তির মতো প্রায় হুবহু পুনরুক্তি নয়।

ভাষাগত দিক থেকে বিচার করলে (১-৫) স্তবকে বিস্তারিত এই বিবরণ সুনির্দিষ্ট প্রকৌশলের মধ্য দিয়ে ভাষিক সংলগ্নতা অর্জন করে।

প্রথমত, একই অতীতসূচক সমাপিকা ক্রিয়া ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয় এইসব স্তবকে। ফলত, এক ধরনের শাব্দিক শৃঙ্খল (lexical chain) তৈরি হয়। যেমন, সাজিল, পরিল ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১৫. ক. সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী... (১ম স্তবক)
তার পরদিনে — আবার সাজিল সুখে নব অলঙ্কারে (৪র্থ স্তবক)

খ. ...নব নীলাম্বরী পরিল অনেক সাধে (১ম স্তবক)
...প্রবালের হার পরিল গলায় (২য় স্তবক)
...পরিল মুক্তার হার (৩য় স্তবক) ...পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা (৪র্থ স্তবক)

দ্বিতীয়ত, বিপর্যস্ত (inverted) ক্রিয়া-আশ্রিত বাক্যাংশের ব্যবহার প্যাটার্নের সংলগ্নতা তৈরি করে। যেমন,

১৬. ক. সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী (১ম স্তবক)

খ. পরিল মুক্তার হার, ভালে সিন্দুরের টিপ (৩য় স্তবক)

গ. আবার সাজিল সুখে ... বিরচিল হাসিমুখে কবরী (৪র্থ স্তবক)

তৃতীয়ত, স্তবকগুলিকে সংলগ্ন ক'রে তোলার পেছনে অনুক্ত গঠনেরও (ellipsis) একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। একই স্তবকে একাধিক ক্রিয়াপদগুচ্ছ (VP) একই কর্তার আশ্রয়ে সংযুক্ত হয়েছে—

১৭. ক. সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল করবী, নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী পরিল (১ম স্তবক)

খ. ...রাণী প্রবালের হার পরিল গলায়। ...খুলি দিল কেশভার... গোলাপি অঞ্চলখানি ... বক্ষে দিল টানি। (২য় স্তবক)

একাধিক বাক্যাংশে কর্তার এ জাতীয় অনুল্লেখকে আমরা বাক্যিক অনুল্লেখ (syntactic ellipsis) নামে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু এধরনের অনুল্লেখ আরো তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে, যখন দেখি তৃতীয় বা চতুর্থ স্তবকে রাণীর কোনো পূর্বোল্লেখ ছাড়াই ক্রিয়াশ্রিত বাক্যাংশে স্তবক শুরু হয়ে যায়—

১৮. ক. তার পরদিনে—আবার রুধিল দ্বার শয়নমন্দিরে।/পরিল মুক্তার হার... (৩য় স্তবক)

খ. তার পরদিনে — আবার সাজিল সুখে নব অলংকারে (৪র্থ স্তবক)

উপরোক্ত অনুল্লেখের ক্ষেত্রে উহ্য উপাদানটি নিহিত থাকে, বাক্যে নয় বরং অধিবাচনিক গঠনে। তাই অধিবাচনিক অনুল্লেখ (discourse ellipsis) নামে এটিকে অভিহিত করা যায়। বলতে পারি, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের অনুক্ত গঠনের প্যাটার্ন, পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের কর্তা-উহ্য বাক্যিক সংগঠনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়।

দেখতে পাচ্ছি, পুনরুক্তির বিন্যাসে ঠাঁই করে নিচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত এক প্রক্রিয়া, অনুল্লেখ নামে যা পরিচিত। পুনরুক্তির মধ্য দিয়ে একই উপাদানের পুনরাবর্তন ঘটে। আর অনুল্লেখ যেন সেই পুনরাবর্তনকে এড়িয়ে যাবার অন্যতম কৌশল।

চতুর্থত, অনুক্ত গঠনের পাশাপাশি পুনরুক্তিকে এড়িয়ে যাবার আরেকটি প্রকৌশল হল বিকল্পন (substitution)। বিকল্পনের সাহায্যেও কবিতার স্তবকগুলির মধ্যে গড়ে ওঠে অদৃশ্য বন্ধন। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১৯. ক. নব নীলাম্বরী পরিল : পরিল ... রক্তাম্বর পট্টবাস : পরিল ... নব পীতবাস (১ম : ৩য় : ৪র্থ স্তবক)

খ. প্রবালের হার পরিল : পরিল মুক্তার হার (২য় : ৩য়)

গ. গোলাপি অঞ্চল : সোনার অঞ্চল (২য় : ৩য়)

ঘ. রক্তাম্বর পট্টবাস : নবরৌদ্রবিভা ... পীতবাস (৩য় : ৪র্থ)

ঙ. বাঁধিল কবরী : বিরচিল কবরী : খুলি দিল কেশভার (১ম : ৪র্থ : ২য়)

ওপরের দৃষ্টান্তগুলিতে পাওয়া যায় ক্রিয়া, বিশেষ্য ও বিশেষণের বিকল্পন। বস্তুতপক্ষে, পুনরুক্তি ও বিকল্প প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কবিতার বিভিন্ন চরণে গড়ে উঠেছে মিল-অমিলের বিন্যাস (দাশ ১৯৮৭)। উল্লেখ্য, বিকল্প প্রয়োগের পাশাপাশি পদের ধারাবাহিক পুনরুক্তির ব্যাপারটিও রয়েছে। যেমন, নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী (১ম স্ত.) : নব অলঙ্কার (৪র্থ) : নবরৌদ্রবিভা ... নব পীতবাস (৪র্থ) ইত্যাদি।

- এই রূপসজ্জার বিপরীত ছবি ধরা পড়ে রাণীর নিজস্ব মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশে। পুনরুক্ত বিন্যাস এখানেও গড়ে তোলে ক্রিয়াপদগুচ্ছের (VP) সহযোজী সম্পর্ক (Collocative relation)।

রাণী নিজেকে সাজান, প্রতিপক্ষের মৃত্যুর আয়োজন করেন। কিন্তু প্রতিবারে তাঁর ব্যর্থতা ও পরাজয় ক্রোধের মাত্রাধিক্য ঘটায় এবং পরিণতিতে দেখি আবেগের চরম বিস্ফোরণ—যা আবাহন করে মৃত্যুকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

২০. ক. কাঁপিয়া কহিল রাণী (২য় স্ত.) : কহিল কাঁদিয়া — (৩য় স্ত) : রাণী কহিল জ্বলিয়া (৪র্থ স্ত.) : চীৎকারি কহিল রাণী... (৫ম স্ত)।

দেখতে পাই, ক্রোধের এই ক্রমিক উত্তরণ ধীরে ধীরে প্রবল ও প্রকাশ্য হয়ে উঠছে চীৎকারের উদ্দামতায়। অবশেষে শেষ অনুচ্ছেদে এই আবেগ মূর্ত হতে চায় সক্রিয় ধ্বংসলীলায়—আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,/ভাঙিল না যে মায়াদর্পণ (৬ষ্ঠ স্ত.)। রাণী অভিধেয় (agent) থেকে সহসা ভোক্তা হয়ে ওঠেন— 'চকিতে পড়িল রাণী, টুটি গেল প্রাণ (৬ষ্ঠ স্ত.)।

আবারও রাণীর এই ক্রোধ ও ঈর্ষার বিপ্রতীপ প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়ায় দর্পণে বিম্ববতীর হাসিমাখা মুখখানি। প্রায় প্রত্যেক স্তবকেই পুনরুক্ত ধাঁচে রাজকন্যার হাসি-আঁকা মুখের প্রসঙ্গটি ফিরে আসে বারবার—

২১. ক. ফুটিয়া উঠিল ... মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ (১ম স্তবক)

খ. দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী (২য় স্তবক)

গ. ...ফুটিয়া উঠিল সেই হাসিমাখা মুখ (৩য় স্তবক)

ঘ. সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি (৪র্থ স্তবক)

ঙ. দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি (৫ম স্তবক)

বস্তুত, সংলগ্ন পংক্তিতে ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং সারল্যময় হাসি—এই দুই বিপরীত মনোভাবের সাক্ষ্য বৈপরীত্যকে আরো যেন স্পষ্ট করে তোলে—

২২. ক. মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ/দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক (১ম স্তবক)

খ. দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী/কাঁপিয়া কহিল রাণী, অগ্নিসম জ্বালা (২য় স্তবক)

গ. ...ফুটিয়া উঠিল সেই হাসিমাখা মুখ/হিংসায় লুটিল রাণী শয্যার উপরে (৩য় স্তবক)

ঘ. সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি মোহনমুকুরে/রানী কহিল জ্বলিয়া (৪র্থ স্তবক)

- পুনরুক্তির অন্যতম প্যাটার্ন নিহিত রয়েছে সর্বনামীয় প্রয়োগে। রানীর কোনো নাম নেই আলোচ্য কবিতায়; তিনি নির্বিশেষ। যদিও রাজকন্যা একটি নামে বিশেষিত—'বিম্ববতী'। এই বিপ্রতীপতা আরো স্পষ্ট সর্বনামের ব্যবহারে (দ্র. গুহ ২০১০)।

সমগ্র কবিতার বিভিন্ন স্তবকে 'বিম্ববতী' প্রায়শই সর্বনামের সাহায্যে নির্দেশিত হয়েছে। লক্ষণীয়, একই পুনরুক্ত সর্বনাম 'সে' কার্যকরী ভূমিকার দিক থেকে দুটি স্বতন্ত্র নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে—কখনো পূর্বনির্দেশক (anaphor), কখনো বা পরনির্দেশক (cataphor)—এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে,/ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে (৩য়, ৪র্থ স্তবক)।

উল্লেখ্য, পুনরুক্ত এই নির্দেশক সর্বনামের ব্যবহার, বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ রাণীর ক্ষেত্রে কিন্তু স্পষ্টভাবে নেই। তাই অধিকাংশ অনুচ্ছেদে 'রানী' পুনরুক্ত (২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ স্তবক), কখনো বা স্তবকের সূচনায় অনুক্ত (৩য়, ৪র্থ স্তবক)। ফলে সর্বনামের প্রয়োগ যেন আরো একভাবে দুটি চরিত্রের বিরোধ তুলে ধরতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাণী যখন ক্ষোভের সঙ্গে বলে ওঠেন—

২৩. ক. পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা/...ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে (৩য় স্তবক)

খ. বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া/তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে (৪র্থ স্তবক)

তখনও লক্ষ্য করি, সর্বনামের প্রয়োগ-বৈপরীত্য। রাজকন্যা যখন নির্যাতিত, ভোক্তা (affected), তখন তারে/তাহারে তির্যক কারকের রূপ ব্যবহৃত। কিন্তু যখন সে জয়ী, রূপশ্রেষ্ঠা, তখন ব্যবহৃত কর্তৃকারকের রূপ 'সে'; সৌন্দর্যের কর্তৃত্ব তখন রাজকন্যার অধিকারে।

এক্ষেত্রে সর্বনামের বৈপরীত্য তুলে ধরে যেন 'ক্ষমতাশীল' ও 'প্রান্তিক' চরিত্রের দ্বন্দ্ব। উত্তম পুরুষের 'আমি' (যা অনেক সময় ক্রিয়াশ্রিত—পরালেম, বনে পাঠালেম ইত্যাদি) হার মানে 'সে'-নির্দেশিত 'সতিনের মেয়ে'-র কাছে। 'আমি'-র ঔদ্ধত্যকে হারিয়ে দিতে চায় 'সে'-র রূপসারল্যের নম্রতা।

- সর্বনামের আরেক প্রকৌশল অপর পুনরুক্ত প্রয়োগে—প্রতিটি স্তবকের সূচনায় ব্যবহৃত হয় 'তার পরদিন' পদগুচ্ছ—

২৪. ক. তার পরদিন রাণী প্রবালের হার (২য় স্তবক)
খ. তার পরদিনে — আবার রুধিল দ্বার (৩য় স্তবক)
গ. তার পরদিনে — আবার সাজিল সুখে (৪র্থ স্তবক) ইত্যাদি।

পূর্বনির্দেশক সর্বনাম 'তার' প্রত্যেক স্তবকের পুনরাবর্তনশীল ঘটনাপরম্পরাকে গ্রথিত করেছে একসূত্রে। 'তার পরদিন'-কে বলা যায় ধারণী পদগুচ্ছ (catch phrase), যা বিভিন্ন স্তবকের ভাববস্তুর খেই (cue) ধরে রাখে।

একমাত্র শেষ স্তবকে যখন চূড়ান্ত পরিণতি ঘনিয়ে আসে, রাণীর বহিরঙ্গ রূপসজ্জার থেকেও যখন প্রকট হয়ে ওঠে অন্তর্নিহিত বিদ্বেষের আগুন, তখনই কেবল এই পুনর্ঘটিত প্রকৌশলের প্রয়োগ থেকে কবি বিরত হন। আমরা বুঝি, রাণীর রূপসজ্জার ক্রমিক অবতারণা এবারে ব্যর্থ; সমস্ত suspense এবারে এসে পৌঁছেছে climax-এ। ফলে সবকটি স্তবক থেকে শেষ স্তবক যে একেবারে স্বতন্ত্র, তার সংকেত থেকে যায় পুনরুক্তির বিরামের মধ্য দিয়ে।

আরেক ধরনের পুনরুক্তি দেখেছি, সর্বনাম 'সেই'-এর ক্ষেত্রে (দ্র. দৃষ্টান্ত ২১)। রাণীর রূপসজ্জার যাবতীয় প্রয়াস ম্লান করে দেয় যে অনাবিল সৌন্দর্য, তাকে দৃপ্ত ক'রে তোলা হয় 'হাসিমাখা মুখটি'কে বারবার মুকুরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

২৫. ক. সেই হাসিমাখা মুখ (৩য় স্তবক)
খ. সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি (৪র্থ স্তবক)

বস্তুত, 'সেই'-এর বারংবার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটা জোরালো বিপরীতকে যেন তুলে ধরতে চান কবি।

- সমার্থক প্রয়োগেও রয়েছে পুনরুক্তির বাহুল্য। সমার্থক পদের সমাহার শাব্দিক শৃঙ্খল তৈরি করার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তি ও স্তবককে সংলগ্ন করে তোলে। যেমন, পুনরুক্ত পদ রূপসী : সুন্দরী (৩য় স্তবক); সুবর্ণমুকুর : কনকদর্পণ : (১ম-২য় স্তবক); মোহনমুকুর : মায়াদর্পণ (৪র্থ, ৬ষ্ঠ স্তবক) ইত্যাদি। আরো লক্ষণীয়, একাধিক রঙের ব্যবহারের মধ্য দিয়েও এখানে বিভিন্ন স্তবকের পদসংলগ্নতা গড়ে উঠেছে। যেমন, গোলাপি অঞ্চল : সোনার আঁচল (২য় স্তবক : ৩য় স্তবক); নব নীলাম্বরী : রক্তাম্বর পট্টবাস : নব পীতবাস (১ম : ৩য় : ৪র্থ)।
- এছাড়াও পুনরুক্ত হয়েছে দুটি অন্যতম সংযোজক (connective)—'আবার' এবং 'তবু'। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

২৬. ক. —আবার রুধিল দ্বার শয়নমন্দিরে (৩য় স্তবক)
খ. —আবার সাজিল সুখে নব অলংকারে (৪র্থ স্তবক)
গ. তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে (২য় স্তবক)

ঘ. তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে (৪র্থ স্তবক)

অধিবাচনিক দিক থেকে এই সংযোজকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ‘আবার’-কে বলতে পারি কালসূচক সংযোজক (temporal adjunction); বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ঘটনা- পরম্পরাকে তা গ্রথিত করতে চায়। অন্যদিকে ‘তবু’-কে চিহ্নিত করা যায় বিরোধসূচক (adversative) সংযোজক হিসেবে। ‘তবু’ এ কবিতায় প্রত্যাশা আর অপ্রত্যাশার দ্বন্দ্ব সূচিত করে। বিপরীতপক্ষে, ‘আবার’-এর পুনরুক্ত প্রয়োগ যেন রানীর নতুন প্রত্যাশার উদ্যোগ।

স্তবকের সূচনায় ‘আবার’ প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে—রাণীর সুন্দর হয়ে ওঠার নব নব প্রত্যাশা। আর স্তবকের শেষ পর্বে ‘তবু’ সেই প্রত্যাশার নিষ্ফলতা; রাণী হার মানে বিম্ববতীর কাছে। লক্ষ করি, ‘তবু’ বিবৃতিমূলক ও নেতিমূলক বাক্য বা বাক্যাংশের সংযোগ ঘটায়—পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,/তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে (২য় স্তবক)। একদিকে বিবৃতিবাক্যে ধ্বংসের উদ্যোগ, অন্যদিকে নেতিবাক্যে সেই আয়োজনের বিফলতা। বস্তুত, ‘আবার’-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সৌন্দর্যের আয়োজন; আর ‘তবু’-র সঙ্গে মৃত্যু ও ধ্বংসের যাবতীয় উদ্যোগ।

১.৬ দুটি কবিতার ভাষাগত বৈপরীত্য

ক. ‘বিম্ববতী’ কবিতায় একটু বেশি মাত্রায় তৎসম শব্দ ও শব্দাশ্রিত সমাসবদ্ধ পদ চোখে পড়ে। যেমন, কবরী, ধরাতল, দর্পণ, মুকুর প্রভৃতি শব্দ এবং সমাসবদ্ধ নবরৌদ্রবিভা, নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, কনকমুকুর ইত্যাদি। দ্বিতীয় কবিতায় এজাতীয় প্রয়োগ তুলনামূলক ভাবে কম, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ জোট গঠনের প্রয়াসও নেই। নামকরণেও একই প্রবণতা—‘বিম্ববতী’ তৎসম পদ, যদিও দ্বিতীয় কবিতায় এই সংস্কৃতায়ন অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় কবিতায় সারল্য আর প্রথম কবিতায় জটিলতা—দু'য়ের প্রতিফলন বোধ করি ভাষাতেও। ভাষার দিক থেকে দেখতে গেলে লোককথার সরল প্রবহমাণতা দ্বিতীয় কবিতায় অনেকাংশে বেশি।

খ. ‘বিম্ববতী’ কবিতায় ক্রিয়াপদে সাধুভাষার ঠাট চোখে পড়ে। যেমন, গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে; পরিল যতন করি; খচিত করিল তনু ইত্যাদি। পাশাপাশি রয়েছে কাব্যভাষাশ্রিত সমাপিকা ক্রিয়া—যেমন, পরালেম তারে আমি; বনে পাঠালেম তারে ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কবিতাটি অনেকটাই আধুনিক এবং সমসাময়িক; ক্রিয়া এখানে চলিত ভাষা-আশ্রিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চুলের ফুল তার পড়ে যেত/রাজার ছেলে এসে তুলে দিত (১ম স্তবক), রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে/আবার পড়ে যায় খসে (২য় স্তবক) ইত্যাদি। তবে সাধু ভাষার মিশ্রণও কিছু রয়েছে; অনেকক্ষেত্রে যা ছন্দের কারণে—রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে (৩য় স্তবক); পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কী ভাষা/ঘড়ি পাতিয়া আঁক কষে (২য় স্তবক) প্রভৃতি।

গ. দুটি কবিতাতেই চোখে পড়ে ক্রিয়া-বিপর্যস্ত বাক্যের প্যাটার্ন। যেমন, ... রাণী প্রবালের হার পরিল গলায়।/খুলি দিল কেশভার (২য় স্তবক, বিম্ববতী); পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে/রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে (২য় স্ত.; রাজার ছেলে রাজার মেয়ে)। তবে দ্বিতীয় কবিতার পংক্তি অনেকসময়ই ছুঁয়ে যায় গদ্যের প্যাটার্ন—রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে (১ম স্ত.); রাজার মেয়ে দূরে সরে যেত (১ম স্ত.); রাজার মেয়ে খেলা করে (৩য় স্ত.) ইত্যাদি। এভাবেই হয়তো বা বয়ানে ঘটে যায় কবিতা আর গল্পের আঙ্গিকের সমাপতন। লক্ষণীয়, প্রথম কবিতার গদ্যধর্মিতা ধরা পড়ে সংলাপে।

ঘ. দ্বিতীয় কবিতার অধিকাংশ বাক্যই বিবৃতিমূলক। প্রশ্ন এসেছে, তবে অপ্রত্যক্ষভাবে—কে জানে কবেকার কথা (১ম স্ত.); রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ (৪র্থ স্ত.) ইত্যাদি। যদিও প্রথম কবিতায় প্রত্যক্ষ প্রশ্ন আর নেতিবাক্যের সমারোহ—ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী/...তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে (২য় স্ত.)।

ঙ. প্রথম কবিতায় ক্রিয়ার কালের (tense) তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। সবই প্রায় নিত্য অতীত (indefinite past)—সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী (১ম স্ত.); আবার রুধিল দ্বার ... পরিল মুক্তার হার (৩য় স্ত.) ইত্যাদি। অথচ দ্বিতীয় কবিতায় ক্রিয়ার কালের বৈপরীত্য লক্ষণীয়—রাজার ছেলে যেত পাঠশালায় : রাজার ছেলে নীচে বসে : রাজার মেয়ে গেল ঘরে (নিত্যবৃত্ত অতীত : নিত্য বর্তমান : নিত্য অতীত)। ক্রিয়াশ্রয়ে যেন এখানে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটে যায়।

চ. 'বিম্ববতী' কবিতায় অনেকক্ষেত্রেই বিষম দলে অন্ত্যমিল ঘটেছে—যেমন, কবরী : নীলাম্বরী, ধীরে : বাহিরে, বিরাজে : মাছে (১ম স্ত.)। পাশাপাশি সমদলিক মিলও রয়েছে—মুখ : বুক, মেয়ে : চেয়ে (১ম স্ত.) ইত্যাদি। ফলে মিলের বিন্যাস এখানে জটিল।

বিপরীতপক্ষে, দ্বিতীয় কবিতায় মিল অনেকাংশেই সমদলিক—তথা : কথা, গাছে : পাছে (১ম স্ত.); বসে : কষে (২য় স্ত.); খুলে : তুলে (২য় স্ত.) ইত্যাদি। খানিকটা ছড়ার প্যাটার্নের সঙ্গে মিলে যায় যেন কবিতার গড়ন। কবিতার সরল বিবৃতির ছাঁচে মিলের এই সুষম বিন্যাস খাপ খেয়ে যায়।

১.৭ রাজার ছেলে রাজার মেয়ে : শৈলীগত অনুধাবন

পুনরুক্তি আলোচ্য কবিতাটির অধিবাচনের অন্যতম প্রকৌশল নয়। বরং বলা যেতে পারে, ভাষিক নির্মাণে বৈপরীত্য (contrast) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল। যদিও এ বৈপরীত্য কোনো বিরোধমূলকতার সূচক নয়, তুলনায় তা পরিপূরক বৈপরীত্যের দ্যোতক।

- শিরোনামে এ কবিতা 'বিম্ববতী'-র থেকে স্বতন্ত্র। এ কবিতার নির্বিশেষ নামকরণ সার্থক। বিশেষ কোনো নাটকীয় সূচনা বা কাহিনি এখানে নেই, পরিণতিও নির্বিশেষ—এক শাশ্বত প্রেমের সূত্রপাতে কবিতার সমাপ্তি। চিরন্তন জীবনের প্রবহমাণতাই কবিতাটির মূল সুর। লক্ষ করি, দিনের দিনান্তিক পরিণতির মধ্য দিয়ে চরিত্র দুটির অস্ফুট প্রেমও যেন বিকশিত ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বৈপরীত্যের আভাস রয়েছে শিরোনামে—রাজার ছেলে এবং রাজার মেয়ে। অথচ শ্রেণিবৈষম্যের কোনো ইঙ্গিত নেই; কারণ দু'জনেই রাজবংশীয়। তবে ছেলে আর মেয়ে লিঙ্গবৈষম্যের সূচক তো বটেই। 'বিম্ববতী' দুই নারীর কথন; আর এখানে দুই কিশোর-কিশোরীর অন্তরঙ্গতায় কবিতাটির পরিচয়।

নারী-পুরুষের এই বৈপরীত্য অবশ্য আগের কবিতার মতো কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি করে না। দুই নারী আগের কবিতায় ছিল প্রতিযোগী, আর এখানে কিশোর-কিশোরী যেন একে অন্যের পরিপূরক। রূপের আধিপত্য আগের কবিতায় সক্রিয়, আর এখানে কেবল প্রেমের আনুগত্য।

- পুনরুক্তির প্যাটার্ন কবিতাটিতে এক একটি স্তবকে সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

২৭. ক রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়/রাজার মেয়ে যেত তথা। (১ম স্তবক)

খ. উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,/রাজার ছেলে নীচে বসে (২য় স্ত.)

গ. রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে/এল//রাজার মেয়ে যায় ঘরে (৩য় স্ত.)

লক্ষণীয়, আগের কবিতাটির মতো এক স্তবক থেকে অন্য স্তবকে পুনরুক্ত প্যাটার্ন সঞ্চারিত হয়নি। ফলে পুনরাবর্তন একই স্তবকে সংলগ্নতা সৃষ্টি করলেও আন্তর-অনুচ্ছেদে সেভাবে ক্রিয়াশীল নয়। এখানে একই স্তবকের একেবারে গোড়ায় এবং মধ্যবর্তী অংশের নবম ও দশম পংক্তিতে উপরোক্ত পংক্তিগুলি পুনরুক্ত। কবির সচেতনতায় আগের কবিতার মতোই পুনরুক্তির বিন্যাসের ব্যাপারটি বিধৃত ছিল, বোঝা যাচ্ছে। তবে পুনরুক্ত বিন্যাস ভেঙে গেছে শেষ অনুচ্ছেদে—৯ম -১০ম পংক্তিতে বিবৃতিবাক্যে গঠিত পূর্বোক্ত বিন্যাসের পরিবর্তে দেখতে পাই সমান্তরাল প্রশ্ন বাক্য—রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ/রাজার ছেলে কার হাসি। ধ্রুবপদী প্যাটার্ন নেই, তবে সন্নিহিত পংক্তিদ্বয় মিল-অমিলে গড়া পুনরুক্ত গঠনের চিহ্ন বহন করে।

পরের আলোচনা থেকে বুঝব, ১ম-৩য় অনুচ্ছেদে যেখানেই বৈপরীত্য সক্রিয়, সেখানে ধ্রুবপদী পুনরাবর্তন। শেষ অনুচ্ছেদে যখন বৈপরীত্যের ব্যাপারটি অনেকটাই প্রশমিত, ধ্রুবপদী প্রয়োগেরও বিরতি ঘটেছে।

ভাষিক বৈপরীত্য কবিতাটির অন্যতম প্রকৌশল। আগেই বলেছি, পূর্ববর্তী কবিতার মতো বৈপরীত্য এক্ষেত্রে দুই নারীর প্রতিস্পর্ধী সম্পর্কের দ্যোতক নয়, তা দুটি সমবয়স্ক কিশোর-কিশোরীর পরিপূরক সম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী। ভাষাগত দিক থেকে বৈপরীত্য কীভাবে কাজ করে, তা এবার দেখা যেতে পারে —

২৮. ক. রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে/রাজার ছেলে যায় পাছে (১ম স্ত.)

খ. উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে/রাজার ছেলে নীচে বসে (২য় স্ত.)

ক্রিয়াবিশেষণের এই দিগ্‌বিভাজক বৈপরীত্য কোথায় যেন সম্পর্কের মেরুকরণ ঘটায়—অথচ এই মেরুকরণ যে কোনো শ্রেণিবিভাজন চিহ্নিত করে, তাও নয়। বস্তুত, আনুগত্যের অধিকারই যেন দুটি চরিত্রকে অসম তলের প্রতিনিধি করে তোলে।

শুধু ক্রিয়াবিশেষণেই নয়, এই পরিপূরক বৈপরীত্যের ছবি লক্ষ করি ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও। যেমন,

২৯. ক. রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে/রাজার মেয়ে যায় ঘরে (৩য় স্ত.)

খ. রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল/রাজার মেয়ে গেল ঘরে (৩য় স্ত.)

গ. ...চুলের ফুল তার পড়ে যেত/রাজার ছেলে এসে তুলে দিত (১ম স্ত.)

ঘ. পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে/রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে (২য় স্ত.)

ঙ. পথে সে মালাখানি গেল ভুলে/রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে/আপন মণিহার ... দিল সে বালিকার করে (৩য় স্ত.)

- বলা বাহুল্য, পুনরুক্ত বিন্যাসের মধ্যেও এই বৈপরীত্য নিহিত থাকে। প্রথম স্তবকের সূচনায় যে পুনরুক্ত গঠনের সূত্রপাত, সেখানে চরিত্রগুলির ক্রিয়াশীলতায় কোনো বৈপরীত্য নেই—একই পাঠশালা-যাত্রার মধ্য দিয়ে রাজার মেয়ে এবং ছেলে যেন একই সমভূমির বাসিন্দা হয়ে ওঠে—'রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়/রাজার মেয়ে যেত তথা।' একই ক্রিয়াশ্রয় এর সূচক।

বৈপরীত্যের সূত্রপাত দ্বিতীয় স্তবকের পুনরুক্ত গঠনটি থেকে (দ্র. ২৮খ)। উল্লেখ্য, এর আগের স্তবকের সমাপ্তিতে ক্রিয়াবিশেষণের মাধ্যমেই এই বৈপরীত্য সূচিত (দ্র. ২৮.ক)। ফলে বৈপরীত্যের এই রেশ দুটি স্তবককে সংলগ্ন ক'রে তোলে।

তৃতীয় স্তবকের সূচনায় আবারও দেখি পুনরুক্ত গঠনে বৈপরীত্য; তবে এবারে পার্থক্য ক্রিয়ায়, ক্রিয়াবিশেষণে নয় (দ্র. ২৯ক)। এ প্যাটার্ন প্রথম স্তবকের সাপেক্ষে বৈপরীত্যসূচক; কারণ সেখানে একই ক্রিয়া 'যেত'-র ব্যবহার বিপ্রতীপতার সুযোগ তৈরি করে দেয়নি। আগের মতোই দ্বিতীয় স্তবকের সমাপ্তিতে ক্রিয়াবিশেষণ যে বৈপরীত্য তৈরি করে—রাজার ছেলে চায় উপর-পানে/রাজার মেয়ে চায় নীচে (২য় স্ত); তার প্রভাব থেকে যায় পরের স্তবকের সূচনায়। ফলে আবারও বৈপরীত্য আন্তর-স্তবক সংলগ্নতা গড়ে তোলে।

বলতে পারি, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশেষণের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ১ম-৩য় স্তবক সংলগ্ন হয়ে ওঠে। ৪র্থ অনুচ্ছেদে পুনরুক্ত বিন্যাসের প্যাটার্ন ভেঙে গেছে। ফলে পুনরুক্ত প্যাটার্নে বৈপরীত্য সৃষ্টির অবকাশও তেমন নেই।

দেখতে পাই যেন একটা চক্রের সম্পূর্ণতা—বৈপরীত্যহীনতায় সূচনা (১ম স্ত)⟶বৈপরীত্য (২য়-৩য় স্ত.)⟶বৈপরীত্যের প্রশমন (৪র্থ স্ত.)। একারণেই প্রথম স্তবক যেমন একই ক্রিয়া 'যেত'-য় শুরু, চতুর্থতেও তেমনি একই ক্রিয়া—রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে/...রুপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে (৪র্থ স্ত.)।

- বৈপরীত্যের যে আভাস প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদে, তা প্রধানত ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশেষণ আশ্রিত। কিন্তু শেষ অনুচ্ছেদে এই বৈপরীত্য প্রশমিত। সমস্ত দিনের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে যে বিপ্রতীপতা তা যেন নিশীথের স্বপনমিলনে ঘুচে যায়। দিনের উত্তাপ প্রশমিত হয় রাতের স্নিগ্ধতায়, 'বিথান বেশ' ও 'মাতামাতি'-র মধ্যে কোথায় যেন সেই মিলনের অস্পষ্ট একটা রেশ থেকে যায়। প্রথম অনুচ্ছেদের স্তবকের শুরুতে একই ক্রিয়াশ্রয়ে যে সাম্যের সূচনা, শেষের স্তবকে একই ধরনের ক্রিয়ার পুনরুক্তিতে সে সমতা যেন আবারও ফিরে আসে—

৩০. রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে/স্বপনে দেখে রূপরাশি
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে/দেখিছে কার সুধা-হাসি (৪র্থ স্ত.)

বৈপরীত্য এখন আর চরিত্রগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় থাকে না, বরং বৈপরীত্য এখানে বস্তুনির্ভর (সোনার খাট : রুপোর খাট) এবং অনুভূতিনির্ভর হয়ে উঠতে চায়—

'করিছে আনাগোনা সুখ-দুখ' কিংবা 'অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক/নয়ন কভু যায় ভাসি' (৪র্থ স্ত.)।

ফলত, বস্তু এবং অনুভূতির জগতের এই অসাম্য এক বৈপরীত্যহীন প্রেমের স্বপ্নময় মিলনের পটভূমি রচনা করে। জাগতিক প্রেমের ছোট ছোট অসাম্য প্রেমের স্পর্শে হয়ে ওঠে সমতলিক। পরস্পরের পরিপূরক সম্পর্কের ব্যাপারটিও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে—রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ/রাজার ছেলে কার হাসি (৪র্থ স্ত.)। প্রশ্ন দুটির উত্তর নিহিত থাকে বয়ানের মধ্যেই। বোঝা যায়, দুজনেই দুজনের মুখ ও হাসির স্বপ্নময় দর্শনে বিভোর। মুখ ও আর হাসির পরিপূরকতা এই দুই চরিত্রের সকল সম্পর্কের সারমর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

- সমগ্র কবিতাটি চারটি স্বতন্ত্র স্তবকে বিভক্ত। প্রতিটি স্তবকের স্বতন্ত্র নামকরণ থেকে বোঝা যায়, একটি দিনের চারটি ভিন্ন পর্যায়কে (প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, নিশীথ) একই তোড়ায় বেঁধেছেন

কবি। দিন থেকে দিনান্তের পটভূমি পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এক অব্যক্ত অস্ফুট প্রেমও যেন পরিণত হয়ে ওঠে; বস্তুত সায়াহ্নের মালাবদলে তারই সূচনা—'আপন মণিহার মনোভুলে/দিল সে বালিকার করে' (৩য় স্ত.)। আরো লক্ষণীয়, আপাতদৃষ্টিতে একটি দিনের বিবরণ মনে হলেও স্তবকের ধারাবাহিকতায় একটি চিরন্তন কালপ্রবাহের দ্যোতনা নিহিত থাকে। শেষ স্তবকে পাঠশালার কিশোর-কিশোরী তাই যেন অনায়াসে পরিণত প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে উঠেছে।

লক্ষ করি, দিনের চারটি ভিন্ন পর্যায়ে ঋতু পরিবর্তনের খেলা; এরই মাঝে প্রকৃতির বৈপরীত্যের ছবি আঁকেন কবি—

৩১. দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে কোকিল কুহু কুহরিছে (২য় স্ত.) :
শান্ত রবি ধীরে অস্ত যায় (৩য় স্ত.) : বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ (৪র্থ স্ত.)।

দিনের উত্তাপ রাতের স্নিগ্ধতায় ম্লান হয়ে আসে। এই বৈপরীত্যের প্রেক্ষাপটে সমান্তরাল ধারায় বর্ণিত হয় দুটি চরিত্রের সক্রিয় বিপ্রতীপতা। এমনকি শেষ স্তবকের হাসি-কান্নার স্বপ্ন-অনুভবও এই বিপ্রতীপতায় বোনা।

একই দিনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকৃতির পরিবর্তনের পাশাপাশি দুটি চরিত্রের স্থানিক বিন্যাসেরও বদল ঘটেছে। প্রথমে পাঠশালা-যাত্রা, তারপর স্থিতি, তারও পর প্রত্যাবর্তন—'রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে'। অবশেষে নিশীথ-শয়ানে আবারও স্থিতি। যদিও প্রথম আর শেষ স্থিতির আপেক্ষিক অবস্থানে পার্থক্য রয়েছে। উপবেশনে যে বৈষম্য, তার অনেকটাই ঘুচে গেছে শয্যার সমভূমিক স্থিতাবস্থায়। শেষ স্তবকে তাই দেখি, স্থিতি ও গতির এই বৈপরীত্য প্রশমিত। গতির বৈপরীত্যহীনতায় সূচনা, আর শেষ অনুচ্ছেদের বৈপরীত্যহীনতায় সমাপ্তি।

- ক্রিয়ার কালবৈপরীত্য (tense contrast) আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কবিতাটিতে ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিনরকম—নিত্য বর্তমান, নিত্য অতীত এবং নিত্যবৃত্ত অতীত (দ্র. অনু ১.৬)। অবশ্য এর পাশাপাশি অন্তত তিনবার ঘটমান বর্তমান প্রযুক্ত—একবার চরিত্রকেন্দ্রিক ব্যবহার শেষ স্তবকে, আর অন্য দু'বার প্রকৃতি-আশ্রিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

৩২. ক. পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল (১ম স্ত.)
খ. কোকিল কুহু কুহরিছে (২য় স্ত.)
গ. রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ (৩য় স্ত.)

আরো দেখি, সারা কবিতায় বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপ বেশি ব্যবহৃত। কালের নিত্য প্রবহমাণতা সূচিত করার জন্যই বোধহয় এত নিত্যকাল-সূচক ক্রিয়ারূপের প্রয়োগ।

আসলে এ কবিতায় নিহিত কাহিনিটি কোনো বিশেষ অতীতাশ্রয়ী সময়ের ফ্রেমে আটকে থাকেনি। প্রথম স্তবকের সূচনায় ক্রিয়া নিত্যবৃত্ত অতীত, তারপর একই স্তবকে প্রকৃতির চিরন্তন রূপের প্রসঙ্গে ঘটমান ও নিত্য বর্তমানের রূপ এসে হাজির হয়—'পাখিরা গান গাহে গাছে' (১ম স্ত.)। ফলে কাহিনিও অতীতের প্রেক্ষাপট থেকে সরে এসে বর্তমানের পরিসরে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনি ক'রেই রূপকথার অতীত বর্তমানের আখ্যান হয়ে ওঠে। অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটে যায়। [উল্লেখ্য, এ ধরনের সংবন্ধন দেখতে পাই লিপিকার 'রাজপুত্তুর' আখ্যানটিতেও; যেখানে রূপকথার রাজপুত্র শহরের ট্রাম-চলা রাস্তায় আফিসমুখো ভিড়ে সহসা এসে হাজির হয়। (দ্র. মজুমদার ২০১০:২০০-১৮)]।

দেখতে পাই, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্তবকে পৌঁছে ক্রিয়ারূপ আবারও অতীত—পথে সে মালাখানি গেল ভুলে/রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে...। তবে ক্রিয়ারূপ এক্ষেত্রে অতীত হলেও তা কোনো কালিক গভীরতা (temporal depth) চিহ্নিত করে না। এই ক্রিয়াকর্ম যেন বর্তমানের ঘটনাতেই নিহিত; অতীত হলেও ক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমানের ছায়াই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপসংহার

কবিতার অধিবাচনিক বিশ্লেষণ কীভাবে করা যায়? কীভাবেই বা কবিতার ভাবগত সংহতি (coherence) এবং ভাষিক সংলগ্নতা গড়ে উঠতে থাকে? এ আলোচনার অন্যতম লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা বেছে নিয়েছিলাম।

আলোচ্য কবিতা দুটির ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে দুটি অন্যতম প্রকৌশল—পুনরুক্তি এবং বৈপরীত্য। আলোচনা প্রসঙ্গে এও দেখেছি, উল্লিখিত দুই কৌশল আদৌ বিযুক্ত নয়, বরং এদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক যোগাযোগ। যে-কারণে প্রথম কবিতা 'বিম্ববতী'-তে ভাষিক পুনরাবর্তন ভাবগত বৈপরীত্য সূচিত করে। আর অন্য কবিতাটিতে ভাষাগত বৈপরীত্য প্রতিফলিত হতে থাকে পুনরুক্তির বুনোটে। অবশ্য শুধু পুনরুক্তি বা বৈপরীত্যই নয়, কবিতা দুটির বয়ানে সক্রিয় থেকেছে আরো অন্যান্য প্রকৌশল—যেমন, বিকল্পন, অনুক্ত গঠন, সর্বনামীয় নির্দেশকতা, সমার্থক পদ, সংযোজকের প্রয়োগ প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, বর্তমান নিবন্ধে আগাগোড়া প্রচ্ছন্ন থেকেছে অধিবাচনিক বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ এক তত্ত্ব—সংলগ্নতার তত্ত্ব। এ তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হ্যালিডে-হাসান (1990)। সংলগ্নতার নির্মাণে বেশ কিছু অধিবাচনিক প্রকৌশল তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। জটিলতা বাদ দেবার জন্য এঁদের প্রস্তাবিত তত্ত্বের আলোচনা থেকে বিরত রইলাম। তবে অনস্বীকার্য, রবীন্দ্র-কবিতার বিশ্লেষণে এ তত্ত্বের প্রয়োগ নতুন দিশা হয়ে উঠতে পারে।

উল্লেখপঞ্জি

ইংরেজি

Barthes R. (1977) : 'The Death of the Author'; In : Image Music Text (tr. S. Heath), London : Fontana, pp. 142-54

Crystal D. (1985) : Dictionary of linguistics and phonetics, Oxford: Basil Blackwell.

Gargesh R. (1990) : Linguistic Perspective of Literary Style, Delhi: University of Delhi.

Halliday M.A.K. and R. Hasan (1990) : Cohesion in English, 1st Publ. 1976, London: Longman.

Olrik A. (1965) : 'Epic Laws of folk narrative'; In : Alan Dundes (ed.) : The Study of Folklore, New Jersey : Prentice-Hall, 1965 : 131

Riffaterre M. (1966) : Describing poetic structures : Two approaches to Baudelaire's 'Les Chats', Yale French Studies 36/37, pp. 200-42

Saussure F.D. (1974) : Course in General Linguistics (tr. *from* Cours de linguistique Générale, Paris, 1916), London : Fontana.

Simpson P. (1997) : Language through Literature : An Introduction, London and New York : Routledge.

Srivastava R. N. (1994) : Stylistics, Studies in Language and Linguistics series, series editor : B. Srivastava, Vol II, Delhi : Kalinga Publ.

Thompson S. (1956) : The Folktales, New York : Dryden Press.
Widdowson H. G. (1975) : Stylistics and the Teaching of Literature, London : Longman.

বাংলা

গুপ্ত ক্ষেত্র (২০০৭) : রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প, কলকাতা : সাহিত্য প্রকাশ।

গুহ রণজিৎ (২০১০) : কবির নাম ও সর্বনাম, ১ম প্রকাশ ২০০৯, কলকাতা : তালপাতা।

দাশ শিশিরকুমার (১৯৮৭) : কবিতার মিল ও অমিল, কলকাতা : দে’জ।

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার (বাং ১৪০০) : রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, সুবর্ণজয়ন্তী সংস্করণ, কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

বিশী প্রমথনাথ (বাং ১৩৫৫) : রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা : মিত্রালয়।

মজুমদার অভিজিৎ (২০১০) : ‘লিপিকা’র ‘রাজপুত্তুর’ : সংগঠন ও শৈলী প্রসঙ্গ; অন্তর্গত : পরেশচন্দ্র মজুমদার, অভিজিৎ মজুমদার : বাঙলা সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন, ২০১০, কলকাতা : দে’জ, পৃ. ২১০-২১৮।

মজুমদার অভিজিৎ (২০০৭) : শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা : দে’জ।

মুখোপাধ্যায় অমিয়রতন (বাং ১৩৬২) : সোনার তরী, কলকাতা : শান্তি লাইব্রেরি।

রায় নীহাররঞ্জন (বাং ১৩৫৩) : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : দি বুক এম্পরিয়াম লিমিটেড।

সরকার পবিত্র (১৯৮১) : ‘বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন’; অন্তর্গত : অরুণকুমার বসু (সম্পা.) : বাঙলা গদ্যজিজ্ঞাসা, কলকাতা : সমতট, পৃ. ৫৫-১০২

হাফিজ আবদুল (১৯৭৬) : লোককাহিনীর দিক্‌-দিগন্ত, মুক্তধারা : ঢাকা।

'স্ত্রীর পত্র' ও সেকালের সামাজিক

প্রসূন ঘোষ

১৩১৭ বঙ্গাব্দে পুত্র রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূর সম্পর্কের বিষয়ে মত ব্যক্ত ক'রে লিখেছেন : ''তাঁকে মানুষ হিসাবে সমগ্রভাবে তোকে দেখ্‌তে হবে—কেবল গৃহিণী এবং ভোগের সঙ্গিনীভাবে নয়। ... কেবলমাত্র নিজের রুচি, ইচ্ছা এবং প্রয়োজনের দিকে থেকে প্রতিমাকে দেখলে হবে না—ওর নিজের দিক থেকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে।'' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নারীর পরিচয় সমাজপ্রদত্ত নির্মোক দিয়ে দেখতে চাননি, কিংবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে কেবলমাত্র অধিকারবোধ কিংবা কামনাসর্বস্বতার দিক দিয়েও মেনে নিতে পারেননি, তিনি নারী এবং পুরুষকে ব্যক্তি হিসাবেই দেখেছিলেন; সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্ককেও দু'জন স্বাধীনচেতা ব্যক্তির আন্তরিক-দায়বদ্ধ-সার্বিক তথা মানবিক সম্পর্ক হিসাবেই দেখেছিলেন। তিনি সর্বাধিক আহত হয়েছিলেন নারীর মর্যাদা লঙ্ঘনের ঘটনায়। সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র নারীর নিপীড়নকে নয়, তার মর্যাদা লঙ্ঘনকে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, বাংলার সমাজ-সংসারে নারী কেবল সামাজিক বা পারিবারিকভাবে আহত হয় না, তার মর্যাদা প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ণ হয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তাদের পারস্পরিক অবস্থান ও অস্তিত্বের ক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় রবীন্দ্র-ছোটগল্পে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রথমে মৃণাল কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের মেজ বৌ হিসাবেই চিঠি লিখেছে। গল্পের প্রারম্ভেই সে তাই তাঁর স্বামীকে 'শ্রীচরণকমলেষু' সম্বোধন করেছে; অর্থাৎ যে পরিচয়ে সে সেই গলির বাড়িতে পরিচিত ছিল, সেই পরিচয়েই নিজেকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু গল্প যত এগিয়েছে, মৃণাল যত তার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছে পত্রে, ততই সে তার মেজ বউয়ের নির্মোক থেকে বেরিয়ে ব্যক্তি হিসাবে, মৃণাল হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেছে। গল্পের অন্তিমে সে নিজের পরিচয়ে একমাত্র স্থিত থেকেছে এবং স্বামীকে লিখেছে 'ইতি তোমার চরণ তলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল।' স্বামীর চরণ তলের আশ্রয় ছিন্ন করা এবং মনুষ্যত্ববোধের অধিকারী ব্যক্তিসত্তায় পরিচিত হতে চাওয়া মৃণালের এই জেহাদ রবীন্দ্র-সাহিত্যে, এমনকি বাংলা কথা সাহিত্যে সেদিনের নিরিখে অভিনব। কিন্তু এই অভিনব রূপটি কি শিল্পের স্বাভাবিকতায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করতে পেরেছেন? না কি মৃণালের ঘোষণা বাস্তববোধহীন কোনো নারীর প্রলাপ মাত্র বা 'নাটুকেপণা' মাত্র? অথবা তা কি লেখকের ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র? অর্থাৎ মৃণালের স্বর কতটা স্বাভাবিক? মৃণালের পরিণতির মধ্যেই বা স্বাভাবিকতা কতখানি? মৃণালের কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত কিংবা ব্যক্তিত্বময় উচ্চারণ সেদিনের প্রেক্ষিতে কতটা বাস্তবসম্মত?

'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল আর পাঁচজন নারীর চেয়ে নানা দিক দিয়েই স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এই গল্পে আরও দুই নারী চরিত্র বড় বৌ আর বিন্দুর চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়েও।

মৃণাল যদি বড় বৌয়ের মতো বাংলার রক্ষণশীল পরিবার-উত্থিত সংস্কারনিমগ্ন চরিত্র মাত্র হত, তাহলে সমস্ত কিছুই ধর্মের দোহাই দিয়ে মেনে নিতে পারত। আবার যদি সে বিন্দুর মতো হত-দরিদ্র পরিবারের অনাথ সন্তান মাত্র হত এবং অনাদরে প্রতিপালিত হতে হতে নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিতে প্রয়াসী হত বা সদা সংকুচিত হত, তবে সেও ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সব কিছু সহ্য করতে পারত। সে স্বতন্ত্র বলেই, সে নিঃসঙ্গ। পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবল আরোপিত সমাজ সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে, অন্তরের সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি।

মৃণাল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সেকালের প্রথাবদ্ধ বাঙালি পরিবারে বুদ্ধি বড় বালাই। সে পুরুষের কথা শুনে চলবে, পুরুষের বুদ্ধির দ্বারা সে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হবে—এই যেখানে প্রচলিত পরম্পরা, সেখানে নারীর-বুদ্ধি পুরুষের কাছে বিড়ম্বনা স্বরূপ। মৃণালও সে কথা টের পেয়েছে। অবশ্য সে একথাও বুঝতে পেরেছে যে, বুদ্ধির জন্যই শ্বশুরবাড়ির সকলে তাকে ভয় পায়। সে আর পাঁচজন মেয়ের মতো সব কিছু মেনে নিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমতী মৃণাল জ্ঞাত যে, তার বুদ্ধিই তাকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করবে প্রতিনিয়ত। সে তাই বলে—"যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই।"

মৃণালের শিল্পীসত্তা তার স্বাতন্ত্র্যের দ্বিতীয় পরিচয়বহ। সে কবিতা লেখে। কবিতা লেখার মধ্য দিয়েই মৃণাল বদ্ধতার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসে, অন্দরমহলের পাঁচিলের মধ্যে বেষ্টিত থেকেও সে পায় মুক্তির স্বাদ। মৃণাল তাই চিঠিতে লিখেছে : "আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদর মেজো বউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পারনি, আমি যে কবি, সে এ পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।"

শুধু মৃণালের কবিত্ব নয়, মাখন বড়াল লেনের পরিবারের কর্তাদের চোখে ধরা পড়েনি অনেক কিছুই। কিন্তু এসব কিছুই ধরা পড়েছে মৃণালের অন্তর্দৃষ্টিতে। পল্লীগ্রামের উদার মুক্ত পরিবেশে লালিত হওয়া মৃণাল মাখন লেনের বদ্ধ পরিবেশে স্থিত মানুষগুলিকে আত্মার আত্মীয় হিসাবে পায়নি আর তাই মানবেতর প্রাণীগুলিকেই সে মনে করেছে আপন। ক্ষুধার্ত গরুগুলির জন্য সে সমানুভূতি প্রকাশ করেছে, তাদের খাইয়ে যত্ন করে সে পেয়েছে আনন্দ। অবহেলিত আর্ত প্রাণের প্রতি মমতা এ বাড়ির মধ্যে কেবল তারই ছিল বলে তালুকের প্রজা যখন তাদের জমিদারকে ভক্ষণ করার জন্য ভেড়া দেয়, তখন সেই ভীত-সন্ত্রস্ত প্রাণীটিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয় সে।

শুধু মানবেতর প্রাণী নয়, সংসারী মানুষেরা যখন তথাকথিত বড় কাজে ব্যস্ত, তখন প্রকৃতির আপাত-তুচ্ছ দৃশ্যগুলির দিকে দৃষ্টি পড়ে না তাদের। কিন্তু যিনি শিল্পী, কবিপ্রাণের অধিকারী সেই 'পাগল' এর চোখে পড়ে সংসারের অকাজের, অপ্রয়োজনের তথা 'বাজে' দৃশ্যগুলি। তাই আবর্জনার স্তূপে পড়েও বেঁচে থাকা গাব গাছের ফুল ফোটা দেখে মৃণাল উপলব্ধি করে বসন্ত ঋতুর আগমনবার্তাকে।

সুতরাং পীড়িত প্রাণীর প্রতি যার মমতা, অবহেলিত দৃশ্যের প্রতিটি লহমা সম্পর্কে যার দৃষ্টি সজাগ, সে যে যন্ত্রণাতাড়িত একটি মানুষের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করবে তাতে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। যে বিন্দু অনাথ বা পিতৃমাতৃহীন, খুড়তুতো ভাইয়েরা তাকে আশ্রয়টুকু দেয় না, তার জন্য মাখন বড়াল লেনের 'তোমরা'-দের সঙ্গে লড়াই করে সে। বিন্দুর যখন গায়ে ঘামাছির মতো বের হয় এবং সকলে বলে বসন্ত হয়েছে, তখন সে সবার মতো ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দেয় না, তাকে নিজের

ঘরটুকুতে জায়গা দেয় অর্থাৎ অন্তরে আশ্রয় দেয়। তাই দেখি, সকলে মিলে জঞ্জাল সাফ করার মতো তাকে পাগল স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দিলে, মৃণাল নিজের শ্বশুরবাড়ি আর বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে সংঘাতে প্রবৃত্ত হয়েও তাকে রক্ষা করতে উদগ্রীব হয়। শেষ পর্যন্ত যখন সে চাইলেও বিন্দুকে আটকে রাখতে পারেনি, বিন্দুও মৃণালকে বিড়ম্বনায় ফেলতে না চেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে, তখন অপরিসীম দুঃখ ও যন্ত্রণায় সে স্থির হয়ে বসে থাকেনি, বিন্দুকে বাঁচাতে চেয়ে গভীর বুদ্ধির প্রয়োগে নতুন কর্মপন্থা বের করতে চেয়েছে। সে উপলব্ধি করেছে তার অস্তিত্বের স্বরূপকে; মাখন বড়াল লেনের ২৭ নং গলির বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কগত অবস্থানটি সে বুঝে নিতে পেরেছে আর তাই সে ঐ বাড়ি ত্যাগ করতেই শুধু চায়নি, জীবনযুদ্ধে পরাজিত নারী বিন্দুকে সঙ্গে নিয়েও যেতে চেয়েছে। যদিও বিন্দু যাবতীয় সমস্যা দূরে ফেলে দিয়ে আত্মবিনাশের পথটিকেই বেছে নেয়। অন্যদিকে এই আত্মবিনাশ থেকেই মৃণাল পেয়েছে তার আত্মপরিচয়, সে করেছে আত্ম আবিষ্কার। বাঙালি পরিবারে মেয়েরা চলে আবেগ দিয়ে, তারা পদে পদে খাটো করে নিজেকে। কিন্তু মৃণাল যুক্তিবোধের দ্বারা চালিত হয়েছে, সে নিজেকে ছোট করতে পারেনি, সে সংসারের তাবত মেয়েদের জন্য বেদনা অনুভব করেছে। সচরাচর মেয়েরা যে সমস্ত অভাবের জন্য রিক্ত অনুভব করে তার কোনো অভাব মৃণাল উপলব্ধি করেনি। সে শাড়ি কিংবা গয়নার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেনি, কিন্তু প্রথাবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা লঙ্ঘনকে সে অনুভব করেছে আর তাই সে পেয়েছে যন্ত্রণা। বিন্দুর মতো, এমনকি বড় জার মতো মেয়েদের জন্য সে পেয়েছে বেদনা, প্রথার দাসত্বকারী পুরুষদের জন্য সে পেয়েছে লজ্জা। মৃণালের এই স্বাতন্ত্র্য, মৃণালের এই ভাবনা নতুন যুগের নারীর ভাবনা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ গল্প রচনা করেছেন দ্বান্দ্বিক কাঠামো বিন্যাসের দ্বারা। তাই মৃণালকে তিনি যখন নবযুগের প্রতিনিধি হিসাবে গড়েছেন, তখন তারই পাশাপাশি বিন্দু বিশেষত বড় জাকে গড়েছেন, যে নারী প্রথাগত ভাবনায় আবদ্ধ, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। মূলত মৃণাল চরিত্র আলোকিত হয়েছে বিন্দু ও বড় জা—এই দুই বিপরীত চরিত্র দ্বারা। মৃণালের ছিল রূপ আর তাই পাড়াগাঁ থেকে কলকাতায় পাত্রপক্ষের লোক তাকে বধূ হিসাবে চয়ন করেছিল। বড় জার রূপও ছিল না, তার পরিবারের টাকাও ছিল না, ছিল বংশকৌলীন্য। মৃণালের বিয়ে হয়েছিল তার রূপের জোরে আর বড় জার বিয়ে হয়েছিল তার শ্বশুরের হাতে-পায়ে ধরে। বড় জা সেকালের অগণিত বাঙালি নারীর প্রতিনিধি। তাই তার স্বামীর চরিত্রদোষ থাকলেও সে তার পতিদেবতার দোষ না, দেয় ভাগ্যদেবতার দোষ। অসংখ্য নারীর মতো তার হৃদয় আর শাস্ত্র দ্বিধাবিভক্ত। তাই অনাথ ও নিরাশ্রয় বোন যখন তার দিদির বাড়িতে আশ্রয় খোঁজে, তখন নির্দ্বিধায় আপন জোরে সে তাকে আশ্রয় দিতে পারে না, খোঁজে নানা ফন্দিফিকির। বোনের খাওয়া পরার মোটা রকমের ব্যবস্থা করে ও তাকে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করে। শুধু তাই নয়, সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, অল্প আয়াসে ও কম ব্যয়ে একজন দাসী পাওয়া গেছে। বড় জা তার স্বামীর ভাবনার বাইরে কিছু ভাবতে পারে না, সে মনে করে স্ত্রীলোকের অবলম্বন ও পরিত্রাণ—সবকিছুই হল তার স্বামী। তাই বোন বিন্দু পাগল স্বামীর জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হলেও সে তাকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে চায়, কেননা তার স্বামী তথা পরিবারের পুরুষেরাও তাই চায়, তারা আপদ বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। বড় জা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মৃণাল তাই বারংবার তাকে পতিব্রতা, শাস্ত্রকে মান্য করা কিংবা ধর্মকে ভয় করা নারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন—

১) ''এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।''

২) ''কিছুকাল থেকে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে।''

৩) ''বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি। দোহাই ধর্মের, সেজন্য তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।''

পতিব্রতা বড় জা ধর্ম আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মাথা হেঁট করে সেকালের নারীদের মতো সমস্ত মেনে নিয়েছে। নিজের বিয়ের কারণে সে অপরাধী, তার অবস্থান সংকুচিত, সকল ব্যাপারে যথাসম্ভব গুটিয়ে নিয়ে অল্প জায়গা জুড়ে সে তাই অবস্থান করে।

বিবাহিত দিদির যদি শ্বশুরবাড়িতে এ হেন অবস্থা হয়, তাহলে তার আশ্রিতা বোনের অবস্থান কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথ তাই তার নাম দিলেন বিন্দু। প্রকৃতপক্ষে বিন্দু উপেক্ষিত, সে থাকে নামমাত্র অস্তিত্বে, স্বল্প স্থান জুড়ে, গভীর দৃষ্টিপাতে কোনোরকমে দর্শনেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে মাত্র। বিন্দু আশ্রিত, সে অনাথা, পিতা মাতার সংসারে সে ঠাঁই পায়নি, খুড়তুতো ভাইয়েরা তাকে এতটুকু স্থান দেয়নি, দূর সম্পর্কের দিদির কাছে সে জায়গা পেয়েছে মাত্র। তার গায়ে ফুটকি দেখা গেলে তা হয়ে যায় বসন্ত, আবার সে দাগ মিলিয়ে গেলে সকলে উদ্বিগ্ন হয়, বলে বসন্ত বসে গেছে—'কেননা সে বিন্দু'। স্বদেশি হাঙ্গামার সময় সে অনায়াসে হয়ে ওঠে পুলিশের পোষা মেয়েচর—'সে যে বিন্দু'। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুবপদের মতো 'কেন না সে বিন্দু', 'সে যে বিন্দু' প্রভৃতি বাক্যাংশ প্রয়োগের দ্বারা একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তার অবস্থান কেবল সংকুচিত নয়, কিংবা সে সর্বদা সন্ত্রস্ত নয়, তার মতো মেয়েকে সংসার নানাভাবে ব্যবহার করে। সংসারের, সমাজের পদ্ধতি বা তন্ত্রের শতধাজীর্ণ ত্রুটি সত্ত্বেও এই হতদরিদ্র, সংকুচিত, ত্রস্ত নারীর দোষই বড় হয়ে ওঠে। তাই তার বিয়ে দেওয়া হয় উন্মাদের সঙ্গে, কারও কিছু বলার থাকে না, তার দিদিরও কিছু করার থাকে না, সেখানে অত্যাচারিত হয়ে ফিরে এলেও সে কোথাও আশ্রয় পায় না। শেষ পর্যন্ত কাপড়ে আগুন ধরিয়ে সে আত্মহত্যা করে।

লক্ষ করার বিষয়, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ লেখা লিখেছেন, তখন পাশ্চাত্যে নারীচেতনা বিকশিত হয়নি। সিমন দ্য বোভায়ার 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' বের হয়েছে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। বোভায়ার মতো নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রে নারীকে 'আদার' বা 'অপর' বা 'চ্যুত' বলে মনে করেছিলেন। 'স্ত্রীর পত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ যদিও দ্বান্দ্বিক কাঠামো বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এবং বৈপরীত্যমূলক চরিত্র সৃজনের মধ্য দিয়ে এ গল্প লিখেছেন, তবুও তিনটি চরিত্রই একটি বিষয়ে সমজাতীয়, তা হল প্রত্যেকেই চ্যুত বা অপর। প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ। মৃণালের নিঃসঙ্গতা সীমাহীন, সে মা হওয়ার যন্ত্রণা পেয়েছে, তার আনন্দ পায়নি। গর্ভে ধরেও জন্মের পরই তার সন্তানের ঘটেছে মৃত্যু। সংসারে থেকেও, একই ছাদের নিচে বাস করেও তার জীবনবোধের সঙ্গে তার স্বামীর জীবনবোধ মেলেনি। খাওয়ার অভাব তার হয়নি, শাড়ি-গয়না সে পেয়েছে, কিন্তু পায়নি মর্যাদা। পায়নি আনন্দ। তার ব্যক্তিত্ব, তার স্বাতন্ত্র্য তাকে করেছে আলাদা। সে তাই নিঃসঙ্গ। অন্যদিকে সে কালের বড় ঘরের পুরুষের মতো বড় জার স্বামীর অর্থাৎ বড় ভাসুরের ছিল চরিত্রদোষ। সুতরাং বড় জা যতই কেননা ধর্মভীরু হন, ধর্মকে অবলম্বন করে ভাগ্যের কথা বলে নিজের কষ্টকে চাপা দিতে চান, তার নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করা যায়। বধূ হওয়ার পর সারাজীবন সংসারের সবার মন জুগিয়ে চলা নারীরও যে

বোধশক্তি যথেষ্ট ছিল, সে তো আমরা উনিশ শতকে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীতে দেখি। আবার, বিন্দুর একাকীত্ব অপরিসীম। এই একাকীত্ব ও অসহায়ত্বের কারণেই সে আত্মহত্যা করে।

দুই

রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী শিল্পী তাঁর ছোটগল্পে বারংবার নিঃসঙ্গ নারী হৃদয়ের যন্ত্রণাকে দেখিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আধিপত্যযুক্ত সমাজ এই সত্য মেনে নিতে চায়নি। যদিও শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই। তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ''প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পারবেন কেন?'' রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্প লেখার পরে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন 'মৃণালের কথা' গল্প। 'স্ত্রীর পত্র'-এ যদি সেকালের সংবেদনশীল ও মানবিক হৃদয়ের একটি প্রতিবেদন ধরা পড়ে, তাহলে পুরুষতান্ত্রিক-আধিপত্যযুক্ত-রক্ষণশীল মানসিকতার আর একটি প্রতিস্পর্ধী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় 'মৃণালের কথা' গল্পে। গল্পটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গল্পকারের বক্তব্যকে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

বিপিনচন্দ্রের 'মৃণালের কথা' গল্পের শুরু ভগিনীর পত্রের মাধ্যমে। ভাগিনী তার মেজ দাদাকে পত্র লিখেছে। তার বক্তব্য : 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণালের নামে যে পত্রটি লেখা হয়েছে তা তাদের মেজ বৌ অর্থাৎ মৃণালের লেখা নয়। শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতো চুড়িদার জামা পরিহিত আর কবিদের মতো বাবরি চুল রাখতে অভ্যস্ত ও রবি ঠাকুরের জানাশোনা পরিচিত তার ভাইয়ের লেখা। 'বাহাদুরি মার্কা' চিঠিটি তাই রবি ঠাকুরের মতো।

তার মতে, চিঠিটিতে মেজ বৌয়ের হিস্টিরিয়ার প্রকাশ ঘটেছে। তাদের বড় উঠোনটা তার চোখে তাই ছোট ঠেকেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেঝেগুলো তার চোখে পড়েনি। আসলে, মেজ বউ চোখ দিয়ে কিছু দেখে না, অন্য সব কবি ও ঋষিদের মতো খেয়াল দিয়ে দেখে। তাই কালীপুজোর আগের অন্ধকার রাতেও সুন্দর চাঁদ দেখতে পায় এবং তা নিয়ে কবিতা লেখে।

শুধু তাই নয়, সত্যি জিনিসে মেজ বৌয়ের মন ভরে না। বাল্যকাল থেকেই ছোটকে সে বড় করে দেখে আর বড়কে দেখে ছোট করে। পিতৃগৃহ টালা থেকে শ্বশুরগৃহ শ্যামপুকুর আধঘন্টার পথ, কিন্তু সে সোজাসুজি সেখানে যায় না। সে পিতৃগৃহ যায় কখনো শিয়ালদা থেকে রেলে করে দমদম গিয়ে তারপর ছ্যাকড়া গাড়িতে অথবা শ্যামবাজারে গিয়ে নৌকায় উঠে বাগবাজারে এসে রান্না করে খেয়ে পরের দিন শ্যামবাজারে পোলের কাছে নৌকা থামিয়ে তারপর পালকি করে। সুতরাং, মৃণাল বেশি দিন নীল সমুদ্র আর মেঘপুঞ্জ নিয়ে থাকতে পারবে না। তার বিশ্বাস, অচিরেই সে তার দাদার কাছে ফিরে আসবে।

বোন তার দাদাকে চিন্তা করতে নিষেধ করে এবং দাদার কথা মতো নিজে পুরী না গিয়ে স্বামীর ভাই অর্থাৎ দেবরকে পাঠায়। সেখানে সে মেজ বৌয়ের গোয়েন্দাগিরি করে এবং তার সেখানকার আচরণ ও কাজকর্ম পর্যালোচনা করে চরিত্র সম্পর্কে বিবরণ পাঠায়। সে জানায় মেজ বৌ তারই মতো সকালে চা পান করে পুরীর সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করে। এরপর গৃহে ফিরে আসে। নয়টার সময় নুলিয়া এলে সাড়ে নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সমুদ্রে স্নান করে, নুলিয়ার হাত ধরে ঢেউ খায় ও সাঁতার কাটবার ভান করে। এগারোটায় সে মধ্যাহ্নে আহার করে এবং তিনটে পর্যন্ত ঘুমায়। চারটের চা ও জলখাবার খাওয়ার পর পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত আবার সমুদ্রের ধারে বেড়ায়। এরপর রাতে আহার সমাপ্ত হওয়ার পর নিদ্রা যায়।

কলকাতার YMCA বোর্ডিং-এর সতীর্থ শরৎ যখন তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়, তখন মেজ বৌয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়। মেজ বৌয়ের অনুরোধে তার বাড়িতে থেকে গেলে সে দেখে মেজ বৌ দিনরাত কেবল লেখাপড়া করে এবং যেখানে যা 'মিষ্টি কথা' পায় তা 'টুকে' রাখে। তার মতে এতে করে নাকি কবিতা লেখার সুবিধা হয়। ঐ মিষ্টি কথাগুলি দিয়ে 'হায়', 'সখি', 'সখা', 'বঁধূ' ইত্যাদি 'মিষ্টি কথার বুক্‌নী' যোগ করলেই এবং সজ্জিত করলেই চমৎকার কবিতা তৈরি হয়।

সেদিন একত্রে নরেন্দ্র সরোবরে বেড়াতে গিয়ে দেবর নরেন জানতে পারে মেজ বৌ আম গাছ চেনে না, সে আম গাছকে গাব গাছ বলে মনে করে। মেজ বৌয়ের মতে আম গাছ মাত্রেই তার ডালে ডালে কোকিল থাকে, শীর্ষে শীর্ষে থাকে ভৃঙ্গ, আকাশে থাকে 'কুঞ্জ' আর গৃহে থাকে 'উহু'। কেবল লাল পাতা দেখে আম গাছ চেনা যায় না, কারণ লাল পাতা গাব গাছেও আছে। সুতরাং মেজ বৌয়ের ভুল জগৎকে সঠিক বলে মেনে নিতে হয়েছে শরৎকে এবং তাকে সপক্ষে বলতে হয়েছে : ''বিধাতা যে কবির চোখেই তাঁর জগতকে দেখেন। তিনিও ত কবি।''

নরেন জানতে পারে যে, মেজ বৌয়ের মনের বাহ্য স্তরে কবিতার তরঙ্গ উঠলেও ভিতরে ভিতরে সে ঠিক আছে। কেননা, শরৎ হঠাৎ কলকাতায় যাওয়ার আগে এক সাহিত্যিক বন্ধুকে সেখানে রেখে যায় এবং সেই বন্ধু যখন মেজ বৌকে জিজ্ঞাসা করে শরৎবাবু আর নরেনবাবুর মধ্যে বড় কে, তখন মেজ বৌ উত্তর দেয়—নরেন বড় হলেও পিঠোপিঠি বলে শরৎ তাকে কোনদিন দাদা বলে ডাকেনি। অর্থাৎ মেজ বৌকে আপাতভাবে বোকা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে বোকা নয়। কবিতা লিখলেও তার বিষয়বুদ্ধি প্রখর। তবে বাইরে কবিতা ঢেউয়ে সে আন্দোলিত। প্রত্যহ বিকেলে সমুদ্রতীরে সে কবিতা পড়ে। কবিতার ঢেউ তাকে অজানা উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছে। অবশ্য বউদিদি তার দেবরের উপর ভরসা রাখতে পারে। কেননা আগুনের ভিতর যাওয়ার কৌশল তার জানা।

শরতের মতে, সাহিত্যিক বন্ধু মিস্টার মৈত্র ব্রাউনিং-এর 'In a Belcony' কবিতাকে নিজের মতো অনুবাদ করে এবং তা শুনিয়ে মেজ বৌকে উন্মাদ করে দিয়েছে। মেজ বৌ সর্বদা তা আউড়ে বেড়াচ্ছে, এমনকি তার কিছু চরণ নরেনকেও শুনিয়েছে ও প্রশংসা করে বলেছে রবি ঠাকুর ছাড়া নাকি আর কেউ সে কবিতা লিখতে পারে না।

কিন্তু সেই মিস্টার মৈত্র শরতের জ্বর হলে পীড়াপীড়ি করে মেজ বৌকে স্বর্গদ্বারের কাছে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাব বলে নিয়ে যায় চক্রতীর্থে, যা তার বাড়ি থেকে দেড় ক্রোশ দূরবর্তী। বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হলে এবং ফিরে না এলে নরেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। নরেন তাদের উদ্দেশে বের হয়ে দেখে নিরালায় মেজ বৌকে মিস্টার মৈত্র অশালীন আচরণের দ্বারা অপমান করতে উদ্যত হচ্ছে। এ দৃশ্যের সম্মুখীন হলে নরেন তাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করে। এই ঘটনার অভিঘাতে মেজ বৌ প্রবল জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুস্থ হয়ে উঠলে সে নরেনের প্রতি প্রভূত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, নরেন চূড়ান্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করে মেজ বৌকে। মেজ বৌ সরল বিশ্বাসে প্রতারক মিস্টার মৈত্রের পাতা ফাঁদে পা দিতে বসেছিল।

মেজ বৌ তার শারীরিক অসুস্থতা সূত্রে ও ডাক্তার প্রসঙ্গে নরেনের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হয়। মেজ বৌ নরেনকে জানায় যে, সে তার স্বামীকে ত্যাগ করে এসেছে। নরেন এ সংবাদে বিচলিত হয়নি। কেননা, তার মতে হিন্দুর স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে না, শাস্ত্রে তা নেই। সব স্ত্রীই রাগ করে নানা কথা বলে, কিন্তু সে তো মারধর করেনি, কেবলমাত্র একখানি চিঠি লিখেছে। নরেনের কাছে একথা শুনে মেজ বৌয়ের জ্বর ছেড়ে গেল, অর্থাৎ মেজ বৌয়ের যেন গভীর চিন্তার অবসান ঘটল।

মেজ বৌ বিন্দুর কারণে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিল। নরেন জানিয়েছে, বিন্দুর আসলে মৃত্যু হয়নি। বিন্দু পরম শান্তিতে সংসার করছে। বিন্দু একদা যে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিল তা মেজ বৌয়ের কারণে। মেজ বৌ তার মনে এই ভাব জাগিয়েছে যে, বিন্দু নির্যাতিত ও নিপীড়িত। নরেনের মতে যে নিজেকে নিপীড়িত মনে করে তার পক্ষে দ্রোহ অনিবার্য। সুতরাং বিন্দুর চলে আসার জন্য দায়ি মেজবৌ।

বিন্দু 'শ্রীচরণেষু দিদি' সম্বোধন করে মৃণালকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, সে মরেনি, মরার কোন ইচ্ছেও তার নেই। বিয়ের আগে সে ধরেই নিয়েছিল যে, সে যেহেতু কুৎসিত দেখতে, তাই তাকে যে বিয়ে করতে চায় নিশ্চয়ই তার কোন গলদ আছে। তাই শুভদৃষ্টির সময়ে ও বাসর ঘরে ভূতের ভয়ে যেমন চোখ বন্ধ করে থাকে ছোট ছেলেরা, তেমন করেই সে কোনক্রমে রাতটি কাটিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পেয়ে সে যখন স্বামীর কাছে গেল, তখন সে তার স্বামীর প্রেমে মুগ্ধ হল। সুতরাং সে বড় সুখে আছে।

অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র তাঁর 'মৃণালের কথা' গল্পে দেখাতে চেয়েছেন : প্রথমত, মৃণালের বেরিয়ে আসার কোনো হেতু নেই। দ্বিতীয়ত, সে কবিভাবে পূর্ণ এবং কবিরা যেহেতু অদ্ভুত আচরণ করে, সুতরাং তার ব্যবহারও উদ্ভট। তৃতীয়ত, মেজ বৌয়ের মতো মেয়েরা স্বামীকে মান্য না করে বিপদেই পড়ে, মৃণালও পড়েছে। চতুর্থত, বিন্দু আদৌ মরেনি, মরেছে অন্য গলির অন্য বাড়ির কোনো মেয়ে। মৃণাল বলেছে, প্রধানত, সে বিন্দুর কারণেই শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেছে। সুতরাং তার এই বেরিয়ে আসার ভিত্তিটিও অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃণাল ভুল করে চলে এসেছে এবং অচিরেই সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

বিপিনচন্দ্রের এ জাতীয় প্রতিযুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য সে বিচার করার আগে গল্পের বিন্যাসগত কিছু ত্রুটি ও অনৌচিত্য দোষের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, শরৎ আর নরেন কলকাতায় YMCA-এর বোর্ডিং একত্রে থাকত। পুরীতে তাদের দেখা হলে কিছুতেই নরেনকে শরৎ ছাড়েনি, বাড়িতে নিয়ে গেছে এবং মেজ বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। অথচ আশ্চর্য লাগে যে, কেন শরৎ এর আগে বোর্ডিংয়ে দিদির প্রসঙ্গ নরেনের কাছে বলেনি, কিংবা দিদির বাড়ি নরেনকে নিয়ে যায়নি। নরেন কটক থেকে পুরীতে তার প্রিয় বৌদিদির কথা শুনে গোয়েন্দাগিরি করতে গেছে, অথচ এর আগে কলকাতায় থাকার সময় তার সেই প্রিয় বৌদিদির বাড়ি দেখেনি, কিংবা মেজ বৌয়ের সঙ্গে পরিচয় করেনি—এই কার্যকারণবোধের অভাব বড় বিস্ময় তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, পুরীতে থাকার সময় মেজ বৌয়ের সঙ্গে প্রথম দিন আলাপ করার পরই সে তার বউদিদিকে লিখেছে—"তোমার মেজ বউ-এর ডায়রীও ঠিক এই।" মেজ বৌয়ের ডায়ারির সমরূপতা সম্পর্কে সে জ্ঞাত হল কী করে? আবার, সেই ডায়ারির বক্তব্য আর পরবর্তীকালের কার্যধারার পার্থক্যও লক্ষ করার মতো। বাড়িতে খাওয়া আর সমুদ্রে নুলিয়ার কাছে সাঁতার কাটা—মেজ বৌয়ের এই কাজের পরিচয় পরে তো আর সে দেয়নি। সে যখন মেজ বৌয়ের কাছে কয়েকদিন থাকল, তখন সে তার কবিতা পড়া আর শব্দ চয়ন করে লিখে রাখা এবং তা দিয়ে নিজের কবিতা তৈরি করার কথাই লিখেছে। তাহলে কোনটি ঠিক? না কি, কটাক্ষ করতে গিয়ে চরিত্র এবং তার স্রষ্টা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন!

তৃতীয়ত, মৃণালের ননদ কোথা থেকে এল? এ চরিত্র কল্পনা করার হেতু কী? বিশেষত, মৃণাল যখন তার উল্লেখ মাত্র করেনি। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণাল তার স্বামীকে বলেছে : তোমরা

জান না যে আমি কবিতা লিখি, আজ পনেরো বছর ধরে সে পরিচয় গোপন আছে। অথচ তার ননদ বলে যে, সে কবিতা লেখে, সেই কবিতা সে পড়েছে। এমনকি সে এও মনে করেছে যে, বাড়িতে সেই কবিতা মৃণাল রেখে গেছে। এমন একজন দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল ননদ, এমনকি বাড়ির একমাত্র পাঠক পাওয়া সত্ত্বেও মৃণাল তার নাম উল্লেখ করেনি! অথচ, বিপিনচন্দ্র মৃণালের ননদ চরিত্র কল্পনা করলেন, সেই ননদ তার দাদাকে চিঠি দিয়ে মেজ বৌয়ের কোনো বিপদ ঘটবে না—এই অভয় দেয়—এ সমস্তও চিত্রিত করলেন। সবমিলিয়ে এক ধরনের কষ্টকল্পনা করলেন।

চতুর্থত, বিন্দু কেন শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে এবং পুনরায় ফিরে গেছে এ কৈফিয়ৎ বড় বেশি জোড়াতালি দেওয়া। বিন্দু শুভদৃষ্টির সময় চোখ বন্ধ করে ছিল, সে না হয় মেনে নেওয়া যায়; কিন্তু স্বামীর আচরণের যে ব্যাখ্যা সে দিয়েছে, তা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বাসর ঘরে তার স্বামী কাচের বাসন ভেঙে চুরমার করে দেয়, কিংবা জুতো পায়ে লাথি মেরে ভাতের থালা ও হেঁসেল লন্ডভন্ড করে দেয়। আবার সাতাশ নং মাখন বড়াল লেনের বাড়ি কিংবা খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় না পেয়ে বাধ্য হয়ে বিন্দু শ্বশুরবাড়ি যায় এবং সেখানে তার স্বামী যেভাবে প্রেমানুরাগ প্রকাশ করে—তা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, বিপিনচন্দ্রের 'মৃণালের কথা'য় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র-বিদূষণ। বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যেও নারীর শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। বিপিনচন্দ্র বারংবার রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করেছেন, এমনকি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করেছেন। তিনি মেজদাদাকে লেখা ভগিনীর পত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতেও দ্বিধান্বিত হননি। আবার মৃণালের চিঠির ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষার মতো একথা যেমন বলেছেন, তেমনি মৃণালের ভাই শরতের পোশাক পরিচ্ছদ তাঁর মতো—এ উল্লেখও করেছেন। শুধু তাই নয়, মৃণালের কবিতা সম্পর্কে এমনভাবে কটাক্ষ করেছেন যে, মনে হয় সাহিত্য বিষয়ে রচয়িতার উন্নাসিকতা স্পষ্ট। তাই দেখি, প্রায় প্লেটোর মতোই কবিদের সম্পর্কেই তিনি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু প্রভূত বিদূষণ ও ব্যঙ্গ কটাক্ষ সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র'-এ যে সত্য প্রকাশে সচেষ্ট, তাকেই স্বীকার করেছেন। বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন : বিন্দু নয়, বিন্দুর মতো একটি মেয়ে পাশের বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে, বিন্দু তা দেখে স্তম্ভিত হয়েছে ও জ্ঞান হারিয়েছে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল যে বলেছে, দেশ সুদ্ধ মেয়েদের কাপড়ে কেন আগুন লাগে, পুরুষের কোঁচায় কেন লাগে না—একথা যুক্তিসিদ্ধ হয়ে যায়। আবার, স্নেহলতার আগুনে পুড়ে মরার বিষয়টি নিয়ে যতই কৌতুক-কটাক্ষ করুক না কেন বিপিনচন্দ্র, তার সুইসাইড নোট যারই লেখা তিনি বলতে চান না কেন, উপর্যুপরি দুটি মেয়ের আত্মহত্যার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

আবার নরেন মেজ বৌকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে এবং সে বিবরণের মধ্য দিয়ে বিপিনচন্দ্র মেজদাদা-বৌদি অর্থাৎ মৃণালের শ্বশুরবাড়ির সহৃদয়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কবিভাবেই হোক, কিংবা যে কোন ছলনাতেই হোক পুরুষেরা মেয়েদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করত। সুতরাং, বিপিনচন্দ্র যতই কেন না, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখে রবীন্দ্রনাথের বীক্ষাকে আক্রমণে সচেষ্ট হন, তাঁর লেখার শিল্পীর দুর্বলতা প্রকট, তেমনি বক্তব্যেও ব্যক্তিগত বিদ্বেষকে তিনি অতিক্রম করতে পারেননি, তাতে গভীরতার অভাব স্পষ্ট। প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত সত্য স্বীকার করেছেন বিপিনচন্দ্র—সমনস্ক পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

তিন

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে রবিবার বিদেশযাত্রা কালে তৎকালের বোম্বাই উপকূলে অবস্থানের সময় সেখানকার সমুদ্রসংলগ্ন এলাকাগুলিতে স্ত্রী-পুরুষের নিঃসঙ্কোচ মেলামেশায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং বাংলার বহির্জীবনে নারীদের অনুপস্থিতিজনিত অসম্পূর্ণ জীবনের কথা মনে করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সে যাত্রার সঙ্গী মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার সন্তান সোমেন্দ্রচন্দ্র তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে য়ুরোপ প্রবাসের স্মৃতিকথা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন : ''গুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন ''এ বিষয়ে বাঙ্গালী সমাজ অঙ্গহীন। স্ত্রী শক্তি বাংলায় এখনো সুপ্ত। ভারতের নবযুগে নারীশক্তির আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। না হয় তো জাতীয় জীবন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। সে জন্য এ অঞ্চলে নারী লাঞ্ছনার অমানুষিক কাহিনী শোনা যায় না, তাহারা আশৈশব মুক্ত হাওয়ায় মানুষ হইয়া স্বীয় শক্তির দ্বারা সমাজে নিজ স্থান অধিকার করিয়া পুরুষের নিকট প্রাপ্য সম্মান আদায় করিয়া লইতেছে।''

'নারী লাঞ্ছনার অমানুষিক কাহিনী' বঙ্গসমাজে তিনি শুনে এসেছেন বারবারই। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে তিনি এমন কথা বলেছেন আর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি এমনই একটি নারী নিষ্পেষণের শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বঙ্গসমাজেই, যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও আছে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্প লেখা হয়েছে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে। এই গল্পে বিন্দু কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মারা গেলে বাড়ির পুরুষ কর্তারা উপহাস করেছিল, যা শুনে মৃণাল বলেছিল : ''কিন্তু নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।'' মৃণালের বক্তব্য যে সঠিক, সে প্রমাণ পাওয়া যায়, বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা' অংশের 'ভগিনীর পত্র'-এ। আগেই বলা হয়েছে বিপিনচন্দ্রের লেখায় রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর বিপরীত ডিসকোর্স নির্মাণ করা হয়েছে। তবুও সেই ডিসকোর্সের মধ্যে লেখকের বক্তব্যের অন্তরালেও রয়ে গেছে কিছু বাস্তব সত্য। তাই অগোচরে প্রতিস্পার্ধী বক্তব্যের সমর্থনের প্রমাণও রয়েছে। তাই দেখি, সেখানে বারবার স্নেহলতার উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'স্নেহলতা ছুরিটার কথা'। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি স্নেহলতা কাপড়ে আগুন দিয়ে মারা যায় এবং তার মৃত্যু তৎকালীন বাঙালি সমাজের শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন তুলেছিল তা অন্য কোন নারীর আত্মহত্যা বা লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে ঘটেনি। একজন মহৎ লেখকের অতুলনীয় প্রতিভা উপলব্ধি করা যায়, তাঁর সৃষ্টিতে প্রতিফলিত লেখকের জীবনভাবনা আর পরবর্তী সমাজ জীবনে ঘটমান সত্যকে মিলিয়ে পড়লে। যে রবীন্দ্রনাথ একদা 'দেনাপাওনা' (১৮৯৩) গল্পে দেখিয়েছিলেন নিরুপমার বেদনার্ত চিত্রের কথা, তাই তো ঘটে যায় একুশ বছর পরে (১৯১৪) স্নেহলতার ক্ষেত্রে। 'দেনাপাওনা'য় নিরুপমা নিজেকে 'টাকার থলি' বলে মনে করতে পারেনি, তার বাবার অপমান সে সহ্য করতে পারেনি, ফলত আত্মক্ষয় করেছে, শীতের দিনে উত্তরের জানালা খুলে দিয়ে অসুস্থ হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। 'দেনাপাওনা' গল্প লেখার সাত বছর পরে (১৯০০) স্নেহলতার জন্ম। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং থানার কাগদি বা কাগরি গ্রামে হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা স্নেহলতা জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামবাজারের ৪৩/১ রাজবল্লভ স্ট্রিটে হরেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে বাস করছিলেন স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর আগে থেকেই। স্নেহলতার চৌদ্দ বছর বয়স হলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হরেন্দ্রনাথ জনৈক মুখোপাধ্যায় বংশের একটি বি.এ. পাশ পাত্রের সন্ধান পান। পাত্রপক্ষ হাতেহাতে নয়শ টাকা

এবং বারোশ টাকার অলঙ্কার বরপণ হিসাবে দাবি করেন। কিন্তু প্রায় দু হাজার টাকার বরণ দেওয়ার সামর্থ্য কন্যাপিতা হরেন্দ্রনাথের ছিল না, আবার এই রকম বিএ বিএল পাত্র অর্থাৎ কলেজি পাশ কেতাবি ডিগ্রিধারি তথাকথিত শিক্ষিত পাত্র হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না স্নেহলতার পিতা। ফলত বাড়িঘর বন্ধক রেখে তিনি যাবতীয় টাকা সংগ্রহে উদ্যোগী হন এবং নিকটবর্তী ১৪ ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির করেন।

কিন্তু মর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী স্নেহলতা পাত্রপক্ষের এই দাবিতে এবং পিতার অক্ষমতায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁর বিবাহের কারণে তাঁর পিতা শেষ সম্বল বাড়িটুকু হারাবেন একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। 'দেনাপাওনা' গল্পে পিতা রামসুন্দর বরপণ বাকি রাখার কারণে বিবাহের পর নিরুপমাকেও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আত্মমর্যাদা বিসর্জন না দিয়ে সে পিতাকে তখন বলেছিল যে, কিছুতেই তার শ্বশুরকে টাকা দেওয়া যাবে না, কারণ সে কেবল 'টাকার থলি' নয়।

নিরুপমার কাহিনি স্নেহলতা শুনেছিল কিনা সে তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে স্নেহলতা প্রথাগত শিক্ষায় ডিগ্রিধারী না হলেও নিজ গৃহে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন স্বশিক্ষিত। তাই পিতাকে আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে বেছে নিয়েছিলেন অপরাহ্নের নির্জন ছাদ, কেরোসিন তেল, দেশলাই বাক্স আর পরিধানের বস্ত্র। কেরোসিন-সিক্ত বস্ত্রে অগ্নি সংযোগের মধ্য দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি। বাঙালি সমাজে প্রথাবদ্ধ জীবনে পীড়নের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই ঘটনায় সেদিনের শিক্ষিত সমাজ কেবল উদ্বিগ্ন মাত্র হয়নি, তাঁদের আলোড়ন প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্নভাবে। একদিকে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন প্রচলিত বরপণ প্রথার অন্তরালে নিহিত নিষ্ঠুরতাকে দেখানো হয়েছিল, অন্যদিকে প্রগতিশীল লেখকেরা তথাকথিত শিক্ষিত পাত্রপক্ষের মনোভঙ্গির প্রতি চরম বিদ্রূপ এবং পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া নিষ্পাপ নারীর প্রতি তীব্র সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অনেকগুলি পত্রিকায় স্নেহলতা সংক্রান্ত ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হল—

সঞ্জীবনী মহিলাতে আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে : ''সমাজ যদি জীবিত থাকিত, তবে আজ প্রলয়কারী গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। আজ এক পক্ষকাল হইল, বালিকা বলি হইয়াছে, ইহার মধ্যে জনসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠত—বঙ্গদেশের ৪ কোটি নরনারী ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত ''আজ হইতে বরপণ উঠিয়া গেল।''

১৩২০ বঙ্গাব্দে ১০ম সংখ্যা ৯ম ভাগের 'ভারত মহিলা' পত্রিকার সম্মাদকীয়তে লেখা হয় : ''স্নেহলতার শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে আমরা আমাদিগের তরুণী ভগিনীদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, আমাদের একটী ভগিনীর এই প্রকার জীবনদানেও যদি কাপুরুষদিগের চৈতন্য না হয় তবে আর কেহ আগুনে পুড়িয়া মরিও না, এই পশুদের পশুত্ব তাহাতে ঘুচিবে না, বিধাতা প্রদত্ত এই অমূল্য জীবন নরপশুদিগের পাপক্ষয়ের জন্য তোমরা কেন পুনঃ পুনঃ বিসর্জ্জন করিবে?''

ফাল্গুন ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিতদের উদ্দেশে বলা হয় : ''যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা মান সম্পদাদি আর কিছুর প্রতি দৃকপাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গের সমুদয় সম্পাদককে

হয়রান করিয়া ফেলেন, আর বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতেও বাপ মাকে পণ লইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ, অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কী?"

'প্রবাসী' পত্রিকায় পরের সংখ্যায় অর্থাৎ চৈত্র ১৩২০ বঙ্গাব্দে স্নেহলতার মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনায় যখন আধিপত্যকামী সমাজের কর্ণধারেরা ব্যথিত না হয়ে বাল্যবিবাহের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হলে তারা মা-বাবার দুঃখ যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারবে না, সুতরাং এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না, তখন তার প্রতিবাদ করে লেখা হয়েছিল : ''যেন দুর্ঘটনা ঘটাটাই একমাত্র দুঃখের বিষয়; যে জঘন্য সামাজিক রীতির জন্য লোকে সর্বস্বান্ত হইতেছে, বৈবাহিকে বৈবাহিকে মনান্তর ঘটিতেছে, দায়ে পড়িয়া পণ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য বা এড়াইবার জন্য লোকে প্রতারণা করিতেছে, বালিকারা আত্মঘাতী হইতেছে, সেই রীতিটাই যেন ঘোর পরিতাপের বিষয় নয়। তা ছাড়া বাপমায়ের টাকার যোগাড় হয় না বলিয়াই তো অনেকস্থলে অবিবাহিতা কন্যার বয়স বাড়িয়া চলিতে থাকে। ফোঁড়া হইলে যদি কোন ডাক্তার তাহা ঢাকিয়া রাখিতে বলে, কিন্তু রোগ বিনাশ করিবার কোন চেষ্টা করে না, তাহার ব্যবহার যে রূপ, এই যুক্তির স্রষ্টাদের আচরণও তদ্রূপ।"

'প্রজাপতি' কিংবা 'কায়স্থ' পত্রিকার তরফ থেকে এ ধরনের প্রতিবেদন সে সময় বারবার লেখা হয়েছিল। তাছাড়া সচেতন সামাজিকদের পক্ষ থেকে অনেকেই লিখেছিলেন প্রবন্ধ এবং কবিতা। রসিকলাল রায়ের 'সমাজ সমস্যা', যদুনাথ চক্রবর্তীর 'বিবাহ পণে বালিকার আত্মবলি', ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'বাল্যবিবাহ ও বরপণ', অশ্বিনী শঙ্কর চৌধুরীর 'হিন্দু সমাজের পণপ্রথা', অখিলচন্দ্র পালিতের 'বরপণ সম্বন্ধে চিন্তা', কেশবচন্দ্র নাগের 'পণপ্রথার পরিণাম' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে দ্য মডার্ণ রিভিউ-এর মতো বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল এই ঘনটাকে উপলক্ষ্য করে। বিভিন্ন স্থানে পণপ্রথা বিরোধী সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের 'প্রজাপতি' পত্রিকা থেকে যশোরে অনুষ্ঠিত এ ধরনের সভার প্রতিবেদন বের হয়েছিল। এছাড়াও গোবিন্দ চন্দ্র দাসের 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি বিবাহযোগ্য বালিকার উক্তি', প্রমথ চৌধুরীর 'স্নেহলতা', করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্নেহলতা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর', প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্তের 'স্নেহলতা', নীহারের 'স্নেহলতার বিদায়' প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে স্নেহলতার মৃত্যুর প্রতিবাদদীপ্তিকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাসের কয়েকটি চরণ সেকালে রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছিল। কবিতার প্রথম স্তবকে পরিস্ফুট হয়েছিল সোচ্চার প্রতিবাদ এবং জ্বালাময় উচ্চারণ, যা জনসমাজকে আলোড়িত করেছিল :

> ''বাবা! থাকুক আমার বিয়ে,
> চাইনে আমি এম,এ,বি,এ, কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে,
> ছাগল গরুর মত যাদের, ছেলের হাটে গিয়ে,
> সোনার চেইন-সোনার ঘড়ি, গর্ব্ব যাদের গলায় পরি,
> অমন পশু কিনোনাক কাণা কড়ি দিয়ে!"

উল্লেখ্য, এই সমস্ত লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২০ বঙ্গাব্দে। সুতরাং দেশ ও কাল সম্পর্কে সদাজাগর, হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব, উদার-নৈর্ব্যক্তিক জীবন মূল্যবোধের অধিকারী এবং সংবেদনশীল মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে এ ঘটনার অভিঘাত ও মর্মান্তিকতা এবং তজ্জনিত মানবিক প্রতিবাদের

উত্তাপ স্পর্শ করবে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, যে-রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন : ''কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো''—তা কেমনভাবে যথার্থ সত্য হয়ে ওঠে। তাই দেখি, তিনি স্নেহলতার মৃত্যুর কত আগে 'দেনাপাওনা' গল্প লিখেছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের তথ্যকে কীভাবে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করতে হয় এ সম্পর্কে ছিলেন প্রখরভাবে সচেতন। তাই তিনি এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ার লিখলেন না দ্বিতীয় 'দেনাপাওনা', অর্থাৎ সে গল্পের আর পুনরাবৃত্তি করলেন না। বাস্তবের জগৎ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিল্পীমনের জারক রস মিশিয়ে সংগুপ্ত শক্তি (occult power)-র সাহায্যে তিনি যে গল্প রচনা করলেন তা 'দেনাপাওনা'-র জগৎ থেকে কত দূরবর্তী। 'দেনাপাওনা'র অভিমানী নারী নিরুপমা নয়, পেলাম 'স্ত্রীর পত্র'-এর প্রতিবাদী দৃপ্ত নারী মৃণালকে। এক্ষেত্রে স্নেহলতার মৃত্যুর অনুষঙ্গটিকে কেবলমাত্র বিন্দুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দ্যোতিত করলেন। কিন্তু সেখানে মূলত পণপ্রথার ব্যাপারটিকে আলোকিত করলেন না। বরং দেখালেন, আধিপত্যের ধরণ কত রকমের হতে পারে! আধিপত্যাধীনের অবমাননার মূল কোথায়? 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমারা কোন্ শক্তিতে কী অর্জন করতে চায়?

এদিক দিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের আবেদন বহুমাত্রিক। আসলে, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। কেবলমাত্র স্নেহলতার ঘটনাটিই তাঁকে আলোড়িত করেনি। বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে অবনমিতের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ তাঁকে বারবার দেখতে হয়েছিল। নারীর সঙ্কুচিত অবস্থান, পদে পদে তার মর্যাদার অবমাননা, দাম্পত্য জীবনে নিহিত বৈষম্য, সবমিলিয়ে তার যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থান বিষয়টি তার পরিচিত জীবনে দেখেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে পরিচিত এমন পরিবারগুলিতে নারীর জীবনের বেধনাবিধুরতাকে কখনো তিনি অনুভব করেছিলেন, কখনো নিজের বাড়িতেই পিতা হিসাবে কন্যার ম্লান চিত্তকে উপলব্ধি করেছিলেন। কবির 'মনোভূমি' বাস্তবের তথ্যভূমি অপেক্ষা অধিকতর সত্য। তাই এ ধরনের ঘটনা থেকে 'স্ত্রীর পত্র'-এর মতো যে গল্প তিনি লিখলেন, তা অনেকবেশি জোরালো, অনেক বেশি আবেদনঋদ্ধ। কেননা, এ গল্প লেখার পরেও গল্পের জগতের ঘটনার পুনরাবৃত্তিই বাস্তবে ঘটেছে বারবার।

চার

উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বহুমাত্রিকভাবে আলোড়িত হয়েছিল। বাইরের প্রবল হাওয়া এ যুগের ইংরেজি শিক্ষিত নতুন যুবকদের আলোড়িত করেছিল। ফলত, সেই সব যুবকেরা যখন পিতা হলেন, কিংবা স্বামী হলেন তখন বহুবিধভাবে বদ্ধমূল প্রথাকে উপেক্ষা করে অন্দরের নারীদের নিয়ে আসতে চাইলেন সদরে, কিংবা প্রগতিশীল মানুষেরাও নানাভাবে মেয়েদের শিক্ষিত করতে সচেষ্ট হলেন, যে সমস্ত সংস্কার নারীদের পীড়িত করে সেগুলির বিরুদ্ধাচরণ করলেন। এই সময়ের নারীদের স্মৃতিকথা, আত্মকথা, আত্মজীবনী, ব্যক্তিগত কথা তথা জবানবন্দিগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তারা সেই সময়কে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন। দেখা যায়, উনিশ শতকেই দুটি ভিন্ন ডিসকোর্স নির্মিত হয়েছিল। এই ডিসকোর্সের একটি দিকে যেমন নতুন সময়কে বরণ করে নেওয়ার তাগিদ দেখা গিয়েছিল, তেমনি এর অন্য দিকটিতে প্রথা কিংবা সংস্কারকে সম্পূর্ণত বিসর্জন না দিয়ে প্রথাবদ্ধতাকে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটের গুপ্তপ্রেসের মাসিকে দুর্গাচরণ গুপ্তের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী যখন তীব্রভাবে প্রথামুক্তির কথা শুনিয়েছিলেন তাঁর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' কিংবা 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস'-এ, তখন

নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী তাঁর 'নারীধর্ম' গ্রন্থে প্রথাধর্ম মান্য করার পক্ষেই অভিমত পোষণ করেছিলেন। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মধ্যে মৃণাল এবং বড় জার চরিত্রগত স্বরূপ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিস্পর্ধী বক্তব্যকে রাখেন, তখন তা উনিশ শতকের নারী প্রগতি বিষয়ে নারীদের ডিসকোর্সের প্রতীকীরূপ পেয়ে যায়। তাই দেখি, মৃণাল সেখানে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যকে দেখাতে পারেন, সেখানে তার বড় জা সমস্ত কিছুকে ধর্মের কারণে, পাতিব্রত্যের দোহাই দিয়ে কিংবা প্রবল সংস্কারের বশে সমস্ত কিছু মেনে নেয়।

দাম্পত্য জীবনের অংশীদার নারী পুরুষের প্রবল ব্যবধানকে কিংবা নারীর মর্যাদা লঙ্ঘনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচিত অনেকগুলি দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে অনুধাবন করেছিলেন। প্রথমেই বলা যায়, কৃষ্ণভাবিনী দাসের কন্যা তিলোত্তমার প্রসঙ্গ। নদীয়া জেলার অখ্যাত গ্রাম কাজলায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম কৃষ্ণভাবিনীর। তাঁর বিয়ে হয় দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু এবং হাইকোর্টের উকিল। দেবেন্দ্রনাথের অন্য ভাই উপেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথও ছিলেন বিখ্যাত। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন নাট্যরচয়িতা, নাট্য পরিচালক ও প্রযোজক। তাঁর 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের জন্যই নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল চালু করেন তৎকালীন ইংরেজ সরকার। অন্যদিকে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন সমাজ সংস্কারক এবং পিতার মতোই হাইকোর্টের উকিল। পিতা শ্রীনাথ বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নিজের পুত্র উপেন্দ্রনাথ যখন বিধবাকে বিয়ে করেন, তখন তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। এমনকি অপর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ যখন ইংলন্ড গমন করেন, তখন তিনি তাঁকে ত্যজ্য পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী যখন স্বামীর সঙ্গে ইংলন্ড গমন করেন, তখন অবশ্য তাঁদের শিশুকন্যা তিলোত্তমাকে নিজের কাছে রেখে দেন শ্রীনাথ। তিলোত্তমার বয়স তখন পাঁচ-ছয় বছর। কৃষ্ণভাবিনী 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'র মতো গ্রন্থ লিখেছেন, সেখানে প্রকাশ করেছেন নারী প্রগতি সম্পর্কিত তাঁর চিন্তারাজি। ইংলন্ডে থাকাকালে সেদেশে পাশ্চাত্য নারীদের জীবনচর্চাকে প্রত্যক্ষ করে এদেশের নারীদের অর্গলবদ্ধ স্বরূপের যন্ত্রণাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ঔপনিবেশিক দেশের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীন ইংলন্ডকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল স্বাধীনতার স্পৃহা। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছিলেন মননঋদ্ধ প্রবন্ধ। 'শিক্ষিতা নারী', 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি; 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ', 'স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারকদের মতো ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। অথচ, তাঁর কন্যা তিলোত্তমার বিয়েতে শ্রীনাথ দিয়েছিলেন রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয়। তিলোত্তমার দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর প্রকাশতি হয়েছিল 'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ। সেখানে তিনি বাবা-মায়ের প্রতি অনুযোগ করেছেন বারংবার। কীভাবে পিতৃমাতৃস্নেহহীন মেয়েটি যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন কাটিয়েছেন সেকথা বলেছেন সর্বদা। আবার বিবাহের পর স্বামীর ভালোবাসা পাননি, প্রবল কষ্টে ও যন্ত্রণায় তিনি স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিলেন। সেই মর্মস্পর্শী যন্ত্রণার কথা লিখেছেন কবিতায়। মায়ের মতো প্রগতিশীল চিন্তার শরিক হতে পারেননি, তাই স্বামীর পীড়ন সত্ত্বেও তাঁর প্রতি প্রথা মেনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। প্রবল অন্তর-দহনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মায়ের উদ্যোগে 'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ। সেখানে 'উচ্ছ্বাস' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

"বিবাহ করিল যবে প্রাণেশ আমায়।
দ্বাদশ বৎসর গত, দু একদিন নয়।।
দাসী বলি অবহেলি, দুই পদে দিয়ে ঠেলি।
করিবে সুন্দরী মনে পুণ পরিণয়।।
এ বারতা মম মনে সত্য কি গো হয়?"

'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে কৃষ্ণভাবিনীও জীবনে কন্যাকে কিছু দিতে পারেননি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

কৃষ্ণভাবিনীর লেখা প্রবন্ধ 'সাহিত্য', 'সাধনা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা'-র সম্পাদক, তখন কৃষ্ণভাবিনীর 'শিক্ষিত নারী'র প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ বের হয়েছিল। তাছাড়া কৃষ্ণভাবিনী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারত স্ত্রী মণ্ডলের একজন সদস্য হয়েছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাদের জন্য তিনি আশ্রম গড়ে তোলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণভাবিনী দেবেন্দ্রনাথের পরিবার সম্পর্কে যেমন জানতেন, তেমনি কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন এবং তিলোত্তমার দুঃখময় জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তিলোত্তমা তাঁর জীবনে যা পারেননি, রবীন্দ্রনাথ শিল্পে সেই না পারার জগৎকে দেখাতে চেয়েছেন বিভিন্ন রচনায় এবং নিজের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনেও তো এ চিত্রই পরিলক্ষিত হয়। পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে সুখী হতে পারেননি, শান্তি পাননি তাঁদের দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের ট্র্যাস্টি থেকে অর্থ পাওয়ার জন্য কন্যাদের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। অথচ ঠাকুরবাড়িতে তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরার বিয়ে হয়েছে বেশ পরে। জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—তিন জনকেই বিলাতে শিক্ষালাভ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে অর্থের যোগান দিয়েছেন, এমনকি তাঁদের পরিবারের অপরাপর সদস্যদের মাসোয়ারা দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যাশিত ব্যবহার পাননি কারো কাছেই। শরৎচন্দ্র তাঁর মতো সম্মাননীয় মানুষের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন। কন্যা রেণুকা যখন অসুস্থ, তিনি যখন তাঁকে হাজারীবাগে নিয়ে গেছেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য, সত্যেন্দ্রনাথকে দায়িত্ব দিয়েছেন আশ্রম বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতার, তখন সে দায়িত্ব পালন না করে সত্যেন্দ্রনাথ গেছেন পাঞ্জাবে বেড়াতে, অসুস্থ স্ত্রীর জন্য সামান্য দায়িত্ব পালন না করেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠালে এবং সেখানে অ্যালোওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের গুঞ্জনে স্ত্রী রেণুকা সর্বাপেক্ষা আহত হয়েছিলেন। সে বিবরণ পাওয়া যায় মীরা দেবীর আত্মকথায়। অন্য দিকে কনিষ্ঠ কন্যা মীরার দাম্পত্যজীবন নিয়ে তাঁর বিবাহের পর থেকে সারা জীবনব্যাপী বিপুলভাবে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের ব্যবহার, তাঁর চাতুর্য, মীরার প্রতি অবহেলা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। অসহায় পিতা তাঁর যন্ত্রণাকে কখনো কখনো প্রকাশও করে ফেলেছেন।

সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রগতিশীল মানুষ যখন বাঙালি নারীর জীবন ও জগতের ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রভূত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতাকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন শিল্পে তা থেকে উত্তীর্ণ হতে চান। বাস্তবে বাঙালি দাম্পত্যজীবনে সেদিন নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ছিল অনেকখানি ব্যবধান। তার অন্যতম

কারণ তাদের স্বনির্ভরতার অভাব। বাঙালি মেয়েরা স্বনির্ভর হবে, তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর হবে, সদরে পুরুষের মতো রোজগার করবে—এ ভাবনা আসতে সময় লেগেছিল অনেকদিন। এমনকি যাঁরা অনেকখানি শিক্ষিত নারী, তাঁরাও সম্পূর্ণভাবে চাকরি করার কথা ভাবতে পারছেন না।

আসলে, অন্দরের নারীরা সদরে এসেছে এক প্রবল ধাক্কায়, সে ধাক্কা হল দেশ বিভাজনের ধাক্কা। ওপার বাংলা থেকে আসা পরিবারগুলি যখন স্বজন-স্বভূমি চ্যুত হয়ে এ বাংলায় টিকে থাকতে চাইছিল, তখন সেই পরিবারের নারীরা তাদের যাবতীয় প্রথা কিংবা সংস্কারকে উপেক্ষা করে বিয়ে নয়, চাকরি করতে চেয়েছিল। এজন্য অবশ্য তাদেরও কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। ঘরে-বাইরে উপেক্ষিত হতে হয়েছে। ঘরের মানুষ ও প্রতিবেশীদের কাছে অনেকসময় সন্দেহের যন্ত্রণা কিংবা সংস্কারের পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে আর সদরের পুরুষদের কাছে বিভিন্ন ভাবে অত্যাচারিত কিংবা লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। সেদিন নারীদের জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল', কিংবা সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি'-র মতো উপন্যাসে এবং সে সময়ের কথাসাহিত্যিকদের বিভিন্ন ছোটগল্পে আর সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় এক দশক পরে। সেই সব দিনের প্রেক্ষিতে কিংবা সেই সব রচনার সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' বিচার করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কতখানি প্রগতিপন্থী। মৃণালকে তিনি বাইরে বের করেছিলেন, বাঙালি দাম্পত্যে নারী পুরুষের প্রবল ব্যবধান মৃণাল চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছে আর নারীর মর্যাদা পদে পদে কেমনভাবে লঙ্ঘিত হয় সেই দিকটিও সে দেখিয়েছে। এর মধ্যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্তযন্ত্রণা কিংবা অভিমান প্রকাশিত হয়নি, কোথাও তা উগ্র হয়েও দেখা দেয়নি, পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে এবং শিল্পের সীমা লঙ্ঘন না করে সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র' লেখার পরেও স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান এবং সংসারের পীড়ন যন্ত্রণার শিকার হয়ে নারীর আত্মক্ষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙালি সমাজে প্রায় সম সময়ে দেখা গেছে আরো অনেকের ক্ষেত্রে। যেমন অমিয়বালার উদাহরণই দেওয়া যায়। সমাজের যে বাধার কথাগুলি মৃণাল বলেছে এবং যাবতীয় বাধা অতিক্রম করতে পারবে বলে প্রবল বিশ্বাসে মৃণাল উচ্চারণ করেছে, প্রায় সেই অনুরূপ স্মৃতিচারণ করেছেন আধিপত্যের শিকার অমিয়বালাও। স্বামীর সঙ্গে কয়েক মাসের মধুময় জীবনে অতিবাহিত করেছিলেন তিনি, সে স্মৃতি তিনি যন্ত্রণাপীড়িত দিনগুলিতেও ভুলতে পারেননি। কিন্তু স্বামীর যে আচরণ তাঁকে আহত করেছিল তা হল তাঁর অবহেলা। বোঝা যায়, এ অবহেলা সেদিন তার প্রতি ছিল না, এ অবহেলা ছিল প্রথাবদ্ধ সমাজে পুরুষের নারীর প্রতি। তাই দেখি স্ত্রীর অসুখে স্বামী প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না, তাঁর আত্মীয়দের কাছে এ নিয়ে কুৎসা রটান। অমিয়বালার মনে হয়েছে, এ কোন্ পৌরুষের প্রকাশ! অমিয়বালার লেখায় ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সচেতনতা, তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাঁর মর্যাদাবোধ। অমিয়বালা স্বামীর গৃহ থেকে চলে এসেছেন পিতৃগৃহে, কিন্তু আত্মসম্মানবোধকে বিসর্জন দিতে পারেননি। মাত্র উনিশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পত্রিকায় যে স্মৃতিকথা তিনি লিখে গেছেন তাতে দেখা যায়, তাঁর প্রতিভার ক্ষণিক দীপ্তিকে। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন তা বোঝা যায়। এদিক দিয়ে মৃণালের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য অনুভব করা যায়। সুতরাং দেখা যায়, আধিপত্য-পীড়িত সমাজব্যবস্থায় মৃণাল কোন আরোপিত চরিত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কতখানি ভবিষ্যৎমুখী তা বোঝা যায় মৃণাল চরিত্র নির্মাণের পরেও প্রায় সমরূপ চরিত্রের দেখা বাস্তবে মিলেছে—এই অনিবার্য সময়-সত্য থেকে।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক সেকালের সমালোচক এবং রবীন্দ্রপরবর্তী একালের সমালোচকরা 'স্ত্রীর পত্র' গল্প সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগ করে থাকেন। সেই অভিযোগের একটি অন্যতম দিক হল নীলাচলে গিয়ে মৃণাল স্বামীর বিরুদ্ধে পত্র লিখে বিদ্রোহ করেছে; তাঁদের মতে সেই বিদ্রোহের সারবত্তা কতখানি, কেননা এর পর মৃণালের দিন অতিবাহিত হবে কীভাবে? এর উত্তরে বলা যায়, একথা ঠিক তখনও বাঙালি নারীরা স্বনির্ভর হয়নি, কিন্তু তাই বলে একেবারেই যে কেউই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হননি, তা নয়। প্রসঙ্গত এর বহু পরে লেখা আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের উপসংহারের কথা বলা যায়। প্রায় একই পটভূমিতে লেখা এবং প্রায় একই সিদ্ধান্ত নেওয়া আর এক নারী সুবর্ণ নবকুমারের কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং মনে করে যে সে শিক্ষকতা জুটিয়ে নিতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ মৃণালের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি, তিনি কেবল মীরার প্রসঙ্গ তুলেছেন। মৃণালের জীবনভাবনা থেকে আমরা, পাঠকেরা অনুভব করতে পারি, সে অধ্যাত্মজীবনের ক্ষেত্রটিতে নিজেকে সমর্পণ করবে না। আশা করা যায়, সুবর্ণের মতোই ছেলে মেয়ে পড়ানোর কাজ জুটিয়ে নেবে। তাছাড়া যে মেয়ে অসাধারণ শিল্প গুণসম্পন্ন পত্র লিখতে পারে; অসামান্য বিদুষী, গুণবতী এবং বুদ্ধিমতী সে সম্মানের সঙ্গে অন্নবস্ত্র জুটিয়ে নিতে পারবে আশা করা যায়। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, ভারত স্ত্রী মণ্ডল অনেক আগেই কেশবচন্দ্র গড়ে ছিলেন। উড়িষ্যায় অনেক নারীও কাজ করছিলেন। বিধবাদের জন্য বিভিন্ন আশ্রমও নানা জায়গায় নির্মিত হয়েছিল, সে সব আশ্রমের দেখাশোনাও মেয়েরাই করতেন। উদাহরণ হিসাবে সুদক্ষিণা সেনের কথাই বলা যায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রগতিশীল কাজকর্ম করেছেন, ইতোপূর্বে উল্লেখিত কৃষ্ণভাবিনীও এ সবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং মৃণালও সেরকম কোনো কাজকর্ম করবেন বলেই মনে হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তাঁর দিদিকে অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী দেবীকে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা, ইন্দিরা কিংবা ভাগ্নি হিরন্ময়ী, সরলা প্রমুখকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দেখেছিলেন তাঁরা কতটা কর্মময় জীবনের অংশীদার। তিনি বিদেশ ভ্রমণকালে নারীদের দেখেছিলেন, বিদেশের সাহিত্যের স্বনির্ভর নারী চরিত্রও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সুতরাং স্বপ্নের ভুবনকে তিনি শিল্পে অঙ্কন করেছিলেন এবং সে শিল্পের ভুবন আবার পরবর্তী বাস্তবের জগতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত কৃষ্ণভাবিনীর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়, সেখানে তিনি লিখেছেন : ''ইংলন্ডে প্রায় আজকাল অধিকাংশ, ভাল-মন্দ সব রকমের উপন্যাসগুলিই নারীরচিত। ঐ সব স্ত্রী গ্রন্থকর্ত্রীদের মধ্যে বর্ত্তমান মিসেস্ অলিফ্যান্ট, মিস্ থ্যাকারে, মিস্ ব্র্যাডুন প্রভৃতি কয়েকজন অতি প্রসিদ্ধ। আর মৃত মহিলা লেখিকাদের মধ্যে জর্জ এলিয়ট, মিস ব্রুট, মিসেস ক্রেক্ ও মিস্ অষ্টিন অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। এই সব গ্রন্থকর্ত্রীরা উপন্যাস লিখিয়া যে কত উপার্জ্জন করেন ও করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে হয় ত আমাদের প্রত্যয় হয় না। কিন্তু, ইংলন্ডে ও আমেরিকায় উহা সচরাচর ঘটিতেছে। উঁহারা এক একখানি নভেল লিখিয়া, অন্তত ১০,০০০ টাকা পাইয়া থাকেন, আর ঐ সকল উপন্যাস-লেখিকারা বৎসরে দু'খানার কম পুস্তক না লিখিয়া ছাড়েন না সুতরাং শুধু কলম চালাইয়া, গড়ে তাঁহাদের অন্তত ১,৫০০ টাকা মাসিক আয় হয়! ঐ সব বড় লেখিকা ছাড়া যে কত মাঝারী ও ছোট রকমের গ্রন্থকর্ত্রী আছেন, তা' বলা যায় না, তাঁহাদের নাম ও পুস্তকের গুণানুসারে, তাঁহাদের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়।'' সুতরাং, এ স্বপ্ন কৃষ্ণভাবিনী দেখেছেন যে, এদেশের নারীরা সুশিক্ষিত হলে কোনো না কোনোভাবে ভদ্র ও শোভন উপায়ে উপার্জন করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথও এই মত পোষণ করতেন বলে ছোটগল্পের পরিমিত সংরূপে মৃণাল কীভাবে দিন অতিবাহিত করছে—সে চিত্র বাহুল্য বলেই

মনে করেছিলেন এবং ব্যঞ্জনায় ফলপরিণামটিকে পরিবেশন করে পাঠকের কাছে সেই সহৃদয় বিবেচনা প্রত্যাশা করেছিলেন। আমরা, পাঠকেরা আশা করতে পারি পুরী তথা উড়িষ্যায় বাঙালি মার্জিত সমাজে সুদক্ষিণাদের মতো মৃণালও সম্মানের সঙ্গে জীবনধারণ করবে, সকলের মান্যতা ও শ্রদ্ধা পাবে, সে লেখক হিসাবে হোক, কিংবা শিক্ষক রূপেই হোক।

ঋণ স্বীকার

এই প্রবন্ধটি লেখা সম্ভব হত না অধ্যাপক স্বপন বসুর সাহায্য না পেলে। উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ, গ্রন্থ সাহায্য এবং পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাকে ঋণী করেছেন। তাঁকে প্রণাম নিবেদন করি।

‘দ্য সেন্টার অব ইন্ডিয়ান কালচার’ : আজকের প্রেক্ষিতে

সেখ রফিকুল হোসেন

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণভারত সফরকালে রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার ‘দ্য সেন্টার অব ইন্ডিয়ান কালচার’ প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। সর্বত্র প্রবন্ধটির বা বক্তৃতাটির এই শিরোনাম রক্ষিত হয়নি। কখনো ‘এডুকেশন ইন জেনারেল’ শিরোনামে, কখনো ‘এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া’ অথবা ‘দ্য আইডিয়া অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া’ শিরোনামে বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরের ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশনে ১৩ জানুয়ারির প্রথম বক্তৃতাটিকে ‘রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে দেওয়া প্রথম বক্তৃতা বলে জানিয়েছেন। বক্তৃতাটি আডিয়ারের ‘সোসাইটি ফর দ্য প্রেমোশান অব ন্যাশানাল এডুকেশন’-এর উদ্যোগে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে ১৮টি পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে সামান্য অদল-বদল করে, শিরোনাম বদলে দিয়ে বিভিন্ন বক্তৃতায় বলতে বাধ্য হয়েছেন। কোলকাতায় ফিরে এসে ২১ মার্চ এম্পায়ার থিয়েটারে বহু মানুষের সামনে ইংরেজিতেই ‘দ্য সেন্টার অব ইন্ডিয়ান কালচার’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সাহিত্য অ্যাকাদেমি প্রকাশিত দ্য ইংলিশ রাইটিং অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর-এর দ্বিতীয় খণ্ডে মূল প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর (৮ পৌষ ১৩২৫) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বার্ষিক সভার পর বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাংলা বক্তৃতাটি প্রচারের জন্য পুস্তিকাকারে ছাপানোও হয়েছিল। বিশ্বভারতীয় ভিত্তি স্থাপনের সভায় উপস্থিত দেশি-বিদেশি মানুষজনদের কাছ থেকে বিশ্বভারতী গঠনকল্পে প্রায় দশ হাজার টাকার মতো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। দীর্ঘ দিন ধরে লালন করা স্বপ্ন সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করে বিপুল সমর্থন পেয়ে উৎসাহিত রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণভারত সফরকে বিশ্বভারতীয় জন্য সমর্থন ভূমি আদায়ে কাজে লাগাতে চাইলেন। বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপনের দু'সপ্তাহের মধ্যে (৫ জানুয়ারি ১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শান্তিনিকেতনের বাইরে, দেশ বিদেশে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের বাইরে সর্বসাধারণের কাছে এই প্রথম তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শ, বিশ্বভারতী সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা তুলে ধরলেন। শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব, আমাদের আর্থ-সামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ইংরেজ প্রবর্তিত ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির ব্যর্থতা প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মতামত ব্যক্ত করলেও তাঁর স্বপ্নের বিশ্বভারতী সম্পর্কে বলা চলে এই প্রথম তাঁর ভাবনা বাইরে এল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ‘বিশ্বভারতী’ শীর্ষক বিখ্যাত বাংলা প্রবন্ধটি সম্ভবত ‘দ্য সেন্টার অব ইন্ডিয়ান কালচার’ প্রবন্ধটির পরে লেখা হয়েছিল এবং সেটি ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’র ১ বৈশাখ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশ্বজুড়ে জ্ঞানের উৎপাদনকে ঘিরে নিত্য যে উৎসবমুখর আয়োজন চলেছে তাতে সভ্য-অসভ্য

উন্নত-অনুন্নত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রত্যেকটি জাতিরই নিজস্ব ভূমিকা এবং অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ঔপনিবেশিক বিশ্বব্যবস্থায় এমনটা যে ঘটেনি ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখক তা বুঝতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে ভারতবর্ষের উপর যে শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা যে ভারতবাসীর পক্ষে নিজেকে আবিষ্কার এবং নিজেদের সত্য স্বরূপকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে ওঠেনি সে-কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে শিক্ষার আদর্শ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা জানি, পশ্চিমী আধুনিকতার সব কিছুকেই রবীন্দ্রনাথ হীন চোখে দেখেননি, বর্জনীয় ভাবেননি। পশ্চিমে আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞানের এবং শিল্প সাহিত্যের যে অগ্রগতি ঘটেছে তাকে যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি আমাদের দেশে পশ্চিমী শিক্ষার ভ্রান্ত পথ এবং নীতিকে বার বার সমালোচনা করেছেন। যে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরেই নিজের মানসশক্তি দিয়ে দেশ এবং বিশ্বের সমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করেছে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই ভারতীয় মানসটিই সংহত হয়ে উঠতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'first of all the mind of India has to be concentrated and made conscious of itself...'। বিচ্ছিন্ন ভারতীয় মননকে আমরা যখন সংহত করে তুলতে পারবো—'they will then become receptive as well as creative'। মনের এই উদ্বোধনের জন্য যে ইতিবাচক পরিবেশ প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে সেটি নিশ্চিত করা। বিদ্যার উৎপাদন ক্ষেত্রে 'Men should be brought together and full scope given to them for their work of intellectual exploration and creation; and the teaching should be like the overflow water of this spring of culture, Spontaneous and inevitable..." এবং রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, শিক্ষা তখনই স্বতঃস্ফূর্ত এবং অকৃত্রিম হয়ে উঠতে পারে যখন তার সঙ্গে আমাদের সমগ্র সামাজিক জীবনের একটা জীবন্ত সম্পর্ক তৈরি হয়।

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজকে কীভাবে গড়ে তুলেছে, কীভাবে উনিশ এবং বিশ শতকের উপনিবেশিত বৌদ্ধিক সমাজ ধীরে ধীরে রক্তহীনতায় পৌঁছে গেছে সেকথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"They never have intellectival courage, because they never see the process and the environment of those thoughts which they are compelled to learn—and thus they loose the historical sense of all ideas, never knowing the perspective of their growth, they are hypnotized by the sharp black and white of the printed words, formed and fixed, which hide their human genesis. They not only borrow a foreign culture, but also a foreign standard of judgement..."। ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ঠিক এমনভাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন মেকলেরা। ভারতবাসীকে পশ্চিমীকরণের মিথ্যা মোহে মজিয়ে দেওয়ার অন্যতম প্রবক্তা লর্ড মেকলের ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণাটা কেমন ছিল? অসভ্য, বর্বর ভারতবাসীর সভ্যতা, সংস্কৃতির ঐতিহ্য বলে যে কিছু নেই সে কথা জানিয়ে মেকলের গর্বিত উচ্চারণ উদ্ধার করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—'I have never found one among them (advocater of Indian languager and traditions) who could deny that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia." সে কালের এই বক্তব্যকে নির্বোধের প্রলাপ বলে মনে করার কোন কারণ নেই—এই ঔদ্ধত্য ঔপনিবেশিক প্রভুদের নগ্ন আধিপত্যবাদী মানসিকতারই পরিচয়বাহী। এবং এই প্রভুদের বানানো ছাঁচেই উপনিবেশিক সত্তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে—তার মন এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছে। উনিশ

শতক থেকেই এই শিক্ষিত ভারতবাসী ক্রমশ তার নিজের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে হারিয়ে ফেলছিল। সুদীর্ঘ কাল ধরেই যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বহুজাতির, বহুভাষার, বহুধর্মের এবং বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং দেওয়া-নেওয়া আর সমন্বয়ের ভিত্তিতে চরিত্রগত ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি একই সঙ্গে স্থানিক এবং বৈশ্বিক সে-কথা ঔপনিবেশিক ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ভুলে যেতে সাহায্য করেছে। আমরা দল বেঁধে পশ্চিমানুগ হবার বা প্রভুর জীবনাচরণ এবং সংস্কৃতির উপরিতলকে অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা করেছি। ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা দেশজুড়ে ছাত্র এবং শিক্ষকদের আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে, আমাদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বহমান জীবনের সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ যে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ইউরোপের মাটিতে জ্ঞানের যথার্থ উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে বিশিষ্ট করে তুলেছে—সেই ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিকে ভারতবর্ষের মাটিতে নির্বিচারে রোপণ করতে চাওয়ার ফল যে ভাল হয় নি তা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন।

আমাদের ঔপনিবেশিক শাসকদের ভাষানীতিও আমাদের ছাত্রদের কাছে ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার যথার্থ বাহন হিসেবে মাতৃভাষার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন—So for as my own experience of teaching goes, a considerable proporation of pupils are naturally deficient in the power of learning languages; such may find it barely possible to matriculate with an insufficient understanding of the English language, while in the higher stages disaster in inevitable.” তাছাড়া ভারতীয় জিহ্বায় ইংরেজি ভাষাকে ধারণ করা প্রায় অসাধ্য এবং খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী ভাল শিক্ষকের সহায়তায় যদিও সেটা আয়ত্ত করতে পারে কিন্তু সেই সুযোগ আমাদের দেশের গরিব ছাত্রদের পক্ষে অর্জন করা কখনও সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় শুধু শিক্ষাক্ষেত্র নয়—আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সংস্কৃতির প্রতিটি প্রত্যন্তে ইংরেজির আধিপত্য ভারতবর্ষের জীবন ও সংস্কৃতিকে কীভাবে শ্রীহীন এবং নির্জীব করে তুলছে তা উঠে এসেছে। ভাষাকে কেন্দ্র করেই একটি জাতির এবং সেই জাতির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, সেখানে বহুভাষিক বহুজাতির ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষাগুলির যথাযথ বিকাশের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের সত্যিকারের সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে ওঠা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বহুভাষিক, বহুজাতির ইউরোপের 'true federation of culture' গড়ে ওঠার বাস্তবতাটিকে মনে করিয়ে দেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে রাউলাট আইন, মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার-সংক্রান্ত বিতর্কের দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ ফেডারেশন গড়ে তোলার ডাক দিচ্ছেন, ডাক দিচ্ছেন ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র বা চর্চাকেন্দ্র গড়ে তোলার। রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিক ভারতে তাঁর পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র বা চর্চাকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাকেন্দ্রে... “We must provide for the co-ordinated study of all these different cultures—the vedic, the Puranic, the Buddhist, the Jain, the Islamic, the Sikh, and the Zoroastsain. And side by side with them the European—for only then shall we be able to assimilate the last...It is needless to add that along with those languages in which lies stored our ancestral wealth of wisdom, we must make room for the study of all our great vernaculars which carry the leaving stream of the mind of modern India. Along with this study of our living languages, we must include our folk literature, in order

truly to know the psychology of our people and the direction towords which our underground current of life is moving.”। দেশের মানুষের অন্তরাত্মার উন্মোচনটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রকলা এবং সঙ্গীতের মতো প্রকাশ ভঙ্গিগুলি ছাড়াও কবিতার উপর জোর দিচ্ছেন তিনি। তাঁর মতে শুধু আমাদের জীবনের উপরিতলের বাস্তবতা নয়, বরং অবচেতন ও অচেতন মন, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে জ্ঞানের সঞ্চয় হয়ে চলেছে তার উন্মোচনও জাতীয় সংস্কৃতির গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

প্রবন্ধের শেষাংশে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যদি প্রশ্ন ওঠে ‘বিশ্বভারতী’ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র গড়ে তোলার যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন তা কতটা বাস্তবসম্মত তাহলে তাঁর উত্তর হবে—“what ever is true is real. Reality is related to truth, as the canvas to the picture—it must be there at the back. And if my Ideal of the Centre of Indian Culture has any truth, it can be, and therefore must be, realized at all costs.” সত্যিই তা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি বিশ্বভারতীর স্বপ্নকে সফল করে তুলতেই প্রাণপাত করেছেন।

কিন্তু তারপর আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি? বিশ্বভারতী এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি আজ অনেকাংশে মার্কশিট এবং মানপত্র ছাপার কারখানায় পরিণত হয়ে যায়নি? ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর ভিতরে বড় হয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক প্রভুর শিক্ষানীতির, ভাষানীতির চূড়ান্ত সমালোচনা করে যেভাবে বিকল্প নীতির বা ভাবনার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন আমরা তাঁর জন্মের দেড়শত বর্ষপূর্তিতে তা অনায়াসে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যেতে দিয়েছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আজ আরও বেশি বেশি করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের আদলে গড়ে তুলতে চাইছি আমরা। আমাদের উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে করি না—আমরা সব কিছুকে কেন্দ্রীকরণের দিকে যেমন ঝুঁকছি তেমনি মাঝে মধ্যেই গৈরিকীকরণের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাও গ্রহণ করছি। নব্য-ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় যখন আসল আঘাতটা এসে পড়েছে সংস্কৃতির উপরে তখন ভারতবর্ষকে টিকে থাকতে গেলে তার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির ভাষাগোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে টিকিয়ে রাখাটাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সেক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র তথা চর্চাকেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের এগোতেই হবে।

কবিতায় গল্প : অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিনী'র প্রকাশকাল ১২৮৪ বঙ্গাব্দ। তারপর ১২৯১-এ প্রকাশ পায় কবির আরো দুটি গল্প 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা'। ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'মুকুট'। কিন্তু ছোটগল্পের তেমন কোন লক্ষণ এগুলিতে ফুটে ওঠেনি বলে কেউ কেউ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক সার্থক সূচনা ১২৯৮ বঙ্গাব্দে।

কেউ কেউ বলেছেন : ''রবীন্দ্রকাব্য সৃষ্টিতে তখন চলছে 'সোনার তরী' পর্ব। কবির জীবনে পদ্মাতীরে বাস, বঙ্গপ্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের ব্যাপক সূচনা। কখনো বেশি বা কম গল্প লেখা চলছে। তখন থেকে আজীবন। প্রায় একই সময়ে কবিতায় গল্প বলা শুরু হল। সে—কাজও চলেছে জীবনের প্রায় প্রান্ত পর্যন্ত।''

যাকে এখানে 'কবিতায় গল্প' বলা হল, তাকেই কেউ কেউ বলেছেন, 'আখ্যান ভিত্তিক কবিতা'। কিন্তু তার উৎস 'সোনার তরী' পর্ব নয়, লক্ষ করলে দেখব, 'সোনার তরী' পর্ব শুরু হওয়ার চার বছর আগেই আখ্যানভিত্তিক রবীন্দ্রকবিতার সার্থক সূচনা হয়ে গেছে 'মানসী'তে (১৮৯০)। 'মানসী'র গুরুগোবিন্দ, নিষ্ফল উপহার, বধূ প্রভৃতি কবিতা তার দৃষ্টান্ত। এগুলিতে কাহিনির ক্রম বা ধারা রক্ষা করা না হলেও খণ্ড খণ্ড যেসব চিত্র আছে তা আখ্যানেরই সমতুল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'কথা' কাব্যের ভূমিকায় 'গুরুগোবিন্দ' জাতীয় কবিতাগুলিকে 'ন্যারেটিভ' বা কাহিনি বলে গোত্র নির্ণয় করেছেন।

কিংবা আমরা যদি আরো একটু পিছিয়ে যাই তাহলে দেখব, আখ্যানভিত্তিক রবীন্দ্রকবিতা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই আখ্যানভিত্তিক রবীন্দ্রকাব্যের আত্মপ্রকাশ। 'বনফুল' তারই নিদর্শন। 'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য এবং লুপ্ত 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের' কথা বাদ দিলে প্রথম রচিত কাব্য। এর প্রকাশকাল ১২৮২, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১২৮৬। এরই দু'বছর পর 'কবিকাহিনী'র আত্মপ্রকাশ, যা রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাপা বই।

মনে পড়বে 'অপ্সরাপ্রেম' এবং 'ভগ্নতরী'র কথাও। 'অপ্সরাপ্রেম' ও 'ভগ্নতরী'তেও কি গল্প একেবারেই অনুপস্থিত? প্রয়াত আচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্য : ''এই দুই কবিতার পটভূমিকা জুড়িয়া আছে সমুদ্র। কবিতা দুটিতে ভাবেরও মিল আছে। 'ভগ্নতরী' কাহিনীর খেই যেন বহুকাল পরে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে ধরা হইয়াছে''। 'ভগ্নতরী'র রচনাকাল ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

তবু একথা ঠিকই, 'মানসী' পর্ব থেকে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'কথা', 'কাহিনী', 'শিশু', 'পলাতকা', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'সানাই' প্রভৃতি কাব্যকবিতায় গল্পরস বহু বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছে। রূপকথা, ইতিহাস, উপনিষদ, অতীতচারিতা, কুসংস্কার, সমাজ, প্রেম, শিশু, শিখ অথবা

বৌদ্ধকাহিনি প্রভৃতি এমন আরো বহু কিছুকেই উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের আখ্যান ভিত্তিক কবিতার জগৎ। এরকম কবিতার সংখ্যা সব থেকে বেশি মিলছে 'কথা ও কাহিনী'তে এবং তারপরই স্থান 'পুনশ্চে'র।

'মানসী'তে (১২৯৪, ১৮৯০)-এ জাতীয় কবিতার মধ্যে পড়ে 'গুরুগোবিন্দ', 'বধূ' প্রভৃতি। 'বধূ' প্রথম রচিত হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জ্যৈষ্ঠ, পরে ৭ কার্তিক কবিতাটি সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করে। বঙ্গবধূর জীবন ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার এক বেদনাবহ চিত্র এতে রূপায়িত। মহানগর কলকাতার সংকীর্ণ ও কৃত্রিম জীবনপ্রবাহের মধ্যে এক বিবাহিতা পল্লীবালা যে কীভাবে হাঁফিয়ে উঠেছিল তারই আখ্যান তৈরি করেছে এ কবিতার অবয়ব। তার কেবলই মনে পড়ছে :

কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল।

মহানগরের মানুষজন কেউই তার দিকে ফিরে তাকায় না :

হেথায় বৃথা কাঁদা দেওয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

নিঃসঙ্গ বালিকা বধূটি তাই শেষ পর্যন্ত ভেবেছে :

দিঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

'গুরুগোবিন্দ', 'নিষ্ফল উপহার' প্রভৃতি কবিতাতেও এসেছে কাহিনির রেণু। কবি নিজেও অবশ্য এ জাতীয় কবিতাগুলিকে 'ন্যারেটিভ' বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলিতে কাহিনির নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা না হলেও যেসব ছবি এতে ভেসে উঠেছে তার গল্পরস যেমন রয়েছে তেমনিই আছে ভাবরস। 'গুরুগোবিন্দে' স্বদেশ অনুরাগী রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে।

কিংবা ধরা যাক 'সোনার তরী' পর্বের (১২৯৮ ফাল্গুন—১৩০০ অগ্রহায়ণ) 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'হিং টিং ছট', 'পরশপাথর' প্রভৃতি কবিতা। এগুলিতে কমবেশি লোককথা, নয়তো অবিমিশ্র রূপকথার আমেজ আছে। হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্রকে নিয়ে যে লোকশ্রুতি প্রচলিত তারই ওপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন 'হিং টিং ছট'-এর অবয়ব। ব্যঙ্গগল্পের এ এক চমৎকার নিদর্শন। গল্পরস ও কাব্যরস যেন এখানে সমানে সমানে চলেছে। রাজা হবুচন্দ্রের ''স্বপ্নে আছে দুটি ছবি—স্বপ্নের মতোই নিঃসম্পর্ক। তিনটি বাঁদরের বাঁদুরে অত্যাচারে অত্যাচারিত হতে হতে :

সহসা মিলাল তারা, এল এক বেদে
'পাখি উড়ে গেছে' বলে মরে কেঁদে কেঁদে।
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নিচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে 'কি আপদ'! কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।

পাখির মত রাজা করে ছটফট,
বেদে কানে কানে বলে—হিং টিং ছট।

রাজার এই দুরবস্থা মজাদার বাংলা উপকথার প্রচলিত ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে, যেখানে রাজারা বোকাটে এবং সর্ববিষয়ে হাস্যকর।”

পূর্বেই বলা হয়েছে, আখ্যানভিত্তিক এরূপ কবিতার সংখ্যা সব থেকে বেশি মেলে ‘কথা ও কাহিনী’তে (১৩০৮-১৩০৬)। ‘পূজারিণী’ তারই অন্যতম। এ কবিতায় বৌদ্ধ-বিরোধী অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ প্রকাশিত। কবিতার আখ্যানটি এইরকম : শ্রীমতী নামে এক দাসী পুণ্য শীতল সলিলে অবগাহন করে হাতে পুষ্পপ্রদীপ নিয়ে যাচ্ছিলেন ভগবান বুদ্ধের স্তূপে অর্ঘ্য দিতে। অজাতশত্রুর নির্দেশ অমান্য করে তাকে এমনভাবে যেতে দেখে রাজবধূ অমিতা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন :

...অবোধ কি সাহসবলে
এনেছিস পূজা! এখনি যা চলে —
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তাহলে বিষম বিপদ্‌পাত।

রাজকুমারী শুক্লা জানায় :

রাজার আদেশ আজি কে না জানে—
এমন করে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে!

তবু থামেন নি শ্রীমতী। নম্র প্রতিবাদের ভঙ্গীতে এগিয়ে গেছেন তিনি। জানিয়েছেন তার প্রভুর পূজার সময় সমাগত। অতএব আর কালবিলম্ব নয়। শেষ পর্যন্ত ধর্মের জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গের যে ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা কাব্যের সম্পদ :

সেদিন শুভ্র পাষাণদলকে পড়িল রক্তলিখা
সেদিন শারদস্বচ্ছনিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।

গল্পরস আরো ঘনীভূত হয়েছে ‘দেবতার গ্রাস’ ও ‘বিসর্জনে’। রচনাকালের নিরিখে ‘বিসর্জন’ আগে (২৪ আশ্বিন, ১৩০৬), ‘দেবতার গ্রাস’ পরে লেখা (১৩ কার্তিক, ১৩০৪)। দুটি রচনাতেই গল্পরস ও নাট্যরস প্রায় সমান সমান। দুটিতেই সামাজিক অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তর্জনী উদ্যত। ‘বিসর্জনে’ পাচ্ছি মল্লিকা নাম্নী এক হতভাগ্য মায়ের কথা, যার ইতিপূর্বেই দুটি সন্তান গত হয়েছে পুরো দু’বছর পেরোনোর আগে। তারপর যখন তৃতীয় সন্তানটি কোলে এল তখন বেচারী মল্লিকা হারালো তার স্বামীকে। সকলে বলল :

পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।

কোলের শিশুপুত্রটির প্রতি তাই মল্লিকার যত্নের অবধি নেই। পাছে তাকেও হারাতে হয় এই ভয়। ব্রত-দান-ধ্যান-উপবাসে সবসময়ই তার অতিবাহিত হয়। সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার বাসনায় কত কিছুই না করে মায়ের মন :

...কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি;
শুনে রামায়ণ কথা; সন্ন্যাসী—সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্বনীচে
সবার প্রসন্ন দৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান লাগি। সূর্য চন্দ্র হতে
পশু পক্ষী পতঙ্গ অবধি কোনোমতে
কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে,
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা, সকলের কাছে
আকুল বেদনাভরে দীন হয়ে আছে।।

কিন্তু বিধি বাম। ক্রমে শিশুপুত্রটির বয়স হয় দেড়। দেখা দেয় যকৃতের বিকার। মমতাময়ী মায়ের আকুল প্রশ্ন উদ্যত খড়্গের মত ঝলসে ওঠে :

...ব্রাহ্মণঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর?
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত পূজা তবু রক্ষা নাই?
তবু কি নেবেন তাঁরা আমার বাছারে?
এত ক্ষুধা দেবতার?...

ব্রাহ্মণঠাকুর জানান দানবীর কর্ণের কথা, ধর্মরক্ষার জন্য যিনি নিজপুত্রকে বলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি; জানান এক বন্ধ্যা নারীর কথা, যে কিনা মানত রক্ষার জন্য নিজপুত্রকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতেও পিছপা হন নি। একেই বলে নিষ্ঠা! কলিকালে সে নিষ্ঠা কই? ভক্তি বলে একেই।

সেই নিষ্ঠার প্রমাণ দিতেই মল্লিকা শেষে নিজপুত্রকে বিসর্জন দেয় গঙ্গাবক্ষে, আর মনে মনে কল্পনা করেন মা গঙ্গা ঠিকই ফিরিয়ে দেবেন তাকে, যেমনটি কিনা দিয়েছিলেন ঐ কর্ণ কিংবা বন্ধ্যা রমনীটিকে। কিন্তু বৃথাই তার আশা :

পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চিৎকারি উঠিল নারী, 'দিবে নে ফিরায়ে'?
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে।।

কবিতাটির আখ্যানের সঙ্গে অসম্ভব মিল আছে 'দেবতার গ্রাসে'র। সেখানেও গঙ্গাবক্ষে সন্তান বিসর্জনের নিদারুণ ছবি পাই। সাগরে যাওয়ার সময়ে প্রথমে মোক্ষদা চায়নি বাছা তার সঙ্গে যাক, চেয়েছিল মাসীর কাছেই থাক, যে কিনা তাকে সন্তানের মতই মানুষ করে তুলেছিল। কিন্তু অবশেষে হার মানতেই হল মাকে। শুধু ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলে ফেলেছিলেন,—কথা যখন শুনবিই না, তখন চল তোকে দিয়ে আসি সাগরের জলে।

সাগরে যাওয়ার পথে তৈরি হল এক প্রতিকূল পরিস্থিতি। বিপন্ন মাঝি সকলকে হেঁকে জানতে লাগল :

বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই তাই এত ঢেউ—
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।...

মোক্ষদা যার সঙ্গে তীর্থে বেরিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মণঠাকুরই একমাত্র জানতেন মোক্ষদার বলে ফেলা ঐ কথাটি। ভর্ৎসনা গঞ্জনার সুরে তাই ঠাকুর বলে উঠলেন :

শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!
মোক্ষদা কহিল, অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল! সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর!
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা!
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা!

আখ্যানটি শেষ হচ্ছে এই ভাবে :

মুহূর্তের তরে ছুটন্ত তরঙ্গ মাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসী' বলি ছুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে।
'ফিরায়ে আনিব তোরে'—কহি ঊর্দ্ধশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত—মাঝে ঝাঁপ দিল জলে
আর উঠিল না! সূর্য গেল অস্তাচলে।।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত যথার্থ বলেছেন : ''পদ্যগল্পটি আদ্যন্ত নাট্যতরঙ্গিত। কথা ও কাহিনির অন্য কোথাও এতখানি নাটক নেই—ভেতরের নাটক এবং বাইরে নাটক। আর যেখানে নাটক নেই সেখানে উদ্ধৃত বর্ণনায় কাব্যিকতা ফাঁক পূরণ করেছে। পুরো লেখাটির মেজাজ ও স্বাদের সাযুজ্যে এই বর্ণনাচিত্র দারুণ সংক্ষুব্ধ। দেবতার গ্রাস সবশুদ্ধ এক অতি উৎকৃষ্ট পদ্যগল্পের ঐ বিশেষ রীতির চরম নিদর্শন।''

স্মরণে রাখতে হবে 'কথা ও কাহিনী'তে কিছু কবিতার রচনাকাল প্রকৃতপক্ষে 'চিত্রা' পর্বে। 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি' তেমনই দু'টি কবিতা। প্রথমটির প্রকাশ ১২ ফাল্গুন ১৩০১ এবং দ্বিতীয়টির প্রকাশকাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২। দুই কবিতাই আসলে নিটোল গল্প। সূচনা ও পরিণতি দুইই আছে, আছে নাটকোচিত ক্লাইম্যাক্সও। ছোটগল্পের একমুখীনতা দুটিতেই বিদ্যমান। 'পুরাতন ভৃত্য'-এ কবির মানবিকতা ও 'দুই বিঘা জমি'তে সমাজমনস্কতার ছাপ স্পষ্ট। প্রথমটির কাহিনিবলয় এইরকম : কেষ্টা নামে ছিল এক প্রভুভক্ত ভৃত্য। চেহারায় ও বুদ্ধিতে তেমন কোন চটক না থাকলেও

প্রভুর প্রতি ছিল তার অসীম শ্রদ্ধা। তাই বার বার দূর করে দেওয়া সত্ত্বেও পরের দিন দেখা যেত সে ঠিক উপস্থিত হয়েছে। আসলে প্রভুও তাকে ভালবাসত খুব। এটা সে বুঝেছিল। 'তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার, মোর পুরাতন ভৃত্য' বাক্যাংশটিতে সেই মমত্বই প্রকাশিত।

তো যাই হোক, সে-বছর কিছু টাকা পেয়ে কেষ্টার প্রভু সিদ্ধান্ত নিলে বৃন্দাবন ঘুরে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গী হল কেষ্ট। গন্তব্যে পৌঁছে মনে হল দিন বেশ ভালই কাটবে। এখানকার মধুর পরিবেশ যারপরনাই মনমুগ্ধকর। কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ করে তিনি আক্রান্ত হলেন মহামারী বসন্তে। বেড়ানোর মনটাই গেল মাটি হয়ে। পরম মমতায় তখন এগিয়ে এল কেষ্ট, নিজের কাঁধে তুলে নিল প্রভুর সমস্ত সেবার ভার। সংক্রামক ব্যধিও পারল না প্রভু-ভৃত্যের মাঝে ব্যবধান তুলতে :

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার 'কর্তা, তোমার কোন ভয় নাই, শুন—
যাবে দেশে ফিরে, মা ঠাকুরাণীদের দেখিতে পাইবে পুন।

কর্তা গৃহে ফিরলেন বটে কিন্তু ফিরল না কেষ্ট। প্রভুর কালব্যাধি অবশেষে তাতেই সংক্রামিত হল, মৃত্যু ঘটতে কালবিলম্ব হল না :

হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন, বন্ধ হইল নাড়ী—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।।

'দুই বিঘা জমি'র আখ্যানেও রবীন্দ্রনাথের এই মানবতা বিদ্যমান, অধিকন্তু আছে সমাজমনস্কতা, আছে মৃদু অথচ মর্মভেদী প্রতিবাদ। দুটি কবিতা এত বেশি বক্তব্যপ্রধান এবং বর্ণনাভঙ্গী এত সাদামাটা যে কাব্যরস অনুপস্থিত। কবিতাটির গল্প এই রকম : জমিদার তার বাগান তৈরির কাজে উপেনের একমাত্র সম্বল পৈতৃক জমিটুকু নিতে চান। কিন্তু কোনমতেই তা দিতে রাজি হয় না উপেন। অবশেষে কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও শাসকের রক্তচক্ষুর কাছে অসহায় উপেনকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। জমি হারিয়ে হতে হয় দেশান্তরী। কিন্তু যতই হোক জমি হল 'মা'। মায়ের টান যে অস্বীকার করার নয়। সেই টানেই একদিন আবার উপেন এসে উপস্থিত হয় তার ভিটেতে। চারপাশের পরিবেশ চোখ জুড়িয়ে দেয়। নষ্টালজিক হয়ে পড়ে সে। আর তখনই :

সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে, আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হল ঐ আম দুটি আসলে চুরি করেছে উপেন। চোর বলে প্রতিপন্ন হয় সে। তার হৃদয়বিদারী মন্তব্য তখন প্রতিবাদের অনেক কাছাকাছি যায় :

আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!
বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়'।

আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।।

'দীনদান' কবিতাটিও কাহিনিনির্ভর। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনার প্রকাশ এখানে বিদ্যমান। তবে সেই ঈশ্বর মানবের মাঝেই প্রকাশমান। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী। 'দীনদান' কবিতার রাজা ছিলেন অন্ধ, চোখ থেকেও প্রজাদের দুঃখ কষ্টের অংশীদার হতে তিনি ছিলেন অপারগ। না হলে যে বছর প্রচণ্ড প্রকৃতির দুর্যোগে প্রজারা সহায়সম্বলহীন হয়ে গৃহ হারিয়ে পথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছিল, সেবছর রাজা হয়ে প্রজার পাশে না দাঁড়িয়ে বিংশতিলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে কিভাবেই বা তিনি গড়ে তুললেন অভ্রভেদী স্বর্ণমন্দির! যে অর্থ প্রজাদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হতে পারত, হওয়া উচিত ছিল, সেই অর্থে নির্মিত মন্দিরে কি দেবতা থাকতে পারেন! মানুষের মাঝেই তো তাঁর নিত্যপ্রকাশ। সাধু নরোত্তম সেকথা নম্রভাবে মহারাজকে জানাতেই বিতাড়িত হতে হল তাঁকে। মনের দিক থেকে রাজা যে দীনতার পরিচয় দিলেন তাকে উপলক্ষ্য করেই গল্প-কবিতাটির নাম রাখা হয়েছে 'দীনদান'।

'মূল্যপ্রাপ্তি'তেও আছে রবীন্দ্রনাথের এই ঈশ্বরভাবনার প্রকাশ, আছে সুদাসমালীর ''ধর্মচেতনায় উজ্জীবনের ছবি, কিন্তু গল্প জমল তখন, যখন অকালের পদ্মটি কেনবার জন্য রাজা ও শ্রেষ্ঠী দর হাঁকার পাল্লা দিল। এতে তাদের দুজনের গাঢ় বুদ্ধ ভক্তির চেয়ে অর্থের অহংকার বড় হয়ে আদর্শকে আঘাত করেছে, আর সে কারণেই কাব্যের রস এখানে জমেছে। দুজনের সঙ্গে আরও একজন নিরুচ্চার মানুষ যোগ দিয়েছে—সে সুদাস। তার মনও সেই দর হাঁকার লড়াইয়ে নীরবে আলোড়িত হয়েছে। এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে নাট্যরস ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছল যখন, সুদাস বিক্রেতা থেকে উপরে উঠে গেল। এখানেই এর আর্ট।...'দীনদান' কবিতাটির সঙ্গেও এর কিছু মিল আছে—ভক্ত এখানে বিদ্রোহী। ...নরোত্তমের ব্যক্তিত্ব যেমন অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে তেমনি ঘটনাবহুল কাহিনিও সুগ্রথিত হয়েছে। খুব অল্প আয়োজনে পদ্যগল্পকার লক্ষ্য ভেদ করেছেন।''

'কল্পনা' পর্বে (বৈশাখ ১৩০৭) এমন গল্প ভিত্তিক কবিতার সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম 'জুতা আবিষ্কার'। এর বিষয়বস্তু হাস্যরসাত্মক। কীভাবে জুতা পরা প্রচলিত হল তা নিয়েই এর গল্প। গল্পটি যেমন ঘটনাবহুল তেমনি নাটকীয়। কাহিনিসূত্রটি এই : একদিন হবুচন্দ্র রাজা তাঁর গোবুচন্দ্র মন্ত্রীকে ডেকে জানালেন আশঙ্কার কথা, জানালেন তাঁর বড় ভাবনা হয় পা দুটিকে কিভাবে ধূলাবালি থেকে রক্ষা করা যায়। তিনি নির্দেশ দিলেন :

শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।

ধুলো দূর করার উপায় নিয়ে তাই বিভিন্ন মহলেই শুরু হল নানা জল্পনা কল্পনা। এলেন দেশ-বিদেশ থেকে নানান পণ্ডিত জ্ঞানীগুণী মানুষ। প্রথমে সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটা কিনে ধুলো দূর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু দেখা গেল তাতে এত ধুলো উড়ল যে তা দূর করতে গিয়ে সমস্ত জগৎটাই গেল ধুলোয় ভরে। তারপর জল দিয়ে তা ধোওয়ার ব্যবস্থা হল। তাতে দেশটা গেল কাদায় ঢেকে। কেউ কেউ বলল :

...চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।

ধূলির মহী ধূলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।
কহিল সবে, হবে সে অবহেলে
যোগ্যমত চামার যদি মেলে।

চামার মিলল। সে সবিনয়ে জানাল, এতেও শেষ রক্ষে হবে না, তবে উপায় একটা আছে। চামড়া দিয়ে যদি মহারাজ তাঁর পা দুটি মোড়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে আর ধুলো লাগবে না। এবং হলও তাই। তখন ঈর্ষাকাতর গোবুচন্দ্রের উক্তি :

...'আমারো ছিল মনে, কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।
সেদিন হতে চলিল জুতা পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।।

'খেয়া' কাব্যের (শ্রাবণে ১৩১২ আষাঢ় ১৩১৩) 'কৃপণ' কবিতাটিও একটি নিটোল গল্প। সূচনা ও পরিণতি দুই-ই আছে, আছে নাট্যচমকও। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনার প্রকাশ এতেও বিদ্যমান। ঈশ্বর প্রেমময়। তিনি দুহাত বাড়িয়েই আছেন। দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। কিন্তু আমাদেরই নেই নেওয়ার মত মন। দিলে তবেই যে পাওয়া যায় তা আমরা মনে রাখি না, মনে রাখি না সর্বস্ব দিলে তবেই সর্বস্বকে পাওয়া যায়। মহৎ ত্যাগ ছাড়া মহৎকে লাভ করা যায় না। তাই তো লাভের ভাঁড়ার শূন্যই পড়ে থাকে। 'কৃপণ' কবিতার ভিক্ষুকটিও সেইরকম। মহারাজের কাছে কিছু পাওয়ার আশাতেই সে হাজির হয়েছিল পথপ্রান্তে, এমন কিছু সে আশা করেছিল যা পেলে সারা জীবন আর ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে না। কিন্তু বিধি বাম বুঝি বা। তাকে কিছু দেওয়া তো দূরে থাক, উল্টে রাজাই তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভিক্ষুক ভাবল এ কি প্রবঞ্চনা! কি বা আছে তার ঝুলিতে যা তিনি রাজাধিরাজকে দেওয়ার স্পর্ধা রাখেন! শেষে ঝুলি থেকে একটি মাত্র শস্য কনা তুলে দিলেন ঐ রাজভিখারীকে, গৃহে ফিরে ভিক্ষাপাত্র উজার করে দেখলেন তা স্বর্ণকণা হয়ে ফিরে এসেছে। ভিক্ষুকটি তখন কাঁদেন অশ্রুনীরে 'আমি কেন দিইনি আমার সকল উজার করে'! উজার করে যিনি দিতে পারেন তিনিই তো ভক্ত। মহারাজ এখানে ঈশ্বরের প্রতীক। ভিক্ষুকের কাছে তার হাত বাড়িয়ে কিছু চাওয়া, ভক্তের কাছে ভগবানের কিছু চাওয়ারই রূপক। বেশ 'ধাক্কা দেওয়া ক্লাইম্যাক্সে' গল্পের সমাপ্তি।

'পুনশ্চে' (১৩৩৯) এ ধরনের আখ্যান-কবিতা বা গল্প-কবিতার সংখ্যা 'কথা ও কাহিনী'র পরেই। 'প্রথম পূজা', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'ছেলেটা', 'বাঁশি', 'শেষ চিঠি' প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা তার নিদর্শন। 'ক্যামেলিয়া'র প্রকাশকাল ২৭ শ্রাবণ ১৩৩৯। এটি একটি আগাগোড়া প্রেমের গল্প। পরিণতি বিয়োগান্ত। এর বিষয়টি এ যুগেও মানানসই। নায়কের কোন নাম নেই। ফুটবল খেলায় তার খ্যাতি খুব। নায়িকার নাম কমলা। পথে ঘাটে ট্রামে প্রায়ই দেখা যায় তাকে। ইচ্ছে হয় আলাপ করতে, কিন্তু সাহসে যেন কুলোয় না। যেচে আলাপ করতে না পেরে তাই মনে মনে কল্পনা করে ছেলেটি :

...একটা কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন,
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি—
রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত,

কোন একজন গুণ্ডার স্পর্ধা।
এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।

না, তেমন কোনো ঘটনাই ঘটল না যে নায়ক তার বীরত্ব প্রমাণ করবে। প্রণয়ের প্রস্তাব দেবে। শেষে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল ছেলেটির। মেয়েটি তাকে দেয় একটি 'ক্যামেলিয়া'র চারা। 'কমলা'র নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় বড় মনে ধরে। তাই ছেলেটি তা সযত্নে রক্ষা করেছে বহুদিন। একদিন তাতে ফুলও ফুটল। ইতিমধ্যে সে জানতে পেরেছে কমলার মনের মানুষ আছে একজন। তার সাধ হল ক্যামেলিয়া ফুল উপহার দেবে কমলাকে। শেষে এক সাঁওতাল মেয়ের মাথায় তার ফুল গোঁজা দেখে তার প্রতিক্রিয়া :

...দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে জিজ্ঞেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে'।
আমি বললেম, 'এইজন্যেই'।

'সাধারণ মেয়ে'র প্রকাশকাল ২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯। নারীমুক্তির গল্প। 'স্ত্রীর পত্রে' পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে মৃণালের বিদ্রোহের সঙ্গে এর মিল আছে। তবে দুটির প্রেক্ষাপট দু'রকম। আখ্যানে পাচ্ছি : মালতীর বয়স অল্প। একজনের মন ছুঁয়েছিল তার কাঁচা বয়সের মায়া। নাম তার নরেশ। তার কথা ভেবে পুলক লাগত দেহে মনে। কিন্তু মালতী ভুলে গিয়েছিল সে সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে। তার কাউকে ভালো লাগতেই পারে, কিন্তু সেও যে তাকে ভালবাসবে সেই নিশ্চয়তা কই? একদিন নরেশ গেল বিলেতে। প্রথম প্রথম সে বলত 'কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো'। শেষবারের চিঠিতে সে লিখেছে, লিজি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। সহ্য করতে পারল না মালতী। লিজির সঙ্গে তার একটা অদৃশ্য তুলনার সংকেত যেন মালতীর বুকে কাঁটার মতো বিঁধল।

মালতী তাই শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়েছে তারই মতো একটি সাধারণ মেয়ের গল্প যেন তিনি লেখেন। তবে সে যেমন হেরে গেছে, মেয়েটি যেন না হারে। কেমন করে লেখা হবে সেই গল্প সেই উপায়-ও বলে দিয়েছে মালতী :

বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙ্গেছে,
হার হয়েছে আমার।
তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে—
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।

মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।

জ্যোতির্বিদদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।

নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

নারী এখানে বিদ্রোহিনী। শরৎচন্দ্র যে সাধারণ মেয়ের গল্প বলায় পটুত্বের অধিকারী ছিলেন, রবীন্দ্রকবিতাতেও তার স্বাক্ষর। কাজেই এই গল্প—কবিতাটির এক ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য।

'বীথিকা' (১৩৪১-৪২), 'শ্যামলী' (১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়), 'আকাশপ্রদীপ' (১৩৪৫), 'সানাই' (১৩৪৫ আষাঢ়-১৩৪৭ আষাঢ়) প্রভৃতি কাব্যেও এরকম কবিতার সাক্ষাৎ মেলে। 'মিলনযাত্রা' এমনই একটি কবিতা। এটি আগাগোড়া বিদ্রোহী প্রেমের গল্প। 'শ্যামলী'র 'সম্ভাষণ'ও একটি নিটোল প্রেমের গল্প। স্বাদে ভরা। মন ভালো করা কাহিনি-কবিতা। নায়কের নাম অজিতকুমার, নায়িকা চারুপ্রভা। প্রতিদিন চারুপ্রভাকে দেখতে দেখতে বয়সের ভারে প্রেম ফিকে হয়ে আসে। একদিন হঠাৎই চারুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে দেখে যৌবনে ফিরে যায় অজিত, মনে পড়ে যায় ফেলে আসা দিনগুলির কথা। নিজেকেও মনে হয় 'অজিতকুমার'। দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে লাগে আবার নতুন রঙ্।

'আকাশপ্রদীপে'র 'শ্যামা'য় (১৪ কার্তিক, ১৩৪৫) এরকম কোন নাট্যচমক নেই, গল্পও ঠিক নয়। শুধু একটি ঘটনা। অনেকটা লিরিকধর্মী। কাব্যত্বও কিছুটা বিঘ্নিত। কাহিনি সরল এবং একমুখী। মেয়েটির নাম শ্যামা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। গলায় তার একটি হার। কবি তার দিকে চেয়েছিলেন অনেকবার কিন্তু কথা হয়নি। তারপর একদিন :

জানাশোনা হল বাধাহীন
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।

এরপর সামান্য কিছু কথা। তারপর আখ্যানটি শেষ হচ্ছে এইভাবে :

পুলকে-বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিম দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনালো,
আশ্বিনের আলো।

এভাবেই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যকবিতায় আখ্যান এসেছে, এসেছে গল্প। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের পাশাপাশি এসব গল্প-কবিতাও স্বাদে ও রসে হয়ে উঠেছে অনন্য। তাঁর অনেক ছড়াও গল্পভিত্তিক। তাতে গল্পের চেয়ে ছবি আছে বেশি একথা ঠিক কিন্তু পুরো ঠিক নয়। গল্পরস, কাব্যরস ও চিত্ররসের অপূর্ব ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে সেখানেও—একথা অবশ্য বলা যায়।

একটি ভাঙা প্রেমের গল্প এবং বাক্‌চিত্রী রবীন্দ্রনাথ

শুভঙ্কর রায়

'চিত্রা'-র 'জীবনদেবতা' কবিতায় জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর অনন্ত প্রণয়ের কথা জ্ঞাপন করেছিলেন কবি। জানিয়েছিলেন তাঁদের অনন্তবাসর সাজানোর কথা—''কত-যে বরন কত-যে গন্ধ/কত-যে রাগিণী কত-যে ছন্দ/গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন/বাসরশয়ন তব।'' কবি রবীন্দ্রনাথের কলম বাসর সাজানোর রোমান্টিক চিত্রসমারোহের সৃজনে অকুণ্ঠ। আবার বাসর ভাঙার কথনেও অনবদ্য বিরহী-চিত্রী। মানুষের পৃথিবীতে বাসর গড়ার পাশাপাশি বাসর তো ভাঙেও। এমনই এক ভাঙা প্রেমের গল্প 'একরাত্রি'। 'সাধনা' পত্রিকায় হাজির হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ বঙ্গাব্দে।

প্রেম ভেঙে যাওয়া শুধু হৃদয়ঘটিত ব্যাপার নয়। সমাজ-সংসারও তাতে নাক গলায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। কাব্যের পাশে পাশে কঠিন গদ্যেরও তাই আবির্ভাব ঘটে। সুরবালা-র সঙ্গে চৌধুরী জমিদারের নায়েবের পুত্র পরবর্তীকালে নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট শহরের এন্ট্রান্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার-এর বিয়েটা যে হল না তার মধ্যে সমাজ-সময়ের খানিক অনুপ্রবেশ আছে। নারী-পুরুষ সম্পর্কের একটা তুল্যমূল্য বিতর্ক সবদেশেই নিজস্ব নিজস্ব ধরনে প্রচলিত। বিষয়টা সমাজ-বিজ্ঞান ঘটিত। রবীন্দ্রনাথও ধরেছিলেন সেটা। ঐ ১২৯৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তিনি লিখেছিলেন 'পঞ্চভূত'-এর 'নরনারী' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে পরবর্তীকালে অবশ্য নতুন একটি অংশ সংযোজনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যার রচনাকাল চৈত্র ১৩৪২ বঙ্গাব্দ। 'নরনারী' প্রবন্ধে দেখা যায় সমাজে পুরুষ ও মহিলা কোন লিঙ্গের গুরুত্ব তর-তম তা নিয়ে প্রবল উত্তেজনা চলছে পাঞ্চভৌতিক সভায়। ক্ষিতি বলে উঠলেন 'স্ত্রীলোকের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ' বলে 'বৃহৎ দেশে ও বৃহৎ কালে তাহার স্থান নাই'। মহিলাদের ধারণা, ক্ষিতি-র মতে, 'উপস্থিতমত স্বামীপুত্র আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই তাহার কর্তব্য সাধিত হয়'। কিন্তু পুরুষের 'জীবনের কার্যক্ষেত্র দূর দেশ বা দূর কালে বিস্তীর্ণ'। তাই তাদের 'কর্মের ফলাফল সকল সময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে'। এমনকি 'নিকটের লোকের ও বর্তমান কালের নিন্দাস্তুতি' পুরুষ উপেক্ষা করতে পারে। কারণ 'সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা' পুরুষকে 'অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার' মধ্যেও 'অবিচলিত বল প্রদান' করে থাকে। বাংলা বা ভারতবর্ষের সমাজজীবনে অন্দরটুকুই নারীর চারণভূমি। পারিবারিক সন্তোষ সাধন ও সন্তান উৎপাদন তার জীবনের সারকথা। পুরুষের দায়িত্ব 'দূর দেশ বা দূর কালে বিস্তীর্ণ', অতএব 'নিকট লোকের' মতামত বা সমালোচনা সহজেই তার উপেক্ষার যোগ্য। প্রচলিত ব্যবস্থায় লিঙ্গগত বৈষম্যের কথা জানিয়ে দিলেন ক্ষিতি। জীবনের সীমিত দায়িত্ব নারীর, কিন্তু পুরুষের দায়িত্ব ও চিন্তার সীমা-পরিসীমা মেলে না। অর্থাৎ নারীর ওপর পুরুষই প্রধান। শুধু প্রধান নয়, নারীর 'শাসনকর্তা'ও বটে। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে লেখা 'নারী' প্রবন্ধে ('কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন—''পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে-সব মত বিশ্বাস

করত না, যে-সকল আচরণ পালন করত না, মেয়েদের বেলায় সেগুলিকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছে। তার মূলে তাদের সেই মনোবৃত্তি ছিল যে-মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনকর্তাদের। তারা জানে, অজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেচ্ছ শাসনের সুযোগ রচনা করে;...”।

যে সমাজে পুরুষ ‘শাসনকর্তা’ সেখানে পাঠশালার বয়সে সুরবালার সঙ্গে বৌ-বৌ খেলার সহ-খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও ‘অধিকারমদে মত্ত’ হয়ে সুরবালার ওপর নায়েব-এর পুত্ররত্নের ‘শাসন ও উপদ্রব’ চালানোটা স্বাভাবিক। কারণ সুরবালার জননীর পাশাপাশি এই শিশুদুটিকে দেখে মনে হয়েছিল ‘আহা, দুটি বেশ মানায়’। কথাটির মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের একটি ইঙ্গিত আছে। সেখানে পরিবারের অভিভাবকদের প্রশ্রয়ও আছে। নায়েব-এর শিশুপুত্রটি সুরবালাজননীর মন্তব্য স্পষ্ট উপলব্ধি করতে না-পারলেও ‘কথাটার অর্থ একরকম’ অনুমান করে। সামন্ততান্ত্রিক পুরুষপ্রধান সমাজ বালকের মনে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয় একটি নারীর ওপর পুরুষ হিসেবে তার ‘বিশেষ দাবি’। শিশু সুরবালা তার সম্ভাব্য পুরুষ-কর্তাটির ‘বিশেষ দাবি’ স্বীকার করে ‘সহিষ্ণুভাবে’ ‘সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত’। সমাজ সুরবালার শিশুমনে এই বিশ্বাস প্রোথিত করেছিল প্রায়-নির্ধারিত স্বামীর ‘প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ’ করেছে সে। ছোটবেলা থেকেই সে অভ্যাস করে নেয় স্বামীর ‘প্রভুত্ব স্বীকার’।

‘একরাত্রি’ গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে নায়েবপুত্রের কথনে। অনেকটা স্মৃতিচারণামূলক কথন। সেই কথনের পরিধি শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত। শৈশবেই সেই কথক বুঝে গিয়েছিলেন বিনা প্রতিবাদে তাঁর সকল ‘প্রভুত্ব’ মেনে চলা সুরবালা তাঁর কাছে ‘বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র’। লক্ষণীয় ‘পাত্রী’ বলে কথকের বয়ানে নারীর প্রতি ন্যূনতম সম্মানটুকু প্রকাশ হতে দিলেন না রবীন্দ্রনাথ। বালিকাটিকে ‘পাত্র’ উল্লেখের মধ্যে বিশেষত্বহীন সাধারণ একজনের প্রতি বর্ষিত উপেক্ষাই প্রকাশ পেল।

কথন বা গল্পের নায়কের পিতার পরিকল্পনা ছিল পুত্রের চিন্তাভাবনা পরিণত হলে জমিদারি সেরেস্তার কাজ শিখিয়ে ‘গোমস্তাগিরি’-তে ঢুকিয়ে দেবেন। সব পিতা যেমন পুত্রের রোজগেরে জীবন সম্পর্কে চিন্তিত থাকেন, ক্ষমতামতো ব্যবস্থাদি করেন—নায়কের পিতাও সেই পথেই হেঁটেছেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু নায়ক খানিক ভিন্নরকম চিন্তা ছকে ছিল। সে দেখে জমিদারের গোমস্তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা ধরে কালেক্টার সাহেব-এর নাজির বা জজ-আদালতের হেডক্লার্ক। নায়কের পিতা জমিদারের নায়েব যিনি, তাঁকেও জমিদারির কর্ম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ‘আদালতজীবী’-দের তোয়াজে ঘুষে তুষ্ট রাখতে হয়। আদালতের নিম্নপদস্থ কর্মচারী, এমনকি পেয়াদারা পর্যন্ত সামন্তব্যবস্থার চোখে ‘বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা’ বা ‘তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ’। বৈষয়িক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য ‘আদালতজীবী’-রা তখন সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরশীল মানুষের কাছে। সময় বদলাচ্ছে—বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসছে। জমিদারতন্ত্র বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে বুর্জোয়া ব্যবস্থা। জমিদারের কর্মচারীর তুলনায় অনেক বেশি সম্মানের ও প্রতিপত্তির অধিকারী বুর্জোয়াব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত পাশ্চাত্য শিক্ষা নির্ভর পেশাদার জীবন—যথা চাকুরিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী। পালটে যাওয়া সময়টাকে ধরতে পেরেছিল নায়ক। সে এটাও লক্ষ করেছিল তাদের গ্রামের নীলরতন কলকাতায় পালিয়ে লেখাপড়া শিখে কালেক্টার সাহেব-এর নাজির হয়েছে। নীলরতনের আদর্শ সামনে রেখে নায়ক ‘সেইরূপ অত্যুচ্চ’ ‘জীবনের লক্ষ্য’ পূরণের

জন্য কলকাতার উদ্দেশে পালাল। যদিও কলকাতায় পৌঁছে 'বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য' নিয়ে লেখাপড়া চলতে থাকে আমাদের নায়কের।

কলকাতায় এসে নায়ক যোগ দিল রাজনীতিতে। সদ্য তরুণ নায়ক উপলব্ধি করল 'দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ বিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক'। তাই তাকে দলের নেতৃস্থানীয়রা নামিয়ে দিল পথে চাঁদা সংগ্রহের কাজে। দলের 'কর্তৃপক্ষীয়রা' যখন বক্তৃতা দিতেন; তখন দলের অন্যান্য তরুণ সদস্যদের সঙ্গে নায়কও 'চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো' করে চাঁদা তুলত, বিজ্ঞাপন বিলি করত, সভার আয়োজনে হাত লাগাত আর 'দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি' করতে লেগে পড়ত। রাজনীতি, সংগঠন প্রভৃতির প্রতি কথকের মতো গ্রাম থেকে শহরে আসা তরুণদের আনুগত্য প্রশ্নহীন। অথচ শহর তাদের সম্মান করে না, 'বাঙাল' বলে টিটকিরি ছোঁড়ে। 'শহরের ছেলেরা' অনেক পরিণত, অভিজ্ঞ। কিন্তু গ্রামবাংলা তখনও আয়ত্ত করতে পারেনি নাগরিক জটিলতা। গ্রামীণ সরলতা ও মূল্যবোধ শহরে বিদ্রূপের লক্ষ্য হল। আবার শহরের রাজনীতির কারবারিরা গ্রাম থেকে আগত তরুণদের সারল্য আনুগত্য ব্যবহার করে নিলেন। বিভ্রান্ত বা দিকভ্রান্ত হল আমাদের নায়ক যুবকটি। এই বিভ্রান্তির ছবিটি একটি বাক্যে প্রতীয়মান করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ—''নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম''। লক্ষ করার মতো 'আয়োজন' শব্দটি—বড়ই বেদনাবহ। উনিশ শতকে মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ ইতালি গড়ে তোলার জন্য সংগঠিত বিপ্লবী আন্দোলনের দুই বরেণ্য নেতা জুসেপ্পে মাৎসিনি (১৮০৫ খ্রি.—১৮৭২ খ্রি.) এবং জুসেপ্পে গারিবালদি (১৮০৭ খ্রি.—১৮৮২ খ্রি.)। স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার নামে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যবহার করল তরুণদের নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে। মাৎসিনি-গারিবালদি-র কথা শুনিয়ে তাদের উত্তেজিত করা হত, অথচ শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীদের রাজনৈতিক অবদান সম্পর্কে তরুণদের প্রকৃত পাঠ দেওয়া হল না। ফলে তরুণের দল বিপ্লবী নায়কদের মতো হওয়ার 'আয়োজন' করার মধ্যেই থেমে থাকল। 'আয়োজন' শব্দের মধ্যে আমরা কৃত্রিমতার বোধ পাচ্ছি, আবার ব্যর্থতার নিদারুণ যন্ত্রণাও অস্পষ্ট নয়।

'নরনারী' প্রবন্ধে পাঞ্চভৌতিক সভার সভাপতি 'আমি' বা ভূতনাথবাবু পুরুষের ব্যর্থতার কথা তুলেছিলেন এইভাবে—''আমরা অকর্মণ্য, নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, ... যে-কোনো কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে।" যেমনটি হয়েছে গল্পের কথক নায়কের। এখানে এই কথা বলাটা জরুরি যে পুরুষের 'কীর্তিস্তম্ভ' গড়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যর্থতাই সকারণ, এবং কারণগুলি সমাজতত্ত্বগত। গল্পের কথক যুবাটি সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ থেকে মুক্তি খুঁজছিল। আর বুর্জোয়া বা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আত্মপ্রতিষ্ঠার সামর্থ্য তার গড়ে ওঠেনি। যদিও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত ছিল। পিতৃপ্রধান সেই ব্যবস্থায় সে ছিল পিতার তত্ত্বাবধানে, পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে। সেখানে তার ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের কোন অবকাশ ছিল না। পিতৃ-ইচ্ছার অধীনতা অস্বীকার করতেই সে কলকাতায় পালিয়ে আসে। তখন তার অভিপ্রায় ছিল ব্যক্তিত্বের মুক্তি, সত্তার স্বাধীনতা। কলকাতার বুর্জোয়া সংস্কৃতি ব্যক্তিপ্রধান সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই হয়ে ওঠার আগেই তার জীবনে এল বিপর্যয়—পিতার মৃত্যু। সামন্ত অবস্থা থেকে বুর্জোয়া দশায় যাওয়ার এই সন্ধিপর্বে পিতার অর্থনৈতিক দাক্ষিণ্য ছিল তার সম্বল। সেই সম্বল হারিয়ে সে সবদিক থেকেই অসহায়। মা ও দুই ভগ্নীর দায়িত্ব নিতে হবে তাকে। এন্ট্রান্স পাশ নায়ককে নিতে হল নওয়াখালি বিভাগের একটি

ছোট শহরের এক এন্ট্রান্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার-এর চাকরি। ততদিনে সুরবালা 'উকিল' রামলোচনবাবুর ঘরনী। 'আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব'—এ প্রতিজ্ঞার কারণে সুরবালাকে বিবাহ করেনি নায়ক। কিন্তু তার দেশের জন্য সেই প্রাণ দেওয়া হল না। আবার যে আধুনিক পেশায় সে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি পেতে চেয়েছিল তেমন কোনো অর্জনও তার ঘটল না। সামন্ত জীবন থেকে সে বিচ্যুত, বুর্জোয়া জীবন তার আয়ত্তাতীত। নিঃসঙ্গ হয়ে গেল নায়ক।

শিক্ষকতার কাজ শুরু করে নায়ক ভাবল 'উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব'। কিন্তু এখানেও তার ব্যর্থতা। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তৈরি করতে গিয়ে সে দেখে 'ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি।' সেকেন্ড মাস্টার দেশহিতের উদ্দীপনায় 'ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেড্‌মাস্টার রাগ করে'। দেশ, দেশহিতব্রত, দেশের ভবিষ্যৎ গঠন—এসব রোম্যান্টিকতার কাল শেষ। বস্তুবাদী 'এগ্‌জামিনের তাড়া'-ই এখন শেষ কথা। জীবনের অনেক কিছু হারিয়ে আদর্শ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নটি নায়ক আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। সেখান থেকেও সে উৎখাত হল। ক্ষিতি যেমন বলেছিলেন 'কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা ... ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে', সেই একই উপলব্ধি ব্যক্ত হল 'একরাত্রি'-র নায়কের কথনে তবে ভিন্ন উচ্চারণে—''আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফে-ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।'' শিক্ষক নিজেকে উপমিত করছে কৃষিকাজে সহায়ক চতুষ্পদের সঙ্গে—এটাই কল্পনাপ্রবণ মানুষটির জীবনের ট্র্যাজেডি।

অগ্নিদুর্ঘটনার আশঙ্কায় একজন শিক্ষককে থাকতে হত স্কুলঘরে। আমাদের নায়ক 'একা মানুষ', তার উপরেই বর্তাল সে দায়িত্ব। এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এই বাক্যটি—''স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে।'' ব্যর্থ জীবন তরুণটিকে 'লোকালয়' থেকে দূরে ঠেলে দিল ঘোর একাকীত্বের মধ্যে। একাকীত্বের সেই শূন্যতায় প্রবেশ করল একটি খবর যা এতদিন তার কাছে 'উল্লেখযোগ্য' ছিল না। কিন্তু তার বর্তমানের গভীর নিঃসঙ্গতা যেন কিছুটা ভরিয়ে দিল এই খবর। নায়কের আশ্রয় যে স্কুলে তার কাছেই 'সরকারি উকিল' রামলোচন রায়-এর বাসস্থান। না, এটা কোন খবর নয়। খবরটি রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন এই বাক্যে—''এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী—আমার বাল্যসখী সুরবালা—ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।'' বাক্যটি শুরু হয়েছে 'এবং' দিয়ে। আর ঐ 'এবং'-ই নির্দিষ্ট করে দিল কোন খবরের জন্য নায়কের উৎসাহ। নায়কের কাছাকাছি তার 'বাল্যসখী' সুরবালার বসবাস। কিন্তু সে এখন সরকারি উকিলের স্ত্রী—পরস্ত্রী। তার সম্পর্কে সহজে কথা বলা সামাজিক সৌজন্যের পরিচয় নয়। আবার সুরবালাকে উপেক্ষা করার যন্ত্রণাও তখন নায়কের মনে ক্রিয়াশীল। তাই নায়কের কথনে সুরবালার বর্তমান খবর এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয় না। দুটি অস্বস্তি প্রকাশক বিরতি বাক্যটিকে বিলম্বিত করে। দুটি অস্বস্তি রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দেন দুটি ড্যাশ ('—') চিহ্ন ব্যবহার করে। একক কথনে বলা গল্পটির মধ্যে নাটকের সংলাপ বলার ভঙ্গিটি যেন ঘনিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

যে সুরবালাকে যৌবনের প্রারম্ভে অবহেলার সঙ্গে ত্যাগ করে এসেছিল নায়ক এবার তার টানেই সুরবালার স্বামী রামলোচনবাবুর সঙ্গে আলাপ জমাল নায়ক। ছুটির দিনে 'ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে'

'ঘন্টাখানেক—দেড়েক অনর্গল শখের দুঃখ' পালনের মধ্যে নায়ক উৎকর্ণ হয়ে থাকে 'পাশের ঘরে' 'মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং' 'কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌' 'পায়েরও একটুখানি শব্দ' শুনতে পাওয়ার জন্য। ধ্বনিব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নায়কের বুকে তখন প্রত্যাশার কম্পন, প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব মানুষ প্রত্যাশিতের জন্য দমবন্ধ অপেক্ষার মধ্যে নিজের হৃৎস্পন্দনের ধ্বনিও শুনতে পায়। তাই ধ্বনিব্যঞ্জক শব্দাবলীর আয়োজন। আবার নিঃসঙ্গ মনের শূন্যঘরে স্মৃতি বা কল্পনা ধ্বনিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এভাবেও দেওয়া যায় এই শব্দযোজনার ব্যাখ্যা। নায়কের প্রত্যাশার পরিমাণ কিন্তু পুনরুক্ত 'একটু' বা 'একটুখানি'। যা একদিন সহজে পাওয়া যেত, তাকে হারিয়ে ফেলার পর, সেই হারিয়ে যাওয়া বিষয়টির জন্য একাকী মনের দারিদ্র্যপূর্ণ আক্ষেপ ঐ 'একটুখানি'।

নায়কের নিঃসঙ্গ মন অধিকার করে নেয় সুরবালার 'চুড়ির শব্দ', 'মাথাঘষার গন্ধ'। শৈশব পেরিয়ে এখন যৌবন, নৈকট্যের অনুষঙ্গ বদলাচ্ছে। যে দাম্পত্য সম্ভব ছিল একদিন তার কিছু ঘনিষ্ঠতার কল্পনা খেলা করে নায়কের মনে। পরক্ষণেই সে সজাগ হয়ে ওঠে সুরবালা এবং তার মধ্যে গড়ে ওঠা 'দেয়াল' সম্বন্ধে। সুরবালা এখন পরস্ত্রী—'তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ'। যে নারী একদিন অবলীলায় তার একান্ত হতে পারত তাকে রামলোচন 'গোটা-দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া' 'ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল'। 'ছোঁ'—শব্দটির মধ্যে নারীর প্রতি পুরুষের অধিকার স্থাপনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সুরবালাকে হারানোর যে ক্ষতি তার সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায় নায়ক। তার মনের অভিব্যক্তি—"রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে-সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষা বেশি করিয়া আমার..."। নায়কের মনে সুরবালা এখন দুজন নারীতে মূর্ত। একজন রামলোচনের স্ত্রী 'যে-সুরবালা'। শব্দচিত্রটি লক্ষ করার মতো। 'যে-সুরবালা'-র মধ্যে হাইফেনঘটিত বিচ্ছিন্নতা নায়কের এই ভাবনাকে প্রকাশ করে ইনি যে-কোনো একজন মহিলা। নায়কের মনে যে সুরবালার স্মৃতি সেই স্মৃতিধৃত নারীটি 'বেশি করিয়া আমার'। স্মৃতির মধ্যে মনের অস্থিরতার উপশম খোঁজে নায়ক। এই অস্থিরতার উদ্ভব ঘটে আক্ষেপ থেকে। নায়কের মনের অস্থিরতাটি পাঠককে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আখ্যানের একক কথনের ভঙ্গি বদলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যে বাক্‌চিত্রটি তিনি সৃষ্টি করেন সেখানে দেখা যায় একটি মানুষের অন্তর্গত তিনটি সত্তা পরস্পরের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে সুরবালাকে কেন্দ্র করে। তর্কটি এইরকম :

> "আমি বলিলাম, তা থাক্‌-না সুরবালা আমার কে।
>
> উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।
>
> সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত...।"

নায়কের চেতনা জুড়ে সুরবালার স্মৃতি যে অস্থিরতা উৎপাদন করে তা অনতিবিলম্বে ব্যাঘাত ঘটাল তার শিক্ষকতার কাজে। অলস দুপুরে ক্লাসে ছাত্ররা যখন পাঠব্যস্ত নায়কের 'তখন ইচ্ছা করিত—কী ইচ্ছা করিত জানি না—এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ভারতবর্ষের এই-সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না'। মনের জটিল ক্রিয়াগুলিকে এখানে মূর্ত করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ। 'তখন ইচ্ছা করিত—কী ইচ্ছা করিত জানি না— ....' দুটি বিরতি (ড্যাশ — চিহ্নিত) ব্যবহার করার মধ্যে মনের অদম্য 'ইচ্ছা'-টাকে দমনের ছবিটা প্রকাশিত হল। 'ইচ্ছা'-টা আর যাই হোক 'ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না'। 'ব্যাকরণের' মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নায়কের অবদমিত অসংযত আবেগের কথাই বলেন। এখানে

'ব্যাকরণ' একদিকে ছাত্রদের পাঠ্যসূচির ব্যাকরণ। আবার অন্য অর্থে 'ব্যাকরণ' সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলিত জীবন। মনের অদম্য 'ইচ্ছা' দমনের প্রয়াসটি 'ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন'। বোঝাই যায় এই 'ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন' না-করার 'ইচ্ছা' জাগত নায়কের মনে সুরবালাকে ঘিরেই। সামাজিক রীতি-কানুনের শৃঙ্খলগুলি অস্বীকার করে হারানো সুরবালাকে আবার ফিরে পাওয়াই হল নায়কের 'ইচ্ছা'। আমাদের মনে পড়বে 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের ''আকাশের চাঁদ'' কবিতাটির কিছু পংক্তি —

''যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহে নি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতি-সাগরের তীরে।
হতাশ-হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
পূরবী রাগিণী বাজে,
দু বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ওই জীবনের মাঝে।''

গল্পটি প্রকাশের পরের মাসেই কবিতার পংক্তিগুলো লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতা রচনার তারিখ যা উল্লিখিত ২২ আষাঢ়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

'ওই জীবনের মাঝে' 'ফিরে যেতে' চাইলেই তো আর ফিরে যাওয়া হয় না। জীবন কচিছেলের হাতের মোয়া নয়, বাস্তবতার আঘাতে যন্ত্রণাদীর্ণ। জীবনের সেই নির্মম বাস্তবতার প্রকাশ হয়ে আসে বান-বিপর্যস্ত রাতটি। রামলোচন সেদিন মোকদ্দমার কাজে অন্যত্র গিয়েছেন। আকস্মিকভাবে বান আসে গ্রামে। পুকুরের পাড়ে 'প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ' অংশে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নেয় সুরবালা ও কথক নায়ক। 'আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত-পাঁচ-ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী' অথচ 'একটা কথাও বলা গেল না'। রবীন্দ্রনাথ এখানে পাঠক মনে উপলব্ধির শিহরণ তোলেন এই বাক্যটিতে—''কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না''। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে বিপর্যস্ত রাতটি ছিল মঙ্গলবারের রাত। 'সোমবার' 'সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে', 'তাহার পরদিন বিকেলের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল' এবং 'যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল'। সোমবারের পরদিন এই মঙ্গলবারের রাতে এসেছিল বিপজ্জনক বান। সুরবালা বা কথক কারো জীবনেই তো মঙ্গলজনক কিছু হয়নি—তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। মঙ্গলবারের রাতেই এই বিপর্যয়। যুগলের যে 'মঙ্গল'-ময় জীবন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা পূর্ণ হতে পারেনি বলেই কেউ কাউকে 'কুশলপ্রশ্নও' করে না। কেউ ভালো তো নেই। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে 'আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে'— 'ব্যাকরণের' শাসন ছিল না। সামাজিক 'ব্যাকরণ' লুপ্ত অথচ কথক জানায় 'দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম'। শৈশবের ঘনিষ্ঠতা পুনর্জীবিত হওয়ার কোনো শক্তি পায়নি সেই রাতের 'অন্ধকারে'। কিন্তু সেই 'অন্ধকারের দিকে' তাকিয়ে কথকের মনে উথালপাথাল করে পূর্বস্মৃতি আর সুপ্ত প্রত্যাশারা। কী ঘটছিল তখন কথকের মনে। গল্পে সে বর্ণনা কথক দেয়নি। তবে সেই নিরুচ্চারিত শব্দগুলি খুঁজে পাওয়া যায় 'সোনার তরী'-র ''ব্যর্থ যৌবন'' কবিতায়—

“মনে লেগেছিল হেন, আমারে সে যেন
ডেকেছে।
যেন চিরযুগ ধরে মোরে মনে করে
রেখেছে।
সে আনিবে বহি ভরা অনুরাগ
যৌবননদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ—
বাঁধনে।
আহা, সে-রজনী যায়, ফিরাইব তায়
কেমনে।”

দুর্যোগ থেমে গেলে ‘সুরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল’ এবং কথক জানাল ‘আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম’। ‘বাড়ি’ ও ‘ঘর’-এর পার্থক্য প্রকাশের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। রামলোচনের স্ত্রী ‘যে-সুরবালা’ সে গেল ‘বাড়ি’। ‘বাড়ি’ অনেকের, কোলাহলপূর্ণ। কথক তার হৃদয়-অন্তর্গত সুরবালা, যে সুরবালা কোন ‘বাড়ি’-র বৌ নয়, সেই সুরবালাকে বহন করে আনলেন ‘আমার ঘরে’—একান্তের নির্জনতায়। কিন্তু বিপর্যয়ের সেই রাতটির মধ্যে কথক যখন ‘অনন্ত আনন্দের আস্বাদ’ লাভ করেন কিংবা ঐ রাত্রিটিকে ‘তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা’ মানেন তখন রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্নপন্থী হয়ে যায় আমাদের ব্যাখ্যা। যে পুরুষ সামন্ততন্ত্রের বাঁধন সম্পূর্ণভাবে ছিঁড়তে পারেনি, আবার বুর্জোয়া জীবনের ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এঁটে উঠতে পারল না ‘দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া’ থাকার মুহূর্তকে সে তার জীবনের ‘চরম সার্থকতা’ বলে মনে করে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে আবেগের প্রাধান্য রয়েছে। ভাঙা প্রেমের যে মর্মস্পর্শী ছবি আঁকল গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কলম ‘একরাত্রি’ গল্পে সমাজবিজ্ঞানগত বিচারে তাকে আমরা সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যের শক্তি খুঁজে না-পাওয়া এক মানুষের অনিবার্য ভবিতব্য রূপেই চিনতে পারি।

ভারতীয় সাহিত্যপাঠে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিজ্ঞতা : এক পাঠকের প্রস্তাব

মননকুমার মণ্ডল

ভারতীয় সাহিত্যের আজকের অবস্থা দেখে একথা বিশ্বাস করাই কঠিন যে একটা শতাব্দী আগে পর্যন্তও আমাদের দেশের 'বিভিন্ন ভারতবাসী' মানুষের সাহিত্যচর্চার মধ্যে আলাদা করে 'ভারতীয়' হয়ে ওঠার কোনো তাগিদ ছিল কিনা। প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের পথ ধরে সমাজ- রাজনীতির ক্রমবিবর্তনের ধারায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যতগুলি ভাষার সাহিত্য আপ্রাণ বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে, 'ভারতীয়' হয়ে উঠছে, তারা তাদের ঐতিহ্যের শিকড় থেকে কি কোনোভাবে উন্মুলিত হচ্ছে? দেশের স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় ভাষাগুলির স্বীকৃতির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যতটা বাস্তবতার কঠিন বাধ্যবাধকতার প্রতিফলন ততটা ঐতিহ্য স্বীকৃতি নেই। স্বাধীনতার কথা উঠলেই অবধারিতভাবে উঠে আসে কলোনির কথা। কলোনির মধ্যে প্রাণান্তকর শ্বাসরোধী বাঁচার কথা; অথবা এমনটাও হতে পারে যে, প্রান্তিক সীমানার মানুষ হয়ত স্ব-নির্বাচিত স্বাধীন জীবনচর্চায় অভ্যস্ত হয়েই তার রচিত সাহিত্যে জীবনের অন্যতর ছাপ রেখে গেছেন! অর্থাৎ প্রান্ত এবং কেন্দ্রের বিতর্ক উঠবেই। এমনভাবে এগোতে থাকলে কলোনির চাপের বিরুদ্ধ প্রস্তাব তৈরি হতেই বা কতদিন লাগে—যেমনটা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বেলায় হয়েছে। কলোনির ভারতবর্ষ কেমন করে বেঁচে ছিল তার কথা, কেন্দ্রের বিপ্রতীপে প্রান্তিকায়িত মানুষের প্রস্তাব। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মারাঠী, তামিল, কন্নড়, মালায়লম, পাঞ্জাবী, গুজরাটী এসবই এখন প্রান্তের ভাষা, তাদের সাহিত্যও অনেকটাই প্রান্তিক সাহিত্য। বরং ইংরেজি ভাষায় এই একান্ত দেশজ ভাষার মানুষের জীবনচর্যা 'ভারতীয়ত্বে'র একটা অন্যতর ঠিকানা তৈরি করেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাস্তব যে এমনকি হিন্দি, রাষ্ট্রভাষা হয়েও কি একটা পৃথক কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার নিশানা তৈরি করছে না? বৈচিত্র্যের সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমেই গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর পাঠকের কাছে পৌঁছয় এটা ঠিক, কিন্তু সেই অনুবাদই যদি কেন্দ্রের আগ্রাসনের জমি তৈরি করে তাহলে? লেখক অর্ধেক জীবন পর থেকেই যদি সেই অনুদিত হওয়ার মোহে পড়ে যান? যদি ক্রমশই সেই অনুবাদ প্রান্তিকের সম্ভাবনাময় বৈচিত্র্যসমূহকে বর্তমানের দ্বিমাত্রিকতায় ভোঁতা করে দিতে থাকে? যদি বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিপুল কাহিনিসম্ভার তার অন্তর্ঘাতের শক্তি হারিয়ে ফেলতে থাকে ক্রমশ? ভারতীয় সাহিত্যের ভারতীয়ত্বের মধ্যে এসব প্রশ্ন এক ধরনের নঞর্থকতাকে নিয়ে আসে হয়ত—কিন্তু একজন মানুষী সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন আমাদের জল হাওয়ায় যিনি বেড়ে উঠেছেন এবং দুটো শতাব্দীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেইসব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রস্তাব করেছিলেন ভারতবর্ষের সাহিত্যের অন্তর্লীন সত্যের শিকড়। তিনি রবীন্দ্রনাথ।

ভারতীয়ত্বের কাল্পনিক সংজ্ঞার্থের মধ্যেই রয়েছে এই কেন্দ্র ও পরিধির সমাজ-রাজনীতির কুশলী টান। জাতীয়তাবাদী ধারণার পূর্বেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কীভাবে কলোনিসম্ভূত জীবন থেকে বিকল্প শিকড় সন্ধানের লড়াই শুরু হয়েছিল সেকথা শিশিরকুমার দাশ তাঁর History of Indian Literature

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন। এমনকি জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ন্যাশানালিজম্ পাকাপোক্তভাবে জায়গা করে নেওয়ার পূর্বেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যিকেরা ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়েছেন। উপনিবেশ বিরোধী গণআন্দোলনের ভাষা সাহিত্যের উপাদানে পরিণত হয়েছে। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক পার্থ চ্যাটার্জ্জীর ভারতবর্ষীয় জাতীয়তাবাদী আলোচনার তিনটি মূল সূত্র ছিল moment of departure, maneuver এবং arrival। শিশিরবাবু একে কিছুটা সরলীকৃত ব্যাখ্যা বলেছেন ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশের নিরিখে। আসলে Patriotic writing ছিল বিদেশী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে জনমানসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। সর্বোপরি তা ঘটেছিল সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের বেশ কিছু আগে। এই Patriotic writing সম্পর্কে শিশিরবাবু বলছেন : The other feature of the patriotic writing is the assertion of the Indian identity in terms of religion, Language, myth and history ... this idea of community of the Indian people surfaced independent of the construction of nation as a political category. মূলত ইংরেজি শিক্ষিত এলিট নব্য-বুদ্ধিজীবীরাই এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব এনে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাদের ভাবনার মাধ্যমে। গদ্য বিকাশের প্রাথমিক পর্বে সারা ভারত জুড়েই উপনিবেশের হাত ধরে, রাজশক্তির ধর্মপ্রচারের ও নিতান্ত বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহৃত শিক্ষাব্যবস্থা যে অল্পশিক্ষিত কেরানিকুল গড়ে তুলছিল তা ছিল সাহিত্য-পাঠক সমুদায় তৈরির ভিত্তি।

কলোনিসম্ভূত জীবনচর্যার বিরুদ্ধে এই পাঠককুল ক্রমশই খাড়া করতে পেরেছিল সেই জাতীয়তাবাদের কল্পপ্রতিমা। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে যে কল্পপ্রতিমা সর্বপ্রথম সাহিত্য ও রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে সংলগ্ন করে তুলেছিল। কিন্তু বিদেশি প্রভুশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধ প্রস্তাব হিসেবে এই ভারতীয়ত্বের কল্পপ্রতিমা আসলে বৈচিত্র্যপূর্ণ গোষ্ঠীসাহিত্যের মূলস্রোতকে প্রান্তিকায়িত করল। ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের ধারণায় যাকে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন Print capitalism বলেছিলেন তা ঠিক এদেশের imagined community নয়; বরং বহুভাষাভাষী মিশ্র জনজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির মধ্যে সেই কল্পপ্রতিমার ভারত তার অতীত আবাহনের রাজনীতিকে সামনে আনল। এই 'Revival of the past' কলোনির বিরুদ্ধে ভারতীয়ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সবচেয়ে সঙ্কটময়ও বটে। গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে রামায়ণ মহাভারতের বহুল প্রচারিত আশ্চর্য আখ্যান-রূপকের ছায়ায় পুনর্গঠিত হতে থাকল নতুন আখ্যান। চেনা গেল আত্তীকরণ, সংশ্লেষণ, মিশ্রণের বৈচিত্র্যময় ঐক্যকে। আবার অন্যদিকে সঙ্কটময় একারণে যে, অতীতের সমৃদ্ধ স্বদেশি সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ক্ষমতার অন্তর্গত সুরকে গুরুত্ব না দিয়ে ঔপনিবেশিকতার বিপ্রতীপে তা পরাহিতের আখ্যান হয়ে উঠতে থাকল। ভারতীয় সংস্কৃতির সংশ্লেষণধর্মিতার পরিবর্তে ভারতীয় সাহিত্যের উপনিবেশ উত্তর অধ্যায় প্রাণপণে চেষ্টা করল জাতীয়তাবাদের কল্পপ্রতিমায় রাজশক্তির বিরুদ্ধ-আখ্যান প্রস্তুতিতে।

ভারতীয় সাহিত্যের ঔপনিবেশিক পর্বে রাজনৈতিক উপন্যাসের জন্ম ও প্রসারের দিকে তাকালেই আমাদের কথা পরিষ্কার হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রচিত *আনন্দমঠের* মধ্যে এই রাজনৈতিক উপন্যাসের বীজ ছিল। *'বন্দেমাতরম'* সঙ্গীতটি পরবর্তীতে বিশেষত বঙ্গভঙ্গের সময় দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে 'জনগণমন অধিনায়ক...' সঙ্গীত রচনার পরও রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরমের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার জন্য। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে

'হিন্দুমেলা'য় যে গানটি গাওয়া হত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত (গাও ভারতের জয়...) সেটি 'বন্দেমাতরম' রচনাকালে এবং 'জনগণমন অধিনায়ক...' রচনাকালে প্রেরণা ছিল দুজনের কাছেই। আসলে সাহিত্য থেকেই জনমানসের রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে আত্মশক্তির আবাহন তা উপাদান সংগ্রহ করছিল। ১৮৮২'র লেখা গান যেন বঙ্গভঙ্গের সময় পুনরাবিষ্কৃত হল। ব্রিটিশ রাজশক্তির সহায়ক শক্তি, তাদের দেশীয় সংস্করণ হিসেবে Native State-এর আগ্রাসনের আঞ্চলিক প্রেক্ষিত থেকেও জন্ম নিয়েছিল রাজনৈতিক আখ্যান। যেমন মালায়লম *পারাপ্পুরম* (১৯০৭) এবং *উদয়াপথম* (১৯০৫-০৯) উপন্যাস দুটি। লেখক কে নারায়ণ *কুরুকাল* (১৮৬০-১৯৪৬)-এ দুটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকার না করলেও ত্রিভাঙ্কুরের দেওয়ানদের ব্রিটিশ স্তাবকতার পরিচয় নগ্নভাবে উঠে এসেছে এখানে। কন্নড়, তেলেগু এবং গুজরাটি উপন্যাসেও এই নেটিভ স্টেটের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। পাঞ্জাবী ঔপন্যাসিক ভাই বীরসিংহের উপন্যাসে শিখ জাতির নবতর উত্থানকে আলাদা করে glorify করা হয়েছে। অসমীয়া ও ওড়িয়া উপন্যাসেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। একদিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বা আখ্যানের মাধ্যমে স্বজাতির শিকড় সন্ধান অন্যদিকে সমকালীনতার কেন্দ্রীয় টান ভারতবর্ষের কথাসাহিত্যিকদের ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বীক্ষাকে সামনে আনল। হরিনারায়ণ আপ্তের *'আজাক'* (This very Day 1924)-এর কথা স্মরণে আসে। সেখানে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের একটি কাল্পনিক ছবি দিয়ে উপন্যাস শুরু হয়েছে। অবশ্য দেশভাগ (১৯০৫) থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত ভারতীয় কথাসাহিত্যে এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ যে প্রচুর জায়গা পেয়েছে এমনটাও নয়। যাইহোক যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ বঙ্গভঙ্গরদ দুটি ঘটনাই ব্রিটিশ প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় ডিসকোর্স তৈরি করার একটা বড় প্রেক্ষিত তৈরি করেছিল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে গান্ধীজীর উত্থান, জনমানসে গান্ধি মিথের লোকায়তিক প্রকাশ, প্রান্তীয় সাহিত্যে Militant Hero-দের আগমন, বিশেষ করে কথাসাহিত্যে বিপ্লবী নায়ক ও সাধারণ জনমানসের ভীষণ পরিচিত মুখগুলির সাহিত্যে জায়গা করে নেওয়া—সমস্ত দিকগুলিই ভারতীয়ত্বের বিকল্প ছবিকে সামনে আনতে থাকে। গদ্য বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে যে নব্য শিক্ষিত পাঠককুল তৈরি হয়েছিল, মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসারে—সাময়িক পত্র-পত্রিকার ব্যাপক প্রসারে যে জাতীয়তাবাদের কল্পপ্রতিমার সংঘটন হয়েছিল তার সাথে এই ভারতীয়ত্বের একটা বিচ্ছিন্নতাও ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে তাঁর সাহিত্যিক সক্রিয়তায় সেটির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। এই ভারতীয়ত্বের ঠিকানা সন্ধান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈদিক-ঔপনিবেশিক-মহাকাব্যিক উত্তরাধিকার থেকে। *কথা-কাহিনীর* কবিতাবলী, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কিত রচনা, *গোরা, ঘরে-বাইরে* ইত্যাদির মতো উপন্যাস, *কালের যাত্রার* মত রূপক নাট্য, *আত্মশক্তি, প্রাচীন সাহিত্য*'র মত প্রবন্ধ ও সমালোচনা সেই ঐতিহ্যকে এবং ভারতীয়ত্বকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চায়।

গুজরাটী কথাসাহিত্যিক কে কে মুন্সী রচিত *স্বপ্নদ্রষ্টা* (The Dreamer, ১৯২৪-২৫), দত্ত আপ্পাজি তুয়াপুরকার *মাঝে রামায়ণ* মারাঠিতে রচিত প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস (১৯২৭), সিন্ধি কথাসাহিত্যিক সেবক ভোজরাজের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস *'আশীর্বাদ'* (১৯৩২), তামিল কথাসাহিত্যে এস. পানিপ্পাম চেত্তিয়ার রচিত (*কান্টিনাটি*, ১৯২৬) এবং কে.এস. ভেঙ্কটরামনি-এর *দেশভক্তান কুন্দান* (১৯৩০) প্রথম পর্বের রাজনৈতিক উপন্যাসের উদাহরণ। এসব রাজনৈতিক

সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যেই তৈরি হয়ে উঠেছে আধুনিক ভারতীয়তার জাতীয়তাবাদী মানসকল্প। ফ্র্যাগমেনটেড্ এই জাতীয়াবাদী কল্পচেতনা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। হিন্দি সাহিত্যে প্রেমচন্দের 'ময়দাই-ই আমল' (১৯৩২)-এর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্যনীয়। এসমস্ত থেকেই দেখা যাবে গান্ধিজির ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে উত্থানের সঙ্গে এবং জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক সক্রিয়তার সূত্রে ভারতীয় কথাসাহিত্যে একপ্রকার স্বদেশিয়ানার আত্মশক্তি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলেছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে যে IPWA তৈরি হয়েছিল (যার প্রথম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রেমচন্দ) তার মধ্যে দিয়েও এই ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী ডিসকোর্সই কথাসাহিত্যের বিষয় হয়েছিল। মনে রাখা দরকার ১৯২২-এর অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে ১৯১৭ রুশ বিপ্লব এবং ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ভারতীয় কথাসাহিত্যিকদের মনে আলোড়ন তুলেছিল। ১৯২৮-এর হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্থিব মাধ্যমে ভগৎ সিং-এর দেশপ্রেমী আত্মত্যাগ লড়াই, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে কমিউনিষ্টদের সাহসী ভূমিকা IPWA-র সাহিত্যিক আন্দোলনে অনেকটা সদর্থক জমি তৈরিতে সাহায্য করেছিল। গান্ধিজির খাদি-চরকা প্রভৃতি সামাজিক স্বয়ম্ভরতার সক্রিয় কর্মসূচীর সমান্তরালে নন-ভায়োলেন্সের অদ্ভুত অস্ত্র ভারতীয় ন্যাশনালিজমের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু এই সমাজ-রাজনৈতিক সক্রিয়তার 'ভারতবর্ষ' নিজের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সূত্রগুলিকে ঠিক রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় গ্রহণ করেনি। ভারতীয়ত্বের নির্মিতির মূলভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে উপনিবেশ বিরোধী চেতনা। আবার ন্যাশনালিজমের তাড়না ভারতীয় সাহিত্যকে অনেক সময়ই প্রান্তিকায়নের চাপিয়ে দেওয়া কল্পলোক থেকে বেরোনোর Safty valve হিসেবে কাজ করেছে। বৈচিত্র্যময় সাহিত্যের আঞ্চলিক গভীরতা দেশজ রূপক-মিথ-আখ্যানের প্রতি সর্বদা সৎ থাকতে পারেনি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটে দশকে এই উপমহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কোনো নতুন কথা নয়। পাশ্চাত্যের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এই পরিচিতির ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কলোনি সম্ভূত জীবনাদর্শের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মত বহুভাষিকতার সাহিত্যে মূলত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া তাঁর মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছিল। প্রথমত কেমনভাবে পাশ্চাত্য ভাবলোক বা ভাবনাদর্শকে দেখা যেতে পারে এবং তাকে ব্যবহার ও সৃজনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা কী? দ্বিতীয়ত স্বদেশের ঐতিহ্য-ইতিহাসের, সংস্কৃতি-পুরাণের প্রতি আমাদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে? আধুনিক ভারতীয়তার নিরিখে এই অতীত ঐতিহ্যের বিন্যাস কেমন? প্রখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যিকদের কথায় যেমন হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী (হিন্দি), বি. গোপাল রেড্ডি (তেলেগু), পি বি নারেগল (কন্নড়), নগিনদাস পারেখ (গুজরাটী) প্রমুখের আলোচনা রবীন্দ্রনাথের এই গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। ১৯৬১ সালের Indian Literature-এর একটি লেখায় ভি.কে. গোককও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই পথপ্রদর্শক কালাতিক্রমী ভূমিকাটিকে। স্বদেশের ভাষার আধুনিক নির্মাণের সৎ সাহসী প্রচেষ্টা এবং উপনিবেশ অতিক্রমী চেতনার নিরন্তর লালন রবীন্দ্রনাথ সম্ভব করেছিলেন ভারতবর্ষের সমাজ-মানসের অখণ্ডতা ও বৈচিত্র্যের যুগপৎ বোঝাপড়ার মাধ্যমে। বিশ্বমানবতার ঐকান্তিক আদর্শগত অবস্থান থেকে। ফলত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য যখনই বহুমাত্রিকতার মধ্যে অখণ্ডতার ঐক্যসূত্রকে হারিয়ে ফেলে তখনই প্রয়োজন পড়ে রবীন্দ্রনাথের।

এখন দেখা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ কেমনভাবে এই ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বিকল্পে ভারতীয়ত্বকে প্রস্তাব হিসেবে রেখেছিলেন। আধুনিক রবীন্দ্রনাথকে ত্রিকালদর্শী বলে থাকেন অনেক সমালোচক। ভারতবর্ষের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান একত্রে প্রতিফলিত তাঁর রচনায়। অতীতকে কথা বলানোর প্রচেষ্টা রাবীন্দ্রিক রোম্যান্টিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 'কথা কও; কথা কও/ অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে/কেন বসে চেয়ে রও। ... হে অতীত তুমি আমার/হৃদয়ে কথা কও, কথা কও।' তিনি বলছেন : 'আমার অতীতের মধ্যে আমার কতগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্তমানের পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি।' মহা অতীতকে মুগ্ধতার সঙ্গে ভরসাস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু স্বজাতির ইতিবৃত্তকে ইতিহাসকে তিনি আচ্ছন্নতার ইতিহাস বলেছিলেন : 'যে-সকল দেশ ভাগ্যবান, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক উলটা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।' (ভারতবর্ষের ইতিহাস) 'বিদেশীর ইতিবৃত্ত' সেই ইতিহাসে আমাদের প্রকৃত প্রাণশক্তির কথা নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় তিনি ঐক্যের আবহ, ঐক্যসাধনার সৎ সাহসী প্রচেষ্টা, চিরন্তন ধর্মনীতির ভাবটিকেই দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলছেন :

> ''পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ... বিদেশীর শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। তিনি সেতু নির্মাণ করিবেন তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।'' (*ভারতবর্ষের ইতিহাস*)

১৯০৬-০৭ সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথের *প্রাচীন সাহিত্য*-এর 'রামায়ণ', 'কাব্যে উপেক্ষিতা' 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ Glorified past-এর যে ঐতিহ্য-স্বীকরণের কথা বলেছেন তাও ভারতবর্ষের ঐক্য-সমন্বয়ের সংশ্লেষণকে তুলে ধরে। দীনেশচন্দ্র সেনের *রামায়ণী কথা-র* ভূমিকারূপে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> ''প্রাচীন আর্যসভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং এক ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে। ... ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান। ... গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। ... ইহাই সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে। ... পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ... সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভগ্নহৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।''

রবীন্দ্রনাথের '*কথা*' এবং '*কাহিনী*' (১৯০০) কাব্য দুখানিকে ভারতবর্ষের আখ্যান ইতিহাসের মর্মকোষ বলা যায়। 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'ভাষা ও ছন্দ', 'পতিতা', 'অহল্যার প্রতি' ইত্যাদি রচনার মধ্যেও এই রামায়ণ কাহিনির বিস্তার। আবার 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিদায়

অভিশাপ' প্রভৃতির মধ্যে মহাভারত কাহিনির বিস্তার। অর্থাৎ ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এক ধরনের ভারতবর্ষীয় অখণ্ড ঐক্যবোধ রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবিয়েছিল তা বিদেশীকৃত ইতিহাসের সঙ্কীর্ণতায় কিংবা একমুখীনতায় বোঝা যাবে না। বুদ্ধদেবের মহান ঐতিহ্য এবং মানবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। এসেছে সম্রাট অশোকের প্রসঙ্গ। কালিদাসের কাব্যের যক্ষপ্রিয়া তাঁকে বর্তমান ও অতীতের অনন্ত বিরহ থেকে মুক্তি দিয়েছিল কখনও কখনও। এই বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় ঐক্যবোধের অভিজ্ঞতা জীবনস্মৃতির মধ্যে কয়েকটি রচনায় পাওয়া যায়। যে অভিজ্ঞতাগুলি পরিণত বয়সেও তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। যেমন 'হিমালয় যাত্রা', 'বাহিরে যাত্রা', 'পিতৃদেব', 'বিলাত' ইত্যাদি। প্রকৃতির মধ্যে একাত্মভাবে একটি বৃহৎ ঐক্যের সামঞ্জস্যবোধকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছেন। এই সামঞ্জস্য ও ঐক্যবোধ-ই তাকে পৌঁছে দিয়েছে ধর্মনীতির পথ ধরে সর্বমানবের উপলব্ধিতে। জীবনের অখণ্ডতা বিশ্বের সজীবলোকের চিরন্তন সংগীতকে রবীন্দ্রনাথ যে রোমান্টিকতায় মূর্ত করেছিলেন তা কিন্তু ঠিক ইউরোপীয় রোমান্টিকতা নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো 'ক্রম-উদ্ভিদ্যমান' কবি-ব্যক্তিত্ব দেশ কাল সমাজের নিরন্তর উত্থান-পতনের মধ্যে এই সর্বমানবের বিশ্ববোধকে জাগ্রত রেখেছেন। কবি জীবনের সেই সর্বমানবের উপলব্ধি অথবা বিশ্বাত্মবোধের গোত্র নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সর্বমানবের পরিচয়কে তিনি ভারতীয়ত্বের অতীত ঐতিহ্য থেকে নিষ্কাষণ করেছিলেন। আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের উর্ধ্বে নিহিতার্থ অনুসন্ধানে বারবার রবীন্দ্রনাথ ফিরে গেছেন অতীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সেই সর্বমানবিক বৈশ্বিক উপলব্ধি যখন পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের আগ্রাসনের মুখে পড়েছে তখনও মাথা তুলেছে ভারতীয়ত্বের বোধ। পুরানো খসে পড়া বিশ্বাসের পলেস্তরার ফাঁকে দেখা গেছে চিরনবায়িত মানববোধ।

রবীন্দ্রনাথের অতীতচারিতা কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। ইতিহাস নিষ্কাশিত কল্পনালোকের বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতার প্রাচ্য প্রস্তাব গড়ে তোলেন। 'মেঘদূত' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ও অতীতের অতলস্পর্শী বিরহকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ডের মত। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি-ঐশ্বর্য-স্পন্দনকে মূর্ত করেছিলেন তিনি। সম্রাট অশোকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তাঁর ধর্মের অন্তর্নিহিত মানবতা নাড়া দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। *'কথা', 'কল্পনা'* ইত্যাদির কবিতায় প্রাচীন ভারতীয় আখ্যানের যে পুনর্গঠন, *মায়ার খেলা, শাপমোচন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন* প্রভৃতির মধ্যে সেই আখ্যানের যে শিল্পিত নবায়ন ঘটান তিনি, যে প্রশ্নগুলি নতুন করে তুলে ধরেন তা থেকেও ভারতবর্ষীয় আখ্যানের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশিত হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতা সেই কারণেই ঠিক ইউরোপীয় রোম্যান্টিকতা নয়। *চিত্রা-চৈতালী-গীতাঞ্জলী* পর্বের অন্তর্লীন আধ্যাত্মিকতা, মরমিয়াবোধ রবীন্দ্রনাথের মনে সৌন্দর্য ও inner self-এর একটা সমন্বয়বোধ হিসেবে ঐশ্বর্যময় রূপ লাভ করেছিল। *'বলাকা'* পর্বের যে গতিবাদের ধারণা তা না থাকলে কিংবা *ছিন্নপত্র* বা *সোনার তরী—মানসী'র* বিশ্বাত্মবোধ সুদৃঢ় জমি না পেলে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্বের সর্বমানবের উপলব্ধির জগতে পৌঁছতে পারতেন না। এই ক্রমবিবর্তিত কবিমানসকেই ঐক্যসন্ধানী, সংশ্লেষণধর্মী দার্শনিকতায় রূপান্তরিত হতে দেখব আমরা। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছুদিনের বিশ্রামকে সাধারণত দেখা হয় প্রকরণগত পরিবর্তনের প্রস্তুতি হিসেবে। কিন্তু এই পরিবর্তন প্রয়াস সমানভাবে বিষয়গতও বটে। আমরা যে ভারতীয়ত্বের কল্পপ্রতিমা রবীন্দ্রনাথে দেখতে পাই, তার সবচেয়ে স্থিতধী নির্মাণ ঘটে *'গোরা'*-তে। আর যে স্বাদেশিকতার মোহগ্রস্ততা থেকে তিনি সাবধান করতে চেয়েছিলেন তা পেয়ে যাই *'ঘরে-বাইরে'*-তে। 'ভারততীর্থ' কবিতায় সম্মিলনের বোধ, সংশ্লেষণের যে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দেন তা এসব জায়গায় বাস্তবের মাটিতে

একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। একদিকে গোরা'র জীবন অন্যদিকে বিমলার মনস্তাত্ত্বিক ডিলেমার পুঙ্খানুপুঙ্খতা আসলে ভারতীয়ত্বের নতুন সন্ধান কিংবা ভারতীয় সমাজ-পরিবারের cohesion (সংবদ্ধতা) পরীক্ষার শিল্পরূপ।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন বলেই সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এত ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছিলেন একথার মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। কবিতার ক্ষেত্রে এই অনুবাদ এবং প্রভাবের ছায়াপাত ঘটলেও নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে ততটা ঘটেনি। যদিও *কুমুদিনী* (যোগাযোগ), *গোরা, আঁখ কী কিরকিরী* (চোখের বালি), *নাও দুর্ঘটনা* প্রভৃতি হিন্দি অনুবাদগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। আর কবিতার ক্ষেত্রে মৈথিলীশরণের কথা তো সর্বজনবিদিত। প্রাচীন সাহিত্যের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের 'উর্মিলা' সম্পর্কিত লেখাটি মৈথিলীশরণকে উর্মিলা সম্পর্কিত কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিয়ে তো আলোচনা চালুই আছে। *রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য* গ্রন্থে সুধাকর চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে (জয়শঙ্কর প্রসাদ, সুমিত্রানন্দন পন্থ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী) আলোকপাত করেছিলেন অনেকদিন আগেই। হিন্দিতে ১৯১০ সালে জনার্দন ঝা অনুবাদ করেছিলেন রাজর্ষি। প্রেমচন্দ্র, নিরালা ও মহাদেবী বর্মা প্রমুখেরাও রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রেমচন্দ 'গল্পগুচ্ছ' পড়ে গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন। উর্দুতে ১৯১৪ তেই নিয়াজ ফতেপুরি অনুবাদ করেছিলেন 'গীতাঞ্জলি'। আরা বেগম করেছিলেন 'ডাকঘর' আর 'চিত্রাঙ্গদা' করেছিলেন অনুবাদক আসফ আলী। মালয়ালি ভাষায় কুমারন আসান 'চণ্ডাল ভিক্ষুনি' কাব্য লিখেছিলেন। কন্নড় কবি বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার মস্তি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা থেকেই বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বনে রচনা করেছিলেন *যশোধরা*। ১৯৩৮-এ সিন্ধিতে *গোরা* উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন গুলি সদারঙ্গিনী। তামিল মহিলা ঔপন্যাসিক তত্তম রঙ্গনায়কী অনুবাদ করেছিলেন *যোগাযোগ*। *রক্তকরবী* ও *মুক্তধারা* বহু ভারতীয় ভাষাতেই অনূদিত হয়েছিল। যাইহোক, পৃথক উদাহরণ এভাবে উল্লেখ করা শেষ হবে না—লিখতে গেলে। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অরুণকুমার বসু *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায় (ঊনত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা) 'ভারততীর্থে রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে একটি আলোচনা উপস্থাপিত করেন। আলোচনাটিতে বারবার তিনি খেদের সঙ্গে এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা না হওয়ার দিকটি তুলে ধরেছেন। আমার বলার লক্ষ্য হল এই সব লেখা থেকেই প্রমাণ করা যায় একক বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা ও বাঙালি পাঠকদের সীমানা ছাড়িয়ে পঠিত, অনূদিত এবং আদর্শায়িত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথের মত অসম্ভব সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে স্বদেশ সন্ধানী চেতনায় দেখলে ভারতীয় সমাজের অখণ্ডতার কোন চেহারা প্রতীয়মান হয়? নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এহেন রবীন্দ্রানুরাগের একটা কারণ হল, ভারতীয় সমাজের বহুবিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলির সঙ্গে তাঁর সাহিত্য সংযোগসাধন করতে পেরেছিল। পুরাণ-ইতিহাস-কল্প, ইতিহাস-আদর্শায়িত মানবতাবোধকে ঐতিহ্য হিসেবে তিনি সামনে রাখতে পেরেছিলেন আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিকীর্ণ মানসলোকে। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

আমার বলার বিষয়ে যে 'ভারতীয়ত্ব'কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা মূলত এই প্রশ্নে যে,

১. রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্বের বোধ ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃতির সংশ্লেষণধর্মীতা থেকে উঠে আসে। এই সংশ্লেষণধর্মী ভারতীয়ত্ব'কে তার নায়কেরা সন্ধান করেছে প্রতিদিনের বাঁচায়—যেমন গোরা, নিখিলেশ, অতীন এমনকি কুমুদিনীও। ভারতীয় সমাজ—পরিবারের গণ্ডী থেকেই এই বৃহত্তর ভারতীয়ত্বের জীবনবোধে এরা মুক্তি পেতে চায়।

২. কলোনিয়াল চাপের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর সাহিত্য ঔপনিবেশিকতার বিপ্রতীপ প্রস্তাব হিসেবে উঠে এসেছে। এজন্যে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পুনরায় নিজের স্বজাতির শিকড়গুলি অনুসন্ধানে নামতে হয়েছে। পাশ্চাত্য পরিক্রমার মধ্য দিয়ে প্রাচ্যকল্পে পৌঁছানোর চেষ্টা আসলে একটা ফাঁদ অথবা আবর্ত। এই আবর্তেই নতুন ভারতীয়ত্বের নির্মাণ ঘটাচ্ছেন অনেক ভারতীয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক। যেমন অমিতাভ ঘোষ, অনিতা দেশাই, ঝুম্পা লাহিড়ীর কথায়। ঐতিহ্য-স্বীকরণ মানেই বেদান্তের বা উপনিষদের ঐতিহ্য নয়—তাহলে কলোনিরও একটা ঐতিহ্য আছে তা কিন্তু স্বীকার করতে হবে। নিজেদের প্রতিদিনের আধুনিক বেঁচে ওঠার স্বাধীনতাই ভারতীয়ত্বের সোপান। তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকায় উপনিবেশের পর থেকে যা শুরু হয়েছে।

প্রেমচন্দের *সেবাসদন, গোদান কিংবা প্রেমাশ্রম* প্রভৃতি উপন্যাসের প্রবল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা বৃহত্তর ভারতীয়ত্বকে ফ্রেমবন্দি করতে অক্ষম। মনে হয় যেন ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এগুলি প্রত্যেকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে নিজের আত্মপরিচয়। রবীন্দ্রনাথ হয়ত সর্বমানবের ধারণাজনিত আন্তর্জাতিকতা থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুরানো বিশ্বাসের টলে যাওয়া বিশ্বাসভূমিতে দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার যন্ত্রদানবিক আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছিলেন—কিন্তু একথাই বা ভুলে যাই কি করে যে শেষ দিনেও তিনি রূপনারায়ণের কূলে জেগে ওঠার কবিতা লেখেন আর বিশ্বাস রাখেন 'তোমার' সর্বনামের আশ্চর্য অস্ত্যর্থকতায়। এই অস্ত্যর্থক বিশ্বাসের পথেই স্বাধীনতার এত বছর পরেও ইউ আর অনন্তমূর্তির মত ঔপন্যাসিক *'সংস্কারের'* মতো উপন্যাস লেখেন। যেখানে কুসংস্কারের পাহাড়প্রমাণ ঘেরাটোপের মধ্যে সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষের পথে নিজের মুক্তি খুঁজে পায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাণেশাচার্য? কিংবা এস.এল. ভৈরাপ্পার উপন্যাসে (পর্ব) সমকালিনতার ফ্রেমে মহাভারতের যুদ্ধের পট সাজানো হয়? ইন্দিরা গোস্বামীকে লিখতে হয় নারীর বেড়ে ওঠার কাহিনি এই রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার অলীক সময়ে?

আজ ই-মেল শাসিত গুগ্‌ল নেটওয়ার্ক ক্রমশই বিশ্বায়নের প্রাপ্তিগুলিকে হাতের মুঠোয় এনে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের অনুভবের অন্তর্লীন ঐক্যবোধ ভেসে উঠছে কি গ্লোবাল গ্রামে? উপনিবেশ ফেলে গেছে তার মর্মন্তুদ সৌধগুলিকে; তাই রবীন্দ্রনাথ এখনও অফুরান আকর। ভারতীয়ত্বের পাঠ নিতে তাঁর কাছে আপত্তি কোথায়। অতীত সন্ধানী, সংশ্লেষণধর্মী ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ইতিহাসকে অনুসন্ধান করেই এমন দেশের সাহিত্যকে প্রতিনিয়ত আধুনিক হয়ে উঠতে হবে। গ্লোবাল আগ্রাসন মূলত পুঁজির আর গ্লোবাল উপলব্ধি বিশ্বাস আমাদের আত্মগত। ভারতীয় সাহিত্যে তাই এ লড়াই নিরন্তর ও বহুমাত্রিক।

গ্রন্থঋণ

১. *Das Sisir Kumar, History of Indian Literature (1911-1956), Sahitya Academy, New Delhi.*

২. *Satchidanandan K. Indian Literature : Paradigm and Prasis (2008), Pencraft Int. New Delhi.*

৩. চট্টোপাধ্যায় সুধাকর, *রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য* (চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা।

৪. সম্মেলক (১৯৯৫), সাহিত্য অকাদেমি সংকলন।

৫. *Gokak V.K. (1961). 'Tagore's Influence on Modern Indian Poetry' : Indian Literature, Sahitya Academy Journal, New Delhi.*

৬. সেন প্রবোধচন্দ্র, *ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ*; দে'জ সং, ১৯৮৩

৭. রবীন্দ্রনাথের রচনার উদ্ধৃতিগুলির জন্য রবীন্দ্র রচনাবলী (প.ব. সরকার) ব্যবহৃত হয়েছে।